আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩

—একশো ত্রিশ টাকা—

সম্পাদনা
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন— অমিয় ভট্টাচার্য
মুদ্রণ— সানলিথোগ্রাফী

ASHUTOSH MUKHOPADHYAYA RACHANAVALI Vol III

An anthology of collection of short stories Vol-3 by Ashutosh Mukherjee
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street. Calcutta-700 073

Price Rs. 130/-

ISBN : 81-7293-195-6

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল লেখার ভিতরে নিবদ্ধ। সাক্ষাৎ হয়েছে কদাচিৎ কোনো সভা সম্মেলন উপলক্ষে। খুব ভালো লেগেছিল তাঁকে বেনারসে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে পর্যটক বেশে। কোথায় যেন চলেছিলেন বেড়াতে। হয়তো কোনো অ্যাডভেঞ্চারে। পরে যেটা রূপান্তরিত করে কোনো এক গল্পে! তাঁর এক একটা গল্প এক একটা অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনার রং মাখিয়ে বানানো। ভাষা সহজ, সরস, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত। এক কথায় মনোহারি। কোথাও কোনো আয়াসের চিহ্ন নেই। প্রসাধনেরও নেই চিহ্ন।

কাহিনী এমন কৌশলে বলা হয় যে বার বার মনটা বলে ওঠে, 'মাস্টার'! 'মাস্টার'! ছোটগল্পের ওস্তাদ। বিষয় যা বেছে নেন তাতে মেলে তাঁর অন্তরের মানবিকতা। তিনি শুধু একজন আর্টিস্ট নন, গভীরতরভাবে একজন হিউমানিস্ট। সব রকম মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি।

তিনি কোনো তত্ত্ব প্রচার করেন না, শিক্ষা দেন না। তাঁর মতবাদ বলতে একটাই। সেটা মানবিকবাদ। সব রকম মানুষই মানুষ। দোষে গুণে মানুষ। দুর্বলতা নিয়ে মানুষ। খুঁত নিয়ে মানুষ। কাউকে তুচ্ছ করা চলে না। নাই বা হলো সে উচ্চ।

তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমি অতিশয় বেদনা বোধ করেছিলুম। তাঁর লেখার মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন। এই সুবাদে আমি তাঁর পরিবারকে আমার সমবেদনা জানিয়ে রাখছি। যদিও বিলম্বিত তবু আন্তরিক।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচীপত্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

চোখের বালি

পুরুষমানুষের নাকি চোখে সচরাচর জল দেখা যায় না। বিশেষ করে যে মানুষ রোজ সকালে কানে তুলো গুঁজে আর চোখে ঠুলি এঁটে তবে কাজে নামে।

কিন্তু সেদিন রাতের গভীরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে যে মানুষটার দু চোখ বেয়ে জল গড়াল নিঃশব্দে, সে যে শুধু পুরুষ তাই নয়, কালে-জলে অবিচল পুরুষ।

কাহিনীর নায়ক আমি নিজে। নায়িকা আমারই শ্রীমতী। ঘটনাস্থল শহর কলকাতা। রঙ্গমঞ্চ, অসূর্যম্পশ্যা নীলমণির গলি সংলগ্ন নোনাধরা বাড়ির একতলার একটা ঘর।

আগে নায়িকার কথা বলি। মালবিকা নবনীতাদের কেউ নয়। বাপ-মায়ের আদরের হাসি নামটাই চল্‌তি। প্রগল্‌ভ নিভৃতে হাস্যমুখী বলে ডাকলে রাগ করে। অর্থাৎ খুশী হয়। সম্প্রতি মারমুখী নামটাও ওকে মানায় ভালো। কিন্তু ডাকে কে।

রূপগুণ— ?

নিরাশ হবেন। এমনটি অন্তত আছে আমার চেনাশুনা সকল ঘরে। তেমন হাসি পেলে কুটনো ফেলে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে, আমার ওপরে রাগলে লাগাম ছেড়ে দেয় রসনার, অন্যের বেলায় শাড়ির আঁচল চোখে ওঠে।

তার পর পার্শ্ব-চরিত্র। তাঁরা আমার বাবা-মা-দাদা-বৌদিরা, নীচের দিকের আরো পাঁচটি ভাইবোন, দাদাদের ছেলেমেয়েরা এবং নিজের ছেলে। এই প্রহসনের সবাক অথবা নির্বাক ভূমিকায় সকলেরই অংশ আছে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না। কিন্তু আমাদের ভাগের টাকা ছাড়া সংসার পতিতপাবনীর থৈ পাওয়া ভার। বাবার পেনসান এবং ভাইদের রোজগারের ভগ্নাংশের সমষ্টিতে সংসার-তরণী বহন করছেন মাতৃদেবী। অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাঁকে স্বয়ং অর্থসচিবের প্রতিস্পর্ধিনী বলে মানি।

আমার বরাদ্দ মাসিক পঁচাত্তর টাকা। এবং যত গোলযোগ এইখানেই। মোট কথা, মাসে পঁচাত্তর টাকা আমি প্রায়ই দিয়ে উঠতে পারিনে এবং সে জন্যে অপ্রিয়-ভাষিণী প্রিয়তমার মেঘ-মূর্তিরও পরোয়া করিনে। কারণ, মাতৃদেবী সহৃদয়া। আমাকে এক রকম বাদ দিয়েই তিনি মাসের বাজেট কষে থাকেন।

গোড়াতে নিজেকে চোখ-কান কাটার অপবাদ দিয়ে রেখেছি। বাংলা কাগজে নানা জাতীয় অর্ডারি লেখা সরবরাহ করেও পারিশ্রমিক আদায়ের ছলাকলা যে শেখেনি তাকে ভাগ্যহত বলব। তারপর টোট্‌কা ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেও চোখ-কানের পর্দার আর এক দফা সংস্কার ঘটেছে। ওষুধের ধন্বন্তরিকে প্রতিবারই সবিনয়ে আশ্বাস দিই, বিজ্ঞাপনের দাপটে সমস্ত কলকাতায় তাঁর রোগীর ছড়াছড়ি পড়ে গেল বলে। কিন্তু

মাসের শেষে ওই পঁচাত্তর টাকা আর তুলে উঠতে পারিনে।

প্রকাশকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিনয়নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, হবে?

ঝাঁঝিয়ে ওঠেন কেউ, এত ঘন ঘন তাগিদ দিলে হবে কেন, এই সেদিন না নিয়ে গেলেন কিছু?

সেদিন অর্থাৎ দু মাস আগে।

কেউ বা বলেন, সের দরে আমার লেখা বেচে দিলে একবারে হিসেব দিতে পারেন, যত ঝামেলা, ইত্যাদি—।

আমি নির্বিকার। বিনয়ের হোমিওপ্যাথি সংস্করণ।

তার পর মাসিক এবং সাপ্তাহিকের পরিবেশ। এ পর্যায়ের কুলীন গোষ্ঠীবর্গকে সভয়ে পরিহার করে চলি। শুনতে পাই, সেখানে অপ্রথিতযশার লেখা ছাপতে হলে তেলের কারখানা থাকা দরকার। আমার রাজত্ব পোশাকী-সম্পাদকের ছোট দপ্তরে। সেখানে দুকথা শুনি দুকথা শোনাই এবং ঝগড়া তর্ক করে দু-পাঁচ টাকা আদায়ও করে নিয়ে আসি। টাকা দিয়ে ফেলে সেখানকার সম্পাদকরা রাগের মাথায় শাসিয়ে দেন প্রায়ই, আর আমার লেখা ছাপা হবে না, এই শেষ।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরি। মুখহাতে বেশ করে জল দিয়ে চেষ্টা করি দিনের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে। লেখার কাগজপত্র এবং একমাত্র সঞ্চয় বইগুলির নিবাস ঘরের কোণের ছোট আলমারিটাতে। এ বাড়িতে ওটাও আমারই মত পঙ্‌ক্তি-হারা, ব্রাত্য। বেশী রাগ হলে হাসি ওর গায়ে তালা লাগায়। কিন্তু আমার বোবা ধড়ফড়ানি দেখে নিজেই আবার খুলে দেয় শেষ পর্যন্ত।

তার পর বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক, আমার কানে তুলো, পিঠে কুলো।

গোড়ায় গোড়ায় আমার লেখার প্রতি সকৌতুক আগ্রহ ছিল সকলেরই। হাসির ধৈর্য এবং স্থৈর্য বিড়ম্বিত হয়েছে অনেক পরে। কিছুকাল আগেও ছাপা অক্ষরে লেখা পড়ে ও সগর্বে ভাবত রসসৃষ্টির যত কারিগরি এবং ভাষা-বণিকের যত চাতুরির ফল্গুধারা আমারই কলমের ডগায়।

কিন্তু 'ফুরালো দিন কখন নাহি জানি....।'

নিরুপায় হয়ে এক-এক সময় ঝগড়াও করি।—কি করব বল, চাকরি? কেউ দেবে না।

ব্যবসা—? আমার একমাত্র মূলধন তো তুমি।

তবু মেজাজ ওর ক্রমশই বিগড়চ্ছে। শাড়ি না, গাড়ি না, গয়না না, সিনেমা না, নিয়মিত হাত-খরচাও না। এর পরে একটু বকাবকি করতে না পেলে ওর অসুখ করাও তো বিচিত্র নয়। বিধাতার যোগাযোগ এমনি, এর জন্য সুযোগ খুঁজতে হবে না অতিবড় সুহৃৎ-জনেরও। লেখার ঝোঁকে হয়ত ওরই পরিত্যক্ত শাড়ির আঁচলে কলমের মুখ-উপচানো কালি মুছে রেখেছি, নয়তো ব্লেড-এ ছেলের নখ কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে বসে আছি, অন্যথায় তার সর্দি-জ্বর ভুলে বেশ করে তেল মাখাতে বসেছি, চান করব—। পরের সকরুণ অবস্থাটা পাঠকবর্গের অনুমানের ওপরে ছেড়ে দিলাম।

পূর্ব-ভাষণের এখানেই শেষ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাগ্‌বাদিনীর আরাধনায় প্রস্তুত হয়ে কাঠের আলমারির সামনে এসে দেখি তালা লাগানো। শ্রীমতী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। অনুনয় করে বললাম, কৌতুক রাখো কৌতুকময়ী, আজ আমার তাড়া আছে।

বাতায়নবর্তিনী নির্মম, নিশ্চল।

কি হল— ?

ঘুরে দাঁড়াল, তুমি চাকরির চেষ্টা দেখবে কি না ?

ঘাবড়ে গেলাম।—দাদারা কিছু বলেছে ?

ও ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রায়, কী— ?

তাড়াতাড়ি সামাল দিলাম, তবে কি বৌদিরা ?

এমন দাদা-বৌদি তোমার, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে লজ্জা করে না ?

ভাবনায় পড়া গেল। মা কিছু বলবেন না জানি, দাদা-বৌদিরাও লোক ভাল, আমিও আর যাই হই মানুষ খারাপ নই—তবে আলমারির গায়ে তালা কেন ! কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে আর জিজ্ঞাসাবাদের সাহস হল না।

চৌকিতে অর্ধশয়ান। প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু বিধি নিতান্তই অপ্রসন্ন।

রাতের আহার সম্পন্ন করে আবার শয্যা নিলাম। আলমারির পুঁথিপত্র রোজ এক বার করে নাড়াচাড়া করা ন বছরের অভ্যাস। অস্বস্তি লাগছে কেমন। মনে হচ্ছে কোন্ কাজটা যেন বাকি।

রাত বাড়ছে। মাঝখানে ছেলে ঘুমিয়ে। ওপাশে তার মা-ও আশ্রয় নিয়েছে। থেকে থেকে এক একটা বড় নিঃশ্বাস এবং চুড়ির শব্দ শুনি। অনেকক্ষণ বাদে ছেলের মাথা ডিঙিয়ে একখানা নরম হাত বাহু স্পর্শ করল।

ঘুমুলে ?

বললাম, না—।

রাগ করেছ ?

না।

আচ্ছা, তুমি এমন কেন গো, আধ ঘণ্টায় আসর জমাতে পার, আর একটা চাকরি যোগাড় করতে পার না ?

নিদাঘ-রজনীর নিভৃত প্রহরে এক মুহূর্তে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল কোথা দিয়ে। অটুট সঙ্কল্পে রাত কাটালাম। প্রকাশক না দিক, প্রয়োজন হলে আলমারির পুঁথি-পত্র আমিই বেচে দেব সের দরে।

তৈল-সিঞ্চনে পাথর ভিজানোর ইতিবৃত্ত বাদ দেওয়া যাক। বিলিতি ল্যাম্প-ফ্যাক্টরির ছোট ম্যানেজার মাসতুতো ভাই। চিঠির সুপারিশে তাঁর ওপরওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন সেলস্-লাইনে-এ চাকরির জন্য।

তারপর ধার করতে বেরুলাম। টাকা নয়, পোশাক। পায়ের জুতো থেকে মাথার টুপি পর্যন্ত।

হাসির কথামত আধ ঘণ্টায় আসর জমাতে চেষ্টা করেছি সাহেবের মুখোমুখি বসে। ছোট ম্যানেজারের সুপারিশে হোক অথবা যে কারণেই হোক অতিবড় সংশয়বাদীও ফলাফল সম্বন্ধে আশান্বিত হবেন। বিদায়ের আগে সাহেব জিজ্ঞাসা করে রাখলেন কলকাতার বাইরে যেতে রাজী আছি কি না। অম্লানবদনে জানিয়ে এলাম, ভারতবর্ষের বাইরে যেতেও আপত্তি নেই।

ইতিমধ্যে আর এক কলমও লিখিনি। বইয়ের আলমারিটা অদৃশ্য আকর্ষণে টানে বার বার। কিন্তু না, ও-পর্বের যবনিকা টেনে দেবই। হাসি আর আমি সাহেবের প্রতিটা কথা ওজন করি বার বার, ওতে চাকরি হওয়া সম্ভব কি না। দু টাকা খরচ করে দরজার গায়ে লেটার-বক্স লাগালাম একটা, নিয়োগপত্র না হারায়। মাসতুতো ভাইয়ের কাছে ছুটি তিন বার করে।

অবশেষে, আয় ছুটে আয় চোখের বালি, চিঠি এসেছে—।

মাদ্রাজ প্রভিন্সএর সেলস্ অর্গ্যানাইজার নিযুক্ত হয়েছি। এক মাস কাজ শেখার পরে সেখানে রওনা হতে হবে। বেতন তিন শ'। ভবিষ্যৎও সুবর্ণোজ্জ্বল।

বাবার মুখের দুশ্চিন্তা কাটল। মা প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বৌদিরা উৎফুল্ল মুখে ঘোষণা করলেন তাঁরাও মাঝে মাঝে যাবেন বেড়াতে। মা বাড়িয়ে তুললেন শ্রীমতীকে, ভাগ্যে ওর মত মেয়ে সঙ্গে থাকবে, নইলে কি যে হত বিদেশে বিভুঁইয়ে, ইত্যাদি। রাত্রিতে হাসি একগাল হেসে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল, দাদা বলছিলেন, গায়ের রঙ্ কালো হয় মাদ্রাজে, মাগো—এমনিতেই তো রঙ্ তেমন ফরসা নয় আমার।

আশ্বাস দিলাম, সেখানে যাঁদের মনোহরণ করবে তাঁরাও কালোই হবেন বোধ করি।

শিক্ষানবিসিতে লেগে গেলাম। দাদারা চাঁদা তুলে কোট প্যান্ট নেকটাইয়ের খরচা যোগালেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্যাটালগ ঘেঁটে ল্যাম্পএর নাম মুখস্থ করলাম দিনকতক। কোম্পানির গাড়িতে বাজারে ঘুরে ঘুরে দালালি রপ্ত করলাম সকাল সন্ধ্যা।

রাতে বাড়ি ফিরে প্রথম চোখ পড়ে কোণের আলমারিটার ওপর। এখন একাই পঙ্ক্তিহারা ওটা। আমি জাতে উঠেছি। ক্রূর শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ওটার দিকে। কতক্ষণ ঠিক নেই। হাসির ডাকে চমক ভাঙে, হাত মুখ ধোবে না?

ইলেকট্রিক ল্যাম্পের দালাল আমি এ মন্ত্র অনুক্ষণ জপ করি মনে মনে। কিন্তু কলম হাতে নিলেই হাত নিশপিশ করে কেমন। সেদিন আলমারিটা ঘর থেকে বার করে দিলাম। ন বছরের অভ্যস্ততা জড়ানো ওটার সঙ্গে। হাসি দেখল চেয়ে চেয়ে। রাত্রিতে বলল, সেখানে গিয়ে কিন্তু তোমার লেখা হবে না বলে রাখলাম।

হাসি পেয়ে গেল। ও কি দুর্বল ভাবে আমায়! খবরের কাগজের আপিসে আর ঘণ্টা ধরে বসে থাকতে হবে না, টোট্‌কা ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখে এক জন অর্ধশিক্ষিতের মন যোগাতে হবে না, প্রকাশকের ভ্রূকুটির এখানেই শেষ, মাসিক সাপ্তাহিকের দরজায়ও আর হত্যা দিতে হবে না কোন দিন। অখণ্ড মুক্তি। আবার লিখব!

কিন্তু কয়েক দিন বাদে নিজেই এসে আলমারিটা খুললাম। বইগুলি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করলাম। নিজের লেখাগুলির ওপর নিবিড় স্নেহে হাত বুলিয়ে গেলাম

অনেকক্ষণ ধরে। ব্যথায় বুকের ভিতরটা টন টন করছে। ফিরে দেখি হাসি পিছনে দাঁড়িয়ে।

হেসে বললাম, এগুলো ভাগ্নের ওখানে পাঠিয়ে দিই, তার খুব ঝোঁক এসবে।

হাসি ইতস্তত করে বলল, সঙ্গে নেওয়া চলে না?

পাগল ! বাতির দালালির সঙ্গে এ জিনিস অচল। তাছাড়া লেখা এখানেই খতম, এ শুধু উপোস করাতে বাকি রেখেছে। হাসতে হাসতে আলমারি খোলা ফেলেই পালিয়ে গেলাম।

প্রবাস-যাত্রার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে ভিতরে একটা শুকনো টান ধরে যাচ্ছে কোথায় অনুভব করতে পারি। অন্তস্তলে দিনরাত এক নীরব হাহাকার শুনতে পাই। আলোর দাম মুখস্থ করতে গিয়ে অন্ধকার দেখি চোখে।

কি যে ঘটে গেল কোথা দিয়ে হুঁশ নেই। সংবিৎ ফিরতে দেখলাম কাজে ইস্তফা দিয়ে কোম্পানি থেকে বেরিয়ে আসছি।

আলমারিটার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে আছি স্থাণুর মত। মুখে স্তব্ধতার বর্ম। ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে চোখে না দেখলেও অনুমান করতে পারি। বাবার মুখে খবরের কাগজ নেমে এসেছে আবার। মা পূজার ঘরে ঠাকুরের পায়ে নির্ভর করছেন। দাদারা মাথা নিচু করে বসে।

আর হাসি ...

ভাবতে পারিনে।

রাত বাড়ছে। উঠে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম এক সময়। চূড়ান্ত বোঝাপড়া এখনো বাকি। একদিনে নয়, দুদিনে নয়—দিনে দিনে।

জানলার গরাদ ধরে হাসি দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ফেরাল। আমি কি ভুল দেখছি? কান্নার দাগ মেলায়নি এখনো কিন্তু হাসির আভাসও স্পষ্ট ! একটু অপেক্ষা করে চৌকিতে এসে বসল। আবার একটু চুপচাপ থেকে ঝপ করে বলে উঠল, আমি খুশি হয়েচি, বুঝলে মশাই— !

আমি অবাক। চেয়ে আছি।

ও আড়চোখে দেখল একবার।—লেখাটেখা ছেড়ে এ চাকরি নিয়ে বাইরে যাওয়াটা তোমার কেমন লাগত বলব... ?

চেয়েই আছি।

ঘুমন্ত ছেলের গায়ে একটা হাত রাখল সে। বলল, অভাবের তাড়নায় ওকে ফেলে পালিয়ে যাবার কথা মনে হলে আমার যেমন লাগে।

এবারে আমি দাঁড়িয়ে আছি জানলার গরাদ ধরে। নীলমণির গলির দেয়ালের ওধারে এক ফালি আকাশ দেখা যায়। চেয়ে থাকি। হঠাৎ সচকিত হয়ে অনুভব করি দুগাল বেয়ে ধারা নেমেছে। শশব্যস্তে মুছে ফেলি। ফিরে দেখি হাসি হাসছে মিটি মিটি।

কলঙ্কবতী

আরাবল্লী পাহাড়টা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত রাজস্থানকে যেন মাঝামাঝি চিরে দিয়ে গেছে।

উত্তর-পূর্ব পাহাড়ের গা ঘেঁষে প্রায় টঙের ওপর বসে আছে ভরতপুর। ছোট জায়গা। সকালের ঘুমভাঙা চোখ আকাশের দিকে চাইতে গেলে প্রথমেই পাহাড়ের গায়ে চোখ আটকে যায়।

একে তাকে জিজ্ঞাসা করতে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল। অবশ্য যাকেই জিজ্ঞাসা করেছি সেই নিশানা বলে দিয়েছে। আমার কাছে সবই নতুন বলে হদিশ পেতে সময় লাগছিল। তবু এ জায়গায় ভদ্রলোকটির নাম আছে বোঝা গেল। চার দিকে পরিচ্ছন্ন বাগান। মাঝখানের লাল মাটির রাস্তাটা একেবারে বাড়ির সিঁড়ির গায়ে গিয়ে ঠেকেছে।

গৃহস্বামীর নাম মাধব চতুর্বেদী।

আমার পরিচিত নন, কখনো দেখিওনি তাঁকে। আমার বিশেষ একজন পরিচিত ভদ্রলোক তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভরতপুরে এঁর সঙ্গে শুধু দেখা করার জন্যেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করেননি, সঙ্গে চিঠিও দিয়েছেন। শুনেছি, প্রাক্‌স্বাধীনতায় স্টেটের পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন মাধব চতুর্বেদী। এখন অবসর নিয়েছেন।

এ জায়গায় একদিন থাকব কি সাত দিন, নিজেও জানতাম না। ভালো আস্তানা পেলে আর ভালো লাগলে দিন কতক কাটাতে পারি। নয়তে সেইদিনই তল্পি-তল্পা গোটাতে পারি। মোট কথা, অবসরপ্রাপ্ত কোন ভদ্রলোকের ঘাড়ে চেপে বসার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না। তবু প্রথমেই এঁর কাছে এলাম, কারণ, স্থানীয় অভিজ্ঞ কারো কাছে জায়গাটার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া দরকার।

ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়ে এতবড় বাগানঘেরা এমন ছবির মত বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে অস্বস্তি অনুভব করছি। পরনের খাকী ট্রাউজার, ছিটের বুশ শার্টের মলিনতা যেন বেশি করে চোখে পড়তে লাগল নিজেরই। কাঁধের খাকী ঝোলার মধ্যে যা আছে তাও এমন বাড়িতে খুব চলনসই নয়।

প্যায়ে প্যায়ে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির পরে প্রশস্ত বারান্দায় এক প্রস্থ টেবিল চেয়ার। এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছি, চাকরবাকর যদি কাউকে দেখতে পাই। বারান্দার ওধারে ঘর থেকে একজন মহিলার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় ঘটল। দুই এক মুহূর্ত। মহিলা সরে গেলেন। একটু বাদেই তিনি ঘর থেকে বেরুলেন আবার। এবার শাড়ির ওপর গায়ে মাথায় বুকে একটা ঘন আকাশী রঙের ওড়না আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। শুধু কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত অনাবৃত। ধীর শান্ত পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমন

ঢেকে ঢুকে এলেন, অথচ কোথাও এতটুকু জড়তা আছে বলে মনে হল না। আমার নিজেরই কিছু বলা উচিত। কিন্তু বোকার মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে তিনিই স্পষ্ট হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চাই?

বললাম। তিনি স্বল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। আমার দিক থেকে আর বাক্‌স্ফুরণ হল না দেখে বললেন, বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

তেমনি শান্ত পায়ে প্রস্থান করলেন আবার। অনুমানে মনে হল ইনি গৃহস্বামিনী। শুধু মুখটুকু দেখে সঠিক বোঝা শক্ত। যৌবন যদি গিয়েও থাকে, যৌবনশ্রী প্রায় অটুট আছে। বারান্দার একটা চেয়ারে বসলাম। কেন জানি ভদ্রলোককে ভাগ্যবান বলে মনে হল। মহিলার শান্ত ঋজু ভাবটুকুই বোধ করি মনে ছাপ ফেলে থাকবে। কিন্তু এমন কমনীয়তার ওপর এত বেশি আব্রু চোখে কি রকম ধাক্কা দেয়। কান, মুখের দুপাশ এমন কি গলা পর্যন্ত ঢাকা। আবরণের আড়ালে থাকার প্রয়াসের থেকেও সরল নিষেধের ইঙ্গিতটাই যেন বেশি সুস্পষ্ট ঠেকে। ভাবলাম, হয়ত এটাই আভিজাত্য এখানকার।

মাধব চতুর্বেদী এলেন। নিজের অজ্ঞাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। প্রৌঢ় কিন্তু স্বাস্থ্যদৃপ্ত,সৌম্যদর্শন। পরনে ঢোলা পা'জামা আর পাঞ্জাবি। নমস্কার জানিয়ে পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে তাঁর হাতে দিলাম। আমায় বসতে আপ্যায়ন করে তিনি নিজেও বসলেন। চিঠি পড়ে সকৌতুকে তাকালেন আমার দিকে।

বেড়াতে এসেছেন?

পরিস্কার বাংলা শোনার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। ঘাড় নাড়লাম। পরে বলেই ফেললাম, আপনি তো সুন্দর বাংলা বলেন দেখছি?

হাসলেন একটু।—একটু আধটু শিখেছি। রাজস্থানে জয়পুর উদয়পুর ছেড়ে ভরতপুরে বেড়াতে এলেন?

ওসব জায়গা ঘুরেই আসছি।

ও...এখানে কোথায় উঠলেন?

বললাম, এই তো সবে আসছি, দেখে শুনে উঠব কোথাও, হোটেল আছে তো?

একটু যেন অপ্রস্তুত হলেন তিনি। জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার জিনিসপত্র কোথায় রেখে এলেন?

হেসে ঝোলাটা দেখিয়ে দিলাম, সব এতেই আছে, সাজ থেকে শয্যা।

ঈষৎ বিস্ময়ে তিনি একবার ঝোলাটা এবং একবার আমাকে নিরীক্ষণ করলেন। পরে বললেন, বাঙালিরা একটু বাবু-মানুষ শুনেছিলাম, ভারি অন্যায় কথা। আপনি অনুগ্রহ করে এই বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে সম্মানিত হব।

এ ধরনের সৌজন্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত। তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম, সে কি কথা, আপনার নিশ্চয় অসুবিধে হবে। আমি বরং ..

তিনি একখানা হাত তুলে নিরস্ত করলেন। বললেন, আমার নিশ্চয় কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। এত বড় বাড়িটিতে আমরা দুটিমাত্র প্রাণী থাকি। আপনি যে ক'দিন

খুশি এখানে থাকবেন। আপনার নিজের বাড়ি বলে মনে করবেন।

কি বলি ভেবে পচ্ছিলাম না। তিনি একজন ভৃত্যকে আদেশ দিলেন মাইজিকে ডেকে দিতে। ক্ষণকাল পরে সেই মহিলাটিই এলেন আবার। শাড়ির ওপর তেমনি ওড়না আঁটা। আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। তিনিও সবিনয়ে প্রত্যভিবাদন জানালেন। আমি ফিরে বসতে উনিও আসন নিলেন। মাধব চতুর্বেদী আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন। এবারে অবশ্য হিন্দিতে।... বাঙালি লেখক,আমাদের হেমরাজের বন্ধু—এই হেমরাজের চিঠি—কলকাতা থেকে রাজস্থান বেড়াতে এসেছেন। এখানে হোটেলের খোঁজ করছিলেন, আমি ওঁকে এখানেই থাকতে অনুরোধ করেছি।

মহিলা জবাব দিলেন, আমরা চেষ্টা করব ওঁর কোন অসুবিধে যাতে না হয়, বা আতিথ্য ত্রুটি না ঘটে।

চতুর্বেদী বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়।

মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, আমি এক্ষুনি ওঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, আর প্রাতরাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চলে গেলেন। ভারি বিব্রত বোধ করছিলাম। মহিলাটির মধ্যে একটা বিচিত্র রকম অভিব্যক্তি—যাকে বলে পারসনালিটি আছে। কিন্তু ওঁর ও-রকম ঠাণ্ডা ভাবটাও প্রায় অস্বস্তিকর। তাছাড়া, যাঁকে রীতিমত সুন্দরী বলে মনে হয় এবং ভালো করে দেখতে ইচ্ছে করে সেই রকম একজন মহিলা আপনার সামনে বসে, অথচ তাঁর দুটি চোখ, নাক, ঠোঁট একং চিবুকের একটুখানি অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, সেটাই বা কেমন লাগে? তার পরেও চেষ্টা করলে তাঁর ঐ আপাদমস্তকে জড়ানো বসনই যেন আপনাকে চোখ রাঙাবে।

কিন্তু ঠিক কি না জানিনে, আমার এও মনে হল, মহিলাটিকে তাঁর স্বামীও রীতিমত সমীহ করেন। আমার পরিচয় দেওয়া, অথবা আতিথ্য গ্রহণের খবরটা দেবার সময়েও তাঁর মুখে একটু যেন বিনয় ভাব লক্ষ্য করেছি। মিসেস চতুর্বেদী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে তিনি দরাজ গলায় বললেন, বি অ্যাট হোম, স্যার। চান করবেন? না, এই ঠান্ডায় আগে চান করে কাজ নেই, সহ্য হবে না। আমি রিটায়ার্ড ম্যান, এমনিতেই সময় কাটে না। তার ওপর আপনি লেখক শুনেছি, আর সহজে ছাড়ি? আপনাদের রবি ঠাকুরের কবিতা বোঝাবার জন্যে আমি বাংলা শিখেছিলাম, জানেন?

জোরেই হেসে উঠলেন তিনি। এ রকম শুনলে কার না ভালো লাগে! বললাম, রবি ঠাকুরের কবিতা সব বুঝতে পারেন?

কই আর পারি! বাংলা শেখার জন্যে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি কিন্তু অনুভূতিটা তো আর পয়সা দিয়ে কেনা যায় না! আপনাকে ধরেবেঁধে এবারে গোটা কতক লেখা বুঝে নেব।

খুব বিশ্বাস হল না। এ রকম বাংলা যিনি বলেন, তিনি বাংলা লেখা ভালো বোঝেন বলেই আমার ধারণা।

প্রাতরাশ এলো। তার পর থাকবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হল আমাকে। সাজানো-

গোছানো সুবিন্যস্ত ঘর। কোনো কিছুরই অভাব নেই। দু'খানি কল্যাণী হাতের স্পর্শ সর্বত্র পরিস্ফুট। সেদিন কাটল। তার পরদিনও। অসম-বয়স্ক হলেও ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মে গেল। চতুর্বেদী সেই ধরনের মানুষ, যিনি সহজে সকল বয়সের সমবয়স্ক হতে পারেন।

মস্ত সুবিধে তাঁর গাড়ি আছে। সকালে-বিকালে সাগ্রহে নিজেই তিনি আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুতে লাগলেন। এখানে পাহাড়ে বেড়াবার আকর্ষণটাই সব থেকে বড়। পাহাড়ের গা ধরে সরু এক-একটা রাস্তার মত উঠে গেছে। ধারে ধারে বিশাল পাথর। সেখানে বসে গল্প-গুজব করা চলে, পিকনিক করা চলে, কিন্তু সেগুলির ধারে এসে নিচের দিকে তাকালে মাথাও ঘোরে।

গৃহস্বামী দেখলাম শুধু অতিথিপরায়ণ এবং সদাশয়ই নন্, বেশ গুণীও। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় কাব্য আলোচনায় বসে আলোচনায় এবং প্রশ্নে আমাকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেললেন। বললাম, আপনাকে কবিতা বোঝাবো কি, আপনার কাছে অনেক বাঙালী অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে।

তিনি সহাস্যে জবাব দিলেন, তোমার অস্ত্রটি দেখছি ভালো, এবারে আমার মুখ বন্ধ করলে। গত কাল থেকে উনি আমাকে তুমি বলছেন, আর সেটা আমার বেশ ভালোই লাগছে। তার পর দিন বিকেলে নির্জনে ওরকম একটা পাথরের ওপর দুজনে বসে আছি। বললাম, মাধবজি, এবারে তো আমাকে যেতে হবে। কাল যাবো ভাবছি।

কেন, আর ভালো লাগছে না ?

এর পরেও যার ভালো লাগবে না, সে নিতান্তই অমানুষ। যেতে মন সরে না।

তা হলে আর ক'টা দিন থেকে যাও না। বেড়াতে এসেছ যখন, একদিন যাবেই তো। আর হয়ত দেখাই হবে না।

কেন, আপনি কি ভরতপুর ছেড়ে নড়েন না ?

তিনি ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, কই আর !

এই ক'টা দিনে আমার আর একটা অনুভূতি মনে জাগছে। এত হাসিখুশির মধ্যেও মানুষটি এক এক সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন যেন। মেঘের ওপর যেমন রৌদ্র ওঠে, অনেকটা সেই রকম মনে হয় তখন তাঁকে। আজকের অন্যমনস্কতায় খানিকটা গাম্ভীর্যও আছে।

এ ক'দিনের মধ্যে মিসেস চতুর্বেদীর সঙ্গে আর চাক্ষুষ সাক্ষাৎও হয়নি। আড়াল থেকে তাঁর যত্নের আভাস পাই মাত্র। আর, সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে এক ঘুমোবার সময় ছাড়া ভদ্রলোকটিও প্রায় সারাক্ষণই আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। সে জন্যে নিজেই বেশি বিব্রত বোধ করতাম। ভদ্রমহিলা হয়ত বা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন আমার ওপর। কিন্তু সব মিলিয়ে যে অনুভূতির কথা বলছি নিজের কাছেই সেটা সুস্পষ্ট নয় খুব।

চতুর্বেদী বললেন, এ দিকটায় একটু আধটু ডাকাতের উপদ্রব আছে বলে লোকচলাচল কম।

এমন শান্ত স্তব্ধ জায়গায় এ রকম সংবাদ কার ভালো লাগে ! বললাম, তা হলে

তো এ দিকটায় না এলেই হত?

চতুর্বেদী হাসলেন।—ডাকাতরা জানে, আমিও খুব কম ডাকাত নই। আজ তবু দু'জন আছি, প্রায়ই তো একাই এসে বসি এখানে—অত ধারে যেও না, এ দিকটায় সরে এসো।

কেন,পড়ে যেতে পারি?

পড়ে যেতে পারো, ঠেলে ফেলেও দিতে পারি। হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসলাম আমিও।—শরীরখানা এ বয়সেও যা রেখেছেন, ঠেলে ফেলার কাজটুকু ধারে না বসলেও স্বচ্ছন্দে পারেন বোধ হয়।

তিনি জবাব দিলেন, এ বয়সের এ শরীরটা মিসেস চতুর্বেদীর হাত-যশ, এর পিছনে আমার চেষ্টা নেই কিছু।

সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে নিচের দিকটা দেখলাম একবার। বললাম, একটা সুবিধে আছে, নিচে ওই পাথরের ওপর গিয়ে পড়লে প্রাণ বেরুতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না, সঙ্গে সঙ্গেই হাড় গুঁড়িয়ে আর মাথার খুলি চৌচির হয়ে সব শেষ।

চতুর্বেদী আস্তে আস্তে বললেন, সে রকম দৃশ্য এখানকার লোকে একবার দেখেছে—।

অবাক বিস্ময়ে তাকালাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা, ঠিক ওই জায়গায় এখানকার একজন মস্ত আর্টিস্টকে ও রকম তালগোল পাকানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

মনে মনে শিউরে উঠলাম। আমার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে কি ভাবলেন তিনিই জানেন।—আচ্ছা, পরে এক সময় বলব'খন গল্পটা।

এখনই বলুন না।

না, এখন ভালো লাগছে না।

তারপর দু'দিন কেটে গেল। আর্টিস্টের প্রসঙ্গটা তিনিও আর উত্থাপন করলেন না, আমিও ভুলে গেলাম। যাবার আগের দিন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে এঁদের কথাই ভাবছিলাম। বিশেষ করে অদৃশ্যবর্তিনীর কথা।

পরদিন সন্ধ্যায় গাড়ি। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে প্রতিদিনের মত সেদিনও মাধবজি আমার কাছে বসে পাইপ ধরালেন। হঠাৎ আর্টিস্টের কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, সেই গল্পটা তো শোনা হল না মাধবজি?

পাইপ টানতে টানতে তিনি বার কতক আড় চোখে নিরীক্ষণ করলেন আমাকে। পরে আমার দিকে ফিরে হাসি মুখে বললেন, গল্প পরে হবে, বিয়ে তো করোনি শুনেছি, কিন্তু কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছ কখনো?

এ রকম একটা বেখাপ্পা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু অম্লান বদনে বললাম,এন্তার —।

সে কি হে!

দেখতে ভালো হলেই ভালোবেসে ফেলি।

দরাজ গলায় হাসলেন তিনি। তারপর সহসা হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন,

আমার স্ত্রীটিকে কেমন দেখলে?

আচ্ছা বিপদ! ভালো বললে নিজের কলে নিজে আটকাবো। হেসেই জবাব দিলাম, তাঁকে আর দেখলাম কোথায়? আপাদমস্তক তো ঢাকা।

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন মাধবজি। বললেন, ইউ আর এ ক্লেভার বয়। একটু থেমে, অনেকটা যেন আপন মনেই বললেন, একদিন ছিল জানো, যখন আমাদের মেয়েরা ইচ্ছে করে পরপুরুষের মুখ দেখলেও কলঙ্ক লাগত।

সে কী! আপনাদের মেয়েরা তো ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধে যেতেন।

দরকার হলে যেত। অন্য সময়ে দেহে অন্য কারো কামনার আঁচ লাগতেও দিত না। আজকের দিনে অবশ্য এ নিয়ম আর নেই, থাকা উচিতও নয়।

কিন্তু আপনার ঘরেই তো এ নিয়ম মানছেন একজন।

তিনি অন্যমনস্কের মত চেয়ে রইলেন আমার দিকে। হঠাৎ মনে হল ওই বিস্মৃতিবিলগ্ন ঘনায়ত চোখ দুটিতে যেন একটা ব্যথাতুর ভাব রয়েছে।

একটু বাদে বললেন, আর্টিস্টের গল্প শুনবে না? এসো।

গল্প শুনতে হলে আবার যেতে হবে কোথায় বুঝলাম না। তিনি আবার আহ্বান করলেন, এসোই না।

অনুসরণ করলাম। ভিতরে আর কোনো দিন যাইনি। এদিকটা দেখলাম একটা আলাদা মহলের মত। একটা দরজা খুলে দিতে প্রকাণ্ড এক হলের মধ্যে এসে পড়লাম। দেয়ালের গায়ে গায়ে প্রমাণ আয়তনের তৈলচিত্র-সম্ভার। নারী-মূর্তি সব। হাস্যে লাস্যে যৌবন-স্বরূপিণী নগ্ন নারী-মূর্তি। কারো দেহে এতটুকু আবরণ নেই।

মাধবজি বললেন, ভালো করে দেখো, লজ্জা কি...।

কিন্তু তবু লজ্জা পাচ্ছি। ইচ্ছে থাকলেও লজ্জা পাচ্ছি। এরই মধ্যে একটি নারী বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তাঁর তিন চারখানি বিভিন্ন আলেখ্য টাঙানো। কানের কাছটা গরম ঠেকছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এঁরা সবাই কি এদেশেরই মেয়ে?

সবাই।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়ালাম। মাধবজি সামনের দেয়ালজোড়া তৈলচিত্রটি ইঙ্গিত করে বললেন, দেখো।

এবার নিস্পলক চোখে স্তব্ধ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। সম্পূর্ণ নগ্ন দুটি নারী-পুরুষ, কিন্তু বহুক্ষণ চেয়ে থাকলেও এতটুকু গ্লানি স্পর্শ করবে না। সহজ সরল শুচিতার প্রতিমূর্তি। লজ্জা ভয় গ্লানি বিরহিত প্রথম নারী আর প্রথম পুরুষ। পুরুষটির হাতে জ্ঞানবৃক্ষের ফল। চোখেমুখে বিবেক এবং সংশয়ের অবিমিশ্র দ্বন্দ্ব। তার নগ্ন জানুতে দু'হাতে ভর করে মাটির ওপর বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে প্রথম নারী। মুখে আশা আকাঙ্ক্ষার অনাবিল প্রতীক্ষা।

আশ মিটিয়ে দেখতে লাগলাম। তবু দেখে আশ মেটে না। ওই নারী মূর্তিটি কি আমি কোথাও দেখেছি? না কি সকল পুরুষেরই মনের তলায় ওরকম একটি মূর্তি বিরাজ করছে, যাকে দেখলে মনে হয় বুঝি চিনি?

মাধবজি বললেন, এই ছবিখানা দেখাবার জন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি। আচ্ছা, এবার এসো।

তাঁকে অনুসরণ করে ঘরে ফিরে এলাম। ফেরবার সময় আর অন্য ছবিগুলোর দিকে তাকাতেও মন সরলো না। মাধবজি আবার আরাম-কেদারায় শরীর ছেড়ে দিয়ে পাইপ ধরালেন। তারপর ধীরে ধীরে যে কাহিনীটি ব্যক্ত করলেন তিনি, শুনতে শুনতে আমার স্থানকাল ভুল হয়ে গেল।

প্রায় পঁচিশ বছর আগে ভরতপুরের হাওয়ায় নারীপ্রগতি দানা বেঁধে উঠছিল যাঁর জন্যে, তিনি এখানকার ডেপুটি পুলিসসুপারের স্ত্রী কমলাদেবী। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটাও যখন এদেশে ভালো করে চালু হয়নি, তখন স্বামীর সঙ্গে তিনি বিলেত ঘুরে এসেছেন। অনেক আব্রু, অনেক সংস্কার, অনেক ভ্রূকুটি সহজ অবহেলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বনেদি ঘরের মেয়ে, বনেদি ঘরের বউ। মনের জোর আছে, তার চেয়েও বেশি রূপের। অনেক কিছুই সহজ ছিল তাঁর পক্ষে। মেয়েদের নিয়েই একটা ক্লাব করেছিলেন প্রথম। কিন্তু তার আনাচেকানাচে ছেলেদের আনাগোনা উঁকি-ঝুঁকি দেখে সকলকে অবাক করে দিয়ে একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, ছেলেরাও ইচ্ছে করলে ক্লাবে এসে যোগ দিতে পারেন। তাঁর অনুগত স্বামী পর্যন্ত প্রথম প্রথম এটা খুব সহজভাবে নিতে পারেননি। কমলাদেবী তর্ক করেননি, হেসে বলেছেন, দেখই না সব রসাতলে যায় কি না। মোটা কথা, অভিজাত মহলে ছেলেমেয়েদের সহজ মেলামেশায় তখন বেশ একটা রোমান্টিক হাওয়া বইছে।

সেই সময়ে এই শিল্পীটিকে আবিষ্কার করলেন তাঁরা, অবশ্য শিল্পী বলে জানতেন না। নির্জন পাহাড়ে বেড়ানোটা তখন খুব বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু ডেপুটি পুলিসসুপার যাঁদের সাথী, স্বয়ং পুলিসসুপারও যাঁদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তাঁদের আর ভয়টা কিসের? একদিন যে পাহাড়টিতে মাধবজি এবং আমি গিয়ে বসেছলাম, পঁচিশ বছর আগে সদলবলে সেখানে অভিযানে এসে তাঁরা দেখেন, লোকটি সেই নির্জন পাথরটিতে আকাশের দিকে চেয়ে একা শুয়ে আছেন। পাশে তাঁর ক্যামেরা।

এঁরা যেমন অবাক, লোকটিও তেমনি নারীপুরুষের বাহিনীটি দেখে হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি একাই জয় করলেন এঁদের সকলকে। অমন সরল শিশুসুলভ মূর্তি বড় একটা দেখা যায় না। জলে-ভেজা দু'টি ডাগর চোখ, শিশিরস্নাত মুখ, ঝাঁকড়া চুলে প্রায় বন্য সরলতা, সমগ্র কমনীয়তায় ভোরবেলাকার রূপের সঙ্গে কোথায় যেন মিল।

পুলিসসুপারই প্রথম জেরা শুরু করলেন, তুমি কে?

আমি? আমি ডুগার—শোভন ডুগার।

এখানে কি করছ?

আকাশ দেখছি।

মেয়েরা কলস্বরে হেসে উঠলেন। কোথায় থাকেন, কি করেন ইত্যাদি জেনে নেবার পর তাঁকে বলা হল, এ ভাবে একা এখানে এসে যে আকাশ দেখা হচ্ছে,ডাকাতের

খপ্পরে পড়লে?

তিনি চিন্তিত মুখে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, ক্যামেরাটা তাহলে যেত বোধ হয়...।

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষরাও হেসে ফেললেন এবার। ফিরতি পথে সঙ্গী একজন বাড়ল। তার আগে শোভন ডুগার অনেকগুলো ছবি তুললেন সকলের।

এই ছবি তোলার ঝোঁক কত সেটা পরে ক্রমশ বোঝা গেল। কিন্তু ঝোঁকটা শুধু মেয়েদের ছবি তোলার প্রতিই। ছ'মাস না যেতে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছেন সকলেরই। মেয়েরা প্রথম প্রথম ছবি তুলতে দিতে হয়তো বা একটু আধটু আপত্তি করতেন। কিন্তু তাঁদের নেত্রীই হাল ছেড়ে দিলেন একদিন।—নাও বাপু, এই বসলাম, যেমন করে খুশি যতক্ষণ খুশি ছবি তোলো। এরপর সঙ্গিনীদেরও আর বাধা থাকল না। যেমন করে খুশি এবং যতক্ষণ খুশি ছবি তুলেও কিন্তু খুশি হতেন না ডুগার। বলতেন, তোমরা মেয়েরা কেউ সহজ 'পোজ' দিতে জানো না, সকলেরই চোখে মুখে কৃত্রিমতা। মেয়েরা চটতেন, কিন্তু ভালোওবাসতেন ওঁকে।

তারপর একদিন দেখা গেল শোভন ডুগার ডুব মেরেছেন। মেয়েরা চিন্তিত হলেন। এবার সত্যই কোনো ডাকাতে তাঁকে খতম করে দিল কি না কে জানে? কমলাদেবী উদ্বিগ্ন চিত্তে স্বামীকে তাগিদ দিতে লাগলেন, কোনো বিপদ ঘটল কি না অনুসন্ধান করতে।

শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। তখনই শুধু জানা গেল আসলে উনি চিত্রশিল্পী। কিন্তু তাঁর শিল্পচর্চার বিষয়বস্তু শুনে ঝড়ের আগের স্তব্ধতার মত সবাই স্তব্ধ। শিল্পীর চতুর্দিকে মেয়েদের ফোটোগুলোছড়ানো, তারই থেকে তুলি আর রঙে এক একটা নগ্নমূর্তির আবির্ভাব ঘটছে। ফোটোর থেকে শুধু মুখ এবং অভিব্যক্তিটুকু তুলে নিচ্ছেন, বাকিটা কল্পনা। পুরুষদের অনেকেই এসে জোর করে স্টুডিওতে এসে ঢুকলেন, নিজের চোখে সত্যমিথ্যা যাচাই করে গেলেন।

মেয়েরা একেবারে বোবা। এমন দেখতে অথচ এত শয়তানি! পুরুষদের বুকে আগুন জ্বলল। বড় বড় অভিজাত ঘরের মেয়েরা সংশ্লিষ্ট, কাজেই আইন আদালত না করে নিজেরাই তাঁর বিচারের পরামর্শ করলেন। সাদাসিধে বিচার। মর্যাদা বা আত্মসম্মানের হানি ঘটলে এদেশের লোক তখনো অম্লান বদনে বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে। নিঃশব্দে তাকে নির্মম বিদায় দেওয়াটাই সাব্যস্ত হল।

স্বামীর মুখ থেকে কমলাদেবী শুনলেন সব। সকলের অজ্ঞাতে তিনি স্টুডিওতে এলেন। সাক্ষাৎ হল শোভন ডুগারের সঙ্গে। দেখলেন তাঁর শিল্পচর্চা। ডুগার চুপচাপ বসে আছেন। তিনি কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন নিরীক্ষণ করে।

এভাবে জীবনটা হারাতে বসলে?

ডুগার বললেন, জীবন যেতে পারে জানতাম, কিন্তু কাজটা হল না, এই দুঃখ।

কি কাজ?

যে কাজের মধ্যে বরাবর বেঁচে থাকতে পারতাম, সে রকম একখানা ছবি।

কমলাদেবী জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ডুগার বললেন, দুটি নারী-পুরুষের মূর্তি আঁকব ভেবেছিলাম, যাদের মধ্যে পাপ ঢোকেনি। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক দুটি নারী-পুরুষ। কিন্তু চেয়ে দেখ, তোমাদের মুখ আমি অবিকৃত রেখেছি। অথচ নগ্ন প্রতিকৃতি কি বিষম নগ্ন।

কমলাদেবী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, নারীমূর্তি পেলে না, কিন্তু তেমন পুরুষমূর্তি পেয়েছ?

তোমাদের চোখ থাকলে সে মূর্তি দেখতে পেতে।

কিন্তু সত্যিই চোখ আছে কমলাদেবীর। দেখেছেনও। শুধু খেয়াল করেননি। আজ খেয়াল করলেন, আর দেখলেন। ধীর শান্ত দুই চোখ মেলে শুধু দেখলেনই।

এর পরে কোথা দিয়ে কি হল কেউ হদিশ পেল না। এমন কি কমলাদেবীর স্বামীও না। দেখা গেল, সশস্ত্র দুটি সৈনিক পুরুষ অষ্টপ্রহর ডুগারের স্টুডিও পাহারা দিচ্ছে। পুলিসসুপার ছিলেন কমলাদেবীর একান্ত গুণমুগ্ধ—ব্যবস্থাটা তাঁরই। কিন্তু, ডেপুটি পুলিসসুপার অর্থাৎ কমলাদেবীর স্বামীর কাছেও তিনি কারণ প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন, লোকটা এক ধরনের রোগগ্রস্ত, কি হবে তাকে হত্যা করে?

ক্রমশ অন্য সকলেরও উত্তাপ কমে এলো। শেষ পর্যন্ত বিকারগ্রস্ত বলেই ধরে নিলেন তাঁকে। শুধু ভদ্রসমাজে আর মিশতে না এলেই হল। সমাজে আর মিশতে এলেনও না শোভন ডুগার। পুলিশসুপার পাহারা তুলে নিলেন।

কিন্তু কমলাদেবীর মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন এলো। তাঁর স্বামী এবং সঙ্গী-সঙ্গিনীরাও অনুভব করলেন সেটা। অনেকটা যেন স্থির হয়ে আসছেন। নিয়মিত ক্লাবে আসেন না, নিয়মিত বাড়িতেও থাকেন না।

ছ'মাস পরের কথা। শোভন ডুগারকে সবাই ভুলেছে। হঠাৎ একদিন রাষ্ট্র হল, জয়পুরে অত বড় ছবির এগজিবিশানে প্রথম হয়েছে শোভন ডুগারের একখানা ছবি, সে ছবির নাকি তুলনা নেই। দেশি-বিদেশি শিল্প-গুণভাজনরা বহু হাজার টাকা দাম দিতে চাইলেন ছবিখানার, কিন্তু শিল্পী সেটা বিক্রি করতে অসম্মত।

এখানে আবার একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। সেটা আরো বাড়ল ছবিখানা এখানে ফিরে আসার পর। দলে দলে লোক আসতে লাগলো দেখতে। প্রথম মানব এবং প্রথম মানবী-মূর্তি! নগ্ন, কিন্তু অপরূপ! এই মানব-মানবীকে এখানকার লোক চেনে। তবু অভিভূত হল, মুগ্ধ হল। রাগতে পারল না। সেদিন যেন সবাই নতুন করে উপলব্ধি করল, কেন মানুষটা মেয়েদের ফোটো তোলার জন্য এতখানি ব্যগ্রতা প্রকাশ করত। মনে মনে ভাবল, পাগল শিল্পীর কল্পনাসম্ভারের তুলনা নেই।

মুগ্ধ হলেন না, অভিভূত হলেন না শুধু একজন। তিনি কমলাদেবীর স্বামী। ডেপুটি পুলিসসুপার। শুধু তিনি দেখলেন, শুধু তিনি জানলেন, কোনো ফোটোগ্রাফ থেকে রূপায়িত হয়নি ওই নারীমূর্তি।

এই পর্যন্ত বলে মাধব চতুর্বেদী থামলেন। আমি নিস্পন্দের মত বসে আছি। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি করলেন ডেপুটি পুলিসসুপার?

—ডেপুটি পুলিসসুপার শিল্পীকে একদিন কাঁচপোকার মত টেনে নিয়ে এলেন সেই

পাহাড়ের ওপর, যেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেখানে তুমি-আমি গিয়ে বসেছিলাম সেদিন। শিল্পী সত্য গোপন করলেন না।

তারপর ? রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রশ্ন করি।

তারপর নির্মম পশুর মত তিনি দু'হাতে তাঁকে শূন্যে তুলে নিঃসীম অতল কঠিনের বুকে নিক্ষেপ করলেন।

বসে আছি।... বসেই আছি।

মাধবজি এক সময় উঠে গেলেন। বাইরের আলো এক সময় আবছা হয়ে আসতে লাগল। একটা বড় নিশ্বসাস ফেলে আমিও উঠলাম। জিনিসপত্রগুলো সব ঝোলার মধ্যে গুছিয়ে প্রস্তুত হলাম।

মাধবজি এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, রেডি ?

হ্যাঁ।

চলো, স্টেশনে তুলে দিয়ে আসি।

তাঁর সঙ্গে বাইরে এসে থামলাম। দ্বিধান্বিত ভাবে বললাম, মিসেস্ চতুর্বেদীর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব না ?

এক মুহূর্ত থেকে তিনি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই ও ঘরে আছেন, দেখা করে এসো, আমি গাড়িটা বার করি।

তিনি চলে গেলেন। আমি বিপদগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইলাম অল্পক্ষণ। পরে পায়ে পায়ে ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। চুপচাপ বসেছিলেন মিসেস্ চতুর্বেদী। আমায় দেখে সচকিতে আলনা থেকে ওড়নাটা টেনে নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর আবৃত করলেন না। ওটা হাতেই রইল। আমি কিছু একটা আভাস পাচ্ছি কি না সঠিক বুঝছি না। পঁচিশটা বছর বাদ দিয়ে দেখা এক মুহূর্তে সহজ নয়। তা ছাড়া বাইরের আলোটা আরও কমেছে। নিঃশব্দে তাঁকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে ফিরে এলাম।

মাধবজি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর কাছে এসে বলেই ফেললাম, একটা অনুরোধ মাধবজি, ওই ছবিখানা যাবার আগে আর একবার দেখাবেন ?

মাধবজি গাড়ির দরজা খুলে দিলেন। বললেন, না, তোমার সময় হয়ে গেছে, ওঠো—।

কালোদা

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

তুবড়ির খোলে বারুদ ঠাসার মত অতিকায় পাইপের গহ্বরে তামাকের মশলা ঠাসতে লাগলেন কালোদা। মুখে কাঁচা বয়সের লজ্জা-লজ্জা ভাব। রাশভারী কালোদার কালো বদনে এ ধরনের শ্যামশ্রী আর কখনো দেখিনি। মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন তিনি। তামাকগাদানো পাইপে দেশলাইয়ের কাঠি খুঁচিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, দেখলি ?

সন্ধানী চোখ দু'টো তাঁর মুখের ওপর ফেলে রেখে মাথা নাড়লাম শুধু।

নতুন বয়সের কালে কেমন ছিল মনে হয়?...তোদের তো আবার অন্য রকম চোখ।

অন্য রকম কি না জনিনে, কিন্তু আপাতত অন্য রকম যে হয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই। ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন মহিলাটির কোন্ বয়েস কাল চলছে?

প্রশ্ন শুনে খুশি হলেন বোধ হয়। পাইপ দাঁতে চেপে বললেন, তুই-ই বল না।

আটাশ উনত্রিশ? একটু বাড়িয়েই বললাম।

দশ বছর আগে তাই ছিল। মনোনিবেশ সহকারে পাইপে আগুন ধরাতে লাগলেন তিনি। মনোবিজ্ঞানী কালোদা আমার বিস্ময়টুকু আঁচ করেই বোধ হয় আর মুখের দিকে তাকালেন না। শুনেছি মেয়েদের বয়েস নাকি যেমন দেখায় তেমন। সত্যি হলে কালোদা সত্যি কথা বলেন নি। কিন্তু কালোদা সত্যি কথাই বলেছেন। পাইপ-ধরানো দেশলাইয়ের আলোয় সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। যৌবনের বন্দি-দশা চিরদিনই নয়নাভিরাম। রমণী-যৌবনের আরো বেশি। কিন্তু এ গবেষণায় কালক্ষেপ করলে আজকের এই অপ্রত্যাশিত সুবর্ণ মুহূর্ত হারাতে হবে।

মহিলাটি কে কালোদা?

পরিচয় করিয়ে দিলাম তো, মেয়ে কলেজের প্রফেসার।

সে তো শুনেছি। তারপর?

তারপর তোমার মনে ধরেছে দেখতেই পাচ্ছি। ভারী গলায় হেসে উঠলেন কালোদা। তোকেও বোধ হয় মনে ধরেছে তার, যে রকম ঘন ঘন শুভদৃষ্টি হচ্ছিল তোদের—

মানুষটি হাসিখুশি হলেও সাধারণত স্বল্পভাষী। কিন্তু আজ বোধ হয় অদৃষ্ট প্রসন্ন আমার। জবাব দিলাম, তা তো হচ্ছিল দাদা, কিন্তু বড় নিরাসক্ত শুভদৃষ্টি। ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। তৃতীয় কারো উপস্থিতি আশা করে আসেন নি, ওই শুভদৃষ্টি দেখে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছিলাম।

হৃষ্টচিত্তে কালোদা মোটা পাইপে মোটা রকমের গোটা দুই টান দিয়ে কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, তা নয়, রোগী ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার তেমন আলাপ পরিচয় আছে, সেটা কোনো দিন দেখেনি বলেই তোকে ভালো করে দেখছিল।

বুঝলাম। তা কাল রোববার, তুমি ওঁর ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন রাখতে যাচ্ছ?

যাব বলেছি যখন যেতে হবে, তোকেও তো বলল, তুই তো রাজি হলিনে। গৌরবে বহুবচন হয়ে আর কি দাদা! সে কথা যাক্, গত রোববারেও গেছলে?

একটু বিব্রত মুখেই কালোদা ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোকে কে বললে?

কেউ না। আর, এর পরের রোববারেও যাচ্ছ, কেমন না?

কালোদা হেসে ফেললেন, খুব ফাজিল হয়েছিস, পাজা এখন।

সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। এর পরেও উঠে যাব সে মানুষ নই, সেটা কালোদাও ভালোই জানেন। একটু থেমে বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, রবিবারের আড্ডাটা আজকাল এই জন্যেই বন্ধ হয়েছে তাহলে! আমি ভেবেছিলাম কেস্-এর

চাপে... যে রকম মানসিক বিভ্রাট শুরু হয়েছে আজকাল, সাইকো-অ্যানালিস্টদেরই পোয়াবারো। কিন্তু এখন দেখছি তোমারটা অন্য কেস্।

জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানতে লাগলেন উনি। দুই চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। ঘুরেফিরে আর যথাসম্ভব মোলায়েম করে সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম আবার। সত্যিই মহিলাটি কে কালোদা?

রোগিণী।

নড়েচড়ে উঠে বসলাম।

এবারে ইতি গজ করে গলা নামিয়ে বললেন, ছিলেন।

নিজের অজ্ঞাতে পাশের চেম্বারের দিকে চোখ গেল। মাঝের দরজাটা এখন খোলা। ওটি বন্ধ হলেই ঘরটা যেন গোটা বাড়ি থেকেই বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয়, পরিবেশ সৃজনের ব্যবস্থা এমন যে, মনে হয় দুনিয়া থেকেই বিচ্ছিন্ন, কিন্তু প্রশান্ত অনাবিলতায় পরম আকর্ষণীয়। ওরকম পরিবেশেই বোধ করি শয্যায় বা ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে আত্মবিস্মৃত শৈথিল্যে বিভ্রান্ত চিত্তের দুর্জ্ঞেয় কথা আর দুর্বোধ্য ব্যথা উজাড় করে দেওয়া সম্ভব। প্রশমনের যাদু আছে যেন ওখানে। ওই ঘরের প্রতি আমার অপরিসীম কৌতূহল। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি কৌতূহল ওই ছোট টেবিলের পাশে বুক-শেল্ফ ঠাসা মোটা মোটা বাঁধানো খাতাগুলোর প্রতি।

ওর প্রত্যেকটি বিস্মৃতি-বিলগ্ন রোগী বা রোগিণীর আত্মকথায় ভরা। মনোবিজ্ঞানীয় নিজের হাতের নোট। রোগী কথা বলে, যেমন খুশি। নিজেকে প্রকাশ করে, যেমন ভাবে খুশি। মনোবিজ্ঞানীর হাত চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে, পাতার পার পাতা। অনেকটা যন্ত্রের মত। মাথা নিচু করে স্টেনোগ্রাফারের নোট নেওয়ার মত নয়। কারণ, রোগী সেদিকে সচেতন হলে তার কথা বলার তন্ময়তায় ছেদ পড়ে যাবে। কিন্তু তবু ওই এক একটি খাতায় যে জীবন চিত্র ধরা আছে সেটা শুধু কল্পনা করতে পারি। ওই খাতার রাজ্যে আমারও প্রবেশ নিষেধ। কখনো সখনো নিতান্ত সদয় হলে ওর থেকে কোনো একটা খাতা বার করে কালোদা হয়ত সকল পরিচয় গোপন করে কোনো এক রোগিণীর কোনো এক দিনের একটুখানি বিবৃতি পড়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার বেশি একটুও নয়। সে বেলায় কালোদার নিষ্ঠা অবিচল। সাইকো-অ্যানালিস্ট এর এথিক্স-এ রোগীর গোপনতার আর দ্বিতীয় দোসর নেই। কালোদার 'পরে আর যে কোনো ব্যাপারে আবদারের অত্যাচারও চলে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক কালোবরণ চৌধুরী ভিন্ন মানুষ।

আমার দুই চোখের তৃষ্ণা উপলব্ধি করেই বোধ হয় কালোদা মিটিমিটি হাসছিলেন। নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই খাতাগুলোর ওপরে তোর বেজায় লোভ, না?

দৃষ্টিটা যথাসম্ভব করুণ করে বললাম, আপাতত মাত্র একটি খাতার ওপরে, এই যে মহিলাটি এই মাত্র চলে গেলেন শুধু তাঁর খাতাটি। একটুখানি পড়ে শোনাও না কালোদা, যেখান থেকে খুশি, যতটুকু খুশি, আমি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করব না।

আবেদনে মন ভিজল বোধ করি। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে ঠক্ করে হাতের

পাইপটা রাখলেন। উঠে গট-গট করে চেম্বারে গেলেন। শেল্‌ফ থেকে একটা মোটা বাঁধানো খাতা হাতে করে ফিরে এলেন আবার।

নে, ধর্ !

আমি হতভম্ব ! খাতাটা সত্যিই তিনি আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নির্বিকার মুখে।

আমি...মানে...আমি নিজে নিয়ে দেখব ?

দাঁতের ফাঁকে আবার পাইপ চালান করে আর সোফায় মাথা এলিয়ে দিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, ইচ্ছে যখন হয়েছে দেখো।

ঠিক শুনেছি তো কানে ! কিন্তু বাঁধানো খাতাটা যে সত্যিই আমার সামনে পড়ে আছে ! কালবিলম্ব না করে তৃষিত হাতে টেনে নিলাম সেটা। ভারি মলাট ওলটাতেই রোগিণীর নাম চোখে পড়ল। মহিলাটির সাক্ষাতেই এই নামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অপর্ণা বসু। তার নিচে তারিখ। লক্ষ্য করলাম, আট বছর আগের কোনো এক দিনের তারিখ সেটা।

পাতা ওলটালাম।

কিছু লেখা নেই, সাদা পাতা।

তার পরেরটাও তাই।

তার পরেরটাও।

রুদ্ধশ্বাসে এবারে এক সঙ্গে প্রায় সবগুলো পাতা উল্টে গেলাম। কোথাও একটি কালির আঁচড়ও পড়েনি। আগাগোড় সাদা। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালাম কালোদার দিকে।

আমার দুরবস্থা দেখে এবারে সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, দেখলি ?

দেখলাম। তুমি একেবারে নৃশংস। খাতা যখন হাতে দিয়েছ তখনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছু লেখনি কেন ?

দরকার হল না।

তার আগেই রোগ সেরে গেল ?

হ্যাঁ।

এ রকমও হয় না কি ?

কি জানি, আমার জীবনে তো আর হয়নি। তার রোগ সারার ব্যাপারেও আমার হাতযশ কিছু ছিল না, সে নিজেই আমায় বলে দিয়েছিল কি করলে তার অসুখ ভালো হবে।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম কালোদার মুখের দিকে। কিছুই বোধগম্য হল না। কালোদা নিজেই কেমন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন বোধ হয়। তাঁর কালো মুখে এত কোমলতা আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এবারে দুর্নিবার হল কৌতূহল। তার কারণ অধ্যাপিকা অপর্ণা বসু নন। তার কারণ, আটচল্লিশের ভাঁটায় দেড় যুগের বিপত্নীক কালোদা হেন মানুষের জীবনেও রেখাপাত করেছে এক নারীর জীবনরহস্য, তাই। এই আঠের বছর কালোদা একনিষ্ঠ ভাবে কামিনী

ছেড়ে কাঞ্চনের সাধনা করে এসেছেন। আমার নিজের ধারণা, এত অল্প বয়সে বিপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও কালোদার এই পেশাই ক্রমশ তাঁকে নারীবিমুখ করেছে। মেয়েদের প্রতি তাঁর দরদ দেখেছি, শ্রদ্ধা বড় দেখিনি। তাই এই ব্যতিক্রম এত বিস্ময়ের কারণ।

আমার এবারকার নাছোড় সঙ্কল্পটা চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল বোধ হয়। যাই হোক, মোটামুটি অপর্ণা বসুর একটু জীবনচিত্র আহরণ করা গেল। আর আশ্চর্য, সে জন্যে খুব একটা সাধ্য-সাধনাও করতে হয়নি কালোদাকে।

মফঃস্বল শহরের এক স্কুল-মাস্টারের একটি মাত্র মেয়ে অপর্ণা। শিশুকাল থেকে বাপের বুক দিয়ে গড়া মা-মরা মেয়ে। কলেজে পড়ত ! কি এক যোগাযোগের ফলে এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কোন্ এক বিদেশী ফ্যাক্টরীতে মস্ত কাজ করেন নাকি।

খুশিতে হেসে, ব্যথায় কেঁদে নিজের বুক খালি করে বাপ মেয়ে দিয়ে দিলেন। ছেলের হাত ধরে বললেন, বড় আদরের মেয়ে বাবা, আর বড় অভিমানী, দেখো....।

বিয়ের পর ক্রমশ প্রকাশ পেল ইঞ্জিনিয়ার কথাটার অন্য অর্থও আছে। যন্ত্রকর্মী অর্থে স্বামী ইঞ্জিনিয়ারই বটেন। এমনি লেখাপড়ায় ইস্কুলের বেড়াও পার হতে পারেননি। ছেলেবেলায় ফ্যাক্টরিতে ঢুকেছেন সাপ্তাহিক বেতন হারে। ডে-ডিউটি করেছেন নাইট ডিউটি করেছেন। এখনো তাই করছেন। তবে কর্মকুশলতার দরুন উন্নতি করেছেন অনেকটাই। মাসকাবারি মাইনে। ভালো মাইনেই। গোটা একটা বিভাগের মেসিন চলছে তাঁর তত্ত্বাবধানে।

মনে মনে স্বামীটি নিজের এক দিকের দৈন্য অনুভব করতেন বলেই হয়ত আর একটা স্থূল দিক সগর্বে জাহির করতেন প্রায়ই। কবে কত প্রোডাক্শন দিয়েছেন বলে কোন্ বিদেশি ফোরম্যান পিঠ চাপড়েছে। কোন্ অপারেটারের এক সপ্তাহ জরিমানা করে দিলেন এক কলমের খোঁচায়। কোন্ দুর্বিনীতে তার হাতের এক চড়ে ছিটকে পড়ল সাত হাত দূরে, ইত্যাদি—।

কিন্তু সামান্য ইস্কুল মাস্টারের মেয়ের মন ওতে বিস্ময়াপ্লুত হচ্ছে না দেখে মেজাজ বিগড়েও যেত। একটা স্তব্ধতা নেমে আসতে লাগল অপর্ণার জীবনে। দেহমনে পুরুষের পরুষ কামনাটুকুই উপলব্ধি করলেন তিনি।... আর কিছু নয়।

কিন্তু সমস্যা শুধু স্বামী নিয়েই নয়।

চার ভাইয়ের সংসার। বড় তিন ভাই মাঝারি গোছের চাকরি করেন। অন্তঃপুরের কর্ত্রী তিন জা। তাঁদের মিলও প্রচুর, অমিলও প্রচুর। রেষারেষিও আছে, গলাগলিও আছে। সংসার পরিচালনায় তাঁরা পরস্পরের নির্ভরশীল, কিন্তু কেউ কারো যে মুখাপেক্ষী নন, তার প্রকাশও খুব অস্পষ্ট নয়। আর প্রত্যেকেই তাঁরা নিজেদের প্রাধান্য সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন। এ হেন অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গেও অপর্ণার খাপ খেল না। আর বাকি তিনজনেই সেটা তাঁর শিক্ষার দেমাক বলে ধরে নিলেন। অপর্ণার প্রতি তাঁদের ব্যবহারে এবার বেশ একটা মিল দেখা যেতে লাগল। টীকা-টিপ্পনী শুরু হল

ক্রমশ।

"..ভাইদের মধ্যে তো ছোট ঠাকুরপোরই রোজগার বেশি, এরকম ঘর সাজানো তোমারই সাজে।" ভাইদের মধ্যে যে আবার ছোট ঠাকুরপোই লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ প্রকারান্তরে সেটাও আর একজন বুঝিয়ে দেন।

"থাক্ ভাই থাক্, তুমি কলেজে-পড়া বিদুষী, এসব কাজ কি তুমি পারো ? আমরা বাপের ঘরেও হাঁড়ি ঠেলে এসেছি, শ্বশুর ঘরেও হাঁড়ি ঠেলতেই এসেছি।" রান্নাঘরের প্রসঙ্গে।

"...তোমার বাপের বাড়ির রাজ্যি আলাদা, একেবারে মা সরস্বতীর রাজ্যি—তা ইস্কুলের পণ্ডিতই হোক আর যাই হোক, সংসারের সতের ঝামেলা সেখানে ব্যাকরণের ফুঁয়েই উড়ে-পুড়ে যায়।" অপর্ণার নিস্পৃহতা-প্রসঙ্গে।

কিন্তু তারপর অপর্ণারও মুখ খুলেছে। বাবা বলে দিয়েছিলেন বড় অভিমানী। কিন্তু বড় জেদীও যে, সেটা বলেননি। সংক্ষিপ্ত দুই এক কথায় এমন কিছু বলে নিজের ঘরে এসে বসে থাকতেন, যার জের সামলানো বাকি তিন জায়ের পক্ষেও খুব সহজ হত না। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলে তাঁরা যুঝতে পারেন। কিন্তু অপর্ণার অস্ত্রে তাঁদের জ্বলুনি বাড়ে, অথচ মুখের উপর তেমনি কিছু বলতে পারেন না। বলতে গেলেও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কেমন থতমত খেয়ে যান।

স্বামী নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাঁড়িয়ে তাকে বিয়ে করেছিলেন, সে চক্ষুলজ্জা কেটে যেতে তাঁর সময় লাগেনি খুব। তাঁর কর্ম-পরিবেশেই তাঁকে রুক্ষ কঠিন করেছে। শালীনতাবোধের ধার ধারেন না বড়। স্বমূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন তখন। সেটা আরো নগ্ন হয় যখন স্ত্রীর তুলনায় ছোট মনে হয় নিজেকে। সামান্য কি একটা ব্যাপারে একদিন ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, কোথাকার লাটসাহেবের মেয়ে তুমি যে এত দেমাক তোমার! তোমার বাবার মত ইস্কুল-মাস্টারের অমন মাইনের পঁচিশ গণ্ডা লোককে রোজ নাকে দড়ি দিয়ে কাজ করাই আমি মনে রেখো।

অপর্ণার ভিতরটা শুকিয়ে আসছিল বহুদিন ধরেই। কিন্তু প্রথম বিপর্যয় ঘটল ওই দিনই। শক্ত হয়ে খাটের বাজু ধরে বসেছিলেন। আর নির্বাক নেত্রে স্বামীর কটূক্তি শুনছিলেন। সহসা দেখা গেল হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেছে। ধুপ করে মাটিতে আশ্রয় নিল দেহ। থরথর কাঁপুনি শুরু হল। দাঁতে দাঁত লেগে গেল। সমস্ত শরীরের রক্ত বুঝি মুখে মুখে এসে জমতে লাগল।

হট্টগোল চেঁচামেচি জল বাতাস ডাক্তার ডাকাডাকি। অপর্ণার জ্ঞান ফিরল প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে। বড়[illegible] ওই লোক ভালো। বিশেষ করে সবার বড় যিনি, তিনিই সম্ভবত যথার্থ স্নেহ করতেন অপর্ণাকে। আগেও নিজের গিন্নিকে উপলক্ষ করে তিনি-গিন্নিকে শুনিয়ে বকাবকি করেছেন অনেক সময়। সেদিনও ভাইকে যতটুকু বকা চলে বকলেন। অন্য বৌদেরও প্রায় ধমকে দিলেন। বিলক্ষণ ভড়কে গিয়েছিলেন বলেই গিন্নিরা আর টুঁ শব্দটি করলেন না কেউ।

কিন্তু সেদিন সবে শুরু। সেই একই পূর্বের পুনরাবর্তন ঘটল আবারও। ঘটতে লাগল

মাঝে মাঝে। কখনো স্বামীর কটূক্তি বর্ষণের ফলে কখনো বা জায়েদের। সেই প্রচণ্ড কাঁপুনি। সেই দাঁতে দাঁত লাগা। সেই ফীট হওয়া!

ডাক্তার সতর্ক করলেন, মানসিক কারণে এরকম হচ্ছে, ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া দরকার।

বৌয়েরা সাবধান হলেন। কর্তাদের বকাবকিতেই ভয়ে ভয়ে সাবধান হতে হল তাঁদের। আড়ালে তাঁরা অপর্ণার নামকরণ করলেন ফীট-গিন্নি। কিন্তু পারতপক্ষে মুখের ওপর আর তাঁরা কিছু বলতেন না। যথাসম্ভব সাবধান হতে চেষ্টা করতেন স্বামীও। কিন্তু রাগের মাথায় ভুলেও যেতেন অনেক সময়েই। এক গিন্নি আর গিন্নিকে তখন দৌড়ে এসে খবর দিতেন, ফীট-গিন্নির ফীট হয়েছে, জল পাখা নিয়ে ছোটো শীগগির।

এমনিই চলছিল।

হঠাৎ স্বামী একদিন ফ্যাক্টরি থেকে এসে খবর দিলেন, তাঁকে বদলি করা হয়েছে। পশ্চিমের কোন এক জায়গায় ফ্যাক্টরির শাখা খোলা হয়েছে, সেইখানে। এ বদলির অর্থ পদোন্নতি। অবিলম্বে যোগ দিতে হবে।

বিদায়ের আগে বড় বৌ বললেন, যাও ভাই, এবারে সুখে থাকবে।

মেজ, সেজ সায় দিলেন।

কিন্তু এ সুখও সইল না অপর্ণার। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মেজাজ বিগড়ালো আরো। অফিসারস্ ক্লাবে পাল্লা দিয়ে মদ খেতে শুরু করলেন মাঝে মাঝে। উচ্চপদস্থদের সঙ্গ পেয়ে তাঁদের মধ্যে নিজেকে জাহির করার এটাই উপায় বলে ধরে নিলেন। অপর্ণার ফীট হলে এখন জল-বাতাস করে চাকরে। এ ছাড়া কোয়ার্টার্সে স্বামীর সঙ্গ ধরে বন্ধু বান্ধবেরও আনাগোনা শুরু হল। অফিসার বন্ধু। অপর্ণার রূপের খ্যাতিটা কি করে যেন অল্প দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল সেই মহলে।

সন্ধ্যায় গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতেও একদিন এলেন এঁদের একজন। যতক্ষণ ছিলেন, দুই চোখে অপর্ণার সর্বাঙ্গ লেহন করে গেলেন যেন।

বাড়ি ফিরে স্বামী এই আগমনবার্তা শুনলেন। শুনে হাসলেন। বললেন, ক্লাবে আমায় বলেই তো এলো। বললে, বাসু, তোমার বৌয়ের হাতে চা খেয়ে আসি।...তা চা দিয়েছিলে তো এক পেয়ালা, না কি?

তোমাদের ক্লাবে চা পাওয়া যায় না?

রসিকতা করে জবাব দিলেন, চা পাওয়া যায়, চা দেবার জন্যে বউ পাওয়া যায় না। পরপুরুষের দৃষ্টি নিয়ে স্বামী যেন খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন অপর্ণাকে। পরে বললেন, সেজন্যে মেজাজ খারাপের কি আছে, দু'পাতা লেখাপড়াই শিখেছ, সোসাইটিতে মিশতে শেখনি। পরদিন স্বামী ফ্যাক্টরিতে গেলে একটা চিঠি লিখে রেখে অপর্ণা সোজা কলকাতার ট্রেনে উঠলেন।

জায়েরা জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোনো কথা বার করতে পারলেন না। বড় ভাসুরও নিষেধ করে দিলেন, ছোট বৌমাকে বিরক্ত করো না, আমি গাধাটাকে চিঠি লিখে জেনে নিচ্ছি কি হল।

যথাসময়ে চিঠির জবাব এলো। দাদার কাছেই। অপর্ণা আর যেন ফিরে যেতে না চান কোনো দিন। খরচপত্র যা লাগে, মাসে মাসে দাদার নামে পাঠানো হবে।

অপর্ণার এত সাহস জায়েদের ভালো লাগল না। আবার তাঁদের জ্বলুনি শুরু হল। চার ভাইয়ের পৈতৃক-বাড়ি। কিন্তু জায়েদের মনে হল, অপর্ণা আবার তাঁর ঘরখানা দখল করে গোটা বাড়িটাই জুড়ে বসেছেন। কিছু বলারও উপায় নেই। তিন ভাই, বিশেষ করে বড় ভাই শাসিয়ে রেখেছেন, ছোটর অনুপস্থিতিতে আবার ফীট-টিট শুরু হলে এবারে সকল দায় তাঁদের ঘাড়ে পড়বে।

কিন্তু তবু একআধ সময় ফীট হ'ত অপর্ণার। বসে থাকতেন গুম হয়ে। বড় ভাসুর ডাক্তারও দেখাতেন।

প্রায় ছ'মাস কাটল।

তারপর হঠাৎ দেখা গেল, ফীট-এর মাত্রা ঘন ঘন বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে রাগ বেড়েছে, অসহিষ্ণুতাও। অথচ জায়েরা পর্যন্ত তখন কেন জানি সদয় ব্যবহারই করতেন। কিন্তু তাতেও রেগে উঠতেন অপর্ণা। বাড়িতে এক মাসের একটা জ্ঞাতি-অশৌচ ছিল। সকলেই বেশ বিষণ্ণ। অপর্ণা দেখেননি, বাড়ির অন্তরঙ্গ একজন ছিলেন নাকি লোকটি। কিন্তু এর মধ্যেও আহারের সময় অপর্ণা ঘোষণা করে বসলেন, নিরামিষ আহার তাঁর পোষাবে না।

সামনেই বড় ভাসুর দাঁড়িয়ে, সে খেয়ালও নেই।

আবার অশৌচভঙ্গের দিন জায়েরা গেলেন গঙ্গাস্নান করতে। অপর্ণা ঘাট থেকে একজন পুরুত ধরে দু'টো টাকা দিয়ে খুশি মত দু'লাইন মন্ত্র নিয়ে নিলেন এবং সেদিন আহারের সময় ঘোষণা করলেন, তাঁর নিরামিষ আহারই চলবে।

বড়গিন্নি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

মন্ত্র নিয়েছি। পরক্ষণেই রেগে গেলেন, মন্ত্র নিই বা না নিই—আমার খুশি, তোমার ইচ্ছে মত আমায় খেতে পরতে হবে নাকি?

দুম্ দুম্ পা ফেলে চলে গেলেন। সে বেলা খাওয়াই হল না। মেজগিন্নি, সেজগিন্নি সাধতে এসে দেখেন ফীট-এর পূর্বলক্ষণ। সেই হাড়কাঁপানো কাঁপুনি।

এবারে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন বড় ভাসুর। ফলে কালোদার সঙ্গে যোগাযোগ। প্রথম দু'দিন অপর্ণাকে চেম্বারে আনা যায়নি।

তারপর এসেছেন। প্রথম দিনই কালোদার কেমন যেন লেগেছিল। অমন রূপ, অমন নিটোল স্বাস্থ্য, সিঁথি এবং কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, সুবেশিনী, শান্ত দুই চোখে স্বচ্ছ দৃষ্টি...তবু কেমন যেন। পর পর তিন দিন তাঁকে একটি কথাও বলাতে পারলেন না কালোদা। অনেক প্রশ্ন করলেন, অনেক কথা নিজে বললেন। কিন্তু অপর্ণা একেবারে নীরব। ইজিচেয়ারে মাথা এলিয়ে বসে থাকেন। চেয়ে থাকেন। চেয়ে চেয়ে দেখেন তাঁকেই। নীরব চাউনি। কিন্তু বোবা চাউনি নয়।

এক ঘণ্টার সিটিং।

ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যায়। চেম্বারের দরজা খুলে দেন কালোদা। ঘরের সবুজ

আলো নিবে যায়। সাদা আলো জ্বলে ওঠে। ধূপকাঠি দু'টো জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়েছে কিন্তু চন্দনগন্ধে তখনও ঘর ভরা।

অপর্ণাকে উঠতে হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন। পাশের ঘরে বড় ভাসুর প্রতীক্ষারত। তাঁর নিষ্ক্রমণের দিকে চেয়ে থাকেন কালোদা। ছোট টি-পয়ে রোগিণীর জন্য ঢাকা জলের গ্লাসটা তুলে নিজেই এক চুমুকে খালি করে ফেলেন তারপর।

চতুর্থ দিন কালোদা অন্য পথ ধরলেন।

ইজিচেয়ারে অপর্ণা অর্ধশয়ান। সবুজ আলো জ্বলছে। চন্দন-ধূপও। অনেকক্ষণ নীরব থেকে ঘরের স্তব্ধতা আরো বাড়িয়ে তুললেন কালোদা। পরে শান্তকণ্ঠে বললেন, কাল থেকে আপনি আর মিছি-মিছি কষ্ট করে আসবেন না।

তেমনি নিঃশব্দেই চেয়ে রইলেন অপর্ণা।

কোনো কথা যখন বলবেনই না ঠিক করেছেন, তখন মিথ্যে আর রোজ 'ফীস্' গুনছেন কেন?

অপর্ণা চুপচাপ দেখছেন কালোদাকে। যেন যাচাই করছেন।

এই তিন দিন যে এত অজস্র কথা বললাম, আপনি শুনেছেন?

অপর্ণা আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লেন।

তাহলে?

এবারে বাক্‌নিঃসরণ হল।—আপনারা কি আমায় পাগল বলে ধরে নিয়েছেন?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কালোদা জবাব দিলেন, পাগলের সঙ্গে তিন দিন ধরে এত কথা কেউ বলে না। পাগল মনে করলে আপনাকে অ্যাসইলামে পাঠানো হত, আপনাকে তো আগেও বলেছি, নানা কারণে এক একজন অতি সুস্থ মানুষেরও মনের এক একটা দিকে এক এক রকমের জট পাকিয়ে যায়।

ধীর শান্ত দুই চোখ কালোদার মুখের ওপর রেখে অপর্ণা প্রশ্ন করলেন, আপনি সে জট ছাড়াবেন?

নিশ্চয়, অবশ্য আপনি যদি সাহায্য করেন। কিন্তু সেটাই যে আপনি করছেন না।

অপর্ণা জবাব দিলেন, করা সহজ নয়।

নয় কেন? মন খুলে বিশ্বাস করতে পারছেন না এই তো? কিন্তু একবার বিশ্বাস করে দেখুন, এই চারদেয়ালঘেরা এতটুকু জায়গার মত বিশ্বাসের এত বড় জায়গা আর কোথাও পাবেন না। নিতান্ত বন্ধু বলে ভাবুন, আর বিশ্বাস করুন। করবেন তো?

কালোদার কণ্ঠে কি যেন আছে। সেটুকু কালোদারই বৈশিষ্ট্য। তবু তেমনি যাচাইয়ের চোখেই অপর্ণা চেয়ে রইলেন খানিক। পরে অস্ফুট স্বরে বললেন, করব, কাউকে বিশ্বাস না করলেই নয়...।

পর পর আরো দু'টো সিটিং-এ অনুকূল পরিবেশ সৃজনের জন্যে কালোদাকে এক তরফাই কথা-বণিকের ভূমিকা নিতে হল। এরপর এক সময় রোগিণী যখন কথা বলা শুরু করবেন, তখন আস্তে আস্তে তাঁর মুখ বন্ধ হবে। মোটা বাঁধানো খাতার পাতা একে একে ভরাট হতে থাকবে।

কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল।

ইজিচেয়ারে অপর্ণা আর দেহ ছেড়ে দিলেন না সেদিন। সোজা বসে যেন শেষ বারের মত কালোদাকে নিরীক্ষণ করে আর যাচাই করে দেখে নিলেন। কালোদা জিজ্ঞাসা করলেন, বলবেন কিছু ?

আপনি জট ছাড়াবেন বলেছিলেন মনের, সে কবে ?

পেশাদার হাসি হেসে কালোদা জবাব দিলেন, কবে যে জট ছেড়ে গেল সে আপনি জানতেও পাবেন না।

আমায় কি করতে হবে ?

আপাতত অমন সোজা হয়ে বসে না থেকে শরীর মন শিথিল করে ইজিচেয়ারে মাথা রাখতে হবে। তারপর চোখ বুজে যা আপনার মন চায়, যা খুশি, যে কথা খুশি—কিছুক্ষণ বলে যেতে হবে। আজকের কাজ এইটুকুই।

অপর্ণা তাঁর দিকে চেয়েই চুপচাপ ভাবলেন একটু। তারপর শান্ত মুখে বললেন, এই করে সারা জীবনেও আপনি কিছু করে উঠতে পারবেন না।... তার থেকে আমি আপনাকে বলে দিতে পারি, কি করলে এ অসুখ ভালো হবে, মনের জট ছাড়বে।

কালোদা অবাক নেত্রে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, পরে বললেন, জানেন যদি তাহলে করেন না কেন ?

আমি নয়, আপনি চিকিৎসক, আপনি করবেন।

... ও, আচ্ছা বলুন।

অপর্ণা নীরব কিছুক্ষণ। পরে চোখে চোখ রেখে বললেন, সেদিন আপনি বলেছিলেন, আপনাকে সব থেকে আপন জন, সব থেকে দরদী বন্ধু বলে ভাবতো। ও রকম কথা বোধ হয় সকলকেই বলে থাকেন আপনারা ?

হঠাৎ এরকম প্রশ্নের জন্য কালোদা প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই হালকা হেসে জবাব দিলেন, বলি হয়ত... কিন্তু সকলের সঙ্গে আপনার একটু তফাৎ আছে... ঘরে আয়না থাকলে দেখাতে পারতাম।

সবুজ আলোতেও অপর্ণার মুখ রক্তিম হতে দেখা গেল। মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা বিশ্বাস করলাম।

আবার চুপচাপ। অদ্ভুত রহস্যের মত লাগছে কালোদার। এরকম নারীচরিত্র বুঝি সত্যিই দুর্জ্ঞেয়। আবার তাঁর চোখে চোখ রাখলেন অপর্ণা। স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ।

বড় ভাসুরের মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে সব কিছু শুনেছেন ?

কি শুনব, বলুন ?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অপর্ণা বলে উঠলেন, যা জিজ্ঞাসা করছি জবাব দিন। শুনেছেন ?

শুনেছি।

আমি বিধবা সে কথা শুনেছেন ?

কালোদা হতভম্ব, বিমূঢ়। জীবনে এত বিস্মিত আর কখনো হননি বোধ হয়। সিঁথি আর কপালে ঝক্ ঝক্ করছে, জ্বল্ জ্বল্ করছে রক্তিম সিঁদুর-চিহ্ন।

শুনেছেন ?

শুনেছি। কিন্তু আপনি কত দিন জেনেছেন ?

প্রথম দিনই। দোতলা থেকে টেলিগ্রাম-পিওনকে আমার নামই ডাকতে শুনেছি আর বড় ভাসুরকে টেলিগ্রাম হাতে নিতেও দেখেছি। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও সে টেলিগ্রাম কেউ আমায় দিয়ে গেল না। পরে নিচে এসে দেখলাম সবারই মুখ কালো। আরো পরে শুনলাম, অ্যাকসিডেন্ট-এ কে একজন জ্ঞাতি মারা গেছেন তাঁদের, তাই এক মাসের জ্ঞাতি-অশৌচ। কিন্তু সত্যি ঘটনাটা তাঁরা কেন কেউ প্রকাশ করলেন না, জানেন বোধ হয় ?

কালোদা নিজের অজ্ঞাতেই মাথা নাড়লেন। বললেন, আপনার ফীট-এর রোগ আছে, পাছে আরো বিপদ ঘটে কিছু।

তাই। পাছে আরো বিপদ ঘটে, পাছে আমি পাগল হয়ে যাই, পাছে দুর্বহ বোঝার মত সারা জীবন তাঁদের টানতে হয় আমাকে। ভাসুরেরা এই ভয়ে বলতে দেননি, জায়েরাও এই ভয়ে বলেননি। নইলে বলতেন। যেদিন নিরাপদ বুঝবেন সেদিনই বলবেন। কিন্তু, এ ভয়টা তাঁদের ভাঙলে চলবে না, বরং সেটা আপনি যদি বাড়িয়ে দেন তো ভালো হয়। ও সংসারে আশ্রয় আর অনুকম্পা আর দয়া আমার সহ্য হবে না, তাহলে সত্যিই হয়ত পাগল হয়ে যাব।

কালোদা বাহ্যজ্ঞান রহিত যেন। প্রশ্ন করলেন, আর আপনার ফীট-এর রোগ ?

যেদিন দেখলাম সত্যিকারের নিরাশ্রয় হয়েছি সেদিন থেকেই ফীট-এর রোগ ছেড়েছে। কিন্তু কাঁপুনিগুলো মিথ্যে নয়, ও এমনি হয়ে গেছে যে নিজেকে একটু উত্তেজিত করে তুলতে পারলেই ও আপনি শুরু হয়ে যায়।

আত্মবিস্মৃতের মত কালোদা বললেন, কিন্তু আপনি কি করবেন স্থির করেছেন ?

অপর্ণা প্রায় না ভেবেই জবাব দিলেন, বড় ভাসুরকে বলে আপনি আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিন। চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছুতে মন দেওয়া দরকার বললে তাঁরা অবিশ্বাস করবেন না। 'ফীস্' অবশ্য তাঁরা আর বেশি দিন দিতে পারবেন না।...কিন্তু যদি কখনো দাঁড়াই, আপনার ঋণ পরিশোধ করতে না পারলেও ওটুকু পারব হয়ত।

স্তব্ধ নেত্রে নারীমূর্তির দিকে চেয়ে বসে রইলেন কালোদা। কতক্ষণ ঠিক নেই।

হাত

হঠাৎ পাঁজরে আঙুলের খোঁচা খেয়ে সবিস্ময়ে সঙ্গীর দিকে তাকালাম।

সঙ্গী মুখে বললেন না কিছু। নীরবে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

তাঁর দৃষ্টি এবং ইশারা অনুসরণ করে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে ইতিহাস অধ্যুষিত গুরুগম্ভীর স্মৃতিগুলো যেন শরতের হালকা মেঘের মত মিলিয়ে যেতে লাগল।

অদূরের মিনার চূড়ায় দাঁড়িয়ে এক নারীমূর্তি।

এতক্ষণ যেন এক ইতিহাসকালের মমির ওপর বিচরণ করছিলাম আমরা। পায়ের নিচে ঋজু কঠিন অম্বর দুর্গ। তার সর্বত্র পাথরে আবদ্ধ শতাব্দীকালের এক একটা দর্পোদ্ধত জীবনস্রোত। যশোরেশ্বরী, শিলাদেবী, শিষমহল, শুকমন্দির, সোহাগমন্দির—এগুলোর মধ্যে প্রাণস্পর্শ কল্পনা করছিলাম শুধু।

কিন্তু ওই মিনার চূড়ার রমণীমূর্তি পাথরেরও নয়, কল্পনারও নয়। সদ্য বর্তমানের। সজীব রক্ত মাংসের।

...পাথরের নয় বটে, কিন্তু মর্মর মূর্তির মতই দাঁড়িয়ে।

মনে হল তাঁর দৃষ্টিও আমাদের দিকেই। কিন্তু মাঝখানের দূরত্ব কম নয়। ঠিক বোঝা গেল না। গলায় ঝোলানো বায়নাকুলার তুলে চোখে লাগালাম। দূরের ব্যবধান ঘুচে গেল। ঘনায়ত দুই চোখের বিদ্যুৎ কটাক্ষে এক মুহূর্তে বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম।

সঙ্গী বায়নাকুলারের উদ্দেশে সাগ্রহে হাত বাড়ালেন।

বললাম,আমাদেরই দেখছে, কি ভাববে...।

তবু বায়নাকুলার লাগালেন তিনি। এবং লাগিয়ে আমারই মত বিধ্বস্ত হলেন। পরে দূরত্বনাশী যন্ত্রটা ফেরত দিতে দিতে গম্ভীর মুখে বললেন, হাসছ মনে হল....।

বাঙালি মেয়ের মতই শাড়ি পরা। কিন্তু সঠিক বিশ্লেষণ করা গেল না। বক্ষদেশ পর্যন্ত প্রাচীরের আড়ালে। সঙ্গী মনোভাব ব্যক্ত করলেন, চলুন একটা মিনারে তো উঠতেই হবে, ওটাতেই গিয়ে ওঠা যাক।

মিনারে একটা উঠতেই হবে এ সঙ্কল্প আমার কেন ক্ষণকাল আগে তাঁরও ছিল না। এতক্ষণ ঘোরাঘুরির ফলে পদযুগল দুজনেরই টনটনিয়ে উঠেছে। তবু মাথা নেড়ে সায় দিলাম এবং দ্বিরুক্তি না করে অগ্রসর হলাম।

ওই গম্বুজাকৃতি মিনার-চূড়ার আড়াল থেকে একদা রাজপুত সৈনিক প্রহরী দুর্গ পাহারা দিত। দুর্গের বাইরে আভাস পাওয়া মাত্র তারা সংকেত-ধ্বনি করত। দুর্গ থেকে মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণ হত তখন। কোন্ কুলবতী আজ ওখানে প্রহরায় মোতায়েন কে জানে। কোনো সংকেত টংকেতের ধার ধারেন, না, তাঁর ওই কটাক্ষ বর্ষণেই আমরা জর্জরিত।

মিনারের কাছাকাছি যেতে দেখা গেল অদূরে একটা পাথরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে এক ভদ্রলোক চুরুট টানছেন। পরনে ট্রাউজারের ওপর বাঘের চামড়ার মত একটা ডোরাকাটা গেঞ্জি।

ক্ষুদ্রাকৃতি দৈত্যবিশেষ। মুগুরের মত দু'খানি লোমশ হাত, বুকের ছাতি ওই স্বল্প আচ্ছাদন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যেন উমার তপোবনে পাহারায় বসে নন্দী ভৃঙ্গীদের একজন। নিস্পৃহ চোখে আমাদের চেয়ে দেখলেন একবার।

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে ভাবছি মিনারে উঠতে যাওয়াটা আর সমীচীন হবে কি না।

কিন্তু পরক্ষণে সে ভাবনার অবসান হল। মহিলা মিনার তোরণ থেকে অবতরণ করে ধীরে সুস্থে এদিকেই আসছেন। পায়ে পায়ে শুকনো অম্বর যেন প্রাণসিক্ত হচ্ছে।

তাঁর নেত্রপল্লব যদি আমাদের দিকে অমন বেপরোয়াভাবে সংবদ্ধ না থাকত, তাহলে হয়ত একটু ভালো করে দেখা যেত। কিন্তু তিনি দেখছেন না তো, যেন স্বয়ং অম্বরেশ্বরী তাঁর ভীরু দুটি প্রজার দিকে সকৌতুক করুণায় কটাক্ষপাত করছেন।

আমাদের কাছাকাছি এসে তাঁর গতি আরো মন্থর হল। শেষে থেমে গেল।

আপলোগ বাংগালী ?

জবাবে হিন্দি বাংলা মেশানো অস্ফুট একটা স্বর নির্গত হল কণ্ঠ থেকে। মাথা নেড়ে জবাবটা সুস্পষ্ট করা গেল।

তাহলে আর হিন্দি বলে মরি কেন! উৎফুল্ল মুখে তিনি অদূরে তাঁর লোমশবাহু সঙ্গীর দিকে তাকালেন একবার।—আসুন না, আলাপ পরিচয় করি, এ ছাইয়ের দেশে তো বাঙালির মুখ দেখা যায় না।

বাঙালী হয়ে ধন্য হলাম। তিনি পাথরে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটির সামনে ধূপ করে বসে পড়লেন। সোৎসাহে বললেন, এঁরাও বাঙালী তাই ধরে আনলাম। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

আমরা তাঁরই মত-ভূমি-আসন গ্রহণ করলাম। বাঙালী শুনেও ভদ্রলোকটি বিশেষ আপ্লুত হয়েছেন বলে মনে হল না। মাথা নেড়ে সামান্য অভিবাদন জানালেন মাত্র। মহিলা পরিচয় দিলেন, ইনি মিস্টার গুপ্ত, আমি মিসেস। আপনারা..... ?

বললাম।

তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, ওই কি একটা কনফারেন্স হচ্ছে সে জন্যেই জয়পুরে এসেছেন, না ?

মাথা নেড়ে জানালাম তাই বটে।

ও বাবা, তাহলে তো একেবারে রাজ-অতিথি! কিন্তু কনফারেন্স শেষ হতে আর দুদিন বাকি। তারপরেও অবশ্য এখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমার থাকার কথা কিছুদিন। সবিনয়ে তাই জ্ঞাপন করলাম।

আত্মীয়! বাঙালি ? কে বলুন তো ?

নাম করতেই তিনি উৎফুল্ল মুখে বলে উঠলেন, প্রোফেসার চক্রবর্তী। খুব চিনি তাঁকে। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ আছে, অনেকদিন ওদিকে যাইনে বলে অবশ্য দেখা হয় না আজকাল।

বুঝলাম, মহিলা আর যাই হোন স্বল্পভাষিণী নন। এমনও হতে পারে অবাঙালির রাজ্যে থাকেন বলেই দেশের মানুষ দেখে খুশি হয়েছেন। ফ্লাস্ক থেকে দুটো পেয়ালায় চা ঢেলে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মিস্টার গুপ্তকে ফরমায়েশ করলেন, এঁদের কেক্ দাও তো—। পরে আমাদের দ্বিধা লক্ষ্য করে বললেন, ওই দুটিই পেয়ালা আছে সঙ্গে, আপনাদের হয়ে গেলে আমরা নেব, গেস্ট ফার্স্ট—।

তাঁর হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিলাম। আর গম্ভীরানন গুপ্তর হাত থেকে কেক-এর প্লেট। পেয়ালায় গোটা দুই চুমুক দিয়ে খুশি জ্ঞাপন করলাম, বাঃ! ঘুরে ঘুরে এতটা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি।

মহিলা হাসি ছড়িয়ে বলে বসলেন, এত পরিশ্রান্ত হয়েও আবার ওই মিনারে উঠতে যাচ্ছিলেন?

মিস্টার গুপ্তর দিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম একটা। তাঁর চুরুট বিগড়েছে বোধ হয়, ভ্রূ কুঁচকে সেটা পরীক্ষা করলেন তিনি। মহিলা মৃদু হাসলেন।...দূর থেকে যত রূপসী মনে হয়েছিল ততটা কিছু নন। কিন্তু হাসলে তাঁর ওই টোল খাওয়া গাল আর ঝকঝকে দাঁতের সমন্বয় অপরূপই মনে হয়।

প্রসঙ্গান্তরে আসাই নিরাপদ। জিজ্ঞাসা করলাম, জয়পুরে বাঙালি বিশেষ নেই বুঝি?

ঠোঁট উলটে জবাব দিলেন, ক'ঘর আর, থাকলেও চেনা দায়—। হাসলেন হঠাৎ, আপনাদের কিন্তু দেখেই চিনেছি, নতুন বলেই গোবেচারি ভাবটা যায়নি।

সঙ্গী লঘুকণ্ঠে বললেন, আপনার চোখ তো খুব!

জবাব দিলেন, খুব, আপনাদের মত বায়নাকুলার টায়নাকুলার লাগে না আমার।

শেষ চা-টুকুর সাহায্যে টিপ্পনী সহ কেক্ জঠরদেশে চালান করতে হল। মিস্টার গুপ্ত নতুন চুরুট ধরিয়েছেন। পেয়ালা ধুয়ে নিজেদের জন্যে এবারে দুপেয়ালা চা ঢেলে নিলেন মহিলা। মিস্টার গুপ্তর নীরবতা অস্বস্তিকর লাগছে কেমন। এবারে তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন নিক্ষেপ করলাম।—জয়পুরে আপনার তো কর্মস্থল, চাকরি না আর কিছু...?

তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, বিজ্‌নেস।

মহিলা হালকা সুরে যোগ করলেন, পাথরের ব্যবসা, দেখচেন না কেমন পাথরপানা হয়ে বসে আছেন।

ভদ্রলোকও হাসতে চেষ্টা করলেন এবার। বললেন, সত্যিই আমার কথাবার্তা তেমন আসে না। নিজের লোমশ বাহু দুটির দিকে সস্নেহে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। বক্তব্য সমাপ্ত করলেন তারপর, কথা বলার সময়ই পাইনে, সারাক্ষণ এই হাতই চলে শুধু।

ছদ্ম ত্রাসে মহিলা কলকণ্ঠে আমাদের সতর্ক করে বলে উঠলেন, সরে বসুন, সরে বসুন, ও হাত আপনাদের দিকে একবার চললে অম্বর থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে গিয়ে পড়বেন।

সমবেত উচ্চ হাসিতে মিস্টার গুপ্তর কণ্ঠই বেশি শোনা গেল এবার। পরে বললেন, তোমার মুখের জোরের থেকে তা'বলে এ হাতের জোর বেশি নয়।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমার আত্মীয় প্রোফেসার এবং তাঁর নবীনা গৃহিণীর মুখে গুপ্ত-দম্পতির সমাচার শোনা গেল। বছর তিনেক আগে বর্তমানের মিসেস গুপ্ত, অন্যকথায়, অরুন্ধতী গুপ্ত প্রথম যখন জয়পুরে আসেন তখন তিনি ছিলেন মিসেস অরুন্ধতী মহাপাত্র। অধ্যাপক গৃহিণীর দৃঢ় বিশ্বাস তারও আগে মহিলা মিসেস অন্য কিছু ছিলেন। কিছুকালের মধ্যেই মহাপাত্র ভদ্রলোকটি জয়পুরের কর্মস্থল থেকে স্বেচ্ছায় বদলি হয়ে একা প্রস্থান করেন। মিসেস মহাপাত্র তারপর ধীরেসুস্থে মিসেস প্রমথ গুপ্ত হয়ে বসেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, মিস্টার গুপ্তকে অতটা পছন্দ হল কি দেখে?

অধ্যাপক গৃহিণী জবাব দিলেন, টাকা আছে অঢেল, তাছাড়া অমন একখানা...। হেসে বাকিটুকু অসমাপ্তই রাখলেন।

অম্বর দুর্গে গুপ্তদম্পতির সঙ্গে সাক্ষাতের কাহিনী শুনে তাঁরা কিন্তু বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁদের ধারণা, দুজনের তেমন বনিবানা নেই এখন এবং অরুন্ধতী গুপ্ত যোগ্য আর কাউকে পেলে আবারও পদবী করতে পারেন। এতদিনে হয়ত বা সেটা হয়েও যেত, কিন্তু রাজপুত ব্যাচিলাররাও নাকি প্রমথ গুপ্তের ষণ্ডমূর্তিটি তফাতে রেখে চলেন।

গুপ্ত দম্পতির সঙ্গে দ্বিতীয় বারের যোগাযোগ কনফারেন্সের শেষ দিনে। বিকেলের দিকে ডেলিগেটদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ গান আবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় গণ্যমান্য ভদ্রলোকরাও সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত।

অধ্যাপকগৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে অরুন্ধতী গুপ্তকে হাত ধরে সাদরে আমাদের দিকে নিয়ে এলেন। পিছনে পিছনে গুপ্ত এলেন। অধ্যাপকদম্পতির সঙ্গে এঁদের সত্যিই বেশ হৃদ্যতা আছে দেখলাম। এক জায়গাতেই আসন নিলাম সকলে। মিসেস গুপ্ত এক ঝলক হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, আবার ওঁর হাতের কাছে বসেচেন?

আমার একদিকে প্রমথ গুপ্ত, অন্যদিকে অধ্যাপক। তারপর মহিলাদ্বয়। রহস্যটা আমি এবং মিস্টার গুপ্ত ছাড়া বাকি দু'জনের বোধগম্য হল না। পরিবেশ নিরাপদ বলেই হালকা জবাব দিলাম, আপনার পাশে একটু জায়গা পেলে সরেই বসতাম...।

তাঁর অস্ফুট হাসির শব্দে অনেক দর্শক ঘাড় ফেরালেন। এমনিতেই উশখুশ করছিলেন তাঁরা।

ওদিকে জলসা শুরু হয়ে গেছে। ভালোও লাগছে না, খারাপও লাগছে না। কারণ, মন দিয়ে তেমন কিছু দেখছিও না, শুনছিও না। কিন্তু সবশেষে যে শিল্পীটির শুভাগমন জ্ঞাপন করা হল তাঁর নাম শোনা মাত্র উৎফুল্ল করতালির অভিনন্দনে এত বড় হল মুখরিত।

নাম প্রোফেসার যশোমন্ত গিরি।

প্রোফেসার বলতে অধ্যাপক নন, ওটা জনসাধারণের দেওয়া টাইটেল।

ডান দিক থেকে আমার আত্মীয়টি বললেন, এবারে মন দিয়ে শুনুন, এ জিনিস আর কোথাও কখনো শোনেন নি। লেখকদের এসব আরো বেশি ভালো লাগার কথা...।

শিল্পী, অর্থাৎ, প্রোফেসার গিরি মঞ্চে এসে দাঁড়ানো মাত্র আর একদফা হাততালির ধুম পড়ে গেল। শিল্পী সবিনয়ে দু'হাত জুড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বয়েস চল্লিশের কিছু এধারে। সৌম্যদর্শন, পরনে ঢোলা পা'জামা আর ঢোলা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটার হাত গুটিয়ে দিতে সুঠাম দু'খানি গৌরবর্ণ বাহুও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মাথার অবিন্যস্ত চুলে লালচে আভা। সব মিলিয়ে চেহারায় বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

পাঠকজন এ কাহিনীর নায়িকার আভাস বহুক্ষণ পেয়েছেন। কিন্তু তা বলে নায়ক আমি নই, বা আমার পাশের ষণ্ডাকৃতি প্রমথ গুপ্তও নন। কাহিনীর নায়ক ওই মঞ্চের উপর যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, উনি। প্রোফেসার গিরি...।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। প্রোফেসার গিরি নম্র মৃদু গলায় একটুখানি ভূমিকা করে নিয়ে রাজপুত প্রাচীন গাথা কাব্য পরিবেশন করতে লাগলেন। আবৃত্তিও নয়, অভিনয়ও

নয়। আবৃত্তির থেকে অনেকটা বেশি কিছু, আবার অভিনয়ের থেকেও কম কিছু।

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলাম। ওই মৃদুকণ্ঠ সে ওরকম উঠতে নামতে পারে, সুরের মূর্ছনায় এমন একটা যান্ত্রিক ঝঙ্কারে এতবড় হলঘর ভরাট করে দিতে পারে, একবারও মনে হয়নি। রাজপুত বীরদের অমর কাহিনী, বীরাঙ্গনাদের বিক্রম, কুল ললনাদের জহরকুণ্ডে মর্মন্তুদ আত্মবিসর্জন, মায়ের হাতে সেজে কিশোর ছেলের যুদ্ধযাত্রা এবং সমরাঙ্গনে প্রাণতর্পণ—দৃশ্যগুলি যেন স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

আমরা স্তব্ধ। দু'হাত তুলে শিল্পী বিদায় অভিবাদন জানালেন। শুধু তখনই সকলের সংবিত ফিরল যেন। সঘন করতালি ছাপিয়ে তখন চিৎকার শুরু হ'ল। শ্রোতারা কিছু একটা অনুরোধ করছেন বোঝা গেল। এদিক থেকে, ওদিক থেকে, চারদিক থেকে একজন দুজন করে শ্রোতা দাঁড়িয়ে উঠে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে চিৎকার করছেন, হাঁথ্! হাঁথ্! হাঁথ্! ... !

বিস্মিত হয়ে আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছে?

তিনি জবাব দিলেন, 'হাত' গাথা কাব্য শোনাতে বলছে।

এবারে বাঁদিক থেকে প্রমথ গুপ্তও মন্তব্য করলেন, ওটাই ওঁর মাস্টারপিস্, সমস্ত রাজস্থানে ওঁর নাম ছড়িয়েছে ওই 'হাত' গাথার জন্যেই।

ভারি অবাক লাগল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রোফেসার গিরি হাসছেন মৃদু মৃদু। পরে দুহাত তুলে সকলকে থামতে বলে তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে নিলেন। রীতিমত পরিশ্রমের ব্যাপার, ঘেমে নেয়ে গেছেন।

মঞ্চের একেবারে সামনে এসে তিনি দুই বাহু উত্তোলন করলেন আবার। যা বললেন, তার মর্মার্থ, এক কৃষকবধূ তাঁর দু'খানি বাহু বিসর্জন দিয়েছিল স্বামীর চাষের মাটিতে সোনা ফলাবার জন্য।

গাথা শুরু হল।

প্রথমে সেই কৃষক পরিবারের কথা। সুখ দুঃখ হাসিখুশির সংসার ঘরে কৃষক ছেলে আর তার যুবতী স্ত্রী আর তার বৃদ্ধ বাবা-মা আর ভাইবোন। আকাল নেমেছে দেশ জুড়ে। অভিশপ্ত মাটি ফেটে শুধু আগুন উঠছে। চারিদিকে হাহাকার আর আর্তনাদ। বাতাসে শুধু সূর্যগলানো আগুন।

কৃষক পরিবারের এক প্রাজ্ঞ পুরুষের উক্তি ছিল, এরকম অগ্নিক্ষরা আকাল আসবে একদিন। তখন যদি বাড়ির কোনো কুলবধূ নিজের দুখানি কল্যাণ-হাত ওই জমিতে বিসর্জন দেয়, তাহলে জমিতে সোনা ফলবে আবার, কোনো দিন আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

দুর্দিন যত বেশি ঘনাতে থাকে, কৃষক-বধূ আনমনে বসে ভাবে কতো কি। শিউরে ওঠে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় এক এক সময়। নিজের মৃণাল-বাহু দু'খানি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে অন্যমনস্কের মত। অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে কখনো বা।

আমরা স্তব্ধ সমাহিতের মত বসে আছি। মঞ্চের থেকে সব কিছু মিলিয়ে গেছে

যেন। প্রোফেসার গিরির ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা হাত-দুখানি বারবার সেই কৃষকবধূর মৃণাল-বাহু বলে ভুল হতে লাগল।

...মাটির আগুন আকাশ স্পর্শ করছে ক্রমশ। আর ঘরে ক্ষিপ্ত উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছে কৃষকবধূ! থেকে থেকে বারবার দুই বাহু শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করছে আর দেখছে আর সঙ্কল্প আঁটছে আর আকুল প্রার্থনা করছে, ভগবান শক্তি দাও— !

...শেষে অটুট সঙ্কল্পে দুই চোখ ধক ধক করে উঠল তার। দুই বাহু তুলে ধীর নির্মম কণ্ঠে যেন সচেতন করতে চাইল তাদের।—দেবো, তোমাদের আমি বিসর্জন দেব, শুনছ? তোমাদের রক্তে তোমাদের হাড়ে মজ্জায় মাংসে জমির ক্ষুধা জমির তৃষ্ণা মিটবে, শুনছ? দেব আমি তোমাদের বিসর্জন, শুনছ?

...পরদিন সকালে কৃষক ছেলে ঘরে কোথাও তার স্ত্রীকে দেখতে পেল না। পরে ধানকাটা কলের পাশে খুঁজে পেল তাকে। একেবারে বোবা হয়ে গেল ক্ষণকালের জন্য। তীব্র তীক্ষ্ণ মর্মচ্ছেদী আর্তনাদ করে উঠল তারপর।

...ভূমিশয্যায় কৃষকবধূ। অদূরে দুখানি ছিন্ন বাহু। সেই দুই বাহু দুহাতে শূন্যে তুলে যেন আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে কার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল কৃষকছেলে।—আমি চাইনে জমি, চাইনে ফসল চাইনে সোনা—ভগবান! এই হাত ফিরিয়ে দাও ওকে, ফিরিয়ে দাও!

...মাটির উপর শান্ত প্রসন্ন নিদ্রায় শয়ান কৃষকবধূ।

...আকাল গেল, ফসল ফলল, সোনা হল।

...দিন গেল, বৎসর গেল, শতাব্দী গেল।

...কিন্তু আকাশ বাতাস থেকে কৃষকছেলের কান্না গেল না।

কণ্ঠের ঝঙ্কারে, কাব্যের মাধুর্যে, সুরের মূর্ছনায় হল্-এর বাতাস যেন কান্নায় কান্নায় ভরে গেছে। গলার কাছে জমাট বাঁধা কান্নার মত কিছু একটা আটকে আছে যেন। অধ্যাপক গৃহিণীর দুই চোখে ধারা নেমেছে। অরুন্ধতী গুপ্ত নির্বাক। সমানে পিছনে দৃষ্টি সঞ্চারণ করে দেখি সকসঙ্গে অনেকেরই প্রায় রুমাল দরকার হয়ে পড়েছে।

মঞ্চ থেকে প্রোফেসার গিরি কখন আড়ালে চলে গেছেন। সার্থক শিল্পী। অধ্যাপক আত্মীয়টি জানালেন, এরকম বহু অপূর্ব গাথা স্টকে আছে শিল্পীর। তবে এটাই সব থেকে প্রসিদ্ধ বটে।

চকিতে যাকে বলে একটা আইডিয়া এলো মাথায়। তাঁকে বললাম, চলুন ভদ্রলোকের কাছে, একবারটি আলাপ করব। এগুলো যদি তাঁর কাছ থেকে পাই আর বুঝে নিতে পারি—বাংলায় একটা অপূর্ব জিনিস হবে।

তাঁকে প্রায় টেনে নিয়ে গিরি সন্নিধানে এলাম। কিন্তু দুচার কথা বলেই নিরাশ হতে হল। এমন একজন শিল্পী এরকম জবাব দেবেন ভাবিনি। সঙ্কল্প শুনে সামান্য হাসলেন। ইংরেজিতে বললেন, চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু এটা আমার পেশা, বাড়িতে এসো আলাপ করা যাবে, টার্মস্-এ বনলে আপত্তির কি আছে...।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পায়ে পায়ে প্রত্যাবর্তন। মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেল।

বাংলার ভাষা সম্পদে এইসব লোকগাথা যা করে তোলা যায় ভেবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।

ফিরে আসতে মিসেস চক্রবর্তী অর্থাৎ অধ্যাপক গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

বললাম কি হল। এরকম জবাব এঁরাও প্রত্যাশা করেননি বোঝা গেল। শুধু প্রমথ গুপ্ত মন্তব্য করলেন, আমি জানতাম—লোকটার বিষম টাকার খাঁই, কম করে পাঁচ সাত হাজার হাঁকবে।

পাঁচ সাত শ' হলেও আমি নাচার।

সবাই আমরা হল সংলগ্ন ফাঁকা মাঠে এসে দাঁড়িয়েছি। গুরুগম্ভীর প্রমথ গুপ্ত বিনা দ্বিধায় হঠাৎ এক অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন। বললেন, আর এক কাজ করতে পারেন। কনফারেন্স-এ লেডি ডেলিগেট তো অনেক এসেছেন, দেখেশুনে তাঁদের এক আধজনকে ধরে নিয়ে যান—দেখবেন টাকার কথাটা তখন আর মনে থাকবে না ওঁর—এই করে দুচার দিনে যা হাতিয়ে নিয়ে আসতে পারেন।

স্থূল ইঙ্গিতটা এমনই স্থূল যে অধ্যাপক গৃহিণী মাঠের আবছা অন্ধকার সত্ত্বেও অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। অরুন্ধতী গুপ্ত ঈষৎ বিস্ময়ে তাকালেন স্বামীর দিকে।

প্রমথ গুপ্ত তাড়া দিলেন, তাঁর কাজ আছে, এক্ষুনি যেতে হবে।

মিসেস গুপ্ত তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন, হ্যাঁ তুমি যাও, আমি একটু বেড়িয়ে ফিরব'খন।

মনঃপূত হল কি না ভদ্রলোকের মুখ দেখে বোঝা গেল না। শুধু বললেন, গাড়িটা...

তুমি নিয়ে যাও, আমি একটা টাঙা ধরে নেব'খন, এখান থেকে এখানে হেঁটেও যেতে পারি।

গুপ্ত চলে গেলেন। আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে অধ্যাপকও সস্ত্রীক গৃহাভিমুখে রওনা হলেন। পরদিন থেকে আমার তাঁদের বাড়িতে থাকার কথা। আজ রাত পর্যন্ত এই মাঠ সংলগ্ন বাড়িতেই ডেলিগেটদের থাকার ব্যবস্থা। মিসেস গুপ্ত বললেন, আপনিও ফিরবেন এখন না আমাকে এগিয়ে দেবেন একটু?

সানন্দে রাজি। বললাম, চলুন—।

নিঃশব্দে খানিকটা পথ অতিক্রম করে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। পথের আলোয় এবার মুখখানি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হল যেন হাসছেন আপন মনে। হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে বললেন, মিসেস চক্রবর্তী আপনার লেখার প্রশংসা করছিলেন, বলছিলেন দৃষ্টিভঙ্গি খুব ভালো।

প্রোফেসার গিরির উদ্দেশে যাওয়ার সময়টুকুর মধ্যে মিসেস চক্রবর্তী এ সংবাদ রাষ্ট্র করে থাকবেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গির সম্বন্ধে মহিলার বাচনভঙ্গিটুকু প্রশংসার বদলে প্রায় ঠাট্টার মতই শোনালো। চেয়ে দেখি হাসছেন অল্প অল্প। বললেন, আপনার লেখা কিছু পড়িনি, কিন্তু মিসেস চক্রবর্তীর মুখে দৃষ্টিভঙ্গির কথা শুনেই অম্বর দুর্গে আপনার চোখে বায়নাকুলার লাগানোর কথা মনে পড়ছিল।

দুদিনের আলাপে এতটা হৃদ্যতায় অভ্যস্ত নই খুব। কিন্তু সুদূর প্রবাস বলেই বোধ হয় অস্বস্তিও লাগছে না কিছু। অথবা, মহিলার উচ্ছল প্রাচুর্যে সঙ্কোচ হয়ত ধুয়ে মুছে গেছে। হেসে উঠলাম তাঁর সঙ্গে। একটু বাদে প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যই বললাম, প্রোফেসার

গিরি আজ মেজাজ বিগড়ে দিয়েছেন, অমন প্ল্যানটাই মাটি।

খুব ভালো জিনিস হত?

বোধ হয়।...নতুন কিছু হতই।

হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেললেন তিনি।—ফন্দি তো বাতলে দিলেন একজন, দেখুন চেষ্টা করে, লাগলে লাগতেও পারে, জহুরী জহর চেনে।

জয়পুরেরর বাতাসে কি আছে কে জানে! অথবা, এরকম একজন মহিলা সঙ্গে থাকলে হয়ত বা সর্বত্রই বাতাস বদলায়। হলই বা দুদিনের আলাপ, আমি পুরুষমানুষ হয়ে মিথ্যে লজ্জা পেয়ে মরি কেন! বিশেষ করে প্রত্যুত্তরটা প্রায় আমন্ত্রণই করেছেন তিনি। বললাম, তেমন কাউকে সত্যিই আর পাচ্ছি কোথায়! ফন্দিটা বাতলে দিয়ে যদি নিজের ঘর থেকেই ধার দিতেন উনি, চেষ্টা করে দেখা যেত।

হুঁ? গালে টোল খেল। দাঁত দেখা গেল।—ধার পেলে কাজ হয়?

এতেও কাজ না হলে ফন্দিটাই বাজে।

সত্যি বলতে কি, কথার ওপর কথা বলার জন্যই বলা। প্রোফেসার গিরির কাছ থেকে প্রকারান্তরে প্রত্যাখ্যাত হবার খেদটা অবশ্য মিথ্যে নয়। কিন্তু তা'বলে প্রমথ গুপ্তর প্ল্যান একবারও যাচাই করে দেখার কথা ভাবিনি।

মহিলা হাসছেন মৃদু মৃদু। বড় করে নিশ্বাস ফেললেন একটা। বললেন, বেচারি! ওঝার ঘাড়েই শেষে ভূত চাপবে জানলে এমন মতলব দিত না। চলুন তাহলে একদিন, গিরি-অভিযানে নেমে পড়ি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এতবড় উপকারসাধন করতে যাচ্ছি, হলে আপনার লেখায় আমার নাম থাকবে তো?

সেটা উপকারসাধন ছাড়াও থাকতে পারে।

তিনি উৎফুল্ল মুখে বললেন, আচ্ছা, আমি না হয় কাব্যে উপেক্ষিতাই থাকব। কবে যাচ্ছেন? কাল...না কাল হবে না, পরশু?

বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। সঙ্কোচও।—সত্যিই কি আপনি যাবেন ভাবছেন নাকি?

ফিরে তিনিই এবারে ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালেন আমার দিকে। দুই চোখে চাপা কৌতুক। বললেন, ও, এই আপনার সাহিত্যপ্রীতি!... গুপ্তর বুকের ছাতিখানা মনে পড়ে গেল বুঝি? সহাস্যে ভুরু কোঁচকালেন।

আবারও মনে হল বাংলাদেশ নয় এটা। এখানে অনেক কিছুই সহজ। এর পরেও উত্তেজিত না হওয়াটা নিতান্তই পুরষকারের অভাব বলে পরিগণিত হবার কথা। কিন্তু তবু তেমন উত্তেজনা এলো না। জবাব দিলাম, সাহিত্যপ্রীতি ঠিকই আছে, আর গুপ্তর বুকের ছাতির ভাবনাও আমার নয়—কিন্তু সত্যিই ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

মুখটিপে হেসে নীরবে দু'চার পা এগিয়ে তিনি বললেন, খুশিতে আটখানা হবেন না নিশ্চয়, কিন্তু সে ভাবনা যখন আপনার নয়, তখন আপনার ভেবেও কাজ নেই। দাঁড়িয়ে পড়লেন, পরশু সকালের দিকেই ঠিক রইল তাহলে। আপনি আমাকে বাড়ি থেকে...না, একবারে অত সইবে না—হাসলেন একটু, আপনি বাড়ি থাকবেন, আমিই

ডাকব'খন আপনাকে। আচ্ছা, নমস্কার—আমি এখান থেকে আর এক জায়গায় যাব।

একা ফিরছি। ভালো লাগছে না। সত্যি বলতে কি, ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে। সেটা ভয়ের দরুন কি না নিজের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। মিসেস চক্রবর্তীর উক্তি মনে পড়ল, অর্থবান রাজপুত ব্যাচিলাররাও প্রমথ গুপ্তকে সমীহ করে চলে...। তবু ভয় নয়। শুধু মনে হচ্ছে কাজটা ভালো হল না।

কিন্তু আমারই বা করার কি আছে! সূক্ষ্ম দৃষ্টিবোধ যদি একটুখানিও থাকে, তাহলে একথা নিশ্চয় যে শুধু বাংলাসাহিত্য অথবা বাঙালী সাহিত্যিকের প্রতি দরদের আতিশয্যেই অরুন্ধতী গুপ্ত এমন এক অভিনব কাজে অবতীর্ণ হচ্ছেন না। বোধ করি এটা তাঁর স্বভাব। এরকম অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি অরুন্ধতীর মত মেয়েরাই সম্ভবত আকৃষ্ট হয়ে থাকেন।

পরদিন অধ্যাপক এবং অধ্যাপকগৃহিণীর অতিথি হয়ে এলাম তাঁদের বাড়ি। সব শুনে মনে মনে তাঁরা কি ভাবলেন জানিনে। ভদ্রলোকটি মুচকি হেসে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রসিকতা করলেন, সাহিত্যিকরা মরুভূমির দেশে এসেও কেমন ফুল কুড়োয় দেখো।

জবাবে মহিলাটিও সরস এবং সূক্ষ্ম মন্তব্য করলেন। সায় দিয়ে বললেন, সত্যি...কিন্তু শেষে কাঁটাই না শুধু বেঁধে।

নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে অরুন্ধতী গুপ্ত এলেন। মাঝখানে একদিনের অবকাশে তাঁর আসার সম্ভাবনা বাতিল করেছিলাম প্রায়। কিন্তু মন থেকে করিনি, বুদ্ধি দিয়ে করেছিলাম বোধ হয়। অন্তঃস্তলের কারিগরী অস্বীকার করব না। অস্বস্তি থাক বা না থাক, মনে মনে আমি উদগ্রীব হয়েই প্রতীক্ষা করছিলাম। গৃহস্বামীর এবং গৃহস্বামিনীর সকৌতুক হাবভাব প্রায় চোখ বুজে এড়িয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে টাঙায় গিয়ে উঠলাম।

দু'জনে দুটো আসন নিয়েছি। চেষ্টা করেও মহিলা অধর প্রান্তের হাসির আভাসটুকু মুছে ফেলতে পারছেন না লক্ষ্য করছি। কিছু পথ এগোবার পর তিনি উঠে পাশে এসে বসলেন। পরে হেসেই ফেললন। বললেন, একা বসতে ফাঁকা ফাঁকা লাগে—।

বলতে পারলে বলতাম, এসব আমার ওপর কেন, প্রোফেসার গিরির জন্য স্থগিত থাক না। সেদিনের সেই আবছা আলোর রাত্রি হলে বলা যেত। এ একেবারে কড়কড়ে দিন।

তারপর, সুপরিচিতার মত হালকা বাকবিনিময়ে অগ্রসর হলেন তিনি, শুভকাজে বেরিয়েছেন, সিদ্ধিদাতা গণেশটণেশ স্মরণ করেছেন তো?

এখনো করছি।

করুন, গিরি-পাহাড়-পর্বত টলানো অত সহজ নয়।

ওই জন্যই তো অস্ত্র নিলুম সঙ্গে।

আপনি আর নিলেন কই, অস্ত্র তো সেধে এলো আপনার কাছে। কলকণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি।

যথাস্থানে পৌঁছে চাকরের মারফত প্রোফেসার গিরিকে খবর পাঠানো হল। একটু বাদে শিল্পী এলেন।

যথার্থ শিল্পীমূর্তি। উসকো-খুসকো, কিন্তু রুক্ষ নয়। আমার মনে হয়, ভদ্রলোকের সুনাম এবং পরিচিতির পিছনে এ ধরনের চেহারাও খানিকটা কাজ করেছে।

সবিনয়ে আমাদের বসতে বললেন। মিসেস গুপ্তর পরিচয় দিলাম। তিনি জবাব দিলেন, এঁকে আমি চিনি, আলাপ ছিল না অবশ্য।

অতঃপর মিসেস গুপ্ত আমার হিন্দির দৌড় বুঝেই বোধ হয় এক ঝলক হেসে আসল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন। আর, পাঁচ মিনিট না যেতেই আমি নিঃসংশয়ে বুঝলাম, প্রমথ গুপ্ত অত্যুক্তি করেননি। আজ আর নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে না।

টগবগিয়ে হিন্দি বলেন অরুন্ধতী গুপ্ত। ভূমিকাস্বরূপ প্রথমেই সেদিনের জলসায় শিল্পীর অপূর্ব গাথা-বিন্যাসের স্তুতি এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। বার বার তাঁর গালে টোল খেল, বারবার দাঁত দেখা যেতে লাগল।

মুগ্ধচোখে শিল্পী ভক্তের স্তুতি আস্বাদন করতে লাগলেন।

শেষে কাজের কথা।—ভারতের এত বড় ঐতিহ্য-সম্পদ এই ছোট পরিসরে আবদ্ধ হয়ে থাকলে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবেই সেটা। নানা ভাষায় দেশের সর্বত্র এই গৌরবের জিনিস ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এর থেকে হয়ত বা নতুন একটা লিটারেচার সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই এভাবে এ জিনিস কিছুতে নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। এর প্রধান সৃষ্টিকার হবেন প্রোফেসার গিরি। আর, রচনাগুলি ভাষান্তরিত হলেও তাতে সৃষ্টিকারের অংশ নির্দিষ্ট থাকবে।

আমি নির্বাক শ্রোতা।

অরুন্ধতী গুপ্ত প্রোফেসার গিরির অন্তরের সুপ্ত শিল্পীটিকে এক ঘায়ে জাগিয়ে দিলেন যেন। সাগ্রহে তিনিও পরিকল্পনার সুবর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনার সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন।

আশাসঞ্চারী উদ্দীপনা। এ খাতা এলো, সে খাতা এলো। শিল্পী তাঁর সেই দানাবাঁধা ঝঙ্কারভরা গলায় এক একটা কাব্য-দৃষ্টান্ত শোনাতে লাগলেন আমাদের। চায়ের পেয়ালা হাতে আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে।

শেষে ঠিক হল, সপ্তাহে একদিন হোক দুদিন হোক, আমি এসে জিনিসগুলো বুঝে নোট করে নিয়ে যাব। প্রোফেসার গিরি স্বয়ং চেষ্টা করবেন হারানো সব রাজপুত গাথা পুনরুদ্ধার করতে। নতুন গাথাও তৈরি করা হবে ওই থেকে।

কিন্তু একটা শর্ত করলেন তিনি। মিসেস গুপ্তকেও সঙ্গে আসতেই হবে, বিশেষ করে বাংলা হিন্দি দুইই যখন এত ভালো জানেন তিনি। নইলে জিনিসগুলা সমস্ত অনুভূতি দিয়ে ঠিক ঠিক বুঝে নেব কি করে আমি ? আমি, অর্থাৎ, এই বাঙালি আমি। সহাস্যে এবং নির্বিকার বক্তব্য সম্পন্ন করলেন শিল্পী, আমাদের মধ্যে দো-ভাষিণীর কাজ করবেন উনি, আর ইন্‌সপিরেশান যোগাবেন।

শুভ কাজের একটা দিন ঠিক করে আমরা গাত্রোত্থান করলাম।

আবার সেই টাঙা। মহিলা হাসছেন নিঃশব্দে। জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ হবে মনে হচ্ছে ?

বললাম, সে তো এখনো আপনার ওপরেই নির্ভর করছে দেখছি—।

তাহলে করবেন নির্ভর। ভদ্রলোক সত্যি গুণী, তাই না?

স্বীকার করলাম, সত্যি—।

তিনি বললেন, বার বার আপনাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনতে পারব না। এবার দিন আপনি আমাকে বাড়ি থেকে তুলে নেবেন।... প্রথম দু'চারদিন যাব'খন, তারপর আর আমাকে দরকার হবে না।

মনে মনে বলি, আমার দরকার প্রথম থেকেই নেই, কিন্তু অন্য লোকটির দরকার ক্রমশ না বাড়ে। বাড়ি থেকে তাঁকে তুলে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে শঙ্কিত হলাম। বললাম, আপনাকে কষ্ট করে বার বার বাড়ি থেকে আমায় ডেকে নিতে বলব না নিশ্চয়, কিন্তু আপনার ওখানে আমার গিয়ে হানা দেওয়াটা ঠিক হবে কী? মিঃ গুপ্ত হয়ত পছন্দ করবেন না...।

জবাবে তিনি হাসলেন একটু।—মিঃ গুপ্তকে আপনার ভারি ভয়, না?

এবারে আমিও হালকাভাবেই বললাম, ভয় না তো কি, ইচ্ছে করলে তো ভদ্রলোক তুলে আছড়ে দিতে পারেন।

উনিও তেমনি সায় দিলেন, তা পারেন। তবে আপনাকে তিনি শত্রু বলে গণ্য করবেন না, নেহাত গোবেচারি ভালোমানুষ আপনি, সেটা দুদিনেই বুঝে নিয়েছেন।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের মত শোনালো। হাসতে হল তবু।—ঠাট্টা করছেন বোধ হয়?

আবার সেই দাঁত দেখা গেল, গালে টোল খেল।—বাঃ, ঠাট্টা কোথায়, প্রশংসা করলাম তো! ভালোমানুষ নন?

অগত্যা ভালোমানুষের মতই রাস্তা দেখতে লাগলাম। জয়পুরের পথের বাহার তো দেখবার মতই সাজানো, সুন্দর। কিন্তু আসলে কিছু একটা ভাবনা বিমনা করে তুলছে থেকে থেকে। অসংলগ্ন ভাবনা।

এর পরের দিন প্রোফেসার গিরি সময় অপচয় না করে সাগ্রহে সত্যিই একেবারে কাজ নিয়ে বসলেন। পূর্ব ব্যবস্থা মত মিসেস গুপ্তকে আমি তাঁর বাড়ি থেকেই ডেকে নিয়েছি। প্রমথ গুপ্ত বাড়ি ছিলেন না। কাজের মানুষ, সকালে বাড়ি থাকেনও না বড় শুনলাম। লজ্জার কথা, শুনে মনটা হালকা হয়েছিল।

গিরি সন্নিধানে এসে অরুন্ধতী সে দিন কথাবার্তা বড় একটা বলেন নি। চুপচাপ বসে শিল্পীর হাবভাব, উচ্ছ্বাস, চলন বলন লক্ষ্য করেছেন।

অনেক উৎসাহ নিয়ে ফিরলাম সেদিন। মনে মনে ভাবছি, জয়পুরে যদি বেশি দিন থাকতে হয় তাহলে থাকার অন্য কোনো ব্যবস্থা করা উচিত কি না।

প্রমথ সপ্তাহে দুদিন গেলাম শিল্পীর কাছে।

পরের সপ্তাহে তিন দিন। শিল্পীর দেখলাম রোজ গেলেও আপত্তি নেই।

কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, শেষের দিকে কাজের গতিতে যেন ছেদ পড়ছে। অরুন্ধতী মাঝে মাঝে বাজে কথা বলা শুরু করেছেন। আর প্রোফেসার গিরিও মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।

হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই উষ্ণ হয়ে উঠছিলাম একটু। আমি দেখছি, শিল্পীর ভিতরে

সোনা আছে। ইচ্ছে করে তাতে খাদ মেশাতে দেখলে রাগ হবারই কথা। আমার তাড়া খেয়ে এক একদিন দুজনেই তাঁরা হাসতে থাকেন। গিরি ঠাট্টা করেন, অল্ ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে মেক্স জ্যাক এ ডাল্ বয়, মাই ডিয়ার!

অরুন্ধতীকে ডাকতে গিয়ে প্রমথ গুপ্তর সঙ্গেও দেখা হয়ে গেছে এক আধ দিন। নীরবেই তিনি লক্ষ্য করেছেন আমাকে। সাদর অভ্যর্থনাও জানান নি কখনো, আবার চোখও রাঙান নি। কিন্তু তবু ভদ্রলোকের মুখোমুখি পড়ে গেলে কেমন খারাপ লাগত।

এরপর একাই একদিন যেতে হল শিল্পীসকাশে। অরুন্ধতী আসতে পারলেন না। অথবা ইচ্ছে করেই এলেন না।

প্রোফেসার গিরির ভিতরটা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হল সেদিন।

উদগ্রীব হয়ে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন প্রথম। নিয়মিত আলোচনা শুরু হল তারপর। কিন্তু জমল না। দু'চার কথা বলেই হাই তুলে গা মোড়ামুড়ি দিতে লাগলেন। শেষে বলেই ফেললেন, আজ শরীরটা তেমন ভালো লাগছে না, অন্যদিন হবে।

আরো একাধিক বার হল এরকম। ওদিকে অরুন্ধতীও তাঁর বাড়িতে একদিন ছদ্ম কোপে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, আমার আর কাজ নেই, আপনাদের কাব্য নিয়ে থাকলেই চলবে?

মনে মনে ভাবি আমার কাব্যের তো বারোটা বেজে এসেছে, তোমাদের কোন কাব্য শুরু হয়েছে কে জানে! কিন্তু জবাবে আমিও প্রায় চোখ রাঙালাম, কি করব, বিদ্যাপতির যে ওদিকে রানী লছিমাকে না দেখলে কাব্য ঝরে না!

লছিমাস্বরূপিণী মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

এরপরে অন্যরকম বৈচিত্র্যও দেখা যেতে লাগলো মধ্যে মধ্যে। বাড়িতে ওঁর সাক্ষাৎ না পেয়ে বিরস বদনে গিরিধামে এসে দেখি, উনি আগের ভাগেই এসে বসে আছেন। আমায় দেখে দুজনারই খুব হাসি। যেন ভারি মজার কিছু হয়েছে।

প্রায় হাল ছাড়তে হল শেষে। ভাবছিলাম এবারে কলকাতায় পাড়ি দেব কি না। মাঝে পাঁচ ছদিন জ্বরে ভুগে উঠলাম। এর মধ্যে অরুন্ধতী একবারও খোঁজ দিতে এলেন না বলে মনে মনে চটেছি। সেদিন বেশ সকাল সকাল খাতাপত্র বগলে করে গুপ্তগৃহে পদার্পণ করলাম। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে গিরির কাছে যাব।

অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা হল না।

প্রমথ গুপ্তর সঙ্গে দেখা হল।

কিন্তু ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে ভড়কে গেলাম। যেন ভাবলেশহীন নিরেট একখানি পাথরের মূর্তির মধ্যে জীবন্ত দুটো চোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। কোনো কথার জবাব দিলেন না। শুধু ফিরে ফিরে দেখতে লাগলেন আমায়।

বসুন।

নিজের অজ্ঞাতেই বসে পড়লাম।

আপনার সঙ্গে ক'দিন দেখা হয় নি তাঁর ?

এ ধরনের, বিশেষ করে এই কণ্ঠের জেরায় অপমানিত বোধ করার কথা। কিন্তু তার বদলে ঘেমে উঠছি প্রায়। জবাব দিলাম, প্রায় এক সপ্তাহ...হঠাৎ জ্বর হয়ে বিছানায় পড়েছিলাম। কিন্তু কি ব্যাপার?

সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বিশ্বাস হল বোধ হয়। হঠাৎ আত্মস্থ হলেন যেন। চোখ দুটো শান্ত হল। বললেন, উনি এখানে নেই...বাইরে, মানে কলকাতায় গেছেন...।

কলকাতায়! হঠাৎ? কবে ফিরবেন?

ঠিক নেই। উঠে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশলগ্ন পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলেন।

বিমূঢ় মুখে প্রত্যাবর্তন করলাম সেখান থেকে। কিন্তু প্রোফেসার গিরির বাড়ির সামনে আসতেই ব্যাপারটা একমুহূর্তে জলের মত সোজা হয়ে গেল।

বাইরের দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে।

আশেপাশে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ফিরে এলাম। সেই থেকে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, আমি উপলক্ষ মাত্র। ওই মহিলাটিকে প্রমথ গুপ্ত শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারতেন না কিছুতে। একদিন না একদিন উনি যেতেনই।

অবিলম্বে কলকাতায় ফেরা মনস্থ করলাম।

একটানা তিন চার বছর কেটে গেছে এর পরে। জয়পুর প্রসঙ্গ প্রায় ভুলতে বসেছি। কিন্তু আবার যবনিকা উঠল।

কি একটা কাজে দিল্লি এসেছি সেবার। কোনো পরিচিত জনের কাছ থেকে একটা জলসার নেমন্তন্ন পত্র পেলাম। মাঝে আরো বার দুই তিন এসেছি এখানে। কিন্তু এরকম যোগাযোগ কখনো কল্পনা করি নি। সম্ভাব্য শিল্পী সমাবেশের মধ্যে পৌরাণিক রাজপুতকাব্য গাথাকার প্রোফেসার গিরির নামটি দেখে চমকে উঠলাম।

দুর্নিবার আগ্রহ নিয়ে উৎসব স্থলে উপস্থিত হলাম। একেবারে প্রথম সারির দু'খানি আসনে পাশাপাশি বসে আছেন প্রেফেসার গিরি এবং অরুন্ধতী।

তখনই শুরু হবে উৎসব। তাঁদের অনেকটা পিছনে আমার আসন। জায়গায় বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।...জলসার পরে দেখা করাই ভালো।

যথাসময়ে আহ্বান আসতে প্রোফেসার গিরি মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। এখানে তাঁর সেই পরিচিতি নেই, কাজেই গোড়তে তেমন হাততালি জুটল না। ভাবলাম শেষে জুটবে। উদগ্রীব নেত্রে দেখছি তাঁকে। সেই কাঁচা লালিত্যের ওপর কেমন একটা বিষাদের ছাপ পড়ে গেছে। বয়েসও যেন অনেকটাই বেড়েছে। সেই রকম ঢোলা পা'জামা এবং পাঞ্জাবির ওপরেই গায়ে একটা সিল্কের চাদর জড়নো। ঝকঝকে আলোয় চাদরটা ময়লা হয়েছে বোঝা যায়।

কাহিনী শুরু করলেন। নতুন একটা কাহিনী। অন্য সকলের কেমন লাগছে জানিনে। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। আমি যা শুনেছি সে আমার কানে লেগে আছে এখনো। সেই হাত পা ছোঁড়া নেই, সেই দাপাদাপি নেই, সেই উদ্দাম প্রাচুর্যও নেই। আড়ষ্ট ভাব। শুধু কণ্ঠস্বর দিয়ে যতটুকু হয়, ততটুকু।

ভাবলাম, ভদ্রলোক বোধ হয় অসুস্থ, নইলে চাদরটা অন্তত গা থেকে খুলতেন।

কাহিনী শেষ হয়ে আসছে দেখে আমার অমন্ত্রণকারী পাশের ভদ্রলোককে বললাম, এরপরে 'হাত' কাব্যগাথার জন্যে যেন অনুরোধ করেন, এ কিছুই হল না,. ওরকম অপরূপ গাথা কেউ কোথাও শোনে নি, আমি নিজের কানে শুনেছি সেই গাথা, ইত্যাদি।

শেষ হতে ভদ্রলোক যথাযথ উঠে দাঁড়ালেন এবং 'হাত' কাব্যগাথা শোনাতে অনুরোধ করলেন।

প্রোফেসার গিরির দৃষ্টি এদিকে সন্নিবদ্ধ হল। এতদূর থেকে আমাকে দেখলেন কিনা বোঝা গেল না। ওদিকে সামনের আসন থেকে অরুন্ধতী প্রায় ঘুরে বসেছেন। তাঁর চোখ এড়িয়েছি বলে মনে হল না।

প্রোফেসার গিরি মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে অসুস্থাতার দরুন অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। সবিনয়ে মার্জনা চেয়ে মাথা দুলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে অরুন্ধতীও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়লেন। মনে হল হাত তুলে আমাকে ইশারা করলেন বাইরে আসতে। দর্শকদের সকৌতুক দৃষ্টি পেরিয়ে বাইরে এলাম।

আমায় দেখেই একগাল হাসি অরুন্ধতীর। গালে তেমনি টোল খেল। ঝকঝকে দাঁত তেমনি ঝকমকিয়ে উঠল। বললেন,কি কাণ্ড ! ভাগ্যিস পিছন ফিরে চেয়েছিলাম ! কেমন আছ ? কোথায় আছ ?

অকস্মাৎ এই অন্তরঙ্গ 'তুমি'টুকু কি জানি কেন কানে তেমন মধুবর্ষণ করল না। বললাম ভালো। তোমরা— ?

তিনি মুচকি হাসলেন একটু।—কেমন দেখছ ?

দেখলে দেখার মত নেই কিছু এখনো এমন নয়। হেসেই জবাব দিলাম, তোমাকে একরকমই দেখছি বটে। কিন্তু গিরি বদলেছেন।

অরুন্ধতীর মুখ থেকে হাসি মিলেয়ে যেতে লাগল। বললেন, বদলাবে না....বেচারী।

বোধগম্য হল না ঠিক। চেয়ে আছি। অরুন্ধতীরও সাজপোশাকে তেমন আতিশয্য নেই আগের মত। প্রায় শাদাসিধে বেশবাস। বেচারী শুনে আর্থিক দিকটার কথাই মনে হল প্রথম।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পাশ থেকে 'হাত' গাথার জন্য উসকে দিয়েছিল কে, তুমি— ?

ঘাড় নাড়লাম, আমিই বটে।

আরো একটু গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, এভাবে ওঁকে অপ্রস্তুত না করলেই পারতে।

অপ্রস্তুত !

আমার বিস্ময় দেখেই অরুন্ধতীর কিছু খেয়াল হল বোধ হয়। বললেন, ও তুমি জানো না বুঝি ? জানবেই বা কি করে।... গুপ্তমশাই ওর হাত দুটো দুমড়ে মুচড়ে একেবারে জন্মের মত ভেঙে দিয়েছে।

আমি নির্বাক, বিমূঢ়। কতক্ষণ চেয়েছিলাম তাঁর দিকে খেয়াল নেই। আত্মস্থ হলাম। বলেই ফেললাম, তাঁর সব রাগ গিরির ওপরেই গিয়ে পড়ল বুঝি ?

মুখ টিপে হাসলেন, তাই তো পড়ল।

গালে টোল খেল। দাঁত দেখা গেল।

রুষ্ট শ্লেষে বলে উঠলাম, তা তুমি গিরিকে এখনো আঁকড়ে আছ যে বড়, তোমার তো সবই আছে দেখছি?

জবাবে এবারে বেশ জোরেই হেসে উঠলেন তিনি। পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সব কি আছে দেখছ?

চুপ করে আছি। কানের কাছটা উষ্ণ ঠেকছে কেমন।

একটু থেমে তেমনি হাল্‌কা করেই আবার বললেন তিনি, আঁকড়ে না থেকে করি কি, গুপ্ত এভাবে ওর হাতদুটো নষ্ট করে একেবারে আটকে ফেললে যে আমাকে।

বলতে বলতে চঞ্চল হয়ে উঠলেন একটু। সন্ধিৎসু চোখে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের দিকে ফিরে তাকালেন।—না, এবারে যাই, এতক্ষণ না দেখে চারদিক অন্ধকার দেখছেন হয়ত। তুমি দেখা করবে নাকি? আমরা এক্ষুনি চলে যাব কিন্তু—

মাথা নেড়ে কিছু একটা জবাব দিয়েছি বোধ হয়। অরুন্ধতী লঘু পায়ে অদৃশ্য হলেন।

আমি দাঁড়িয়েই আছি।

অম্বর দুর্গে, জয়পুরের রাস্তায় আর টাঙায়, প্রমথ গুপ্তর বাড়িতে আর প্রোফেসার গিরির ঘরে যে অরুন্ধতীকে দেখেছিলাম, এঁর সঙ্গে তাঁর এখনো অনেক মিল।...আর সেই সঙ্গে অনেক অমিলও।

কমলিনী

গণেশবাবুর বাঁ হাতে দু'শ টাকা আর ডান হাতে দু'মাসের আগাম ভাড়া গুঁজে দিয়েই প্রকাণ্ড একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। পাঁচ ভাড়টের সঙ্গে ওই খাপছাড়া একটা বাড়িতে এসে বাস করা পোষাবে কি না একবারও ভেবে দেখি নি। আধখানা খুপরি ঘরে চারজনে থাকার যাতনা যে থেকেছে সেই জানে। এখানে তেমন বড় না হোক মাঝারি গোছের দু'খানা ঘর পাচ্ছি। আলাদা একটু বাথরুম আর রান্নার জায়গাও। যেখানে আছি আর তুলনায় গড়ের মাঠ। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে পাওয়া গেছে। তিনজন পরিচিত লোকের চিঠি দাখিল করতে হয়েছে, সঙ্গে নিজের তিন পুরুষের ফিরিস্তিও। তবে বাড়ি পাওয়ার ব্যাপারে আমার খবরে কাগজের আপিসের চাকরিটাই হয়ত অনুকূল হয়েছিল সব থেকে বেশি। গণেশবাবু দ্রবীভূত হয়েছেন তাইতেই। ভেবেছিলেন, ভেবেছিলেন কেন, ধরেই নিয়েছিলেন আখেরে কাজে লাগবে। সেটা পরে বুঝেছি। পরে নয়, পরদিনই।

গণেশবাবুর সঙ্গে ডান হাত বাঁ হাতের বোঝাপড়াটা শেষ করেই নতুন আবাসের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম। আপিস ছুটির পর আর ছুটির দিনে ঠাঁই খুঁজতে বেরুতে হবে না, সেই স্বস্তিটুকু তখন আস্বাদন করার মতই। সম্ভব হলে সেদিনই এসে

উঠি। আজ হলে কাল করতে নেই। কিন্তু সব ঠিকঠাক করে উঠে আসতে দু'টো দিন সময় লাগবেই।

দূর থেকে শ্যামাপদকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। তার কাছে চাবি। এ বাড়ির কেয়ারটেকার শ্যামাপদ। আর, ভাড়াটেদের বাজার সরকার। শুধু বাজার সরকার কেন, বাড়ির ব্যাপার ছাড়া আর সব ব্যাপারেই সে ভাড়াটেদের লোক। যার যার ফর্দ নিয়ে ঝরঝরে এক সাইকেলে চেপে রোজ বাজার করে আনে, অন্যান্য ফাই ফরমাশও খাটে। এজন্য প্রত্যেক ভাড়াটের কাছ থেকে মাসে তিন টাকা বরাদ্দ তার। না দিতে চাও দিও না, বিশ্বাস করতে মন না চায় কোরো না—আড়াই মাইল ঠেঙিয়ে নিজেই করো না রোজ হাটবাজার—ক'দিন করবে। এসব কথা আগের দিন ঘর দেখাতে দেখাতে শ্যামাপদ নিজেই জানিয়েছে। আরো বলেছে।...এই তিন টাকা এবার চার টাকা করে নেবে। কারণ, নতুন সাইকেল এবারে একটা না কিনলেই নয়। ওই পুরনো সাইকেল তার প্যাঁকাটির মত দেহের ভারও আর সইতে পারছে না। তা বছর তিনেক ধরে চেষ্টা করেও একটা নতুন সাইকেলের অর্ধেক দামও এ পর্যন্ত জমাতে পারল না। অতএব বরাদ্দটা চার টাকায় না চড়িয়ে আর উপায় কি। বাবুদের সুবিধের জন্যেই তো, ইত্যাদি—

সরাসরি বাড়িতে ঢোকা হল না। সামনের বাঁধানো দাওয়ায় তিনজন ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন। শ্যামাপদর সঙ্গে কথা বলতে দেখে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন তাঁরা। শ্যামাপদ জানালে, এ বাড়িরই ভাড়াটে ওঁরা।

সমবয়সী না হলেও তিজনই প্রৌঢ়। একজন হাঁক দিলেন, ও শ্যামাপদ, ইনিই নতুন এলেন নাকি গো ?

নিজের থেকেই এগিয়ে গেলাম। আলাপ পরিচয় করা দরকার। নমস্কার জানিয়ে সবিনয়ে বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের আশ্রয়ে আসছি।

আর এক প্রস্থ খুঁটিয়ে দেখা হল আমাকে। পরে ওই ভদ্রলোকটিই সশব্দে হেসে উঠলেন প্রথম। রঙচটা চ্যাপটা একটা জার্মান সিলভারের পানের ডিবে থেকে একসঙ্গে গুটি তিনেক পান মুখে পুরে সঙ্গীদের দিকে চেয়ে গাল ফুলিয়ে হাসতে লাগলেন আবারো।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বড়সড় একটা শামুকের নস্যিদানি থেকে বাঁ হাতে একগাদা নস্যি ঢেলে ডান হাতের দু' আঙুলে করে যতটা সম্ভব দুই নাসিকার দুর্গমে চালান করে দিয়ে হাস্যবদন-সজল-চোখে আমার দিকে চেয়ে গলা দিয়ে ঘড়ঘড় শব্দ বার করলেন একটা।

আর, তৃতীয় ভদ্রলোক বুক পকেট থেকে সস্তা সিল্কের নকশা করা রুমাল বার করে ঘাড় মুখ মার্জনা করলেন বারকতক। রুমালের ঘষায় আর চাপা হাসিতে তাঁর বিরক্তিকর রকমের ফর্সা মুখ টুকটুকে লাল হয়ে উঠল।

আমি হতভম্ব। এ ধরনের অভ্যর্থনা কে আর প্রত্যাশা করে !

পানের ডিবেই বাকস্ফূরণ করলেন আবার।—তা বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন—মশাই আশ্রয়ের কথাটা বলতে একটু ইয়ে হয়ে গেল—একটুখানি আশ্রয়ের খোঁজে বছরের পর বছর নিজেরাই হন্যে হয়ে গেলাম কিনা।

কিছু জিজ্ঞসা করার আগেই শামুকের নস্যিদানি প্রশ্ন ছুঁড়লেন, মশাইয়ের কোন পাড়া ছেড়ে এখানে আসা হচ্ছে ?

বললাম। বললাম, একখানা খুপরি ঘরে কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকতে হয় সেখানে, বেজায় অসুবিধে।

প্রায় কথা কেড়ে নিয়েই নকশা-রুমাল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি চলে এলে সে ঘর তো খালি হবে ? ওটা পাওয়া যায় ? দিতে পারেন ব্যবস্থা করে ?

বাকনিঃসরণ হল না। মাথা নেড়ে জানালাম আমার কোনো হাত নেই।

শ্যামাপদ অদূরে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে।

পানের ডিবে বললেন, যাক আসছেনই যখন ওঁকে আর ঘাবড়ে দিয়ে লাভ কি। ওখানে অসুবিধে হচ্ছিল, এখানে সুবিধে হলেও হতে পারে...বয়েস কম...আমাদের মত দিন গোনার বয়েস তো আর নয়...নিন পান খান...খান না ? বেশ বেশ, তা সবসুদ্ধু, ক'জন আসছেন এখানে ?

চারজন।

আপনি, পরিবার আর ছেলেপুলে ?

আজ্ঞে না, আমি আর ছোট তিনটি ভাই।

শোনামাত্র আবার হাওয়া পরিবর্তন হল। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে তিনজনেই গম্ভীর হলেন। কিছু একটা চিন্তার কারণ ঘটল যেন। রকম-সকম দেখে ঘাবড়েই গেছি। এবারে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, কিন্তু সুবিধে অসুবিধের কথা কি বলছিলেন আপনারা— ?

জবাবে ওই ভদ্রলোকটি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনার এখানে আসাটা একেবারে স্থির তো ?

মাথা নাড়লাম, স্থিরই বটে।

তা'হলে সে কথা তুলে আর লাভ কি, দেখতেই পাবেন। তা'ছাড়া বললাম তো অসুবিধে যে সকলেরই হবে তার কি মানে আছে...অসুবিধে নাও হতে পারে, ওহে শ্যামাপদ, আকাশের কাব্যি রেখে বাবুকে ঘর-দোর দেখাওগে না ভালো করে—।

শ্যামাপদর সঙ্গে বাড়ির ভিতর ঢুকলাম। চিন্তিত মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, শ্যামাপদ কি ব্যাপার বলো তো ?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে শ্যামাপদ জবাব দিল, কি আর..আসছেন যখন এসেই পড়ুন না।

বিরক্তিকর। অসহিষ্ণু হয়েই বললাম এবার, আ-হা বলোই না শুনি—বাবুরা অসুবিধে-টুবিধের কথা কি বলছিলেন ?

আঙুল দিয়ে শ্যামাপদ দোতলার একটা দিক দেখিয়ে দিল।—ওই উদিক্‌টায় এক দিদিমণি থাকেন—তেনার কথাই বলছিলেন ওনারা।

থমকে গেলাম।—দিদিমণি।...তা দিদিমণি থাকেন তো কি হয়েছে ?

শ্যামাপদ বলল, দিদিমণি এ বাড়িতে থাকলে ওনাদের তিন জনেরই একটু একটু

অসুবিধে হয়।

খুব যেন প্রাঞ্জল ঠেকল না। কিন্তু শ্যামাপদর মুখের দিকে চেয়ে মন বোঝা শক্ত। অতঃপর জেরা করে যেটুকু বেরুলো তাতেই চক্ষুস্থির।

...দিদিমণির সঙ্গে আর কে থাকেন? তার বুড়ি মা। না আর কেউ না।

কি করেন? চাকরিবাকরি করেন নিশ্চয়ই। রোজই তো দুপুরে বেরিয়ে রাত্তিরে ফেরেন।

কতকাল আছেন? অনেক কাল। যাঁরা আছেন এখানে, দিদিমণিই সক্কলের পুরনো।

আর কি করেন? কি আর করবেন, তবে যতক্ষণ বাড়ি থাকেন, গান বাজনা করেন। একটু তরল গান বাজনা আর কি। হ্যাঁ বাড়িতে লোকজনও আছে—মেয়ে, পুরুষ—গান বাজনা তখন একটু বেশি হয় বইকি—হাসাহাসি হৈ-হুল্লোড়ও—তা উঠতে বসতে সারাক্ষণই হাসতে পারেন দিদিমণি—গানের মাঝেও হা হা করে হেসে নিয়ে আবার গান মিলিয়ে দিতে পারেন।

কেউ কিছু বলে কি না? বলে আবার না—সারাক্ষণই বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে—কিন্তু দিদিমণি থোড়াই কেয়ার করে এ বাড়ির কাউকে—!

বাসা পাওয়ার নিশ্চিন্ত আনন্দটুকু গেল। ছোট ছোট তিনটে ভাই...ইস্কুল কলেজে পড়ছে...বাড়ির আবহাওয়া এরকম হলে তো খাসা। শ্যামাপদ যে ভাবে বলল, সমস্যাটা তার থেকেও গুরুতর নিশ্চয়, ভাড়াটে ভদ্রলোকদের হাবভাব বাচন-বচনেই সেটা সুস্পষ্ট। আগে এঁদের কাছে ভালো করে খবর বার্তা নিইনি বলে নিজের গালেই গোটাকতক চড় কষালাম মনে মনে। শ্যামাপদকে ব্যবস্থাপত্রের কথা কিছু না বলেই ফিরে চললাম।

বাড়িওলাকে ধরে-পড়ে টাকা কটা ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে কেমন হয়? সে আশায় বালি। বুড়ো মহা ঘোড়েল। জেরায় জেরায় জর্জরিত করে ছেড়েছে দু'দিন, অথচ নিজের বাড়িতে কোনো মেয়ে ভাড়াটে আছে এ-কথাটা পর্যন্ত জানতে দেয় নি। কিন্তু নতুন আস্তানার সন্ধান পেয়ে বর্তমান বাসস্থানের অসুবিধেও যেন চতুর্গুণ হয়ে চোখে ঠেকছে। কি হবে আর বাড়িওলার বাড়ি দৌড়ে, হাতের মুঠোয় অতগুলো টাকা পেয়ে আর ছাড়ে! কপাল ঠুকে গিয়ে ওঠা তো যাক, তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু পরদিন সকালেই আবার এক বিস্ময়। বাইরে কে ডাকছে শুনে এসে দেখি স্বয়ং গণেশ ঘোষ। টাকাটা ফেরত পাওয়া যায় কি না ভাবছিলাম। কিন্তু গণেশবাবু টাকা একেবারে সঙ্গে করে নিয়েই এসেছেন ফেরত দেবার জন্য। ভণিতা বাদ দিয়ে যা বললেন তার মর্ম, কোন বিশেষ কারণে ঘর দু'খানা ভাড়া দেওয়া সম্ভব হল না, অতএব...।

তাঁর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলাম খানিক। সবই গোলমেলে ঠেকছে। জিজ্ঞাসা করলাম, বিশেষ কারণটা কি?

গণেশবাবু জবাব দিলেন, কারণ শুনে আর কি হবে মশাই, ঘর এখন ভাড়া দেব না, আপনার টাকা নিয়ে রিসিটখানা আমায় ফেরত দিন—।

ব্যাপার বিশেষ কিছু একটা ঘটেইছে। নইলে এমন হবে কেন গম্ভীরমুখো জবাব

দিলাম, টাকা তো ফেরত নেব বলে দিই নি আর আপনার রিসিটও ফেরত দেব বলে নিই নি। ফেরত দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা তাহলে কোর্টেই ঠিক হবে, আমি আজই ওখানে গিয়ে উঠব ঠিক করেছি।...আর আপনাদের এ জুলুম আমি কাগজেও তুলে দেব।

কাগজ সম্বন্ধে গণেশবাবুর দুর্বলতা আগের দিন ঠিকই আঁচ করেছিলাম। ওষুধ ধরল। গলার সুর পাল্টে ফেললেন গণেশবাবু। —সে কি মশাই। আপনাকে তো আমি খুব মানে—ইয়ে লোক ভেবেছিলাম। আর আপনি কিনা উল্টে আমায় কোর্ট দেখিয়ে দিলেন।

তেমনি গম্ভীর মুখেই জবাব দিলাম, নিরুপায় হয়েই বলছি, দেখছেন তো কি অবস্থায় আছি, আপনি এলেন আপনাকে বসতে পর্যন্ত দিতে পারছিনে। কিন্তু এই একদিনেই কি হল বলুন দেখি?

আর কড়া মেজাজের ধার দিয়েও গেলেন না গণেশবাবু। একটু নিরালায় টেনে নিয়ে গিয়ে গলা খাটো করে বললেন, হবে আর কি, আপনি ছেলেমানুষ, আপনার ভালোর জন্যেই বলছি মশাই। শ্যামাপদর মুখে কাল ওই মেয়েটার কথা শুনেছেন না? একেবারে নষ্টমেয়ে মশাই। সক্কলের হাড়-মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে—গিয়ে দু'দিনও টিকতে পারবেন না।

কিন্তু কাল তো একথা বলেন নি?

গণেশবাবু আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, ভেবেছিলাম ইয়ে —আপনাদের পাঁচজনের চেষ্টায় মেয়েটাকে তুলতে চেষ্টা করা যাবে—

এখন অন্যরকম ভাবছেন কেন?

গণেশবাবু হাল ছেড়ে দিলেন প্রায়। বললেন, আসল কথাটা তাহলে শুনুন মশাই। সত্যি আপনার ওই কাগজ দেখিয়ে এবার মেয়েটাকে তুলতে চেষ্টা করব ভেবেছিলাম। তা এনারা যে বাদ সাধলেন। ওই মানে আর ভাড়াটেরা—অবনী ঘোষাল, দ্বিজেন ভশচায আর দুলাল মিত্তির। কাল রাত্তিরেই সশরীরে সব আমার বাড়ি এসে হাজির। এমনিতেই তো ওঁরা মেয়েটার জ্বালায় দিনরাত অস্থির—তার ওপর আবার ক'টি ভাই নিয়ে আপনি আসছেন—মানে আপনি অবিবাহিত বলেই যত ইয়ে—মেয়েটা সত্যি ভারি বজ্জাত—আবার পাছে কিছু—মানে বুঝছেনই তো—এই জন্যেই ওঁদের এত আপত্তি...।

আসল ব্যাপারটা এতক্ষণে বোঝা গেল। চুপচাপ ভাবলাম একটু। কেন জানি শ্যামাপদর উক্তিটাই বিশেষ করে মনে পড়ল এ সময়, 'আসছেন যখন' এসেই পড়ুন না—।' বললাম, আপনার ভাড়াটেদের ব্যবহারটা একটু বাড়াবাড়ি গোছের হয় নি কি?

—না না না না। গণেশবাবু তড়বড়িয়ে উঠলেন, ওঁরা অতি মহাশয় ব্যক্তি—ওঁরা আছেন বলেই বাড়িটা আজও একেবারে বারোয়ারি হয়ে ওঠে নি মশাই। আপনাকে তো আর চেনেন না তাঁরা, ভুক্তভোগী বলেই ভয় পান। যাক, সব তো শুনলেন, এখন কি করবেন?

কি আর করব, যা করবার তো করেইছি। যাব—। আপনাদের কোনো ভয়ের কারণ

নেই, বরং আগে যা ভেবেছিলেন সেটাই কাজের কথা। ওরকম একটা মেয়েকে তোলা খুব শক্ত বলে মনে হয় না। আপনারা চেষ্টা করেছিলেন— ?

দু'চোখ টান করে ফেললেন গণেশবাবু।—করি নি আবার ! নোটিস পর্যন্ত দিয়েছি। দিলে কি হবে, চোখ রাঙিয়ে উল্টে সে-ই আমায় নোটিস দেয়। নিজে তো থাকিনে, ভাড়ার জন্যেই বাড়ি, কি করেই বা তুলব—এতকাল ধরে আছে কিন্তু একটা মাসের ভাড়া পর্যন্ত বাকি ফেলে নি, এমন সেয়ানা !

বেশ একটু অস্বস্তি নিয়েই বাসা বদল করলাম।

এত ব্যাপার যাকে নিয়ে সেই দিনই দর্শন মিলল তার। দোতলার জানলার কাছটিতে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ ধরে সকৌতুকে আমাদের ঘরগোছানোর ছেলেমানুষি দেখল যেন। কান বিষিয়ে না থাকলে চোখে খারাপ লাগতো না বোধ হয়। সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ শ্রী আছে। স্বাস্থ্যশ্রীও। এখন অন্তত ঘরের শাদাসিধে আটপৌরে মেয়েটির মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু মনটা বিরূপ হবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রথম দর্শনে তাই চোখও বিরূপ।...ওভাবে চোখের ওপর দাঁড়িয়ে থাকাটা নির্লজ্জতা ছাড়া আর কি।

কিন্তু অস্বস্তি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল শিগগীরই। রাগেরও। এখানে না আসার যথেষ্ট সুযোগ তো পেয়েছিলাম। সব জেনেশুনেই একরকম এসেছি।

শ্যামাপদর মুখে শোনা তরল গান বাজনা আর হাসিখুশির নমুনাটা স্বকর্ণে শুনে ছোট ভাইদের সামনে এক এক সময় কান লাল হয়ে ওঠে। গান নয়, গানের ভিতর দিয়ে প্রগলভ যৌবনের বেপরোয়া পরিবেশন। গান বন্ধ হল তো রেকর্ড চলল। সেই একই ব্যাপার। বিলোল নারীকণ্ঠের ভবে আর ভাষায়, সুরে আর সুরায় 'জেয়ানি' বিলানোর নানান অভিব্যক্তি। স্থান বিশেষে পথে ঘাটে আজকাল এরকম গান অনেক সময়েই কানে আসে ! কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে বাড়ি বসে সেটা শুনতে যে এমন কদর্য লাগে জানতাম না।

একটা দু'টো নয়, বা একদিন দু'দিন নয়। একের পর এক আর দিনের পর দিন। এতবড় বাড়িটা শ্রীমতী একাই যেন দখল করে বসে আছে। লোকজন আসার প্রসঙ্গেও শ্যামাপদ বাড়িয়ে বলে নি। নারী পুরুষের মিলিত কণ্ঠে আসর তখন জমজমাট হয়ে ওঠে। সঙ্গে তবলা বাজে, সারেঙ্গী বাজে, আরো কি সব বাজে। কিন্তু সব মিলিয়ে সেই একই। সুরে বাঁধা নানা ঢঙে চটুল চপলতার কারিগোরী।

ভাড়াটেদের বৈকালিক মজলিশ বসে বাইরের সেই দাওয়াটিতে। আমিও এসে যোগ দিই প্রায়ই। আর রাগ নেই তাঁদের ওপর। আমার এখানে আসায় বাধা দিয়ে প্রকারান্তরে উপকারই করতে গিয়েছিলেন তাঁরা।

খালি গায়ে পানের ডিবে হাতে প্রথমে এসে বসেন অবনী ঘোষাল। সকাল থেকে সমস্ত দিনই প্রায় মুদি দোকানে কাটে তাঁর। নিজেরই দোকান, আর বেশ দু'পয়সা করেছেন এবং করছেন বলেই লোকের ধারণা। বিপত্নীক, ছেলেপুলে আছে। রাত থাকতে উঠে দু'মাইল পায়ে হেঁটে প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করে আসেন। শুধু এবাড়ি নয়, এই তল্লাটেই বেশ একটু মান সম্ভ্রম আছে তাঁর !

এর পরে আসে শামুকের নস্যিদানি ট্যাঁকে গুঁজে দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌। মার্চেন্ট আপিসে চাকরি করেন। মন্দ চাকরি নয়, একটা বিভাগের বড়বাবু নাকি। সকাল ন'টা না বাজতে নীরব কর্মিনী গৃহিণীকে ভাতের জন্য অম্লমধুর তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন রোজ। বিকেলে বাড়ি ফিরে জলযোগ সেরেই গায়ে ফতুয়া চড়িয়ে নস্যিদানি ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে রক-এ চলে আসেন। ছেলেপুলের দিক থেকে তাঁর প্রতিও মা-ষষ্ঠী প্রসন্না।

সবশেষে সিল্কের নক্‌শা-রুমালে ঘাড় মুখ মুছতে মুছতে আসেন ইঁটের দালাল দুলাল মিত্তির। তাঁর আসার বাঁধাধরা সময় নেই কিছু, তবে রক্‌-প্রীতি তাঁরই বোধ করি সব থেকে বেশি। কারণও খানিকটা অনুমান করেছি। দোতলার গান-বাজনা বন্ধ থাকলে তাঁর ঘরণীটির লম্বা ঘোমটার আড়ালে উগ্র রসনার ঝাঁজ সকলেরই কানে আসে। নিঃসন্তান দুলালবাবুর ঘর কখনো খাঁ খাঁ করে না বোধ হয়।

রক্‌-মজলিশের প্রধান হলেন অবনী ঘোষাল। স্পষ্ট বক্তা বলে নিজেই নিজের প্রতি দোষারোপ করে থাকেন। আমার প্রতিও কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি।—কি মশাই লাগছে কেমন?

সবিনয়ে জবাব দিই, ঠিক বুঝছি না, তবে সুবিধের লাগছে না।

বুঝবেন বুঝবেন, তা কমলিনীদেবীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে তো?

জবাব এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, ওই নাম বুঝি মেয়েটির?

ছদ্মবিস্ময়ে চোখ টান করে ফেলেন অবনীবাবু।—নামটা পর্যন্ত এখনো কানে দেয় নি শ্যামাপদ! ব্যাটা গণেশের ইঁদুর করেছে কি! ...হ্যাঁ ওই নাম। গলির দোরে কুপি হাতে দাঁড়ালে যে কুমি, দোতলা পাকা বাড়ির ইলেকট্রিকের আলোয় সেই-ই শ্রীমতী কমলিনী...আমরা বুড়োরাই বলে দিনরাত ওই নামে মজে আছি, আপনি তো ছেলেমানুষ!

অট্টহাসি, মিহি হাসি, আর মুচকি হাসি।

পানের ডিবে খুলল, নস্যিদানি বেরুলো, আর সিল্কের রুমাল ঘাড়ের দিকে চলল।

কিন্তু খুব মিথ্যে বলেন নি বোধ হয়। নাম-অমৃতে না হোক নাম-বিষে মজে আছেন ঠিকই। নদী যেমন সাগরের দিকে যায়, এই রক্‌-মজলিশের সকল আলোচনাও ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত কমলিনীতে এসে দাঁড়ায়। স্বাভাবিকও। প্রতি রাত্রির গান বা রেকর্ড বা আসরের ঝমঝমানি থেকে রেহাই নেই এখানে বসলেও। নিরুপায় এঁরাও তখন রসনার বিষে কানের বিষ ক্ষয় করেন। শুধু এঁরা কেন, আমিও কতদিন অস্ফুট কটূক্তি করে উঠেছি ঠিক নেই।

রক এড়িয়ে বাড়িতে প্রবেশের আর দ্বিতীয় পথ নেই। কাজেই দেখা হয় প্রায়ই। মুখের ওপর দুই চোখে যেন একরাশ বিদ্রূপ ছড়িয়ে ভিতরে ঢুকে যায় মেয়েটা। আলগা রঙ-পালিশে সেই প্রথম দেখা বাতায়ন-বর্তিনী তলিয়ে গেছে কোথায়। অনন্তযৌবনা না হোক উদ্ধতযৌবনা বটেই।

একটানা দিন-যাপনে প্রথম বৈচিত্র্য দেখা দিল মাস দুই বাদে।

কথাটা উঠেছিল শ্যামাপদর বাজার করা নিয়ে। প্রায়ই ওঠে। দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌

বলছিলেন, শ্যামাপদর সাইকেল কেনার ঝোঁকেই ইদানিং বাজারের মাছ তরকারির দাম এমন বেড়ে চলেছে। আর, সে ঝোঁকটা আজকাল জিনিসপত্রের ওজনের পরে গিয়েও চাপছে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

অবনী ঘোষাল বললেন, ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না সাইকেল কেনার টাকাটা পুরোপুরি উঠতে আর কতকাল লাগবে!

দুলাল মিত্তির হঠাৎ মন্তব্য করলেন সেটা কোন কালেও উঠবে না, ফকিরের পুঁজি উজিরে খায়—শ্যামাপদর সাইকেলের টাকাটা জমছে তার দিদিমণির বাস্‌কয়, কাজেই কেমন জমছে বুঝুন—।

শুনে অবনী ঘোষাল আর দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌ হাঁ হয়ে গেলেন।

আমি অবাক হই নি, কারণ খবরটা আমি জানি।

আর দুলাল মিত্তির জানলেন কি করে তাও জানি।

শ্রোতা ভালো এবং বাজারের হিসেব নিয়ে গোলযোগ করিনে বলেই বোধহয় শ্যামাপদ আমার কাছেই দুঃখ করে বলে ছিল কথাটা —কড়কড়ে অনেকগুলো টাকা লাভ হত, তা দিদিমণি কিছুতেই হতে দিলে না।

লাভ কি করে হত, আর দিদিমণি কি করে তা হতে দিল না তাও তক্ষুনি জানা গেল। একমাসের কড়ারে শ্যামাপদর কাছ থেকে গোপনে একশটা টাকা ধার চেয়েছিলেন দুলালবাবু, দশ টাকা সুদ দিতেন—শ' আড়াই টাকা লাগবে সাইকেল কিনতে (কিনবে যখন রাজা মালই কিনবে)—শ'দেড়েক টাকা তার জমেছে দিদিমণির কাছে—এখনো একশ টাকার ধাক্কা—হুট্‌ করে দশ-দশটা টাকা এগিয়ে যেতে পারত—কিন্তু কি জন্যে টাকা চাই শুনে দিদিমণি মারতে এলো।

শুনে মন্তব্য করি নি কিছু। কিন্তু দিদিমণির কাছে তার টাকা শুনে আমিও অবাক হয়েছিলাম সেদিন।

শেষকালে কি না শ্যামাপদ পর্যন্ত! শুরু করলেন অবনী ঘোষাল।—যার তার হাতে টাকা তুলে দেবে ব্যাটা, গণেশের ইদুঁর তো অত কাঁচা নয়!

কিন্তু এ প্রসঙ্গ ধামাচাপা পড়ল সেখানেই। শ্যামাপদ দাওয়ায় এসে হাজির। আমাকেই লক্ষ্য করে বলল, দিদিমণি আপনাকে একটিবার ডাকছেন—।

এমন সাদাসিধে ভাবে এসে বলল যেন দিদিমণি প্রায়ই এমনটি ডেকে থাকেন।

আমাকে! গলা দিয়ে স্বর বেরয় না প্রায়।

অবনী ঘোষাল, দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌ আর দুলাল মিত্তিরেও বোবা বিস্ময় কাটতে সময় লাগল। শ্যামাপদ যাবার জন্য পা বাড়াতেই হুঁশ ফিরল যেন। দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌ বাধা দিলেন প্রথম, কেন ডাকছেন, জানো?

শ্যামাপদ মাথা নাড়ল, জানে—

অবনী ঘোষাল তড়বড়িয়ে উঠলেন, জানো তো দয়া করে বলেই যাও না ধর্মপুত্তুর যধিষ্ঠির!

শ্যামাপদ নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, দিদিমণির বুড়ি-মা কেমনটা যেন করছে, সেই

জন্য—

এবারে আমারও সুর চড়ল, তা আমি গিয়ে কি করব, আমি কি ডাক্তার নাকি?

অলস চোখে তাকালো শ্যামাপদ, তাহলে দিদিমণিকে বলে দিই—

অবনী ঘোষাল বাধা দিলেন, দাঁড়াও, তোমাকে সদ্দারি করতে হবে না। আমাকে বললেন, গিয়ে একবার দেখেই আসুন না, হয়ত বিপদে পড়েছে...আমরা তো শত্তুরপক্ষ, আপনার সঙ্গে এখনো তেমন লাগে নি, তাই আপনাকেই ডেকেছে।

শ্যামাপদর পিছনে দোতলায় উঠে এসে দেখি বুড়ি শুয়ে আছে নিস্পন্দের মত আর তার মুখের কাছে ঝুঁকে কড়ে কমলিনী চামচে করে ফলের রস না কি খাওয়াতে চেষ্টা করছে।

সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এলো। বলল, মায়ের শরীরটা হঠাৎ কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে, হার্টের ব্যামো আছে, চট করে যদি একজন ডাক্তার ডেকে আনেন—এই একটু আগেই খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল।

সেই প্রথম দেখা আটপৌরে মেয়েকেই দেখলাম আবার। মায়ের অসুখে খুব যে ভয় পেয়েছে এমন মনে হল না। অবে চিন্তাগ্রস্ত বটে। বিব্রত মুখে বললাম, ধারে কাছে এখানে ভালো ডাক্তার কে আছে না আছে আমার তো ঠিক জানা নেই...।

কমলিনী নীরবে তাকালো আমার দিকে।

অনুরোধ এড়াবার জন্য ও-কথা বলি নি। তাই আবার বললাম, আচ্ছা ওঁদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখি কি করা যায়—

কাদের? পরক্ষণেই কমলিনীর নিজেরই যেন খেয়াল হল কাদের। হেসে ফেলেও সামলে নিল চট করে। বলল, থাক আমিই দেখছি, মিথ্যে আপনাকে কষ্ট দিলাম। শ্যামাপদকে নির্দেশ দিল, তুমি একটু বোসো মায়ের কাছে, আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কমলিনী ফিরে দেখল একবার। সচকিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলাম। ভাবলাম বলি, আপনি থাকুন, আমিই যা হয় একটা ব্যবস্থা করছি।

কিন্তু বলা হল না। নিচে নেমে উল্টে কমলিনীই হাসি চেপে টিপ্পনী কেটে গেল, উদগ্রীব হয়ে আছেন সব, এবারে জেরা সামলান গে যান।

কিন্তু দুদিন না যেতে এই উপলক্ষে জেরা ছেড়ে আরো কিছু সামলাতে হল। দাওয়ায় এসেই হাওয়াটা সে দিন অন্যরকম লাগছিল। যেন আমারই প্রতীক্ষায় বসেছিলেন তিনজনে। অবনী ঘোষাল মিটিমিটি হেসে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, হ্যাঁ মশাই, মায়ের অসুখে আর ডাক-টাক পড়ে নি তো?

কিছু না বুঝেই বললাম, কই না তো, অসুখ বেড়েছে নাকি?

অসুখ বাড়তেও পারে, নতুন করে আবার হতেও পারে অসুখ—

বোকার মত চেয়ে আছি।

অবনী ঘোষাল মুখ খুললেন আবার। বেশ গম্ভীর মুখেই বললেন, দেখুন, এখানে যখন এসেছেন আপনি আমাদেরই একজন, তাই ভালো-মন্দ পাঁচটা দেখতেও হয় বলতেও হয়।... তাছাড়া ওদের মা মেয়েকে চেনা আপনার মত ভালো মানুষের কম্ম

নয় বলে আমাদের হয়েছে আরো মুশকিল।

অবনীবাবু পান খেলেন, দ্বিজেনবাবু নস্যি নিলেন, দুলালবাবু সিল্কের রুমালে ঘাড় মার্জনা করলেন।

আর আমার নির্বাক দুই চোখ সকলের মুখের ওপর সঞ্চারণ করে ফিরতে লাগল।

খেই ধরলেন আবার দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌।—আসলে মায়ের অসুখ-টসুখ কিছু নয় এটুকু আর বুঝছেন না মশাই! মায়ের সঙ্গে সড় করে এই চাল চেলেছে—

সমর্থন করলেন দুলাল মিত্তির।—নইলে আপনাকে আর শুধুমুদু ডাকতে যাবে কেন—আপনি যে আবার বুদ্ধি করে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইবেন সেটা ভাবে নি, ওতেই শ্রীমতী কাত হয়েছেন।

টিপ্পনী কাটলেন অবনী ঘোষাল, আ-হা কি সাঙ্ঘাতিক অসুখ গো! হাসি-হুল্লোড় তেমনি চলল, গান বাজনার কামাই নেই, অথচ মায়ের অসুখের ভাবনায় মেয়ে একেবারে আধখানা।

মেজাজ গরম হয়ে উঠছিল। সামলে নিতে হল। হতেও পারে...কতটুকু আর জানি! বলতে গেলে সেদিন তো অকারণেই ডাকা হয়েছিল আমাকে। তারপর সেই হাসি আর বিদ্রূপ...। মনের ঝাঁঝ চেপে হাসি মুখেই বললাম এবার, আপনারা দিনের পর দিন এ নিয়ে জটলাই করবেন, না এর বিহিত একটা কিছু করবেন?

তিনজনেই নড়েচড়ে আমার দিকে ঘুরে বসলেন। অবনী ঘোষাল বললেন, আমরা তো হার মেনেছি প্রায়। বিহিত কি করা যায় এবারে আপনিই একটা পরামর্শ দিন না—সকলে মিলে আর একবার না হয় আদাজল খেয়ে লাগা যাক।

অতঃপর পরামর্শ সভা বসল তিন চারদিন ধরে। বড়িওলা গণেশবাবুরও ডাক পড়ল তাতে। ভেবেচিন্তে সাব্যস্ত হল, উচ্ছেদের আক্রমণটা এবার দু'দিক থেকে চালাতে হবে। প্রথম দুর্নীতি নিরসনের কর্মকর্তাদের কাছে সম্মিলিত অভিযোগ পেশ করবেন সকলে। দ্বিতীয় একই অভিযোগ, অর্থাৎ বাড়ির সুনাম রক্ষার্থে কোর্টে নালিশ রুজু করবেন গণেশবাবু এবং তাতে সাক্ষী দেব আমরা চার ভাড়াটে। পাড়া থেকে আরও কিছু সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করাও কঠিন হবে না খুব। উপায় স্থির হতে সকলেই খুশি। সবারই মনে হল, এতদিনে সত্যিই হাড় জুড়োবে বোধ হয়।

বেরুব বলে সবে ঘরের বাইরে পা দিয়েছি সেদিন। মাঝ সিঁড়ি থেকে তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের আহ্বানে থমকে গেলাম।

—শুনুন!

দুই চোখে যেন আগুন ছড়াতে ছড়াতে সামনে এসে দাঁড়াল কমলিনী।

—আপনি আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন কেন?

হঠাৎ এ ভাবে আক্রান্ত হয়ে হকচকিয়ে গেলাম।—আমি...মানে আমি একা কেন...সকলেই তো...!

সকলের কথা আপনাকে বলা হয় নি, আমি আপনার কথাই জিজ্ঞেস করছি।

আশ্বস্ত হলাম। জবাব দিলাম, আমার অসুবিধে হয়, তাই—।

অসুবিধে হয় তো জেনেশুনে আপনি এলেন কেন এ বাড়িতে?

ইচ্ছে করে কেউ যদি অসুবিধে সৃষ্টি করেন তাহলে তার বিহিত একটা কিছু করা যাবে ভেবেই এসেছি।

পিছনে অগ্নিদৃষ্টি উপলব্ধি করতে করতে বেশ খুশি মেজাজে প্রস্থান করলাম। বিকেলে এ নিয়ে জটলাটা জমবে ভালো...। ভাবলাম, বরের মাসি কনের পিসি ওই শ্যামাপদর মুখেই সব শুনেছে বোধ হয়।

রাত্রিতে সেদিন আর গানবাজনা শোনা গেল না।

তার পরদিনও না। তার পরদিনও না।

লোক আনাগোনাও বন্ধ।

এরকম ব্যতিক্রম এ বাড়িতে কখনো ঘটে নি বলেই রিপোর্ট করলেন দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌। অবনী ঘোষাল বিশেষ করে আমাকেই সতর্ক করলেন যেন, তা'বলে ওতে আমরা ভুলছিনে মশাই, যা করবার করে ফেলি আসুন—একটু ঢিলে দিয়েছেন কি আবার স্ব-মূর্তি ধরবে—নইলে চলবে কি করে, বুঝছেন না?

অর্থাৎ, স্ব-মূর্তি যখন ধরবেই অন্যত্র গিয়েই ধরুক। কিন্তু তবু কিছুই আর করতে হল না। কমলিনী যাকে বলে একেবারে আত্মসমর্পণ করলে। দূতমুখে, অর্থাৎ শ্যামাপদর মারফত পরদিনই সংবাদ পাওয়া গেল, এ মাসের শেষেই সে বাড়ি ছেড়ে দেবে।

মাস শেষ হতে আর দিন কুড়ি মাত্র বাকি।

এতটা কেউ আশা করে নি। রকের জটলায় খুশির বান ডাকল যেন। বাড়িওলা গণেশবাবু পর্যন্ত সেদিনই আনন্দে আটখানা হয়ে ছুটে এলেন। ভাড়াটেদের তিনি ভুরিভোজন করাবেন একদিন সেকথাও দিলেন।

আমারও মনে হতে লাগল, বিনা আয়াসে বড় রকমের জয়লাভ ঘটেছে সকটা।

একটা একটা করে দিন যায়।

দোতলাটা সেই থেকে নিস্তব্ধ, নিঃঝুম। গান শোনা যায় না, রেকর্ড বাজে না, অবাঞ্ছিত লোকজনের যাতায়াতও নেই। কমলিনী বাইরে কখন বেরয় টের পাইনে। রকে সমাসীন থাকলে বিকেলে বা সন্ধ্যায় তার ফেরার মুখে একবার সাক্ষাৎ ঘটে আগের মতই।...না আগের মত ঠিক নয়। দূর থেকেই মুখ নিচু করে আসে। কোনোদিকে না চেয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। চোখের আড়াল হতে দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌ সেদিন টিপ্পনী কাটলেন, যতই ঠান্ডা মেরে যাক গরবিনীর সাজের ঘটা তো তেমনি আছে—!

অবনী ঘোষাল জবাব দিলেন, আপনারাই না হয় সাজের কদর বুঝলেন না, কিন্তু সকলেই তো আর বেরসিক নয় আপনাদের মত!

সাজপোশাক এবং প্রসাধনের উগ্র পারিপাট্যটুকুও ছাড়লে হয়ত বা সহানুভূতিই হত। পাঁচজন পুরুষ মিলে একটা মেয়েকে ঘরছাড়া করানোর মধ্যে আর যাই হোক; পৌরুষ কিছু নেই। কিন্তু সাফল্যের আনন্দে এঁরা তিনজন ডগমগ—যত দিন যায়, এঁদের আনন্দের মাত্রা ততো বাড়ে।

মাস শেষ হতে আর দিন চারেক মাত্র বাকি। রাত আটটা ন'টা হবে তখন। রকের

গল্প-গুজব ঝিমিয়ে এসেছে। হঠাৎ যেন মরা গাঙে ভরা পূর্ণিমার জোয়ার এলো!

নিস্তব্ধ বাড়িটার নোনাধরা ইটমাটি পর্যন্ত উচ্ছল মুখরতায় জমজমিয়ে উঠল যেন।

সেই গান, সেই রেকর্ড বাজানো, সেই কলকণ্ঠের হাসি...!

এতদিনের নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার দরুনই বোধ হয় দ্বিগুণভাবে নাড়া দিল সকলকে।

রকের ঝিমুনি ভাবটা মুহূর্তে অতলে ডুবল। নড়ে চড়ে সচকিত হয়ে বসলেন সকলে। বিমূঢ় নেত্রে তাকাতে লাগলেন এ-ওর মুখের দিকে।

অবনী ঘোষাল অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, কি রে বাবা—মরণ কামড় না কি!

দুলাল মিত্তির ইংরাজিতে বিস্ময় জ্ঞাপন করলেন, পার্টিং ব্লো!

দ্বিজেন ভশ্‌চায্ নির্বাক।

আমিও অবাক।

বেশ রাত্রি পর্যন্ত চলল সেই বেপরোয়া গান-বাজনা। তার পরদিনও তাই। নেশাখোরের নেশায় ছেদ পড়ার পর আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যটি পেলে যেমন হয় তেমনি। তার পরদিন বিকেলে রকে বসে সাক্ষাৎও পাওয়া গেল শ্রীমতীর। মাথা নিচু করে আসছে না আর। মুখে ব্যঙ্গ হাসি, চোখে কৌতুক কটাক্ষ, চলনে যৌবনের ঠমক।

অবনী ঘোষাল মাথা নেড়ে বললেন, আমার কেমন সুবিধা মনে হচ্ছে না—যাবে তো শেষ পর্যন্ত, নাকি!

বললাম, আর তো কাল বাদে পরশু মাস শেষ, দুটো দিন দেখা যাক না।

দ্বিজেন ভশচায্ শুকনো মুখে মন্তব্য করলেন, জিনিসপত্রও তো কিছু পাঠাতে দেখিনে, গেলে হয়—।

দুলাল মিত্তিরই কাজের কথা বললেন, ওই শ্যামাপদ ব্যাটা সব জানে ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়।

তাই করা হল। কিন্তু শ্যামাপদ বোকা সাজল, কিছুই জানে না। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, দিদিমণি নাকি তাকে ধমক দিয়েছে, সে খোঁজে তোর দরকার কি—!

এরপর আমিই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলাম প্রথম।—আর ভেবে কি হবে, আমরাও যা করবার তাই করব তাহলে।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন সকলেই। সে তো করতেই হবে। কিন্তু মনে হত, এঁরা যেন জোর পাচ্ছেন না তেমন।

মাস শেষ হয়েও দু'দিন কেটে গেল।

সোজা দোতলায় উঠে এলাম সেদিন। কিছুক্ষণ আগে কমলিনী ফিরেছে দেখেছি। একমুখ হেসে কলাহাস্যে অভ্যর্থনা জানালো, ও মা কি ভাগ্য, আসুন, আসুন—।

গম্ভীর মুখে বললাম, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব বলে এলাম—।

একটা মোটে! কমলিনী যেন হতাশ হল, তারপর তেমনি হেসে বলল, আচ্ছা ঘরে তো বসুন আগে, আপনার জন্যে বলে অপেক্ষায় অপেক্ষায়—

কথাটা শেষ না করে লঘু পায়ে নিজেই সে ঘরের দিকে এগলো। অদূরে কমলিনীর বুড়ি মাকে দেখে আমিও আর কিছু না বলে ঘরে এলাম।

এককোণে সুবিন্যস্ত শয্যা। অন্যদিকে গান বাজনার সরঞ্জাম, গ্রামোফোন এবং রেকর্ডের স্তূপ। একটা মোড়া টেনে নিয়ে কমলিনী বলল, বসুন—।

—থাক্।

থাক কি! অতিথি সজ্জন...অপরাধ হবে না আমার! একটু তফাতে তকতকে মেঝের ওপর কমলিনী বসে পড়ল দু'পা মুড়ে।—বসুন।...আপনি এলেন ভালোই হল, এতদিন আপনার জন্য অপেক্ষা করে করে শেষে নিজেই আপনাকে একবারটি ডাকব ভেবেছিলাম।

বসলাম। গম্ভীর প্রশ্ন করলাম, কেন?

সে গাম্ভীর্য কমলিনীর আরো যেন হাসির খোরাক হল। বলল, বলতে ভয় করছে—

আপনি এ বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন কবে?

কমলিনী বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল যেন।—ওমা, কোথায়? আমি বাড়ি ছাড়তে যাব কোন দুঃখে?

কোথায় যাবেন বা কোন দুঃখে যাবেন আপনি জানেন, কিন্তু মাসের শেষে যাবেন কথা দিয়েছিলেন।

কথা দিয়েছিলাম? আপনাকে? কমলিনীর মুখে চোখে চাপা হাসি উছলে পড়ছে যেন। আর কানের কাছটা গরম হয়ে উঠছে আমার।

শ্যামাপদ আমাদের সেই রকমই জানিয়েছিল।

শ্যামাপদ! এবারে হাসিতে ভেঙেই পড়ল কমলিনী। শ্যামাপদ কি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি নাকি?...একজন থাকলে মন্দ হত না, তা বলে শ্যামাপদ! হাসি সামলাবার চেষ্টা মুখে আঁচল চাপা দিল্ সে।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, বেশ, আমাদের যা করবার তাই করিগে তাহলে—।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আটকে রেখে ঈষৎ ভ্রূ-ভঙ্গি করে কমলিনী চেয়ে রইল ক্ষণকাল। পরে নিস্পৃহ সুরে বলল, করতে যদি কিছু হয়ই একা আপনাকেই করতে হবে, আর কাউকে পাবেন বলে মনে হয় না।

তার মানে?

বলছি, বসুন। আর যাঁদের ওপর নির্ভর করছেন, দরকার হলে আমার হয়ে তাঁরা সাক্ষীও দেবেন হয়ত।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধহয় বসে পড়লাম আবার। কমলিনী মুখ টিপে হাসছে।

উঠে দাঁড়াল। ছোট একটা আলমারি খুলে বার করল কি। সামনে এসে বলল, দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন—?

বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে উঠল প্রায়। অবনী ঘোষালের সেই নাম খোদাই করা রঙচটা চ্যাপটা জার্মান সিলভারের পানের ডিবে, দ্বিজেন ভশ্চাযের সেই মার্কামারা নস্যিদানি, আর সেই শৌখিন সিল্কের রুমালের একটি—কোণে দুলাল মিত্তিরের নাম লেখা!

মনে হল জেগে স্বপ্ন দেখছি। তারপর হঠাৎ স্মরণ হল, কিছুদিন ধরে অবনী ঘোষালকে অন্য একটা চকচকে পানের ডিবে ব্যবহার করতে দেখছি বটে। দ্বিজেন

ভশ্‌চাযের এতকালের শামুকের নস্যি-কৌটো আপিসে হারিয়েছে দিনকতক আগে, নিজেই দুঃখ করে বলেছিলেন।...দুলাল মিত্তির অবশ্য কিছুই বলেন নি।

কমলিনী উৎফুল্ল মুখে তেমনি পা মুড়ে বসে পড়ল আবার। বলল, দুরাশা ছিল আপনার কাছ থেকেও হয়ত কিছু পাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেলাম না যখন, ভাবলাম আপনাকে একবারটি ডেকে এনে আপনার মুখ দিয়েই ওঁদের খবরটা পাঠাই—ভারি ব্যস্ত হয়ে আছেন ওঁরা সেই থেকে।

সবকিছু দুর্বোধ্য লাগছে। কিসের খবর?

কমলিনী হাসল আর এক ঝলক।—আপনার মত তো নন, কোথায় কোন বেঘোরে গিয়ে পড়ছি সেজন্য দুশ্চিন্তা আছে না তাঁদের! তাই কোন ঠিকানায় যাচ্ছি, একে একে সকলেই ওঁরা চুপি চুপি জেনে নিতে এসেছিলেন।

স্থান কাল ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার। কমলিনী কলকণ্ঠে বলল, আপনি যে দেখি আকাশ থেকে পড়লেন!...ত ওঁদের বলে দেবেন, কমলিনীর ঠিকানাটা আপাতত গণেশ ঘোষের বাড়ির দোতলাতেই রইল।

হঠাৎ মনে পড়ল শ্যামাপদর একটা কথা, যে কথাটা প্রথম দিন কানে কেমন লেগেছিল। শ্যামাপদ বলেছিল, দিদিমণি এ বাড়িতে থাকলে ওনাদের তিনজনেরই একটু একটু অসুবিধে হয়।

তখনকার মত অন্তত সব রাগ আর বিদ্বেষ নিশ্চিহ্ন হয়েছে।—কিন্তু আপনি ওঁদের কাছ থেকে এগুলো যোগাড় করলেন কি করে?

করলাম।

কমলিনীর হাস্যোচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়ে মোটামুটি ব্যাপারটা আহরণ করা গেল—প্রথমে আসেন অবনী ঘোষাল। কমলিনী নিশ্চিত জানত সকলেই আসবেন, শুধু সুযোগের অপেক্ষা।...অবশ্য তখনও তার প্ল্যান ঠিক হয় নি। অবনী ঘোষাল জানালেন পাছে তাঁকে ভুল বোঝা হয় সেই জন্য একবার না এসে পারলেন না তিনি।

অবনতমুখী কমলিনী গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করল, বসবার জন্য সযত্নে আসন পেতে দিল, তারপর গুরুসান্নিধ্যে অপরাধী শিষ্যের মত বসে রইল মাথা নিচু করে। অবনী ঘোষাল যা বলার বললেন, কমলিনীকে উঠতে হচ্ছে বলে বাকি সকলকেই দুষলেন, নিজের নিরুপায় কর্তব্যের কথা উল্লেখ করলেন, যেখানেই সে থাক, যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, অর্ধেক দামে তাঁর ঠিকানায় প্রতিমাসে মুদি দোকান থেকে যাবতীয় সওদা পাঠাবেন সে কথাও দিলেন। কমলিনী তখন প্রাণপণ চেষ্ট করছে চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল বার করতে। না পেরে নিঃশব্দে পান সেজে গেল একটা একটা করে অনেকগুলো। পরে কি ভেবে নিজের শখের পানের ডিবেটা এনে পানগুলো রাখল তাতে। আসনের কাছ থেকে অবনী ঘোষালের পানের ডিবেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে তাঁর পানগুলোও সেই ডিবেতে পুরল—পরে সেই পান ভরতি ডিবে রাখল তাঁর পায়ের কাছে, আর তাঁর এই রঙচটা ডিবেটা রাখল ছোট আলমারির ওপর। অবনী ঘোষালের আগের দৃষ্টিটা বদলে গিয়ে বিস্ময়ে দেখা দিয়েছে। সেই প্রথম মুখ খুলল

কমলিনী, কান্নাভেজা মৃদু গলায় বলল, এই চিহ্নটুকু তার কাছে থাক, কয়লার কালি আগুনে না পোড়ালে ওঠে না—কমলিনীর আর কোনো খেদ নাই।

কমলিনীর পানের ডিবে হাতে করে অবনী ঘোষাল সপুলকে প্রস্থান করলেন—মধ্যাহ্ন গড়িয়ে আসছে, আর অবস্থান সমীচীন নয়।

পরের দু'জনের বেলায়ও প্রায় একই প্রহসনের পুনরাবর্ত্তন। তবে এঁদের বেলায় গচ্চা কিছু দিতে হয় নি, চিহ্ন দু'টো বিনা বিনিময়েই হাত করা গেছে।

নিজের অজ্ঞাতে কমলিনীর মুখের ওপর দু'চোখ আটকে ছিল আমার। সচেতন হলাম। তারপর এই প্রথম হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম, এর পরেও ওঁরা যদি আপনাকে তুলতে চান, এগুলো নিয়ে তখন কি করবেন আপনি?

খিল খিল করে হেসে উঠল কমলনী, বলল, গলার মালা করে ঘুরে বেড়াব। পরে তেমনি হালকা কণ্ঠেই বলল, তাঁরা মানী লোক, নিজেদের মান রেখে চলতে জানেন...কিছুই করা দরকার হবে না।

উঠলাম। নারী বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টি তাই ভাবছিলাম বোধহয়।

কমলিনী বলে উঠল, ওমা! আপনিই যে একমাত্র আসল শত্রুপক্ষ গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছিলাম!...ওঁরা কেন তুলতে চান বুঝতে পারি, কিন্তু আপনি চান কেন?

শত্রুপক্ষ যে সেকথা নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম বোধহয়। মনে পড়ল। বললাম, এত ভালো গলা আপনার, দিনরাত ওই ছাইপাঁশ গান কেন?...আর রেকর্ডের গানগুলিও সব বেছে বেছে তেমনিই যোগাড় করেছেন।

কমলিনী নিরীহমুখে বলল, শুনতে খুব খারাপ লাগে বুঝি?

—শুধু খারাপ লাগে না, ইস্কুল কলেজে পড়া ছোট ছোট ভাইগুলোর সামনে লজ্জা পেয়ে ঘরের দরজা জানলা প্রায়ই বন্ধ করে দিতে হয়।

কমলিনী থমকে গেল। আমি নিচে নেমে এলাম। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লাম। পাশের ঘরে তিন ভাই পড়ছে।

অনুমানে ভুল হল না। একসঙ্গে আসবেন না তাঁরা। ফাঁক মত একে একে আসবেন।

প্রথমে এলেন অবনী ঘোষাল।—কি হল, গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, মুখের উপর বলে দিলে বাড়ি ছাড়বে না।

কেন? ছাড়বে না কেন?

তার খুশি। বলল, নালিশ করলে সেও জানে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে। তারপর গলা নামিয়ে বললাম, আপনাকে আড়ালে বলব বলেই ওঁদের সামনে যাই নি...পাছে ওঁরা কিছু ভাবেন—আপনার ওপরই মেয়েটার বিষম রাগ দেখলাম—নালিশ করলে আপনাকে অন্তত সে নাকি নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছাড়বে।

দু'চোখে প্রায় কপালে তুলে ফেললেন অবনী ঘোষাল।—এই কথা বললে! উঃ! সাঙ্ঘাতিক মেয়ে মশাই! কি ষড়যন্ত্র ফেঁদে বসে আছে ঠিক কি!—এই—ইয়ে আর কিছু বললে?

না, আর কিছু না।

ভাবনার কথা...বেশ করেছেন ওদের সামনে বলেন নি...খুব ভালো করেছেন...হয়ত কি না কি ভেবে বসে থাকবে...ওরা কি আপনার মত অত লেখাপড়া জানে, না খবরের কাগজে চাকরি করে আপনার মত...কি দজ্জাল মেয়ে...আচ্ছা আপনি পড়ুন...ওরা আবার...।

প্রস্থান করলেন।

তারপর এলেন দ্বিজেন ভশ্‌চায্‌।

আর, একটু বেশি রাত্রিতে দুলাল মিত্তির।

তাঁদেরও আগাগোড়া ওই এক কথাই নিবেদন করলাম। তবে একেবারে এক কথা নয়। দ্বিজেন ভশ্‌চাযকে বললাম, দরকার হলে এমন কান্ড করবে বলেছে যাতে আপনার নামে আপিসসুদ্ধু ঢি-ঢি পড়ে যায়।

দুলাল মিত্তিরকে বললাম, ওর পিছনে লাগলে আপনার বউয়ের সঙ্গে যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাই করবে বলেছে।

এরপর দিনকতক আর রকের আসর জমল না তেমন। আমারও আর সেখানে বসে আড্ডা দেওয়ার প্রবৃত্তি নেই খুব। সকলকে নিশ্চেষ্ট দেখে বাড়িওয়ালা গণেশ ঘোষ এসে হাজির হলেন। তিনজনেই এঁরা একযোগে জানালেন, এই সব যা তা মেয়ের সঙ্গে লাগার মত তাঁদের সময়ও নেই ইচ্ছেও নেই—তাঁদের মান-সম্ভ্রম বলে কিছু আছে, সুবিধা পেলে তাঁরাই মানে মানে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

গণেশ ঘোষ হতভম্ব। সরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো? এঁরা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন কেন?

বললাম, কি জানি ভয় দেখিয়েছে হয়ত।

কমলিনীর উদ্দেশে গণেশবাবু কটূক্তি করে উঠলেন একটা। পরে একটু ঠাণ্ডা হয়ে প্রস্তাব করলেন, চলুন তো যাই একবার রসবতীর কাছে, দেখি কি বলে...।

আপনিই যান, আমি আর কেন!

গণেশবাবু দোতলায় গিয়ে উঠলেন ঠিকই। তবে একা নয়, শ্যামাপদকে সঙ্গে করে। এবং যথা সময়ে তার রিপোর্টও পাওয়া গেল।

কমলিনী সকাশে এসে গণেশবাবু একেবারে জোড়-হাত করে নিবেদন করলেন, আর কেন মা, অনেক তো নাজেহাল হয়েছি, ছা'পোষা মানুষের ওপর এবার একটু দাক্ষিণ্য করো—তোমার আর ভাড়া দিতে হবে না, উল্টে তোমার হাতে শ'পাঁচেক টাকা গুনে দিচ্ছি, একমাসে হোক দু'মাসে হোক আর কোথাও দু'খানা ঘর দেখে দিয়ে একেবারে পাড়া জুড়ে থাকগে তুমি।

পাঁচশ টাকা গণেশবাবুর পাঁজরের পাঁচখানা হাড়।

কমলিনী হেসে উঠেছে প্রথম। শ্যামাপদর ভাষার পিত্তিজ্বলানো হাসি। তারপর হাসি থামিয়ে দু'চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করেছে, পাঁচশ টাকা দেবেন?

গণেশবাবু আশান্বিত হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাসও পড়েছে—হ্যাঁ দেব, পাঁচশ টাকাই

দেব, কিন্তু খুব চুপি চুপি, কাউক্কে বলবে না, নয়ত এরপর যে ব্যাটাকেই উঠতে বলব সেই এসে টুঁটি চেপে ধরবে পাঁচশ টাকা দাও, উঠছি—।

দিলে উঠবে?

উঠবে না! দু'চোখ গোল করে ফেলেন গণেশবাবু। যাকে বলব সেই লাফাতে লাফাতে উঠবে, পাঁচশ টাকা চাট্টিখানি কথা নাকি!

কমলিনী সাগ্রহে বলল, আপনি তাহলে বলুন না কাউকে উঠতে গণেশবাবু, আপনার জন্যে আমি সাড়ে পাঁচশ টাকা যোগাড় করছি, পঞ্চাশ টাকা আপনার—আর দু'খানা ঘর পেলে ভারি সুবিধে হয় আমার।

চোখের আগুনে আজকাল আর কাউকে ভস্ম করা যায় না। কণ্ঠও মিশিয়েছিলেন গণেশবাবু।—তা হয় বইকি সুবিধে, খুব সুবিধে হয়—ভালো করে এখানেই দোকান-পাট খুলে বসতে পারো তাহলে—।

এও কমলিনীর বিপুল হাসির খোরাক হচ্ছে দেখে গণেশবাবু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছেন।

কিছু কালের মত বেশ একটু পরিবর্তন দেখা গেল এর পরে। রকের প্রগলভ জটলার একটু যেন চিড় খেয়ে গেছে। আস্ত আস্তে নিজেকে গুটিয়েই নিয়েছিলাম। ওঁদের আড্ডা এখনো বসে রোজই কিন্তু তাকে আর মজলিশ বলা চলে না।

ওদিকে কমলিনীর আচরণেও খানিকটা পরিবর্তন দেখা গেল। ভেবেছিলাম, এবারে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে সে। কিন্তু উল্টে একটু যেন সংযত হল। লোকজনের আনাগোনা কিছু কমল, গানের আসরও ততো ঘন ঘন বসে না আর। গলায় অবশ্য সেই একই গান লেগে আছে, কিন্তু প্রায়ই জানলা দরজা বন্ধ থাকার দরুনই বোধহয় কানে আর তেমন করে গরম সিসে ঢালে না। রেকর্ডও চলে, তবে তেমন উচ্চগ্রামে নয়। অনেকটাই স্তিমিত।

একটানা মাস পাঁচ ছয় এমনি চলল। এ ভাবে বললে গণেশ ঘোষের ডেরার কাহিনী এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল আবারও, এবারে শেষ ব্যতিক্রম।

আর, অপ্রত্যাশিতও।

খবরটা এবারেও প্রথম দিল শ্যামাপদ। পরে গণেশ ঘোষ।

কমলিনী বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। গণেশবাবু যথাবিধি নোটিস পেয়েছেন।

...কিন্তু কিছু একটা ঘটবে সে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল মাসখানেক আগে থেকেই।

...দুই বিপরীতমুখী বৈচিত্র্য।

প্রথমে, হঠাৎ শোনা গিয়েছিল সেই কূল ছাপানো সবখোয়ানো বিভ্রম-মন্দিরার উচ্ছল ঝমঝমানি। আগের মতই, আগেরও চরম। সকাল সন্ধ্যা সারাক্ষণ। রাতের আসরে নারী-পুরুষের বিচ্ছিন্ন এবং মিলিত লাস্য সংগীতে আগলভাঙা কামনার উৎসব লেগেছিল যেন। এরই মধ্যে বাইরে যাতায়াতের পথে কমলিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎও হয়েছে দুই একবার। তার সাজসজ্জা এবং প্রসাধন আগের নগ্নতাকে ছাড়িয়ে গেছে চতুর্গুণ। মনে হয়েছে, উদভ্রান্ত-যৌবনা এক নারীর সমস্ত প্রাচুর্য যেন স্থূল মত্ততায় দেহের কানায় কানায় উপচে উঠছে।

...তেমনিই তারপর আবার একদিন সব কিছুর হঠাৎ অবসান।

গান বাজনা রেকর্ড রূপসজ্জা—সবই। দুরন্ত ঝালার মুখে সেতারের ঝমঝমে তারগুলো সব হঠাৎ একসঙ্গে ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়। উৎসব-সমারোহে আকস্মিক সমাধির স্তব্ধতার মত। একদিন, দু'দিন করে পনের বিশ দিন পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে কমলিনীকে আর বাইরে বেরুতেও দেখেনি কেউ।

শ্যামাপদকে জিজ্ঞাসা করতে সে শুধু সংক্ষেপে বলল, দিদিমণি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেন বলতে পারল না। গণেশবাবুও নোটিস পেয়ে তেমনি অবাক।

রকের জটলায় আবার যেন বেশ রসের আমেজ লেগেছে। অবনী ঘোষালের পানসিক্ত মুখ খুলেছে। দ্বিজেন ভশ্চায্ নাসিকা গহ্বরে ঘন ঘন নস্যি চালান দিয়ে গলায় খুশির আওয়াজ বার করছেন ঘড়ঘড় করে। দুলাল মিত্তিরের সিল্কের রুমালের ঘষায় আর চাপা হাসিতে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে থেকে থেকে। আমায় দেখলেই সাড়ম্বরে তাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁদের নাকি প্রায় বর্জন করেছি।

কি ভেবে পায়ে পায়ে দোতলায় উঠে গেলাম সেদিন। কমলিনী সেদিনও সানন্দেই অভ্যর্থনা জানাল। —আসুন, আসুন, এরকম একটুখানি সৌভাগ্য মনে মনে আশাও করছিলাম।

সেই আগের ঘরেই মোড়া পেতে পেতে বসতে দিল। নিজেও তেমনি মেঝেতে বসল পা গুটিয়ে। দেখছি। এমন শাদাসিধে বেশে আর দেখি নি।

বললাম, আপনি কাল চলে যাচ্ছেন শুনে একবার এলাম দেখা করতে... !

কমলিনী সেই আগের মতই চপল হাস্যে চোখ টান করে বলল, ঠিকানা জানতে নয় তো ?

কিন্তু তবু ঠিক যেন আগের মত নয়। তফাতটা কোথায় ঠিক ধরে উঠতে পারছি না। হাল্কা জবাবই দিলাম, কি জানি। কিন্তু হঠাৎ সুমতি হল ?

ভালোই তো হল, আপনারা নিষ্কন্টক হলেন।

তা তো হলাম, কিন্তু আপনার এত সুমতি হল কেন ?

সুমতি হল তার কারণ চাকরিটা গেল।

থতমত খেয়ে গেলাম হঠাৎ। অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।—চাকরি গেল ! কোথাকার চাকরি ?

গ্রামোফোন কোম্পানির—দিনরাত যে মহড়া শুনতেন সে-সব তো আমাকেই রেকর্ড করতে হত—এক পিঠ একা, এক পিঠ দলবলের সঙ্গে।

হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেলাম একেবারে। বিমূঢ় নেত্রে চেয়েই আছি। সহজ কথাটাও বুঝতে সময় লাগছে। অথচ, এত সহজ যে বলা মাত্রেই মনে হচ্ছে, রেকর্ড যখন বাজত তখনও এর গলাই শুনেছি অবিরাম। এই জলের মত ব্যাপারটাই একটা বারও মনে হয় নি আমার। মনে হয় নি কারোই।

কিন্তু চাকরিটা গেল কেন ?

কমলিনী থমকালো একটু। তার পরেই হাসির উচ্ছ্বাসে একেবারে ভেঙে পড়ল যেন।

বেদম হাসি ! কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, উঃ ! কি পাল্লাই না দিলাম ক'টা দিন—একেবারে মরণ পাল্লা ! আবার হাসি।

...পাল্লা দিলেন ! সঠিক বুঝে উঠছি না। গান-বাজনায় শেষ ছেদ পড়ার আগেই ক'টা দিনের সেই চরম-মত্ততার আবহাওয়া মনে পড়ে। আর কমলিনীর তখনকার রূপ-সজ্জাও।

মুখের দিকে চেয়ে আমার নির্বাক প্রশ্নটা উপলব্ধি করেই কমলিনী মজা পেয়ে গেল যেন খুব। ফস্ করে জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার বয়স কত ?

বয়স !

আচ্ছা থাক। আমার বত্রিশ, পাল্লা দিতে হল নতুন এক বাইশ বছরের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলাম না বলেই গেল চাকরিটা। এক গলা ছাড়া ওই বাইশ বছরের আর সব কিছুই ভালো আমার থেকে—। সেই উচ্ছল হাসি কমলিনীর।

কিছুই যেন মাথায় ঢুকছে না। বিমূঢ় বিস্ময়ে বললাম, কিন্তু গ্রামোফোন কোম্পানি...ওদের তো গলাই দরকার...।

হাসি ঝলমল দুই চোখ মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হল আমার মুখের ওপর। —ও মা ! অতটাই ছেলেমানুষ নাকি আপনি ?

বলতে বলতে ওই অদম্য হাসির শেষ বাঁধটাও ভেঙে গেল যেন, মাথা মেঝের ওপর নুয়ে এলো প্রায়। আর সামলানো গেল না সে হাসি। মুখে আঁচল গুঁজে দিয়ে চকিতে একেবারে ঘর ছেড়ে চলে গেল কমলিনী।

উঠলাম সকসময়।

নিচে নেমে এলাম।

কোণের দিকে একপ্রান্তে শ্যামাপদর ঘর দেখা যায়। সচরাচর এ সময় ঘর খোলা থাকে না তার।... কিন্তু খোলাই আছে। লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে গেলাম। এমনিই।

ময়লা একটা ঝাড়ন দিয়ে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে একটা সাইকেলের জলুস বার করছে শ্যামাপদ।

নতুন কিনে আনলে শ্যামাপদ ?

সাগ্রহে আরো কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।...শ্যামাপদর এতকালের শখ। কিন্তু থেমে গেলাম। এরই মধ্যে বাকি টাকা সে পেল কোথায় ! ভিতরটা যেন হঠাৎই খচ্ খচ্ করে উঠল আর একবার। সাইকেলের জেল্লায় কমলিনীর হাসিই ঠিকরে বেরুচ্ছে...।

শ্যামাপদ শান্ত মুখে ফিরে দেখল একবার। তেমনি নিবিষ্টচিত্তে সাইকেল মুছতে লাগল তারপর।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি। পরে প্রায় নিস্পৃহ মুখেই জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দিদিমণি কোথায় উঠে যাচ্ছেন জানো ?

না...ওই ওঁরা জানতে পারেন।

ওঁরা !...কারা ?

ওই ঘোষালমশাই ভশ্চায্‌মশাই আর মিত্তিরমশাই। নিষ্ঠা সহকারে সাইকেল মুছে চলেছে শ্যামাপদ। নিজের মনেই বলল, আজ না জানলেও দু'দিন বাদে ওঁরা জানবেনই। আপনি বা আমি না জানলেও ওঁরা ঠিক জানবেন।

পায়ে পায়ে সরে এলাম।

বাইরে অন্তরঙ্গ আনন্দে অবগাহন করছেন ওঁরা।

—শ্রীরাধিকা কালই তাহলে নতুন কুঞ্জে চলল এ বাড়ি ছেড়ে! অবনী ঘোষালের গলা।

শ্যামের বাঁশি-টাঁশি শুনেছে কোথাও, না গিয়ে উপায় আছে! দ্বিজেন ভশ্চায্‌।

—কুঞ্জকথা মাথায় থাক্‌, ঘোষালমশায়ের সঙ্গে কাল অমরাও গঙ্গাচান করে আসিগে চলুন। দুলাল মিত্তির।

চুপচাপ শুনছি।

আর দেখছি।

শবের লোভে শ্বাপদের উল্লাস।

জবাব

কোথা থেকে শুরু করব ভাবছিলাম। একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল। অনেক দিন আগে লখ্‌নউ-এর এক কুকুর প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম। যাকে বলে ডগ্‌ শো। কুকুর-প্রীতি নেই। গিয়েছিলাম অভিজাত সমাবেশটির আকর্ষণে।

শো বা বিচারকের বিচার বিশ্লেষণ বিরক্তিকর লাগছিল। কুকুরের কদর বুঝিনে। বোঝার বাসনাও নেই। সদ্যপরিচিত দু'চারজন গণ্যমান্য কুকুরভক্তর সঙ্গে দাঁড়িয়ে বেশ সমঝদারের মত মুখ করে দেখে যাচ্ছি, অর্থাৎ সময় কাটাচ্ছি এই পর্যন্ত। প্রদর্শনী শেষে একজন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা তাঁর মস্ত কুকুর নিয়ে এক আজ্ঞানুবর্তিতার খেলা দেখালেন। ইংরেজিতে বলে ওবিডিয়েন্স টেস্ট। নয়নাভিরাম। বুদ্ধির বিচারে এ খেলায় মানুষের সঙ্গে কুকুরের তফাত ঘুচে গেছে।

মহিলা তাঁর কুকুরকে যা আদেশ দিচ্ছেন সে তাই করছে।—বসে থাকে চুপ করে!

বসে থাকছে।

শুয়ে পড়ো চোখ বুজে!

শুয়ে পড়েছে।

বোর্ডে তিনটে খড়ির দাগ দিয়ে আদেশ দিলেন, শো কার্পেটটা তিনবার প্রদক্ষিণ করতে।

করল।

পাঁচটা দাগ দিয়ে বললেন, ডাকো পাঁচবার!

গুনে পাঁচবারই ডাকল।

একটা বাসনে খানিকটা রান্না মাংস তার সামনে রেখে আদেশ দিলেন, বসে চুপচাপ পাহারা দাও, খাবে না—বলেই চোখের আড়ালে সরে গেলেন তিনি।

মাংসের বাসনের সামনে কুকুর হুমড়ি খেয়ে বসেই রইল, জিভ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল টসটস করে। প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল।

আড়াল থেকে মহিলা আবার বেরিয়ে এসে বললেন, আচ্ছা এবার খেতে পারো।

মহা আনন্দে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ধৈর্যাবতার সারমেয় মাংসের বাসনে চড়াও করল।

ছোটখাট এমনি আরো গোটা কতক আজ্ঞানুবর্তিতার খেলা দেখালেন মহিলা। হাততালিতে পরিবেশ মুখরিত হল। খুশিতে লাল হয়ে মহিলা বসে পড়ে তাঁর কুকুরকে দু'হাতে বুকে করে জড়িয়ে ধরে গোটাকতক চুমু খেয়ে ফেললেন।

অনুমান, সুদর্শনার এই কাণ্ড দেখে অনেকের দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল।

প্রত্যাবর্তনের পথে দেখা শশী ভার্গবের সঙ্গে। রূপসী শশী ভার্গব। সঙ্গে বেদপ্রকাশ। শশীর পায়ে পায়ে আসছে তার লিও। প্রকাণ্ড অ্যালসেসিয়ান। লায়ন, অর্থাৎ সিংহের সমবিক্রম তাৎপর্যে ওই নাম। তা মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালে সত্যিই ভয় ধরে।

কলহাস্যে শশী ভার্গব উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যেন।—কি আশ্চর্য। তোমারও আবার এসবে টান আছে নাকি ? ওবিডিয়েন্স টেস্ট দেখলে ? ওয়ান্ডারফুল না ? সামনের বারে লিওকে নামাব দেখবে, ও-ও কম যায় না। আদর করে লিওর মাথা চাপড়ে দিল সে।

বেদপ্রকাশ বিরস মুখে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে। শুধু লিও কেন, কুকুর দেখলেই তফাতে থাকে সে। আমার বন্ধুত্ব তার সঙ্গেই। শশীর সঙ্গে পরিচয়টা সেকেন্ডহ্যান্ড। অর্থাৎ বেদপ্রকাশের মারফত। ডগ-শো দেখতে এসেছে সে এটা সত্যিকারের বিস্ময় ! কান টানলে মাথা আর না এসে যায় কোথায়। বললাম, কি হে মুখখানা অমন হাঁড়ি করে আছ কেন ?

অস্ফুট জবাব দিল, যত সব সিলি...

সিলি ! রুষ্ট কটাক্ষে তাকালো শশী ভার্গব—এমন ওবিডিয়েন্স ক'টা মানুষের দেখেছ শুনি ? সিলি তো তুমি এলে কেন, তোমাকে কে সেধেছিল আসতে ?

হন্ হন্ করে সে এগিয়ে চলল। পরম অনুগত লিও-ও সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে দিল। অপ্রস্তুত হয়ে বেদপ্রকাশ আমার দিকে চেয়ে হাসল একটু। বললাম, এতদিনে একটা কুকুরকে বরদাস্ত করতে পারলে না, তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

আমার বিশ্বাস, ওদের এতদিনের এই হৃদ্যতা আজও এক মিষ্টি পরিণতিতে এসে পৌঁছয় নি তার একটা বিশেষ কারণ বেদপ্রকাশের কুকুর বিদ্বেষ আর শশীর কুকুর প্রীতি। কিন্তু বেচারী বেদপ্রকাশই বা করবে কি ! চেষ্টার ত্রুটি করে নি সে। কিন্তু একটা ভয় যেন অস্থিমজ্জায় মিশে আছে তার। ছেলেবেলায় এক ভাই পাগলা কুকুরের কামড়ে মারা যায়। জলাতঙ্কের সেই বিভীষিকা আজও তার মন থেকে গেল না। মনে মনে লিওকে বরদাস্ত করার অনেক চেষ্টা সে করেছে। কিন্তু লিও কাছে এলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

শশী এই নিয়ে প্রথম প্রথম অনেক হেসেছে, অনেক মজা করেছে। শেষে অনেক অনুযোগ করেছে আর রাগ করেছে। আর কুকুরটাও তেমনি। মানুষটা তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না উপলব্ধি করেই যেন খুশি নয় তার ওপর। কর্ত্রীর বা নিজের কাছাকাছি তাকে দেখলেই গড়গড় করে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

বেশ হাশিখুশি শাদাসিধে মানুষ এই বেদপ্রকাশ। বন্ধুবৎসল। ব্যবসায়ী বাপের টাকাকড়ি কিছু আছে। কিন্তু ব্যবসায়ের টাকা বলেই বোধ হয় আলগা আতিশয্য কিছু চোখে পড়ে না। চৌকস বন্ধুরা বরং একটু বোকাই ভাবত ওক। শশী ভার্গবের মত মেয়ে শেষে ওরই প্রতি আকৃষ্ট হবে কেউ ভাবতে পারে নি। সালোয়ার-কামিজ পরে কখনো তাকে দেখা যেত ফটফট করে মোটর বাইক চালাচ্ছে নিজেই। কখনো আবার শাড়িপরা বাঙালি মেয়ের তন্বী সাজে অভিজাত মহলে চাঞ্চল্য এনেছে। কেমন করে এই মেয়ের যোগাযোগ ঘটল বেদপ্রকাশের সঙ্গে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু আমাদেরও খারাপ লাগত না। মেয়েটির প্রাণ-প্রাচুর্য আছে।

এসব ক্ষেত্রে পূর্বরাগের ব্যাপারটা অপরিহার্য। ওদের দেখা যেত কখনো রেসিডেন্সির কোনো নিরিবিলি কোণে, কখনো জ্যু-গার্ডেনের নিভৃত কুঞ্জে, কখনো ইমামবাড়ার পথে, কখনো বা গোমতীর ধারে। দেখে অনেকেরই ঈর্ষা হত। বলত, ভ্যাবাগঙ্গারাম বেদপ্রকাশের বরাত দেখো, ওর মধ্যে কি যে পেল মেয়েটা কে জানে—।

যাক, প্রথম পাঠ অর্থাৎ পূর্বরাগের ভিতটা পাকা করে নিয়ে যথারীতি আবার তারা বন্ধুবান্ধবের সমাবেশেই প্রত্যাবর্তন করল। কিন্তু এর পরের প্রত্যাশিত নির্বন্ধে অযথা বিলম্ব ঘটতে লাগল যেন। একটা দুটো করে দিন যায়, মাস যায়, বছরও ঘুরে আসে। কিন্তু প্রজাপতি-ঋষির পাখার বাতাসই শুধু গায়ে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় ওরা। আসল বার্তা আর শুনিনে কিছু।

বেদপ্রকাশকে বলি, আর কেন, দুর্গাবলে ঝুলে পড়ো এবার।

শুনে হাসে। বলে, গলা তো বাড়িয়েই আছি...।

টানছে না ?

টানছে, ঝোলাচ্ছে না। একটু থেমে বলল, যত ভণ্ডুল বাধাচ্ছে বোধ হয় ওই ব্যাটা কুকুরটাই, ওটাকে যদি গুলি করে মেরে দিতে পারতাম !

সাধে বন্ধুরা বলে ভ্যাবাগঙ্গারাম ! অনেক দিন বলেছি, কুকুরটাকে একটু আদর যত্ন করো, আসল কাজ চুকে যাক তারপর প্রাণেশ্বরী তোমার শ্যাম রাখে কি কুকুর রাখে দেখা যাবে। কিন্তু বেদপ্রকাশের কাঁধে শনি। উল্টে বলেছে, তোমার আমার মাঝখানে ওই কুকুরটা কেন, ওকে বিদায় করো—।

শুনে শশী ভার্গব ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, আসলে আমাকেই তুমি ভালোবাস না একটুও, বাসলে একথা মুখেও আনতে পারতে না।

বেদপ্রকাশ খানিক গুম হয়ে থেকে বলল, তোমার ওই কুকুরও আমাকে পছন্দ করে না।

শশী জবাব দিল, তুমি ওকে দু'চোখে দেখতে পারো না তাই পছন্দে করে না,

ও আদরের কাঙাল, কোনোদিন একটু আদর করেছ ওকে? তারস্বরে হাঁক পাড়ল সে, লি-ই-ও-ও!

ওপরে ছিল বোধ হয়। পড়ি মরি করে ছুটে এলো। কিন্তু দোসরটিকে দেখে গলার অস্ফুট শব্দে আর চোখের দৃষ্টিতে স্পষ্ট অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করল। কর্ত্রীর চেয়ার কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলল, দেখো তো, ওকে কেউ অপছন্দ করতে পারে!

বেদপ্রকাশের গা'টা শির শির করে উঠছে কেমন। তবু মরীয়া হয়েই চেষ্টা করল ওকে একটু পছন্দ করতে। মুখে হাসি টেনে ওর মাথার দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু সারমেয়-পুঙ্গব কর্ত্রীর আদর তুচ্ছ করে রোষে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে গ-র্-র্-র্ করে এমন একটা গুরুগম্ভীর জলদ শব্দ বার করল গলা দিয়ে যে অস্ফুট আর্তনাদ করে চেয়ার ছেড়ে তিন হাত দূরে গিয়ে বেদপ্রকাশ দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে।

শশী ভার্গব হেসে কুটিপাটি।

যাক্, ডগ-শো'র পরেই কাহিনীর নতুন অধ্যায় শুরু।

শশী ভার্গবকে দেখেই হোক বা শশী ভার্গবের কুকুর দেখেই হোক, মুগ্ধ হল কে এক রাজকুমার। রাজার কুমার নয়। নাম রাজকুমার। কানপুরে এক মস্ত ব্যবসায়ের আট আনার মালিক নাকি। শোনা গেল লিও তাকে গুণ করেছে। লখ্‌নউ ছেড়ে সে আর নড়তে পারছে না। নড়লেও কানপুর থেকে লখ্‌নউ মোটরে দু'ঘণ্টার পথ মাত্র। প্রথম দিকে তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা দেখা গেল শশী ভার্গবের বাবার সঙ্গে। মাঝে মধ্যে কুকুরসহ বাবা মেয়েকে নিয়ে লম্বা লম্বা দু'চারটে মোটর টিপও দিলে রাজকুমার।

তারপর দেখা যেতে লাগল বাবা নেই, শুধু মেয়ে, কুকুর আর রাজকুমার।

দেখা গেল সেই রেসিডেন্সিতে, সেই জ্যু-গার্ডেনে, সেই ইমামবাড়া পথে, সেই গোমতীর ধারে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ভিতরের ব্যাপারটা যেন ঠিক বোধগম্য হল না। আমার সঙ্গে শশী ভার্গবের মুখোমুখি দেখা হয়েছে জ্যু-গার্ডেনে। রাজকুমার লিওর সঙ্গে খেলায় মেতে ছেলেমানুষের মত ছুটোছুটি করছে। শশী তৃণাসনে বসে চেয়েছিল সেই দিকে। আমায় দেখে থতমত খেয়ে গেল একটু। পরে ঈষৎ হেসে বলল, অনেক দিন দেখা নেই, কেমন আছ?

দেখা না হওয়ার কারণ বলা যেতে পারত। কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে বলতে মন সরল না আর।...হাসির আড়ালেও তার অমন বিষণ্ণ মূর্তি আর কখনো দেখি নি। সেই উচ্ছলতাও নেই। স্তিমিত, ব্যথা-ভারাক্রান্ত।

অদূরে ক্রীড়ারত রাজকুমারের দিকে চেয়ে বললাম, ভদ্রলোক কুকুর খুব ভালোবাসেন দেখছি...

অস্ফুট, তীক্ষ্ণ মন্তব্য করল শশী, ছাই ভালোবাসে।

যেটুকু ব্যক্ত করল আর যেটুকু করল না, ওর মুখের দিকে তাকালে তার অর্থ বুঝতে এক মুহূর্তও লাগে না।

বেদপ্রকাশের সঙ্গে অনেকদিন দেখা করি নি। ইচ্ছে করেই করি নি। ওর অবস্থা

জানি ! এর তিন চারিদিন বাদে ওর কাছে গেলাম। কথা উঠল। বেদপ্রকাশ প্রায় শান্ত মুখে বলল, মেয়েটাকে তিলে তিলে দগ্ধে মারছে।

কে ?

ওর বাবা। অ্যারিস্টক্র্যাট্ না হাতি, কানাকড়ির মুরোদ নেই, এখন দাঁও মারবার মতলব।

কিন্তু শশী বেঁকে বসছে না কেন ?

বসছে না কে বলল। কিন্তু এসব ফাঁপা অ্যারিস্টক্র্যাটদের তুমি চেন না, স্বার্থের জন্য ওরা সব করতে পারে।

শুনলাম গত কালই শশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। অপদার্থ কাপুরুষ বলে শশী গালাগাল দিয়েছে তাকে। তারপর কেঁদেছে।

কিন্তু ওর বাবার সঙ্গে দেখা করে তুমি একটা বোঝাপড়া করে আসছ না কেন ?

করতে চেয়েছিলাম। শশীই বাধা দিয়েছে। ওর বাবা রেগে গেলে নাকি আমায় আর জ্যান্ত ফিরতে দেবে না।

লোকটা সত্যিই কাপুরুষ কি না আমারই সন্দেহ হচ্ছিল। বেদপ্রকাশ বলল, কাল সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে রাজকুমারের নেমন্তন্ন। হয়ত কালই ওর বাবা কথা তুলবে।...আমিও যাব।

সন্দেহ গিয়ে এবারে দুর্ভাবনা দেখা দিল, শশীকে বলেছ তুমি যাবে ?

না, মিথ্যে তাকে ভাবিয়ে লাভ কি। কিন্তু যাব ঠিকই।

গিয়েছিল...।

আর ঠিক যে জ্যান্ত ফিরেছে তাও নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়িতে ঢুকেছে সে। বাইরে কারো সাড়াশব্দ নেই। অন্দরমহলে পা বাড়িয়েছে। ইচ্ছে সরাসরি দোতলায় উঠে শশীর বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। নিমন্ত্রিত রাজকুমারের সামনেই যা বলার বলবে। আবছা অন্ধকারে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কান পাতল, কারো সাড়াশব্দ শোনা যায় কিনা। সহসা এক মুহূর্তে যেন দেহের সমস্ত রক্ত জল হয়ে গেল তার। নখদন্তবিদারিত হিংস্র আক্রমণে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

তার বুকের ওপর দু'পা তুলে দাঁড়িয়েছে সিংহ-বিক্রম লিও। কি করত তারপর বলা যায় না। হয়ত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত। কিন্তু বরাত জোরে বাড়ির চাকরটা বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করেছে সেই মুহূর্তে। ছুটে গিয়ে দু'হাতে গলা জাপটে ধরে লিওকে ওর বুক থেকে টেনে নামিয়েছে। কিন্তু তাকে তখন ধরে রাখা দায়, ক্ষিপ্ত গর্জনে বাড়িসুদ্ধ কাঁপছে। ওপর থেকে শশী ছুটে এসেছে, পিছনে তার বাবা এবং রাজকুমারও। চাকরটা পেরে উঠছিল না, শুষ্ক পাংশু মুখে শশী তাড়াতাড়ি এসে শক্তমুঠিতে লিওর গলার বকলসটি ধরে ফেলল। তারপর এলোপাথাড়ি কতকগুলি কিল চড় ঘুষি বর্ষণ করল লিওর ওপর।

এর পরের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ থাক। দিনকতক হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল

বেদপ্রকাশকে। প্রয়োজনে নয়, ভয়ে। তারপর লখ্‌নউ থেকে একেবারে ডুব দিয়েছে সে। বছরখানেক বাদে খবর পাওয়া গেল আগ্রাতে একটা হোটেল খুলে দিব্বি বহাল তবিয়তে আছে।

কুকুরের ভয়ে প্রণয়ের এমন ছন্দপতন অভাবনীয়। তারপর আগ্রার হোটেলেই আবার দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। হাসিমুখে আদর আপ্যায়ন করেছে। কিন্তু ভুলেও শশীর প্রসঙ্গ তোলে নি একবারও।

তুলতাম না হয়ত আমিও। কিন্তু ওপরঅলার ইচ্ছে অন্যরকম। দেখা আবার শশী ভার্গবের সঙ্গেও হয়েছে। সেই বিষণ্ণ, করুণ মূর্তি। বেশবাসের পারিপাট্যও যেন কমেছে। জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ, আর দেখিনে কেন?

বললাম কাজের ঝামলায় থাকি...!

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করল, প্রকাশের খবর জান কিছু?

যা জানি বললাম।

চোখে মুখে একটু আগ্রহ দেখা গেল যেন।—তোমার সঙ্গে দেখা হয়?

হয়, আগ্রায় গেলে ওর ওখানেই উঠি।

আবার কবে যাবে?

ভেবে জবাব দিলাম, মাসখানেক বাদে হয়ত যেতে পারি।

আমায় নিয়ে যাবে সঙ্গে?

চট করে জবাব দেওয়া গেল না। একটু আঘাত দেবার জন্যই বললাম, একলা যাবে, না সঙ্গে তোমার কুকুর নিয়ে যাবে?

অন্যদিকে চেয়ে শশী জবাব দিল, কুকুর নেই...দিয়ে দিয়েছি।

কেমন যেন হয়ে গেলাম। তা যাবে তো যাও না, মিছিমিছি দেরি করবে কেন—।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি গেলে যাবার আগে একবার আমায় জানিও।

লিওর মত রাজকুমারকেও বাবার দাপট এড়িয়ে কি করে বিদায় করল জানায় কৌতূহল ছিল। কিন্তু সেটা আর জিজ্ঞাসা করা গেল না।

শশীকে দেখে বেদপ্রকাশ প্রথমে হকচকিয়ে গেল যেন একটু। তার পরেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বাগত জানাল তাকে। আমার ভাবনা গেল। দু'চার দিনেই ওরা যেন সেই আগের জীবনে ফিরে এলো আবার। আগেরও দ্বিগুণ। হোটেলের দায়িত্ব মাথায় উঠল বেদপ্রকাশের। নতুন প্রেমিক প্রেমিকার মত এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। আজ তাজমহল, কাল ফোর্ট, পরশু ফতেপুর সিক্রি...। আমার মনে হচ্ছিল শশী ভার্গবকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে জীবনে এই একটা ভালো কাজ করেছি।

সেদিন ওরা গেছে ইতমতুদ্দৌল্লায়। চারদিকে দেয়াল ঘেরা বিস্তীর্ণ ভূপ্রান্তরের মাঝখানে নূরজাহানের পিতার স্মৃতিসমাধি। বাগান আর গাছপালায় সবুজের সমারোহ। নির্জনে বেড়াবার মতই জায়গা। সমাধির সিঁড়ির গোড়া থেকে যে প্রশস্ত পথটা শুকনো যমুনার দিকের দেয়ালে গিয়ে মিশেছে সেই পথ ধরেই হাঁটছে তারা। সমাধি এবং লোকজনের কাছ থেকে অনেকটাই দূরে এসে পড়েছে।

প্রত্যাবর্তনের জন্য ফিরে দাঁড়াতেই দেখা গেল একপাল বাঁদর উল্টোদিক থেকে ধীরেসুস্থে এদিকেই আসছে।

শশী বেদপ্রকাশের গা ঘেঁষে পাশ কাটাতে যাবে, অতর্কিতে বাঁদরগুলো আক্রমণ করে বসল ওকে। প্রাণপণে আর্তনাদ করে উঠল শশী ভার্গব। বেদপ্রকাশ কাঠের মত দাঁড়িয়ে! কিন্তু বাঁদরগুলো যেন ক্ষেপে গেছে। ওদিকে দূর থেকে লাঠিসোঁটা নিয়ে হৈ-চৈ করতে করতে সাহায্যের জন্য ছুটে আসছে লোকজন। কিন্তু পথ খুব কমটুকু নয়। এদিকে বেদপ্রকাশও আত্মস্থ হয়ে হাত পা ছুঁড়ে চেষ্টা করছে বাঁদরগুলোকে হটাতে। কিন্তু শশীর পরনের শাড়ি ততক্ষণে ওদের হাতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে! মৃত্যু বিভীষিকায় দিশেহারার মত এদিক ওদিক ছুটে ওদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চেষ্ট করছে সে। ক্রুদ্ধ গর্জনে ওরা চেষ্টা করছে কোনো রকমে একবার ওকে মাটিতে ফেলতে—তার পরেই নখ-দন্তে ফালা ফালা করে দেবে ওই নারী দেহ।

কিন্তু তার আগেই লোকজন এসে পড়ল। বাঁদরের পাল সরে পড়ল। শশীর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ধরাধরি করে তাকে ফটকের কাছে এনে শ্বেত পাথরের বেদির ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। অনেকগুলি নখের আঁচড় লেগেছে পায়ে। একজন বৃদ্ধ মুসলমান কি সব লতাপাতা ছেঁচে লাগিয়ে দিল। কোথাও দাঁত বসেছে কিনা দেখল। বাঁদরের দাঁতের কামড় নাকি বিষাক্ত। চোখে মুখে অনেকক্ষণ ধরে জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান ফিরল শশীর। একটি মুসলমান বউ আধময়লা একটা ওড়না ওর গায়ের ওপর ফেলে দিল। শশী তখনও দিশেহারার মত তাকাচ্ছে চারদিকে আর শিউরে উঠছে।

অতঃপর সমবেত লোকজন বেদপ্রকাশকে বলল, সময় মত তারা দেখেছিল বলেই এ যাত্রা বেঁচে গেছে—আর জীবনে যেন ওদিকটায় জেনানা দিয়ে একলা না যায়, কিছুকালের মধ্যে এই নিয়ে একে একে চার চারজন মেয়েছেলের প্রাণান্ত দশা গেছে সই করে। মেয়েছেলে দেখলেই বাঁদরগুলো ওভাবে আক্রমণ করে। ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে এই বিপদের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক দিন আগেই—গাইডরাও ওদিকে যাওয়ার সম্বন্ধে আগন্তুকদের সতর্ক করে দেয়। কিন্তু কখন তারা ছিটকে বেরিয়ে গেছে কেউ লক্ষ্য করে নি।

উপদেশ শোনা ছেড়ে বেদপ্রকাশ তখন শশীকে নিয়ে হোটেলে ফিরতে পারলে বাঁচে। ধরাধরি করে একটা বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হল তাকে। ত্রাতাদের পঁচিশ টাকা বকশিশ করে বেদপ্রকাশও এসে উঠল।

ওই অবস্থায় ফিরতে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের তলব পড়তে দেখে ঘটনাটা হোটেলময় রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। ডাক্তার অভয় দিয়ে চলে যেতে অনেকেই এসে মৃদুমন্দ ভর্ৎসনা করে গেল বেদপ্রকাশকে। অবশ্য ইতমতুদ্দৌল্লার বানরবাহিনীর কথা জানত যারা, তারাই শুধু। অন্যেরা শুনে শিউরে উঠল।

পরদিন সকালে কাজে বেরুতে হয়েছিল আমায়। ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে বেদপ্রকাশের ঘরে এলাম। আরাম কেদারায় দেহ ছেড়ে

দিয়ে সিগারেট টানছে সে।

কেমন আছে শশী?

ক্ষুদ্র জবাব দিল, ভালো। চলে গেছে...।

আমি অবাক। চলে গেছে মানে! কোথায়?

শাদাসিধে জবাব দিল, তার বাড়ি...এই সকালের ট্রেনে গেল।

তুমি যেতে দিলে! আর দিলে যদি তো নিজে সঙ্গে গেলে না কেন?

বেদপ্রকাশ নিরুত্তর।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কবে যাচ্ছ তুমি?

সিগারেট টানতে টানতে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে নিস্পৃহ মুখে বলল, কাজকর্ম ফেলে আমি যাই কি করে?

বলে ফেললাম, রাজ্যসুদ্ধ লোক যে বিপদের কথা জানে, আনন্দে কাঁসি হারিয়ে সেই বিপদের মধ্যে ওকে টেনে এনে ফেলার সময় তো খুব ছিল!

মৃদুহাস্যে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সে।

রাগ চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, যাবে না কেন, কুকুরের ভয়ে? তোমার জন্যে কত করেছে মেয়েটা জানো? তার অত আদরের লিওকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছে।

শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা অ্যাশপটে গুঁজে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, বিলিয়ে দেয় নি, বেচে দিয়েছে...দু'হাজার টাকায়।

আমি হতভম্ব। সহসা বাক্‌নিঃসরণ হল না।—তোমাকে কে বলল?

কেউ বলে নি জানি। জানি। শশীর 'পরে রাজকুমারের লোভ ছিল না, কুকুরটার 'পরে ছিল।

সবই গোলমেলে ঠেকছে। অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি। চকিতে কি একটা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আসল প্রশ্নটা যেন নিগের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবার।—শশী চলে গেল কেন?

তেমনি নির্বিকার মুখেই জবাব দিল বেদপ্রকাশ, বোকা নয় বলেই গেল। জেনেশুনে তাকে ওই বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছি সেটা বুঝেছে!

জেনেশুনে! রাজ্যের বিস্ময়।

হ্যাঁ। আর সেদিনের সেই সন্ধ্যায় ওদের বাড়িতে আমার ওপর ওই কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল কে তা আমি জানি, সেটাও বুঝেছে—।

বিকেলের তদ্বির তদারক করার জন্য ধীরেসুস্থে গাত্রোত্থান করল বেদপ্রকাশ।

আমি স্তব্ধ, বিমূঢ়।

আর জন্মে ও বোধ হয় শত্রু ছিল।

অতিথি অভ্যাগতের সামনেও একেবারে নাজেহাল করে ছাড়লে। ঠক করে এক পেয়ালা চা রেখে গজেন্দ্রগমনে ফিরে চলল নৃত্যকালী। আমি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, আর কই?

সে সাফ্ জবাব দিলে, আর নেই, দিনের মধ্যে সতেরবার চা খেলে 'নিভার' থাকে!

কথাটা মায়ের মুখে শুনে শুনে শিখেছে। অতিথির সামনে হাসতে চেষ্টাই করলাম। হাসি ফুটল না। বললাম, এতকালের ঝি—দিনকে দিন মাথায় উঠছে, তাড়ালেও যায় না, কি যে করি—।

অতিথি বিদায় নেওয়া মাত্র একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য ভিতরে এলাম। ভিতরে মানে আর একখানাই মাত্র ঘর। কিন্তু নৃত্যকালী বাজারে চলে গেছে। ওকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছেন বলে স্বর্গগতা মায়ের ওপর পর্যন্ত রাগ হতে লাগল।

কাজ নিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ বাদের সাড়া পাওয়া গেল। রান্নার তোড়জোড় করছে। একবার ভাবলাম, উঠে ওর সঙ্গে শেষবারের মত একটা বোঝাপড় করে আসি।...কিন্তু হাতের কাজই পন্ড হবে শুধু। তা'ছাড়া রান্নার সময়ে তার মেজাজ বিগড়ে দেওয়াটা খুব সমীচীন নয়।

কিন্তু একটু বাদে নৃত্যকালী নিজেই এসে উদয় হল। বেশ হাসিখুশি মুখে সংবাদ দিলে, সামনে যে নতুন ভাড়টে এলেন গো দাদাবাবু!

কড়া কিছু বলব বলে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। কিন্তু তার আগে ওর মুখে পরের খবরটা শুনে রাগ আপাতত স্থগিত রাখতে হল।—তিন তিনটে ধিঙ্গি মেয়ে মোটর গাড়ি থেকে নেমে যেন নাচতে নাচতে এসে ঢুকল—সঙ্গে একটা বয়সী মেয়েনোকও আছে—মা টা হবে—।

পুরুষমানুষ কেউ নেই?

তবে আর বলচি কি গো! মেয়ে ভাড়াটে, আমি খপর নিলাম—।

সামনের তিনঘরের ব্লকটা সবে গত সন্ধ্যায় খালি হয়েছে। পিছনের ব্লকের দু'টি ঘরে আমি কায়েমী বাসিন্দা। ভিতরের ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে ওদিকের কথাবার্তা পর্যন্ত কানে আসে। আর মাঝের দরজটা খুলে দিলে তো এক বাড়ি।

বিকেলে নৃত্যকালী আরো খবর সংগ্রহ করে আনল। দুপুরে স্বয়ং কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ সালাপ করে এসেছে। কিন্তু তেমন পছন্দ হয় নি। ঝি বলে তাকে তেমন আমল দেয় নি বলেই বোধ হয়। মেয়েদের কারো সঙ্গে দেখা হয় নি তার। তারা সবাই টেলিফোনে

চাকরি করে—ভালো ভালো মাইনে পায়। আমার কথা কর্ত্রী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন কি করি না করি, কত রোজগার, ইত্যাদি—।

নৃত্যকালী এতসব বড় বড় কথা শুনে কি আর ছোট করে বলবে আমার কথা! বলে এসেছে, তার দাদাবাবু পরের চাকর হতে যাবে কেন, পৈতৃক অর্থ যা আছে তাতে করে এখনো তিনপুরুষ স্বচ্ছন্দে চোখ বুজে কাটিয়ে দিতে পারবে।

বিরক্তিকর। তিনপুরুষ ছেড়ে এই এক পুরুষেরই পরমায়ুর জোর থাকলে শেষ বয়সে কপালে অনটন লেখা আছে। তাছাড়া এই সামান্য পুঁজি থেকেও আর পাঁচজন শরণার্থীর নানা দায়ে মাঝে মধ্যে একটা আধটা স্ফীত অঙ্ক বেরিয়ে যাওয়ায় রীতিমত হাত টেনে চলতে হয়। নৃত্যকালী এ সবই জানে। বন্ধু-বান্ধব অথবা কাউকে পাছে কিছু দিয়ে ফেলি সেই চিন্তায় তার ঘুম নেই। আর সেই কিনা আমাকে নবাব বাদশার দৌহিত্র বানিয়ে এলো!

ক্রমশ আরো কিছু কিছু খবর সরবরাহ করতে লাগলো নৃত্যকালী। কিন্তু নিজে আর একদিনও যায়নি সে বাড়ি। ওর পাশের ঘরের সদু'ঝি সেখানে কাজে লেগেছে। নৃত্যকালীর মতে সদুঝি হাড়-বজ্জাত। কিন্তু তার মুখে শোনা মেয়েগুলোর অশোভন উচ্ছলতার রসালো ইঙ্গিতগুলি সে বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করেছে। যে খুড়তুতো ভাইটি রোজ দেখাশুনা করতে আসে, তার সঙ্গে ওদের হাসাহাসির বহরটা দেখলে নাকি গা জ্বলে যায়।

আমি নৃত্যকালীকেও চিনি, সদুঝিকেও ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। বাড়ির উল্টো দিকের বস্তিতে তারা থাকে। ভূতের মুখে রামনাম!

দু'মাস কেটে গেল। নবাগতাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় বটে, কিন্তু আলাপ হয় নি। বেশ সুশ্রী মেয়ে তিনটি কারো সঙ্গে কারো চেহারায় মিল নেই, প্রায় এক বয়সীই মনে হয় তিনজনকে। টেলিফোন আপিসে এরকম সুশ্রী মেয়েও কাজ করে জানতাম না। আলাপ না হলেও ওরা যে সকৌতুকে লক্ষ্য করে আমাকে, সেটা উপলব্ধি করতাম।

দিনের বেলায় তাদের সম্মিলিত কল-কাকলির রেশ মাঝে মাঝে এখানেও ভেসে আসে। বেলা দুটো আড়াইটের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত আর কোনো সাড়াশব্দ শোনা যায় না। সপ্তাহে একদিন করে একজনের অফ্ ডে। সদুঝি নৃত্যকালীকে বলেছে, চাকরির খাটুনি খুব। রাত দশটার পর মেয়েরা প্রায় আধমরা হয়ে বাড়ি ফেরে।

মেয়েদের নাম, অমিতা শমিতা নমিতা। নাম-মাধুর্য আছে।

তৃতীয় মাসের গোড়ায় হঠাৎ একদিন তিনজন একসঙ্গে এসে আমার ঘর চড়াও করলে। আমি যুগপৎ বিস্ময়ে আনন্দে বিব্রত হয়ে তাদের বসতে দিলাম। নৃত্যকালী একবার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে গভীর এবং গম্ভীর মনোনিবেশে তাদের নিরীক্ষণ করে গেল।

ওদের মধ্যেই একজন পরিচয় পর্ব শুরু করলে। বলল, আমি শমিতা—মেজ, ইনি অমিতা—বড়, আর উনি নমিতা—ছোট। তিনজনেই মিতা, একজন 'অ' একজন 'শ'

একজন 'ন'—জুড়ে দিলে অশনমিতা—অশন মানে কি ?

সমবেত কলহাস্য। মনে হল এই নীরস পরিবেশে হঠাৎ যেন বাগ-বাদিনীর সভার দূতীদের আগমন ঘটল। আমি জবাব দিতে ছাড়লাম না। বললাম, অশন মানে ভোজ্য দ্রব্য।

এ মা গো ! সম্মিলিত রাগরক্ত অভিব্যক্তি শমিতা এবং নমিতার। অমিতা ভ্রূ-ভঙ্গি করে তাদের বলতে চাইল, আর ফাজলামো করতে যাবি— ?

তিনজনের মধ্যে শমিতারই বোধ করি বাক্য-ছটার জোর বেশি। বলল, আপনার লেখা একটু-আধটু পড়ি, আবার ভুলেও যাই—কিন্তু দিদি মস্ত ভক্ত, ও আপনার লেখা পড়ে না, গেলে। পাশাপাশি থাকি, আলাপ করবার জন্য অস্থির, কিন্তু ওদিকে ভীতুর একশেষ—এতবড় লেখক, কি না কি ভাববে—শেষে আমি সাহস দিয়ে নিয়ে এলাম, চলই না তিনজন গিয়ে পড়ি একসঙ্গে ভদ্রলোক মারধর তো আর করবেন না— !

অমিতা ছদ্মকোপে বলল, তুই আচ্ছা মিথ্যেবাদী, ওঁর লেখা আমার থেকে তুই ডবল মন দিয়ে পড়িস। হাসল একটু, সত্যি অনেকদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে হয়েছে, এখানে আসার অনেক আগে থেকেই আপনাকে আমরা চিনি।

আমি সপুলকেই ঘাবড়ে গেলাম। পাবলিশারের ঘরে বইয়ের ঢিপি জমে আছে, বিক্রি নেই। এখনো মাসিক সাপ্তাহিক-এ লেখা ছাপবার জন্য কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জন করে চলতে হয়। তার মধ্যে নারীমুখের এই অবিশ্রান্ত স্তুতি শুনলে আপনারা কি করেন ?

কিন্তু যা করেন তাতে ছন্দ-পতন ঘটালে নৃত্যকালী। ডাকার আগেই সে ঘরে ঢুকে বলল, দুপুরে যখন বেরুবে, চা চিনি কৌটোর দুধের পয়সা দিয়ে যেও—সব ফুরিয়ে গেছে।

মিলিটারি মেজাজে সে আবার প্রস্থান করল।

আমি অবাক। নিঃসন্দেহে জানি ও-তিনটে সামগ্রীই ঘরে মজুত আছে। কারণ, দুদিনও হয় নি এগুলো আনা হয়েছে।

নমিতা বলল, চায়ের কথা শুনেই চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—

অমিতা বলল, ইচ্ছে করছে তো বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিতে বল্‌গে যা না।

শমিতা উঠে দাঁড়াল।—দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি। দরজার কাছে গিয়ে ডাকল, এই ঝি শোনো—বাড়িতে মাকে গিয়ে বলে এসো এখানে চার পেয়ালা চা পঠিয়ে দেবে।

নৃত্যকালী কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে আবার দোরগোড়ার এসে দাঁড়াল।—আমাকে ঝি-টি ডেকো নি বাছা, আমার নাম নেত্যকালী। দাদাবাবুর বেশি চা খাওয়া বারণ আছে।

দু'চোখে আমি বোধকরি তাকে জ্যান্ত ভস্ম করছিলাম। সেটা বুঝেই ও আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে আড়ালে সরে গেল। ইচ্ছে করছিল, উঠে চুলের ঝুঁটি ধরে এক্ষুনি ওকে হিড় হিড় করে বাড়ি থেকে বার করে দিই।

শমিতা অপ্রস্তুতের ভাবটা চাপা দিতে গিয়ে নমিতাকে চোখ রাঙালো, তোর জন্যেই তো— ! পরে আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, ঝি-টি বুঝি আপনার গার্জেন ? খুব

কড়া গার্জেন তো !

বললাম, মায়ের আমলের ঝি, ওই রকম বাড়াবাড়ি করে। আপনারা চা খান তো ব্যবস্থা করি, কতক্ষণ আর লাগবে—।

অমিতা তাড়াতাড়ি বাধা দিল, আপনার বেশি চা খাওয়া বারণ যখন কিছু দরকার নেই। আমাদের বাড়ি কবে আসছেন বলুন—।

এক্ষুনি যেতে পারি।

ওরা হাসল। অমিতা বলল, একটু বাদে তো বেরুবার উদ্যোগ করতে হবে, নইলে ঠিক ধরে নিয়ে যেতাম। কাল নয়, পরশু সকালে আসুন, আমাদের ওখানে চা খাবেন।

সম্মতি নিয়ে তারা চলে গেল। আমি নৃত্যকালীর উদ্দেশে উঠে এলাম। কিন্তু কিছু বলার আগেই সে ভালোমানুষের মত বলল, ওরা ভালো মেয়ে নয় আমি তোমাকে বলে রাখছি, বেশি মিশো নি—।

কিছু বললে সে হয়ত এমন মধুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে যে ওপাশ থেকে ওরা শুনতে পাবে। তবু বললাম, তুমি ক'মাসের মাইনে পেলে এ বাড়ি থেকে বিদেয় হতে পারো ?

নৃত্যকালী কালো দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বলল, কিছু টাকা দাও না দাদাবাবু, ঘরটা মেরামত করে নি, বর্ষার জলে পোড়া ঘরে টেঁকা দায়—তিন মাসের মাইনে দিলেই হবে, মাসে দুটাকা করে কেটে নিও।

প্রস্থান করলাম।

যথারীতি চায়ের আমন্ত্রণ সেরে এলাম। অশনমিতার দল ভারি খুশি। যেন মস্ত হোমরাচোমরা কেউ এসেছে তাদের বাড়ি। ওদের মা নিজে সামনে থেকে আদর অভ্যর্থনা করলেন।

তারপর এই চায়ের ব্যাপারটা মাঝে মাঝেই চলতে লাগল। আর নৃত্যকালীকে আগে থাকতে চোখ রাঙিয়ে রাখলাম, একটা বেসামাল কথা যদি শুনি ওরা এলে, তাহলে সেদিনই তার সঙ্গে, ইত্যাদি—।

এর পরে মাঝে মধ্যে মধ্যাহ্নভোজনের আমন্ত্রণ আসতে লাগল। নৃত্যকালীর দাপট উপলব্ধি করত বলেই বোধ হয় তাকেও একদিন বলেছিল ওরা। সে সাফ্ জবাব দিয়েছে, থাক্ বাছা থাক্, যাকে খাওয়াচ্ছো খাওয়াও, আমরা নুন ভাত খাই, ওসব বড়মানুষি খাওয়া পোষাবে না।

চায়ের আমন্ত্রণ সপ্তাহে একদিন ছাড়িয়ে দু'তিন দিনে এসে ঠেকেছে। যখন তখন শমিতা অথবা নমিতা এসে হুকুম করে, দিদির তলব, চা রেডি—চলুন।

আমি আপত্তি করলেও টেঁকে না। দিদির আগমনও ঘটে যখন তখন। বই নিতে আর বই দিতে আসে সে। মাঝে মাঝে অবাক লাগত, চাকরি করেও এত তাড়াতাড়ি এক একটা বই কি করে শেষ করে ! একদিন ঠাট্টা করলাম, পড় তো, না কি ওটা উপলক্ষ শুধু ?

এই ক'মাসে ওদের অনুরোধেই তুমিটা চালু করে ফেলেছি। অমিতা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল যেন। পরে হেসে চ্যালেঞ্জ করল, পরীক্ষা করেই দেখুন না।

শমিতা নমিতাও আজকাল আভাসে ইঙ্গিতে ঠাট্টা করে একটু আধটু। অমিতা ছদ্ম ক্রোধে চোখ রাঙায় তাদের। আর, একটা মিষ্টি সম্ভাবনার কল্পনা আমার মনেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে না বললে মিথ্যে বলা হবে। নিজের যখন সঙ্গতি বিশেষ নেই, এরকম চাকরি করা মেয়েই তো ভালো।

ওদের সম্বন্ধে নৃত্যকালীর মনোভাবটা এমন কেন কিছুতে বুঝতাম না । বোধহয়, সম্ভাবনাটা সত্যি হলে ওর আধিপত্য ঘুচে যাবে সেটাই ওর ভয়। অমিতা রাত দশটার পর বাড়ি ফিরেও যেদিন বই নিতে বা দিতে আসত, সেদিন নৃত্যকালীর সেই নির্বাক মূর্তির দিকে চেয়ে অমিতা কেন, আমি পর্যন্ত প্রায় শঙ্কিত হয়ে উঠতাম। অমিতা একদিন বলেই ফেলল, আপনি ওই ঝিটাকে এত আশকারা দেন কেন, ওলোক ভালো নয়।

জবাব দিলাম, লোক ভালই, তবে মেজাজ ভালো নয়।

ওঃ, ঝিয়ের আবার মেজাজ ! আপনি আচ্ছা লোক—আমি বলছি ওলোকও ভালো নয়, ওর অনেক দুর্নাম আছে, সদুঝির মুখে আমি শুনেছি...।

ওর সঙ্গে কথা বললে আবার সদুঝির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনবে, সেদিক থেকে লোক ওরা দু'জনেই খাসা।

আপনি তা'হলে জেনে শুনেও ওকে রেখেছেন, কলকাতা শহরে কি আর ঝি নেই ?

ছাড়াতে পারলে তো বাঁচতাম, ও-ই তাহলে উল্টে আমায় প্রাণ ছাড়া করবে।

বলা বাহুল্য, জবাবাটা অমিতার মনঃপূত হয় নি।

দিন দুই একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ওদের কারো সঙ্গে দেখা হয় নি। ওরাও কেউ আসে নি দেখে কাজের ফাঁকে ফাঁকেও বিস্মিত হচ্ছিলাম। এমন সময় নৃত্যকালী বারতা পেশ করল।—ও বাড়িতে যে অমিবস্যে নেমেছে গো দাদাবাবু !

সচকিত হয়ে তাকালাম ওর দিকে। নৃত্যকালী বলল, মেজ মেয়েটা এক বড়নোক ছেলের সঙ্গে ভালোবাসাবাসি কচ্ছিল তলায় তলায়—ছেলের বাপ জানতে পেরে আগুন—শেষে ঠান্ডা হয়ে আড়াই হাজার টাকা পণ হেঁকেছে—এক কড়ি কমে ছেলের বে দেবে না বল্‌ছে—।

তুমি জানলে কোত্থেকে ?

সদুঝি বলল, গিন্নিমা নাকি কান্নাকাটি কচ্ছিল খুব।

শুনে দুঃখ হল, অমন হাসিখুশি চটপটে মেয়েটা। একটু বাদে গেলাম ওদের বাড়ি। আমায় দেখে শমিতা গম্ভীর মুখে আর একদিকে চলে গেল। অমিতা-নমিতারও মুখ কালো। একথা সেকথার পর তাদের মা দুঃসংবাদটা জানালেন।—ছেলেটা ভালো, কিন্তু বাপটা চামার। বাপের অমতেই বিয়ে করত, কিন্তু তাহলে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবে, অত বিষয় সম্পত্তি...এই একমাত্র ছেলে, ইত্যাদি—।

বললাম, একমাত্র ছেলে যখন বাপের দাবীটা নামতেও পারে, অপেক্ষা করে দেখুন না। অমিতার কাছে গিয়ে বসতে সে বলল, শমির জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে, আমি তিন বছর আগেই বলেছিলাম ওসব বড়লোক টড়লোকের ধারে কাছে যাস নি। আমাকে তখন মারে আর কি। ভদ্রলোক অবশ্য ভালো মানুষই—

ভালোমানুষের সম্বন্ধে দু'চারটে কড়া কথা বলতে পারতাম। কিন্তু কি লাভ ! পরদিন দুপুরের দিকে শমিতা এলো। ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মুখ। বলল, একটা বই দিন দেখি, সময় কাটছে না।

আজ আপিসে যাও নি ?

নাঃ, ভালো লাগল না।

ওকে বসতে বললাম। বসল না। বললাম, বাস্তবিক ভারি দুঃখের কথা--

শমি জবাব দিলে, দুঃখের কথা না ছাইয়ের কথা, আপনি দিন দেখি আমাকে আড়াই হাজার টাকা, বিয়ের তিন মাসের মধ্যে সুদসুদ্ধু যদি না ফেরত দেওয়াতে পারি তো আমার নামে কুকুর পুষবেন।

হকচকিয়ে গেলাম। শমি বই না নিয়েই চলে গেল। এরকম কথা ও-ই বলতে পারে।

অস্বস্তি লাগছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে নিজের সামান্য পুঁজিতে যেন আড়াই হাজার টাকা কম দেখছি।

পরদিনটা কেটে গেল। তার পরদিন সকালের দিকে নমিতা এসে হাজির। মুখভাব সন্ত্রস্ত। আঁচলের আড়াল থেকে একটা কৌটো বার করল। বলল, আফিং, শমির বাক্সয় ছিল। কাল রাত্রি থেকেই কেমন সন্দেহ হতে সারাক্ষণ তাকে তাকে ছিলাম—এখন যেই বেরিয়েছে একটু, বাক্স ঘেঁটে দেখি এই ব্যাপার। এটা কি করব এখন ? বাড়ি ফিরে তো হুলস্থূল বাধাবে।

কৌটোটা নমিতার হাত থেকে নিয়ে খুলে দেখলাম। আমারও উত্তেজনা কাটতে সময় লাগল একটু। শেষে শান্ত মুখে বললাম, শমি এলে বোলো, সেদিন সে যা বলে গেছে আমি চেষ্টা করে দেখব, হয়ত টাকা পাওয়া যাবে।

নমিতা বিস্ফারিত হয়ে উঠল, আপনি টাকা দেবেন ?

আমার টাকা কোথায় যে দেব, দেখা যাক্—।

ইচ্ছে করেই ঘুরিয়ে বললাম। আড়াই হাজার টাকার মায়া একেবারে কাটানো সহজ নয়।

নমিতা প্রায় ছুটেই চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে করাল-বদনী নৃত্যকালীর আবির্ভাব ঘটল। সে সবই শুনেছে বোঝা গেল। আমি যত তর্জন করি ওর গর্জন তত বাড়ে। ইচ্ছে হল হাতের আফিঙের কৌটোটা ওর মুখে গুঁজে দিই। শেষে আমার মায়ের নামে দিব্বি দিয়ে গেল, এক সপ্তাহের মধ্যে যেন টাকা বা কোনো কথা না দিই—ও এর মধ্যে দেখছে কি ব্যাপার।

একে একে দুটো দিন কাটল। ও বাড়ির আদর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু ভালো লাগে না। আড়াই হাজার টাকার শোক বোধ হয়। অমিতা সেদিন নিরালায় জিজ্ঞাসা করল, ওদের তাহলে কথা দিয়ে পাঠাই ?

নিস্পৃহ মুখে বললাম, যাক কটা দিন, চেষ্টা করে দেখি—।

অমিতা ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, এরকম আশা দিয়ে ফেলেছ যখন না দিয়ে

তো পারবে না, মিছিমিছি দেরি করে লাভ কী?

টাকার আশ্বাস দিয়ে পাঠানোর পর থেকে অমিতা আমাকে তুমি বলছে। কিন্তু তার কথাগুলো কেমন যেন কটু লাগল কানে। নৃত্যকালী মায়ের দিব্বি দিয়ে রেখেছে সাত দিনের আগে কিছু বলব না। তাছাড়া ও এমন বিষদৃষ্টিতে দেখে কেন ওদের, এ চিন্তাটাও বোধ করি দিজের অজ্ঞাতে মনে আসছে এখন। জবাব দিলাম, আশা দিয়েও যদি আত্মহত্যা থেকে কাউকে বাঁচানো যায় সেটা খারাপ কি। দেখি, কটা দিন না গেলে কিছুই বলতে পারছি না।

এর পরে তিন দিন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। তারাও আসে নি বা ডাকে নি। আমিও যাই নি। কেমন একটা থমথমে ভাব। ভাবছি আর দু'টো দিন গেলে ব্যাঙ্ক থেকে আড়াই হাজার টাকা তুলে একেবারে ওদের হাতে ফেলে দিয়ে টাকার শোক ভুলব। যেটা যাবে সেটা না যাওয়া পর্যন্ত অস্বস্তি।

ছ'দিনের দিন বেলা প্রায় চারটে নাগাদ নৃত্যকালী সেই কালো দাঁত বার করা হাসি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।—কি গো দাদাবাবু, ওদের টাকা দেবে তো দিয়ে এসো, ওদের যে টাকার বড্ড দরকার।

আমি শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিলাম। কাগজ সরালাম। নৃত্যকালী পা ছড়িয়ে বসল মেঝেতে। —বিয়ে টিয়ে কিছু নয়, ওরা ব্যবসা করবে—দোকান খুলবে গো—ওই যে গা হাত পা টেপানোর দোকান। সেরকম একটা দোকানেই তো তিনজনে চাকরি কচ্ছে এখন—তোমার কাছ থেকে টাকা পাবে জেনে ঘরও ঠিক করে ফেলেছে, দেখতে দেখতে বড়নোক হয়ে যাবে এখন।

আমার হাত পা অসাড়। কোনো রকমে উঠে বসলাম। নৃত্যকালীর টিকা-টিপ্পনী বাদ দিয়ে যেটুকু আহরণ করা গেল, সেটা গুছিয়ে বললে এরকম দাঁড়ায়ঃ

—নৃত্যকালীর প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল ওরা বোন টোন কিছু নয়, আর ওদের খুড়তুতো ভাই যাকে বলছে সেও একটা পাজী লোক। সদুঝি আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কথা বলত। মাঝে এই টাকার ব্যাপারটা ও একদম বিশ্বাস করে নি। কারণ সদুঝি বলেছে, তিন মেয়ে, ওই মা—মা না ছাই—আর ওই লোকটা প্রায়ই ফিস্ ফিস্ করে কি পরামর্শ করে। আর এদিকে দিব্বি খায় দায় ঘুরে বেড়ায়, অথচ আমাকে দেখলেই শুধু মুখ কালো করে থাকে। সেদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করার পর থেকেই নৃত্যকালী সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। গত কাল ছুটি ছিল বড় মেয়েটার। দুপুরে খুড়তুতো ভাইটাকে আসতে দেখে কিছুক্ষণ বাদে ভিতরের দরজা খুলে নৃত্যকালী সরাসরি ওদের বাড়ির অন্দরে গিয়ে হাজির। গিন্নিটা এক ঘরে ঘুমুচ্ছে, আর এক ঘরে লোকটার বুকের ওপর মুখ রেখে মেয়েটা গল্পসল্প করছে। ওকে দেখে দু'জনেই হাঁ। নৃত্যকালী বলল, চমকে উঠোনি বাছারা—তোমাদের আমি খুব চিনি, আমারও অমনি দিন ছিল—তোমাদের একটা কথা বলতে এনু, শোনো তো শোনো—।

তারা বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল। নৃত্যকালী বল, তোমরা টাকার জন্যে টোপ ফেলেছ, ও ছোঁড়া হাড় কেপ্পন, একটা পয়সাও দেবে না শুনে রাখো, সেদিন ঝোঁকের

মাথায় বলে ফেলে নিজেই পস্তাচ্ছে আর কাটান দেবার মতলব ভাঁজছে।—কিন্তু এই নেত্যঝি পারে না এমন কম্ম নেই, ওর সংসারে খেটে খেটে হাড়মাস কালি হয়েছে—টাকা দিয়ে কি করা হবে আর তার কি লাভ হবে জানতে পেলে টাকা ঠিক আদায় হয়ে যাবে।

লোকটা প্রায় তাড়া করে এসেছিল ওকে। কিন্তু মেয়েটা থামালে। কারণ, এ অবস্থায় দেখে ফেলেছে যখন, এমনিতে টাকা পাবার আশা তো গেছেই। ওকে সেখানে বসিয়ে অন্য ঘরে বুড়িটাকে জাগিয়ে অকেনক্ষণ শলাপরামর্শ করে এলো। নৃত্যকালীকে একেবারে অবিশ্বাস করে নি। ওর কথা সদুঝির মুখে শুনেছে, আর আমার ওপর তার একচ্ছত্র প্রতাপ নিজেরাই দেখেছে। এখন একমাত্র পথ ওকে দলে টানা। তবু অনুনয় বিনয় করে নৃত্যকালীর কাছ থেকে একটা দিনের সময় নিলে তারা। বোধ হয় অন্য দু'জনের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার সেইজন্যে। আজ সবাই মিলে পরিকল্পনাটা ব্যক্ত করল ওর কাছে। আর লোভ দেখাল, টাকা আদায় হলে নৃত্যকালীর দুঃখ ঘুচে যাবে। ওকেও সেখানে চাকরি দেওয়া হবে, মাইনে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হবেই, এ ছাড়াও উপরি রোজগার আছে—অবিলম্বে টাকাটা যেমন করে হোক পাইয়ে দিতে হবে।

নৃত্যকালীর কাছ থেকে সুনিশ্চিত আশ্বাস পেয়ে তারা কাজে বেরিয়ে যেতে সে আমাকে সুখবরটা দিতে এলো।

আমি নির্বাক, হতভম্ব। বিশ্বাস করব? অবিশ্বাস করব? কি করব?

অনেক ভেবে আমার একজন বন্ধুর কাছে গেলাম। বন্ধুটি পদস্থ পুলিস কর্মচারী। আসল ব্যাপার কিছু না বলে তাকে একটা বিচিত্র অনুরোধ করে এলাম। দু'জন লাল পাগড়ি বাহন নিয়ে এবং নিজেও সরকারি পোশাক পরে তাঁকে পরদিন সকালে আমার বাড়িতে একটু চা খেয়ে যেতে হবে। আর তার আগে একবারটি শুধু সামনের ব্লক-এ এক মিনিটের জন্য থেমে সেই বাড়ির লোকদের ডেকে সেখানে কে কে থাকে না থাকে প্রশ্ন করতে হবে।

বন্ধু বিস্মিত হলেও শেষ পর্যন্ত কথা দিলেন অনুরোধটি যথাসময়ে পালন করবেন।

পালন করলেনও। সামনের ব্লক-এ মিনিট দুই কথাবার্তা বলে দুজন পুলিস সমেত আমার এখানে চলে এলেন তিনি। কিছু প্রশ্ন করার আগেই আমি জবাব দিলাম, পরে বলব, যা বলেছি করেছ?

তিনি ঘাড় নাড়লেন। আমি নৃত্যকালীকে বললাম, সকলকে চা দিতে। পুলিস দেখে নৃত্যকালী সুড়সুড় করে চা এবং নির্দিষ্ট খাবার দিয়ে গেল। তারা চলে যেতেই উচ্ছিষ্ট সরঞ্জামগুলো সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে একটা বই খুলে বসলাম।

একটু বাদেই অশনমিতার দল এসে হাজির। শুষ্ক, পাংশু মূর্তি সব। অমিতা জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, পুলিস কেন?

তাচ্ছিল্য সহকারে জবাব দিলাম, যতসব বাজে কোথা থেকে খবর পেয়েছে পাড়ায় কতগুলো খারাপ মেয়ের আমদানী হয়েছে—তাই শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে।

এতক্ষণ কি করছিল?

এই সবই জিজ্ঞাসাবাদ করছিল।

আমি মনোনিবেশ সহকারে পড়ছি। ওরা নিঃশব্দে একটুখানি অপেক্ষা করে আস্তে আস্তে চলে গেল। কিন্তু অমিতা ফিরল আবার। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ওই টাকাটার যোগাড় হয়েছে।

মুখ না তুলেই জবাব দিলাম, কই আর হল...।

চলে গেল।

বেশি রাতে টের পেলাম চুপি চুপি ওরা বাড়ি ছেড়ে চলল।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই নৃত্যকালীর গজগজানি কানে এল। বেলা পর্যন্ত ঘুমুবার দরুন আমার উদ্দেশে এক পশলা বর্ষণ হচ্ছে। আমি ইচ্ছে করেই ঘুমোবার ভান করে পড়ে রইলাম আরো খানিকক্ষণ। নৃত্যকালী বকেই চলেছে।

আর, আমি ভাবছি আর জন্মে ও বোধ হয় মা ছিল।

লীলাবতী

কাহিনীর পটভূমি যদিও সুদূর গোয়ালিয়র দুর্গের অন্তরভাগ, তবু কলকাতার সঙ্গে এর খানিকটা যোগ আছে। ভূমিকায় সেটুকু সংক্ষেপে সেরে নিতে চাই। আর্টিস্ট অম্বরনাথ শুধু যে বাঙলী তাই নয়, তাঁদের বংশগত যশ-অপযশের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসে। পূর্বপুরুষদের কার নাকি রাজা উপাধি ছিল। পরবর্তী কয়েক পুরুষের জীবন কেটেছে সেই গৌরবের ঢেকুর তুলে। ঐশ্বর্যের উৎসে শুকনো টান ধরেছে অনেক দিন, জমিদারিও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় বিলীন। তবু,আজও এঁদের সঞ্চয়ের হিসেব নিলে দেখা যাবে, দু'তিনটে মাঝারি পরিবারের দু'তিন পুরুষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদন চলতে পারে। কিন্তু দিন বদলালেও বাড়ির ছেলেদের ধাত বদলায় নি এখনো। কখনো তাঁরা সাঙ্গোপাঙ্গ মোসাহেব নিয়ে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠন খুলে বসেন, কখনো বা থিয়েটার কোম্পানি। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ি এঁদের দ্রুত চলে এখনো। অন্দরমহলের পরিবর্তনটুকু কিন্তু সুস্পষ্ট। একদা তাঁরা ছিলেন অসূর্যম্পশ্যা। পুরুষের সঙ্গ পেতেন রাতের নিভৃতে। পরবর্তিনীরা আজ দল বেঁধে সিনেমায় যান, পিকনিকে যান, খেলা দেখেন, চ্যারিটি শো'র টিকিট বিক্রি করেন অপরিমিত উৎসাহ।

এহেন পরিবারের ছেলে অম্বরনাথ আর্টিস্ট হবেন, এ এমন কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তাঁর চরিত্রগত বৈচিত্র্যটুকু আমাকে আকর্ষণ করেছে। বছর দশেক আগের কথা। একে বয়েস কম তায় ডাম্বেল বার্বেল ভাঁজার উত্তাপটুকু দেহে সকল সময় উপলব্ধি করি। কানে এল, সঙ্গীসাথী নিয়ে প্রায়ই এপাড়ায় বিচরণ করতে আসেন যে ধনীর দুলালটি, তাঁর নাকি মতিগতি ভালো নয়। যোগাযোগ ঘটল একদিন। আচমকা পথরোধ করে বেশ দু'চারটে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, ফের এপথে আসতে দেখি তো ঠ্যাং ভেঙে দেব।

বেগতিক দেখে সঙ্গীরা তাঁর পার পার কেটে পড়লেন। অম্বরনাথ দাঁড়িয়ে রইলেন

হতভম্বের মত। পরে আমার বন্ধুদের দু'এক জনকে এগিয়ে আসতে দেখে সভয়ে বলে উঠলেন, আপনারও এমনি এক একটা ঝাঁকানি দিলে হাড়গুলো সব খুলে খুলে যাবে যে! নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন আমাকে, মন্তব্য করলেন, জোর আছে, একা লড়লেও পারতাম না। হাসলেন একটু, আপনার বাড়ি কোনটা?

মানুষটি ভয় যে পান নি এ স্পষ্ট বোঝা গেল। আমার সঙ্গীরাও একটু যেন অবাক হয়েই দেখতে লাগলেন তাঁকে। তাই কঠিন কণ্ঠেই বলতে হল, ওসব বড়লোকি চাল রেখে সোজা পথ দেখুন, আর যা বললাম মনে থাকে যেন।

দু'চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। সে চাউনি দেখে নিজের অজ্ঞাতে হয়ত বা আমিও বিস্মিত হচ্ছিলাম। অল্প হেসে তিনি বললেন, আচ্ছা আবার দেখা হবে, গুড বাই—।

মৃদুমন্দ গতিতে ফিরে চললেন। এক জন সঙ্গী দ্বিধান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা শাসিয়ে গেল কি না বুঝলাম না তো, ধরব আবার?

বললাম, থাক, দেখা যদি হয় আবার তো ওকে এ ভাবে ফিরতে হবে না।

কিন্তু দেখা আবারও হল এবং সেই রাত্রিতেই। পথেঘাটে নয়, একেবারে আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায়। একজন ভদ্রলোক ডাকছেন শুনে এসে দেখি সহজ শৈথিল্যে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি। বিস্ময় দমন করতে হল, কি চান?

একগাল হেসে তিনি জবাব দিলেন, আপনার কাছেই তো এলাম, বলেছিলাম না দেখা হবে, বসুন না। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, সজোরে হেসে উঠলেন আবারও।—ভারি অদ্ভুত মানুষ আপনি, আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। ও কি, ওভাবে দেখছেন কি, আবার ঝাঁকুনি দেবেন না তো? গায়ের ব্যথাটা এখনো মরে নি—

হেসে ফেলেছিলাম।—অদ্ভুত মানুষ আমি, না আপনি। কিন্তু এ সময়ে হঠাৎ কি মনে করে?

আলাপ করতে এলাম। আপনি পড়েন? মোটে এম. এ, দেবেন? আপনি তো তাহলে ছেলেমানুষ আমার কাছে। চার বছর আগেই আমার ওপাট শেষ হয়ে গেছে।

চেষ্টা করেও রাগতে পারছিলাম না। তিনি আবার বললেন, আপনার বাড়ি খুঁজে বার করতে হয়রান হয়ে গেছি। বেজায় খিদে পেয়ে গেছে। আর কিছু না হোক, এক পেয়ালা চা অন্তত আনতে বলুন না?

উঠতে হল। কি ভেবে মাকে বললাম, চায়ের সঙ্গে এক বাটি মুড়ি বৈঠকখানায় পাঠাও তো, একজন বড়লোকের ছেলের সৎকার করি।

মা অবাক, মুড়ি কি রে!

হ্যাঁ মুড়ি, আর কিছু দিও না কিন্তু—আর, চা।

কিন্তু মুড়ির বাটি দেখে অতিথি আমার সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন যেন। জব্দ করতে গিয়ে জব্দ হলাম নিজেই। একবারে যতটা সম্ভব মুখে পুরে দিয়ে অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন, গ্র্যান্ড—। পরে ঢোক গিলে মন্তব্য করলেন, ঘি দিয়ে না মেখে তেল দিয়ে

মাখলে আরো ভালো হত—অনেক দিন আগে খেয়েছিলাম।

কৃত্রিমতা থাকলে চোখে পড়ত। নিচের ঘিমাখা চিনিটুকু পর্যন্ত যে নিষ্ঠা সহকারে চেটেপুটে খেলেন সেটা দেখবার মত। পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতায় তাঁর মত ভোজনরসিক আমি আর দেখি নি। খাওয়া থেকে খাওয়ার আড়ম্বর তাঁর চতুর্গুণ।

চায়ের পেয়ালায় সশব্দে বার দুই চুমুক দিয়ে আরামের নিশ্বাস ফেললেন একটা। নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আপনি বুঝি এ পাড়ার পাণ্ডা একজন?

না, তবে কর্তব্যবোধ আছে খানিকটা।

হুঁ, এম, এ, পাসের আগে এ রকম কর্তব্যবোধ বেশি চারিয়ে উঠলে ফেল করা কপালে আছে আপনার।...তা, আমি কি জন্যে এদিকে আসি বলে মনে করেন, এখানকার মেয়েগুলোকে বিগড়ে দিতে?

সে আপনিই ভালো জানেন।

মুখের দিকে চেয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, রেগে গেছেন বুঝি? এ রকম ভাবাটা অন্যায় নয় বটে, আমাদের বাড়িতে এ তো জলভাত ব্যাপার। কিন্তু বড় নিরেমিষ লাগে। আমি আর্টিস্ট অম্বরনাথ—ছবি আঁকি। বড় হব একদিন জানা কথা, কিন্তু বাড়িতে কেউ বিশ্বাস করে না। একটা স্টুডিও অবশ্য করে দিয়েছে। অনেক বলে কয়ে দাদুকে রাজি করিয়েছি—মডেল আনার টাকা দেবে।

মানুষটির প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছি অস্বীকার করব না। আমন্ত্রণ এড়াতে না পেরে তাঁর বাড়িও যাই। প্রথম মাঝে মাঝে, পরে রোজ। নিজের অজ্ঞাতে কবে দাদা ডাকতেও শুরু করলাম তাঁকে। তাঁর মায়ের সঙ্গে আলাপ হতে আরো একটা প্রাচীন যোগসূত্র বেরিয়ে পড়ল। আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি গুরুগিরি করতেন এই বংশের। অন্দরমহলে প্রবেশের অব্যর্থ পাসপোর্ট। অম্বরনাথ যখন তাঁর মায়ের উদ্দেশে হাঁক দিতেন, মা, তোমার গুরুবংশের ছেলে এসেছে দেখো, তখন বাড়ির কমবয়সী মেয়েদের অবজ্ঞা-মিশ্রিত কৌতূহল গায়ে বিঁধত যেন। ছেলেদের নির্লিপ্ততাও নয়নাভিরাম নয়। কিন্তু একা অম্বরনাথের আন্তরিকতায় কোনো প্রতিকূল অনুভূতি গায়ে মাখার অবকাশ পেতাম না। তাছাড়া, বাড়ির সকলের সেরা এই খাপছাড়া লোকটির আমার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখে সকলেই ক্রমশ কাছে আসতে লাগলেন।

এবারে মূল কাহিনীতে আসা দরকার। পূর্বোক্ত ঘনিষ্ঠতার বছর দুই বাদে অম্বরনাথ কি একটা শিল্প অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়র রওনা হলেন। দশ পনের দিনের মধ্যেই ফেরার কথা। কিন্তু আট বছর অতিবাহিত হতে চলল, আজও তিনি ফেরেন নি। অথচ, তিনি যে বহাল তবিয়তে অবস্থান করছেন সেখানে, এ সংবাদ এখানে আসে।

আর একটু প্রাঞ্জল করে বলি। গোয়ালিয়র যাত্রার তিন মাস বাদের প্রথম তাঁর খবর পাওয়া গেল। তার সারাংশ, এক রাজপুত রমণীর রূপবাণে বিদ্ধ হয়ে অম্বরনাথ ওই মরুভূমির দেশে আটকে পড়েছেন। শুনে বাড়ির কেউ, এমন কি অম্বরনাথের বাবা মাও বিশেষ চিন্তিত হয়েছেন বলে মনে হল না। সমবয়সী জ্ঞাতিবর্গ হাসলেন মনে

মনে, এত দিনে খোলসটা গেছে যা হোক। এর কিছুকাল বাদে জানা গেল, অম্বরনাথ ওই মেয়েটিকে বিবাহ করেছেন। এই সংবাদটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত। অন্য সকল দিকে লাগাম ছেড়ে দিলেও বিয়ের ব্যাপারে বাড়ির সকলেই বেশ রক্ষণশীল।

অম্বরনাথের বাবা প্রকাশ্যেই অসন্তোষ জ্ঞাপন করলেন, সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা কেন বাপু!

দাদু অবশ্য ব্যাপারটা গায়ে মাখলেন না।—হুঁঃ, এ আবার বিয়ে দু'দিন গেলেই চলে আসবে'খন।

মা শঙ্কিত হলেন, বিদেশ-বিভূঁইয়ে কার পাল্লায় পড়ল কে-জানে, কলকাতা হলে কি আর অতটা ভাবি!

ছেলেরা সচকিত হলেন, বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়েছে যখন রূপের ব্যাপারটা অবহেলার নয় নিশ্চয়। মেয়েরা নাসিকা কুঞ্চিত করলেন, মেম বিয়ে করলেও না হয় লোকের কাছে বলা যেত, কোথা থেকে কি না রাজপুতানী!

গেল কিছু কাল। বাবা লিখলেন টাকা পাঠাচ্ছি, যা হোক একটা রফা করে চলে এসো। বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করে মা চিঠি লিখলেন, মেয়েটিকে না হয় সঙ্গে নিয়েই এসো, তার জন্য আমি একটা আলাদা বাড়ি ঠিক করে দেব'খন।

কিন্তু অম্বরনাথের কোনো সাড়াশব্দ নেই।

এর পরে এখান থেকে এক জন সাগ্রহে রওনা হলেন টাকা এবং পরামর্শের ঝুলি নিয়ে। শুষ্ক পাণ্ডুর মুখে ফিরেও এলেন আবার। প্রশ্নের জবাবে শুধু বললেন, বাপ! বিষ মাখানো ছুরি—জ্বালাতন না করে দম নিতে দাও এখন, প্রাণে বেঁচে এসেছি এই ঢের!

কিন্তু এ সত্ত্বেও দেখা গেল, ততোধিক আগ্রহে আর একজন জ্ঞাতি রওনা হলেন অম্বরনাথকে ফিরিয়ে আনতে। আর তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তাঁর অবস্থা আরো বেদনাকরুণ। কপালে পট্টি বাঁধা—পা পিছলে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি। অম্বরনাথের কথা উঠতে জবাব দিয়েছেন, তার আশা ছেড়ে দাও, সে আর ফিরছে না।

সকল আভিজাত্য ভুলে আমাদের বাড়ি এসেই কেঁদে ফেললেন তাঁর মা। একদিন নয় পর পর অনেক দিন।—বিদেশে বেঘোরে একটা ছেলে শেষ হয়ে যাবে, তোমরা দেখবে না?

বললাম, ভাবছেন কেন, ভালই তো আছে শুনছেন।

এর নাম ভালো থাকা! তুমি একবার যাও বাবা, তোমাকে ভালবাসে, তোমার কথা শুনবে।

অনেক চেষ্টার পর তাঁকে বোঝানো গেল, আমার যাওয়াটা সম্ভব নয় এবং সুশোভনও নয়। তবে, চিঠি লিখে দেখতে পারি।

কিন্তু তাও পারি নি। হৃদ্যতা সত্ত্বেও অম্বরনাথ নিজে থেকে আমাকে একটি পত্রেও লেখে নি। আমিই বা গায়ে পড়ে লিখতে যাই কেন?

শোনা গেল, সেখানকার কোন একটা স্কুলে অম্বরনাথ চাকরি নিয়েছেন, ছাত্রদের

ছবি আঁকা শেখান। শুনে তাঁর মা কপালে করাঘাত করেন, শেষকালে কি না ইস্কুলমাস্টারী, মেয়েটা কি গুণ করল ওকে!

সুদীর্ঘ আট বছর অতিবাহিত হয়েছে। অম্বরনাথের আশা ছেড়েছেন সকলেই। এমন কি তাঁর মা'ও। কিন্তু এতকাল বাদেও যখন শুনলেন, হঠাৎ গোয়ালিয়র যাত্রার একটা যোগাযোগ ঘটেছে আমার, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন। সকাতরে অনুনয় করলেন, একবার শেষ চেষ্টা করতে হবে তোমাকে, একটা মেয়ের সঙ্গে আর বোঝাপড়া করতে পারবে না?

জবাব দিলাম, সে চেষ্টা তো আরো অনেকে করেছেন।

তাদের কথা ছেড়ে দাও, তারা নিজেরাই হয়ত রূপ দেখে ভুলেছে। তুমি কথা দাও চেষ্টা করবে।

বললাম, করব চেষ্টা।

ইতিহাস সম্মেলন হবে গোয়ালিয়রে। খবরের কাগজের তরফ থেকে আমি যাব তার খবরদালালি করতে। সুযোগ পাওয়া মাত্র আমি সেটা আঁকড়ে ধরেছি। অম্বরনাথের জন্য মনে যে কতখানি কৌতূহল পুঞ্জীভূত ছিল সেটা টের পেলাম যাবার সময়ে।

সেখানে পৌঁছে কিন্তু ভারি অবাক লাগল। জায়গাটা সুন্দর। চারদিকে পাহাড়ের মাঝখানে ছোট শহর। কিন্তু জনতার সংস্পর্শে এসে এখানে প্রেম কি করে করা চলে কিছুতে মাথায় এলো না। নারীপুরুষে সকলেরই অদ্ভুত বেশবাস, অদ্ভুত চেহারা, কমনীয়তা নেই এতটুকু। পরে জানলাম, এরা রাজপুত নয়, পথে ঘাটে সকল সময়ে সম্ভ্রান্ত রাজপুত মেয়ের দেখা মেলে না!

দূরে পাহাড়ের ওপর তাম্রাভ গোয়ালিয়র দুর্গ দেখা যায়। শক্ত ঋজু, কঠিন। ইতিহাসবিপর্যিত দুর্গ। যুগযুগ ধরে তিলতিল করে আয়ু লাভ করেছে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ। একে নিয়ে এত ঝঞ্ঝা, কত রক্তক্ষয়। ওখানে আধিপত্য করে গেছে শক হূন রাজপুত পাঠান মোগল ইংরেজ। বাতাসে কান পাতলে বুঝি এখনো যায় ঝাঁসীর রাণীর হৃদয় নিঙড়ানো বজ্র-নির্ঘোষ—'মেরি ঝাঁসী নহী দেউঙ্গী।'

যেখানে আছি সে জায়গায় নাম লস্কর। এদিকটায় বাঙালির বসতি আছে কয়েক ঘর। দু'দিনেই আলাপ জমে গেল। অম্বরনাথকে সকলেই তাঁরা জানেন দেখলাম।—বাবা! তাঁকে আর চিনিনে, কি কান্ডই না ঘটেছিল, মারামারি খুনোখুনি হবার উপক্রম! আমাদের সুদ্ধু প্রাণ যায়। এখন তো মেয়েটা একেবারে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে তাকে, এদিকে আর আসেও না বড় একটা—ওই ফোর্টের ওপরেই থাকে, ওখানেই ইস্কুল, ওখানেই ঘরবাড়ি।

বোধগম্য হল না কিছুই। ভাবলাম আস্তে আস্তে সব জানা যাবে। কিন্তু এদিকে ইতিহাস সম্মেলনের জ্বালায় সময় করে উঠতে পারছি না। তার ওপর হাড় কাঁপানো শীত। বিকেল হতে না হতে ইচ্ছে হয় লেপের নিচে ঢুকে বসে থাকি। কিন্তু দুর্গে যাবার জন্যে মন ওদিকে আকুলি বিকুলি করছে।

প্রথম সাক্ষাতে হাঁ করে খানিক মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অম্বরনাথ। পরে

ছেলেমানুষের মত লাফ ঝাঁপ চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন তিনি। অন্যান্য কোয়ার্টার থেকে উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলেন তাঁর সহকর্মীরা। আর এদিকে পর্দা সরিয়ে যিনি দেখা দিলেন তাঁকে দেখে আমার স্থান কাল সব ভুল হয়ে গেল। বর্ণনা করতে গেলে লেখনী বিভ্রান্ত হবে। মোট কথা, অমন রূপ, অমন দেহসৌষ্ঠব, অমন ঘনায়ত চোখ আমি আর দেখি নি। সাধারণ বাঙালি মেয়ের মতই আটপৌরে বেশবাস। সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হয়েছে জানি, কিন্তু কুড়ি বাইশের বেশি মনে হয় না। কতক্ষণ অভিভূত হয়েছিলাম খেয়াল নেই, সচকিত হয়ে দু'হাত তুলে নমস্কার জানালাম।

নিষ্পলক নেত্রে চেয়েই রইলেন তিনি। দুই চোখে অগ্নিকণা।

ভড়কে গেলাম কেমন। অম্বরনাথের জ্ঞাতির উক্তি মনে পড়ল। ...বিষ মাখানো ছুরি। অবিশ্বাস ঘৃণা এবং বিদ্বেষের এক অদ্ভুত সমন্বয় তাঁর দুই চোখে। অম্বরনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরালাম, আমাদের দু'জনের দিকে চেয়ে তিনি হাসছেন মৃদু মৃদু। বললাম, আমি আসাতে উনি খুশি হন নি দেখছি। পরে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বাংলা বোঝেন না তো ?

অম্বরনাথের দেহ যেমন নধরকান্তি হয়ে উঠেছে, হাসিটাও তাঁর তেমনি পুষ্টিলাভ করেছে দেখলাম। হাসি থামলে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, কি গো, তুমি বাংলা বোঝো ? পরে আমার কথার জবাব দিলেন, আজকাল আমার বাংলা বানান পর্যন্ত ভুল ধরতে শুরু করেছে। কাল রাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে মাথার চুলগুলো পটাপট টেনে ছিঁড়েছে। ভাবছিস এতবড় টাকটা বুঝি এমনি গজাচ্ছে—ওর হাতের গুণ।

কিন্তু এর পরেও মহিলার মুখে হাসি দেখা গেল না এতটুকু। দূরের একটা চেয়ারে বসে স্থিরনেত্রে চেয়েই রইলেন তেমনি। আনন্দাতিশয্যে অম্বরনাথের সেদিকে হুঁশ নেই বিন্দুমাত্র। প্রশ্নের তুফান তুললেন তিনি, এসেছিস কবে ? তিনদিন হল ! কোথায় উঠেছিস ? লস্কর ! তোকে ধরে পিটব আমি রাস্কেল, এখানে এসেও তুই তিন দিন পরে এলি আমার সঙ্গে দেখা করতে, আর উঠেছিস লস্করে গিয়ে ? উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন, স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, একটা জাড়ির জন্য নিচে টেলিফোন করে দাও তো এক্ষুনি—।

কী হবে ? বামাকণ্ঠের সুস্পষ্ট শীতল কণ্ঠস্বর নিক্ষিপ্ত হল এবার।

ওর জিনিসপত্র সব নিয়ে আসতে হবে। কাণ্ডখানা দেখছ না...। থমকে গেলেন হঠাৎ। স্ত্রীর চোখের দিকে চেয়ে যেন হৃদয়ঙ্গম করলেন, সকল সমাচার কুশল নয়। বিব্রত মুখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, তুমি একটা যাচ্ছেতাই—আরে এ আমার বন্ধু মানিক, আত্মীয় টাত্মীয় নয় কেউ। প্রকৃতিস্থ হলেন আরো, তুমি না বললে ও এখানে থাকেই বা কি করে—এক পেয়ালা চা পর্যন্ত দিলে না এখনো, আমিও ছাই খেয়াল করি নি কিছুই।

মহিলা উঠে গেলেন। প্রশ্ন করলাম, তোমার আত্মীয়রা ওঁর কাছে কি অপরাধ করলেন ?

কি জানি, এমনি বেশ আছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজন কাউকে দেখলেই বিগড়ে গেল।

নিভৃত বাক্যালাপের অবকাশ পাওয়া গেল না। মহিলা আবার এসে চেয়ার দখল করলেন। অম্বরনাথ বক্তৃতা শুরু করলেন তাঁর আর্ট নিয়ে। একজন পাহাড়ী পরিচরিকা চা এবং কিছু খাবার রেখে গেল। চা গলাধঃকরণ করলাম কোনো প্রকারে, খাবার তেমনি পড়ে থাকল। গৃহিণীর আতিথিপরায়ণতা দেখে মেজাজ আমারও বিগড়ে গেছে।

একটু বাদেই উঠে দাঁড়ালাম।—চলি, মিটিং-এর সময় হল।

অম্বরনাথ বাস্তব জগতে ফিরে এলেন আবার। চলি মানে ? তাহলে আসছিস কখন ? কিছুই তো খেলি না ! আচ্ছা, তাহলে বিকেলেই চলে আয় একেবারে জিনিসপত্র নিয়ে। ওর হাতের রান্না খেলে বুঝবি তখন, দিনকে দিন আমাকে কেমন হাতিটি করে তুলেছে দেখছিস তো ?—বলেই অট্টহাসি।

হাসতে চেষ্টা করলাম আমিও। মহিলার উদ্দেশে নমস্কার জ্ঞাপন করলাম। দৃষ্টির উগ্রতা তাঁর একেবারে প্রশমিত হয় নি তখনও। তবে এবারে প্রত্যাভিবাদন একটা করলেন বটে। অম্বরনাথ দু'তিন বার স্মরণ করিয়ে দিলেন, বিকেলে আসতে, বেশি দেরি করি না যেন, আমরা পথ চেয়ে থাকব তোর—।

হাসি পেয়ে গেল। বললাম, আমরা কারা, ইনিও ?

আবার অট্টহাসি।

ফিরতি পথে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। এখানে এসেও দুর্গটা পর্যন্ত বোধহয় আর দেখা হয়ে উঠল না। বিকেল হল। রাত এলো। অম্বরনাথ অস্থির চিত্তে প্রতীক্ষা করছেন অনুমান করতে পারি। কিন্তু কি আর করা যাবে।

পরদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বরফ জমানো শীত। বিকেল পর্যন্ত এক রকম লেপের নিচেই কেটে গেল। অন্যমনস্কতায় অনুক্ষণ যে মূর্তি চোখে ভাসছে তিনি রোষদৃপ্তা অম্বরনাথ-গৃহিণী। বিকেলের দিকে একটা মোটর এসে দরজার কাছে থামল। বিদেশি ড্রাইভারের হাতে অম্বরনাথের চিঠি।—'নিজেই যেতাম কিন্তু ঠান্ডা লাগায় লীলাবতী যেতে দিলে না। গাড়ি পাঠালাম। পত্রপাঠ সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে আয়।'

শান্ত মুখেই জবাব লিখলাম, এখানেই বেশ আছি। পার তো কাল একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। কথা আছে। তিনি চার দিনের মধ্যেই কলকাতা রওনা হব।

ড্রাইভার চলে গেল। অম্বরনাথের চিঠি থেকে তাঁর গৃহিণীর নামটা আবিষ্কৃত হল। লীলাবতী...। এ নাম যেন ঠিক ওরকম মেয়েকেই মানায়। মায়ের অনুরোধ মত অম্বরনাথকে এর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে পারব না বুঝতে পারছি। কিন্তু লীলাবতীর কাছে আমার কিছু কৈফিয়ত পাওনা হয়েছে—অম্বরনাথ এলে সেটা নেব স্থির করলাম।

পরদিন সকাল। অম্বরনাথ এলেন। সঙ্গে এলেন লীলাবতী। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর চোখের অগ্নিকণা একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে, মুখের উগ্র কাঠিন্যও ! স্নিগ্ধ স্বচ্ছতায় আজ আর এক রূপ দেখলাম তাঁর। অপরূপ। অম্বরনাথ সোৎসাহে আমার পিঠে এক বিরেশি সিক্কার কিল বসিয়ে বললেন, সাবাস্, দেয়ার লাইজ্ ইওর ট্রাম্পকার্ড—খুব জব্দ

হয়েছে—ওর ধারণা ছিল, একবার ওকে দেখলে সকলেই এবোরে কাচপোকার মত আটকে যাকে ওর বাড়িটতে। কাল শেষে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোর সম্বন্ধে অন্তত হাজার কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমাদের প্রথম দিনের আলাপের কথাও ওকে বলেছি। নে, ওঠ্ এবার—।

বিব্রত বোধ করছি। বললাম, তোমাদের অসুবিধে হবে, মাঝে মধ্যে না হয় তোমাদের ওখানে যাব'খন।

লীলাবতী একটুখানি মুখের দিকে চেয়ে থেকে দরজার কাছে গিয়ে ড্রাইভারকে ইশারায় ডাকলেন। সে এলে ঘরের কোণ থেকে আমার স্যুটকেস এবং বাক্সটা গাড়িতে তুলতে নির্দেশ দিলেন। এক টানে শয্যাসামগ্রী গুটিয়ে বগলদাবা করলেন অম্বরনাথ। টেবিল থেকে আয়না চিরুনি ব্রাশ প্রভৃতি তুলে নিয়ে লীলাবতী কাছে এসে গম্ভীর মুখে বললেন, চলিয়ে জি।

গাড়ি চলল। অম্বরনাথ বললেন, তোমার এক দিনের ব্যবহারেই বেচারির আত্মারাম খাঁচাছাড়া, তার পর ওই হিন্দির টগ্‌বগানি শুনলে আর রক্ষা নেই।

লীলাবতী মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।—তোমার হিন্দিটা একটু শুনিয়ে দাও না। ফিরে তাকালেন আমার দিকে, শুনেছ কখনো ? জিব কাটলেন পরক্ষণে, আপনি বলতে হবে, না ?

যা খুশি..

হেসে উঠলেন, যো খুশি ও তো আপ্‌সে নিক্‌ল গ্যয়া—ও ঠিক হ্যায়, লেকিন আপকো ভি ওহি বোলনা চাহি, সমঝে— ?

অবাক লাগলো, ইনিই সেদিন দুই চোখে ভস্ম করতে চেয়েছিলেন।

ছদ্ম-হতাশায় অম্বরনাথ বললেন, এর সঙ্গে আমাকে হিন্দিতে প্রেম পর্যন্ত করতে হয়েছিল, বুঝে দেখ্—না পারি কিছু বুঝতে, না পারি কিছু বোঝাতে, সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ল তাঁর, তর্জন করে উঠলেন, আচ্ছা, আমি না হয় হিন্দিতে ওস্তাদ, আর তোমার সেদিনের বাংলাটা ?

লীলাবতী সচকিত হয়ে তাঁর মুখ চাপা দিতে গেলেন, শক্ত মুঠিতে তাঁর দু'হাত ধরে রাখলেন অম্বরনাথ।—বলবই, সেদিন আমর ভুঁড়ি বাড়ছে বলে ঠাট্টা করতে গিয়ে বলল কি না ফুঁড়ি বাড়ছে। আট বছর বাংলা শিখে এই, শুনে আমি হাঁ—।

ছদ্ম কোপে লীলাবতী জবাব দিলেন, বেশ, যাও দিনরাত তো থাকো ছবি নিয়ে, বাংলা বলি কার সঙ্গে ?

দু'দিনের জায়গায় দু'সপ্তাহ অতিবাহিত হতে চলল। যাবার কথা তুলতেই এঁরা হাসতে শুরু করে দেন, যেন এমন অসম্ভব কথা আর শোনেন নি। যাবার জন্য আমিও যে খুব উদগ্রীব হয়ে আছি এমনও নয়। অম্বরনাথকে চিনতাম, কিন্তু লীলাবতীর উচ্ছল প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। ওদিকে নিজের হাতে অম্বরনাথের স্নানের গরম জল পরীক্ষা করবেন, রান্না করবেন, সামনে বসে খাওয়াবেন এবং দরকার হলে ঘুম পাড়াবেন। ঝি চাকর দিনরাত ফাঁকি দিক একটি কটু কথা বলবেন না, কিন্তু কর্তার কোনো কাজে

এতটুকু ত্রুটি করেছে কি দু'চোখ জ্বলে উঠবে ঝক্‌ঝক্‌ করে। সেদিন ঠাট্টা করে বললাম, লোকটা একেবারে অমানুষ হয়ে গেল যে!

হাসলেন, গেলই তো, কি আর করা যাবে!

অম্বরনাথ ইস্কুলে গেলে পরে রোজই আমরা দুর্গের কোনো না কোনো দিকে বেড়াতে বেরোই। হালকা হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন লীলাবতী।... ওটা গুজরি মহল, সেখানে থাকতেন মানসিংহের গুজরি বউ মৃগনয়নী। হাসলেন একটু, গল্প শুনবে? ঘড়ার পর ঘড়া মাথায় সাজিয়ে পথ চলেছেন সাধারণ মেয়ে মৃগনয়নী—ওদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে আসছেন রাজা মানসিংহ, জলতৃষ্ণায় তাঁর ছাতি ফাটে। মৃগনয়নীর ঘড়ার জলে তৃষ্ণা মিটল, কিন্তু তাকে দেখে আর এক তৃষ্ণায় রাজার আবার তখন বুক ফাটে। তরল কণ্ঠে লীলাবতী হেসে ওঠেন।

মানমন্দিরে এসেই তিনি সবার আগে যান জহরকুণ্ডের কাছে। যুদ্ধে পরাজয়ের পর মান বাঁচাতে এই কুণ্ডের আগুনে প্রাণ দিতেন রাজপুত রমণীরা। মনে দাগা কাটে। মুখে বলি, কুণ্ডে তো এখনো কালি ঝুলি লেগে আছে দেখছি, খানিকটা মেখে নাও না, পুণ্য হবে।

পাতালপুরীর বন্দীঘরটা আমাকে অকর্ষণ করে। শৃঙ্খলের নিদর্শনগুলি আজও তেমনি আছে। অগণিত রাজপুরুষ যুগের পর যুগ কাটিয়ে গেছেন এখানে—জীবিত অবস্থায় আর সূর্যের মুখ দেখেন নি তাঁরা! ওই লোহার আঙ্‌টা দুটোয় শৃঙ্খলিত ছিলেন শুনেছি রাজভ্রাতা হতভাগ্য মোরাদ—নির্মম অস্ত্রাঘাতে যাঁর তপ্ত রুধির দুর্গের পাষাণকে করে রেখেছে কলঙ্কিত।

আমার স্তব্ধতা দেখে এবার লীলাবতী ঠাট্টা করলেন, আসলে বন্দী হবার দিকে পুরুষদের একটা অহেতুক ঝোঁকই আছে, তোমার দাদাকেই দেখ না।

জবাব দিলাম, ঠিক, তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব বলেই তো আমার এখানে আসা।

পলকের জন্য চোখের দৃষ্টি তাঁর ক্ষুরধার হয়ে উঠল যেন। পরে হালকা জবাব দিলেন, বেশ তো, চেষ্টা করে দেখ না।

রানীদের প্রসাধন-কক্ষ শিশমহল থেকে চারিদিকের আয়নাগুলি সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বললাম, সেগুলো থাকলে বেশ হত, আজ একসঙ্গে তোমার হাজার মূর্তি দেখতে পেতাম।

তিনি জবাব দিলেন, এক মূর্তিতেই রক্ষা নেই, হাজার মূর্তি দেখলে ফীট হবে।

কখনো গল্পচ্ছলে কখনো বা ইতিহাস রাজত্বে ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে অম্বরনাথের বিবাহপূর্ব জীবন অধ্যায়ের অনেকটাই অহরণ করা গেল।

বিস্মিত হই নি। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের মধ্য দিয়েই সবটুকু উপলব্ধি করতে পারি।...জমিদার রাজপুত সর্দারের বিদুষী কন্যা লীলাবতী। বাড়ির দেউড়িতে তাঁদের তলোয়ার ঝোলে এখনো। তাঁর পায়ের তলায় বুক পেতে দিতে উদ্‌গ্রীব অনেক স্বজাতীয় তরুণ। কোন বিষম লগ্নে তাঁকে প্রথম দেখলেন অম্বরনাথ। পর পর পাঁচ

দিন তাঁকে অনুসরণ করলেন সকাল বিকেল। ছ'দিনের দিন তাঁদের দেখা হল এই দুর্গে—'শাস-বহুর' মন্দিরের কাছে। একাদশ শতাব্দীর শাশুড়ী-বধূর দুটো বিখ্যাত মন্দির। সসঙ্গিনী বেড়াতে এসেছেন লীলাবতী। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন অম্বরনাথের মুখোমুখি। হিন্দিতে প্রশ্ন করলেন, কি মতলব ?

অম্বরনাথ হকচকিয়ে গেলেন।

পিছু নিয়েছ কেন ?

প্রকৃতিস্থ হলেন অম্বরনাথ। জবাব দিলেন, প্রাণের দায়ে, ভুলতে পারছিনে তোমাকে। ও... ! মন্দিরের গায়ে মূর্তিগুলির দিকে ইঙ্গিত করলেন লীলাবতী, দেখেছ— ?

অম্বরনাথ দেখলেন ! প্রতিটি মূর্তির নাক এবং মুখ নির্মূলিত। বিধর্মীর আমলে হিন্দু-মূর্তিবিদ্বেষের নিদর্শন। লীলাবতী আবার বললেন, নাক-মুখ ওমনি থ্যাবড়া করে দেব, আমরা রাজপুত মেয়ে, ভুলো না।

রাজপুত মেয়েকে অম্বরনাথ ভুললেন না তো বটেই, নিজের নাক-মুখের প্রতিও খুব বেশি মমতা আছে বলে মনে হল না। ফলে লীলাবতীর সামান্য একটু ইঙ্গিতে অম্বরনাথকে অজ্ঞান অবস্থায় সোজা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর জন কতক অনুগ্রহপ্রার্থী।

এর পরের দেখা 'মাতা-কী-মন্দির'-এর পাশে ছোট পাহাড়ের ওপর। ওপরটা সমতল। শুয়ে থাকা যায় এমন দশ পনেরটা বড় বড় পাথর ছড়ানো। পাশ দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা গেছে 'আম-খো' জঙ্গলের দিকে। একটা পাথরের ওপর পা ছড়িয়ে বসে অম্বরনাথ তুলি দিয়ে ছবি আঁকছেন। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তখনো।

কলরব করতে করতে সেখানে এসে থমকে দাঁড়ালেন লীলাবতী অ্যান্ড পার্টি। ক্যানভাসের ফ্রেম হাতে কাছে এসে দাঁড়ালেন অম্বরনাথ। বললেন, তোমার লোকেরা নির্দয় নয় খুব, দু'মাসেই সেরে উঠেছি। ক্যানভাসটা তুলে ধরলেন তাঁর সামনে। লীলাবতীর প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে। সঙ্গিনীদের চক্ষুস্থির। অম্বরনাথ বললেন, ওই পাথরটায় একটু বোসো না, মন থেকে ঠিক মত এঁকে উঠতে পারছি না।

লীলাবতী নির্বাক। একটু বাদে অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রাণে ভয়ডর নেই তোমার ?

আছে বলেই তো এখানে পড়ে আছি।

কি রকম ? চেয়ে আছেন লীলাবতী।

এখান থেকে গেলে প্রাণ যাবে।

এখানে থাকলেও যাবে। লীলাবতীর দু'চোখ স্থির, শান্ত।

সেটা সহ্য হবে !

লীলাবতীর খেয়াল হল, কথার ফাঁকে অম্বরনাথের হাতের তুলি দ্রুত চলছে, দৃষ্টি মুখের ওপর সংবদ্ধ। ছুটে পালালেন সেখানে থেকে। সঙ্গিনীদের কৃপায় খবরটা শহরময় রটে যেতে সময় লাগল না। রাগের মাথা লীলাবতীও গোপন করলেন না কিছু। দু'দিনের মধ্যেই অম্বরনাথের আস্তানা চড়াও করে দেখতে এলেন জন কতক, ছবির কথাটা সত্যি

কি না। রঙে রঙে ছবি তখন মূর্তিমতী হয়ে উঠেছে অম্বরনাথের হাতে। তাঁরা শাসালেন, বিপদ হবে।

অম্বরনাথ বললেন, জানি।

তাঁরা বললেন, এতে আমাদের জাতির অপমান।

অম্বরনাথ বললেন, সেটা ভুল। এতে তোমাদের জাতির সম্মান।

ছোট শহর উত্তপ্ত হয়ে উঠল। লীলাবতীর পিতা ষড়যন্ত্র করলেন, একেবারে সরিয়ে দাও ওকে। ঠিক হল দিনক্ষণ।

অম্বরনাথের দোরগোড়ায় গাড়ি থামল একটা। নেমে ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করলেন লীলাবতী। তাঁর হাত ধরে সজোরে আকর্ষণ করলেন, শীগ্‌গির এসো।

কোথায় ?

চিনবে না, দেরি কোরো না, ওরা এসে পড়ল।

ছবির ফ্রেম হাতে করে অম্বরনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

লীলাবতী বললেন, ওটা থাক এখানে।

অম্বরনাথ জবাব দিলেন, না, এটাও নিতে হবে।

লীলাবতী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ওটা নিলে পথেই ধরা পড়তে হবে, আমি তো সঙ্গে আছি, ছবি নিয়ে কি হবে ?

অম্বরনাথ ছবি রেখে দিলেন।

পুরনো একটা বড় বাড়ির দরজায় ঘোড়ার গাড়ি থামল। সেখানে থাকেন লীলাবতীর বৃদ্ধ মাতামহ। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। অম্বরনাথের পিঠ চাপড়ে দিলেন। লীলাবতীকে বললেন, ভয় নেই, এখানে কেউ এলে আর জান দিয়ে ফিরতে হবে না।

বৃদ্ধকে অপূর্ব বলে মনে হল অম্বরনাথের।

এখানেই যবনিকা টানতে পারতাম। কিন্তু তাহলে বাকি থেকে যায় কিছুটা যাত্রার আগের দিন 'শাস-বহুর' মন্দিরের কাছে একটা উঁচু পাথরের ওপর বসে আছি। অদূরে লীলাবতী। কথায় কথায় অম্বরনাথের পারিবারিক প্রসঙ্গটা উঠে পড়ল। অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল লীলাবতীকে। তবু বলতে ছাড়লাম না, তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারটা কিন্তু তুমি ভালো করো নি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন লীলাবতী, কি রকম— ?

তাঁদের দোষ কি, তাঁরা তাঁদের আত্মীয়কে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন ? আর আমার আসাও সেই জন্যেই প্রায়।

লীলাবতী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আত্মীয়কে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন ? থেমে গেলেন। হেসেও ফেললেন হঠাৎ, তোমার কথা থাক, তারা কি বলেছে শুনি ?

একজন বলেছেন, তুমি একখানি বিষ-মাখানো ছুরি।

তবু তো সত্যিকারের ছুরি ওর বুকে বসাই নি। তার পর আর একজন ?

সে বেচারী তো পা পিছলে পড়ে কপাল ফাটিয়ে নিয়ে গেছে, বলবে কি—।

লীলাবতী মৃদু হাসতে লাগলেন। পরে বললেন, তোমার দাদা ফিরে গেলে আমার

ভয়টা কি, আমিও তো সঙ্গে যেতাম। কিন্তু তারা তাঁকে ফিরিয়ে নিতে আসে নি। পা পিছলে যার কপাল ফেটেছে শুনেছ, তার কপালটা আমি পাথরের সঙ্গে ঠুকে দিয়েছিলাম। হাসলেন, আবারও, এতটা কেন দরকার হয়েছিল বুঝতে পারো?

এমন একটা কিছু সন্দেহ যে আমারও হয় নি তা নয়। কিন্তু এতটা ভাবি নি। আমার নির্বাক মুখের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, তোমাকেও তাদেরই এক জন ভেবেছিলাম, প্রথম দিনের অভ্যর্থনাও তাই ওরকম হয়েছিল।

তাঁর প্রথম দিনের সে মূর্তি স্মরণ করে হেসে ফেললাম। বললাম, তাদের একজন হলেই বা তুমি করতে কি, আমার বুকের ছাতিটা দেখেছ?

অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠলেন তিনি, দেখেছি, বিশ হাত।

এ ক'দিনের অনাবিল আনন্দের ওপর হঠাৎ যেন বাসন-মাজা জল পড়ল সেদিন রাত্রিতে। লীলাবতী রান্নার তদারক করছিলেন। দূরে নিরালায় এসে বসলাম অম্বরনাথের সঙ্গে। মুখভাব গম্ভীর। বললেন, কালই যাওয়া ঠিক তাহলে?

কালও যদি বেঠিক করি তাহলে যাওয়া হবে কি না সন্দেহ!

তিনি বড় রকমের নিশ্বাস ফেললেন একটা।—তোকে একটা কথা বলি, এ ভাবে আর ভালো লাগছে না আমার। উঠতে বসতে যে করে আগলে রেখেছে, একেবারে হাঁপ ধরে গেছে।

চেয়ে আছি তাঁর দিকে।

এবার আমি সত্যিই পালাব ভাবছি। শীগ্‌গিরই হয়ত আবার দেখা হবে তোর সঙ্গে।

আমি অবাক, নিস্পন্দ। সমস্ত দেহ থেকে একটা উষ্ণ রক্তস্রোত মাথায় উঠছে উপলব্ধি করি। ওর রক্তে আছে বংশগত পিচ্ছিলতা....আমারই ভুল হয়েছিল। অনেকক্ষণ বাদে খুব ধীরে ধীরে বললাম, আমার আর লীলাবতীর দু'জনের সঙ্গেই ঝগড়ার মধ্য দিয়ে তোমার পরিচয়। লীলাবতীর কাছ থেকে পালিয়ে আমার সঙ্গেই যদি তোমার দেখা হত তার ফলও খুব ভালো হবে না বোধ করি।

সুস্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল তাঁর মুখে।—ও সব আমি করিনে, জানিস তো, এ ভাবে মানুষ বাঁচে না, আমি করব কি।

রাত্রিতে খাওয়া হল না ভালো। ঘুম হল না। মুখ তুলে লীলাবতীর দিক চাইতে পারি নি। পরদিনও তাই। দুপুরে গাড়ির সময়ের অনেক আগেই রওনা হয়ে গেলাম। বেদনায় টন-টন করছে বুকের ভেতরটা। অম্বরনাথের এ শিথিলতা একবার যখন এসেছে, ও যাবেই। সমস্ত দুনিয়ার অবিশ্বাসের বোঝা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন লীলাবতী, ঘুরে ফিরে সেই দৃশ্যটা বার বার চোখে ভাসছে। দিন চারেক পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দারুণ বিতৃষ্ণা নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। স্নান সেরে নিজের ঘরে এসে বসতে টেবিলের ওপর একটা খাম চোখে পড়ল। মেয়েলি লেখা, গোয়ালিয়রের ছাপ।—"শেষ দিন ওই ছলনাটুকু তোমার দাদাকে দিয়ে জোর করে আমিই করিয়েছিলাম। দু'দুবার বলেছিলে, তোমার দাদার বন্দী-দশা ঘোচাতে এসেছ, তাই দেখতে ইচ্ছে হল তোমার দৌড় কত। কিন্তু তুমি যাবার পর থেকেই সে কি রাগ

তাঁর। যাবার আগে কেন মন খারাপ করে দিলাম তোমার! গোটা দশেক কাটলেট তাঁর মুখের সামনে ধরলাম, সঙ্গে নিজেকেও, তবু বকুনি কি থামে! তাই সাত তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে বসেছি। রাগ কোরো না।—লীলাবতী।"

জগদ্দল এক পাষাণভার যেন বুক থেকে নেমে গেল। নিজের মনেই হাসছি বসে। পায়ের শব্দে সচকিত হলাম। অম্বরনাথের মা। চিঠিটা তুলে পকেটে রেখে দিলাম। আর প্রমাদ গুনলাম মনে মনে।

নীরব প্রশ্নে তিনি চেয়ে রইলেন।

একটু ভেবে, নিয়ে বললাম, আপনার ছেলেকে এখানে নিয়ে আসা যায় হয়তো, কিন্তু প্রাণটা তাঁর সেখানেই থেকে যাবে। সে রকম করে তাঁকে পেতে চান না বোধ হয়?

কি বুঝলেন তিনিই জানেন। বিমূঢ় নেত্রে মুখের দিকে চেয়েই রইলেন শুধু।

সুদর্শনা সোম

দিল্লির পথের ধুলোয় অনেক ইতিহাস ছড়ানো।

আর, দিল্লির বাতাসে অনেক রোমান্স ছড়ানো।

ইতিহাসের রূপ বদলেছে। রোমান্সেরও রং বদলেছে। কোনো শাহেন শা বাদশার রণোন্মত্ত ভ্রূকুটিগর্জনে আজ আর এখানে ইতিহাস রচিত হচ্ছে না। বাদশাহের সুরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছ্বাসে কোনো সুলতান-প্রেয়সীর ঈর্ষা-নিপীড়িত যৌবনবেদনাও বিদ্যুৎ কটাক্ষে ঝক্‌মকিয়ে উঠছে না। বা, অন্ধকার বিলাসশালার দীপালোকে বিলোলকটাক্ষ কোনো নর্তকীর মণিভূষণ জ্বলে উঠেও আজ আর রোমান্স বিচ্ছুরিত করছে না। রোমান্স আসছে নতুন দিল্লির বাতাসের গায়ে গায়ে।

গল্প বলি।

দিল্লির প্রতি আমার বিশেষ একটা মোহ আছে। সেটা এই নতুন ইতিহাস বা নতুন রোমান্সের জন্য নয়। বরং যে ইতিহাস আর যে রোমান্স এখন মিউজিয়ামে এসে ঠেকেছে, সেগুলোর প্রতিই আকর্ষণ বেশি। বছর দু'বছর বাদে যখনই এক একবার আসি এখানে, সেগুলোর একটা নিঃশব্দ আবেদন যেন মনের মধ্যে পৌঁছয়। অনেক বার হয়ে গেল, এখনো কুতুবের তিনশ' উনিশটা ধাপ গুনে গুনে চূড়ায় গিয়ে উঠতে ভালো লাগে। আউলিয়ার পুকুর ছাড়িয়ে বাদশাজাদী জাহানারার ঘাসের কবরের পাশটিতে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। লালকেল্লারর মধ্যে ঢুকে দেওয়ানিআম, দেওয়ানিখাস খাসমহল রঙমহলে ঘুরে ঘুরে যেন আশ মেটে না। দু'শ বারো বিঘে হউজখাসের ধূ-ধূ এবড়ো-খেবড়ো মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে কল্পনা করতে সাধ যায় কেমন ছিল সেই বিশালকায় কাকচক্ষু পুষ্করিণীর রূপ। হুমায়ুন সমাধিসৌধের ওপরে উঠে সেই জায়গাটা খুঁজে বার করতে ইচ্ছা করে, যেখানে শেষ ভারত সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র-পৌত্রেরা

প্রাণভয়ে লুকিয়েছিল ভীরু খরগোশের মত, আর ফকিরের বিশ্বাসঘাতকতায় পুরুষ-কঠিন হড্‌সন ক্ষুধিত মার্জারের মত যাদের মুখে করে নিয়ে এসে বুলেটের আঘাতে রাজরক্তে কলঙ্কিত করে ছিল দিল্লির রাজপথ।

নতুন দিল্লি নয়, এই দিল্লির প্রতি আমার মোহ।

কিন্তু নতুন দিল্লিই বা ছাড়বে কেন?

এবারে এসে পর্যন্ত মনটা কেমন মুষড়ে আছে। এসেছি পাঁচ-ছ' বছর বাদে, অথচ ক'টা দিন কেটে গেল কোথাও বেরনো হয় নি। একে বরফ জমানো শীত, তার ওপর আবার অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে রোজই। ওদিকে অতিথি-বৎসল আত্মীয় গৃহস্বামীটি আপিসের কাজের চাপে আর তাঁর গৃহিণীটি বাড়িতে ছেলের অসুখে ব্যতিব্যস্ত আছেন। সঙ্গী এবং সঙ্গিনী হিসাবে তাঁরা লোভনীয়। রোজই আশায় আশায় কাটে, যদি আকাশের অবস্থা একটু ভালো হয়, যদি আপিস থেকে ফিরে আত্মীয়টি খবর দেন যে দিন তিনেকের ছুটি পেয়ে গেছেন, যদি ছেলের অসুখ কমে....।

বিকেলের দিকে অবশ্য রোজই একটু-আধটু হাঁটতে বেরোই। সেদিন শীতের জড়তা কাটাবার জন্যেই বার কতক যন্তরমন্তরের ডগায় উঠলাম আর প্রায় দৌড়ে নামলাম। অতঃপর শ্রম-বিনোদনের জন্য চায়ের দোকান খুঁজতে হল। আত্মীয়টি তাঁর পরিচিত এক বাঙালি রেস্তোরাঁয় নিয়ে এলেন। এখান থেকেই গল্পের প্লট শুরু।

নানা বয়সের জনাকতক বাঙালি ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে বেশ জমিয়ে গল্পগুজব করছেন। আমার সঙ্গীটির মুখ চেনা সকলেরই। বোধ হয় সেক্রেটিরিয়েটেরই চাকুরে এঁরাও। একটু তফাতে বসলেও কথাবার্তা কানে আসছে। নারী-সংশ্লিষ্ট বেপরোয়া মুখরোচক আলোচনা।...সার কথা, কোনো এক সুদর্শনা সোম—বহু অভিজাত দিল্লিবাসীর অন্তস্তলে যিনি খোল্লাখুলি বিচরণ করে বেড়িয়েছেন, তুফান বইয়েছেন—সেই অমিতচারিণী সুদর্শনা সোমের মোহিনী জালে এবারে আবদ্ধ হয়েছেন বেশ একটা বড় জাতের মাছ। যিনি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং পদস্থ সরকারি চাকুরে।

সঙ্গীর দিকে চেয়ে দেখি, স্মিতহাস্যে তিনিও দিব্যি রসাস্বাদনে যোগ দিয়েছেন। সুদর্শনা সোমের মত অমন দু'চারটে মেয়ে সব জায়গাতেই থাকে। কিন্তু আমার কান খাড়া হয়েছে ওদের মুখ থেকে সেই বড় মাছের নামটা শুনে। ওই নামের এক জনকে আমিও চিনতাম। এক নামের অমন কত লোক থাকে। আবার এক একটা নামও থাকে যা অনেক লোকের থাকে না। সেই গোছের নাম একটা।—পার্থ বোস। সংক্ষেপে ডাকতাম পি. বি। যাই হোক, নামটা শোনা মাত্র একটা ছিপছিপে দোহারা তরুণ মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সহপাঠি ছিলাম। খুব বেশি দিনের জন্যে নয়। মাত্র বছর কতক। কিন্তু পার্থ বোসের সংশ্রবে যে এসেছে তার মধ্যে একটা নিবিড় ছাপ পড়তে বাধ্য। অন্তত আমার পড়েছিল। সাহসী, মেধাবী, খেলা-ধূলোতেও ভালো ছিল। কিন্তু সব থেকে বড় আকর্ষণের সম্পদ ওর মনটা। এত বড় আর এত নরম দেখি না। একটা আরশোলা মরতে দেখলেও ধড়ফড় করে উঠত। হস্টেলের ছেলেরা পুরনো আলসে থেকে জংলি পায়রা ধরে এনে

মাংস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে রেস্তোরাঁয় বসে ওর পয়সায় চপকাটলেট খেত। মারের চোটে পকেটমারকে রক্তাক্ত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে পর পর ক'রাত ঘুমোয়নি। কোনো দিন কোনো ভিখিরি ওর কাছে হাত পেতে বিমুখ হয়নি। রাতের পর রাত আমরা হস্টেলে এক ঘরে পাশাপাশি শুয়ে জল্পনায় ভাবী জীবনের কত রকম নকশাই না আঁকতাম। ওর বাবা আজীবন বাংলাদেশের বাইরে কাটিয়েছেন। ওরও খুব বেশি দিন সেখানে থাকা হল না। প্রথম প্রথম ঘন ঘন পত্র-বিনিময় চলত। ক্রমশ সেটা শিথিল হল। শেষে একেবারে ছেদ পড়ে গেল। সুদর্শনা-বল্লভ এই পার্থ বোস বোধ করি আর কেউ হবে, কিন্তু তবু মনে মনে একটা কৌতূহল জাগল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার?

সঙ্গী উৎফুল্ল মুখে জবাব দিলেন, কি আর, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে....

নায়িকাটি কে?

শুনলেন তো।

উর্বশী বিনিন্দিতা?

জবাবে মাথা নাড়লেন তিনি।—না, ওরকম উর্বশী প্রায় ঘরে-ঘরেই আছে। অতঃপর দিল্লীর রূপ সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতা করে ফেললেন তিনি। অর্থাৎ, নিছক রূপের দামে এখানে রূপ বিকোয় না। হাব-ভাব চলন-বলন, সোসাইটি, ব্যসন-বসন ইত্যাদির সব মিলিয়ে যা 'দাঁড়ায় এখানকার অ্যারিস্টক্র্যাট্ মহলে সেটাই রূপ। এই ধরনের রূপশ্রীর সাধনায় অনেক সাধারণ মেয়ে এখানে রূপসী বলে চলে যায়।

আর নায়কটি?

বয়েস কত?

বেশি নয়, কি মতলব, গল্প ফাঁদবেন না কি?

বললাম, তা নয়, এক জন পার্থ বসুর সঙ্গে ইস্কুল-কলেজ একসঙ্গে পড়তাম সেই কি না....

সম্ভাবনাটাকে তিনি আমল দিলেন না। ঈষৎ তাচ্ছিল্যে জবাব দিলেন, না এ প্রকাণ্ড লোক, বহু দিন বিলেতে কাটিয়েছে—আড়াই হাজার টাকা মাইনে পায়।

তিনি কেরানি আর আমি কেরানির আত্মীয় লেখক। উনিশ-বিশ অবস্থা। প্রকাণ্ড লোক অথবা আড়াই হাজারওয়ালারাও যে এক সময় সাধারণ পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকেন এ প্রতিবাদ আর করলাম না।

সুদর্শনা সোমের সমাচার শোনা গেল। বিধবা। স্বামী দিল্লিতে চাকরি করতেন কি ব্যবসা করতেন সেটা সঠিক ইনি জানেন না। তবে টাকা-কড়ি কিছু রেখে গেছেন বলেই মনে হয়। দু'টি ছেলে আছে। তারা কলকাতায় পড়াশুনা করে। সম্ভবত, কোনো বড় লোক আত্মীয়-টাত্মীয় আছে, নয়ত বোর্ডিং-এ রেখেছে। মিছিমিছি নিজের কাছে রেখে ঝামেলা বাড়ানো কেন, ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি এখানে থাকেন কোথায়?

কোথাও থাকেন নিশ্চয়, তবে থাকার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই শুনি। আপনার

বাড়ি গাড়ি আর ডিনার-লাঞ্চ খাওয়াবার পয়সা থাকলে আপনার কাছে এসেও থাকতে পারেন ডাকলে! হেসে উঠলেন, বললেন, পার্থ বোস তার লেটেস্ট...

পরদিন সন্ধ্যায় কনটসার্কাস ধরে হাঁটছি। পাশে লাভার্স পার্ক। দিল্লির রসিক জনেরা এই নাম দিয়েছে। সন্ধ্যার পর থেকেই বহু যুগ্মদয়িতের আনাগোনা শুরু হয় এখানে। সকালের দিকে পথের ছেলেরা গাছের তলায় তলায় ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে শ্যেন দৃষ্টিতে ভূমি-তল্লাস করে। অনেক সময়েই তারা আঙটি, হারের লকেট বা কানের দুল কুড়িয়ে পায় না কি।

সঙ্গীটি হঠাৎ আমার বাহু আকর্ষণ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর অঙ্গুলি-সঙ্কেত অনুসরণ করে দেখি, কিছু দূরে মোটর গাড়ি থেকে নেমে একজোড়া ঝকঝকে নারী-পুরুষ পার্কের উদ্দেশে অগ্রসর হচ্ছে। এ আলোয় বিলিতি পোশাক, মোটা ফ্রেমের চশমা এবং মোটা পাইপের আড়াল থেকে মানুষটিকে সঠিক দেখা সম্ভব হল না। আর তার পার্শ্ববর্তিনীর মুখ মোটে দেখাই গেল না। শুধু দূর থেকে, বিশেষ করে পিছন থেকে সাজগোজ-করা মেয়ে মাত্রেই যেমন ভালো লাগে দেখতে, তেমনি লাগল।

সুদর্শনা সোম আর সেই বড় জাতের মাছ?

আত্মীয়টি মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন, তাই বটে?

বললাম, চলুন না ভিতরে গিয়ে দেখি।

পাগল, আপিসে কত বার ফাইলে নিয়ে যাই, মুখ চেনে। তা' ছাড়া জানেও আপিসে এখন কোন্ টপিক নিয়ে জোর কানাঘুষো চলছে, ভাববে ফলো করছি।

এর পরের বারে কিন্তু আর ফলো করতে হল না। একেবারে মুখোমুখি দেখা কনট-প্লেস মার্কেটের একটা গেটের সামনে। দিল্লি যাঁরা যান নি, তাঁরা এ যোগাযোগে বিস্মিত হবেন না। অভিজাত মাত্রেই সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন এখানে না এলে আভিজাত্য মলিন হয়। অতএব এখানে এসেছি যখন দেখা হওয়াটা বিচিত্র নয়।

আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সসঙ্গিনী তিনিও থামলেন। পাশ কাটাতে গিয়ে আবার থমকালেন। মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন ভালো করে। তারপর চেয়েই রইলেন।

আপনি তো...তুমি.....মানে....কি আশ্চর্য!

কিন্তু সহসা বাক্-নিঃসরণ হল না আমারও। এত কাল বাদে বিলিতি ধোলাইয়ের আড়াই হাজারি ডিরেক্টর বন্ধুকে দেখে নয়। তাকে আমি এক নজরেই চিনেছি। সেই ছিপছিপে গড়ন গিয়ে দিব্যি পরিপুষ্ট নধরকান্তিটি হয়ে উঠেছে, তবুও। কিন্তু ওপরওয়ালা আমার জন্যে অনেক বড় বিস্ময় সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। তার সঙ্গিনী, অর্থাৎ, মহানগরীর বিলাসতরঙ্গিনী সুদর্শনা সোমের পালিশ করা মুখের ওপর আমার চোখ দু'টো যেন আটকে গেল।

রূপ? না সে জন্যে নয়। আমার আত্মীয়টি মিছে বলেন নি, একটু ভালো করে চেষ্টা করলে অমন রূপকে উপেক্ষা করা যায় হয়ত। রূপের জন্যে এ-বিস্ময়-সম্মোহন নয়। এই সুদর্শনা সোমকেও আমি চিনি।

ভুল হল, সুদর্শনা সোমকে চিনি নে, কিন্তু এই মহিলাকে আমি বেশ ভালো রকম

চিনি এবং জানি। অন্তত চিনতাম এবং জানতাম। সে-ও চিনল, আর চিনে বিব্রত হল।

সামলে নিলাম। এতকাল পরের সাক্ষাতে আড়াই-হাজারি পার্থ বোসও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, নইলে তার চোখে আমার সেই বিস্ময় বিসদৃশ লাগত। সবল দুই হাতে আমার কাঁধে বিপুল এক ঝাঁকানি দিল সে।

হ্যালো হ্যালো হ্যালো হ্যা-ল্-লো ! হোয়্টএ সারপ্রাইজ ! কবে এসেছ দিল্লিতে ? এখানেই থাকো না কি ? কোথায় আছ ? চিনতে পারছ তো,

সকল প্রশ্নের জবাবে আমি একটু হাসতে চেষ্টা করলাম শুধু। অদূরে আমার আত্মীয়টি দেখি মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন।

গেট থেকে সরে এসে দাঁড়ালাম। আমার হস্তযুগল পার্থ বোসের হাতের মুঠিতে। আবার প্রশ্ন করলাম, এখানেই থাকো ?

না, দু'চার দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি।

এই শীতে ! দাঁড়াও, আগে এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।....মিসেস সুদর্শনা সোম, মাই অনারারি গার্ডিয়ান—আর, ইনি আমার ক্লাস-মেট, রুম-মেট, অ্যান্ড....

সুদর্শনা সোম বিব্রত ভাবটুকু দমন করে সহজ হাস্যেই বাধা দিল, তোমাকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না, আমিও এঁকে ভালোই চিনি। সোজাসুজি তাকালো আমার দিকে, আপনি চিনেছেন তো ?

আমি চিনেছি কি না, সেটা সে প্রথম নজরেই বুঝেছে। আবারও জবাব না দিয়ে শুধু হাসতেই চেষ্টা করলাম। পার্থ বোস, অন্যথায়, পি. বি'র হাতে আবার সজোরে ঝাঁকুনি খেলাম একটা।—হোয়াট এ ফেমাস ম্যান ! দৃষ্টি ফেরালো, তুমি ন'শ মাইল দূরে বসে এঁকে চিনলে কি করে ?

জবাবে সুদর্শনা সোমও হাসির পথটাই বেছে নিল। পরে হাত বাড়িয়ে পার্থ বোসের কব্জি উল্টে সময় দেখল। সঙ্গে সঙ্গে পি, বি'ও চঞ্চল হয়ে উঠল।....গ্যড্ ! ওন্লি টেন মিনিটস্ লেফট ! পকেট থেকে নোট বই বার করল সে।—আজ ভয়ানক তাড়া আছে আর দাঁড়াতে পারছি না, তোমার ঠিকানা বলো, স্যাল হান্ট ইউ আউট্—।

বললাম। সে লিখেও নিল বটে। তারপর দু'বার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে অদূরের প্রতীক্ষারত ঝক্‌ঝকে একটা মোটরে গিয়ে উঠল। সঙ্গিনীও। মোটরের স্টার্ট দিয়ে পি. বি, হাত নাড়ল একবার। আর, সঙ্গিনী শুধু ফিরে তাকালো।

আমার আত্মীয়টি পায়ে পায়ে কাছে এলেন এতক্ষণে। তাঁর বিমূঢ় ভাব দেখে হাসি পেয়ে গেল। বাড়ি ফিরে শুধু তিনি নন, সমাচার শুনে তাঁর গৃহিণীও আমায় ছেঁকে ধরলেন। কর্তা বললেন, পার্থ বোসকে আপনি চেনেন একথা অবশ্য বলেছিলেন, কিন্তু সুদর্শনা সোমের কথা তো একবারও বলেন নি ?

গৃহিণী বললেন, তলায় তলায় এত ! সব ফাঁক হয়ে গেল তো ?

প্রসঙ্গ এড়িয়ে জবাব দিলাম, সুদর্শনা সোম সম্বন্ধে আপনাদের সবারই যেন ভয়ানক আগ্রহ !

গৃহিণী ছদ্মত্রাসে বলে উঠলেন, হবে না! নেহাৎ আমার ভদ্রলোকটি কেরানি বলে রক্ষা, ছোটখাট অফিসার হলেও ভয়ে ভয়ে দিন কাটত। স্বামীর দিকে চোখ ফেরালেন, পার্থ বোসের পরে আর ক'জন অফিসার আছে গো? শীগ্গির তোমার নাগাল পাবে না তো? হেসে উঠলাম।

গৃহস্বামী চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন, ঠিকানা যে লিখে নিল, সত্যিই এসে হাজির হবে না কি এই 'ডি'-মার্কা কোয়ার্টারে?

আশ্বস্ত করলাম তাঁকে, নিশ্চিন্ত থাকুন, যে পার্থ বোসকে জানতাম সে মানুষ বদলেছে—ঠিকানা তার নোট বইয়েতেই থাকবে। আর আসেই যদি নেহাৎ, তাতেই বা আপানার সঙ্কোচ কিসের?

তাঁর গৃহিণী ফোঁস করে বলে উঠলেন, যদি প্রমোশান দিয়ে বসে?

মহিলা সুরসিকা।

কিন্তু আমারই ভুল হয়েছে। পার্থ বোসের বাইরেটা বদলালেও ভেতরটা খুব বদলায় নি বোধহয়। পরদিনই সকালে আপিসের পথে তার প্রকাণ্ড গাড়িটা এই 'ডি'-মার্কা কোয়ার্টারের দোরেই এসে হানা দিল। গৃহস্বামী হন্তদন্ত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ভেতরে এনে বসালেন। তাঁর সঙ্গে নতুন করে পরিচয়ও ঘটল আমার মারফত। তারপর বোস স্মিতহাস্যে তাকালো আমার দিকে।—হোয়েন ডু আই পিক ইউ আপ্ নেক্স্ট?

কোথায়?

এনিহয়্যার। কাল শনিবার হাফ ডে, পরশু রবিবার ফুল ডে—হাউ লাকি!

বিব্রত মুখে বললাম, তুমি কাজের লোক, এতটা সময় নষ্ট করে...

সময় নষ্ট! সবিস্ময়ে চেয়ে রইল স্বল্পক্ষণ। তুমি সেই লোকই তো হে! তোমার আত্মীয়রা অসন্তুষ্ট হবেন, নইলে আমার বাড়িতেই ধরে নিয়ে যেতাম তোমাকে। আর ক'দিন আছ এখানে?

সপ্তাহখানেক।

গুড। শনি-রবিবারের প্রোগ্রাম করো, তাছাড়া ছুটির পরেও মিট করা যাবে।

হেসে বসলাম, আপত্তি নেই, বিশেষ করে তোমার যখন গাড়ি আছে। এবারে বসে কাটিয়ে দিল্লি আর ভালো লাগছে না। কিন্তু তোমার ওই সব হালফ্যাশানের আধুনিক বেড়ানও আমার ভালো লাগবে না। আমি ইতিহাসের যুগে বেড়াব, তাতে আপত্তি না থাকে তো গাড়ি নিয়ে এসো।

আগের মত তেমনি প্রাণ-খোলা হাসি হেসে উঠল পি. বি। বলল, ইয়েস্, ইউ আর দ্যাট্ ওল্ড ম্যান। ও, কে। আই উইল কাম্। গাড়িতে এসে উঠল। আর এক আপিসেরই যাত্রী যখন, আমার আত্মীয়টিকেও ডেকে নিতে ভুলল না।

তাঁরা চলে যেতেই গৃহস্বামিনী একগাল হেসে উদয় হলেন, একেবারে খাঁটি সাহেব দেখি!

বললাম, হবে না কেন বিলেত-ফেরত, আড়াই-হাজারি মাল।

তিনি মন্তব্য করলেন, একে দেখেই বোধ হয় সুদর্শনা সোম সাহেব ইস্কুলে ছেলেদের

পড়াচ্ছে।

এ খবরটা আবার কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ?

সংগ্রহ করব কেন, তার হাঁড়ির খবর দিল্লির বাাতাসে ভাসে। রোববার এলেই দেখবেন বাইরের ঘরে বসে আপিসের বাবুরা এই নিয়ে গবেষণা করতে করতে নাইতে খেতে ভুলেছেন। এবারে তো আরো বিষম ব্যাপার, পার্থ বোসের মোটরে আপিসে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি ! কিন্তু লোকটা ভালো মনে হচ্ছে—ওই সর্বনাশীর খপ্পরে গিয়ে পড়লে কি করে !

সুদর্শনা সোমের কথা ইতিমধ্যে অনেক বার ভেবেছি। ভবতোষের বোন হিরণ হঠাৎ সুদর্শনা হয়ে বসল কি করে বুঝছি না। ভাবতোষও সহপাঠি ছিল, তবে পার্থ বোসের অনেক পরে। মা-বোন নিয়ে তখন থেকেই ছেলে পড়িয়ে সংসার চালাতে হত তাকে। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালোই ছিল। সহপাঠিদের কেউ কেউ তাই ওর বাড়িতে আসা যাওয়া করত বোনকে প্রাইভেট ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশে সাহায্য করতে। এ প্ররোচনা ভবতোষের মস্তিষ্কজাত। তার আশা ছিল বোধ হয়, এই থেকে যদি অনুকূল কিছু ঘটে যায়। কিন্তু কিছুই ঘটল না। ম্যাট্রিক পাশও না বা অনুকূল কিছুও না।

বোনের ওপর আস্থা ছিল ভবতোষের, সেটা গেল হয়ত। কারণ, হঠাৎ একদিন শোনা গেল, দিল্লি-নিবাসী একজন মাঝবয়সী লোকের সঙ্গে হিরণের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কি করে যোগাযোগ ঘটিয়েছিল জানি নে। বিয়ের জন্যে কলেজ থেকে চাঁদা তুলে আমরা অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছি ভবতোষকে। বিয়ের আসনে বসেও মেয়েটার সে কান্না ভুলি নি।

কিন্তু ভোজবাজির মত এমন দিন বদলালো কি করে ! যার হাতে বোনকে সমর্পণ করেছিল ভবতোষ, তার অবস্থাও সচ্ছল ছিল না খুব। অথচ তার ছেলেরা আজ কলকাতায় থাকে, সাহেব-ইস্কুলে পড়াশুনা করে, আর তাদের মা এখানে ডিনার-লাঞ্চ খায়, মোটরে চড়ে বেড়ায়। ভাবলাম হবেও বা। যুদ্ধের দৌলতে কত ফকির তো লাল হয়ে গেল। এ-ও সম্ভবত তাই।

শনিবার থেকেই দিল্লিভ্রমণ শুরু হল। পার্থ বোস নিজেই এসে তার মোটরে তুলে নিয়ে গেল। একা নয়। হিরণ, হিরণ বলি কেন, সুদর্শনা সোমের সেই বিব্রত ভাবটুকু একেবারে কেটেছে। কুতুবের পথে আগাগোড়া হাস্য-কৌতুকে সিঞ্চিত করে রাখল আমাদের।

কুতুবের প্রথম পঙক্তি উঠে বিশ্রামের জায়গায় গা ছেড়ে বসে পড়ল পার্থ বোস। বলল, বাপ ! আর এক পা-ও উঠছি নে আমি—তোমাদের ইচ্ছে থাকে তো একেবারে স্বর্গে গিয়ে ওঠো গে যাও।

ইচ্ছে তো আছেই। উপরন্তু তার সঙ্গিনীটিকে একলা পাবার ইচ্ছেও একটু ছিল। সুদর্শনা টিপ্পনী কাটল, এতেই হাঁপিয়ে পড়লে ! আচ্ছা ননীর পুতুল তো ! আমায় লক্ষ্য করে বলল, আপনারও একই অবস্থা নাকি ?

না, আমি তো উঠবই।

এবারের সিঁড়ির ধাপগুলো তেমন চওড়া নয়। ক্রমশ আরো সরু হয়ে গেছে। পাশাপাশি দু'জন ওঠা যায় না। সুদর্শনা আগে আগে উঠতে লাগল। আমি পিছনে।

ইতিহাসের রোমাঞ্চ আর মনে জাগছে না। পিছন থেকে বললাম, তুমি তাহলে এখন সুদর্শনা ?

সে ঘুরে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে তার দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। হেসে বলল, সুদর্শনা নই ?....কি জানি, লেখকরা কল্পনা-জগতের মানুষ, মাটির কাউকেই তারা সুদর্শন দেখে না বড়।

কে বলবে এই সেই ম্যাট্রিক ফেলকরা মেয়ে হিরণ! আবার উঠতে লাগল সে। আমিও। একটু বাদে বললাম, আমি লেখক, এ খবরটা তুমি রাখো দেখছি.....

ও মা, আমরা রাখি বলেই তো রক্ষা, মেয়েরা ছাড়া কে আর খবর রাখে আপনাদের ?

কর্ণদ্বয়ে ব্যঙ্গ-মধু বর্ষিত হল! উঠতে লাগলাম। তিন তলা ছাড়িয়ে চার তলা ধরে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার দাদার খবর কি ?

খবর রাখি নে।

তোমার ছেলেরা কলকাতায় পড়াশুনা করছে শুনলাম, সেখানে থাকে না ?

দাদার বাড়ি ছাড়াও কলকাতায় থাকার অনেক জায়গা আছে। দাদার অবস্থা তো জানেন—

তা' বটে, এ তো আর হিরণের ছেলে নয়, মিসেস্ সুদর্শনা সোমের ছেলে।

অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল সে। পরে তেমনি উঠতে উঠতেই জিজ্ঞাসা করল, ছেলেদের কথা কোথায় শুনলেন ?

দিল্লিতে এসে অবধি তো এবারে সকলের মুখে তোমার কথাই শুনছি।

ওর হাসিটা এবারে আরো তরল শোনালো—সকলের মুখেই! টেনে বলল, বে—চা—রি—

চার তলায় এসে বিশ্রামের জন্য একটু দাঁড়ালাম। সুদর্শনা রেলিংএ ঠেস দিয়ে হাঁপাতে লাগল। অল্প অল্প ঘামছেও। রুমালে সন্তর্পণে মুখ মুছতে লাগল।

জিজ্ঞাসা করলাম, বেচারি কেন ?

ঈষৎ কৌতুকে সে মুখের দিকে চেয়ে রইল স্বল্পক্ষণ জবাব দিল, কেন বুঝছেন না ? যারা আমার কথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে এমন, তাদের নাম-ঠিকানা, বরং দিয়ে দিন আমায়। হেসে উঠল।

নিজের কানের কাছটাই উষ্ণ ঠেকল। মেয়েটা এককালে একটু সমীহ করত আমায়। প্রশ্ন করল, আর উঠবেন, না এবারে অধোগতি হবো ?

আমি শেষ পর্যন্ত উঠব একবার।

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলল, শেষ পর্যন্ত ওঠাই ভালো, চলুন—

বিনা বাক্যব্যয়ে এবারে কুতুব-আরোহণ শেষ হল। পার্থ বোস নিচে নেমে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে বলল, ওপরে ওঠার প্রতি মানুষের

একটা নেশা আছে না ?

তার সঙ্গিনী বক্র কটাক্ষে একবার তাকালো আমার দিকে। জবাব দিলাম, তা বটে, কিন্তু মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে ওঠা শক্ত।

বন্ধু একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাড়াতাড়ি হেসে উঠল।— ফিলসফাইজিং, এঃ— ?

পরদিনটাও সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে ইতিহাসরাজ্যে ভ্রমণ করেছি। কিন্তু ইতিহাস যে সঙ্গ-বিশেষে এমন দূরে সরে যেতে পারে আগে জানতাম না। বন্ধুটি কুঁড়ের বাদশা। অনেক সময়েই গাড়িতে বসে অপেক্ষা করেছে সে, সঙ্গিনীকে বলেছে ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনো—। আমি যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখেই ঘুরে ফিরে দেখতে চেষ্টা করছি। কিন্তু দেখার সে মনটাই আর নেই, থেকে থেকে বিরক্ত হচ্ছি নিজের ওপরে, কোথাকার কে একটা বাজে মেয়ের পাল্লায় পড়েছে বড়লোক বন্ধু, সে জন্যে আমার অস্বস্তি কেন ?

তার সঙ্গিনী কিন্তু নিরালায় এসে আজ আর হাসিঠাট্টার ধার দিয়েও গেল না। উচ্ছলতাটুকু শুধু বন্ধুর সামনেই স্বতঃস্ফূর্ত হচ্ছিল। আমায় একলা পাওয়া মাত্র কলকাতা, কলকাতার স্বাস্থ্য, কলকাতার খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি নানা বিষয়ে তার ঔৎসুক্য চারিয়ে উঠতে লাগল যেন। এবারে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা এখন তো বসন্তের সময় আসছে, করপোরেশানের লোকেরা নিজেরাই এসে সব জায়গায় টিকে দিয়ে যায় তো ?

যায়।

স-ক্ক-ল জায়গায় ?

খবর দিলে যায়। বিদ্রূপ করে বললাম, তোমার এত ভাবনা কিসের, বড়লোকের ছেলেদের কোনো ব্যবস্থারই অভাব হয় না, না চাইতেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

একটু হেসে প্রায় অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়ল সে। পরে হঠাৎ কি ভেবে বলল, একটা কাজ করে দেবেন ?

কি—

আপনি কলকাতা ফিরছেন কবে ?

শীগগিরই, কেন ?

একটা প্যাকেট দেব, পৌঁছে দেবেন ?

কোথায় পৌঁছে দেব, ছেলেদের ?

হ্যাঁ।

আমার তো সময় হওয়া শক্ত।

তার কণ্ঠস্বর এবার আবেদনের মত শোনালো যেন। বলল, দয়া করে যখন হোক এক সময়ে পৌঁছে দেবেন, এক-আধটা জামা-টামা আর কি, চিঠি লিখেছিলাম পাঠাব। এখন পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি, ছোট ছেলে, ভারি আশা করে আছে, দিন না পৌঁছে ?

দরদ দেখে গা জ্বলে যায়। শান্ত মুখে বললাম, এমন করে বলছ যখন দেবো। কিন্তু ছেলেদের এখানে নিজের কাছে এনে রাখো না কেন ?

এখানে পড়াশুনার নানা অসুবিধে।

এখানে ছেলেরা আর পড়াশুনা করছে না তাহলে, নানা অসুবিধেটা পড়াশুনার, না তোমার নিজের ?

সে হাসতে লাগল। পরে বলল, ওদিকে মোটরে বসে ভাবছে হয়ত কি হল, চলুন শীগ্‌গির—।

এর পরে আপিসের দিনেও বিকেলের দিকে বেড়ানোর কামাই হল না। আত্মীয় গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিনী ঠাট্টা করতে লাগলেন, সুদর্শনা সোমের জন্যে শেষে বন্ধুর সঙ্গে না হাতাহাতি হয়ে যায় আমার। এতবড় একজন ধনী পদস্থ লোকের দরাজ অন্তঃকরণ দেখে তাঁরা মুগ্ধ।

মুগ্ধ আমিও। আর সেজন্যেই তাকে তার সহচরীটির সম্বন্ধে একটু সচেতন করে দেবার কথাটা মনে মনে অনেক বার ভেবেছি। কলকাতা ফেরবার সময় এগিয়ে এলো। শেষ দিনে পার্থ বোসের সামনেই তার সঙ্গিনী ছেলেদের জামার বড় একটা প্যাকেট আমার জিম্মা করে দিল। একটা আলাদা কাগজে বাড়ির ঠিকানা আর একজন ভদ্রলোকের নাম লেখা। বলল, আপনার একটুও কষ্ট হবে না, বড় রাস্তার ওপর প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইবেন, আর ছেলেদের ডেকে প্যাকেটটা দেবেন।

অপাঙ্গে একবার বন্ধুর দিকে তাকালাম। দেখি, সে নির্বিকারে চিত্তে গাড়ি চালাচ্ছে।

যে দিন রওনা হব সেদিনও সকালে বন্ধু এসে হাজির। আজ একাই। একা ঠিক নয়, সঙ্গে পশ্চিমা ড্রাইভার আছে। বলল, চলো তোমাকে স্টেশনে তুলে দিয়ে আসি।

ভারি ভালো লাগল। গাড়িতে উঠে প্রশ্ন করলাম, একলা যে, বান্ধবী কোথায় ?

তিনি সকালে একটা পার্টি অ্যাটেন্ড করবেন।

ও ! একটু ভেবে বললাম, কিছু না মনে করো তো একটা কথা বলি।

নো ফরম্যালিটি প্লিজ, গো অন।

জিজ্ঞাসা করলাম, বিয়ে করছ না কেন ?

হাসল, বলল, আর বয়েস আছে নাকি ?

ঠাট্টা নয়, এই মেয়েটিকে আমি ছেলেবেলা থেকে জানি, শেষে তোমার অশান্তি বাড়বে আরো।

হেসেই জবাব দিল, মেয়েটির ছেলেবেলা জানো, বর্তমান কিছু জানো কি ?

যা দেখলাম আর জানলাম, সে তো ছেলেবেলার থেকেও খারাপ। তা' ছাড়া ওর দুটি ছেলে আছে। এত উঁচু মন তোমার....ওর ভালোর জন্যেও ওকে বিদেয় করা উচিত।

স্টেশনের কাছে একটা ঠেলা গাড়ি রাস্তা আটকে আছে। দু'টো লোক এই শীতেও সেটা ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেছে। পার্থ বোস তাকালো আমার দিকে, দেখেছো— ?

—কি ?

ওই ঠেলাঅলা দু'টোকে। ভালো করে দেখো, পরে বলছি।

কথাটার তাৎপর্য বোঝা গেল না। মোটর স্টেশন-প্রাঙ্গণে এসে থামল। টিকিট কেটে মালপত্র নিয়ে একটা ইন্টার-ক্লাস কামরায় সবে উঠে বসেছি, পার্থ বোস চোখের ইঙ্গিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আবার। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, সুদর্শনা সোম হন্তদন্ত হয়ে প্রত্যেক কামরা অনুসন্ধান করতে করতে এগিয়ে আসছে। হাতে তার আর একটা ছোট কাগজের বাক্সর মত কি। কাছে এসে পার্থকে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। স্পষ্টই বুঝলাম, তাকে এখানে প্রত্যাশা করে নি। পার্থ একগাল হেসে প্রশ্ন করল, কি ব্যাপার, মিসেস আলির পার্টিতে যাও নি এখনো?

সে-ও এবারে তেমনি হালকা হেসেই জবাব দিল, এই যাব, একটু দেরি হয়ে গেল।

একটু! লেট্ হওয়াটা তোমার একেবারে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে দেখছি।....তাঁরা তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন নিশ্চয়।

তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, থাকুক গে—। আমার দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাস্যে বলল, আপনার বোঝা আরো একটু বাড়াতে এলাম। এই খাবারের বাক্সটাও পৌঁছে দিতে হবে। ওরা ভাবে, দিল্লির খাবার কত না ভালো, খেয়ে দেখুক।

নিজের অজ্ঞাতেই হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিলাম। সুদর্শনা বলল, যাই, নইলে লেট হবার জন্যে আবার এক পশলা বকুনি শুরু হবে। বন্ধুর উদ্দেশে হালকা কটাক্ষপাত করে সে প্রস্থানোদ্যত হল। বন্ধু অনুরাগ-রঞ্জিত হয়ে স্মরণ করিয়ে দিল, বিকেলে ওখলায় যাচ্ছি খেয়াল আছে তো? লেট হলে শাস্তি পাবে কিন্তু—।

তার দিকে একবার ভ্রূ-ভঙ্গি করে আধুনিকার হালফ্যাশানে হাত নেড়ে আমায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে একটু ব্যস্তভাবেই প্রস্থান করল সুদর্শনা সোম।

পার্থ বোস জানলায় মাথা রেখে অর্ধশয়ান হয়ে বলল, আসলে, পার্টি-টার্টি কিছু ছিল না দেখছি, স্টেশন তোমাকে মিট করার জন্যেই পার্টির কথাটা বলেছে বোধ হয়।

সুযোগ পেয়ে ঠাট্টা করলাম, একটু একটু চিনেছ তাহলে। ঠেলাঅলা দু'টোকে দেখিয়ে কি বলছিলে তখন?

দেখেছিলে?

দেখেছি তো, কিন্তু কি দেখতে বলছিলে?

সুদর্শনার ভালোর জন্যেও সুদর্শনাকে বিদেয় করবার কথা বলছিলে কি না। উঠে সোজা হয়ে বসল সে। আমার নির্বাক চোখে চোখ রেখে হাসল একটু। বলল, ওই ঠেলাঅলা দু'টোর যা অবস্থা, তাতে ওদের ভালো করতে হলে ঠেলা টানা বন্ধ করা উচিত। কিন্তু সত্যি তাই করতে গেলে ওরা মরবে। বরং যত ভার চাপাবে ঠেলায়, তত তাদের উপকার।

দু'টো এক হল?

হল। আই অ্যাম হার এইটথ্, মে বি নাইনথ—সি উইল বি ইন্ ডিফিকালটি ইন গেটিং হার নেক্সট। এখন আর ওকে বড় একটা আমল দেয় না কেউ।....কলকাতার বড় রাস্তার ওপর যে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির ঠিকানায় তুমি ওর ছেলেদের জন্য এই

প্যাকেট দু'টো পৌঁছে দিতে যাচ্ছ সেটা একটা অনাথ-আশ্রম। আর ওই কাগজে নাম লেখা সেই ভদ্রলোকটি সেখানকার অভিভাবক। সেখানে খাওয়া থাকাটাই শুধু ফ্রি, আর কিছু নয়—।

আমি নির্বাক বিস্ময়ে হতভম্বের মত চেয়ে রইলাম তার দিকে। সে নির্বিকার চিত্তে বসে শিস দিতে লাগল।

খানিক বাদে আস্তে আস্তে বললাম, তুমি এত কথা জানো, সে জানে?

ক্ষুদ্র হেসে জবাব দিল, পাগল নাকি!

চেয়ে আছি। সময় হল। গার্ডের হুইসল্ বেজে উঠল। বন্ধু নেমে গেল। কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রসন্ন হাস্যে বিদায় নিল সে। ট্রেন ছাড়ল।

যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, ঝুঁকে রইলাম।

সদানন্দ ঘোষালের গল্প

প্রথম সর্গ

সদানন্দ ঘোষালের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ বছর দশেক আগে।

নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম শুভ-দৃষ্টির স্মৃতি-বৈচিত্রও বাস্তবের ঘষায় ঘষায় নিষ্প্রভ হতে বসেছে। কিন্তু ঘোষালের সেই শুভাবির্ভাব অবিস্মরণীয়।

সকাল বেলা উঠে দুধ এনে, ছেলে পড়িয়ে, বাজার করে এবং স্ত্রীর আরও পাঁচটা ফরমাইশ খেটে দুর্গা-গণেশ স্মরণ করে কাগজ কলম নিয়ে বসেছিলাম। সাদা কাগজের ওপর কলমের যথেচ্ছ বিচরণে আপাতত আর কোনো ব্যাঘাত ঘটার কারণ নেই। তবু ব্যাঘাতের আশঙ্কা ছিল। কারণ, স্ত্রীর কাছে তখন পর্যন্ত লেখা বা লেখক কারোরই তেমন মর্যাদা ছিল না। এখনও নেই, তবে লেখা থেকে কিছু অর্থাগম হয় বলে প্ল্যান করে এখন আর লেখায় বাদ সাধেন না তিনি। তখন সাদা কাগজগুলোই মিছি মিছি নষ্ট করা হচ্ছে ভাবতেন ।

তাঁর দোষ দিই না। পাঁচটা লেখার মধ্যে গড়পরতা একটা লেখাও তখন পত্রস্থ করা সহজ হত না। যাও হত, তাও মাশুল আদায় করতে কালঘাম ছুটে যেত। নতুন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা মাঝে মধ্যে লেখা চেয়ে পাঠাতেন। সেখানে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন ওঠেই না। আর বনেদী কাগজের সম্পাদকরা উল্টে মাশুল না নিয়ে যে লেখা ছাপছেন সেটাই ঢের মনে করতেন। বার তিনেক লেখা ছাপা এবং নির্ভেজাল বিনয়ে তুষ্ট থাকলে দয়াপরবশ হয়ে এক-আধ বার হয়তো দু-পাঁচ টাকা দিতেন। আর, একবার দিয়ে কম করে এক বছর সেটা স্মরণ করে রাখতেন।

যাই হোক, সংসারের কাজ সব সেরে দিয়ে স্ত্রীর প্রচ্ছন্ন ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই বেপরোয়া একাগ্রতায় আঁটসাট হয়ে বসেছিলাম। বাসনা, একটা নিটোল প্রেমের গল্প লিখব। বিয়োগান্ত প্রেমের গল্প। লিখে তাঁর চোখে জল আনব এরকম সঙ্কল্প অনেক দিনের।

লিখে পারি নি। লিখি বলে চোখের জল অবশ্য অনেক বারই দেখেছি।

বলা বাহুল্য সেটা নয়নাভিরাম নয়। চোখ-কানের পর্দা তেমন পুরু না হলে এতদিনে সব জলাঞ্জলি দিয়ে বসে থাকার কথা।

সেই সকালে এ-হেন স্ত্রীটি তখন সামনের চিলতে-বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বিশ্বাস, আবারও আমাকে ওঠাবার একটা কিছু দরকারী ফিকির আবিষ্কারে মগ্ন ছিলেন। প্রেমের গল্পে নিবিষ্ট তন্ময়তার ফাঁকে সম্ভাব্য বিয়ের কথা ভেবে বিরক্ত হবার মত বলও মনে

মনে সংগ্রহ করছিলাম।

কিন্তু সিদ্ধিদাতা গণেশও সেদিন একটু বৈচিত্র্যাভিলাষী হয়েছিলেন বোধ হয়। স্ত্রীর বিস্ময়োক্তিতে চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল। —ও মা, গাড়িটা যে এই দোরেই থামল!

বাড়ির দোরে পাওনাদার থেমেছে শুনে কলম হাতেই থেকে গেল। উঠে উঁকি দিয়ে দেখি, গাড়িই বটে। ঝকঝকে তকতকে মস্ত গাড়ি একখানা।

প্রথমেই নামলেন দশাসই চেহারার এক ভদ্রলোক। বেশভূষায় বনেদী আভিজাত্যের ছাপ। হাতে দামী সিগারেটের টিন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, মুখখানি হাসি হাসি। তাঁর পিছনে আর যে দুই ভদ্রলোক অবতরণ করলেন, তাঁদের অবশ্য চিনি। একজন চলচ্চিত্রের ভাবী বিদ্রোহী-পরিচালক নিরঞ্জন বোস, অন্য জন নিরঞ্জন বোসের মত অতটা প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন না হলেও রীতিমত উঁচুদরের আলোক-শিল্পী বিনয় তালুকদার। আলোক-শিল্পী বললে ঠিক প্রাঞ্জল হবে না, সাদা কথায় ইমাজিনেটিভ ক্যামেরা-ম্যান। তাঁর ইমাজিনেশনও এখন পর্যন্ত বাজারে যাচাই হবার সুযোগ আসে নি, তবু সার্টিফিকেটটা নিরঞ্জন বোসের যখন, আদৌ ফেল্না নয়।

বোস আর তালুকদার দুজনেই ভাগ্যের ছকে গোটাকতক অনুকূল গ্রহ-সমাবেশের প্রতীক্ষারত।

সেটা যত দিন না হচ্ছে, তত দিনও তাঁরা হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। গীতার প্রবচন মেনে ফলের আশা বিসর্জন দিয়েই তাঁরা কাজ করে চলেছেন। অর্থাৎ কাজের মত কাজ সংগ্রহের চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁদের সেই কাজের জের আমাকেও কিছুটা সামলাতে হয়। পার্টির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের প্রোগ্রাম না থাকলে অবসর সময়টা এঁরা দুজন অনুগ্রহ করে মাঝেমধ্যে আমার এখানেই কাটিয়ে যান। এসে ভবিষ্যতের সফল সম্ভাবনার ছক আঁকার ফাঁকে কম করে দুই প্রস্থ চায়ের হুকুম করেন বলে এঁদের দেখলেই গৃহিণীর মুখভার। এঁরা থাকাকালীন তাঁর নীরব অগ্নি-বৃষ্টি আর বিদায়-অন্তে সরব বর্ষণ অনিবার্য।

হাতে কোনো কাজ না থাকলে ভাবী চিত্রের গল্প-প্রসঙ্গেই আলোচনা করতে আসেন তাঁরা। কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায়। আজ যে-টা গড়েন আর একদিন এসে সেটা ভাঙেন এবং নতুন করে গড়ার মাল-মশলা দিয়ে যান। গল্পের মত গল্প একটা ফাঁদতে পারলে শিকার, অর্থাৎ, শাঁসালো পার্টিকে তাই দিয়েও বশীভূত করা সম্ভব বলে বিশ্বাস দুজনেরই। সেটা হয়ে উঠেছে না বলে নিরঞ্জন বোস অনুযোগও করেন, ছাই-পাঁশ লিখে সময় নষ্ট না করে এই একটা দিক নিয়েই ভাবুন না? আজ যেটা বেগার খাটুনি ভাবছেন কাল দেখবেন সেটাই সোনা।

এই সোনার লোভ একটু-আধটু আমারও ছিল।

দু-দুজন কর্মঠ লোক একযোগে অক্লান্ত চেষ্টা করছেন, তা সত্ত্বেও কোনোদিন কিছু হবে না, লেখক হলেও অতটা নিরাশাবাদী নই। তাই তাঁরা এলে যতটুকু সম্ভব আদর অভ্যর্থনা করি। প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে যোগাযোগও রাখি। সরাসরি এঁদের সঙ্গে পার্টি শিকারে না বেরুলে প্রায় অভিভূত বা অর্ধাভিভূত শিকারকে সম্পূর্ণ অভিভূত

করার প্রয়োজনে গল্পের দিকটা সামলাবার জন্যে ডাক পড়লে সঙ্গ নিই। প্রযোজকের পছন্দ হোক না হোক নিরঞ্জন বোসের ভয়ে তাঁর পছন্দের মাল-মশলা দিয়েই গল্পের চমক ছোটাতে চেষ্টা করি। কারণ, যে জন্যেই প্রযোজক পিছিয়ে পড়ুন (এ পর্যন্ত সকলেই পিছিয়েছেন), গল্পের দিকটা নিরঞ্জন বোসের পছন্দমত চমকপ্রদ না হলে ব্যর্থতার সকল দায় আমার ঘাড়েই পড়ে থাকে। নিরঞ্জন বোস অনেক দিন স্পষ্টই বলেছেন, আর কখনও মশাই আপনাকে নিয়ে যাব না, আপনাদের কলম তবু চলে, মুখ একেবারে ভোঁতা।

গাড়ির মাহাত্ম্যে এই দুজনকে দেখেও গৃহিণী আজ ভুরু কোঁচকালেন না। উল্টে তাঁর বিস্ময় দানা বাঁধল আরও। বলে উঠলেন, তোমার কাছেই তো দেখি......... !

চেনা মুখ দুটি দেখেই একটু আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। গায়ের গেঞ্জিটা গাড়িওয়ালার চোখে না পড়ে। যত অবাকই হই স্ত্রীর সম্ভ্রম উদ্রেকের উদ্দেশ্যে নিরাসক্ত তাচ্ছিল্য প্রকাশের লোভ সংবরণ করা গেল না। বললাম, লেখার সময় কাকে আবার নিয়ে এলো জ্বালাতে !

ঘরে ঢুকে আলনাটা একবার পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। পরনের লুঙ্গিটাও অমন গাড়িওয়ালার সামনে অচল। সেই সঙ্কটে গৃহিণী আশ্চর্য রকম সদয় মনে হল। হাতল-ভাঙা তোরঙ্গ থেকে হাতে-কাচা একটা অল্প-ছেঁড়া গেঞ্জি বার করলেন।—এর ওপর জামাটা পরে নাও, আর ধুতি একটা আলনায় ধোয়াই আছে দেখো। এমন লোকের কাছে ভদ্রলোক আসে কেন বুঝি না—

মুখে যাই বলুন, এমন লোকের কাছে অমন গাড়ি চেপে ভদ্রলোক এসেছেন বলেই অনাস্বাদিত পুলকে আজ এই প্রথম স্বামীটিকে একটু ভদ্রস্থ করার চেষ্টা তাঁর। আর, ওই গাড়ির কল্যাণেই যিনি এসেছেন তিনি তাঁর চোখে ভদ্রলোক।

ঠিকে ঝি এসে খবর দিয়ে গেল, বাবুরা বসে আছেন আর তাড়া দিচ্ছেন।

তাড়া একবার নিরঞ্জন বোসই দিতে পারেন। তাঁরই সহিষ্ণুতা কম একটু। কাপড়-জামা পরে ভদ্র হওয়ার ফাঁকে চকিতে মনে হল, এই ভদ্রলোকই সদানন্দ ঘোষাল নন তো ?

চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় না থাকলেও ওই নামটি ইতিমধ্যে অনেকবার শুনেছি। প্রথম শুনেছিলাম হারাণ বিশ্বাসের মুখে। হারাণ বিশ্বাস নামটা যেমন সর্বহারা গোছের, লোকটি তেমন নন। বরং ঠিক উল্টো। মস্ত এক ফার্মের কৃতী অর্গ্যানাইজার। চালচলনে খাঁটি সাহেব। মিঃ বিশ্বাস, বড় জোর এইচ. বিশ্বাসের ওধারে তাঁর পুরো নামটা ফার্মের অতি অন্তরঙ্গ জনেরাও হয়তো জানেন না। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কলেজ-জীবনে, খেলার মাঠে। দুই এক ক্লাস ওপরে পড়লেও তখন নাম ধরেই ডাকতুম। জীবন-বাস্তবে সাফল্যের জোয়ার দেখে এখন আর নাম ধরে ডাকতে ভরসা পাই নে, হারাণদা বলি। তাও অন্তরঙ্গ নিরিবিলিতে।

ওই হারাণদাই সদানন্দ ঘোষালের নাম কীর্তন করেছিলেন প্রথম। কোনো তুখোড়

ব্যবসায়ীর জোরালো এবং জটিল জীবনের ভিত্তিতে একটা অভিনব উপন্যাস লেখার বাসনা ছিল। বাংলা উপন্যাসে নয়া পটভূমির চাহিদা। নয়া পটভূমিতে বিচরণের মাশুল নেই পকেটে। অতএব নিখরচায় চরিত্র এবং ঘটনা সন্নিবেশে রচনার সঙ্কল্প মাথায় এসেছিল। হারাণদাকে ধরেছিলাম, তেমন পাকাপোক্ত কোনো ব্যবসায়ীর সঙ্গে যদি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারেন।

শোনামাত্র হারাণ বিশ্বাস অমিত-শ্রদ্ধায় আর বিশ্বাসে ওই নামটি শুনিয়েছিলেন। আশ্বাস দিয়েছিলেন, এর জন্য কোথাও ঘুরতে হবে না আমাকে, কোনো নীরস ব্যবসায়ীর পদযুগলে তৈলসিঞ্চনও করতে হবে না,— এই একটি লোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেই রসদের ভারে রচনার ভাণ্ডার উপচে উঠবে।

—পুকুর নয়, নালা নয়, নদী নয়, সরাসরি সমুদ্র একেবারে, বুঝলে ? ডুব দাও যত ডুবতে পারো— তল-কূল পাবে না।

সাহেবী চালচলনের কেতাদুরস্তদর অর্গ্যানাইজারকে বাঙালি ঘরের নাম-মাহাত্ম্য-বিহ্বলা বর্ষীয়সী বিধবার মত এমন বিগলিত হতে আর কখনও দেখি নি। ভদ্রলোক নাকি সম্প্রতি তাঁদের ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছেন। এতদিন ব্যবসায়ের একছত্র অধিপতি ছিলেন হারাণদা এবং তাঁর পার্টনার। এখন স-ঘোষাল ত্রি-কর্ণধার তাঁরা।

কতখানি অভিভূত হলে এক অংশীদার আর এক অংশীদারের প্রসঙ্গে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন সেটা অনুমান করেই হয়তো মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হারাণ বিশ্বাস সব সঙ্কোচ একেবারে নির্মূল করে দিতে চেয়েছেন। —সাধারণ ব্যবসায়ীর মত রসকষ-শূন্য নয় হে, অমন দরাজ মনের কাছে গড়ের মাঠটাও ছোট মনে হবে। প্রেম চাও যদি, একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে পারলে ওঁকেই প্রেমচাঁদ মনে হবে তোমার। ব্যবসায়-বুদ্ধির কথা যদি বলো, হাত পেতে টাকা যেমন আনতে পারেন, হাত উপুড় করে টাকা ঢালতেও পারেন তেমনি। বদ্ধ জলার মত তাঁর হাতে আটকে থাকে না কিছুই। আর সাহিত্যবোধ, শিল্পবোধ ?.........রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে কদর হত, এখন সবাই বোঝেই ভারী !

বলা বাহুল্য আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তারপর যাই যাই করেও এমন একজন দুর্লভ মনীষীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে ওঠে নি। নিজের বিদ্যেবুদ্ধি জাহির হয়ে পড়ার ভয় একটু ছিল না এমন নয়। সাহিত্য নিয়ে তাঁর সঙ্গেই আলাপ করে সুখ, সাহিত্যিককে যিনি জ্ঞান-সমুদ্রের ডুবুরী বলে ভাবেন এবং ভিন্ন জগতের মানুষ জ্ঞানে সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। উল্টে হারাণ বিশ্বাসই তাগিদে দিয়ে গেছেন একদিন, কই হে গেলে না ? আমি যে বলেই রেখেছি তোমার কথা— লেখাটেখাও উনি পড়েছেন বললেন।

ঘরে আর তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও প্রায় সঙ্গোপনেই ফিসফিস করে হারাণদা আরও বলেছেন, বড় মোক্ষম প্ল্যান করেছ, ঠিক মত লিখেটিখে খুশী করতে পারো যদি, জীবনের মতই হিল্লে হয়ে যেতে পারে একটা, এসো একদিন। অবশ্য এসো।

আমার হিল্লে করে দেওয়া ছাড়া তাঁরও একটু বিশেষ আগ্রহ ছিল মনে হয়েছিল। যাই হোক, যাওয়া শেষ পর্যন্ত এখনও হয়ে ওঠে নি। এমনি কি, ব্যবসায়ী জীবনের

ভিত্তিতে উপন্যাস রচনার যুগান্তকারী সম্ভাবনার ওপরেও নিজেরই গাফিলতিতে ক্রমশ মরচে ধরে আসছিল।

আজ নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদারের সঙ্গে এই ভদ্রলোককে দেখে সদানন্দ ঘোষাল বলে মনে হল কেন, তার একটু ভিন্ন কারণ। সম্প্রতি এঁদের মুখেও এই একটা নামের সুরেলা কীর্তন শোনা যাচ্ছিল। এক মানুষের মধ্যে অত প্রতিভা নিরঞ্জন বোস তাঁর বহুদেখা চোখেও আর দেখেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর ওখান থেকে যে দিন ঘুরে আসেন, বোসকে সেদিন ঘন ঘন দামী সিগারেট বার করতে দেখা যায় পকেট থেকে। যে-কোয়ালিটির চা খেয়ে আসেন, তার পর আমার এখানে চা যদি খেতেই হয়, কুইনিন-গোলা জলের মতই গলাধঃকরণ করে। বোস-তালুকদারের পূর্ণ দৃষ্টি সম্প্রতি এই এক জনের ওপর, সেই অনুমান মিথ্যে নয়।

কিন্তু এঁদের প্রত্যাশা কি, সেটাই খুব স্পষ্ট নয় এখনও। সদানন্দ ঘোষালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাটুকু এঁরা দুজন নিজের ভাগ্যের ছকে স্বয়ং বৃহস্পতির পদার্পণের মতই মনে করছেন। তাই এরই মধ্যে একদিন বলে ফেলেছিলাম, তিনি তো শুনেছি ফলাও করে চটের ব্যবসায় নেমেছেন, আপনাদের এ-লাইনে কি তেমন.........

সংশয় যতটা সম্ভব প্রচ্ছন্ন রেখেই কথাটা বলতে চেষ্টা করেছিলাম। তবু নিরঞ্জন বোসের পাকা কান এড়ানো গেল না। তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠেছিলেন, মশাই, আপনারা— এই আজকালকার সাহিত্যিকরা, কোন যুগে যে বাস করেন তাও বুঝি নে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতেন বলে গল্প কিছু কম লিখেছেন না খারাপ লিখেছেন ? গল্প লিখেছেন বলে প্রবন্ধ কিছু কম লিখেছেন না খারাপ লিখেছেন ?

.......হারাণ বিশ্বাসও বলেছিলেন, রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে ভদ্রলোকের যথার্থ কদর হত। তবু চট-জগতের সঙ্গে শিল্প-জগতের কিছুতে একটা সামঞ্জস্য কল্পনা করে উঠতে পারছিলাম না। তাই আমতা আমতা করেও বলতে হয়েছে, ওগুলো সবই সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে তো.........

জবাবে বিনয় তালুকদার ফস করে বলে উঠেছেন, এও তো ব্যবসায়ের পর্যায়ে পড়ে, চটের ব্যবসা ব্যবসা আর সিনেমার ব্যবসা ব্যবসা নয় !

অকাট্য যুক্তি। বোস আর তালুকদারের হতাশার কোনো সঙ্গত কারণ নেই বটে। আর প্রতিবাদ করা বা সংশয় প্রকাশ করাটা নিরাপদ মনে করি নি।

অতিথি-সকাশে এসে জানা গেল আগন্তুকত্রয়ের মধ্যমণি ব্যক্তিটি সদানন্দ ঘোষালই বটেন। ঘর আলো করে বসে আছেন।

আমার বসার ঘরটাকে ঘর বলা ঠিক হবে না। ঘরের মতই একটু কিছু। চেয়ারগুলোর কোনটার ডাইনের হাতল নেই, কোনটার বাঁয়ের। চোখে সাদাটে মায়া ছড়ানো ধুতি পাঞ্জাবিতে চেয়ারের কলচে ছাপ পড়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু তারই একটাতে দিব্বি আঁট-সাঁট হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক ।

যেন এই রকম চেয়ারে বসেই চিরকাল অভ্যস্ত।

এক পলক দেখেই মনে হল, যে-চেয়ারটিতে বসেছেন তার একটা দিকের অঙ্গ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন বলেই ওই তরতাজা বিশাল দেহটি ওতে কুলিয়েছে। কালোর ওপর হাসি হাসি মিষ্টি মুখখানি দেখলেই ভালো লাগার কথা। আমারও ভালো লেগেছে, কিন্তু এই ঘরে এমন অতিথির আবির্ভাব ভিতরে ভিতরে বিপন্ন বোধ করেছি আরও বেশি।

তার ওপর লেখক আমি কোন পর্যায়ের সেটা নিরঞ্জন বোসের প্রথম সম্ভাষণেই ভদ্রলোকের বুঝতে বাকি থাকল না বোধ হয়। পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু বিরক্তিতে তিনি বলে উঠলেন, মশাই এতক্ষণ করছিলেন কি ? সেই কখন খবর দিয়ে বসে আছি, অ্যাঁ ?...... কে ইনি জানেন ?

তালুকদার সগর্বে যোগ করলেন, ঘোষালদা—সদানন্দ ঘোষাল !

স্বয়ং পণ্ডিত নেহরুকে আমার দীন কুটীরে এনে হাজির করা গেলেও এমন সার্থক তৃপ্তির অভিব্যক্তি দেখতাম কিনা জানি নে। আমি সবিনয়ে এবং যুক্ত করে আনত হলাম। ঘোষালের প্রসন্ন মুখে মৃদু হাসি।— লিখছিলেন বোধ হয় ?

নিজের ঘরে বসে নিজেই অতিথিসুলভ নম্র জবাব দিলাম, ওই একটু-আধটু—

কি লিখেছিলেন, গল্প ?

হ্যাঁ—।

আনুন না, শুনি একটু।

অপ্রতিভ হবার কিছু নেই। গল্প একটার জায়গায় দশটা মজুত আছে, থাকেও সব সময়। যে-কোন একটা নিয়ে এলেই হয়। কিন্তু আমি অপ্রতিভ অন্য কারণে। গল্পগুলো যখন লিখে উঠেছি, মনে হয়েছে প্রত্যেকটাই বিভিন্ন ধরনের ছুরির ফলা একখানা করে। অথচ এই মুহূর্তে মনে হল ওর একটাও হয়তো তেমন সচল নয়। আর একবার অন্তত পড়ে না দেখে পড়তে ভরসা হল না। অথচ ভদ্রলোকের আগ্রহটুকু কল্পিত-প্রেয়সীর চকিত আবির্ভাবের মতই নির্জলা মিষ্টি। দ্বিধান্বিত জবাব দিলাম, আজই সবে ধরেছি, শেষ হলে শোনাব।

ভদ্রলোক একটু মাথা হেলালেন, অর্থাৎ অনুমোদন করলেন। তারপর বললেন, ছোট গল্প শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই, বড় ট্রেচারস্ ব্যাপার কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে লেখক নিজেই সব সময় বুঝে ওঠে না।

বোস আর তালুকদারের সশ্রদ্ধ সমর্থন। নিরঞ্জন বোস ঘন ঘন মাথা নাড়া শেষ করে আমার দিকে যে-ভাবে তাকালেন তার সারমর্ম, এবারে বুঝুন কাকে এনেছি !

ঘোষাল প্রাথমিক আলাপের সূচনায় জানালেন, আপনার প্রায়ই খুব প্রশংসা করেন এঁরা, এমনিতেই আলাপ করার ইচ্ছে ছিল, সেই সঙ্গে নিজের একটু দরকারও পড়ে গেল...

আমার প্রশংসা করা হয় শুনে মনে মনে যথার্থ কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। একটু-আধটু দুর্মুখ হলেও বোস-তালুকদার অন্তরে অন্তরে যে ভালোবাসেন আমাকে তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠকের মনে হতে পারে, হাতের কাছে ওই দুজনের চেনা-জানা আর কোন লেখক নেই বলে এবং চেনা-জানাটা এক জনের

সঙ্গে অন্তত থাকা দরকার হয়েছিল বলেই তাঁরা আমার উদ্দেশে প্রশংসা বর্ষণ করেছেন। তা যে হতে পারে না সেটা অবশ্য হলপ করে বলতে পারি নে। যে লাইনে আত্ম-প্রকাশ আর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এঁদের, সেই লাইনে সদাবনত কোনো লেখক হাতের মুঠোয় না থাকাটা ছেঁড়া পকেটে মানিক কুড়োতে যাওয়ার সামিল। এঁদের হাতের মুঠোয় ছবি করার টাকা না থাক, ছবির গল্প লেখানোর লেখক এক-আধ গণ্ডা থাকাই নিয়ম।

কিন্তু সব জেনেও আমি কৃতজ্ঞ এবং বিগলিত। আর সেই বিগলিত ধারা দেহের শিরা উপশিরা ধরে কানায় কানায় ভরে উঠল সদানন্দ ঘোষালের পরের কথাটা শুনে। তিনি বললেন, আপনার লেখা নিজেও আমি কিছু কিছু পড়েছি...ওই এক রোগ, যখন যেটা সামনে আসে না পড়ে পারি নে—

লেখা পড়েছেন হারাণ বিশ্বাসও বলেছিলেন। শুনে তখন এত আনন্দ হয় নি।...লেখা পড়েছেন, পড়ে আলাপের বাসনা হয়েছিল, তার পরে সশরীরে উপস্থিত একেবারে—হারাণ বিশ্বাসের সংবাদে অতখানি অবিশ্বাস্য সম্ভাবনার রোমাঞ্চ কল্পনা করা সম্ভব হয় নি। যাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তাঁকে, তাঁরা মুগ্ধ অনেক আগে থেকেই। বিনয় তালুকদার রোগের কথা শুনে নিরঞ্জন বোসকেও টপকে গেলেন। বললেন, আপনার এ রোগ যেন না সারে কখনও, আর পাঁচজনের এমন রোগ গাকলে আর ভাবনা কি ছিল!

নিরঞ্জন বোস অগত্যা গম্ভীর মুখে তাঁকেই শোনালেন, আমি যত দূর জানি, ঘোষালদার এ রোগটা দিনকে দিন বাড়ছে, কাজেই আপনার কোনো ভাবনা নেই।

সদানন্দ ঘোষাল হাসছেন মিটি মিটি।

আমার মনে হল, ভদ্রলোকটির নাম যিনি রেখেছিলেন, তিনি সত্যিকারের দূরদর্শী।

এমন নির্বিকার অথচ আত্মস্থ প্রসন্নতা আর দেখছি বলে মনে হয় না। যে যা বলেন শোনেন, হাসেন একটু একটু, সিগারেট টানেন, তারপর যেটুকু বলার হাসিমুখেই শাদা-সাপটা বলে বসেন। ইস্কুলের এক মাঝবয়সী ইতিহাসের মাস্টারমশাইকে মনে পড়ে গেল। ভদ্রলোক যেন ইতিহাসের মতই প্রাচীন ছিলেন অথচ ইতিহাসের মতই নির্ভুল নতুন সব সময়ে। সকলকেই ছেলে-মানুষ ভাবতেন—ছাত্র, সহ-শিক্ষক, এমন কি হেডমাস্টারমশাইকে পর্যন্ত। অথচ সেই ভাবার মধ্যে দম্ভ ছিল না। যে যা বলতেন হাসি মুখে শুনতেন, ঠাকুরদা যেমন মুখ করে আর যেমন আগ্রহ নিয়ে সহজ-পাঠ-পড়া নাতির গল্প শোনে। তারপর নিজের কথাটি বলতেন যখন, সরাসরি সেটা বুকে গিয়ে পৌঁছুত আর তাক লেগে যেত।

এই সদানন্দ ঘোষালও প্রথম আলাপে অনেকটা তেমনি। এঁর সঙ্গে কথা বলে প্রতি পদে হোঁচট খেতে হলেও তেমন লাগে না বা আত্মবোধ ক্ষুণ্ণ হয় না।

তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যটি পরে ব্যক্ত করেছেন। তার আগে ছোট গল্প থেকে উপন্যাস, উপন্যাস থেকে কবিতা, কবিতা থেকে নাটক, নাটক থেকে বাংলা ছবি—সকল প্রসঙ্গেই কিছু কিছু নতুন মত আর নতুন পথ-বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই সব মত আর পথের সঙ্গে আমার এতদিনের মোটামুটি ধারণার মিল ছিল সে কথা

বলি না। মিল ছিল না বলাই ঠিক। বরং তাঁর অচিন্তিত উদ্ভাবনীর ছটায় একটু-আধটু ধোঁকাই লেগেছে। যেমন, তাঁর মতে ছোটগল্প-লিখিয়েদের দু'বছর অন্তত কোনো পাগলা গারদের অনারারী কর্মী হয়ে থাকা উচিত। সেটাই তাদের একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র। জীবন-জটিলতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাবতীয় রহস্য আহরণ ও চিত্রানুধাবন একমাত্র সেখান থেকেই সম্ভব। একটা গোটা অ্যাসাইলাম আজকের দিনের সমাজের সমস্ত সমস্যার এক জীবন্ত অ্যাকোয়ারিয়াম!

তাঁর ধারণা, উপন্যাস বস্তুটি আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই সাহিত্যের এক লুপ্ত-অধ্যায় হয়ে থাকবে। পুরুষ মানুষ তো উপন্যাস পড়েই না এখন, মেয়েরা যা একটু-আধটু দিবানিদ্রার ওষুধ হিসেবে পড়ে। কিন্তু মেয়েদেরও সে সময় কমে আসছে,—এমন একটা সময় আসবে যখন বড় উপন্যাস পড়ে সময় নষ্ট করা দূরে থাক—তারা সন্তান ধারণেও রাজী হবে না। (তার জন্য সমাজে নির্দিষ্ট এক সেট নারীর উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। এই আলোচনায় নিরঞ্জন বোসের বিশেষ আগ্রহ। তিনি আজও অবিবাহিত। সদানন্দ ঘোষালের বক্তব্য এবং যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, সেই দিন হয়তো পঞ্চাশ বছরের অনেক আগেই আসবে।)

তার পর কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর কিছুকাল বাদে গীতার জায়গাটি দখল করবে। সার জিনিস জেনে সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু পড়বে কম লোকেই। আর, আজকের দিনে যারা কবিতা লিখছে, তারা অনেকটা ঠিক রাস্তাই ধরেছে। কিন্তু অন্ধ যেমন লাঠি ঠুকে ঠুকে হোঁচট খেতে খেতে ঠিক রাস্তায় চলে তেমনি চলেছে। সত্যিকারের কবিতার গতি হবে দুর্বার, দুর্গম—পাহাড় থেকে যেমন ঝরনার জল গড়ায়, তেমনি। সেটা একমাত্র সম্ভব থট্‌মিকানিজম্ কবিতায় এনে ফেলার চেষ্টাটা সার্থক হলে। অবেচেতন মনের প্রচ্ছন্ন অথচ স্বতঃস্ফূর্ত, অসংলগ্ন অথচ অর্ধচেতন চিন্তার ফোয়ারা কাব্যের মধ্যে এনে ফেলতে হবে। যেমন, আধঘুম অবস্থায় অথবা নির্জন নিরিবিলি শয্যায় চোখ-বোজা অবস্থাতেই কতরকমের উল্টো-পাল্টা সম্ভব-অসম্ভব চিন্তাধারা অনর্গল আসছে যাচ্ছে— সেই চিন্তা, সেই ভাষা, সেই ফোর্স যখন কাব্যে এনে ফেলা যাবে, সেই কবিতাই কবিতা হবে—পারমাণবিক যুগে অন্য কোনো কবিতা টিকবে না।

উক্তির ব্যাখ্যার্থে জীবন্ত নজিরও তুলে ধরেছেন সদানন্দ ঘোষাল—এই থট্‌মিকানিজ্‌ম সাহিত্যে কিছুটা আনতে পেরেছিল জেমস্ জয়েস—মলিব্লুম তৃপ্তিভরে পর-পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ করার পর স্বামীর শয্যায় আধঘুমন্ত অবস্থায় মিঃ ব্লুমের চোখের সামনে যে খেদ আর জীবনের যে চিত্রটি তুলে ধরেছিল, তার সেই বক্তব্যের চল্লিশ পাতার মধ্যে একটা দাঁড়ি একটা কমা একটা ফুলস্টপ নেই—যেন কলে মোচড় দিয়ে মনোযন্ত্রটি খুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু ওই জায়গাটুকুই যদি উপন্যাসে ফেলে জয়েস কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে সাজাতো তাহলে একটা এপিক সৃষ্টি হত!

নাটক প্রসঙ্গে ঘোষালের ধারণা, নাটক বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত একটাই লেখা হয়েছে।

রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর।

বিদ্যা আর সুন্দরের গোপন মিলন, গোপন অভিসার আর মিথুন-রজনী যাপনের মধ্য দিয়ে কবিগুণাকর নিখিল বিশ্বের নারী আর পুরুষের চির আকাঙ্ক্ষার চিত্রটিই অবিনশ্বর করে রেখে দিয়ে গেছেন নাকি।

এখানে নিরঞ্জন বোস সাগ্রহে আবার উসখুসিয়ে উঠেছিলেন। অনেককাল আগে পড়েছিলেন তিনি নাটকখানা, সঠিক স্মরণ নেই বলেই রাজনন্দিনী বিদ্যার সম্বন্ধে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করে চরিত্রটি হুবহু মনে আনতে চেষ্টা করেছেন। শেষে গোপন মিলনে রমণীপ্রাণপ্রাচুর্যের আভাস পেয়ে সর্বান্তঃকরণে ঘোষালের মন্তব্য সমর্থন করেছেন—নাটক একখানাই লেখা আছে। বিদ্যাসুন্দর।

আর গম্ভীর মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, নাটকখানা একবার তাঁকে সংগ্রহ করে দিতে পারি কিনা, পারলে আর একবার পড়ে দেখার ইচ্ছে। পারি নে জেনে অকর্মণ্য জ্ঞানে আবার ঘোষালের দিকে ঘুরে বসেছেন।

শেষে বাংলা ছবির আলোচনা।

সদানন্দ ঘোষাল রায় দিলেন, আজকাল হিন্দি ছবিগুলো তবু ব্যবধান ঘুচিয়ে স্ত্রী-পুরুষ চরিত্রগুলিকে কিছুটা পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। তাও হাঁটি-হাঁটি পা' পা' গোছের করে। কিন্তু বাংলা ছবি ডিসটিল ওয়াটারকেও হার মানিয়েছে। মেয়ে পুরুষ একটু কাছাকাছি হয়েছে কি অমনি কাঁচি! তাঁর মতে ছবিতে চুম্বন-কলা চালু না হওয়াটা এ-যুগের একটা হাস্যকর বিস্ময়। একটা চুমুর সুযোগে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই এফেক্ট আনতে এক ঘণ্টা ধরে কচকচি। রোমান্টিক ছবিতে 'কিস' নেই, হ্যামলেট নাটকে ডেনমার্কের যুবরাজ নেই! রোমান্সের যেটা প্রথম আর প্রধান বিজ্ঞানসম্মত অঙ্গ সেটাই বাতিল! কি যে কাণ্ড, সদানন্দ ঘোষালের ভাবতেও হাসি পায়। জলো লাগবে না তো কি! নুন ছাড়া ঘি দিয়ে ভাত মেখে খাওয়া যায়?

এই আলোচনাটাই বোধ হয় বোস আর তালুকদারের সব থেকে সারগর্ভ মনে হয়েছে। দুজনেই ঘন ঘন মাথা নেড়েছেন। বোস সদর্পে সায় দিয়েছেন, ছবিতে চুম্বন-কলা বাদ দেওয়া আর রোমান্সের গলা টিপে মারা একই ব্যাপার। কিন্তু এ-সব নীতির নামাবলী বেশি দিন আর চলবে না।

খুব খারাপ না লাগলেও ভিতরে ভিতরে আমি একটু শঙ্কিত এবং সচকিত।

গাড়িওয়ালার শুভাগমনে ভিতরে থেকে আর একজনের কানপাতা অস্বাভাবিক নয়। গৃহিণী জয়েস বা বিদ্যাসুন্দর তেমন তলিয়ে না বুঝলেও এই কলাটির আলোচনা বুঝতে বেগ পেতে হবে না। যদি শুনে থাকেন কপাল মন্দ। এ-পর্যন্ত আমার একটিমাত্র গল্পের নায়ক একবার মাত্র কোনো আবেগের মুহূর্তে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল। তার ফলে কম করে সাত দিন ছোঁয়া-বাঁচিয়ে গৃহিণী যে অগ্নি-উদ্‌গিরণ করেছিলেন তা আজও স্মরণ করতে পারি। যেহেতু লেখক সেই কারণে উক্ত অপকর্মটি যেন আমিই করে বসে আছি। অন্তত সেই সময় ওই অভিলাষটি যে আমি মনে মনে পোষণ করেছিলাম সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়—শুধু চক্ষুলজ্জায় আর ভয়ে নাকি সেটা নায়কের নামে চালিয়ে দিয়েছি। অনেক করে তাঁকে বোঝাতে

চেষ্টা করেছিলাম, আজকালকার কথাসাহিত্যে এটুকু লেখা এমন কিছু অপরাধের নয়—

এটুকু। ফল বিপরীত হয়েছিল—আরো লিখতে পারলে তবে মন ভরে কেমন? ঘেন্নাও করে না, লেখা ফেলে রাখলে যে মাছি ঘিনঘিনিয়ে উঠবে। ছেলে-মেয়ে বড় হবে না? তাদের চোখে পড়বে না?

ছাপা লেখাটা ছিঁড়ে কুটিপাটি করে এবং নিশ্চিহ্ন করে তবে তিনি একটু শান্ত হয়েছিলেন।

অতঃপর গৃহিণীর সম্ভাব্য মনোভাব নিয়ে গবেষণার আর বিশেষ অবকাশ থাকল না। কারণ এবারে এই দীন কুটিরে অপ্রত্যাশিত আগমনের উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করলেন সদানন্দ ঘোষাল।

প্রস্তাবটি তাঁর পূর্বোক্ত সব মতামত এবং বিশ্লেষণের থেকেও অভিনব।

প্রস্তাবের অবতরণিকায় মনে মনে বিলক্ষণ উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সবটা শোনার পর সহসা বাকস্ফূরণ হয় নি।

মহিলা-সম্পাদিত কোন একটি সাহিত্য-পত্রের জন্য একাধিক ছোট গল্প চাই। মিলনান্ত বিয়োগান্ত বিচ্ছেদ বিরহ সবই চলবে—গল্পগুলো নিটোল হওয়া দরকার। প্রত্যেকটা গল্প তিনি ভালো দামে কিনে নেবেন—

শুধু এইখানেই শেষ হলে মন ভরে ওঠার মত। ভরেও উঠেছিল। শেষ না হতেই ধাক্কা একটা।—গল্পগুলো সব ছদ্মনামে অথবা কোনো মেয়ের নামে লিখতে হবে। মেয়ের নামে লেখাই ভালো। লেখককে বরাবর যবনিকার আড়ালে থাকতে হবে, গল্পের ওপর তার কোনোদিন কোনো দাবি থাকবে না বা নিজের নাম প্রকাশ করা চলবে না। এক কথায় যে-কটা গল্প ছাপা হবে তার প্রত্যেকটার স্বত্বই তিনি কিনে নেবেন।আর সেই লেখিকার নামে যে কটা গল্প পাঠানো হবে সে গল্পের পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষরও কোনো মহিলার হওয়া চাই—মহিলাকে দিয়ে লেখা নকল করানোর পারিশ্রমিক যা লাগবে তাও তিনি দেবেন।

প্রস্তাব-বৈচিত্র্যে আমাকে থমকে যেতে দেখে ঈষৎ উষ্মায় নিরঞ্জন বোস একটা গোপন সংবাদ ফাঁস করে দিলেন যেন, কেন মশাই, মহিলার ছদ্মনামে আগে আপনি লেখেন নি?

আমতা আমতা করে বললাম, তখন লেখা বিশেষ বেরুতে না তাই...

ঘোষাল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, কি নামে লিখতেন?

...জয়া দেবী।

স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন। স্মরণ হল না বোধ হয়।—ওই নামটা যে আপনার কেউ জানে?

মনে মনে প্রমাদ গুনতে হল আবার। কারণ নামটার আসল মালিক আমি নই। মালিক যিনি তিনি আমার ঘরণী। বললাম, বাইরের কেউ জানে না।

ওয়াণ্ডারফুল! ওই নামটাই ভালো, বেশ মিষ্টি নাম—তা ছাড়া একটু-আধটু পাব্লিসিটি পাওয়া নাম যখন আরও ভালো কাজ হবে। ওই নামেই লিখুন—

তবু আমার দিক থেকে তেমন উৎসাহের আভাস না পেয়ে ভদ্রলোক একটু চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করলেন।—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, হাতে সময় থাকলে নিজেই লিখতুম...আপনি মোটামুটি এক-একটা প্লট দাঁড় করান তার পর আলোচনা করে ঠিক-ঠাক করে নেওয়া যাবে—

লেখক মাত্রেরই এ-প্রস্তাবে ক্ষুণ্ণ হবার কথা। সাদা অর্থ গল্পের দোষত্রুটি যা থাকবে উনি শুধরে দেবেন। অমিও খুব খুশী হই নি। বললাম, না সে-জন্যে নয়, আসলে ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ঘোষাল অল্প অল্প হাসতে লাগলেন। নিরঞ্জন বোস যে ভাবে চেয়ে আছেন, তাৎপর্য, এতটাই নিরেট আমি তাই বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। তাঁর নীরবতার সুযোগে বিনয় তালুকদার হতাশার সুরে বলে উঠলেন, এর মধ্যে আবার বোঝাবুঝির কি আছে মশাই—গল্পের কপি-রাইট কিনে নেওয়া কথাটা শোনেন নি কখনও?

...তা নয়, ঠিক এ রকম শর্তে—

নিরঞ্জন বোসের এটুকু দ্বিধাও চক্ষুশূল। ফসফসিয়ে উঠলেন, শর্তটি এ রকম না হলে আপনার কাছে ওঁকে নিয়ে এলাম কি করতে—ঘোষালদার টাকার অভাব না বাজারে লেখকের অভাব! সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ অসহিষ্ণুতায় চোখ টিপে ইশারা করলেন তিনি। বোকার মত তাঁদের একটা জোরালো প্ল্যান যেন বরবাদ করে দিতে বসেছি।

ঘোষাল সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, একটা ছোট গল্প লিখে আপনি কত পান?

...বিশ, পঁচিশ—ভয়ে ভয়েই জবাব দিলাম। কারণ, দশ বছর আগে গল্প পিছু টাকার অঙ্কটা প্রায় কল্পনার অঙ্ক ছিল।

এক মুহূর্ত না ভেবে ঘোষাল দর দিলেন, ধরুন আমি যদি সে-জায়গায় আপনাকে চল্লিশ-পঞ্চাশ দিই...কপি-টপি করা নিয়ে পঞ্চাশই ধরুন—তা হলে?

একটা জোরালো ফাঁদে ফেলা হয়েছে আমকে, নিরঞ্জন বোসের মুখে সেই গোছের তুষ্ট ভাব। আর, এর ওপরে কথাটি কইলে বিনয় তালুকদার নিজেই বোধ হয় গল্প লিখতে বসে যাবেন।

কথা কওয়া শক্ত হয়ে পড়ল। সামনে বিশাল ঝকঝকে গাড়িটা দেখছি বলে, কি অমন দশাসই চেহারার ভদ্রলোক আমার ভাঙা ঘরের ভাঙা চেয়ারে নির্বিকার শৈথিল্যে গা এলিয়ে দিয়ে মিট-মিট হাসছেন বলে—বলতে পারি না। তার ওপর সিগারেটটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে পকেট থেকে যখন চেহারার অনুকূল অতিকায় একটা পার্স বার করে একশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট সামনের তিন-পেয়ে নড়বড়ে টেবিলটার ওপর রাখলেন, আমি বোবা।

—আপনার দুটো গল্পের টাকা অ্যাডভ্যান্স দেওয়া থাক—আজকালকের মধ্যেই গল্পে হাত দিন, একটা গল্প অন্তত দিন সাতেকের মধ্যেই লিখে ফেলুন, তার পর শোনা যাবে একদিন বসে। একটু থেমে অল্প হেসে অন্তরঙ্গজনের মত বলে ফেললেন, বুঝতেই তো পারছেন এর মধ্যে ব্যাপার কিছু আছে—পুরোপুরি পেশাদার না হয়ে আপনি না হয় স্পোর্টিং জেস্‌চারই দেখালেন আমার জন্যে একটু।

নিশ্চয় ! চকচকে নোটখানার দিকে চেয়ে ফটফটিয়ে উঠলেন নিরঞ্জন বোস।—ঘোষালদা নিজে এসেছেন, আমরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, টাকা ছাড়াই তো আপনারা রাজী হয়ে যাওয়া উচিত—তাও যে-সে টাকা নয়, দুটো গল্পের জন্য একশ টাকা !

ঘোষাল মাথা নাড়লেন, ওঁর সময় নেব টাকা দেব না কেন, গল্প ভালো হলে টাকা না-হয় আরো বেশিই দেওয়া যাবে...।

অব্যর্থ টোপ ফেলে নিশ্চিন্ত মনেই তিনি গাত্রোত্থান করলেন।

তাঁর সঙ্গী দুজন এবারে আর গাড়িতে উঠলেন না, তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এদিকেই প্রত্যাবর্তন করলেন। এক শ টাকার নোটখানা চোখের সামনে দেখেও আচ্ছন্ন ভাবটা যেন পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছিল না। তাঁদের ফিরতে দেখে যন্ত্রচালিতের মত নোটখানা পকেটে আড়াল করে ফেললাম।

ফিরে এসেই নিরঞ্জন বোস চারখানা হয়ে ফেটে পড়লেন। ধুপ করে আবার বসে পড়ে বলে উঠলেন, আপনার বুদ্ধি হবে কবে ? এই বুদ্ধি নিয়ে চললে আপনি কোনো দিন কিছু করতে পারবেন ভাবেন ? আমরা সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এসেছি তাতেও বুঝলেন না এই সুযোগে বড় কিছু আশা আছে ! কেবল খুঁতখুঁত খুঁতখুঁত—দশটা ছোট গল্প না হয় আপনার গেলই, তাতে এমন কি এলো গেলো—তাও তো অমনি নয়, কড়কড়ে একশটি টাকা তো পকেটে গুঁজেছেন !

আমি নিরুত্তর। যেন মস্ত বড় একটা অপরাধ করেছি। বিনয় তালুকদার বললেন, আমরা ধরে নিয়ে এলাম ভদ্রলোককে, সময় নষ্ট করলাম—লাভটা হল আপনার। কোথায় আনন্দ করবেন না মুখ যেন শোকের মুখ !

নিরঞ্জন বোস সুগম্ভীর উপদেশ দিলেন, যে সুযোগ করে দিলাম যদি মন রেখে চলতে পারেন ওই একশ টাকা নস্যি—টাকার বৃষ্টি হবে, বুঝলেন ?

বুঝে ভিতরটা কেমন খুঁতখুঁতই করতে লাগল। বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু ব্যাপারখানা কি ? প্রোপোজ্যাল্‌টা অদ্ভুত বলেই অমন হকচকিয়ে গেছলাম—

ব্যাপারখানা কি নিরঞ্জন বোস ধীরে সুস্থে ব্যক্ত করলেন এবার। আমার ধারণা শুধু সেটুকু লিখলেই একশ টাকার মধ্যে পঞ্চাশ টাকার একটা গল্প হয়ে যায়।

নিরঞ্জন বোসের বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম, সদানন্দ ঘোষাল ওই কাগজের মেয়ে-সম্পাদিকা মিলি বোসের প্রেমে পড়েছেন—শুধু প্রেমে পড়েন নি প্রেমে পড়ে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। আর ঘোষালের প্রতি মিলি বোসের ভালোবাসাও একেবারে নিখাদ, নির্ভেজাল। তাঁদের অনেক দিনের অন্তরঙ্গতা ক্রমশ দানাই বাঁধছে। মিলি বোসের সাহিত্য-প্রীতি তাঁর কাগজেই প্রমাণ। সাহিত্যিকদের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ। তাঁর কাগজের এক নম্বর পেট্রন, আজ পর্যন্ত বহু টাকাই তিনি ওই কাগজের গহ্বরে ঢেলেছেন আর ঢালছেন—কিন্তু তা বলে (সমস্ত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও) কাগজ কলম নিয়ে সাহিত্য করার সময় কোথায় তাঁর ? তাঁর ব্যবসা আছে না ? অথচ সাহিত্য একটু না করলে মিলি বোসের ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধাটুকুর তেমন যোগ হচ্ছে না। তাই ঘোষালদার একেবারে অবাক করে দেবার মতলব তাঁকে। কোনো মহিলার নামে

কয়েকটা জোরালো গল্প ছাপিয়ে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করবেন একদিন। নিরঞ্জন বোসের উপসংহার, আপনি শুধু কাঠামোটা করে নিয়ে যান না, তার পর যা করবার ঘোষালদাই পালিশ-টালিশ করে ঝকঝকে করে দেবেন দেখবেন'খন—তখন আপনি নিজেও বলবেন না যে আপনার গল্প।

তালুকদার জানালেন, উনি নিজেই বসতেন লিখতে কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে একটু এদিক-ওদিক মন দিয়েছেন কি একেবারে ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা, যত সব অপদার্থ লোক জুটেছে সেখানে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে হারাণদার মুখখানা ভেসে উঠল। ঘোষালের প্রশংসায় তাঁকেও উদ্ভাসিত হতে দেখেছি। অথচ এঁরা এমন কথা বলেন কেন।

কথায় কথায় এ-হেন শিল্প-প্রাণ মানুষটির নীরস চটের ব্যবসায় নামার কারণও জানা গেল।

মিলি বোস সাহিত্য নিয়ে ডুবে থাকলে কি হবে, টাকা চেনেন খুব। নিজেও মস্ত বড়লোকের মেয়ে, তার ওপর চেহারাখানা যা, হোমরা-চোমরা পাঁচটা টাকা-ওয়ালা লোক চারদিকে ঘুরঘুর করেও সারাক্ষণ। এই কারণে ঘোষালের সঙ্কল্প, লক্ষ লক্ষ, সম্ভব হলে কোটি কোটি টাকার বৃষ্টি করবেন মিলি বোসের মাথায়। টাকা না থাকলে মিলি বোসের ভালোবাসায়ও শুকনো টান ধরে যেতে পারে একদিন।

তেমন সম্ভাবনার মূলসুদ্ধ উপরে ফেলে দিতে বদ্ধপরিকর ঘোষালদা। কিন্তু ওদিকে বাড়িতেও আর এক ফ্যাঁকড়া—অসবর্ণ বিয়েতে খুব রাজী নন ঘোষালদার বুড়ো বাপটি। আসল ব্যাপার তা নয়, আসলে বুড়োর মোটা দাঁও মারার মতলব। তিরিশ চল্লিশ লাখওয়ালা এক মক্কেল পাকড়েছেন—সেই মক্কেলের তিনটি মাত্র মেয়ে, ছেলে নেই। বুড়ো ঘোষাল ঘুঘু ব্যারিস্টার ছিলেন তো, ছেলের জন্যে ওই তিন মেয়ের মেজটাকে আনার মতলব। বড়টা পার হয়ে গেছে, আর দুটো বাকি।

ওই নিয়েই বাপের সঙ্গে ঘোষালদার খটমট, বাপ বলেন মেয়ে সুন্দরী, মেয়ে শিক্ষিতা—তবে আবার আপত্তি কেন হবে। অত টাকা থাকলে বিয়ে করার পক্ষে শুধু মেয়ে হলেই যথেষ্ট, ওই কোয়ালিফিকেশানগুলো তো বাড়তি লাভ!

কিন্তু শ্বশুরের টাকায় বড়লোক হবে অমন পাত্র সদানন্দ ঘোষাল নন, জীবনে টাকা নিজেই তিনি বস্তা বস্তা রোজগার করতে পারবেন। বাপকে আর মুখের ওপর মিলি বোসের কথা বলেন কি করে? যদিও ওই বাপকে ফাঁকি দেবার জো নেই, মনে মনে ছেলের অমতের কারণটা তিনি আঁচ করেছেন ঠিকই—স্পষ্ট বলেছেন অসবর্ণ বিয়ে চলবে না।

নিরঞ্জন বোস ঘোষাল-আখ্যান বিস্তারে নিবিষ্টচিত্ত, ভাগ্যিস এই গোলযোগের আগেই ব্যবসার নামে ঘোষালদা বাপের কাছ থেকে লাখ দেড়েক সরাতে পেরেছিলেন, নইলে বুড়ো এক পয়সা ঠেকাতেন না, বলেওছেন, তাঁর কথা মত বিয়ে না করলে আর এক কপর্দকও মিলবে না। কিন্তু ঘোষালদা তোয়াক্কাও রাখেন না আর পয়সার, টাকা কি করে রোজগার করতে হয় সেটা ওই দেড় লক্ষ টাকা দিয়েই বাপকে বুঝিয়ে

দিয়েছেন। যুদ্ধের বাজারে চটের ব্যবসায় দেড় লক্ষ ছ লক্ষয় দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু বাপকে তাক লাগাতে হলে ওই ছ লক্ষ নস্যি—তাই আপাতত টাকা রোজগারেই মেতেছেন সদানন্দ ঘোষাল।

সাহিত্য, শিল্প নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই তাঁর। একদিকে মিলি বোস অন্যদিকে বাবা, দুজনকেই আকণ্ঠ টাকা গিলিয়ে ছাড়বেন ঘোষালদা। নইলে অমন শিল্প-প্রাণ ব্যক্তি চটের ব্যবসায় লেগে থাকেন। বাপের জন্য একটু ভাবেন না উনি, এ যুগেও বুড়ো যদি আশা করেন, ছেলে (সদানন্দবাবুর মত ছেলে!) বাপের কথায় বাপের পছন্দর মেয়ে বিয়ে করবে তা হলে তিনি আর কি করতে পারেন। কিন্তু ঘোষালদা ভাবেন মিলি বোসের জন্যে—মহিলা সাহিত্য আর সাহিত্যিক নিয়ে এক-এক সময় যে-রকম মাতামাতি করেন, তাতে টাকার জন্যে শুধুই চটের ব্যবসায় ডুবে থাকাটা খুব সুবিবেচনার কাজ নয়। এই সমস্যার ফলেই নাকি আমার অর্থাৎ এই আমার মত লেখকেরও আজ পোয়া বারো।

কিন্তু আপাতত আমার সমস্যাও কম নয়। ঘোষাল-আখ্যান শেষ করে আর মনের মত (ঘোষালদার এবং তাঁদের) গল্প লিখতে উপদেশ দিয়ে তাঁরা তো বিদায় নিয়ে গেলেন। এখন আমি করি কি?

গল্প লিখব সেটাও নিজের হবে না, এমন কি নিজের স্ত্রীর নামটিও আর নিজের (বিধিমত বিবাহ করেছি যখন ওই নামের মালিক আমি বইকি) থাকবে না—সেটাও সদানন্দ ঘোষাল নেবেন। একেবারেই অতখানির সঙ্গে আপস করা খুব সহজ নয়। স্ত্রী যতই গঞ্জনা দিন বা যতই দুর্মুখ হোন, তবু স্ত্রী তো। নাম নয়, প্রথম ধাক্কায় অনুভূতিটা এমন হল যেন তিনই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছেন।

...ভাবছি, এক শ টাকায় গল্প দিতে পারি কিন্তু নামটা দেব কেন? সেই ভাবনাও বেশিক্ষণ টিকল না, ওই নামের তো আমি আর কপিরাইট নিয়ে বসে নেই, আমি না দিলেও সদানন্দ ঘোষাল যদি ওই নামেই লেখেন, আটকাব কেমন করে।

এক শ টাকার নোটখানা হাতে পাওয়ার পর স্ত্রী ভিতর থেকে কতটুকু শুনেছেন না শুনেছেন মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। নোটখানা বাক্সজাত করে ভদ্রলোকের সুখ্যাতি করলেন, চেহারা দেখেই নাকি বোঝা যায় উঁচু মনের লোক। এক পেয়ালা চা দিতে বললাম না বলে আমার বুদ্ধির ওপর সরবে ছায়া ফেললেন তিনি, তার পর চার সপ্তাহ চারটে গল্প লিখে ওই সাপ্তাহিক-পত্র থেকে মাসে দু শ টাকা রোজগার হতে পারে কিনা সেই সম্ভাবনার গবেষণায় নিবিষ্ট হলেন।

॥ ২ ॥

গল্প লিখে উঠেছি। বেশ ঠাসা প্রেমের গল্পই একটা।

বিচ্ছেদের বুড়ী ছুঁইছুঁই করেও একটা তাক-লাগানো অঘটনের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলিন ঘটানো গেল। গৃহিণীকে শোনাবার লোভেও এক-আধার হয়েছিল,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি । সাহিত্য, বাংলা ছবি ইত্যাদি প্রসঙ্গে সেদিনের আলোচনা শোনার পর এই গল্পে নায়ক-নায়িকাকে একাধিকবার প্রগল্‌ভ সান্নিধ্যে না এনে পারা যায় নি। ছবির পাহারাওয়ালারা নীতির কাঁচি নিয়ে বসে থাকলেও সাহিত্য-পত্রের সম্পাদক অথবা সম্পাদিকারা অতটা গোঁড়ামি পছন্দ করেন না। অতএব যে-কলাটি ছবিতে অনুপস্থিত বলে সেদিন অত খেদ প্রকাশ করেছিলেন সদানন্দ ঘোষাল অ্যান্ড পার্টি, কলমের ব্যঞ্জনায় গল্পে তারও অভাব থাকল না। শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ আকস্মিক মিলন পর্যায়ে ওই কলার কিছুটা আধিক্যই ঘটানো গিয়েছিল।

তাই গল্পটা গৃহিণীকে দেখান সমীচীন মনে হল না। পঞ্চাশ টাকায় (একটা গল্পের দাম) উনি অতটাই বরদাস্ত করবেন বলে ভরসা হয় না।

টেলিফোনে দিনক্ষণ ঠিক করে বেশ খুশী মনেই একদিন ঘোষাল-আলয়ে উপস্থিত হলাম গল্প শোনাতে।

গল্পের সঙ্গে স্ত্রীর নামটাও হাতছাড়া হওয়ার দরুন যেটুকু খেদ ছিল তার বেশির ভাগ কেটে গেল বাড়ি দেখে, বাকিটুকু কাটল ঘোষালের দরাজ আপ্যায়নে। বোস আর তালুকদার আগেই হাজির। তাঁদের মুখে সেদিন অনেক লাখ-বেলাখের গল্প শুনেছিলাম, কিন্তু সে-টাকার পরিমাণ ঠাওর করা সম্ভব হয় নি বলে সেদিন মাথাও ঘামাই নি। আজ সদানন্দ ঘোষালের বাড়ি, শৌখিন আসবাবপত্র, আর আদর-অভ্যর্থনার বহর দেখে মনে হল, দশ বিশ লাখ না হোক, এখানে দু-চার দিন এলে দু-চার লাখের কথা আমিও বলতে পারি।

চপ কাটলেট রসগোল্লা সন্দেশ গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠার পর সদানন্দ ঘোষাল বললেন, নিন, এবার শোনান দেখি কি লিখলেন।

যতক্ষণ পড়া হল একবারও চোখ খুললেন না। চোখ বুজেই সিগারেটের টিন খুলে একে একে চারটে সিগারেট শেষ করলেন। নিরঞ্জন বোস তিনটে আর বিনয় তালুকদার দুটো (ঘোষালের টিন থেকেই)। এঁরা দুজনেও তন্ময় আর বেশির ভাগ সময়ই নিমীলিত নেত্র। মাঝে মাঝে সিগারেটের তাগিদে আর ঘোষালের তন্ময়তা লক্ষ্য করার জন্য যা কয়েকবার চোখ খুলেছেন। ফলে লেখক এবং পাঠক, আমি, ভিতরে ভিতরে পুলকিত। গল্প তেমন না জমলে এতটা নিবিষ্টতা প্রত্যাশিত নয়।

গল্প শেষ হতে সদানন্দ ঘোষাল চোখ খুললেন। তারপর মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। তাই দেখে বোস আর তালুকদারও। পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখানোর পর মেয়ের বাপের মুখের অবস্থা কেমন হয় জানা নেই। পরে তালুকদার ঠাট্টা করেছিলেন আমার মুখখানা নাকি সে-রকমই হয়েছিল দেখতে।

কই বলুন—? ঘোষাল মৃদু হেসে তাঁদেরই মতামত আহ্বান করলেন প্রথম।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিরঞ্জন বোস কিছু একটা মজার ব্যাপার উপভোগ করতে লাগলেন যেন। চোখ দুটো আধাআধি বুজে সিগারেট টানছেন আর হাসছেন নিঃশব্দে। বিনয় তালুকদার ফ্যালফ্যাল করে সরাসরি আমার মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন— যার অর্থ দু'রকম হতে পারে। এক, এই পদের লেখক আপনি। দ্বিতীয়, আপনার তুলনা

নেই।

অতএব ত্রিশঙ্কু অবস্থা আমার।

শেষ পর্যন্ত নিজেই মুখ খুললেন সদানন্দ ঘোষাল। পঞ্চম সিগারেটটি ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে অ্যাশপটের পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো ঠেলে দিত দিতে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আপনারা এই যে প্রেমের গল্প লেখেন, নিজেরা কি সত্যিই দু-চারটে প্রেম-টেম করেছেন, না কি সবটাই কল্পনা করে লেখেন?

প্রশ্নে ব্যঙ্গ অথবা বিদ্রূপের লেশমাত্র ছিল না, বরং সমস্যামূলক আলোচনার সুরই ছিল একটু। তবু বোসের এবারের দৃষ্টিটা সহ্য করা সহজ হচ্ছিল না। জবাব দিলাম, না মানে... তেমন সুযোগ-সুবিধে হয় নি আর কি।

ঘোষাল সদয়ভাবেই মাথা নাড়ালেন।—আপনাদের বেশির ভাগ লেখকদেরই ওই সমস্যা, অথচ প্রেমের গল্প না লিখলেও চলে না। ওদের দেশের লেখকরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই লিখতে পারে।

তালুকদার বললেন, এদেশের লেখকদের একটু নাম হতে হতেই অনেক বয়স হয়ে যায় তো—তার আগে তো গরীবই থাকে বেশির ভাগ। প্রেম করার সুযোগ কোথায়।

আলোচনার গতিতে অস্বস্তি লাগছিল। ঘোষাল একটু ভেবে নিয়ে আসল প্রসঙ্গেই অর্থাৎ গল্পের প্রসঙ্গে ফিরলেন আবার। শাদা সাপটা নির্দেশ দিলেন, আপনার গল্পের শেষে নায়কটির নায়িকার বাড়ি আসা চলবে না, ওখানে নায়িকাকে নিয়ে আসুন নায়কের বাড়ি। নায়িকা নায়কের বুকের ওপর বলতে গেলে মাথা খুঁড়বে—হঠাৎ নদীর বাঁধ ভেঙে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি হবে তার অবস্থা—হাসবে কাঁদবে এমন কি আবেগের মুহূর্তে নায়কের জামাসুদ্ধ ছিঁড়ে নিতে পারে—

আমতা আমতা করে বললাম, কিন্তু নায়িকা যে অসুস্থ.......

তাইতেও তো আরও সুবিধে, অসুস্থ বলেই ও রকম মুড আসা সম্ভব।

আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করছি বলেই হয়তো বোস একটা দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন, তবে না তো কি।

—তা ছাড়া ছেলেটাকে অমন ঘাবড়ে-যাওয়া টাইপের করলেন কেন? ঘোষালের অনুরোধ, ওকে একেবারে ওয়াইলড করে দিন—দুর্দম, দুরন্ত—

বোস টিপ্পনী কাটলেন, ছেলেটা তো আর লেখক নয় মশাই।

— এত না হয় হল, ঘোষালের বিশ্লেষণ এখনও শেষ হয় নি, গল্পে রিয়েলিস্টিক টাচ কোথায়? মোটরে করে নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য এলাকায় বেড়াচ্ছে অথচ দু-চারটে গাছের নাম নেই, কাঁচা মাটির সোঁদা গন্ধ নেই—

বোস বলল, কিছুই নেই—ও আপনাকেই করে নিতে হবে।

ঘোষাল আরও খুঁত বার করলেন, বললেন, ছোট গল্পের উপমাই হল আসল, সেদিকটায়ও আপনি ঠিক নজর দেন নি।

নায়ক-নায়িকার অন্তঃসলিলা প্রেমটা উপমায় ভরে দিন—চাঁদের সঙ্গে চামেলীর, রাতের সঙ্গে রজনীগন্ধার, সকালের সঙ্গে শুকতারার তুলনা নিয়ে আসুন।

বা বা বা! বিনয় তালুকদার লাফিয়ে উঠলেন প্রায়। নিরঞ্জন বোস শূন্যের মধ্যেই একবার হাত চালিয়ে হাতটা কপালে ঠেকালেন। অর্থাৎ, পায়ের ধুলো নিলেন।

আমি একেবারে নীরব।

আরও তিন দিনের তিন সীটিংয়ের বেপরোয়া পালিশের পর গল্প দাঁড়ালো। নিরঞ্জন বোস সেদিন মিথ্যে বলেন নি, রং-পালিশের পর ওই গল্প নিজের বলে দাবি করা শক্তই বটে। বাংলাদেশের গাছপালার ভিড়ে, কাঁচা মাটির সোঁদা গন্ধে, উপমার চটকে, আর সব শেষে গল্পের চমকে আমি নিজেই দিশেহারা। কোনো এক আত্মীয়াকে দিয়ে কপি করিয়ে গল্পটা সদানন্দ ঘোষালের হাতে সমর্পণ করে তবে স্বস্তি।

গল্পটা দিনকতক বাদে ফেরত এলো।

মিলি বোস সম্পাদিত সাপ্তাহিকের দপ্তর থেকে জয়াদেবীর নামে গল্পটা ফেরত এলো। সঙ্গে সম্পাদিকার ছোট চিঠি।—সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠপোষক শ্রদ্ধেয় সদানন্দ ঘোষাল কাগজের তরফ থেকে যোগ্য পারিশ্রমিকে গল্পটি নিয়ে এলেও এ-গল্প তাঁরা ছাপতে অক্ষম। উক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আর একটা সহজ এবং সরল বাস্তব গল্প যেন পাঠানো হয়।

আমি হতভম্ব।

গৃহিণীর চোখ বাঁচিয়ে গল্প এবং চিঠি পকেটস্থ করে ছুটতে হল ঘোষালের বাড়িতে। ঘোষাল তখন কারবারে যাবেন বলে প্রস্তুত হচ্ছেন। বোস আর তালুকদার সেখানে বসে, ঘোষালের সঙ্গে তাঁরাও যাবেন তাঁর অফিসে। ইদানীং সপ্তাহের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ দিন তাই যাচ্ছেন তাঁরা। বাড়ি থেকে অফিস টাইমে খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরোন—বিকেল পর্যন্ত সেখানেই কাটান, দরকার হলেই ঘোষালকে সাহায্য করেন(না-ই বা করলেন চাকরি, আপনজন আপনজনকে সাহায্য করেই থাকেন), অবকাশ সময় নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় জ্ঞানার্জন করেন। সন্ধ্যের সময় আবার ঘোষালের সঙ্গে ঘোষালের গাড়িতেই বেরোন, সিনেমা দেখেন, থিয়েটার দেখেন, নয়তো বিলিতি-হোটেল-রেস্তরাঁয় গিয়ে বসেন।

সদানন্দবাবু সমাচার শুনলেন, চিঠিখানা পড়লেন, তারপর মিটি মিটি হাসতে লাগলেন।—আমার আগেই মনে হয়েছিল, ওর চোখ ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ নয়, গল্পের কাঠামোটাই কাঁচা ছিল তো একটু........।

বিরস বদনে চুপ করেই রইলাম। জবাব দেব কি, মুখ খুললেই অন্য দুজন তো ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

গাড়িতে ওঠার আগে ঘোষাল বললেন, যাক যা হবার হয়েছে, বেশ ধরে বেঁধে আর একটা লিখুন, তার পর দেখা যাবে।

বোস আর তালুকদার একটা কথাও না বলে দু জোড়া বীতশ্রদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাড়িতে উঠে বসলেন।

আবারও গল্প লেখা হল। আবারও গল্পের আগা-পাশতলা ছাঁটা হল ও যোগ করা

হল। আবারও পাঠানো হল। আবারও আশা আবারও আশঙ্কায় কাটল কটা দিন।

আবারও ফেরত।

সেদিন বোস আর তালুকদার এসে জানালেন, ঘোষালদা এবারে অন্য কোনো নামী লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ভাবছেন। অতঃপর জয়া দেবী নামটাও আর চলবে না, দু-দুবার গল্প ফেরত আসার ফলে ওই নামের মর্যাদাও গেছে, অতএব আমার নাম আমারই থাকল, ইত্যাদি।

গল্প ফেরত আসতে মেজাজ আমারও খুব প্রসন্ন ছিল না। তার ওপর একটা নয়, দু-দুটো গল্পের এক শ টাকা মজুরি খেয়ে বসে আছি। বলে ফেললাম, গল্পের ওপর ওভাবে কলম চালালে শরৎবাবুর গল্পও ফেরত আসত।

সদানন্দ ঘোষালের অনুকরণে নিরঞ্জন বোস মিটিমিটি হাসতে লাগলেন, আর বিনয় তালুকদার আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। তারপর তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময়, সেই সঙ্গে হাসি গোপন করার প্রয়াস। আমার ঘা-টা কোথায় তাঁরা আঁচ করেছেন বলেই সম্ভবত আর বাক্যবাণে বিঁধতে চাইলেন না।

এক শ টাকা পরিশোধের দায়িত্বজ্ঞানে পুরো একটা দিন হাঁসফাঁস করে কাটালাম। হাতে এক শ টাকা ছেড়ে এক শটা পয়সাও নেই। গৃহিণীর কাছে থাকতে পারে, কিন্তু এক শ টাকা পাওয়ার পর আবার কবে টাকা পাবেন উল্টে সেই প্রত্যাশায় আছেন তিনি।......

ওই টাকাটা তাঁর হাতে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে আমার।

পরদিন জয়া দেবীর নামে এবারে সরাসরি নিজেই আমি আগের লেখা একটা গল্প কপি করিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। ঘোষাল জানেন না, বোস জানেন না, তালুকদার জানেন না।

পরের সপ্তাহে একেবারে ছাপাখানা সাপ্তাহিক ডাকে এসে হাজির। সেই সঙ্গে ছোট্ট চিঠিও একখানা, গল্প ভালো হয়েছে—এই রকম আরও গল্প পেলে চলতে পারে।

প্রায় হাওয়ায় ভেসেই চলে এলাম ঘোষালের বাড়ি। প্রথমে গল্প পড়ে তার পর চিঠি পড়ে ঘোষাল হালকা মন্তব্য করলেন, ভালোই তো হয়েছে, আগে এই ধরনের লিখলেই পারতেন।

বোস ও তালুকদারও পড়লেন। পড়লেন ঠিক বলা চলে না, উল্টে-পাল্টে দেখলেন। বোস বললেন, ধাক্কা না খেলে সাহিত্যিকদের কলম চলে না, ধাক্কা খেয়ে তবে লেখা কিছুটা খুলছে।

বিনয় তালুকদার অনুযোগ করলেন, পাঠালেন যখন অন্য কোনো মেয়ের নামে পাঠালেই পারতেন, দু-দুবার এই নামের লেখা ফেরত এসেছে......।

অর্থাৎ, পরে ওই নামে আত্মপ্রকাশ করাটা ঘোষালের পক্ষে একটু অসুবিধে হবে। কিন্তু তবু এর পরেও ওই নামেই আমি গল্প পাঠিয়েছি আর সে-গল্প ছাপাও হয়েছে।

একটা নয়, পরের দু মাসের মধ্যে আরও তিনটে গল্প ছাপা হয়েছে মিলি বোসের সাপ্তাহিক পত্রে। আমার এক শ টাকার দায় গিয়েও আরও এক শ টাকা পাওনা

হয়েছে সদানন্দ ঘোষালের কাছে। সাপ্তাহিক কাগজ থেকে এক পয়সাও পাই নি, তাঁদের বোধ হয় ধারণা, গল্পের পারিশ্রমিক সদানন্দ ঘোষালই দিয়ে আসছেন। অথচ ইতিমধ্যে আমি আর ঘোষাল-বাড়িমুখো হই নি। ভাবছি কি করা যায়.......।

সেই সপ্তাহেরই ছুটির দিনে বোস আর তালুকদার এসে হাজির। ঘোষাল জোর তলব, এক্ষুনি যেতে হবে। এতদিন গা-ঢাকা দিয়ে আছি বলে নরম-গরম বুলিও বাদ গেল না।

চার-চারটে গল্প ছাপা হয়ে যাওয়ার পর সদানন্দ ঘোষালের যে আস্থা এসেছে সেটা এবারের আদর-আপ্যায়নেই বোঝা গেল। দিনকে দিন লেখার নাকি আশাতিরিক্ত উন্নতি দেখা যাচ্ছে। পরের দুটো লেখার এক শ টাকা এবং আরও এক শ টাকা আগাম—এই দু শ টাকা পকেটে গুঁজে দিলেন। আরও লিখতে উৎসাহ দিলেন, মাসের চার সপ্তাহের মধ্যে অন্তত দু সপ্তাহ জয়া দেবীর গল্প থাকা চাই। মিলি বোসের সঙ্গে সেই রকম কথা বলেই রেখেছেন নাকি। আর, যে দুটো গল্প ফেরত এসেছিল, সে দুটো নাকি সম্পাদিকার নির্বাচনের মুন্সিয়ানা পরীক্ষার্থেই পাঠিয়েছিলেন জয়া দেবী—সেই কথা বলে ঘোষাল মিলি বোসের সম্পাদনার তারিফ করে এসেছেন।

আমাকে বলেছেন, ও-গল্প দুটো কিন্তু মশাই আপনার সত্যিই বড় কাঁচা ছিল, সাঁওতাল মেয়েকে আমরা জর্জেট শাড়ি পরিয়ে পাঠালে কি হবে—নেহাত আপনি দুঃখিত হবেন তাই পাঠাতে বলে ছিলাম, যদিই আমার খাতিরে চলে যায়। কিন্তু সেদিকে মেয়ে বড় কড়া, আমিই পাঠাই আর আমার বাবাই পাঠাক—

সাফল্যে অনেক গ্লানি ধুয়ে মুছে যায়। এমন খাওয়াদাওয়া খাতির-যত্ন আর কড়কড়ে দু শ টাকা লাভের পর আমারও কিছুটা উদার হতে বাধলো না। চুপ করে থেকে প্রায় স্বীকার করেই নিলাম, প্রথম গল্প দুটো কাঁচা ছিল।

অতঃপর গল্প পাঠানোয় আর ছাপা হওয়ায় আর কোনো ব্যাঘাত ঘটল না।

॥ ৩ ॥

বাসের দ্বৈতাসনের জানালার ধারটি দখল করার তাড়ায় যার সঙ্গে কাঁধে কাঁধে ঠোকাঠুকি, চেয়ে দেখি তিনি হারাণ বিশ্বাস।

দৃষ্টি-বাণে বিদ্ধ করবার জন্য দুজনেই ভুরু কুঁচকে পরস্পরের দিকে ঘাড় বাঁকিয়েছিলাম।

হারাণদা যে।

তুই.......! কি খবর, আয় বোস্।

জানলার দিকটা স্বেচ্ছায় আমাকেই ছেড়ে দিলেন তিনি, তারপর পাশে বসলেন। অনুমান, আমাকে দেখে মনে মনে তিনি একটু বিব্রত বোধ করছেন। হারাণ বিশ্বাসকে তকতকে সুট পরে আর কোম্পানির ঝক্‌ঝকে মোটর হাঁকিয়ে বহুদিনই কলকাতা চষতে দেখেছি। এমন কৃতী অর্গ্যানাইজার আমাদেরই মত বাসে চড়েছেন দেখে আমিও অবাক

একটু। বেশবাসেও আর তেমন জেল্লা নেই, মুখখানাও মলিন একটু। কিন্তু আনন্দের উচ্ছ্বাসে এই সামান্য ব্যতিক্রমের দিকে চোখ গেলেও মন গেল না। জানাবার মত কথা আছে বলেই ভিতরে ভিতরে উৎফুল্ল আমি।

মিলি বোসের সাপ্তাহিকে একশটা গল্প ছাপা হলেও বোস আর তালুকদারের বাহবা মিলবে না। সদানন্দ ঘোষালের সঙ্গে পরিচয়টা তাঁরাই করে দিয়েছিলেন, সুযোগ-সুবিধে পেলে সেই কথাই বরং শোনাতে ছাড়েন না। কাজেই মন উজাড় করে কথা বলার মত একজন কাউকে বোধ হয় মনে মনে খুঁজছিলামও। সব কথা বলে আনন্দ করার মতই অপ্রত্যাশিত যোজাযোগ।

বলতে শুরু করে ঝোঁকের মাথায় সবই বলা হয়ে গেল। সদানন্দ ঘোষালের আমার বাড়িতে আগমন, মিলি বোসের সাপ্তাহিকে ছদ্মনামে গল্প লেখার আমন্ত্রণ, ছদ্মনামের উদ্দেশ্য, গল্পের ওপর সদানন্দ ঘোষালের বেপরোয়া মাস্টারি এবং সে গল্প ফেরত আসা—সব শেষে নির্ভেজাল নিজের গল্প জয়া দেবীর নামে নিয়মিত ছাপা হওয়ার বারতা।

হারাণ বিশ্বাস নিবিষ্টমনে সব শুনে গেলেন, তার পর ফোঁস করে বড় নিঃশ্বাস ছাড়লেন একটা। একটু হালকা হবার পর ভালো করে চোখ গেল তাঁর দিকে। বেশ শুকনো লাগছে।

তারপর তোমার খবর কি বলো হারাণদা, বাসে চলেছ, কোম্পানির গাড়ি কি হল?

কোম্পানির গাড়িতে সাহেব আর মেমসাহেব চড়ছে, আমাদের চড়ার হুকুম নেই। নীরস জবাব।

আমি অবাক, সাহেব-মেমসাহেব! তারা কারা?

এসেছে। তারা ছাড়া ব্যবসা বোঝেই বা কে আর ব্যবসা জানেই বা কে! তার ওপর মোসাহেব জুটছে দুটি—তোর ওই ওঁরাই হবেন। সব একেবারে ঝরঝরে করে দিলে!

আমার ওঁরা অর্থাৎ নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদার। কিন্তু হারাণ বিশ্বাসের কথাবার্তা আর হাবভাব দুর্বোধ্য। এই কিছুদিন আগে ইনিই গভীর অনুরাগে সদানন্দ ঘোষালকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন, অমন দরাজ মনের কাছে গড়ের মাঠটাকেও ছোট মনে হবে বলেছেন—এরই মধ্যে কি হল আবার!

খানিক গুম হয়ে বসে থেকে হারাণ বিশ্বাস জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কি খুব তাড়া আছে নাকি?

ঘাড় নাড়লাম, তেমন কিছু না।

আয়, নামা যাক, কথা আছে।

তাঁর সঙ্গে নেমে দেখা গেল আমার যেমন আনন্দ সমাচার জ্ঞাপন করার তাগিদ ছিল, তাঁরও তেমনি কিছুটা ক্ষোভ উজাড় করার তাগিদ ছিল। এঁদের চটের ব্যবসার খুঁটিনাটি কিছুই জানতুম না—খুব জাঁকিয়ে ব্যবসা করছেন এটুকুই জানতাম।

চৌরঙ্গীর এক চায়ের দোকানে বসে ব্যবসার সমাচারটাই প্রথমে আদ্যন্ত শুনতে হল।

ব্যবসায় প্রতিমাসে এখন বেশ হাজার কতক করে লোকসান যাচ্ছে—যাবেই তো, যুদ্ধের বাজারের সেই চাহিদা তো আর এখন নেই, এখন সর্বত্র স্টক ছাড়ার হিড়িক অথচ সদানন্দ ঘোষাল স্টক বাড়াচ্ছেন। অন্য যে কাজের মওকা এখন, তার দিকেও নজর নেই। কিন্তু ঘোষালকে সে কথা বলে কে—একজন পার্টনারকে তো এরই মধ্যে তাড়ানো হয়ে গেছে।

আর একটু প্রাঞ্জল করে বললে যা দাঁড়ায় তার সার কথা, যুদ্ধের বাজারে মোটা মোটা অর্ডার নিয়ে টাকার জন্যে আটকে পড়তে হচ্ছিল বলেই এই ব্যবসায় ঘোষালের অনুপ্রবেশ। তাঁর দেড় লক্ষ টাকায় তখন দশ লক্ষ টাকার কাজ করা গেছে। কিন্তু টাকা যার জোর তার। বেশ রয়ে-সয়ে সেই জোরই খাটিয়েছেন সদানন্দ ঘোষাল।

বাপ ঝুনো ব্যারিস্টার, ছেলের হয়ে আঁট-ঘাট সব তিনিই বেঁধে দিয়েছিলেন। আর প্রগাঢ় আস্থা ছিল বলে এসব দিক এঁরাও তখন অত তলিয়ে দেখেন নি—ব্যবসা ফাঁপিয়ে তোলার কথাই ভেবেছেন শুধু। প্রথম সুযোগেই প্রধান পার্টনারকে সরানো হয়েছে—তা তিনিও বোকা নন একেবারে, নিজের লাখখানেক টাকা আগের থাকতে গুটিয়ে নিয়েই সরে গেছেন।

কিন্তু হারাণদা তো শুধু ওয়ার্কিং পার্টনার আর বেতনভোগী অর্গ্যানাইজার—তাঁর আর জোর কতটুকু ? তিনি মুখ বুজে পড়ে আছেন, তাঁর অবস্থা কাহিল, কারণ এক পার্টনার টাকা নিয়ে সরে পড়ায় সদানন্দ ঘোষাল সম্প্রতি তাঁর ওপরেও বিরূপ।

বলতে বলতে চোখ ছল্-ছল্ করে এল হারাণ বিশ্বাসের।—দ্যাখ তো, কত বড় আশা নিয়ে ব্যবসায় নেমেছিলাম, কত খেটেছি—আর ওর চোখে আমিই অকর্মণ্য এখন, কোনো কাজের নই। যত কাজের লোক এখন উড সাহেব, মাসে বারশ টাকা মাইনে খাচ্ছে—সাহেব ম্যানেজার না হলে ফার্মের প্রেস্টিজ থাকে না। আর ওই এক মেমসাহেব জুটিয়েছে প্রাইভেট সেক্রেটারি, সাহেবটাই এনে দিয়েছে—

পার্টির কাছে গিয়ে মেমসাহেব একটিবার তেমন করে হাসলেই নাকি যেখানকার যত অর্ডার সব হুড়মুড়িয়ে আমাদের কাছে এসে পড়বে। সেই হাসিটা এখন শুধু ঘোষালের ওপরেই খাটাচ্ছেন মেমসাহেব !

আমার কোন স্বার্থ নেই তবু সব শুনে মেজাজটা বড় বিষণ্ন হয়ে গেল। স্বার্থ নেই-ই বা বলি কি করে, গল্পের স্বার্থ আছে। তা ছাড়া বোস আর তালুকদারের অভ্রান্ত বিশ্বাস, মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে জমলেই সদানন্দ ঘোষাল চটের ব্যবসা ছেড়ে ছবির ব্যবসায় নামবেন—ওটাই যোগ্য লাইন তাঁর।...যদি নামেন গল্পের ভারটা কি আমার ওপরেই পড়বে না !

কিন্তু হারাণদার কথা কতটা বিশ্বাস্য আর কতটা নয় তারই বা ঠিক কি ! ঘোষাল তো হেঁজিপেজি লোক নন, আর বুদ্ধিও রাখেন।

কিন্তু হারাণদাও আর যাই হোন কাজের লোক, উদ্যমী পুরুষ। সেই হারাণদাই আমার হাত ধরে অনুনয়ের সুরে বললেন, আমার হয়ে ঘোষালকে একটু বলিস-টলিস—এ বয়সে নতুন করে আবার কোথায় গিয়ে দাঁড়াব !

মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে কি একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিও ভিতরে ভিতরে গুড়গুড়িয়ে উঠতে লাগল। জবাব দিলাম, বলব...কিন্তু তোমাকে যা বললাম, ওই ইয়ে গল্প-টল্পের কথা আর কি, সে-সব যেন তাঁকে কিছু বলো না।

পাগল নাকি! হারাণদা যেন সে প্রসঙ্গ ভুলেই গেছেন।

এরপর একদিন প্রায় দুরন্ত আবেগেই সদানন্দ ঘোষালের প্রাইভেট সেক্রেটারির সমাচার শোনালেন নিরঞ্জন বোস। সুযোগ পেয়ে কথাটা অবশ্য আমিই তুলেছিলাম।—সদানন্দবাবু কি মেম-সেক্রেটারি রেখেছেন নাকি?

নিরঞ্জন বোস নড়েচড়ে বসেছেন একটু। বড় বড় দুই গোল চোখ মুখের ওপর ফেলে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি জানলেন কি করে?

সেদিন মোটরে দেখলাম আপনার আর সদানন্দবাবুর মাঝখানে একজন শাড়িপরা মেমসাহেব— বিনয়বাবু ড্রাইভারের পাশে ছিলেন...।

বোস উৎফুল্ল মুখে বলে উঠলেন, চোখ তো খুব মশাই, যে-টুকু চোখে পড়ার ঠিক পড়ে!

চোখে পড়েছে বলেই নিরঞ্জন বোস খুশী। মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, তা কেমন দেখলেন শাড়ি-পরা ক্লারা দেবীকে?

ক্লারা দেবী!

আমার বিস্ময়টুকু যেমন আনন্দের কারণ তাঁর, তেমনি অবজ্ঞার।—অমনি হাঁ করে ফেললেন? মিস ক্লারা বা মিসেস ক্লারা থেকে কি কানে খারাপ লাগল শুনতে? এই রসজ্ঞান নিয়েই তো সাহিত্য করেন আপনারা! তার পরে সগর্বে ঘোষণা করলেন, নামটা আমি দিয়েছি, ঘোষালদাও অ্যাপ্রুভ করেছেন আর শুনে আনন্দের চোটে ক্লারা দেবীর মুখখানি আমার মুখের থেকে চার আঙুলের বেশি দূরে ছিল না। ভদ্রমহিলার আদরে আর খুশিতে আমি নাজেহাল!

আমি বিস্ফারিত নেত্রে দেখলাম, সেই নাজেহাল হওয়ার তৃপ্তি এখনও তাঁর চোখে মুখে। নতুন করে আবার খানিক নিঃশব্দে সেই আনন্দ রোমন্থন করে বোস দ্বিতীয় খুশির শর নিক্ষেপ করলেন,—আর সেই শাড়িটা? ঘোষালদাকে বলে কয়ে আমিই দুখানা শাড়ি কিনিয়ে দিয়েছি—শাড়ি-পরা ক্লারা দেবী কেমন?

ভা...ভালো—

ভালো! এমন আর দেখেছেন কোথাও? শাড়ি পড়লে ওঁকে যা দেখাবে সেটা এই মাথাতেই প্রথম এসেছিল বুঝলেন—এই মাথাতে। পথে ঘাটে এক-একজন হাড়-জিরজিরে শাড়ি-পরা পাঁশুটে মেম-সাহেবকে দেখেই চোখ ফেরানো যায় না, ক্লারা দেবীর মত হৃষ্টপুষ্ট মেমসাহেব শাড়ি পরলে কি কাণ্ড হবে সেটা না দেখেই আন্দাজ করেছিলাম—ছবির ডিরেক্টার হতে গেলে সেই চোখ থাকা দরকার—ওমনি হয় না।

নির্বাক অভিনিবেশে আরও ঘণ্টাখানেক বসে উর্বশী বিনিন্দিতা ক্লারা দেবীর গুণগান শুনে যেতে হল।

মহিলা নাকি যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি সুরসিকা। ঘোষালদার ভাগ্য ভালো এমন

সেক্রেটারি পেয়েছেন। বাজারে একবার ঘুরে এলেই বাজার চন্‌মনিয়ে উঠবে। ঘোষালদার ছোটখাটো কাজে এখনও ওঁকে লাগাচ্ছেন না—'পেটি' কাজের জন্য ওঁর মত মেয়েকে চিপ করে লাভ কি! শুধু-পঞ্চাশ হাজারের অর্ডারগুলো উনি 'ডিল' করবেন। তবে যাই করুন আর তাই করুন, শেষ পর্যন্ত ছবিতেই আসতে হবে ক্লারা দেবীকেও।

—শাড়ি-পড়া মেমসাহেব নায়িকার কথা বাংলা ছবিতে আজ পর্যন্ত কল্পনা করতে পেরেছে কোনো ডাইরেক্টর? দর্শকদের চোখ ঠিকরে যাবে না।

নিরঞ্জন বোস নাকি সেই সুবর্ণ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েই রেখেছেন ক্লারা দেবীকে—অবসর সময়ে অফিসে একটু-আধটু বাংলাও শেখানো হচ্ছে তাঁকে। ক্লারা দেবী তো দিন গুনছেন কবে সেই দিন আসবে—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ হেন ক্লারা দেবীর সঙ্গে চাক্ষুষ যোগাযোগেরও সুযোগ ঘটল একদিন।

বলা বাহুল্য, সুযোগটা নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদারই ঘটালেন। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত তাঁরা হঠাৎ এসে একদিন বিশ টাকা চাঁদা দাবি করে বসলেন। টাকাটা তক্ষুনি দিতে হবে—জরুরী।

শুনেই মুখ শুকাল, আট আনা এক টাকা নয়, একেবারে বিশ টাকা চাঁদা।—কেন? কি ব্যাপার?

ব্যাপার সদানন্দ ঘোষালের জন্মদিন পরের সপ্তাহে—সেদিন সকলেরই আমাদের নেমন্তন্ন তাঁর বাড়িতে, সেই নেমন্তন্ন যথাসময়ে আমার কাছেও আসবে। বোস আর তালুকদার স্থির করেছেন অভিনব একটি উপহার দেবেন ঘোষালদাকে—যা কেউ কখনও কল্পনা করে নি, বা কেউ কোনোদিন দেয় নি। উপহারটি ঘোষালদাকে দেওয়া হবে তাঁর জন্মদিনের আগের দিন—বাড়িতে নয়, তাঁর অফিসের খাস কামরায়।

নিরঞ্জন বোস রহস্যভরে হাসতে লাগলেন, তালুকদারের মুখে চাপা উদ্‌বেগ—বলে না ফেলে।

আর আমার মুখে প্রচ্ছন্ন শঙ্কা। কিন্তু খুব প্রচ্ছন্ন নয় বোধ হয়, এক নজর তাকিয়েই বোস ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, অমন করে দেখছেন কি—কত টাকা ঝেড়েছেন আজ পর্যন্ত? ঘোষালদার জন্মদিনে বিশটা টাকা দিতে পারেন না?

তালুকদার টিপ্পনী কাটলেন, আমাদের মধ্যে টাকার মুখ তো মশাই আপনি একাই দেখেছেন—আমরা বিশ টাকা দিলে আপনার কম করে চল্লিশ টাকা দেওয়া উচিত।

কথাটা মিথ্যে নয়, টাকা সদানন্দ ঘোষালের কাছে এ পর্যন্ত খুব কম পাই নি। এঁরা কিছু না পেয়েই দিচ্ছেন যখন, অতি বড় আশাতেই দিচ্ছেন। সেখানে আমার পিছিয়ে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ভবিষ্যতের আশা সকলেই রাখে। আর ঘোষাল যদি শোনেন তাঁর জন্মদিনে কুড়িটা টাকা দিতেও কার্পণ্য করেছি, তা হলে মান-সম্ভ্রম থাকবে কোথায়?

সামলে নিয়ে বললাম, টাকার জন্যে নয়—তিন কুড়ি ষাট টাকায় কি এমন উপহার দেবেন সেই কথা ভাবছিলাম।

বোস গম্ভীর মুখে বললেন, ষাট টাকায়ও হবে না বোধ হয়, আরও দু-দশ টাকা

বাড়তি লাগলে আপনাকেই দিতে হবে।

শুনে আবারও মুখ শুকিয়েছে, পাছে টের পান তাই চেষ্টা করেও হাসতে হল একটু।—কিন্তু অত টাকায় দেবেনটা কি ?

জবাবে দুজনেরই আবার সেই রহস্যভরা হাসি এবং দৃষ্টি বিনিময়। তালুকদার বললেন, সেটা সেই দিনই দেখতে পাবেন, আগে বলা চলবে না। লেখকদের বিশ্বাস নেই। পাঁচকানে মন্ত্রনাশে ওস্তাদ আপনারা।

অতএব কিছু না জেনে বিরস বদনে শুধু টাকাই বার করে দিতে হল। সেই গোড়ায় দু-দুটো গল্প নিয়ে ঘা পাবার পর থেকে গল্প ছাপা না হওয়া পর্যন্ত অ্যাডভ্যান্সের টাকাটা আর স্ত্রীর হাতে দিয়ে হাতছাড়া করি নে—নিজের কাছেই রাখি, গল্প ছাপা হলে তারপর দিই। নিরুপায় হয়ে সেই টাকা ভেঙেই কুড়িটি টাকা সঁপে দিলাম।

এরপর যথাদিনে অর্থাৎ, ঘোষালের জন্মদিনের আগের দিনে বোস আর তালুকদারের সঙ্গে বিকেলের দিকে গেলাম ঘোষালের অফিসে। উপহারের বাক্সটি নিরঞ্জন বোসের হাতে। তখনও জানি নে কি আছে ওতে। একটা জুতোর বাক্সর মত। ব্রাউন পেপারে মোড়া। সঙ্গী দুজন আনন্দবিহ্বল—সমস্ত পথ মিটিমিটি হেসেছেন শুধু। তাঁদের দিকে চেয়ে আমিও রোমাঞ্চ অনুভব করেছি একটু—ষাট টাকার উপহার, কি এমন বস্তু থাকতে পারে ওতে মনে মনে অনেক জল্পনাকল্পনা করেছি।

সদানন্দ ঘোষালকে আগেই তাঁরা টেলিফোন জানিয়ে রেখেছেন, জন্মদিনের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আগের দিনই বিকেলের দিকে আমরা তিন জন তাঁর অফিসে যাচ্ছি। অবশ্য পরদিনও তাঁর বাড়িতে যাব এবং উৎসবে যোগদান করব, কিন্তু সেই উপলক্ষে আগের দিন নিরিবিলিতে আমরা তাঁকে কিছুক্ষণ পেতে চাই।

অনুরাগী বন্ধুদের দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি সদানন্দ ঘোষাল। সানন্দেই আরজি মঞ্জুর করেছেন।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াতেই বেয়ারা শশব্যস্তে সেলাম ঠুকল। সে এদের ভালোই চেনে বোঝা গেল। বোস ইশারায় জিজ্ঞাসা করে নিলেন, ঘরে আর কে আছে ?

বেয়ারা তেমনি ফিসফিস করে জবাব দিল, মালিক আছেন, আর সাহেব আর মেমসাহেব আছেন—

হারাণ বিশ্বাসের মুখে সাহেব ম্যানেজারের কথাও শুনেছিলাম মনে পড়ল। এখানে হারাণদার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে ভেবেছিলাম, দেখা না হওয়াতে কেন জানি স্বস্তিই বোধ করছিলাম। ওদিকের কোনো ঘরে আছেন বোধ হয়। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিলাম।

হ্যাঁচকা টানে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। থামিয়ে দিয়ে বোস নিঃশব্দে চোখ পাকালেন একবার। তারপর বেশ মোলায়েম অথচ তরতাজা কণ্ঠে বাইরে থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, ঘোষালদা আসব ?

আসুন—। দরাজ আহ্বান।

অতঃপর প্রবেশ।

রিভলভিং চেয়ারে শরীর ঢেলে দিয়ে বসে আছেন সদানন্দ ঘোষাল। তাঁর পাশেই একটা রকিং চেয়ারে শাড়ি-পরা ক্লারা দেবী অল্প অল্প দুলছেন। সামনে মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের ওধারে ঘোষালের মুখোমুখি বসে ম্যানেজার উড সাহেব। তিনজনের মুখেই সিগারেট। মস্ত বড় ঘর, আগাগোড়া পুরু কার্পেট বিছানো। পা ফেলতে মায়া হয়। এমন সুন্দর অফিস-ঘর আমি কমই দেখছি।

ঘোষাল আবারও আপ্যায়ন করলেন, আসুন, আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

সাহেব এবং মেমসাহেবের মুখে অন্তরঙ্গ হাসি। অপরিচিত ব্যক্তিটিকে দেখে, অর্থাৎ আমাকে দেখে সৌজন্যসূচক অভিব্যক্তি একটু। ঘোষাল আমার পরিচয় জ্ঞাপন করলেন তাঁদের কাছে। সেই পরিচয় শুনে অন্তরতুষ্টিতে বিহ্বল আমি। আর, এমন একজন যশস্বী সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরাও ধন্য যেন। তাঁদের, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গিনীটির অন্তরঙ্গতায় ঘেমে ওঠার দাখিল। জীবনে সেই প্রথম মেমসাহেবের হাতে হাত মেলাবার সৌভাগ্য আমার।

আনন্দে ডগমগ নিরঞ্জন বোস ক্লারা দেবীর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। পরে চুপি চুপি বলার ভঙ্গিতে সকলকে শুনিয়েই প্রশস্তি জানালেন, ইউ লুক ওয়াণ্ডারফুল ম্যাডাম—এই শাড়িখানায় আরও চমৎকার মানিয়েছে।

ম্যাডাম পরিতুষ্ট। বোসের বাহুতে একটা মৃদু খোঁচা দিয়ে ছদ্ম-কোপ প্রকাশ করলেন, ইউ নটি বয়, ইউ আর জোকিং—ঠাট্টা হচ্ছে।

ঠাট্টা! দু চোখ কপালে তুলে ফেললেন নিরঞ্জন বোস, ক্লারা দেবীর হাতখানা তাঁর দু হাতের মুঠোয় বন্দী।--আচ্ছা দাদা আপনিই বলুন, এই শাড়িখানায় আরও অদ্ভুত মানায় নি ওঁকে! ফায়ার আপন্ ফায়ার—আগুনের ওপর যেন আগুন লেগেছে!

সকলেই হেসে উঠলেন, ক্লারা দেবী খুশিতে যথার্থই রক্তবর্ণ। ম্যানেজার মিঃ উড্ সহাস্যে উঠে দাঁড়িয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর অনেক কাজ, ব্যবসায়ের তাগিদে অনেক জায়গায় যেতে হবে।

তিনি অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো ছন্দপতন একটা।

ফাইল হাতে ঘরে ঢুকলেন হারাণ বিশ্বাস, মুখে অপ্রতিভ হাসির আভাস। তাঁকে দেখে বোস ক্লারা দেবীর হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ বাঁকালেন। বিনয় তালুকদার গম্ভীর।

ঘোষালের মুখভাবে কোনো ব্যতিক্রম নেই অবশ্য, নির্বিকারমুখেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই?

আমার দিকে একটা করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হারাণ বিশ্বাস ফাইলসহ টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন। আমার উপস্থিতি তেমন অপ্রত্যাশিত মনে হল না...বরং আমি যে এখানে বসে সেটা যেন জেনেই এসেছেন। ভাবলাম ভেতর থেকে দেখে থাকবেন।

ঘোষাল এখন ফাইল দেখতে রাজী নন বোধ হয়, আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই তাই বলুন না ছাই—

বিশ্বাস আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, স্টক ফাইলটা এক বার দেখলে হত,

পার্টিরা মাল ডেলিভারি নিচ্ছে না—

ঘোষাল হালকা বিদ্রূপে বলে উঠলেন, সমস্ত দিন কাবার করে এই শেষ বেলায় এলেন ডেলিভারি দেখাতে !

বোস-তালুকদারের হাস্যগুঞ্জন, মেমসাহেবের চোখে মুখে প্রগল্‌ভ কৌতুক। ঘোষাল মৃদু হেসে টেনে বললেন, আপনার বুদ্ধি আর কবে হবে মশাই—এঁদের সঙ্গে বসে আছি, হড়বড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। চারটের পর আজ আর কিছু দেখব না তাও বলে দিয়েছি—কান দুটো কি মেরামতে পাঠিয়েছেন নাকি ? ওসব নিয়ে যান এখন, কাল হবে—

ফাইল হাতে পাংশু মুখে হারাণ বিশ্বাস প্রস্থানোদ্যত হয়েও থামলেন একটু। তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো আছ তো ?

আমি কলের পুতুলের মতই একটু ঘাড় নেড়েছি বোধ হয়, একটি কথাও বলতে পারি নি। বিশ্বাস চলে যেতে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি চেনেন নাকি ওঁকে ?

বিশ্বাসের করুণ কুশল প্রশ্নের একটাই তাৎপর্য—বোঝ কি অবস্থায় আছি, তোমাকে দেখেই এসেছিলাম, আমার কথাটা ভুলো না। কি জানি কেন, তাঁর জন্য মনটা সহানুভূতিসম্পন্নই হয়ে উঠল। সুপারিশ করার বাসনাও মনে জাগল একটু। বললাম, হ্যাঁ, বড় ভালো লোক—

ঘোষাল তক্ষুনি সকৌতুক প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন আবার, ভালো লোক জানলেন কি করে ?

বোস উৎফুল্ল মুখে হাত বাড়িয়ে ক্লারা দেবীর হাতে মৃদু চাপ দিলেন একবার। তাৎপর্য, মজা দেখ এবার—

বিনয় তালুকদার টেবিলের ওপর কনুই আর হাতের ওপর গালখানা পেতে আমাকে দেখতে লাগলেম।

বললাম, প্রায় ছেলেবেলা থেকেই জানি তো...

আপনার ছেলেবেলা তা হলে এখনও শেষ হয় নি। ঘোষালের প্রসন্ন মন্তব্য।—লেখকরা এই রকম লোক চিনলেই তো খাসা, ভালোয় ভালোয় আপনার ওই ভালো লোকটিকে এখন তাড়াতে পারলে বাঁচি মশাই।

আমার দুর্দশাটাই সকলের উপভোগের বস্তু যেন। তবু হারাণ বিশ্বাসের দুর্ভাগ্যে আরও বেশি বিমর্ষ হয়ে পড়লাম, হাল ছাড়তে মন সরল না। বললাম, কিন্তু আপনার তো উনি খুব প্রশংসা করেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হবার আগেই ওঁর মুখে আপনার কথা কত শুনেছি—

ঘোষাল তাকালেন বোসের দিকে। ফলে বোস আমার দিকে।—প্রশংসার লোককে প্রশংসা করেছেন, তাতে উনি ভালো হলেন কি করে—আপনাদের সাহিত্য-ভাষায় ওটাই কি ভালোর নজির নাকি ?

সদানন্দ ঘোষাল সানন্দে উপদেশ দিলেন, আপনি নিজেই মশাই ভাল লোক, তাই ভালো চেনা আপনার কর্ম নয়—মোট কথা, বেশি মাখামাখি করবেন না, আপনার

ওই ভালো লোকটি বাস্তু ঘুঘু।

বোস-তালুকদারের সমবেত হাসি। ক্লারা দেবী হালকা প্রশ্ন নিক্ষেপ করে বসলেন, গুগু কি?

বোস তক্ষুনি অনুবাদ করে দিলেন, ডোমেস্টিক ডাভ—।

আর তালুকদার ব্যাখ্যা করলেন, দ্যাট মীনস ডিপ-ওয়াটার ফিশ...।

নিরঞ্জন বোস এই নীরস প্রসঙ্গে আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। পাশের র‍্যাক থেকে কাগজে মোড়া উপহারের বাক্সটা টেনে নিয়ে বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে ঘোষালের দিকে চেয়ে বললেন, আপনার জন্মদিনের আনন্দে একটু অন্যায় করে ফেলেছি দাদা, গ্রহণ করতে হবে—।

ঘোষালের প্রশ্রয় মিশ্রিত অনুযোগ, কিছু খরচাপাতি করে বসেছেন বুঝি, কি আছে ওতে?

তালুকদার বললেন, আপনি নিজেই খুলুন, আমরা খুলব না।

ঘোষাল হাত বাড়িয়ে বাক্সটা টেনে নিলেন। ওজন পরখ করে বুঝতে চেষ্টা করলেন কি আছে। ওপরের ব্রাউন পেপার ছিঁড়ে ফেললেন। আমিও সাগ্রহে দেখছি। ভিতরে তো জুতোর বাক্সই মনে হচ্ছে একটা, তবে, জুতোর লেবেল চোখে পড়ে না, সাদা কাগজ আঁটা।....ষাট টাকা খরচ করে বোস কি শেষে জুতো এনে হাজির করল নাকি একজোড়া।

ঘোষাল বাক্সটাও খুলে ফেললেন।

বাক্সর ভিতরের তুলোর পাঁজা সরাতে যে বস্তুটি আত্মপ্রকাশ করল, দেখে একেবারে নির্বাক, বিমূঢ় আমি।

বাক্সর ভিতরে ঘোড়ার লেবেল আঁটা সুন্দর বোতল একটা ভিতরে রঙিন পদার্থ টলটল করছে।

ঘোষালও এই অপ্রত্যাশিত উপহার দর্শনে নির্বাক ক্ষণকাল। বোস এবং তালুকদারের সশঙ্ক প্রতীক্ষা। ক্লারা দেবীব চোখে কৌতুক মাধুর্য।

সদানন্দ ঘোষাল সপ্রশংস নীরবতায় হাত বাড়িয়ে দিলেন নিরঞ্জন বোসের দিকে। করমর্দন করলেন। তারপর বিনয় তালুকদারের সঙ্গে। শেষে আমার সঙ্গেও।

সঙ্গে সঙ্গে বোস আর তালুকদারের জীবন সার্থক যেন। যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়ে তৃপ্ত তাঁরা। আমারই শুধু দিশেহারা অবস্থা।

প্যাঁক করে কলিং বেল-এর বোতাম টিপলেন সদানন্দ ঘোষাল। বেয়ারা হাজির হতে পাঁচটা গেলাস, পাঁচটা ঠাণ্ডা সোডা, এবং পাঁচ দফা খাবার আনার হুকুম হল তাব ওপর। আর সতর্ক করে দেওয়া হল, কাউকে যেন আর এই ঘরমুখো আসতে না দেওয়া হয়।

বেয়ারা চলে যেতে প্রসন্ন অন্তরঙ্গতায় রিভলভিং চেয়ারটা অর্ধেক বাঁয়ে পরে অর্ধেকটা ডাইনে ঘোরালেন।—এ রিয়েল সারপ্রাইজ—এ রিয়েল অ্যাণ্ড সুইট অ্যাণ্ড ওয়াণ্ডারফুল সারপ্রাইজ।

ক্লারা দেবীও রকিং চেয়ারে মৃদু মৃদু দুলতে শুরু করেছেন। বোস আর তালুকদারের মুখে অপার্থিব আনন্দ। আমার মুখ...আমার মুখ আমি আর দেখব কি করে।

একটু বাদেই বেয়ারা সব কিছু নিয়ে হাজির। টেবিলের কাগজপত্র ঝেঁটিয়ে সরিয়ে ফেলা হল। সারি সারি খাবারের ডিশ পড়ল সেখানে। ডিশের পাশে শূন্য গ্লাস একটা করে আর সোডার বোতল।

ঘোষাল নিজের হাতে ঘোড়া-মার্কা উপহারের বোতলটা খুলে ফেললেন। তারপর প্রত্যেকের গ্লাস টেনে নিয়ে খানিকটা করে রঙিন তরল পদার্থ ঢেলে দিতে লাগলেন। আমার গ্লাসটা টেনে নেবার সময় মৃদু হেসে একটু বাড়তি মর্যাদা দিলেন যেন, অভ্যাস আছে তা হলে?

শুকনো জিভটা শুকনো ঠোঁটের ওপর ঘষে নিয়ে কোনো প্রকারে বলে ফেললাম, আমি খাবারের সঙ্গে শুধু সোডাটাই খাই, ইয়ে—ঠিক অভ্যেস নেই।

শুনে ঘোষাল বেশ জোরেই হেসে উঠলেন। নিরঞ্জন বোস চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিলেন। ঘোষালকে হাসতে দেখে পাকানো চোখেই হাসির জেল্লা ফোটালেন। মেমসাহেবও হয়তো আমার অবস্থাটা উপলব্ধি করেই মজা দেখছেন।

ঘোষাল বললেন, উৎসবে বসলে একটু-আধটু খেতে হয় মশাই, কিছু খারাপ লাগবে না, খেয়ে দেখুন।

গ্লাস ঠেলে দিলেন, তালুকদার পাশ থেকে গম্ভীর মুখে সাহায্য করতে লেগে গেলেন, অর্থাৎ আমার গ্লাসের রঙিন পদার্থটুকু সোডার জল ঢেলে প্রায় সাদা করে দিলেন।

তারপর গ্লাস ঠোকাঠুকি। বিলিতি ছবিতে যেমন দেখেছিলাম। ঘোষাল বলল, নিন্, আরম্ভ করুন।

সৌজন্যের তাগিদে গ্লাসটা একবার ঠোঁটে ছুঁইয়ে আমি খাবারের ডিশে মন দিয়েছি। কিন্তু শুকনো চপ কাটলেট আজ যেন বড় বেশি শুকনো লাগছে। সহজে জঠরদেশে চালান করে উঠতে পারছি না। সকলের বিশেষ আগ্রহটুকু ক্লারা দেবীর প্রতি সন্নিবদ্ধ বলেই আমার দিকে চোখ নেই কারও।

ডিশের খাবার আধাআধি শেষ না হতেই গ্লাসের পানীয় নিঃশেষ সকলের। শুধু আমারটা বাদে। ঘোষাল আবারও ঘোড়া মার্কা বোতল খুললেন।

এইবার ধরা পড়লাম।

ঘোষাল বিস্ময় প্রকাশ করলেন, সে কি মশাই, আপনি যে একেবারে ছোঁন নি দেখি!

জোড়া জোড়া সব কটি আমেজি চোখ আমারই মুখের ওপর আটকে গেল। ঢোক গিলে বললাম, ইয়ে—আপনারা নিন না।

নিরঞ্জন বোস হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে কাছে এসে এক হাতে আমার মাথাটা একেবারে তাঁর মুখের কাছে টেনে নিলেন। তার পর আধা উত্তেজনা এবং আধা কাঁদ কাঁদ সুরে কানে কানে বললেন, দোহাই আপনার, আজকের দিনে ঘোষালদাকে এভাবে অপমান করবেন না, তা ছাড়া ক্লারা দেবীই বা কি ভাবছেন—লজ্জায় যে আমাদের একেবারে

মাথা কাটা গেল।

আমি হতভম্ব। কিছুই না বুঝে তাড়াতাড়ি গ্লাসটা তুলে নিয়ে বেশ বড়সড়ই চুমুক বসিয়ে দিলাম একটা। ঘোষাল সানন্দে বলে উঠলেন, হিয়ার হিয়ার।

আনন্দ জিনিসটাই ছোঁয়াচে। বোস প্রায় নাচতে নাচতে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। ততক্ষণে ঘোষাল আর এক দফা তাঁদের সকলের গেলাস ভরে দিয়েছেন। সানন্দে পানাহার শুরু আবার।

চপ কাটলেট্‌গুলো এবারে যেন মুখের মধ্যে গলে গলে তরল হয়ে যাচ্ছে। পাছে আবার কাউকে অপমান করা হয় বা লজ্জায় কারও মাথা কাটা যায়, তাই গ্লাসের তরল পদার্থটুকু নিঃশেষ করব বলে বদ্ধপরিকর আমি। একবারেই শেষ করতে পারতাম, কিন্তু শূন্য গেলাস আবার ভরে ওঠার সম্ভাবনায় খাবারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে সুস্থে পানই বিধেয় মনে হল।

যেমন সিদ্ধান্ত তেমনি কাজ। নিজের ওপর ক্রমশ বেশ একটা আস্থা ফিরে আসছে। সেই আস্থার ফলে বেশ আত্মপ্রসাদও লাভ করছি। আত্মপ্রসাদের ফলে মনটা ক্রমশ উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। আর মন উৎফুল্ল হলে দেহটাও হালকা লাগবেই, নিজের প্রতি নিজে শ্রদ্ধায় ক্রমশ অভিভূত আমি। ভিতরটা বিস্ময়ে আনন্দে কবিতার মত গলে গলে পড়তে চাইছে। কত কালের এক জমাট বাঁধা নিষ্ক্রিয়তা থেকে যেন মুক্তিলাভ করেছি। বাল্মীকির প্রথম মোহ-ভাঙা বিস্ময় যেন। কে আমি ? কিসের বন্ধনে এমন নিদারুণ আচ্ছন্নতার গহ্বরে বাস করছিলাম এতকাল ? আমি কি দেবদূত—বিধাতার রোষে ভয় মোহ চিন্তাজ্বরের তিমির অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম ?

সামনে যাঁরা বসে আছেন, আমার এই সদ্য-লব্ধ উদার দৃষ্টির ফলে তাঁদেরও হালকা প্রজাপতির মতই মনে হল। বিবেক যেন কানে কানে গানের মত চেতনার গুঞ্জন শোনাতে লাগল,—ছোট ছোট আনন্দের মুহূর্তগুলিই সব, জীবনের কলসে এইটুকুই শুধু ভরে নেবার মত। ওঁরা সেই আনন্দের দল, আনন্দের জোয়ারে গা ভাসিয়েছেন। আমিই শুধু মূর্খের মত এতকাল বঞ্চিতের দলে গিয়ে ভিড়েছিলাম। কিন্তু কোনো খেদ নেই—মুক্তি এমনই দুর্লভ বস্তু, একবার পেলে জন্ম জন্ম না পাওয়ার খেদ ঘোচে।

আমরা যেন সুরসভার শোকতাপবিরহিত সুরজন। যেন কেন, মানুষেরই অন্তরতম নিভৃতে দেবতার বাস—এ তো সকল ধর্মেরই সার কথা। গেলাস আর ডিশের ওপর কাঁটা-চামচের টুনটান শব্দ সুরসভার অপ্সরীদের নূপুর ধ্বনির মতই মিষ্টি লাগছে। রকিং চেয়ারে তনু-ভার সমর্পণ করে গ্লাস হাতে বসে আছেন ক্লারা দেবী...আমারই চোখের দৃষ্টি ঠিক ছিল না আগে, নিরঞ্জন বোস ঠিকই বলেছিলেন, ঠিকই দেখেছিলেন। ওই তনু-সত্তার ঘিরে শাড়ির শিথিল আবরণ লজ্জার আভাসের মতই মিষ্টি।

ঘোষালের গাড়ি বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিয়ে গেল। স-ঘোষাল বন্ধুরা মুক্ত আনন্দে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

আমি কড়া নাড়লাম।

স্ত্রী দরজা খুলে দিলেন।

কিন্তু আমি বিহ্বল। মানুষের দৃষ্টি জাগ্রত হলে সবই কি এমন সুন্দর লাগে চোখে ? অন্তরের দাক্ষিণ্যই কি তা হলে সকল সৌন্দর্যের মূল উৎস ! এ কি আমারই স্ত্রী...যাঁর সঙ্গে বছরের পর বছর ঘর করছি !

দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন—মনে হল, শান্ত প্রতীক্ষার অবসানে নিখিল-বিশ্বের রুদ্ধ দরজাটি খুলে অনন্তকালের জীবন-সহচরী সামনে এসে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি দেখছ ? নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই সুধা বর্ষণ করল।

তিনি জবাব দিলেন না।

না-ই দিন। এই মৌন নীরবতার সবটুকুই মৌন নয়। বহু আশায় বহু প্রত্যাশায় বহু অনুযোগে বহু অভিমানে ভরপুর।

কিন্তু মুক্তির আনন্দে দেহ যে-রকম হালকা লাগছে, বসতে পেলে আরও ভালো লাগবে। আমি শোবার ঘরের দিকে এগোলাম। স্ত্রী দরজা বন্ধ করে অনুসরণ করলেন।...এই অনুবর্তিনী রূপেই নারীর অক্ষয় মাধুর্য।

প্রথম ঘরেই পর-পর তিনটি ছেলে মেয়ে শয়ান। শোক-তাপদুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বমুখী মনের ওপর যেন মর্ত্যের ছায়া পড়-পড় হল একটু। পাশ কাটিয়ে পাশের ঘরে অর্থাৎ নিজেদের শয়ন ঘরের শয্যায় এসে বসলাম।

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রেঃ...

একটু বাদেই কান্তা এলেন। আমি তাকালাম তাঁর দিকে, তিনি আমার দিকে। কিন্তু আমার দর্শনের সঙ্গে তাঁর দর্শনটা ঠিক মিলছে না। মেলার কথাও নয়। মিষ্টি করে বললাম, দাঁড়িয়ে কেন, বসো—

ঊর্ধ্বমুখী মনটি আরও প্রসারিত করার বাসনায় শয্যায় দেহভার বিছিয়ে দিলাম।

রাত কত বলতে পারি নে। একটা গুমরনো কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে চমকে উঠে বসলাম। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। যে দৃশ্য দেখলাম দেহের সমস্ত রক্ত জল।

স্ত্রী শয্যায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে গুমরে গুমরে কাঁদছেন ! মর্মান্তিক কান্না।

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাশের ঘরে এসে আলো জ্বাললাম। বিকেলে মেজ ছেলেটার বেশ জ্বর দেখে বেরিয়েছিলাম, প্রথম চমকে তার কথাই মনে হয়েছে প্রথম। সত্রাসে তার গায়ে পিঠে হাত দিয়ে দেখি গা বেশ ঠাণ্ডা, দিব্বি ঘুমুচ্ছে। বিমূঢ়ের মত অন্য ছেলে-মেয়ে দুটোরও গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে নিয়ে আলো নিভিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলাম।

আমার সাড়া পেয়ে স্ত্রী আরও সরব কান্নায় ভেঙে ভেঙে পড়ছেন। আরও ফুলে ফুলে উঠছেন। আচমকা ধাক্কায় ঘুম-ভাঙা মগজে কিছুই ঢুকছে না। অজ্ঞাত আশাঙ্কায় ভিতরে থরথর কাঁপুনি একটা। বিভ্রান্ত ব্যাকুল উদ্বেগে স্ত্রীর পিঠে হাত রেখে সবে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, কি হয়েছে, কি অঘটন ঘটল—টেলিগ্রাম এসেছে কিনা—

কিন্তু তার আগে আলুথালু মূর্তিতে বিদুৎস্পৃষ্টের মত ছিটকে দূরে সরে গেলেন তিনি।

তীব্র তীক্ষ্ণ কঠিন কণ্ঠে যেন এক বালতি তরল আগুনের ঝাপটা মারলেন আমার

চোখেমুখে।—ছুঁয়ো না তুমি, খবরদার। ছুঁয়ো না তুমি আমাকে! লজ্জা করে না তোমার, অপদার্থ বিশ্বাসঘাতক বে-আক্কেল চরিত্রহীন বেইমান মাতাল!

বিছানায় ক্রমাগত মাথা খুঁড়তে লাগলেন তিনি। কান্না বাড়তে লাগল। কণ্ঠস্বর চড়তে লাগল। স্বামী-সম্ভাষণ নিকৃষ্টতর হতে থাকল।

সেই ক্ষুব্ধ উত্তেজনার ধাক্কায় আর সম্ভাষণের চাবুকে মস্তিষ্কে ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল আমার। ব্যাপারটা বোধগম্য হল। নিদারুণ সংকট, যে-ভাবে হাত পা ছুঁড়েছেন, হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টায় এগোনোটা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। অথচ হিস্টিরিয়া রোগীর মত বিলাপের আর সেই সঙ্গে কটূক্তির মাত্রা যেরকম বাড়ছে, আশে-পাশের বাড়ি থেকে দরজা জানলা খুলে উঁকিঝুঁকি শুরু হল বলে। কিছু একটা অঘটনের আশঙ্কায় লোক দৌড়ে আসাও বিচিত্র নয়।

বিলাপ প্রলাপ এবং আগ্নেয় আক্ষেপ ক্রমশ হৃদয়-বিদারী আর্তনাদে পরিণত হতে চলেছে।

আর কোনো উপায় না দেখে প্রাণের দায়ে হঠাৎই একটা বালিশের কিছুটা অংশ রোরুদ্যমানা স্ত্রীর মুখ-গহ্বরে গুঁজে দিয়ে আর ওই বালিশের দ্বারাই তাঁর বাহুর-আক্ষেপণ বন্ধ করে এবং আত্মরক্ষা করে সকাতর অনুনয়ে ভেঙে পড়তে লাগলাম আমিও। অনেক দিব্যি কাটলাম, অনেক হাতে পায়ে ধরলাম (হাত দিয়ে নয়, কারণ প্রাণের দায়ে দুই হাতে তাঁর মুখে বালিশ চেপে আছি), অনেক মর্মবিদারী অভিসম্পাত করলাম নিজেকে, নিশ্চিত কথা দিলাম উনি আদেশ করলেই সকালে উঠে যে-দিকে দুচোখ যায় চলে যাব, নয়তো সকালে উঠেই আত্মহত্যা করে ফেলব—আত্মহত্যাই উপযুক্ত শাস্তি আমার—

অনুনয়ের দরুন হোক, কথা দেওয়ার ফলে হোক, আত্মহত্যার সংকল্প শুনে হোক অথবা বালিশের মাহাত্ম্যেই হোক, স্ত্রী খুব বেশিক্ষণ যুঝলেন না আর। বালিশের ওধারে ক্রমশই তিনি শিথিল হয়ে আসছেন টের পেলাম। কান্না থামল, আক্ষেপণ প্রশমিত হল, উদ্‌ভ্রান্ত কাঁপুনিও বন্ধ—চোখের ইশারায় বালিশ সরাতে ইঙ্গিত করছেন মনে হল।

॥ ৪ ॥

পরদিন ঘোষালের জন্মদিনে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। পরদিন কেন, পর পর অনেক দিনই বাড়ি থেকে বেরুই নি। সেই রাতে স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছিলাম আত্মহত্যা করব। কিন্তু ও কাজটা উনিই করে বসতে পারেন, মুখের দিকে চেয়ে সে-রকম একটা ত্রাস আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করেছে সারাক্ষণ।

জম-জমাট উৎসবের সেই গল্প শুনে অনেকগুলো দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল অবশ্য।

দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত খেয়ে খেয়ে দু দিনের মধ্যে কারও নাকি শুধু জল ছাড়া মুখে আর কিছু রোচেনি। তার পর সমস্ত দিন গান-বাজনা, বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, আর তেমনিই সব মেয়েদের আনাগোনা হাসি ঠাট্টা হৈ-হুল্লোড়। নিরঞ্জন বোস বিহ্বল আবেশে বলেছেন, নহ মাতা নহ কন্যা গোছের এমন সুন্দর সুন্দর মেয়েও

আছে কলকাতা শহরে...কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন তাই যেন সমস্যা। তার পর বক্রোক্তি করেছেন, লেখকের কপাল—অত আনন্দ সইবে কেন, মিস্ তো করবেনই!

সব শোনার পর লেখকের কপালটা নিজের কাছেই করুণার বস্তু। তার ওপর নিরঞ্জন বোস আমাকে বিঁধবার জন্যেই যেন সম্পাদিকা মিলি বোসের প্রসঙ্গ তুললেন।—মশাই, যদি দেখতেন একবার, উঃ!

উচ্ছ্বাসের আধিক্যে মর্মান্তিক কাতরোক্তি করে উঠলেন একটা। দু চোখ বুজে এল।—ঘোষালদার পছন্দ বটে! দেখে আমি পায়ের ধুলো না নিয়ে পারি নি—

মিলি বোসের? আমি হতভম্ব!

ধেৎ মশাই! ঘোষালদার—।

তোড়ের মুখে বাধা পেয়ে বোস বিরক্ত। কিন্তু যে পূর্ণতা নিয়ে এসেছেন, বিরক্তি তরল হতে কতক্ষণ আর। বললেন, এসে যখন দাঁড়াল মনে হল—পূর্ণিমার আস্ত চাঁদখানা হঠাৎ যেন চোখের সামনে খলখলিয়ে উঠল। তেমনি জ্যোৎস্না-ধোয়া রঙ মশাই গায়ের, মুখখানা একেবারে তিলে তিলে তিলোত্তমা—হাসলে যে-কটা ঝকঝকে দাঁত দেখা যায়, আঃ।

আনন্দে গোটা মুখখানা আবারও কুঁচকে গেল বোসের। আনন্দ-বেদনায় অস্থির। সিক্তবসনা। বললেন, মুখ যত না হাসে তার থেকে চোখ হাসে অনেক বেশি, যেদিকে তাকায়, যেন কেটে কেটে বসে যায়। ওই চেহারার বর্ণনা করতে হলে আবার মশাই বঙ্কিমচন্দ্রকে এসে জন্মাতে হয়, আর কারও কম্ম নয়।

নিজের অজ্ঞাতে আবারও ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ল একটা।

নিরঞ্জন বোস নাকি পাকাপাকিভাবেই তাঁর ভাবী ছবির নায়িকা পেয়ে গেছেন। দুনিযার আর কোনো কিছুতেই তিনি পরোয়া করেন না।—ও রকম একজনকে পেলে মশাই আপনাদের গল্পের পরোয়া করি নে, অ্যাকটিংয়ের পরোয়া করি নে, একবার এসে দাঁড়ালেই দর্শকের হাড়-পাঁজর মড়মড়িয়ে উঠবে। ঘোষালদাকে বলেছি বিয়ের পর ছেড়ে দিতে হবে। উনি রাজী হয়েছেন—

ভাবী ছবিতে নায়িকার মত নায়িকা-লাভের রোমাঞ্চে নিরঞ্জন বোস বিভোর। কিন্তু আমি নিরঞ্জন বোসের পূর্বনির্বাচনে ভুলি নি এরই মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি না সেদিন ক্লারা দেবীকে নায়িকা ঠিক করলেন?

বে-খাপ্পা রকমের কিছু বলা হয়ে গেল বোধ হয়। তাঁর চোখ পাকানো দেখে আমি সঙ্কুচিত। তিনি বললেন, অনেক সময় ভাবি আপনার ওপর রাগ করব না, কিন্তু এমন এক-একটা কথা বলেন যে পিত্তি জ্বলে যায়। ক্লারা দেবী তো টাইপ-নায়িকা, টাইপ-রোলে তাঁকে নামানো যায়, তা বলে সব ছবির সব নায়িকার রোলে মেমসাহেব নামিয়ে দেব?

চুপ করে থেকে নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করে নিলাম।

মিলি বোসের পর্ব শেষ করে নিরঞ্জন বোস একটা দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করলেন। এই দশ-বারো দিনে আরও কিছু গোলযোগ ঘটেছে। হারাণ বিশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত তাড়াতে

পেরেছেন সদানন্দ ঘোষাল, ব্যবসাটাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছিল নাকি—

আপনি তো সেদিন মশাই খুব ভালো খুব ভালো করে এলেন, কিন্তু কত বড় পাজী জানেন লোকটা! দশ পাতার এক চিঠি লিখেছে ঘোষালদার বাবাকে—ব্যবসাটা কি ভাবে ডুবছে সেই ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ, মাসে নাকি পনের-বিশ হাজার করে লোকসান চলেছে। ব্যবসা করতে বসলে কখনও লোকসান কখনও লাভ হবে এই বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত নেই এমন বুদ্ধু। সে তো যা হয় হল, আর কি করেছে জানেন?

দু চোখ কপালে তুলে বোস তাকালেন আমার দিকে—ঘোষালদার স্বভাব চরিত্র নিয়ে পর্যন্ত যা নয় তাই লিখেছে, ক্লারা দেবীর সঙ্গে ওঁর নাকি ইয়ে চলেছে, খুব খারাপ রকমের ইয়ে—ব্যাটা আমাদের সম্বন্ধে পর্যন্ত যাচ্ছেতাই লিখেছে।

পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সম্বন্ধে?

আপনি কি এমন যে আপনার কথা লিখবে? তিক্তমুখে বোস বলে গেলেন, আমাদের কথাই লিখেছে, আর ঘোষালদার কথা, আর ক্লারা দেবীর কথা, আর নিজের কথা—। লোকসানের ফিরিস্তি শুনে বুড়ো ঘাবড়ায় নি, ওই ক্লারা দেবীর সঙ্গে ইয়ের কথা শুনেই ক্ষেপে আগুন। পারলে এক্ষুনি তিরিশ-চল্লিশ লাখওয়ালার মেজ মেয়েটার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে দেন। বলতে গেলে ঘোষালদাকে এক রকম আলটিমেটামই দিয়েছেন—তাঁর কথা মত বিয়ে করতে হবে।

সদানন্দবাবু বিয়ে করবেন?

পাগল নাকি! মিলি বোসকে ছেড়ে? ভাবলে আমারই বলে বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে ওঠে—বিয়ে ঘোষালদা আর কোথাও করবেন না, কিন্তু তাঁর মেজাজের ওপর একেবারে স্টিম রোলার চালিয়েছে বুড়ো।

মনে হল স্টিম রোলারটা তাঁর বুকের ওপর দিয়েই চালানো হয়েছে।

অতঃপর সঙ্গোপনে নিরঞ্জন বোস যে ভাবনার ব্যাপারটা ব্যক্ত করে ফেললেন, মনে হয়, এতক্ষণের এত সব সরস আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেও তাঁর মুখে একটা বিরস ছায়ার মত দেখা যাচ্ছিল এই কারণেই। উনি এরই মধ্যে একদিন নাকি মিলি বোসের সাপ্তাহিক কাগজের অফিসে গিয়েছিলেন। ঘোষালদার জন্মদিনে ওঁকে দেখার পর এক বার না গিয়ে পারেন নি। ইচ্ছে ছিল, ছবিতে কোন ধরনের নায়িকার ভূমিকায় ওঁর স্বভাবগত স্ফুরণ সম্ভব, আলাপ-আলোচনায় সেইটাই আবিষ্কার করবেন।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন, ঘোষালদার বুড়ো বাপ—ব্যরিস্টার ঘোষালের গাড়িটা দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে বুড়ো দিব্ব খোশ মেজাজে এসে গাড়িতে উঠলেন। মিলি বোস সবিনয়ে আর সসম্ভ্রমে সঙ্গে এসে তাঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেলেন। নিরঞ্জন বোসকে দুজনেই তাঁরা দেখে ফেলেছেন, দেখে মুখ গম্ভীর করেছেন।

এরপর মিলি বোস তাঁকে ঘরে নিয়ে বসিয়েছেন বটে, দুই-একটা কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু ঘোষালদার জন্মদিনে মহিলাটিকে যেমন দেখেছিলেন নিরঞ্জন বোস, আদৌ সে-রকম নয়। নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে মাঝবয়সী কড়া হেড্‌মিস্ট্রেস যেমন মুখ করে কথা বলেন, সেই রকম। সেই রকম করে কথাবার্তা বলেছেন। একবারও চোখ দুটো হেসে

ওঠে নি, একবারও সেই বুক-মোচড়ানো দাঁত দেখা যায় নি। উল্টে জেরার পর জেরা—কি করা হয়, সদানন্দবাবুর সঙ্গে কত দিনের আলাপ, হঠাৎ আজ কাগজের অফিসে এসে আলাপের বাসনা হল কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি—।

ছবি বা ছবির নায়িকা-প্রসঙ্গে আলোচনা? তাই কখনও আর হয়—সারাক্ষণ নিরঞ্জন বোস অস্বস্তিতে বোবা একেবারে। পালাতে পারলে বাঁচেন। ওই সময়ে গিয়ে পড়ে যেন মস্ত অপরাধ করে বসেছেন কিছু। উঠে আসার আগে মিলি বোস নাকি গম্ভীর মুখে যা বলে দিয়েছেন তাকে বলা বলে না, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভদ্রভাবে শাসানোই বলা চলে। বলেছেন, বুড়ো ব্যারিস্টার ঘোষাল ওই দপ্তরে এসেছিলেন সেটা কারও না জানাই বাঞ্ছনীয়।—কারও বলতে ঘোষালদা ছাড়া আর কে মশাই? জানলে নাকি সকলেরই একটু মুশকিল আছে, সকলের সঙ্গেই তা হলে বন্ধুত্ব ঘুচিয়ে ছাড়বেন ঘোষালদার বাবা ব্যারিস্টার ঘোষাল!

এখন দুর্ভাবনায় অস্থির নিরঞ্জন বোস। তাঁর বদ্ধ ধারণা, নিজের ব্যবস্থা মত ছেলের বিয়ে দেবার জন্য বুড়ো মিলি বোসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন কিছু।

কিন্তু মিলি বোস তাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে যাবেন কেন? আমি অবাক।

বোস জবাব দিলেন, আর একটু বুদ্ধি খরচ করে ভেবে দেখুন কেন যাবেন। ব্যারিস্টার ঘোষাল ওঁর কাগজের নামে বিশ-তিরিশ হাজার ঢাললে ওঁর সরে দাঁড়ানো অসম্ভব নাকি? কাগজটাকে তো ঘোষালদার থেকে কম ভালোবাসেন না মিলি বোস— উনি সরে দাঁড়ালে ওই টাকার আন্ডিলকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে ঘোষালদার?

দুর্ভাবনার কারণ বোধগম্য হল। এখন নিরঞ্জন বোসের সমস্যা, উনি কি করেন। সদানন্দবাবুকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না। ঘোষালদা এই নিয়ে বাপের সঙ্গে বা মিলি বোসের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেলে সবই জানাজানি হয়ে যাবে। জানাজানি হলে বুড়োর কোপে পড়ে হয়তো ঘোষাল-নিবাসে যাতায়াতই বন্ধ হয়ে যাবে তাঁদের — হয়তো বা অফিসেও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেবেন ঝানু বুড়ো। মিলি বোস তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শাসিয়েই দিয়েছেন।

অন্যদিকে, চুপ করে থাকার ফলে সত্যিই যদি মিলি বোস হাতছাড়া হয়ে যান, তাই বা সহ্য করা যায় কেমন করে। ঘোষালদার মেজাজ বিগড়ে যাবে, চাই কি সব ছেড়েছুড়ে বিবাগীও হতে পারেন তিনি। এমন হৃদয়-বিদারক ব্যাপার নিরঞ্জন বোস আজ অবধি কম দেখেন নি। আর বাংলা দেশের শিল্পের অমন যুগান্তকারী নায়িকা-লাভের সম্ভাবনাও চিরকালের মতই নির্মূল তা হলে। অন্যের সঙ্গে মিলি বোসের বিয়ে হলে সে কি আর নিরঞ্জন বোসের হাতে ছেড়ে দেবে তাঁকে— তখন আর পাঁচ ভূতের খপ্পরে গিয়ে পড়বে না মেয়েটা!

দুরূহ সমস্যা। তিন ঘণ্টায় পরপর তিন পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করেও দুজনের কারও মাথায়ই সমাধানের ক্ষীণতম আলোকরশ্মির উদয়-সম্ভাবনা দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে সদানন্দবাবুর কানে আপাতত কিছু না তোলাই

যুক্তিযুক্ত মনে হল। আপাতত শুধু পর্যবেক্ষণ করে যাওয়াই সুবিবেচনার কাজ।

কিন্তু সেই নীরব পর্যবেক্ষণ-পর্বে কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ এক গোলযোগ উপস্থিত।

সাপ্তাহিক অফিস থেকে সম্পাদিকা মিলি বোসের স্বাক্ষরিত একটা চিঠি পেলাম। আমি পেলাম বলা ঠিক হবে না, জয়া দেবী পেলেন। নির্দেশ, এবারের প্রেরিত গল্প-প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা দরকার, অতএব সাপ্তাহিকের দপ্তরে এসে সম্পাদিকার সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

অনেক ভেবে চিন্তে নিজেই যাব স্থির করলাম। জয়া দেবীর মুখপাত্র হয়ে যেতে বাধা কি। ঘরের মেয়েছেলেরা সব সময় এস বললেই হুট করে গিয়ে হাজির হতে পারে নাকি।

নিরঞ্জন বোসের বর্ণনার পরে সদানন্দ ঘোষালের জন্মদিনে মিলি বোসকে একবার চোখের দেখা দেখবার সুযোগ হারিয়ে একটুখানি সংগোপন ক্ষোভ মনের কোণে পুঞ্জীভূত হয়েই ছিল বোধ হয়। কারণ, প্রথম উতলা ভাবটা কাটবার পর যাব স্থির করে ফেলতেই মনটা বেশি খুশি হয়ে উঠল। আর সেই খুশির তাড়নায় দুর্গা-গণেশ স্মরণ করে পর দিনই বেরিয়ে পড়লাম।

সম্পাদকের দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার অভ্যাস আছে। সম্পাদিকার দপ্তরে এই প্রথম। এখানকার আদব-কায়দাও অন্যরকম একটু। আগে বেয়ারার হাতে স্লিপ দিতে হবে, সম্পাদিকার অনুমোদন এলে তবে তাঁর ঘরে প্রবেশ সম্ভব।

স্লিপের বদলে জয়া দেবীর নামের চিঠিখানাই বিরক্ত-বদন প্রহরীকে দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, স্বয়ং তাদের কর্ত্রীই ডেকে পাঠিয়েছেন।

বেয়ারা চিঠিখানা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল একবার, তার পর চিঠিসহ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল। খানিক বাদে শূন্য হাতে ফিরে এসে পরোয়ানা দিলে, যাইয়ে—।

দ্বিধান্বিত প্রবেশ।

সম্পাদিকা মিলি বোস মস্ত এক সম্পাদকীয় টেবিলের ওধারে বসে গভীর মনোযোগে কি একটা লেখা পড়ছেন। একটুও মুখ না তুলে বললেন, বসুন—

কণ্ঠস্বর গম্ভীর হলেও মিষ্টিই বটে। পাছে তন্ময়তায় ছেদ পড়ে সেই সংকোচে সন্তর্পণে চেয়ার টেনে বসলাম। বোস খুব অত্যুক্তি করেন নি, এই দিনে-দুপুরে ঠিক একেবারে জ্যোৎস্না-ধোয়া পূর্ণিমার চাঁদের মত না লাগলেও বার বার (সংগোপনে এবং ভয়ে ভয়ে) দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চোখভরা হাসি আর বুক-মোচড়ানো দাঁত দেখতে পাব কি নিরঞ্জন বোসের দ্বিতীয় সাক্ষাতের মত মাঝবয়সী কড়া হেড্‌মিস্ট্রেসের মুখ দেখব— সেই ভাবনায় ভিতরে ভিতরে একটু বিচলিত আমি।

জয়া দেবীর নামের চিঠিখানা সামনে পড়েছিল। পাণ্ডুলিপি সরিয়ে রেখে মিলি বোস সেটা তুলে নিয়ে একবার নাড়াচাড়া করে সরাসরি মুখের দিকে তাকালেন। হাসিভরা

চোখ নয়, বুক-মোচড়ানো ঝকঝকে দাঁত নয়, কড়া হেড্‌মিস্ট্রেসের মুখও নয়। সব মিলিয়ে এক ধরনের। সেই দৃষ্টি শুভ কি অশুভ বলতে পারি নে, কিন্তু অনেকটা ভিতরে গিয়ে যে বেঁধে সেটা ঠিক।

আপনি জয়া দেবী?

শুনেই হক্‌চকিয়ে গেলাম এমন যে নিজের কান দুটোর ওপরেও আর আস্থা নেই।—আজ্ঞে?

আপনার নাম জয়া দেবী? আরও স্পষ্ট ও গম্ভীর প্রশ্ন।

আজ্ঞে না, আমার স্ত্রীর নাম—

এই যাঃ। সব থেকে গোপনীয় যা, ঘাবড়ে যেতে সেটাই ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। শুকনো হাসি চাপা দিয়ে ভুলটা তাড়াতাড়ি শুধরে নিতে চেষ্টা করলাম, মানে—আমার স্ত্রীরও ওই নাম আর কি, এক নাম তো কত জনেরই হয়....

চেয়ে আছেন চুপচাপ। মনে হল আমার মুখখানা যেন ফালা ফালা করে দেখছেন। রমণী-নয়ন রমণীয় লাগার কথা। তার বদলে একরাশ অস্বস্তি, ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠছি।

ধূসর বসন্ত গল্পটা কার লেখা?

জয়া দেবীর—

আবার নিরীক্ষণ। যেন পুলিস বিভাগে আমাকে চাকরিতে নিয়োগ করবেন উনি, সেই রকমের চুলচেরা দেখা।—আমি চিঠিতে আসতে অনুরোধ করেছিলাম জয়া দেবীকে, আপনি এলেন কেন ?

তাই তো ...... ঘরে। ঢুকে প্রথমেই ব্যক্ত করা উচিত ছিল জয়া দেবীর বদলে আমি কেন এলাম। মনে মনে নিজের মুণ্ডুপাত করে নেব সেই অবকাশও নেই, জবাবের প্রতীক্ষায় উনি আপাতত কড়া হেডমিস্ট্রেসের মতই চেয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি জবাবদিহির চেষ্টায় উল্টো-পাল্টা কিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে ছিল কিনা মনে করতে পারছি না। কারণ আমার কৈফিয়ত শুনতে শুনতে মিলি বোসের মুখে হাসির আভাসের মত দেখেছিলাম মনে পড়ে। আমি বলতে চেয়েছিলাম, জয়া দেবী ঘোর পর্দানশিন এবং রক্ষণশীলা মহিলা, কক্ষনো কোথাও যান না, একেবারে কোথাও না। ঘরের বারই হন না বলতে গেলে—যখন যেখানে যাওয়া দরকার আমাকেই পাঠান।

সম্পাদিকার মুখের গাম্ভীর্য একটু তরলই হল। হাসির আভাস আরও একটু স্পষ্ট। সবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছি, কিন্তু ফেলা হল না। উনি বললেন, কিন্তু লেখা পড়ে তো ওঁকে একটুও পর্দানশিন মনে হয় না, বরং যে সব বাস্তব গল্প লেখেন—সাত জায়গা চষে বেড়ান বলেই তো মনে হয়—তা ছাড়া রক্ষণশীলা হলে ধূসর বসন্তের মত প্রোগ্রেসিভ লেখা উনি লেখেন কি করে?

মরীয়া হয়েই আর এক দফা কি গড়গড় করে বলে যেতে হল আমাকে। খুব সম্ভব বলেছিলাম, ওই সব বাস্তব গল্পের উপকরণ তিনি আমাকে দিয়েই সংগ্রহ করে থাকেন, যত্রতত্র পাঠান আমাকে মালমশলা যোগাবার জন্যে—ধাপার মাঠ থেকে গঙ্গাসাগর

পর্যন্ত—আর রক্ষণশীলা মানে উনি আত্মরক্ষণশীলা— চেহারাপত্রও ইয়ে মানে ভা-ভালর দিকেই কিনা...তাই আর কি—নইলে প্রোগ্রেসিভ লেখাই তো লেখেন উনি, মনে মনে ভয়ানক প্রোগ্রেসিভ—যাকে বলে একেবারে আলট্রামর্ডান।

আর হাসির আভাস নয়, একেবারে স্পষ্ট হাসি আর মিষ্টি হাসি। এবারে নিরঞ্জন বোসের বর্ণনার সেই বুক-মোচড়ানো দাঁতও দেখা গেল একটু। আমার বুক মোচড়াল না বটে তবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

মিলি বোস বেশ মিষ্টি করেই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নামটি কি?

বললাম। স্পষ্ট করে এবং সবিনয়ে।

শুনেই একটু উৎফুল্ল মনে হল তাঁকে।—আপনিও তো লেখেন, আপনার নাম তো এখেনে-সেখেনে দেখি মাঝে মাঝে মধ্যে? নাকি আর কেউ?

নিজের লজ্জানম্র হাসির সম্বন্ধে নিজেরই কোনো সংশয় ছিল না। জবাব দিলাম, না আমিই...

সম্পাদকীয় গাম্ভীর্যে এবং আন্তরিকতায় মিলি বোসই তখন আসল সমস্যাটার সমাধান কবে দিলেন। বললেন, তা হলে আর কি, জয়া দেবীর সব গল্পের নাড়ীনক্ষত্র তো আপনার জানাই, ধূসর বসন্ত গল্পটা আপনিই তো একটু অদল বদল করে দিয়ে যেতে পারেন? তিনি আপত্তি করবেন?

সানন্দে মাথা নাড়লাম।—আমরা ওপর তাঁর অপার বিশ্বাস, কি করতে হবে বলুন?

এক পাঁজা পাণ্ডুলিপির তলা থেকে গল্পটা টেনে বার করলেন তিনি। বললেন, গল্পের শেষে কোনো এক দূর ভবিষ্যতে নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলন-সম্ভাবনার আভাস দিয়ে গেছেন লেখক—

শুধরে দিলাম, লেখিকা—

বাধা পেয়ে মিলি বোস নিস্পৃহ চোখে একবার তাকালেন শুধু। তারপর বললেন, সেই সম্ভাবনার আভাস থাকবে না, সেটুকু মুছে দিতে হবে।

—তাতে আর অসুবিধে কি, দিন মুছে দিচ্ছি। পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে শেষের দিকের অনেক যত্ন-করে লেখা হৃদয়ের ব্যাপারটুকু ঘষ ঘষ করে কেটে দিয়ে তিন লাইনের মধ্যে ধূসর বসন্তের নায়কের হৃদয়টি একেবারে তপ্ত সাহারার বুকে বসিয়ে দিলাম। সন্তর্পণে নায়কের হয়ে নিজেই তারপর তপ্ত নিশ্বাস ফেললাম একটা। আজকাল মিলন তো হয়ই না, মিলনের আশ্বাসটুকুও এঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না দেখছি...

মিলি বোস সেই বর্জন এবং সংযোজনটুকু দেখে নিয়ে অনুমোদনের সুরে বললেন, ঠিক হয়েছে, সুন্দর হয়েছে—। থামলেন একটু, প্রচ্ছন্ন হাসি হাসি চোখ দুটি যেন আমার মুখের ওপর আটকে নিলেন বেশ করে। তার পর স-মন্তব্য প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন, শেষটা এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে না...কিন্তু লেখার ব্যাপারে প্রয়োজনেও তেমন অকরুণ হতে পারেন না দেখছি—লেখকের মনটি বোধ হয় নরম। আপনার কি মনে হয়?

জবাব এড়িয়ে আবারও শুধরে দিতে হল। বললাম, লেখিকার—

আমি বলছি লেখকের। মিলি বোসের মৃদু-কঠিন কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন কানের পর্দা দুটো ছিঁড়ে দিয়ে গেল।—নাম ভাঁড়িয়ে লিখতে আপনার লজ্জা করে না?

আমাকে বলছেন? গলার স্বরে ভাঙন ধরে আসছে নিজেই টের পচ্ছি।

হ্যাঁ, আপনাকে।

কিন্তু ইয়ে মানে, জয়া দেবী—

কি বলতে যাচ্ছিলাম বলতে পারি নে। তার আগেই মিলি বোস কড়া গলায় থামিয়ে দিলেন।—জয়া দেবী নয়, আপনি। এই লেখা আর এর আগে যতগুলো ছাপা হয়েছে সবই আপনার লেখা।...ভাবছি এই লেখাটার সঙ্গে ফুট-নোটে আসল লেখকের নাম আর পরিচয়টা ছেপে দেব এবার।

আমার মুখে ভাষা নেই আর। হতভম্বের মত চেয়ে আছি শুধু। ধূসর বসন্তের নায়িকার থেকেও নির্মম মনে হচ্ছে সম্পাদিকা মিলি বোসকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বোবামূর্তি দেখেই রমণী-হৃদয়ে একটুখানি করুণার উদ্রেক হল কিনা বলতে পারি নে। ঈষৎ সদয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হঠাৎ মেয়েছেলের নামে লেখা দরকার হয়ে পড়ল কেন?

বাঁচার আশায় ঢোঁক গিলে চিরাচরিত জবাবটাই আবিষ্কার করলাম।— মেয়েছেলের নাম থাকলে একটু খাতির পাওয়া যায়, মানে লেখা একটু তাড়াতাড়ি ছাপা হয় আর কি...।

মিলি বোসের মুখে আবারও একটু হাসির মত দেখলাম কি? আমার যুক্তিটা এক কথাতেই নাকচ করে দিলেন তিনি।—সেটা পুরুষদের কাগজে হতে পারে, মেয়েদের কাগজ ছেলেদের লেখারই ডিম্যান্ড বেশি, অনেক মেয়ে পর্যন্ত এখানে পুরুষের ছদ্ম নামে লেখেন। আপনি এবার থেকে নিজের নামেই লিখবেন, আর এ গল্পটার ফুট নোটে আপনার আসল নাম তো ছেপেই দিচ্ছি। এ কাগজে আপনার লেখার কদর বেড়ে যাবে দেখবেন।

প্রাণপণে যতটা সম্ভব আত্মস্থ হতে চেষ্টা করেছি, তারপর মরীয়া হয়েই বলে ফেলেছি, স্বনামে লেখা আমার দ্বারা ঠিক সম্ভব নয়, তাতে কিছু বাধা আছে আর, এই 'ধূসর বসন্ত' গল্পে আমার নাম প্রকাশ করা হলে আমি সেটা ঠিক স্বীকার করে নিতে পারব না...মানে প্রতিবাদই করতে হবে আমাকে।

করুন প্রতিবাদ, মিলি বোস নিঃশঙ্ক বিদ্রূপই করে উঠলেন প্রায়, সে-ক্ষেত্রে কত টাকার লোভে আপনি নিজের লেখা এভাবে বিক্রি করেছেন, কার কাছে বিক্রি করেছেন, যাঁর কাছে বিক্রি করেছেন তাঁর উদ্দেশ্য কি—এ সবই একে একে তা হলে আমাদের কাগজে প্রকাশিত হবে, সব কিছুর প্রমাণ আমার হাতেই আছে। নামের থেকেও পাঠক-পাঠিকার সেটা আরও বেশি পছন্দ হবে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, নির্বাক বিমূঢ় আমি। কে করল এই বিশ্বাসঘাতকতার কাজ। সব কিছুর প্রমাণ কে এঁর হাতে তুলে দিল! সদানন্দ ঘোষাল বলবেন না, নিরঞ্জন বোস বা বিনয় তালুকদারও না। তা হলে?

তা হলে হারাণ বিশ্বাস।

মনে হতেই চমকে উঠলাম আর এক দফা। হারাণ বিশ্বাস ছাড়া এমন অবিশ্বাসের কাজ আর কেউ করবে না। সদানন্দবাবুর বুড়ো বাপকে দশ পাতা জোড়া চিঠি লিখেও জ্বালা জুড়োয় নি তাঁর—এখানেও অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন নিশ্চয়। রাগে দুঃখে আর নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল। কি কুক্ষণে সেদিন বাসে দেখা সেই অবিশ্বাসী লোকটার সঙ্গে, আর কি কুক্ষণেই বা রসিয়ে বলতে বসেছিলাম সব।

সদানন্দ ঘোষালকে জীবনে আর মুখ দেখানো হবে না বোধ হয়। নিরঞ্জন বোসের রক্তচক্ষু দুটো আর বিনয় তালুকদারের বোকা-বোকা চাউনিটা বার বার যেন চোখের সামনে নেচে বেড়াতে লাগল।

মিলি বোস চুপচাপ নিরীক্ষণ করছিলেন, গাম্ভীর্য সত্ত্বেও অন্তরতুষ্টিতে ডগমগ করছিল মুখখানা। জিজ্ঞাসা করলেন, এভাবে নিজের লেখা বিকোচ্ছেন কেন?

মোলায়েম কণ্ঠস্বরটুকু মরুভূমির বুকে ওয়েসিসের মত। সকাতরে বলে উঠলাম, বিশ্বাস করুন, টাকার লোভে একটুও নয়—এমন একটা অবস্থায় পড়ে গেলাম যে রাজী না হয়ে উপায় ছিল না, মানে রাজী না হলে প্রাণান্ত অবস্থা হত আমার—কিন্তু সত্যিই কি আপনি নাম প্রকাশ করে দেবেন?

যদি দিই? সদানন্দবাবুব উদ্দেশ্য জেনেও আপনি এভাবে লেখা বিকোচ্ছিলেন, তার মানে প্রকারান্তরে আপনি আমারই ক্ষতি করছিলেন।

ক্ষতি! ক্ষতি কেন? বিস্ময়ে বিস্ফারিত আমি।— আমি তো শুনেছি আপনি তাঁকে খুব ভালো..মানে খুব ভালো চোখে দেখেন। আরও একটু ভালো চোখে যাতে দেখেন সেই জন্যে...কিন্তু আপনি যদি এখন নামটা প্রকাশ করে দেন, আমাকে—আমাকে কলকাতা ছেড়েই পালাতে হবে বোধ হয়।

বলেন কি! সকৌতুকে দুই চোখ বড় করে ফেললেন মিলি বোস। তারপর একটু ভেবে বললেন, তা হলে আর প্রকাশ করি কি করে, আপনি যেমন লিখছিলেন তেমনি লিখে যান—।

জয়া দেবীর নামে?

তাই লিখুন।

চোখের ভাষায় যতটুকু কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব জানিয়ে উঠে এলাম। কিন্তু অস্বস্তির বোঝা বুকে থেকে নামে না। সদা আতঙ্ক, ওই মেয়েকে এতটুকু বিশ্বাস নেই, সব ফাঁস হল বলে।

যথাসময়ে জয়া দেবীর নামেই 'ধূসর বসন্ত' বেরিয়েছে। মিলি বোস কথা রেখেছেন, কোনো রহস্য উদঘাটন করেন নি। তবু আশ্বস্ত হওয়া গেল না, আজ হোক কাল হোক ছ মাস পরে হোক একদিন না একদিন বিপদ ঘটবেই। সেই একদিনের ভয়ে দিনে দিনে মুষড়ে পড়তে লাগলাম। মিলি বোস কাগজে না লিখুন, মুখেও সব বলে দিতে পারেন সদানন্দ ঘোষালকে। ভালোবাসার লোকের কাছে কোন্ মেয়ে আর মুখে

তালা আটকে বসে থাকে ? যে-কোনো দিন যে-কোনো মুহূর্তে বলে দিতে পারে। বললেই হল। লক্ষ লক্ষ লোক জানলেও পরোয়া করি নে, শুধু সদানন্দ ঘোষাল নিরঞ্জন বোস বা বিনয় তালুকদার জানলেই ভরাডুবি।

এদিকে মিলি বোসই তাগিদ দিয়ে আরও গল্প নিয়েছেন। কিন্তু এবারে আর কোনো মেয়েছেলে দিয়ে গল্প কপি করিয়ে পাঠানো প্রয়োজন মনে করি নি। যে কারণে এই সতর্কতা অবলম্বন, সে-তো পণ্ডই হয়েছে। নিজেই লিখে জয়া দেবীর নাম বসিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। যথাসময়ে সে গল্পও ছাপা হয়েছে। মিলি বোস এ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি বটে, কিন্তু করতে কতক্ষণ ! মনের তলায় তাই সর্বদাই থিতনো উৎকণ্ঠা একটা।

॥ ৫ ॥

মাস দেড় দুই গেছে আরও।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে বসে স্ত্রীর মিষ্টি বচন শুনছিলাম। আমার মত লোকের হাতে পড়ে গোটা জীবনটাই তাঁর মাটি। সাধ আহ্লাদ সুখ শান্তি বলতে আর কিছুই নেই—দিনে দিনে শুধু হাড় কালি, ইত্যাদি। নিবিষ্ট চিত্তেই শুনছিলাম। শুনতে শুনতে বেশ একটা আবেশের মত আসছিল। উনি আমার হাতে পড়েছেন কি আমি ওঁর হাতে পড়েছি, অভিনিবেশ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সেই সংশয় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল।

পরিচিত গুরুগম্ভীর মোটর-হর্ন শুনে চমকে উঠলাম।

স্ত্রীরও একটানা খেদ-গুঞ্জনে ছেদ পড়ল।

দেহের আগে আগে যেমন ছায়া চলে, মনের আগে আগে তেমনি একটা অজ্ঞাত শঙ্কার অস্বস্তি আমার। অভ্যর্থনায় এগিয়ে এসে আরও অবাক। সদানন্দ ঘোষালের গাড়ি নিয়ে এসেছেন একা নিরঞ্জন বোস। তাঁর কালো মুখখানা ভয়াবহ রকমের গম্ভীর।

এক্ষুনি যেতে হবে, যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থাতেই যেতে হবে, ঘোষালদার জোর তলব।

কি ব্যাপার ? আধমরা অবস্থা আমার।

ব্যাপার পরে শুনবেন, বুঝতেই তো পারছেন গুরুতর কিছু, শিগগীর আসুন !

যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় আমাকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ সত্ত্বেও লুঙ্গি পরা আদুর গায়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে পারেন না। বলেই অসহিষ্ণু তাড়া।

জামাকাপড় বদলাতে আসতে স্ত্রী মুখের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, খারাপ নাকি কিছু ?

কেউ যেন গ্রেপ্তার পরোয়ানা নিয়ে এসেছে এমনি অবস্থা আমার। গলা দিয়ে স্বর বেরুল না, মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। গাড়িতে বসে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে আর অত্যন্ত বিনীত গলায় স্ত্রীর প্রশ্নটাই নির্গত করলাম কোনোপ্রকারে, কি হল, খারাপ খবর নাকি কিছু ?

গম্ভীর বিরক্তিসহকারে নিরঞ্জন বোস একটা সিগারেট ধরাবার উদ্যোগ করে জবাব দিলেন, এক্ষুনি তো জানতে পাবেন কি হল, চুপচাপ বসে ভাবতে দিন একটু।

সিগারেট ধরিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন। আমার আর সন্দেহ থাকল না, মিলি বোস লেখার ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়েছেন, আর সেই কৈফিয়ত নেবার জন্যেই ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। আম প্রাণের দায়ে ভাবতে চললাম কি জবাব দেব, কি কৈফিয়ত দেব। আমার কি দোষ, কোথা থেকে কেমন করে জেনেছেন কে জানে, আমি তো নিজে থেকে সেধে বলতে যাই নি! ধরা পড়ার পর স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি এই যা। দোষটা ফিরে তাঁদের ঘাড়েই চাপানো যায় কিনা তাও ভেবেছি। হারাণদার কথা চলবে না, ঘুরে ফিরে অপরাধটা তা হলে নিজের ঘাড়েই এসে পড়ে। তার থেকে ঘোষালদারই কোনো আলগা কথায় মিলি বোসের সন্দেহ হয়েছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাব্য আলগা কথার নমুনাটা আবিষ্কার করে উঠতে পারছিলাম না।

হঠাৎ খেয়াল হল গাড়িটা ঘোষালের বাড়ির দিকে যাচ্ছে না। সোজা চৌরঙ্গীর পথে চলেছে। নিজের অগোচরেই আবারও সচকিত প্রশ্ন বেরিয়ে এল একটা, ঘোষালদার বাড়ির রাস্তা তো, ইয়ে—মানে আমরা কোথায় যাচ্ছি?

জাহান্নমে, আপত্তি আছে? মশাই আপনি তো মেয়েছেলে নন!

সত্যিই তো। বোসের কথা টনিকের কাজ করল। আবার কণ্ঠস্বরও আপনা থেকেই চড়ল একটু, বললাম, সেই জন্যেই তো জিজ্ঞাসা করছি কোথায় চলেছি, বন্ধু মানুষ ডাকলেন, হুট করে এলাম—কিন্তু আমি তো কেনা গোলাম নই মশাই কারও, বলবেন তো কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে!

পুরুষের উক্তি শুনেই বোধ হয় বিস্মিত হলেন, প্রীতি হলেন, আর নরম হলেন একটু।—মেজাজের যে দেখি খাসা উন্নতি হয়েছে, অ্যাঁ। পকেটে আজকাল অন্যদিক থেকেও দু-চার পয়সা আসছে বুঝি? যাচ্ছি ঘোষালদার কাছে, বুঝছেন না? যে জন্যে যাচ্ছি সেটা বাড়িতে বসে সুবিধে হয় না—বুঝছেন না? মিলি বোস বুকে সরাসরি ছুরি মেরেছে ঘোষালদার বুকে—বুঝছেন না? আর কি বলতে হবে, আর কত সহজ সরল প্রাঞ্জল করে বোঝাতে হবে আপনাকে?

শুনে পুরুষ ভাবটুকু আবার মিইয়ে যেতে লাগল। মিলি বোস ছুরি মেরেছে...কেমন ছুরি, কি ছুরি!...নিশ্চয় সেই ছুরি, নইলে আমার ডাক পড়বে কেন!

গন্তব্য স্থলে এসে বোসের আহ্বানে যেখানে ঢুকতে চলেছি, তাকিয়ে দেখি, মস্ত বিলিতি এক বার-রেস্তরাঁ সেটা। বোস চওড়া কাঠের সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগলেন। চিত্রার্পিতের মত আমিও। দোতলার সামনের হলের জম-জমাট পরিবেশের ওপর চোখ পড়তেই পা থেমে যাওয়ার উপক্রম। আলোয় আলোয় একাকার চারদিক। রাত মনে হয় না। দিনও না। নীল-ঘেঁষা সাদাটে পরিবেশ।

ভিড়ের মধ্য দিয়ে বোস আমাকে এক প্রকার ঠেলে নিয়েই এগোতে লাগলেন।

হঠাৎ একটা সন্দেহ দেহের সব কটা স্নায়ু একসঙ্গে ঝাঁকিয়ে দিল। জয়া দেবীর নামে

সদানন্দ ঘোষালের লেখক পরিচিতি লাভের সম্ভাবনা আর নেই দেখে এঁরা কি প্রতিশোধ নেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে আমাকে এখানে ধরে এনেছেন?

সকলে মিলে মদের পিপেতে চোবাবেন আমাকে!

কি সর্বনাশ!

আমি এলাম কেন, বেরুলাম কেন বাড়ি থেকে! সেদিনের এক মাত্রাতেই মুক্তির বাতাসে সাঁতার কাটার ফলে যে অঘটন ঘটতে বসেছিল—এঁদের প্রতিশোধের পাল্লায় পড়লে পা দুটো কি আর একটুও মাটির ওপর থাকবে! আর তার ফলে এবারে একজনের না একজনের আত্মহত্যা অনিবার্য। হয় আমার, নয় তো গৃহিণীর।

আমি হয়তো করে উঠতে পারব না, কারণ, বাতাসে ভাসতে থাকলে আত্মহত্যা সম্ভব নয়। তা হলে গৃহিণীই করবেন—বাতাস থেকে আমি ঠিকমত মাটিতে নামার আগেই হয়তো দেখব সব শেষ হয়ে গেছে।

শেষ দৃশ্যটা ভালো করে দেখার আগেই বোস একটা ক্যাবিনের দরজা ঠেলে আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। টেবিলের দুদিকে বসে ঘোষাল আর বিনয় তালুকদার। এক নজর দেখেই মনে হল বাতাসে ভাসার ব্যাপারে তাঁরা কিছুটা এগিয়ে গেছেন। ঘোষাল নিবিড়তা মাখানো দুই চোখ আমার দিকে তুলে বিষণ্ণ আহ্বান জানালেন, আসুন, এত দেরি করতে হয়!

নিরঞ্জন বোস চেয়ার টেনে বসতে বসতে জবাব দিলেন, আর বলেন কেন, এই জন্যেই যেতে চাই নি আমি। সারা পথ জেরার চোটে অস্থির একেবারে, কেন যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি, উনি কি কেনা গোলাম নাকি আমাদের—এই সব কথা।

গাড়িতে বসে কথা বলেছি, সেজন্য আসতে দেরি কেন হবে সেটা কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না।

ঘোষালের অভ্যর্থনা আর অনুযোগে আমার ভয় কিছুটা কমেছে। কিছুটা কেন অনেকটাই। মিলি বোস লেখক-প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন হাবভাব দেখে তো মনে হয় না। নিরঞ্জন বোসের বিরক্তির কারণ অনুমান করা গেল। আমায় ডেকে নিয়ে আসার দায়িত্বটা তাঁর কাঁধে চেপেছে বলেই হয়তো মেজাজ চড়া একটু। বিনয় তালুকদারের সামনের গেলাসের রঙিন তলানির দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে চাপা টিপ্পনী কাটলেন তিনি, খুব সাঁটছেন যে দেখি!

ওদিকে সদানন্দ ঘোষাল যেটুকু শুনেছেন তাতেই বিষম মর্মাহত তিনি। নিজের গেলাসের তরল পদার্থটুকু এক চুমুকে শেষ করে (কয় দফা শেষ করেছেন জানা নেই) মুখ গোঁজ করে বসে রইলেন খানিক। তারপর আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন?

তাড়াতাড়ি বসে পড়তে 'বয়'-এর উদ্দেশে একটা হাঁক পাড়লেন প্রথম। তারপর গলার স্বর একেবারে কোমলে নামিয়ে অনুযোগ করলেন, আপনি কেনা গোলাম বলতে পারলেন নিজেকে? বন্ধুত্ব কিছুই নয়? বরং এই দুঃসময়ে আপনাদের বন্ধুত্বের ঋণে আমিই তো কেনা হয়ে আছি!

মনে মনে গোটাগুটি হাঁপ ফেলে বাঁচলাম। মিথ্যেই ত্রাসে আর শঙ্কায় আধমরা হয়ে ছিলাম গাড়িতে। এদিকে থেকে বিনয় তালুকদার ব্যথায় কুঁচকে উঠলেন যেন।—আপনি এভাবে বলবেন না ঘোষালদা, এভাবে বললে বড় লাগে যে!

তারপর আমার দিকে চেয়েই একেবারে খাপ্পা,—ঘোষালদার সম্বন্ধে একথা বললে নরকেও ঠাঁই হবে না—নিন্, ঠিকঠাক মত বেশ গুছিয়ে চিঠিখানা লিখে ফেলুন চট করে। কলম এনেছেন তো, না তাও আনেন নি?

বোস এখনও শুকনো যাচ্ছেন বলেই হয়তো তালুকদার সক্রিয় একটু। কলম আমি আনি নি, পকেটে সর্বদা থাকে এবং ছিল বলে এসে গেছে। কিন্তু কি চিঠি লিখব, কাকেই বা লিখব ভেবে পেলাম না। সেটা পরিষ্কার হবার আগেই ক্যাবিনের হাফ-দরজা ঠেলে ঝকেঝকে তকমা-আঁটা বেয়ারা হাজির।

ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন, কি খাবেন বলুন—

চপ-কাটলেট আর জল...।

সেকি! শুধু জল? একটু তাজা হয়ে না নিলে তেমন চিঠি লিখবেন কি করে? ঘোষাল সংশয়াপন্ন।

দেরি হচ্ছে দেখে বোস নীরবে চোখ পাকিয়েছেন। কি লিখতে হবে, কেন লিখতে হবে, কোথায় লিখতে হবে না জেনেই তাড়াতাড়ি বললাম, তেমন তাজা হলে আমার লেখা ঠিক আসে না, চপকাটলেটেই আমি অনেকটা তাজা হয়ে যাই।

কাজ হল। লেখা না আসার ভয়েই ঘোষাল তৎক্ষণাৎ রেহাই দিয়ে ফেললেন আমাকে।—থাক্ তা হলে, থাক্।

আমার জন্য স-খাদ্য সাদা জল আর তাঁদের জন্য স-খাদ্য রাঙাজলের হুকুম নিয়ে বয় চলে গেল। তার পর কিছুক্ষণের নিঃসীম নীরবতা। সেই গুরুগম্ভীর নীরবতার অবসান হল বয় আহার্য এবং পানীয় নিয়ে ফিরে আসতে।

নিশ্চিন্ত আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঘোষাল বোসকে জিজ্ঞাসা করলেন, এঁকে ব্যাপারটা সব বলেছেন তো?

গ্লাস আর ডিশ হাতের কাছে টেনে নিয়ে বোস বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন, না দাদা, ও আপনিই বলুন। অর্থাৎ এমন বুকভাঙা সমাচারটা তিনি বলে উঠতে পারেন নি। আমার দিকে তাকালেন, হড়বড় করে শুধু খাওয়ার দিকে মন না দিয়ে দাদা কি বলেন বেশ করে শুনে নিন—শোনার জন্যে তো ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ভালো করেই শুনলাম। আর যা শুনলাম তাতে চপ-কাটলেটও এক-একবার নিরামিষ লাগছিল।

—মিলি বোস ঘোষালের বুকে যথার্থই ছুরি বসিয়েছেন।

একেবারে আমূল বিদ্ধ করেন নি বটে, কিন্তু যতটুকু করেছেন তাইতেই ঘোষাল ক্ষতবিক্ষত।...ছুরিটা প্রথম বসিয়েছেন সদানন্দবাবুর বাবা, বুড়ো ব্যারিস্টার ঘোষাল। এত বড় কলকাতা শহরে এমন বিদ্‌ঘুটে যোগাযোগ যে কি করে হয় সদানন্দবাবু ভেবেই পান না। ভগবান বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি যে বিষম কু-চক্রী তাতে ওঁদের

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঘটনাটা এই ঃ সেদিন গাড়িতে যাচ্ছিলেন সদানন্দবাবু, নিরঞ্জন বোস আর ক্লারা দেবী। সদানন্দবাবু আর ক্লারা দেবী পিছনে বসেছিলেন, ড্রাইভারের পাশে নিরঞ্জন বোস। সদানন্দবাবু একেবারে নির্দোষভাবেই এক হাতে ক্লারা দেবীর গলা জড়িয়ে ধরে বসে বড় একটা অর্ডার সংগ্রহের ব্যাপারে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করছিলেন। ইদানিং ব্যবসায় বেশ একটু মন্দা যাচ্ছে, ক্লারা দেবীকে উনি বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন কী করতে হবে না হবে। এক হাতে তাঁর গলা জড়িয়েছিলেন সহকর্মিণীর অন্তরে শুধু একটুখানি উদ্দীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই। ক্রিকেট খেলার মাঠে দক্ষ অধিনায়ক যেমন করে তাঁর বোলারের গলা জড়িয়ে ধরে বোলিং সম্বন্ধে নির্দেশ দেন বা পরামর্শ করেন। খুব মন দিয়েই আলোচনা করছিলেন, গাড়িটা যে লালবাতি দেখে থেমে আছে খেয়ালই করেন নি।

সে যে কি বিষম লালবাতি সেটা পরে বোঝা গেছে। আজও বোঝা যাচ্ছে। যখন খেয়াল হল, সদানন্দবাবু বেশ জোরালো রকমের ইলেট্রিক শক খেয়েছেন একটা।

পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁর বাবার গাড়িখানা—বাবা গলা বাড়িয়ে তাঁদেরই দেখছেন, আর নীরবে ভস্ম করছেন।

সেই রাতেই বাপের সঙ্গে বোঝাপড়া। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সদানন্দবাবু এই সামান্য ব্যাপারটা তাঁকে বোঝাতে পারেন নি। বুড়োর সাফ কথা, হয় পত্রপাঠ বিয়ে করতে হবে, নয় তো ছেলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

সদানন্দবাবু স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন, বিয়ে তিনি একমাত্র মিলি বোসকেই করতে পারেন, আর কাউকে না। আর কাউকে বিয়ে করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়।

বাবা ক্ষেপে উঠে বলেছেন, বেশ তাই কর। মোট কথা স্বভাবচরিত্র একেবারে রসাতলে পাঠাবার আগে বিয়েটা করা চাই। আর এ কথাও বলেছেন, তাঁর ছেলের মত ছেলেকে জেনেশুনে কেউ বিয়ে করবে সেই আস্থা তাঁর একটুও নেই।

বাপের পরোক্ষ সম্মতির দরুন আনন্দে, আর সংশয়ের দরুন পুরুষের মেজাজ নিয়ে সেই দিনই সদানন্দ ঘোষাল হৃদয়-রমণী সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই ভরা প্রত্যাশার মুহূর্তে বুকে ছুরি বসিয়েছেন মিলি বোস।

বিয়ের প্রস্তাব শুনে প্রথমে এমন মুখ করেছেন যেন বিয়ে কাকে বলে তাই জানেন না। তার পর তাঁর নির্মম ব্যবহারে সদানন্দ ঘোষাল একেবারে আকাশ থেকে পড়েছেন। যে-মেয়ের একরাশ পুরুষবন্ধু সেও কিনা তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করে ! সদানন্দ ঘোষাল নিঃসন্দেহ, হারাণ বিশ্বাস সেখানেও চিঠি ছেড়েছেন। মিলি বোস স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন, বিয়ের কথা তিনি এখন ভাবতে রাজী নন, সদানন্দ ঘোষালকে বিয়ে করার কথা ভাবতে আরও কম রাজী। বলেছেন, অমানুষ স্বামীর থেকে স্বামী না থাকাও ভালো। বলেছেন, আগে উনি মানুষ হোন, তারপর ভেবে দেখা যাবে।

সদানন্দবাবুকে নিজের হয়ে সুপারিশ করার একটুও অবকাশ না দিয়ে এক ঝলক আগুনের মতই তাঁর বুকখানা ঝলসে দিয়ে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করেছেন মিলি বোস।

ওদিকে বাপ যেন ওত পেতে ছিলেন। ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ঘাড়ে চেপে বসেছেন। ঝানু বুড়ো ছেলের মুখ দেখেই বুঝেছেন গণ্ডগোল হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেছেন, এই মাসের মধ্যেই যেখানে হোক ছেলেকে বিয়ে করতেই হবে, অন্যথায় ছেলের আর মুখও দেখবেন না তিনি।

বাপকে মুখ দেখানোর জন্য ছেলের খুব গরজ নেই। ব্যবসাটা আপাতত একটু মন্দা যাচ্ছে বলেই যা সমস্যা—নইলে ভ্রূকুটির পরোয়া করতেন না সদানন্দ ঘোষাল।

আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, ওই বাপের সঙ্গে মিলি বোসের যে একটা প্যাক্ট হয়েছে তলায় তলায়, সেই ব্যাপারটা এই সুযোগে নিরঞ্জন বোস বলে দেবেন। কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত কিছুই তিনি বললেন না ঘোষালের দুঃখে ছলছল নেত্রে দ্বিতীয় দফা গেলাস খালি করে 'বোয়—' বলে একটা করুণ ডাক ছাড়লেন শুধু।

বিনয় তালুকদার মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে টেনে টেনে বললেন, নিজেব বাপ যে এমন নৃশংস হয় জানা ছিল না।

হয়। সবই বরাত, বুঝলেন। ঘোষালের মুখে দার্শনিকের বেদনা।—বাবা তো উপলক্ষ মাত্র। বড়ব ওপরেই চিরকাল বড় ধাক্কা আসে—যীশুখ্রীস্টকে আগুনে পুড়তে হল, চৈতন্যদেবকে সমুদ্রে ডুবতে হল, গান্ধীকে গুলি খেতে হল—

বয় আবারও গেলাস ভরে দিয়ে যেতে বাধা পড়ল।

এইবার আমাকে কি করতে হবে জানা গেল। একখানা চিঠি লিখতে হবে। চিঠি লিখতে হবে না, চিঠির খসড়া করে দিতে হবে। চিঠি লিখবেন সদানন্দ ঘোষাল। লিখবেন মিলি বোসকে। হৃদয়-গলানো ব্যথায়-কাঁদানো আবেদনে-জাগানো প্রেমে-হাসানো সমর্পণে-মাতানো চিঠি।

—আগে আমার বুকের হাহাকার উপলব্ধি করুন, আমার বুকের আগুন অনুভব কবুন—তারপর লিখুন—এই একখানা চিঠির জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ঘোষালের থমথমে ভারী গলায় ক্যাবিনের বাতাসও থমথমে হযে উঠল।

পাশের একটা শূন্য চেয়ারে তাঁর পেট-মোটা ব্যাগটা পড়েছিল। ওটা খুলে কাঁপা হাতে তিনি এক গোছা তক-তকে সাদা প্যাডের কাগজ বার করে দিলেন।—লিখুন, আপনার এ-চিঠি যেন কন্দর্পশরকেও হার মানায়, এ চিঠি যেন আপনার লেখক জীবনের, সাহিত্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়।

এমন গুরুগম্ভীর উত্তেজনার পর লিখতে বসে বে-খাপ্পা রকমের গোল বাধল প্রথম শব্দটি বসানো নিয়েই। যে-চিঠি এক অকরুণ রমণী-হৃদয়ে প্রেমের বন্যা নামাবে, যে চিঠি শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হবে লেখক-জীবনের আর সাহিত্য-জীবনের—সেই চিঠির প্রথম সম্বোধনটি কেমন হবে?

অনেক ভেবেচিন্তে প্রস্তাব করলাম, শুধু 'মিলি'—লিখে চিঠি শুরু করা যাক। একেবারে ডাইরেক্ট অ্যাকশান হবে তা হলে।

সদানন্দ ঘোষাল গেলাস হাতে হাঁ একেবারে। বেশ বড়সড় একটা আছাড় খেলেন

যেন।—শুধু মিলি?

ওদিকে নিরঞ্জন বোসেরও গেলাসের আমেজ অর্ধেক চটে গেল বোধ হয়। গম্ভীর অনুযোগে দু চোখ টান করে তাকালেন।—এটা কি ঠাট্টার সময়?

অতএব ঠাট্টা বাদ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সমবেত লিপি-সম্বোধনী শব্দ চয়ন চলতে লাগল।

প্রিয়তমা, প্রেয়সী, প্রিয়সখী, প্রাণাধিকা—হৃদয়েশ্বরী, প্রাণেশ্বরী, ধ্যানেশ্বরী, প্রেমেশ্বরী—প্রেমবাঞ্ছিতা, চিরবাঞ্ছিতা, চিরসিঞ্চিতা, চিরবন্দিতা—চারুমুখী, চন্দ্রমুখী, পলাশমুখী, ডালিয়ামুখী—আলোকরূপিণী, শচীরূপিণী, লক্ষ্মীরূপিণী, দীপ্তিময়ী, তৃপ্তিময়ী—

—ডিক্‌শনারিটা আনলে হত। বড় দেরিতে মনে পড়ল নিরঞ্জন বোসের।

বিনয় তালুকদার সর্বক্ষণ প্রায় মুখ সেলাই করে ঝিম মেরে বসেছিলেন। হঠাৎ আড়ামোড়া ভেঙে বলে বসলেন, অন্তরতমাসু লিখলে কেমন হয়?

বেনা বনে মুক্ত কুড়িয়ে পেলেন সদানন্দ ঘোষাল।—জাস্ট দ্যাট, জাস্ট দ্যাট। লিখুন, অন্তরতমাসু।...ওই জন্যেই বলেছিলাম একটুখানি খেয়ে মাথাটা সাফ করে নিন, বিনয়বাবুর মাথায় পর্যন্ত এল, অথচ আপনি ভেবে পেলেন না।

খুশিতে আর বিনয়ে বিনয়বাবু ঢুলু ঢুলু মুখখানা টেবিলের সঙ্গে লাগো-লাগো।

প্রশংসাবচন শুনে ওদিক থেকে নিরঞ্জন বোস আরও একটু বেশি সক্রিয় হয়ে উঠলেন এবারে। বয়ান-রচনায় উদ্ভাবনীর চমক দেখাতে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। ফলে প্রত্যেক লাইন নিয়েই তাঁদের তিনজনের মধ্যে চালাই বাছাই বিচার বিশ্লেষণ চলল। আমি কলম ধরে বসে। সাজিয়ে গুছিয়ে ওজন-পালিশ করে তাঁরা যেটুকু ধরে দেন সামনে, আমি তক্ষুনি সেইটুকু লিখে ফেলি, তার পর পরের পঙক্তির জন্যে আবার প্রতীক্ষা করি।

বহুক্ষণের আত্মনিষ্ঠ অনুশীলনের পরে যে চিঠিটা দাঁড়াল, সেটা এই রকম ঃ

অন্তরতমাসু,

মিলি, ফুল কি কখনো মক্ষিকার প্রতি বিমুখ হয়? কায়া কি কখনো ছায়ার প্রতি বিমুখ হয়? দেবী কি কখনো ভক্তের প্রতি বিমুখ হয়? কিন্তু তুমি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছ, আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ।

আমার মিলি, তুমি এমন নিষ্ঠুর কেমন করে হলে?

তোমার কাছ থেকে সাহারার আগুন বুকে নিয়ে ফিরেছি, বুকে আমার খাণ্ডবদাহ। তুমি আমাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছ মিলি। আমি চলে গেছি অবন্তী-বিদিশা-উজ্জয়িনীর দেশে, বসে আছি রেবা-শিপ্রা-বেত্রবতীর ওধারে—বিরহী যক্ষের তপ্ত নিশ্বাস তুমি কি শুনতে পাও না মিলি? তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না মিলি, তোমার রোষানলে পুড়ে আমি খাঁটি সোনা হয়ে গেছি, তোমার বিরহানলে পুড়ে আমি আধাআধি কবি হয়ে গেছি। মিলি, তুমি আমাকে ডেকে নাও। তোমার জীবন-বাস্তবে যৌবন-বাস্তবে এ-পথিককে ডেকে নাও। তুমি চাঁদ—আমি যে তোমার বুকে কলঙ্কের মতই অবিচ্ছেদ্য, তুমি

সমুদ্র—আমি যে তোমার বুকে ঢেউয়ের মতই অনিবার্য, তুমি পুষ্পোদ্যান—আমি যে তোমার বুকে দখিন বাতাসের মতই অবধারিত।

মিলি, আমার প্রিয়তমা মিলি, আমার প্রাণাধিক মিলি, আমার হৃদয়েশ্বরী মিলি, আমার চিরবাঞ্ছিতা মিলি, আমার চারুমুখী মিলি, আমার শক্তিরূপিণী মিলি, এই বিয়েতে তুমি সম্মতি দাও, আমাকে রক্ষা কর, আমার যক্ষের প্রতীক্ষার অবসান কর। আমাকে ডেকে নাও—তোমার প্রসন্নতার জোয়ারে আমাকে সাঁতার কাটতে দাও। তোমার লাবণ্যের আগুনে আমাকে পতঙ্গের মত পুড়ে মরতে দাও।

আমার মিলি, আমাকে তুমি দু-হাত বাড়িয়ে ডেকে নাও।

তোমারই—

চিঠি শেষ হতে আমি ঘেমে উঠেছি। ভয় হচ্ছে, নিজের অগোচরে এঁদের কারও গেলাসে দুই-একটা চুমুক বসিয়েছি কিনা।

ঘোষাল বললেন, সব মিলিয়ে কি রকম দাঁড়াল একবার পড়ুন শুনি।

যথা নির্দেশ। পড়তে পড়তে একটা শব্দ-তরঙ্গ আর ভাব-তরঙ্গ কানের ভিতর দিয়ে নিজেরই মগজে ঠাসাঠাসি হয়ে উঠতে লাগল।

পড়া শেষ হতে সদানন্দ ঘোষাল হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে আমার দুটো হাতই একসঙ্গে ধরে ফেললেন, আর বুকভরা কৃতজ্ঞতায় বলে উঠলেন, আপনি বয়সে ছোট, কি আর বলব আপনাকে, এ জীবনে এই ঋণ ভুলব না—আপনার কলম আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব—এমন চিঠি এক কালিদাস ভিন্ন আর কেউ লিখতে পারতেন না।

ওঁরা যা বলেছেন আমি তাই শুধু লিখেছি, ওইটুকু ছাড়া আমার আর একটুও কৃতিত্ব ছিল না। কিন্তু চিঠির যাদুতে নিজেরা ততক্ষণে তা ভুলে গেছেন। ঘোষালের কৃতজ্ঞতার ঢেউয়ে বোস আর তালুকদার অবশ্য একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন প্রথম। তার পর তাঁরাও দু দিক থেকে দুজনে আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

বোস বললেন, এত দিনে আজ এই প্রথম আপনাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

তালুকদার বললেন, কালই আমি আপনার একখানা ছবি তুলব।

অতঃপর সদানন্দ ঘোষাল তাঁর পেট-মোটা ব্যাগ থেকে নিজের প্যাড বার করে চিঠিখানা কপি করবেন বলে আঁটসাট হয়ে বসলেন। খামও রেডি। চিঠি কপি করে আজই ডাকে দিয়ে তবে তাঁরা ক্ষান্ত হবেন। এদিকে সকলের গেলাসই খালি। 'বয়' এর উদ্দেশ্যে আবারও হাঁক পড়ল।

আর এখানে অবস্থান নিরাপদ বা সমীচীন বোধ করছি না। এঁদের কৃতজ্ঞতার জের এবারে কত দূর গড়াবে ঠিক নেই। লেখার অজুহাতে আর হয়তো পাশ কাটানো যাবে না। এমন কি, এবারে প্রত্যাখ্যান করলে তিনজনের একসঙ্গে কেঁদে ফেলাও বিচিত্র নয়। অতএব বয় আসার আগেই বাড়িতে অসুখ, স্ত্রীর অসুখ, ইত্যাদির অজুহাতে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে হাঁপ ফেলে বাঁচলুম। তবু নীচে নামার সময় মনে হচ্ছিল পা দুটো টলছে একটু একটু।

॥ ৬ ॥

ঠিক তিন দিনের দিন সম্পাদিকা মিলি বোসের অপ্রত্যাশিত চিঠি।

জয়া দেবীর নামে নয়, আমারই নামে। সেই চিঠি ডাকে আসে নি, দপ্তরের এক পিওন নিয়ে এসেছে। চিঠির মর্ম, পত্রপাঠ একবার আসতে হবে, বিশেষ জরুরী।

গত কটা দিন আমিও মিলি বোসের কথাই ভাবছিলাম। সদানন্দ ঘোষালের চিঠি পাওয়ার পর তাঁর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। এরই মধ্যে এই আহ্বানে পুলকিত হব কি চিন্তিত হব বুঝে উঠলাম না। সদানন্দ ঘোষালের চিঠি পেয়ে রেগে গিয়ে গল্পের কথা সব ফাঁস করে দেবেন বলেই কি আমাকে ডেকেছেন? ডেকে জানিয়ে দেবেন, কথা রাখতে পারলেন না? নাকি, এবারে যে গল্পটা পাঠিয়েছি তারও প্রথম বা শেষ বা প্রথম-শেষ সবই বদলাতে বলবেন?

যথাসময়ে সম্পাদিকা সন্নিধানে এসে কিছুটা নিশ্চিন্ত। এবারের প্রেরিত গল্পটির পাণ্ডুলিপি টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে দেখলাম। গল্প প্রসঙ্গেই আলোচনা তা হলে।

কিন্তু সম্পাদিকার মুখখানি এত গম্ভীর কেন? ইঙ্গিতে আমাকে বসতে বলে পাণ্ডুলিপিটা টেনে নিলেন। একটা জায়গা খুলে আমার দিকে ধরলেন, এটা আপনারই হাতের লেখা তো?

কোন জায়গাটা দেখালেন দূর থেকে ঠাওর হল না। শুধু নিজের লেখা লেখা যে সেটুকুই দেখা গেল। প্রশ্নটার এবং অপরিসীম গাম্ভীর্যের তাৎপর্য না বুঝে আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি।

কিন্তু ওই লেখা পাতাটা পাণ্ডুলিপির কোনো অংশ নয় সেটা বোঝা গেল কাগজখানা তিনি বার করে নিতে। দু আঙুলে কাগজখানার এক কোণ ধরে গোটা হাতখানাই আমার দিকে প্রসারিত করে দিলেন তিনি, তার পর ঠাণ্ডা গলায় আবার বললেন, এটা আপনারই লেখা তা হলে.....?

লেখা কাগজখানার দিকে ভালো করে তাকিয়েই গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল আমার। তার পরেই তড়িৎস্পৃষ্টের মত নিস্পন্দ আমি।

স্তব্ধ বিমূঢ়, বিভ্রান্ত।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি। আমি কোথায় বসে আছি। এ আমি কি দেখছি?

আমি দেখছি, আমারই হাতের লেখা এবং ঘোষালের জন্যে লেখা সেই চিঠির খসড়াখানা। একেবারে 'অন্তরতমাসু' থেকে 'তোমারই' পর্যন্ত। নিচে কোন নাম স্বাক্ষর নেই। যেমনটি দিয়েছিলাম ঘোষালের হাতে।

কিন্তু এ চিঠি এখানে এল কেমন করে। সদানন্দ ঘোষাল তো তক্ষুনি সেটা কপি করতে বসেছিলেন। কপি করে নিজের নাম স্বাক্ষর করে পাঠানোর কথা।

চোখের সামনে সব কিছুই ঝাপসা দেখতে লাগলাম আমি। টেবিল চেয়ার মিলি বোস ঘর দরজা জানলা সবই দুলছে আর মাথাটা লাট্টুর মত বনবনিয়ে ঘুরছে।

কোনোপ্রকারে গলার স্বর দখলে এনে বলে উঠলাম, এ আপনি পেলেন কি করে, এটা তো চিঠি নয়, এটা—

মিলি বোস কঠোর কণ্ঠে থামিয়ে দিলেন, এটা আপনি লিখছেন কিনা আমি জানতে চাই।

আমি—ইয়ে, আমি কেন লিখব, মানে ওটা সদানন্দবাবুর জন্যে লেখা—

মিলি বোস শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, আপনার নিজের হাতের লেখা এই গল্প আর এই চিঠিখানা আগে হ্যান্ডারাইটিং এক্সপার্টের কাছে পাঠাব, তাদের পাকা মতামত নিয়ে তারপর আপনার বিরুদ্ধে কেস করব, আপনাকে পুলিসে দেব, আপনার কথা কাগজে লিখব।

শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে কলকলিয়ে নেমে যাচ্ছে। ভয়ে ত্রাসে গলা শুকিয়ে কাঠ। অব্যক্ত আকৃতিতে কি বলতে চেষ্টা করলাম, গলা দিয়ে শুধু ফ্যাসফেসে শব্দ বেরুল একটা। মিলি বোসের সামনেই এক গেলাস জল ঢাকা ছিল। মনে হল, কত কাল জল খাই নি ঠিক নেই। হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে মুখে ঠেকাতে না ঠেকাতেই গেলাস খালি। আরও চার-পাঁচ গেলাস হলে তৃষ্ণা মিটত।

যাই হোক, এবারে গলা দিয়ে স্বর বেরুল—কান্নাই ঝরল বলা যেতে পারে। বললাম, কিন্তু আপনি এত সব করবেন কেন, লেখা তো আমারই— মানে তাঁরা যেমন যেমন বলেছেন তেমনি লিখেছি—

তাঁরা কারা? মিলি বোস যেন চিরে চিরে দেখছেন আমাকে।

সদানন্দ ঘোষাল, নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদার—ওই চিঠি ঘোষালের লেখার কথা আপনাকে, আমি তাঁকে কপি করতেও দেখেছি—

মিলি বোস নীরস জবাব দিলেন, আমি অত সব জানতে চাই নে, আমি আপনার লেখা এই চিঠি পেয়েছি, কাজেই যা করবার আপনার বিরুদ্ধেই করব--

কিন্তু কেন আপনি তা করবেন? দিশেহারার মত বলে উঠলাম, আমি আপনাকে এরকম চিঠি লিখতে যাব কেন। আমি আপনাকে কোনো দিন একটুও ভালোবাসি নি, আমি আপনাকে কোন দিনই ওই চিঠির মত ওভাবে পেতে ইয়ে-- মানে আপনি কাছে এলেই আমার ভয় করে। তা ছাড়া ওতে দেখুন বিয়ের কথা লেখা আছে, আমি তো বিবাহিত—হিন্দু আইনে দুটো বিয়ে চলে না এখন, আমি বিয়ে করতে চাইব কি করে। আপনি ভেবে দেখুন—

মনে হল এরকম বিতিকিচ্ছিরি একটা জালে পড়েছি বলেই মহিলার ভিতরে ভিতরে একটু আনন্দও হচ্ছে। নির্মম শান্তমুখেই তবু বললেন, সে সব আমার ভাবার দরকার নেই, কোনো ভদ্রমহিলাকে এ-রকম চিঠি লিখলে বা পাঠালে কতটা অপমান করা হয় আদালত সেই বিচার করবে।

পট পট করে নিজের মাথার চুলগুলো টেনে তুলতে ইচ্ছে যাচ্ছিল আমার, নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। এ কি মর্মান্তিক বিড়ম্বনা! এখন আমি কি করব? স্ত্রীর মুখে বালিশ চাপা দেবার মত করে এঁর কাছ থেকেও জোর করে চিঠিখানা কেড়ে নেব? তাই বা করি কি করে, চিঠিটা তো আবার ড্রয়ারে পুরেছেন। তা ছাড়া কাড়াকাড়ি করতে গেলে বাইরে দরোয়ান বসে, ওদিকে লোকজনও আছে— হাড়মাস আলাদা করে

হাসপাতালে পাঠাবে।

আবারও ব্যাকুল আবেদনেই তাঁর মন ভেজাতে চেষ্টা করলাম।—দেখুন, আপনি ইয়ে ঠাট্টা করছেন কিনা বুঝতে পারছি না, কিন্তু এ বড় মর্মান্তিক ঠাট্টা। আর ঠাট্টা যদি না হয় তা হলে তো আরও সাংঘাতিক। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি চিরজীবনের মত লেখাই ছেড়ে দেব, আলু-পটল বেচে খাব, আর কোনো দিন কিছু লিখব না—গল্পও না, অন্যের চিঠিও না। দয়া করে ওটা আমাকে ফেরত দিয়ে দিন—আপনি কোর্ট থানা পুলিস করলে সকলেই জানতে পারবে, আমার স্ত্রীও জানতে পারবেন, তা হলে আমার একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে—তাঁকে আপনি জানেন না—

বলে আরও বিপদ বাড়ল। বেশ রয়ে সয়ে ঠাণ্ডা মুখে উনি বলে বসলেন, আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই এ-চিঠি নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করব ঠিক করেছি—তার পর আর যা হয় করব। দুই-এক দিন পরে নয়, আজই দেখা করব ভাবছি।

কেন ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন কেন ? ত্রাসে আর দুর্ভাবনায় আমার রাগই হয়ে গেল প্রায়, থানা পুলিশ করলে আবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার দরকার কি। আমার স্ত্রীকে আমি কোনো লোকের সঙ্গে দেখা করতে দিই না, মানে স্ত্রীলোকের সঙ্গেও দেখা করতে দিই না—কিন্তু আপনি বুঝে শুনেও আমাকে এভাবে বিপদে ফেলতে চান কেন ?

প্যাঁ-ক্ করে শব্দ হতে চমকে উঠলাম। মিলি বোস টেবিলের বেল টিপেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে দোরগোড়ায় বেয়ারা হাজির। মিলি বোস পাখাটা তাকে আরও জোরে চালিয়ে দিতে ইঙ্গিত করলেন। এতক্ষণে খেয়াল হল আমার গোটা মুখ, এমন কি জামা পর্যন্ত ঘামে ভিজে গেছে। রুমালে করে মুখ মুছতে মুছতে একটা কথা মনে হতেই আশান্বিত চোখে তাকালাম মিলি বোসের দিকে। বললাম, আচ্ছা চিঠিখানা তো ডাকে এসেছে, আপনি খামটা দেখুন, খামে নিশ্চয় আমার হাতের লেখা দেখতে পাবেন না— খামটা কোথায় ?

মিলি বোস নিরাসক্ত মুখে ড্রয়ারটা টেনে খুলে একটা খাম বার করে আমায় দেখালেন। অবশ্য খামটা নিজের হাতে রেখেই।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম প্রায়, ওই তো—সদানন্দ ঘোষালের নাম-ছাপা খাম। আর আপনার ওই নাম-ঠিকানাও আমার লেখা নয়, আপনি এক্ষনি পরীক্ষা করে দেখুন—একবার দেখলেই আপনার আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

খামটা আবার ড্রয়ারে চালান করে মিলি বোস তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, আপনার নামে কেস করলে বা থানা পুলিশ করলে এ খাম আর বার করেছে কে—

যেটুকু আশার সঞ্চার হয়েছিল সবই গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তাজ্জব আমি। কি সর্বনাশ ! আপনি জেনেশুনেও আমাকে বিপদে ফেলবেন ? সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না যে চিঠি কপি করে মদের ঝোঁকে সদানন্দবাবু আসলটার বদলে এটাই খামে পুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—তাঁর প্যাডে তাঁর কপি করা চিঠিটা আপনি তাঁর পেট-মোটা ব্যাগ

খুঁজলে এখনও পাবেন হয়তো—মদের ঝোঁকেই আমার আর নিজের এই সর্বনাশটি করেছেন তিনি।

মিলি বোস মুখ নিচু করে ভাবতে লাগলেন কি। কিছু ভাবার সময় তাঁর মুখখানা অমন মিষ্টি হাসি-হাসি দেখায় আগে লক্ষ্য করি নি। আমার ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

নিস্পৃহ প্রশ্ন করলেন, আজকাল উনি খুব বেশি ড্রিঙ্ক-টিঙ্ক করেছেন বুঝি ?

প্রায়ই—। প্রায়ই মানে প্রত্যহ। সদানন্দ ঘোষালের ওপর রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠল ভিতরটা, বললাম, উনি আজকাল জল ছোঁন কিনা সন্দেহ, শুধু ওই ইয়েই খান—।

আপনিও খান তো ?

চমকে উঠলাম, আমি। না আমি খাই নে।

আমার বিশ্বাস আপনিও খান। কি বিপদ। সত্যি বলছি আমি খাই না, মাইরি বলছি, আপনার গা ছুঁয়ে ইয়ে— নিজের বুকে হাত দিয়ে বলছি আমি খাই না। এক দিন ওঁরা জোরজার করে দু চুমুক খাইয়েছিলেন তাতেই একেবারে প্রাণান্ত অবস্থা আমার। মনে মনে তার পর কম করে দু মাইল নাকে খত দিয়েছি, একশ আটবার কান মলেছি— আরও জিনিস জীবনে স্পর্শ করব না।

মিলি বোস জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় বসে এ-চিঠি লেখা হয়েছিল ?

বার-এর নাম বলে দিলাম।

রোজ সেখানেই যান তিনি ?

তা তো ঠিক বলতে পারব না, সেই দিন সেখানেই আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আবারও চুপচাপ ভাবতে লাগলেন কি। এবারে সিরিয়াসলি ভাবছেন বোধ হয়, কারণ মুখখানা মিষ্টি দেখালেও হাসি হাসি দেখাচ্ছে না। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলে মুখ তুললেন—কিন্তু আপনার নামেই কেস না করে আর আপনাকে পুলিসে না ধরিয়ে আমার উপায় নেই—

এইবারেও অনুকম্পা আশা করেছিলাম, তাই আবারও আঁতকে উঠতে হল।—

কেন ? উপায় নেই কেন ?

আর আপনার স্ত্রীর কাছেও না গিয়ে উপায় নেই—

কেন ? কেন ?

সদানন্দবাবুকে ধরব কি করে, তাঁর নামে কেস করতে গেলে তিনি তো আর স্বীকার করবেন না যে এ-চিঠি উনি লিখেছেন বা মদের ঝোঁকে আপনার খসড়াটাই পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে শিক্ষা দেওয়া দরকার একটু, আপনি তাঁর বন্ধু—আপনাকে শিক্ষা দিতে পারলেও তাঁর মনে নিশ্চয় লাগবে।

আমি দিশেহারা।— একটুও লাগবে না, এক বিন্দুও লাগবে না, আমি তাঁর সে রকম বন্ধু মোটেই নই, নিরঞ্জন বোস হলেও কিছুটা লাগত হয়তো— তা ছাড়া একজনের ওপর রাগ করে নিরপরাধ নির্দোষ জেনেও আমার গোটা জীবনটা আপনি মাটি করে দেবেন ? আমার ঘর-সংসার আছে, ছেলেপুলে আছে—

মিলি বোস ভ্রূকুটি করে উঠলেন, আপনি নিরপরাধ কিসের, ওই ভদ্রলোক দিনরাত মদে ডুবে থাকেন জেনেও একটি মেয়ের জীবন ব্যর্থ করার জন্যে তাঁর হয়ে আপনি চিঠি খসড়া করে দেন—আপনি তাঁর থেকেও বেশি দোষী !

হাল ছেড়ে চেয়ারেই ঢলে পড়লাম আমি। সেই কাতরতা দেখলে মেয়েছেলে মাত্রেই হাত-পাখা নিয়ে মাথায় বাতাস করতে বসার কথা। কিন্তু এমন নির্মম মহিলা জীবনে আর দেখি নি। বুকের ভিতরটা শুকনো কাঠ হয়ে গেছে আবার।

আর আশা নেই হয়তো, তবু এভাবে নিজের তাজা জীবন বিসর্জন দিতে কে পারে ? শেষ চেষ্টায় বুকের সমস্ত আকূতি ঢেলে দিয়ে বললাম, আমার না লিখে উপায় ছিল না, আমাকে বিনা নোটিসে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওই বার এ, কিড্ন্যাপ করা হয়েছিল বলতে পারেন—না লিখলে ওঁরা আমার জীবনান্ত করতেন, মদের পিপেয় চোবাতেন আমাকে ধরে—তা ছাড়া ওই লেখার আদ্যোপান্ত ওঁরাই ফরমাইশ করে লিখিয়েছেন, আমি শুধু কানে শুনে লিখে গেছি— অত ভালো ভালো বাংলা শব্দের ব্যবহার আমার জানাই নেই।

মিলি বোস খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। আমার অন্তিম প্রতীক্ষা।

একটু চা খাবেন ?

হকচকিয়ে গেলাম একেবারে।—....... চা...... মানে চা ? শোনামাত্র অভিমান যেন বুক মুচড়ে গলা ঠেলে উঠে এল।— চা খাব না, আপনি কি করবেন না জেনে আমি এখানে জলস্পর্শও করতে পারব না।

মিলি বোস স্মরণ করিয়ে দিলেন, এই একটু আগেই তো আমার জলের গেলাসটা খালি করেছেন। তারপরে ভাবলেন একটু, একটা শর্তে আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি......

আমি নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলাম। যে সংকটে পড়েছি, এক মানুষ খুন করতে না বললে আর সবই পারি বোধ হয়।—বলুন কি শর্ত, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।

প্যাঁ-ক্ করে আবার টেবিলের কলিং বেল টিপলেন তিনি।—একটু চা খান।

চা খাওয়ার শর্ত। আনন্দে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, একটু কেন, অনেক খেতে রাজী আছি— দশ পেয়ালা বারো পেয়ালা, যত পেয়ালা বলবেন।

বেয়ারাকে মাত্র দু পেয়ালা চা আনতে হুকুম করে মিলি বোস মুখখানা বিরক্তিতে ভরাট করে তাকালেন আমার দিকে।—চা খাওয়াটা শর্ত নয়, শর্তের কথা পরে বলছি, তার আগে একটু চা খেয়ে নিন।

চায়ের বদলে বসে বসে আমি খাবি খেতে লাগলাম ; বেয়ারা দুই-এক মিনিটের মধ্যেই দুজনকে দু পেয়ালা চা দিয়ে গেল। উনি ধীরে সুস্থে চা পান করতে লাগলেন, আমি অনেক আগেই পেয়ালা শেষ করে অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছি।

চায়ের পেয়ালা এক ধারে সরিয়ে রেখে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি সদানন্দবাবুর সঙ্গে বাজি ধরেছেন কখনও ?

এ আবার কি উদ্ভট প্রশ্ন ! —বাজি ! কিসের বাজি ?

উনি কথায় কথায় বাজি ধরতে ভালবাসেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা কলছিলাম........।

ধৈর্য রাখা কঠিন।—কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?

কি করতে হবে ভালো মত সেটা বুঝে উঠতেই সময় লাগল একটু। অথচ মিলি বোস বেশ সহজ সরল আর স্পষ্ট ভাবেই ব্যক্ত করেছেন কি করতে হবে। একটুও রেখে ঢেকে বলেন নি, একটুও দ্বিধা করেন নি। সবটা শোনার পর আর ব্যাপারটা বোধগম্য হবার পর নির্বাক অনড় অবস্থা আমার। বোবা বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি। তিনি স্থির নেত্রে।

আমার স্তব্ধ প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ্য করে শান্ত গম্ভীর মুখে বললেন, আমি কাল থেকে ঠিক এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারি, এর মধ্যে পারেন ভালো। না যদি পারেন, আট দিনের দিন এ-চিঠি নিয়ে প্রথমে আমি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।

নিশ্চেতন মস্তিষ্কে চেতনার ঘা পড়ল একটা।

তার পর যাব থানায়।

নড়েচড়ে বসলাম।

তারপর কোর্টে।

কিন্তু এ তো ব্ল্যাকমেল। আমার মুখ দিয়ে একটা আর্তনাদের মত বেরিয়ে। এল কথা কটা।

হ্যাঁ। নির্বিকার মুখে মেনেই নিলেন তিনি।—এ-রকম ব্ল্যাকমেল-এ ক্ষতি কিছু নেই। আপনি রাজী আছেন কিনা বলুন, আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

আবারও ফুলস্পীড পাখার নীচে বসে ঘামতে শুরু করেছি। ফুটন্ত কড়া থেকে জ্বলন্ত আগুনে। ঢোক গিলে বললাম, কিন্তু এ তো বেশ খরচেরও ব্যাপার...ওই দুই ভদ্রলোকও সব সময় ঘোষালের সঙ্গেই থাকেন।

গম্ভীর মুখেই হাতব্যাগ খুলে মিলি বোস গোটাকতক একশ টাকার নোট বার করলেন। তার থেকে প্রথমে একটা, পরে একটু ভেবে দুটো নোট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, আপনি উপকার করবেন, আপনাকে খরচ করা কেন, ধরুন—। কাল থেকে এক সপ্তাহ সন্ধ্যার দিকে আমি বাড়ি থাকব—আপনি টেলিফোন করবেন। তারপর একটু আশ্বস্তই করলেন যেন, আপনার কিছু ভাবনা নেই, সাহস করে এগোলেই দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে—তাঁকে আমি চিনি। আচ্ছা, নমস্কার।

কখন টাকা নিয়েছি, কখন উঠে এসেছি, কখন ট্রামে বা বাসে চেপে বাড়ি এসেছি কিছুই স্মরণ নেই। স্ত্রী পর্যন্ত বিশেষ ব্যতিক্রম দেখে কপালে বুকে হাত দিয়ে গা পরীক্ষা করলেন, তারপর সন্দিগ্ধ নেত্রে নিরীক্ষণ করলেন, তারপর ধমকে উঠলেন, কি হয়েছে বলছ না কেন, বোবা হয়ে গেলে নাকি?

মাথা নেড়ে জানালাম বোবা হই নি।

দুটো দিন নিষ্ক্রিয় কেটে যেতে আমার চমক ভাঙল। সর্বনাশ! দু-দুটো দিন চলে গেল। আর পাঁচ দিন মাত্র। আত্মানং সততং রক্ষেৎ—আত্মরক্ষা তো করতেই হবে।

রক্ষা শেষ পর্যন্ত হোক না হোক, চেষ্টা না করে উপায় নেই।

অনেক জীব প্রতিদিন একই সময়ে একই জায়গায় জল খেতে যায় নাকি। মানুষ রঙিন জলের তৃষ্ণায় ঘাট বদলায় কিনা জানা নেই। তবু আগের সেই বার-এর কাছাকাছিই অদৃশ্য হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। অদৃশ্য হয়ে অর্থাৎ একটা পানের দোকানের অল্প আলোর ওধারে দাঁড়িয়ে। বার-এর জোরালো আলোয় চেনা মানুষও চেনা যাবে না এইটুকু ভরসা।

সশঙ্ক এবং উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা।

যাক্, ওই চেনা গাড়ি শেষ পর্যন্ত! সদানন্দ ঘোষালের গাড়ি। শরীরের মধ্যে উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল একটা। গাড়ি থেকে ঘোষাল নামলেন, পিছনে নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদাররা। বার-এ ঢুকলেন তাঁরা, তার পর হৃষ্টচিত্তে তিনজনে ওপরে উঠতে লাগলেন।

বেশ খানিকক্ষণের ধুকধুকুনি। পায়ে পায়ে ভিতরে ঢুকলাম আমিও। সৌভাগ্যক্রমে নিচেই টেলিফোন ঘর। নম্বর ডায়েল করতে মিলি বোসই ধরলেন টেলিফোন। বললেন, ঠিক আছে, আপনার কিছু ভয় নেই।

টেলিফোন করে এলাম না চুরি করে এলাম যেন। পা দুটো খানিক কাঁপল ঠকঠক করে। কিন্তু প্রাণের দায় বড় দায়, পা কাঁপলে চলবে কেন? অতএব কাঁপুনি থামিয়ে আর মুখে হাসি টেনে সিঁড়ি ধরে পায়ে পায়ে ঊর্ধ্বপথে।

আমায় দেখে সদানন্দ ঘোষাল উৎফুল্ল, আর সঙ্গী দুজন অবাক। কৈফিয়তের সুরে বললাম, এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনার গাড়ি দেখে ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই—চিন্তা তো কম নয়, চিঠির জবাব পেলেন?

ঘোষাল প্রথমে আপ্যায়ন করলেন, বসুন বসুন—আমাকে একটু ভালোইবাসেন দেখছি তা হলে। পরে চিন্তিত মুখে বললেন, না, জবাব তো রোজই আশা করছি...চিঠি পেয়ে কান্নাকাটি করছে কি না তাই বা কে জানে!

আগে লক্ষ্য করে নিলাম, পেট-মোটা ব্যাগটা সঙ্গে নেই। কিছুটা নিশ্চিন্ত। ইতস্তত করে বললাম, চিঠিখানা ঠিক ঠিক পাঠানো হয়েছে তো, মানে ওই ইয়ের ঝোঁকে তেমন হয়তো হুঁশ ছিল...যদি ঠিকানা লিখতে বা অন্য কিছু ভুল হয়ে থাকে...।

বলেন কি মশাই। সদানন্দবাবু বিস্মিত, এ খেয়ে বেহুঁশ হই ভাবেন নাকি?

নিরঞ্জন বোস একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বার করলেন গলা দিয়ে, আর বিনয় তালুকদার অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অর্থাৎ, কেন বিরক্ত করতে আসা।

কিন্তু আমি মরীয়া। ঘোষালের কথারই জবাব দিলাম, মাত্রা বেশি হলে হুঁশ তো থাকেই না, সেই জন্যেই বলছিলাম—

বোস খেঁকিয়ে উঠলেন প্রায়, বেশি মাত্রায় একদিন খাইয়েই দেখুন না হুঁশ থাকে কিনা, এত বাজে কথাও বলেন!

ঘোষাল মিটি মিটি হাসছেন।

আবার বাজে কথাই বলতে হল।—বাজে কথার সমর্থনে বিনীত নজির পেশ করলাম

একটা, আমি একজন খুব শক্ত লোককে দেখেছিলাম কিনা...চার পেগ না কি বলে—খেয়ে চেয়ার ছেড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, এক পাও আর নড়ার ক্ষমতা নেই।

ঘোষাল সহাস্যে ঘোষণা করলেন, বেশ তো নিরঞ্জনবাবুর কথা মত খাইয়েই দেখুন—চারের জায়গায় আট সাবড়ে দিয়ে গটগট করে হেঁটে নিচে চলে যেতে পারি কিনা—

অভিনয় কখনও করি নি, কিন্তু অবিশ্বাসের হাসিটুকু বোধ হয় জোরালোভাবেই মুখে ফুটে উঠেছিল।—হ্যাঃ, না পারলে মাঝখান থেকে টাকাগুলোই জলে যাবে আমার।

অবাক হয়ে দেখলাম, মিলি বোস মিথ্যে বলেন নি। ঘোষাল নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন।—বাজি? আট কেন দশ খাব—না পারলে ডবল দাম দেব।

খেয়ে হেঁটে নিচে চলে যাবেন? আমি যেন রূপকথা শুনছি।

বললাম তো বাজি, আসুন—

খানিকটা যেন লোভেই পড়ে গেলাম। এর ওপর নিরঞ্জন বোস ইন্ধন যোগালেন।—লেখকের নতুন অভিজ্ঞতা হোক না একটা, কিন্তু দশের খরচা শুনলে যে ফীট হবেন মশাই!

কিছুটা রাগে আর কিছুটা ঝোঁকের মাথায় পকেটে হাত ঢোকালাম। দুখানা একশ টাকার নোটই হাতে উঠে এল। পকেটে কিছু আছে কিনা তাই দেখে নিলাম আর কি।

নিরঞ্জন বোস প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন, বিনয় তালুকদারও গোল গোল চোখ করে দেখতে লাগলেন। তারপর একটা ছোটখাটো আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

বয়! বয়! বো-অ-য়!

তকমা-পরা বয়ের দ্রুত আগমন এবং অর্ডার গ্রহণ। বোস জানিয়ে দিলেন, দরজার ওধারেই এখন বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাকে অবস্থান করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ ঘোষালের সঙ্গে বটে। কিন্তু অন্য দুজনও একেবারে শুকনো যাচ্ছেন না। ওদিকে ঘোষাল এক রাউণ্ড করে শেষ করছেন আর হাসিমুখে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। বোস আর তালুকদারের অপরিমিত উৎসাহ। খেলার মাঠে আপন দলটিকে উৎসাহ দেবার মত করে একবার গ্লাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স-কলরবে টেবিল চাপড়ে ঘোষালকে প্রেরণা যোগাচ্ছেন তাঁরা।

ছ রাউণ্ডের মাথায় সদানন্দ ঘোষালের হয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। একবার হাত থেকে পড়ে আর একবার হাতের ঠেলায় দুবার দুটো গেলাস ভেঙেছেন। বেয়ারা গ্লাস বদলে দিয়ে গেছে। সবেতেই হাসছেন তিনি, গেলাস ভাঙতে দেখেও আর গেলাস বদলে দিতে দেখেও। সেই আনন্দ-বিহ্বলতায় কখন কোন্ ভাষায় কথা কইছেন তিনি ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।

আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। গা হাত পা ঘুলোচ্ছে কেমন। তবু ঘোষালকে উত্তেজিত করার জন্যেই সাত রাউণ্ডের মাথায় সংশয়ের ইন্ধন যোগাতে হল, আমার টাকা যায় যাক আপনি হার স্বীকার করলেই হবে—

ঘোষাল চোখ পাকিয়ে বললেন, হাম দশ খায়েংগা, বো—!

বয় এল।

এক সাথ্ তিন লাগাও !

আদেশ পালন করে বয় প্রস্থান করতে তিনি এক চুমুকেই তারও অর্ধেকটা সাবাড় করে দিলেন। তারপর গুনগুন করে গান করলেন একটু, দু লাইন কবিতা আওড়ালেন। সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে দেশলাইয়ের খোঁজে পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে পকেট খুঁজে পাচ্ছেন না দেখে এক টানে জামাটাই খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে তার মধ্যে হাত গলালেন। অর্থাৎ পকেটটাকে শায়েস্তা করে নতুন পকেট বানিয়ে তার মধ্যে হাত ঢোকালেন।

বোস আর তালুকদার সহাস্যে তারিফ করলেন। কিন্তু যা খুঁজছেন অর্থাৎ দেশলাইটা হাতের কাছেই টেবিলের ওপর পড়ে ছিল এবং আছে। তাই দেখে তিনজনেই মহাখুশী আবার। বোস বললেন, এটাও বেশ রসিকতা জানে দেখছি।

ঘোষাল দেশলাই জ্বালালেন, এদিকে ঠোঁটের ঝোলানো সিগারেট কখন যে মুখ থেকে পড়ে গেছে খেয়াল নেই। ফলে নিজের হাতের জ্বলন্ত কাঠির আগুনে নিজেরাই মুখাগ্নি গোছের হয়ে গেল। প্রথম যন্ত্রণায় বিরক্ততে মুখ কুঁচকে ফেললেন, তারপর, এটা যে বিশ্বাসঘাতকতার যুগ সেই প্রসঙ্গে টেনে টেনে ছোট একটু বক্তৃতা করলেন। নিজের সঙ্গে নিজেই বিশ্বাসঘাতকতা করছে মানুষ, বাপ মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কোন ছার। যুগের এমন অবনতির কথা ভেবে দু চোখ ছল ছল করে এল তাঁর। বোস আর তালুকদারও বিমর্ষ।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে বললাম, ওটুকু থাক সদানন্দবাবু, এবারে চলুন যাই—।

জবাবে আর এক চুমুকে গেলাস খালি করে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।—ভাবছেন চলতে পারব না, কেমন ? গটগট করে হেঁটে নিচে নেমে যাবার কথা তো ? চলুন—

বিল চুকিয়ে তাড়াতাড়ি অনুসরণ করে দেখি পা গুনে গুনে ঘোষাল সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন। পায়ে করে মাটি মাপার মত করে। পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, ধরব একটু ?

ঘোষাল আমার ফন্দিটাই ধরে ফেলেছেন যেন। হেসে বললেন, আমাকে বাজি হারাবার মতলব ? ইচ্ছে করলে নাচতে নাচতে চলে যেতে পারি আমি, বুঝলেন ?

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নাচতে নাচতেই সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে এক আছাড়।

বোস দৌড়ে ধরতে গেলেন। ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ধমকেই উঠলেন তাঁকে।—জিততে দেবেন না নাকি ! ঠিক আছে—

উঠে সিঁড়ির রেলিং ধরে নামতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসে আবার পা হড়কাল, খাড়া থেকে ধপ করে বসে পড়লেন—রেলিংটা ধরা ছিল বলে রক্ষা। এবারে টলতে টলতে তালুকদার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন ধরতে।

ঘোষাল ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, ঠিক আছে !

টেনে টুনে দাঁড়ালেন আবার। বুক টান করেই দাঁড়ালেন। কিন্তু সিঁড়ির এবারের বিশ্বাসঘাতকতার বোধ করি তুলনা নেই। ওই বিশাল দেহ নিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে ! আশ্চর্য, তবু হড়গোড় ভাঙল না।

টেনে হিঁচড়ে সদানন্দ ঘোষাল আবারও উঠে দাঁড়িয়েই হতভম্ব। আমরাও।

সামনে দাঁড়িয়ে মিলি বোস। তাঁর দুই চোখে সাদা আগুন।

ঘোষাল বললেন, ঠিক আছে—।

আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে মিলি বোস নিরুত্তাপ-কণ্ঠে বললেন, কতটা সোনা হয়ে গেছ তাই দেখতে এসেছিলাম।

সদানন্দ ঘোষাল বললেন, ঠিক আছে।

—আপনার জন্যেই। আপনি অপয়া। কথা নেই বার্তা নেই হুট করে বাজি ধরতে গেলেন। এমনিতে তো এক পয়সাও গলে না হাত দিয়ে। বাজি না ধরলে এমন কাণ্ড হত? ঘোষালদা আছাড় খেতেন? নাকি রাগের মাথায় মিলি বোস আর একজনকে বিয়ে করে বসত। ঘোষালদার বুক ভেঙে গেল, ভালোবাসার এমন অপমান কি বাংলাদেশে আর কখনও হয়েছে। ছবির নায়িকা হিসাবেই কি মিলি বোসকে কোন দিন আর পাওয়ার আশা থাকল? আর এই সব কিছুই আপনার জন্য, আপনিই দায়ী শুধু আপনি—আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।

নিরঞ্জন বোস আরও কত কি বলেছিলেন মনে নেই।

লজ্জায় আমি অধোবদন হয়েই বসেছিলাম। যতটা বলতে পারলে জ্বালা জুড়োয় বলে এমন করে তিনি প্রস্থান করেছেন যে আর বোধ হয় জীবনেও আমার মুখদর্শন করবেন না। তিনি চলে যেতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। পকেটে তখন এক বিষম জিনিস নিয়ে বসে আমি। মিলি বোসের (এখন মিত্র) একখানা খামের চিঠি। একটা শব্দ মাত্র লেখা, ধন্যবাদ। সেই সঙ্গে উপহার একটা। আমার হাতের লেখা ঘোষালের সেই চিঠির খসড়া। গৃহিণীকে লুকিয়ে ওটার দাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে।

মাস দুই বাদে।

সকালে বোস আর তালুকদার এসে হাজির আমার বাড়িতে। ভেবেছিলাম আর তাঁরা আসবেন না। এলেন বলে আমি খুশি। কিন্তু এসেই তারা পাঁচটা টাকা বার করতে বললেন। ভালো ফুলের তোড়া আর ফুলের মালা কেনা হবে। বড় মর্মান্তিক খবর শোনালেন তাঁরা। সেদিনের বিকেলের বোম্বাই মেলে সদানন্দ ঘোষাল বিলেত যাচ্ছেন—বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবেন। বোস আর তালুকদার হাওড়া স্টেশনে যাচ্ছেন তাঁকে সী-অফ করতে, আমাকেও যেতে হবে, ইত্যাদি।

হাতে তখনও সময় প্রচুর। টাকা নিয়ে তালুকদার তোড়া আর মালা কিনতে বেরিয়ে গেলেন। বোস বিগত দু মাসের দুর্ভাগ্যের সমাচার নিবেদন করলেন।

মিলি বোসকে হারিয়ে সদানন্দ ঘোষালের বুকখানা নাকি ভেঙে গুঁড়িয়েই গিয়েছিল বলতে গেলে। তাঁর সেই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ক্লারা দেবী। তাঁরই সান্ত্বনায় আর আশ্বাসে বুক বেঁধে ঘোষাল আবার ব্যবসায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। মনপ্রাণ দিয়েই ঝাঁপিয়ে ছিলেন তিনি। সেই ঝাঁপানোতে আগ্রহ ছিল উদ্দীপনা ছিল সংকল্প ছিল।

মিলি বোস গেছে—কিন্তু টাকা রোজগার করে বুড়ো বাপকে দেখিয়ে ছাড়বেন তিনি, আর দূর থেকে তাই দেখে মিলি বোসেরও যাতে চোখ টাটায় সেই ব্যবস্থাও করবেন।

কিন্তু মাঝখান থেকে প্রথমেই দুশমনি করেছে তাঁর চটের আফিসের সেই সাহেব ম্যানেজার—সাহেব না কচু! কোথা থেকে কত টাকা যে হাত সাফাই করে হাতিয়েছে ঠিক নেই, আর ঘোষালদার সেই মিলি বোস হারানোর ব্যথার সময় কত চেকও যে চোখে ধুলো দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে তারও হদিশ নেই।

তবু সব লোকসান ঘাড়ে নিয়ে সত্যিকারের পুরুষের মতই ব্যবসায় মেতে উঠেছিলেন সদানন্দ ঘোষাল। অতটাই প্রেরণা যুগিয়েছিলেন ক্লারা দেবী।

কিন্তু শুধুই কাজ কত আর করতে পারে মানুষ, বিনা আনন্দে মানুষ বাঁচে?

তাই এক শনিবারের রাতে নির্দোষ আনন্দ আহরণেব উদ্দেশ্যে দমদমের এক বাগানবাড়িতে কাটিয়ে আসতে গিয়েছিলেন সকলে মিলে। খুব হৈ হুল্লোড় আর আনন্দেই কেটেছিল রাতটা। সে আনন্দের স্মৃতি ভোলবার নয়। ক্লারা দেবী একাই একশ, হাসি-খুশিতে ভরপুর করে রেখেছিলেন সকলকে। ছবিতে নামবেন বলে ফুর্তি করে নানা ঢংয়ে ছবিও তুলেছেন ঘোষালদার সঙ্গে। কোনোটা রাগের ছবি কোনোটা বেদনার ছবি, কোনোটা বা ঘোষালদার প্রতি ছদ্ম-বিদ্বেষের ছবি। প্রত্যেকটা ছবিতেই চমৎকার চমৎকার পোজ নিয়েছিলেন।

কিন্তু বিশ্বাস বোধ হয় এ-যুগে কাউকেই করা উচিত নয়। বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ক্লারা দেবীও।

উপহারের নাম করে পর দিনই সেই সব ফোটোর কপি আদায় করেছেন ঘোষালদার কাছ থেকে। তার পরেই তাজ্জব-কাণ্ড! কোথাকার কে এক ফিরিঙ্গি রেজিস্ট্রি চিঠি ঝেড়ে বসেছেন। ক্লারা দেবী নাকি তাঁর স্ত্রী। সারারাত নাকি তাঁর স্ত্রীকে জোর করে দমদমের বাগান বাড়িতে আটক করে রাখা হয়েছিল, তাঁর ওপর নির্যাতনের চেষ্টাও হয়েছে—তাঁকে অপমান করা হয়েছে, আর মদ খেয়ে ফুর্তি করে তাঁকে নিয়ে ছবি তোলা হয়েছে। একজন ভদ্রমহিলাকে এ-ভাবে অপমান করা, সারা রাত আটকে রাখা, হেনস্থা করা এবং তাঁর সঙ্গে অপমানকর ছবি তোলার জন্য তিনি ক্রিমিন্যাল কেস করতে যাচ্ছেন—প্রমাণ সহ ঘোষালের এই দুষ্কৃতির সংবাদ সমস্ত কাগজেও তিনি প্রকাশ করবেন বলে শাসিয়েছেন।

আর হুকুম করেছেন, ঘোষালের যদি কিছু বলার থাকে, দুদিনের মধ্যে তিনি যেন চিঠির ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

সদানন্দ ঘোষাল দেখা করতে বাধ্য হয়েছেন—সঙ্গে বোস আর তালুকদারও ছিলেন। গিয়ে দেখেন সেই সাহেব ম্যানেজার, ক্লারা দেবী আর তাঁর ফিরিঙ্গি স্বামীও প্রস্তুত। সেই দিনই তাঁরা প্রমাণ সহ ঘোষালদার বাবা ব্যারিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন জানালেন।

তারপর, সংক্ষেপে, বিশ হাজার টাকা লেগেছে তাঁদের মুখ বন্ধ করতে আর ছবি কখানা ফেরত নিয়ে আসতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ওই সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে যে হারাণ বিশ্বাসের দেখা হয়েছিল সেটা কেউ জানতেন না। ফলে ফৌজদারী মামলা আর লোকলজ্জা বাঁচলেও বাড়ির মামলা এড়ানো গেল না। হারাণ বিশ্বাস দ্বিগুণ রং ফলিয়ে ঘোষালদার বাপকে জানিয়েছেন সব।

এদিকে বুড়ো ব্যারিস্টার ঘোষাল ছেলের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে ভালো করে বোঝাপড়া করে ওঠার আগেই আর এক কাণ্ড, বরাত খারাপ হলে কোনো কাজই আর নির্বিঘ্নে হয়ে ওঠে না। চারদিক থেকে লোকসান খেয়ে সামলে ওঠার আশায় একটা ভালো প্ল্যানই করেছিলেন সদানন্দ ঘোষাল। রাতারাতি ব্যবস্থা করে চটের গুদোমে আগুন লাগিয়ে ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ওপর দিয়ে লোকসানটা পুষিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এমন তো কতই হয়, কটা আর ধরা পড়ে। কিন্তু ঘোষালের সব দিকেই কপাল মন্দ এখন। কি করে যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। সদানন্দ ঘোষাল উল্টে চিটিং কেস-এ পড়ে গেলেন। চিটিং কেস, আরও কি-সব কেস। বুড়ো ব্যারিস্টার ঘোষাল তদ্‌বির করে আর ঘর থেকে কিছু খেসারত দিয়ে সব ধামা চাপা দিয়েছেন।

তারপর বাপের সঙ্গে ছেলের বোঝাপড়া।

ব্যারিস্টার ঘোষাল মুখে আর ছেলেকে কিছু বলেন নি। কাগজে-কলমে পাকাপাকিভাবে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করার ব্যবস্থায় মন দিয়েছেন। কিন্তু ঘোষালদাও তেমনি বাপের ব্যাটা। নিজের আর সামান্য যা কিছু অবশিষ্ট ছিল কুড়িয়ে নিয়ে বিলেত চলে যাচ্ছেন। আজ সেই যাত্রার দিন। সদানন্দ ঘোষাল নাকি বলেছেন, আমাদের মত বন্ধুদের জীবনে তিনি ভুলবেন না—ফিরে এসে আবার এই বন্ধুদের নিয়েই নতুন করে কাজ করবেন তিনি। আর চটের কাজ নয়, কাউকে চটানোর কাজও নয়—শিল্পের কাজ আর শিল্পীর কাজ।

যথাসময়ে মালা আর তোড়া নিয়ে বিষণ্ণ বদনে আমরা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত। সদানন্দ ঘোষাল তখনও আসেন নি। আমরা প্ল্যাটফরমএ পায়চারি করছি, আর সত্যিকারের এক বন্ধুর বিদায়মুহূর্ত কল্পনা করে আরও বিমর্ষ হয়ে উঠছি।

বোম্বাই মেল এক বিরাট অজগরের মত ফুঁসছে আর এক ধার থেকে যাত্রী পেটে পুরছে। আমাদের ঘোষালদাকেও পুরবে।

কিন্তু ঘোষালদার তখনও দেখা নেই। ভাবছি, কি ধীর স্থির মানুষটি—বিলেত যাবেন, তাতেও ব্যস্ততা নেই।

যতই সময় এগিয়ে আসছে, ততই উদ্‌গ্রীব আমরা। ঘোষালদার এখনও দেখা নেই কেন!

বোম্বাই মেল আমাদের নাকের ডগা দিয়ে আর বিমূঢ় চোখের ওপর দিয়ে ঘষঘষিয়ে চলে গেল। মালা আর তোড়া হাতে আমরা তিনজন হাঁ করে দাঁড়িয়ে। বোস-তালুকদার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

প্রত্যাবর্তন। আমারই বসবার ঘরে।

নড়বড়ে টি-পয়ের ওপর মালা আর তোড়া রেখে বোস-তালুকদার ধুপ ধুপ বসে পড়লেন। বোস বললেন, চা করতে বলুন ভালো করে, মাথায় কিছু ঢুকছে না।

আমি উঠতে গিয়ে দেখি টি-পয়ের নিচে শৌখিন একটা রঙিন খাম পড়ে। ডাকে এসেছে। ওপরে বেশ মক্স-করা প্রজাপতি নির্বন্ধের ছাপ।

কার আবার সময় ঘনাল।

খুলে দেখি, বুড়ো ব্যারিস্টার ঘোষালের নাম-স্বাক্ষরিত নেমন্তন্নের চিঠি। তাঁর অমুক বন্ধুপ্রতিমের দ্বিতীয়া কন্যা অমুকের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সদানন্দ ঘোষালের বিয়ে।

আমার পরে বোস পড়লেন।

তারপর বিনয় তালুকদার।

কিছুক্ষণের নির্বাক বিস্ময়। নিরঞ্জন বোসই শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন প্রথম। টি-পয় থেকে মালা আর তোড়া তুলে নিয়ে বিনয় তালুকদারকে আহ্বান জানালেন, চলুন শিগগির—।

কিছু না বুঝেই বাকি মালা আর তোড়া হাতে বিনয় তালুকদার উঠে দাঁড়লেন।

সহজ উদ্দেশ্যটাও আমার কাছে স্পষ্ট নয় দেখে নিরঞ্জন বোস বিরক্ত মুখ করে বললেন, ঘোষালদাকে কংগ্র্যাচুলেট করতে হবে না?

মালা আর তোড়া হাতে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা।

খেয়াল হতে দেখি, হাতল-ভাঙা চেয়ার আমি একা বসে।

সদানন্দ ঘোষালের গল্প

দ্বিতীয় সর্গ

ভোর না হতে একটা হট্টগোল চেঁচামেচির রেশ কানে আসছে।

আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি শুধু আলো-বাতাস আটকাবার জন্যে নয়, আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ওই দুর্বোধ্য শব্দ-ব্রহ্মকে প্রতিরোধ করতে চাইছিলাম। তবু ভোরের এই ঘুমের মায়া তরল হয়ে আসছে। ডেকময় একটা ব্যস্ততার আভাস পাচ্ছি। দূরে দূরে বিভিন্ন ভাষায় কলকাকলিও বাড়ছে। মনে মনে ঘুমের আশা জলাঞ্জলি দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

সঙ্গীদের অবস্থাও যে আমারই মত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে-যাঁর কম্বল আঁকড়ে পড়ে আছেন। আমার পাশে যিনি শয়ান, অর্থাৎ, সদানন্দ ঘোষাল কম্বল বর্জন করলে তাঁর সদানন্দ হাঁকডাকে বাকি কজনকেও উঠে বসতে হত। অন্য দুই জনের ঘুম ভেঙে থাকলেও সদানন্দবাবুর জাগার অপেক্ষায় নিশ্চল হয়ে আছেন মনে হয়। কারণ দলের নেতাকে সর্ব ব্যাপারে নেতৃত্বদানে তাঁদের আপত্তি নেই। তাই আশায় আশায় মুখ থেকে কম্বল সরাতে পারছি না আমিও। এই ভোরের ঘোরে আর কিছুক্ষণ

যদি কেটে যায়।

কিন্তু ডেকের এদিকটাতেই এবারে লোকজনের শশব্যস্ত পায়ের শব্দ আর কাঠ-কাঠ ইংরেজি বুলি বেশি শোনা যাচ্ছে। কাঠের ওপর ভারী পায়ের ধপ্ ধপ্ শব্দ কানে বাজছে। ফার্স্টক্লাস ক্যাবিনযাত্রী ছাড়া অন্য যাত্রীদের ডেকের এদিকটায় আসার কথা নয়। কিন্তু সে-রকম যাত্রী তো মাত্র আমরা এই কজন। অন্তত কাল রাত্রি দুটো পর্যন্ত তাই ছিলাম। এরই মধ্যে আবার কে এল?

কম্বলের ভিতর থেকেই কান খাড়া করলাম একটু। আদেশ নির্দেশ এবং ব্যস্ততার আভাস থেকে বোঝা গেল, এঁরা জাহাজের কর্মচারী হবেন। জাহাজ ছাড়ার তোড়জোড় চলছে। হঠাৎ খেয়াল হল, জাহাজ ছাড়ার কথা সকাল পাঁচটায়। কিন্তু এখনও ছাড়ে নি যখন, পাঁচটাও বাজে নি। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল আরও। রাত দুটোয় শুয়েছি, তিনটের আগে ঘুম আসে নি। খোলা সমুদ্রের বুকে শুয়ে রাতের গভীরে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই পুরনো আকাশটাকেই দেখেছি চেয়ে চেয়ে মনে আছে। আর পাঁচটা না বাজতে এই!

পায়ের শব্দ বাড়ছে, গমগমে ইংরেজি হুঙ্কারও ঠাস ঠাস করে কানে এসে লাগছে। কম্বলের তলা থেকে ভাবছি, ওই অসহিষ্ণু দরাজ গলা সম্ভবত ক্যাপ্টেনের। এক-একটা সাঙ্কেতিক ধ্বনি খুব সম্ভব একটা চোঙের মধ্য দিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, নইলে এমন আওয়াজ হয় কি করে?

ঘট ঘট ঘটাং, ঘট ঘট ঘটাং...

ধুপ ধাপ আওয়াজ, শশব্যস্ত কল-গুঞ্জন, কড়া কড়া ইংরেজি গর্জন।

নোঙর উঠল। জাহাজের ভোঁ শব্দে সুখ-তন্দ্রার শেষ আশ্বাসটুকটুও খান খান হয়ে গেল। জাহাজ নড়েচড়ে উঠল, ডাইনে বাঁয়ে দুলতে লাগল। তবু আমার সঙ্গীদের, বিশেষ করে সদানন্দ ঘোষালের সাড়া-শব্দ নেই।

কাল রাতে অবশ্য তাঁর কিছু দুর্গতি গেছে। কিন্তু তাঁর পাল্লায় পড়ে সে তো সকলেরই এক অবস্থা আমাদের। ভাবলুম, মুখ থেকে কম্বল সরাই এবার। কিন্তু জাহাজের দোলানিটা বেশ লাগছে। তন্দ্রা আসছে আবার। মনে হল, সঙ্গীরাও এই আশাতেই স্থাণুর মত পড়ে আছেন এতক্ষণ। ভোরের বাতাসে দুলতে দুলতে জাহাজ চলবে, গণ্ডগোলও কমবে, নতুন করে তখন ঘুম জমে উঠতে আর বাধা কোথায়! আমিও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পথ অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

এমন একটা পরিবেশে একটুখানি ঘুমের জন্য এমন হ্যাংলামি অনেকের চোখে বিসদৃশ ঠেকতে পারে। কিন্তু খোলা সমুদ্রের বুকে ক'দিনের ঘুম-পোড়া চোখে ভোরের বাতাসের মায়া সকলে আর জানবেন কি করে? সবে তো পাঁচটা বাজল, যা দেখার চার দিন ধরেই তো দেখব এর পরে। তা ছাড়া কাল রাতেই বোধ করি ধকল গেছে সব থেকে বেশি। এই দ্বীপের রাজ্যে এসে পর পর কটা দিনের মধ্যে রাতের কটা ঘণ্টা ছাড়া দেহ আর বিশ্রাম পায় নি। ওঁদের মতে বিশ্রাম মানেই তো সময় নষ্ট। রাতের ঘুমও বর্জন করতে পারলে খুশি হন সঙ্গীরা।

গতকাল সমস্ত দিন জঙ্গলে ঘোরাঘুরির পর হোটেলে এসে শোনা গেল, বিভিন্ন দ্বীপের উদ্দেশ্যে চারদিনের জন্য আজই ভোর রাতে ছেড়ে যাবে এই ছোট্ট জাহাজ। শোনা মাত্র বিপুল দেহ নিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন সদানন্দ ঘোষাল। বললেন, চলুন বেরিয়ে পড়া যাক তা হলে।

শুনে একমাত্র আমিই চুপসে গিয়েছিলাম। কিন্তু স-কলরবে প্রস্তাব সমর্থন করে উঠলেন সঙ্গীরা। হৃষ্টপুষ্ট সদানন্দ ঘোষাল আড়ে আড়ে তাকালেন আমার দিকে। নিরীহ মুখে টিপ্পনী ছুঁড়লেন, লেখক কি বলেন, তবিয়তে কুলোবে?

সঙ্গীরাও মিটি মিটি হাসছেন আমার দিকে চেয়ে। কিন্তু না কুলোলে রক্ষা নেই। ওঁরাই তাহলে নাজেহাল করে ছাড়বেন আমায়। কারণ এ যাত্রায় সদানন্দ ঘোষাল শুধু কর্ণধার নন, গৌরী সেনও। ঘোরাঘুরির খরচা-পত্র সব তাঁর। অতএব শরীরের দোহাই দিয়ে এ আমন্ত্রণ বরবাদ করে দিলে এর পর দ্বীপে বাস দ্বীপান্তরের মত হয়ে উঠবে। সদানন্দ ঘোষালের অমিত উৎসাহী প্রধান সাগরেদ নিরঞ্জন বোস প্রচ্ছন্ন হাস্যে দু চোখ উচিয়ে আছেন না তো যেন ঝকঝকে খাঁড়া উঁচিয়ে আছেন একখানা। এসব জায়গায় লেখক নিয়ে আসার বিড়ম্বনাটা অনেক বারই স্পষ্ট ঘোষণা করে ফেলেছেন তিনি।

দোষের মধ্যে আমি তাঁদের সঙ্গে ধুতি আগলে পাহাড়ে উঠেছি হয়তো একটু বেশি সন্তর্পণে, জঙ্গলে ঢুকেছি হয়তো মাঝখানটা দখল করে আর সমুদ্রে নেমেছি হয়তো হাড়ভাঙা ঢেউগুলোর দিকে একটু বেশি নজর রেখে।

নিরঞ্জন বোসের চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, বেরিয়ে পড়াই তো উচিত, নইলে আবার তো সাত দিন জাহাজের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে।

আনন্দের কলধ্বনি উঠল আবার। হোটেল থেকেই টেলিফোনে ক্যাবিন রিজার্ভ করা হয়ে গেল। চার দিন কালাপানিতে ভাসার জন্য স-সমারোহে ছোটখাটো প্রস্তুতি চলতে লাগল। এক ঘণ্টার মধ্যে সদানন্দ ঘোষাল আবার ঘোষণা করলেন, ভোর পাঁচটায় জাহাজ ছাড়বে, এত মালপত্র নিয়ে দু মাইল ঠেঙিয়ে মেরিনে পৌঁছে তার আগে জাহাজে উঠব কি করে? অতএব, তাড়াতাড়ি রাতের খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র নিয়ে সোজা গিয়ে জাহাজে উঠে বসে থাকা যাক। রাতটা জাহাজেই নিশ্চিন্তে কাটবে।

নিরঞ্জন বোস তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, তাই তো যেতে হবে, নইলে কাল আর যাব কি করে!—ওহে বিনয়, খানসামাটাকে খবর দিয়ে রেখেছে তো আমাদের তাড়াতাড়ি খেতে দেবে—নইলে ব্যাটার তো আবার নড়তে চড়তে তিন দিন!

কর্তৃত্বের দিক থেকে বিনয় তালুকদারের পোজিশন নিরঞ্জন বোসের পরেই। তিনি বললেন, ও ব্যাটাকেই তো খুঁজছি। সপ্রতিভ মুখে চটি ফট ফট করতে করতে খানসামার উদ্দেশে গেলেন তিনি।

মনে হল, আজ রাতই জাহাজে গিয়ে থাকতে হবে সেটা আমি ছাড়া আর সকলেই জানতেন। এই না জানাটুকু বোধ করি আমার চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

কারণ সদানন্দ ঘোষাল উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন, আজকালকার লেখকদের কি শুধু ঘরের মধ্যে কলম নিয়ে বসে থাকলেই চলে। দেখুন মশাই, জীবনটাকে ভালো করে দেখে নিন।

নিরঞ্জন বোস একটা অনুকম্পার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন শুধু, মুখে কিছুই বললেন না।

যাক, লটবহর নিয়ে রাত্রি সাড়ে আটটা না বাজতে জাহাজের ক্যাবিনে এসে ঢুকেছি। আমাদের সেই ব্যস্ততা দেখলে অনেকেরই মনে হত জাহাজ ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই বুঝি। ক্যাবিনের মধ্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। পাঁচ জনের লটবহর কম নয়, অন্য কোনো লোকজনের সাড়া-শব্দ নেই। নিজের অজ্ঞাতে বেশ একটু রোমাঞ্চ জাগছে। সদানন্দ ঘোষাল আর নিরঞ্জন বোস বেরিয়ে গেলেন নিঝুম জাহাজখানা প্রদক্ষিণ করতে। জাহাজের কর্মচারীরা রাতের মত মেরিনেই কোথাও আশ্রয় নিয়েছেন নিশ্চয়। ডাঙা পেলে তাঁরা জলে থাকতে যাবেন কোন বৈচিত্র্যের আশায়?

যদিও প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শয্যা-ব্যবস্থা আছে, তবু যে কজন আছি তার তুলনায় ক্যাবিনটা অপরিসর মনে হচ্ছিল। আমি মনে মনে প্যাঁচ কষছি, কোন বাঙ্কটা দখল করা যায়, ওপরের না নিচের, এ-ধারের না ও-ধারের।

সদানন্দ ঘোষাল এবং নিরঞ্জন বোস ফিরলেন। ঘোষাল বললেন, এখানে এই খুপরির মধ্যে থাকব কেন—ওপরে খাসা ফার্স্টক্লাস ডেক, চারিদিক খোলা—হাত পা ছড়িয়ে তোফা নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো যাবে।

নিরঞ্জন বোস বৃথা বাক্যব্যয় না করে তাঁর হোল্ড-অল বগলে নিয়ে প্রায় প্রস্থানোদ্যত হলেন। অর্থাৎ এখানে রাত কাটানোর কথা তিনি ভাবতেও পারেন না, আর কেউ আসুক না আসুক তিনি একাই ডেকে চললেন।

ক্যাবিন তালা বন্ধ করে যার যার হোল্ড-অল কাঁধে নিয়ে ওপরের ডেকে চলে আসতে হল সকলকেই। এখানে বিছানা ছড়িয়ে অবশ্য ভালোই লাগল। ভাবছি এবারে আলো নেভালেই পরিবেশ-মহাত্ম্যটুকু জমে উঠবে আরও। কিন্তু ঘোষাল সত্যিকারের ছন্দপতন ঘটালেন এবার। বললেন, এখন ঘুমোনোর কোনো মানে হয় না, আসুন রামি খেলি, আন্দামানে এসে ভালো করে এক দিনও এখানকার ন্যাশানাল গেম খেলব না এ কেমন কথা?

এই দ্বীপের রাজ্যে তাসের এই খেলাটাই চালু বটে খুব। উঁচু-নিচু, মেয়েপুরুষ সবাই খেলে। এক কথায় ভদ্রগোছের জুয়া খেলা। আমরা যাকে 'ফিশ' খেলা বলি, অনেকটা তাই। এতদিন আমাদের মধ্যে এই খেলার প্রতি কারোরই টান দেখি নি খুব। নেহাত জলে-বৃষ্টিতে হোটেলে আটকে গেলে অন্যান্য হোটেলবাসীদের আমন্ত্রণে খেলতে হয়েছে। কিন্তু সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর এখানে এই সময়ে খেলার প্রস্তাব শুনেই আমার দুই চক্ষুস্থির। করুণ নেত্রে তাকালাম নিরঞ্জন বোসের দিকে। জবাবে তিনি আমারই উদ্দেশ্যে কড়া গলায় বলে উঠলেন, মশাই, ঘুমটা দিনকতক কলকাতার জন্যে শিকেয় তুলে রাখুন না—এ রকম জায়গায় এসেও আপনার ঘুমুতে ইচ্ছে করে।

বিনয় তালুকদার ক্যাবিনে চলে গেলেন তাস আনতে। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল তাঁর উৎসাহ যেন কিছুটা স্তিমিত।

সেই রামি খেলা চলেছে রাত্রি দুটো পর্যন্ত। সদানন্দ ঘোষাল হারছেন, থামবে কি করে খেলা। আর হারছেন বেশ নিরঞ্জন বোসও। রাত দুটোর সময়ে শেষে বলতে হল, সব পয়সা ফেরত নিয়েও রেহাই দিন, এখন আর পারছি না।

খেলা বন্ধ করে ঘোষাল বললেন, আচ্ছা, দেখা যাবে কাল।

ঝোঁকের মাথায় যে যাই করুন, শরীর তার মাশুল নেবেই। কাজেই কার ইচ্ছে করে এমন দুর্গতির পর সকাল না হতে সাত তাড়াতাড়ি উঠে বসে থাকতে। জাহাজের দোলানির সঙ্গে সঙ্গে চোখে আবার ঘুম জড়িয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু সে বোধ হয় মাত্র মিনিটকতকের জন্য। তার পরেই বিরক্তিতে কম্বলের নিচে দু চোখ মেলে তাকাতে হল আবার। পায়ের কাছে ডেকের বেঞ্চিতে বসে দরাজ গলায় জটলা শুরু করেছেন কারা।

কাংস্য কণ্ঠটি বোধ করি জাহাজ ছাড়ার আদেশ-নির্দেশ দিচ্ছিলেন তাঁর। অর্থাৎ ক্যাপ্টেনেরই হবে। জোরে জোরে কথা বলছেন আর হা হা করে হাসছেন। আর, আর-এক জনের গলা ইংরেজির শব্দ-সমুদ্রে যে তরতরিয়ে চলেছে—এদিকে সেদিকে যেদিকে খুশি। ইংরেজি লোকটার মাতৃভাষা নয় বোঝা যায়, স্পষ্ট ভারতীয় কণ্ঠস্বর—কিন্তু রসিয়ে মজিয়ে ওই বিদেশি ভাষা অর্নগল বলে যাওয়ার ক্ষমতা আছে বটে। কথা নয় তো, যেন শব্দের খই ফুটছে। গত রাত্রিতে কোনো ক্লাবের রোমাঞ্চকর পরিবেশ নিয়ে গল্প হচ্ছে বোঝা গেল। রামি খেলতে বসে কার বউয়ের সঙ্গে কার ঝগড়া বেঁধে গেল, ডিনারে বসে সেই মহিলার হাতের ধাক্কায় একজনের কোলে জলের গ্লাস উল্টে কি কাণ্ড ঘটল, আর তাই দেখে মহিলার উদ্দেশ্যে বক্তা নিজে কি টিপ্পনী কাটলেন—সেই গল্প। সত্যি কথা বলতে কি, গল্প নয়, বলার ধরনটুকু আমার ভারী ভালো লাগছিল।

শুনতে শুনতে বক্তার সঙ্গীরা উৎকট শব্দে হা হা করে হেসে উঠলেন মাঝে মাঝে। আমরা এতগুলো লোক পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছি সামনে, অন্তত চেষ্টা করছি ঘুমুতে, সেদিকে হুঁশই নেই লোকগুলোর।

এমনি হাসির মাঝে একটা বাজখাঁই বিরক্তি নির্ঘোষিত হল আমার পাশ থেকেই, এই খেলে যা!

তাড়াতাড়ি কম্বল সরিয়ে দেখি, আষ্টেপৃষ্ঠে কম্বল জড়ানো অবস্থাতেই একেবারে উঠে বসেছেন সদানন্দ ঘোষাল।

সামনের বেঞ্চিতে চারজন লোক বসে। ব্যাজ-আঁটা ধপধপে নাবিকের পোশাক। জাহাজের পদস্থ কর্মচারী সকলেই বোঝা যায়। একজন ক্যাপ্টেনই বটেন, তাঁর পাশে বোধ করি তাঁর সহকারী। ক্যাপ্টেনের গায়ের রং আবলুস কাঠের মত। অন্য দুজন কে বোঝা গেল না। একটু হকচকিয়ে গিয়ে তাঁরা সকলেই দৃষ্টিপাত করেছেন সদানন্দ ঘোষালের মুখের ওপর।

ওদিকে উঠে বসলেন নিরঞ্জন বোসও। বললেন, দিলে ব্যাটারা ঘুমের বারটা বাজিয়ে,

মরার আর জায়গা পেলে না।

আমাদের বক্তব্য ওদের বোধগম্য হবার কথা নয়, কিন্তু উপলব্ধি হল বোধ হয়। ক্যাপ্টেন দু-চার মুহূর্ত তাঁর লালচে চোখ দিয়ে যেন মেপে নিলেন আমাদের। পরে সদানন্দ ঘোষালের দিকেই চোখ ফেরালেন আবার। ইংরেজিতে বললেন, গুড মর্নিং, তোমরা ঘুমুচ্ছ কি এখনও, অ্যাঁ?

বলেই গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন তিনি। কুচকুচে কালো মুখে মুক্তোর মত দু পাটি দাঁত ঝকমকিয়ে উঠল। নিরঞ্জন বোস বলে উঠলেন, আর কোথাও গিয়ে হেসে মর গে যাও না,এখানে কেন?

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন, পার্ডন?

ঘোষাল জবাব দিলেন, তোমার হাসিটা ওর খুব ভালো লেগেছে। ক্যাপ্টেন আর এক দফা হেসে উঠলেন।

বেঞ্চির একেবারে ধারের লোকটিই সম্ভবত এতক্ষণের সেই অনর্গল-ভাষী বক্তা। ছিপিছিপে ধারালো চেহারা, চোখেমুখে বুদ্ধির ছটা। আমাদের দেখছেন আর হাসছেন মুখটিপে। ক্যাপ্টেন পরিচয় দিলেন নিজের এবং সকলের। তৃতীয় লোকটি এই জাহাজের নবাগত চিফ এঞ্জিনিয়ার এবং চতুর্থ লোকটি অর্থাৎ বুদ্ধিদৃপ্ত সেই ধারালো সুবক্তাটি হলেন মিঃ বুশি—এই জাহাজেরই বিদায়ী চিফ এঞ্জিনিয়ার। ক্যাপ্টেন জানালেন, অনেক বড় জাহাজে চিফ এঞ্জিনিয়ারের পদে বদলী হয়েছেন উনি। পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে এটা তাঁর 'প্লেজার ট্রিপ।'

বুশির পরিচয় দেবার সময় ক্যাপ্টেনের শ্রদ্ধার অভিব্যক্তিটুকু লক্ষ্য করলাম। লোকটিকে দেখলাম আবার, ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হবে। মনে মনে ভাবলাম, এরই মধ্যে উঠেছে তো কম নয়।

ক্যাপ্টেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন, মিঃ বুশি, সেই বর্মি বুড়ির ঘুমের গল্পটা এঁদের শুনিয়ে দাও।

বুশি তাঁর সুরেলা গলায় সোৎসাহে গল্প শুরু করে দিলেন তৎক্ষণাৎ। কড়া আফিম টেনেছিল এক বর্মি বুড়ি পোর্টব্লেয়ারে জাহাজে উঠে। যাবে শেষ মাথায়, অর্থাৎ ডিগলীপুর। চার দিন বাদে জাহাজ ফিরে পোর্টব্লেয়ারে ঘুরে আসতে বুড়ি জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করল, জাহাজ ছাড়বে কখন?

আবারও গল্পের থেকে বলার ঢংটাই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করল। অট্টহাসি থামিয়ে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরাও রাতে আফিঙ টানো নি তো?

ঘোষাল ইংরেজিতে জবাব দিলেন, টেনেছিলাম, তোমার হাসির তোড়ে নেশা কেটে গেছে, ওই বুড়ি নিশ্চয় তোমার হাসি শোনে নি।

তাঁর এবারের হাসিটা আমাদেরও হাসির খোরাক হল। আনন্দাতিশয্যে উঠে এসে ঘোষালের পিঠ চাপড়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

চায়ের পর্বে এই দলটির সঙ্গে আরও খাতির হয়ে গেল আমাদের। মিঃ বুশি চায়ের আসরে গল্প জমালেন আবার। এর পর সর্ব ব্যাপারেই দেখা গেল কথা বলার নেতৃত্ব

ওই মিঃ বুশির। লোকটির সজীব বাক্‌পটুতার তুলনা নেই। সকলেই শ্রদ্ধাবান এঁর প্রতি।

বলতে বাধা নেই, আমিও আকৃষ্ট হয়েছি। নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ তাঁর, তাই গল্প শোনার মত অঢেল সময়ও পাওয়া গেল। মাঝ সমুদ্রের ঢেউয়ে আমাদের ছোট্ট জাহাজ খেলনার মত উঠছে নামছে।

সেই ঢেউয়ের প্রসঙ্গে আটলান্টিক সাগরের পঁয়ত্রিশ ফুট ঢেউয়ের বর্ণনা শুরু করলেন বুশি। ঝড়ের প্রসঙ্গে বললেন, ঝড়ের মুখে লোহিত সাগরে তের দিনের পথে জাহাজ ভেসে যাওয়ার মৃত্যু-কণ্টকিত কাহিনী। জাহাজ-ডুবির প্রসঙ্গে শুনলাম প্রশান্ত মহাসাগরের লাইফ বোটে বিয়াল্লিশ দিন ভেসে থাকার রোমহর্ষক বিবরণ। সবই নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী বুশির। এ ছাড়া শার্ক পরপয়েজ প্রমুখ জলজ প্রাণীর গল্প, বিচিত্র শামুকের(শেল) গল্প, মানুষ-মারা জারোয়াদের গল্প, এমন কি খেলাধুলোর গল্পেও তাঁর জুড়ি নেই দেখলাম।

ফল বিপরীত দাঁড়াল।

এক নৌকোয় দুই নেতা কুলোয় না। সদানন্দ ঘোষাল ভিতরে ভিতরে চটতে লাগলেন তাঁর ওপর। আড়ালে টিকা-টিপ্পনী কাটতে লাগলেন। মন্তব্য শোনা গেল, ব্যাটা যেন দিগ্‌গজ ভগবান, কোন অভিজ্ঞতাই আর বাকি নেই।

এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক অস্বস্তি শুরু হয়েছে আমার। থেকে থেকে সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠছে। কলকাতা থেকে এরোপ্লেনে সাত ঘণ্টায় উড়ে এসেছিলাম আন্দামানে। সামুদ্রিক আলোড়ন কাকে বলে টের পাই নি। অবস্থা ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়তে লাগল, বার দুই উদ্‌গিরণও করতে হল পেটে যা ছিল। মিঃ বুশি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে এক শিশি নেবুর আচার আর এক বোতল লিমন স্কোয়াশ নিয়ে এলেন। বললেন, পেট খালি রেখো না, হরদম খাবে আর ঘুরবে।

ঘোষালের দিকে এক গেলাস লিমন স্কোয়াশ এগিয়ে দিতে তিনি জবাব দিলেন, তোমার মত অত অভিজ্ঞতা না থাকলেও একেবারে ননীর শরীর নয় আমার— বোতলটা ওঁর জন্যেই রাখো।

ওঁর জন্যে অর্থাৎ আমার জন্যে। বুশি ঘোষালের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার তাকত আছে।

ঘোষাল জবাব দিলেন, একটু-আধটু।

পানীয় প্রত্যাখ্যান করলেন নিরঞ্জন বোস এবং বিনয় তালুকদারও। কিন্তু তালুকদারের দিকে চেয়ে মনে হল তাঁরও দৈহিক সমাচার কুশল নয় খুব। আমার দিকে চেয়ে সংক্ষিপ্ত হুল ফোটালেন নিরঞ্জন বোস, নাম ডোবালেন একেবারে।

দুপুরে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। বিকেলের দিকে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে দেখি ডেকে বুক ফুলিয়ে হাঁটা-চলা করছেন সদানন্দ ঘোষাল আর নিরঞ্জন বোস। এক কোণে শুকনো মুখে বসে আছেন বিনয় তালুকদার। বোতলের লিমন স্কোয়াশ আরও খানিকটা কমেছে কি করে তাঁকে দেখে অনুমান করা গেল। গোটা দুপুরের বারতা শুনলাম তাঁর

মুখে। বুশির বিরুদ্ধে বোস আর ঘোষালের একতরফা রেষারেষি বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। বুশির সঙ্গে রামি খেলে হেরেছেন ওঁরা দুজন। তাই ভিতরে ভিতরে বেশ চড়ে আছেন।

কিন্তু বুশির হাসি-খুশির ব্যতিক্রম দেখলাম না একটুও। হাসছেন, টগবগিয়ে কথা বলছেন, শরীর অসুস্থ হয় নি বলে প্রশংসা করছেন বোস-ঘোষালের। কিন্তু এঁরা দুজন মাঝে মাঝে বাংলায় ঠেস দিতে ছাড়ছেন না, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও করে উঠলেন। বুশি সঠিক বুঝতে না পেরে থেমে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাচ্ছেন তাঁদের দিকে।

জবাবে আমরা যা হোক কিছু গোঁজামিল দিচ্ছি। বুশি হেসে উঠছেন তাতেই।

বিকেল না পেরুতে জাহাজে দস্তুরমত এক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া গেল। মুখের কথা থেমে গেল সকলেরই। চোখ আটকে গেল দূরে ডেকের এক দল বর্মি নারীর দিকে। এই দলটিকে সকাল থেকেই দেখেছি আমরা। সকলেই মাঝবয়সী, বুড়িও দু-চারজন আছে। প্রত্যেকের আধময়লা বেশ-বাস আর মুখে মোটা-মোটা চুরট রীতিমত দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। চুরট খেতে খেতে তারা গল্প করেছে, নয় তো পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে।

কিন্তু এদেরই অদূরে এ কাকে দেখা গেল! এ কোত্থেকে হঠাৎ জল ফুঁড়ে এসে উদয় হল।

আর একটি মেয়ে। বর্মি মেয়েই। বছর বাইশ-চব্বিশ হবে। রীতিমত অভিজাত বেশ-বাস। নিটোল স্বাস্থ্য। দুই গালে যেন হলদে আর লালে মেশানো দুটো কাশ্মীরী আপেল বসানো। বেশ একটু ব্যবধানে দাঁড়িয়ে স্বজাতীয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। আমাদের নির্বাক দৃষ্টি অনুধাবন করে বুশিও ঘাড় ফেরালেন। পরে হালকা হেসে বললেন, মেয়েটিকে তোমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে দেখছি।

ছন্দপতন ঘটালেন। ঘোষাল চোখ রাঙিয়ে উঠলেন, তুমি বলতে চাও তোমার পছন্দ হয় নি?

বুশি জবাব দিলেন, খুব! অভিজাত বর্মি মেয়েদের গুণের ব্যাখ্যা শুরু করে দিলেন বুশি। কত ভালো ওরা, কত শাদাসিধে ইত্যাদি। কিন্তু এমন বৈচিত্র্যের মধ্যে কথা শোনার মত আগ্রহ কারও নেই। নারীবর্জিত এই দ্বীপের রাজ্যে এত সৌন্দর্যের মধ্যেও দু চোখ সকলের শুকিয়ে আসছিল। বলতে বাধা নেই, এই কটা দিন কোথায় যেন নীরস লাগছিল আমারও। তাই কালাপানির এই মাঝদরিয়ায় জাহাজের মধ্যে বেশ যেন ফাল্গুনের বাতাস বইল একপ্রস্থ।

দিব্যি সোজাসুজি ঘুরে বসলেন সকলে। এমন কি বুশিও। নারী-সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণে তাঁরও কিছুমাত্র আপত্তি নেই দেখা গেল। খানিক বাদে মেয়েটির এদিকে চোখ পড়তে বুশি সোজা মাথার ওপরে একখানা হাত তুলে দিলেন তার উদ্দেশ্যে।

মেয়েটি ঈষৎ থমকে গেল যেন প্রথম। পরে খুশিভরা দুই চোখ মেলে আমাদের দলটিকে নিরীক্ষণ করে নিলে। তার পর চোখ ফেরালে।

এদিকে সকলেই আমরা অপ্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছি।

একটু বাদে মেয়েটি চলে গেল সেখান থেকে।

এইবার বুশির উদ্দেশে চোখ রাঙিয়ে মন্তব্য ছুঁড়লে বোস, অভদ্র।

বুশি জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললে?

ঘোষাল জবাব দিলেন, এ রকম করা তোমার উচিত হয় নি, মেয়েটি আমাদের অভদ্র ভেবেছে।

বুশি অবাক। বললেন, আমাদের ভালো লাগলে ওর তো ভালো লাগার কথা, অভদ্র ভাববে কেন?

অন্য দিকে চেয়ে বোস ঝাঁজিয়ে উঠলেন, দাঁত বার করতে হবে না, মেয়েটাকে তাড়িয়ে ছাড়লে।

যাক, এর পরেই একটা নিঃশব্দ খোঁজাখুঁজি চলল। কোথায় কোন ক্যাবিনে আছে মেয়েটি, কোন পর্যন্ত যাবে, সঙ্গে কে আছে, ইত্যাদি। কিন্তু সেদিনের মত আর বাইরে দেখা গেল না তাকে। রাতে রামি খেলার আসর বসল ক্যাপ্টেনের ঘরে। কত রাত পর্যন্ত খেলা চলেছিল জানা নেই। কারণ সে রাতটা নির্বিঘ্নে ঘুমুতে পেরেছিলাম।

পর দিন সকালে বোস হন্তদন্ত হয়ে খবর দিলেন, ব্যাটা এক নম্বরের ঝানু—দিব্বি জমিয়েছে মেয়েটার সঙ্গে, ইঞ্জিনের দিকের রেলিংয়ের ধারে কথাবার্তা কইছে দুজনে।

একটা কর্তব্যের গাম্ভীর্য নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঘোষাল। বললেন, চলুন দেখে আসি।

কিন্তু তার আগেই দেখা গেল বুশি সহাস্যে এদিকেই আসছেন। বোস বললেন, ব্যাটা আমাকে দেখে সরে এল।

দরাজ গলায় বুশি জিজ্ঞাসা করলেন, আজ মাছ ধরা হবে তো?

সেই রকমই প্রোগ্রাম ছিল আজ। ঘোষাল জবাব দিলেন, তুমি তো সেই চেষ্টাই করছিলে এতক্ষণ শুনলাম।

বুশি থতমত খেয়ে গেল প্রথম। তার পরেই হেসে উঠল হা হা করে। প্রাণখোলা হাসি। তার পর ঘোষালের পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন, তুমি রসিক বটে মিস্টার।

বলা বাহুল্য, এ প্রশংসাও ঘোষালের ভালো লাগল না খুব।

যেমন জমবে ভেবেছিলাম মাছ ধরা, ঠিক তেমনটি জমল না এর পরে। বুশির অবশ্য উৎসাহের অন্ত নেই। কিন্তু বাকি সকলের একাগ্রতায় ছেদ ঘটালে সেই বর্মি মেয়ে। দু-চারবার কাছাকাছিও এল, চোখে কৌতূহলের আভাসও দেখা গেল। কিন্তু একেবারে কাছে এসেও দাঁড়াল না। বোসের মতে, ওই অভদ্র লোকটাকে দেখেই এল না, নইলে বাঙালির সঙ্গে কে না খাতির করতে চায়?

যাই হোক, এরপরে বুশিকে চোখে চোখে রাখা এঁদের একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল। এটা যেন একটা পরোক্ষ দায়িত্বের মত। মেয়েটির ক্যাবিনে আর কাউকে দেখা যায় নি যখন, সে একাই চলেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ওই নিম্নশ্রেণীর বর্মী স্বজাতীয়াদের ভরসায় বেরিয়ে পড়েছে বোধ হয়। কিন্তু চুরুট ছেড়ে কলাপাতার নলে আফিঙ টানা ধরেছে যারা, তাদের সঙ্গে যে মেয়েটির কোনো মিল বা কোনো সম্পর্ক নেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঘোষাল তার নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলেছেন।—সাগরিকা। সাগর থেকে উঠেছে।

এই লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যে একমাত্র অমৃতরূপিণী। স্বপ্নের ফুল, জীবনের গায়ে ধরেছে—যৌবনের যাদুতে বিকশিত হয়েছে। সেই ফুল রক্ষা করার দায়িত্ব রূপরসিক মাত্রেরই।

অতএব বুশি চোখের আড়াল হলেই অস্বস্তি অনুভব করছেন এঁরা। কোথায় বুশি ? গেল কোথায় ?

দেখা গেল, ডেকের এক কোণে যে শূকর ধরা চালানি কুকুরগুলো সামুদ্রিক গ্লানিতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে, তাদের শুশ্রূষায় লেগে গেছেন বুশি। নয় তো, এক ধারে যে বড় কচ্ছপ দুটো পড়ে আছে পাথরের মত, তাদের খেতে দিচ্ছেন কিছু। আমরা নিশ্চিন্ত হচ্ছি কিন্তু অবাকও হচ্ছি তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে। রাতের ভাবনা অবশ্য কিছু নেই, কারণ অর্ধেক রাত পর্যন্ত ক্যাপ্টেনের ঘরে তাঁকে রামি খেলায় আটকে রাখছেন স-সঙ্গী সদানন্দ ঘোষাল।

পর দিন বিকেল না গড়তে বোস এবং ঘোষাল ভাবতে লাগলেন, বুশি সম্বন্ধে ক্যাপ্টেনকে কিছু বলা দরকার কিনা। কারণ, তাঁর মতিগতি সুবিধের ঠেকছে না খুব। কিন্তু বলে হবে কি, ক্যাপ্টেন যে-রকম অন্ধ ভক্ত বুশির, হয়তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন। উল্টে এঁদের ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়। তা ছাড়া সব থেকে মুশকিলের কথা, ওই মেয়েটাও যেন একটু প্রশ্রয়ই দিচ্ছে লোকটাকে।

পর দিন সকালে জাহাজ নোঙর করতে নৌকো করে সকলে দ্বীপটা দেখে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম। প্রায় আধ মাইলটাক গেলে তবে দ্বীপে পৌঁছানো যাবে। বড় বড় ঢেউয়ে ছোট নৌকোটা যেন আছাড় খাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে বললাম, নৌকো যদি ডোবে ?

বুশি ঠাট্টা করলেন, যদি ডোবে, সোজা জলের নিচে 'মার-মেড' দের দেশে চলে যাবে, সেখানে গিয়ে সুখে ঘর-করনা করবে।

বুশি আমাদের সঙ্গে আসছেন না দেখে দলের সকলেই বিশেষ চটেছেন। অদূরে দাঁড়িয়ে আমাদের নৌকারোহণ দেখছে সেই বর্মি মেয়েও। ঘোষাল কটূক্তি করে উঠলেন বাংলায়, জাহাজের 'মার-মেড'টিকে তুমি এবার আস্ত রাখলে হয়! ব্যাটা ঝানু দেখেছেন ? আগে একবারও বললে না যে আমাদের সঙ্গে আসছে না।

নৌকোর মধ্যে একটা নিরাপদ আসন নিয়ে বোস বললেন, কিছু গন্ডগোল করেছে বুঝলে ওকে আমি খুন করে এই কালাপানিতে ডোবাব।

নৌকো চলল আছাড় খেতে খেতে। সকলেরই চোখ সেই মেয়ের দিকে। যৌবনের মায়া ছড়িয়ে সকৌতুকে তখন চেয়ে চেয়ে দেখছে আমাদের। দুটি চোখ নয় তো যেন দুটো ভ্রমর বসানো। দেখে কার কার নিঃশ্বাস পড়ল জানা নেই। আমার পড়েছিল।

দ্বীপ থেকে ফিরে এসে বোস এবং ঘোষাল যেন চিরে চিরে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন বুশিকে। কিন্তু বুশির হাসি-খুশিতে কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারলেন না তাঁরা। মেয়েটিকেও দেখা গেল একবার। কিছুই বোঝা গেল না।

সেদিন দুপুরে।

কোনও প্রোগ্রাম নেই। ডেকের এ-দিকটা নিরিবিলি। বোস দেখে এসেছেন বুশি ক্যাপ্টেনের ঘরে আড্ডা দিচ্ছেন। মেঘলা আকাশ। তার ছায়ায় আলকাতরার মত কালো দেখাচ্ছে সমুদ্রের জল। জাহাজ চলেছে কালো জলে সাদা ফেনা কেটে।

হঠাৎ দেখা গেল বেশ একটু তৎপর হয়ে উঠেছেন সদানন্দ ঘোষাল আর নিরঞ্জন বোস। উঠে উঠে বার বার কি দেখে আসছেন তাঁরা।

দেখলাম আমিও।

বেশ খানিকটা দূরে, ডেকের যে দিকটায় একটিও লোক নেই, সেইখানে একেবারে একা শ্লথ ভঙ্গিতে রেলিং-এ ঠেস দিয়ে সমুদ্র দেখছে সেই মেয়ে। খোলা চুল উড়ছে, কাঁধের ওড়না উড়ছে পতাকার মত। উচ্ছল বাতাসে এবং ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যপ্রাচুর্য যেন সর্বাঙ্গে উঁকিঝাঁকি দিচ্ছে। দুর্লভ নারীমাধুর্য এবং দুর্লভ মুহূর্ত।

হঠাৎ সভয়ে দেখলাম, পা টিপে এগিয়ে চলেছেন ঘোষাল আর বোস। ঘোষালের হাতে মুভি ক্যামেরা। ক্যামেরায় চোখ লাগালেন তিনি। বরাবরই বেপরোয়া জানতুম ঘোষালকে, তবু আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল।

কিন্তু হল না। মেয়েটি নড়েচড়ে ঘাড় ফেরাল এবং তার পরেই সচকিত হয়ে উঠল একেবারে। মুহূর্তের বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াল সে।

কিন্তু তারপর, তারপর নয়—সেই মুহূর্তে কি বোমা পড়ল জাহাজে ?

বোমা নয়, ক্যাপ্টেনের অট্টহাসি।

সঙ্গে বুশিও হাসছেন মহা আনন্দে। আর তাই দেখে মেয়েটিও নিজের অজ্ঞাতেই বিব্রত মুখে আবার দাঁড়িয়ে গেছে যেন।

হাসতে হাসতে তরতরিয়ে এগিয়ে এলেন বুশি। বললেন, হেরে গেলে তো মিস্টার, পারলে না, জাস্ট্ ব্যাড লাক্ !

তার পরেই এক দৌড়ে মেয়েটির কাছে গিয়ে সোজা বাহু ধরে টেনে নিয়ে এলেন তাকে। মেয়েটির সলজ্জ বাধা টিকল না। আমরা হতভম্ব আবারও। বুশি কলকলিয়ে উঠলেন, নাও মিস্টার, শ্যুট।

কিন্তু আমাকেও ছবির ভাগ দিতে হবে।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে বুশিকেও ধরে রাখতে চাইল, কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বুশি দৌড়ে চলে এলেন আবার ক্যামেরার কাছে। চিত্রার্পিত বিস্ময়ে লজ্জা-বিড়ম্বিত রমণীর দিকে চেয়ে আছি। ওদিক থেকে দরাজ গলায় ক্যাপ্টেন হাঁক দিলেন, ভদ্রলোকদের নিরাশ করো না মিসেস্ বুশি, ক্যামেরার দিকে তাকাও বলছি।

সেই রাতে আর ডেকে শুলেন না সদানন্দ ঘোষাল। ক্যাবিনে ঢুকলেন। পরদিন বেশ বেলা পর্যন্ত তাঁকে চায়ের আসরে না দেখে চিন্তিত হলাম। বোস জানালেন, হঠাৎ সামুদ্রিক অসুস্থতায় বেজায় কাহিল হয়ে পড়েছেন তিনি। তাড়াতাড়ি দেখতে গেলাম। তিন দিন কাটিয়ে এ রকম হয় শুনি নি।

কিন্তু ক্যাবিনের দরজার কাছেই থমকে দাঁড়াতে হল। বাহুতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন সদানন্দ ঘোষাল। আর বুশি তাঁর শয্যা-পাশে বসে এক হাতে তাঁর পিঠ টিপছেন এবং

অন্য হাতে এক গেলাস লিমন স্কোয়াশ নিয়ে খাবার জন্য সাধাসাধি করছেন। তাঁর সুরেলা গলা শুনতে পেলাম, বলছেন, এ রকম সবারই হয়, তোমার তো সে তুলনায় খুবই তাকত আছে বলতে হবে—এটুকু খেয়ে নিয়ে বারকতক ছোটাছুটি কর আমার সঙ্গে, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তৃতীয় সর্গ

মাঝে মাঝে কাগজের চিত্র-সংবাদে আর সিনেমা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখছি, সদানন্দ ঘোষাল একখানা ছবি করবেন।

আস্ত একখানা ছবি করাটা চাট্টিখানি কথা নয়। নয় বলেই সেকাজ রাশভারী সদানন্দ ঘোষালের দ্বারা অনায়াসে সম্ভব সে-রকম বিশ্বাস বলতে গেলে আমারও ছিল। যেখানে তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি—পাহাড়ে বলুন, সমুদ্রে বলুন, জঙ্গলে বলুন—তাঁর ভাবী ছবির গল্প শুনেছি। গল্প মানে গল্প নয়, পরিকল্পনা। মুভি ক্যামেরা ছাড়া এক পা নড়েন নি কখনও। যেখানে যে দৃশ্য অথবা আদিবাসী মেয়েদের মনে ধরেছে, কিরকির করে ক্যামেরা চালিয়ে দিয়েছেন।

পরে শুনেছি, নমুনা রাখছেন—সবই তাঁর ছবির কাজে লাগবে।

সদানন্দ ঘোষাল ছবি করবেন এক দিন, আর ছবির মতোই ছবি হবে সেটা—সে রকম ধারণা শুধু আমার নয়—ছবির বাজারের স্বয়ং কর্ণধারদের ছিল। গত ক বছর ধরেই প্রযোজক হিসেবে না হোক, ছবির বিচারক হিসেবে, বিশেষজ্ঞ সমালোচক হিসেবে, এবং ছবির নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন পরামর্শদাতা হিসেবে তাঁর নামডাক কম নয়। হাতে নগদ টাকাও মন্দ ছিল না ঘোষালের। তাঁর নিজের হাতে না হোক, তাঁর স্ত্রী করুণাময়ীর হাতে একসঙ্গে চারখানা বই ছবি করার মতো যে নগদ টাকা আছে, সে খবর পরিচিতি শুভার্থীরা অর্থাৎ আমরা অন্তত রাখতুম।

কিন্তু ব্যবসায়ীমহল করুণাময়ী কথা জানবেন কি করে, তাঁদের ধারণা সমস্ত ঐশ্বর্যই সদানন্দ ঘোষালের হাতে। সদানন্দ ঘোষালের হাবভাবেও সেই বিত্তভাবাপন্নতাই প্রকাশ পেত। সেটা আমাদের চোখেও বিসদৃশ ঠেকে নি কখনও—কারণ স্ত্রীর হাতে টাকা থাকা আর স্বামীর হাতে টাকা থাকা একই ব্যাপার।

যাই হোক, নিজের হাতের টাকাটা সদানন্দ ঘোষাল মাঝে মাঝে ব্যবসায়ে খাটাতেন। ব্যবসায় অর্থাৎ, এই ছবির ব্যবসায়। আধখানা ছবি করার পর টাকায় টান পড়েছে, অথবা, সময়ে সময়ে টাকা-ওলা ডিস্ট্রিবিউটার পাওয়া যাচ্ছে না—ছবির রাজ্যে এ রকম অঘটন হামেশা ঘটছে। সেই সব ছবি-নির্মাতারা তখন ত্রাসে দিশাহারা হয়ে টাকার জন্য ছোটাছুটি করতে থাকেন। এই থেকেই সদানন্দ ঘোষালের এত কদর।

কেউ দু লক্ষ টাকার জন্যে আটকে পড়েছেন শুনলেও তিনি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হেসে অভয় দিতে পারেন। যদিও চটের ব্যবসা ফেল পড়ার পর তাঁর নিজের হাতে তিরিশ-চল্লিশ হাজারের বেশি কখনও ছিল বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু সেই তিরিশ-চল্লিশ হাজারাই তিনচার লাখের মতো কাজ দিয়েছে। সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেবার আগে সদানন্দ ঘোষাল নিজে গিয়ে কতটা ছবি তোলা হয়েছে এবং কেমন হয়েছে দেখেন। দেখে নিজের মতামত দেন, প্লট অদল-বদল করেন, আরও কি করতে হবে না হবে শর্ত করেন—তার পর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

টাকায় ঠেকলে ছবি-নির্মাতারা মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। সেই দুঃসময়ে এমন একজন সর্বগুণভাজনের অনুগ্রহের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হতেও প্রায়ই আপত্তি থাকে না তাঁদের।

কিন্তু সদানন্দ ঘোষাল লাখ দু লাখ ছেড়ে নিজের হাতে ওই তিরিশ-চল্লিশ হাজারও কি সবটা খরচ করেন নাকি? দরকার হলে করতেন হয়তো, দরকার হলে স্ত্রীর থেকে চেয়ে নিয়ে লাখ দু লাখও দিয়েই ফেলতেন হয়তো। কিন্তু সেই দরকারটাই শেষ পর্যন্ত আর হয় না কখনও। অন্তত আজ পর্যন্ত হয় নি।

এইখানেই সদানন্দ ঘোষালের সব থেকে বড় বাহাদুরি। আর এই বাহাদুরির জন্য তাঁর নিজেরও যেমন আত্মপ্রসাদ, তাঁর অনুরাগী পার্শ্বচরেরাও তেমনি মুগ্ধ। অমন লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারা, অমন একখানা বাড়িতে (পিতৃসম্পত্তি) থাকেন, অমন একখানা গাড়ি হাঁকিয়ে ঘোরাফেরা করেন—যেখানে গিয়ে দাঁড়ান আর যেখানে গিয়ে বসেন—গোটা পরিবেশ তাঁরই করায়ত্ত।

তার ওপর অনেক কাগজের চিত্রসম্পাদকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব এবং হৃদ্যতা। তাঁদের পার্টি দেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, তাঁদের সঙ্গে এ-দেশের ছবির ভবিষৎ আলোচনা করতে করতে আশা নিরাশায় উদ্দীপিত অথবা হতোদ্যম হয়ে পড়েন।

অতএব টাকার বিড়ম্বনায় আটকে পড়া কোনো ছবির মালিককে সাহায্য করার (স্বার্থের বিনিময়ে) বাসনা হলে এই সব চিত্রসম্পাকদেরও সাহায্য মেলে। অর্থাৎ, এঁদের দুই-এক জনকে ধরে নিয়ে ছবির মালিক সহ সরাসরি সদানন্দ ঘোষাল গিয়ে উপস্থিত হন কোনও নামকরা ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে। ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ থাকুক বা না থাকুক, বাংলা ছবির শুভার্থী হিসেবে সদানন্দ ঘোষালের নামটি নিশ্চয় শোনা আছে তাঁর। কারণ, ইতিমধ্যে অনেক বিপদগ্রস্ত ছবির মালিককে তিনি ভরা-ডুবির হাত থেকে রক্ষা করেছেন—সে সংবাদ লাইনের লোকের কাছে অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তার ওপর আর যাঁদের সঙ্গে নিয়ে আসেন তিনি, অর্থাৎ কাগজের চিত্রসম্পাদকরা— তাঁরা তো যে-কোনো ছবির ভাগ্যোন্নয়ন অথবা দণ্ডমুণ্ডের মালিকরূপে পরিগণিত।

অতএব যেখানেই যান সদানন্দ ঘোষাল খাতির পান।

ঘোষালের কাছেও রাখা-ঢাকা নেই কিছু। সরাসরি প্ল্যান দেন, অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত ছবির কোথায় গলদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি (তাঁর মতে) সেটা ছবির ম্রিয়মাণ মালিকের

সামনেই নির্দ্বিধায় বলে দেন—সেই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য তাঁর কি নির্দেশ সেটা জানাতেও ভুল হয় না। আর, সংশোধনের পরে যোগ্য তত্ত্বাবধানে নির্মাণ-কার্য শেষ হলে সে-ছবি কেমন দাঁড়াবে সে কথা তিনি আর সবটা বলে উঠতে পারেন না। ঈষৎ হেসে শুধু তাকান চিত্রসম্পাদকদের দিকে।

হাব-ভাবে অথবা দুই এক কথায় তাঁরাই তখন পাদপূরণ করে দেন। ব্যবসা করতে বসে ডিস্ট্রিবিউটার সেই সুবর্ণ প্রলোভনের আশা খুব সহজে ছাড়তে পারেন না। তবু, অনেক ছবিতে টাকা আটকে আছে এবং তার ফলে টাকা সংগ্রহ করতে সময় লাগবে বলে কোনো ডিস্ট্রিবিউটার যদি দ্বিধা প্রকাশ করেন—তার জবাবে সদানন্দ ঘোষাল সরাসরি নিজের চেক বই বার করেন পকেট থেকে। খস খস করে দশ পনের হাজার টাকার চেক লিখে দেন ছবির মালিকের নামে। বলেন, এই নিয়ে আপাতত কাজ চালান, এদিকে এঁদের সঙ্গে কন্ট্রাক্টটা হয়ে যাক। ডিস্ট্রিবিউটারকে বলেন, আপনি কন্ট্রাক্ট করে ফেলুন, কোনো ভয় নেই—এর মধ্যে আপনার হাতে টাকা না এলে আরও বিশ তিরিশ হাজার যা লাগে আমিই চালিয়ে দেব।

চালাতে আর হয় না। ওই আশ্বাসেই কাজ হয়।

আর ডিস্ট্রিবিউটারের ভয়ই বা কোথায়? তাঁর টাকা শেষ পর্যন্ত উঠে আসেই। আগে নিজের আসল আর কমিশন উশুল করে নিয়ে তবে তো ছবির মালিককে টাকা দেবার প্রশ্ন। তার ওপর যে ছবির পিছনে এমন একজন লোক, আর কাগজের সম্পাদকরা আছেন। ডিস্ট্রিবিউটার যে-টুকু মুখ শুকোন, ব্যবসায়নীতি হিসেবেই শুকোন। ছবির মালিককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছবি সুসম্পূর্ণ করে দেওয়ার দায়িত্বটা এরপর তিনি ঘোষালের ওপরেই চাপিয়ে দেন। কাজ হাসিল হবার পর এসব দায়িত্ব পালনের বিড়ম্বনায় একটু যেন বিব্রত বোধ করেন সদানন্দ ঘোষাল। তারপর দায়িত্ব নেন।

এই করেই নিজে একখানা ছবির মালিক না হওয়া সত্ত্বেও ছবি নির্মাণের রাজ্যে এত নামডাক আর প্রতিপত্তি সদানন্দ ঘোষালের।

অবশ্য আড়ালে আবডালে দুর্জনরা এ নিয়ে অনেক কানাকানি করে। করবে না কেন, উপকারীর শত্রুতা করাই দস্তুর এই দেশের। তারা বলে, ঘোষালের মতো অমন খরচে লোকের হাতে সর্বদা তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকাই বা থাকে কি করে? নিজের গেলাসের খরচই তো মাসে কম করে পাঁচ শ' টাকা! তার ওপর গুণমুগ্ধ পার্ষদদের নিয়ে এক-একবার অ্যাডভেঞ্চার বেরুতেও কম খরচ নাকি! তাদের ধারণা, সদানন্দ ঘোষাল যাঁদের উপকার করেন ওই টাকা আসে তাঁদেরই হাড়-মাংস নিঙড়ে। প্রতিবাদ করলে তারা ওই সব অনুগৃহীত ছবির মালিকদেরই নজির দেখাবে একে একে—ডিস্ট্রিবিউটার আর ঘোষালের কল্যাণে ছবি করার পর কেউ কাশীবাসী হয়েছেন, কেউ ঘটিবাটি বিক্রী করে সংসার চালাচ্ছেন, আর কেউ নাকি দেনার দায়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ফেলে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন।

কিন্তু এসব কান-লাগানে কথায় আমরা কান্ দিই নে। শত্রু নেই কার—অমন প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেবই কি রেহাই পেয়েছিলেন?

যাক সে কথা, দু-পাঁচজনে যাই বলুক, বাংলা ছবি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী মহলে সদানন্দ ঘোষাল শুধু সুপরিচিত নন, একজন কেউকেটা লোক। শুধু তাঁর মতামত পাবার জন্যেই কত ছবির প্রযোজক তাঁকে ধরে নিয়ে যান ঠিক নেই। আর শুধু আমরা কেন, তাঁর কুবেরদুহিতা স্বরূপিণী বিদুষী স্ত্রী করুণাময়ীর পর্যন্ত ছবির ব্যাপারে অন্তত স্বামীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং মতামতের ওপর গভীর আস্থা ছিল। থাকবে না কেন, দাম না থকলে এত লোক মানুষটাকে ধরে এভাবে টানাটানি করে ?

এই সদানন্দ ঘোষাল স্বয়ং ছবি করছেন এবারে।

ছবি একদিন না একদিন তিনি করবেনই এবং ছবির মতো ছবিই করবেন সেটা সকলেরই প্রায় জানাই ছিল। সকলেরই মানে যাঁবা চেনেন সদানন্দ ঘোষালকে। আমরাও তিন-চার বছর ধরেই জানতুম, ছবি একদিন হবেই। কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবি নি।

এই তাড়াহুড়োর ছোট্ট একটা কারণ অনুমান করতে পারি। গেল বারে এক বিপদগ্রস্ত ছবির মালিককে সাহায্য করতে গিযে সেই প্রথম ছোটখাটো একটা ঘা খেয়েছেন সদানন্দ ঘোষাল। বড় রকমের একটু প্রাপ্তির আশায় আট-ঘাট বেঁধে হাজার পঁচিশ টাকা তিনি দিয়েছিলেন কোনো একটা ছবি নির্মাণের কাজে। ছবির মালিকেরা বলেন, ঘোষালের বিধিব্যবস্থা মতোই কাহিনী অদল-বদল কবে এবং অভিনয় করিয়ে ছবি শো-হাউসে আনা হয়েছিল। ঘোষাল বলেন, তাঁর কথা মতো একটা কাজও হয়নি (হয় নি যে তা আমরা বিশ্বাস করি কারণ ঘোষালের প্রতিভায় আমাদের গভীর আস্থা)।

যাই হোক ফল যা দাঁড়িয়েছিল, সেটুকু বলতে পারি। ছবি মুক্তি লাভ করার তৃতীয় দিনে মাঝামাঝি সময়ে হল প্রায় খালি। বাংলা ছবির দর্শক যেখানে আঠাব হাজার ফুটের ছবি হলেও সহজে উঠতে চান না, সেখানে এই অবস্থা। তার ওপর সকলেই পয়সা দিয়ে একেবারে অহিংসভাবে উঠে চলে যেতে চান নি। এক দল লোকের পরদা ছিঁড়ে দেবার বাসনা উগ্র হয়ে উঠতে হল-এর ম্যানেজার করজোড়ে নিবেদন করেছেন, ওই প্রথম সপ্তাহেই তিনি ছবি তুলে দেবেন। ম্যানেজার কথা রেখেছেন। ফলে ডিস্ট্রিবিউটারের টাকাই চার আনা উশুল হয় নি, সদানন্দ ঘোষাল আর কি পাবেন ? তাঁর পুরোপুরি পঁচিশ হাজারই লোকসান।

কিছুটা লোকসান আমাদেরও। কারণ, ঘোষালের তহবিলে টান ধরলে আমরাও কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করি।

এই লোকসান আর আনুষঙ্গিক দুর্নামের ফলেই ঘোষালের সুপ্ত পৌরুষ পুরাপুরি জেগে উঠেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর ভাগের কাজে যোগ দেওয়া নয়, ওপর ওপর তত্ত্বাবধান করাও নয় আর—গোটা একখানা ছবিই এবারে করবেন তিনি।

সেই ভাবী ছবিরই বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছে।

চিত্রসম্পাদকরা জোরালো ভাবপ্রবণতায় স্বাগত জানিয়েছেন তাঁকে এবং সাফল্য কামনা করেছেন। অনুমান, ব্যবসায় মহলেও বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। দুই-একটা

সিনেমা পত্রিকায় ঘোষালের জীবনী প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন দেখার পর থেকেই ভিতরটা আনচান করছিল, একবার যাই দেখা করে আসি। কি গল্প করছেন, কার লেখা, অভিনেতা অভিনেত্রী কারা, বিজ্ঞাপনে যে কোম্পানির নাম দেখা যাচ্ছে সেটা ঘোষালের নিজস্ব কোম্পানি কিনা—এই সবই জানার জন্য উন্মুখ আমি।

কিন্তু লেখকসুলভ দুর্বলতায় যাই যাই করেও গিয়ে উঠতে পারি নি। সেখানে তো ঘোষাল একাই নয়—সর্বদা সঙ্গে আর যে দুটি বাহু আছেন তাঁর, মনে মনে তাঁদেরও বিলক্ষণ সমীহ করে চলি। দক্ষিণবাহু নিরঞ্জন বোস, বাঁয়েরটি বিনয় তালুকদার। এত দিন বাদে হঠাৎ গিয়ে পড়লে হয়তো ভাববেন, গল্পের ব্যাপারে অনুগ্রহপ্রার্থী। তা ছাড়া সর্বব্যাপারে আমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা নিয়ে সদানন্দ ঘোষালের কটাক্ষ তবু বরদাস্ত করতে পারি, কারণ, তিনি মালিক মানুষ—যাই বলুন হজম করা যায়। কিন্তু ওই দুজনের, বিশেষ করে, নিরঞ্জন বোসের চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি শুনলে অনেক সময়েই আঁতে ঘা লাগে। কিন্তু লাগলেও মুখ বুজেই থাকতে হয়। কারণ, বিদ্যা বুদ্ধি এবং উদ্যমের জোয়ারে আমার মতো লেখককে যে তিনি নাকানি চোবানি খাওয়াতে পারেন, সেটা অন্য লোকে কেন, আমি নিজেও বিশ্বাস করি।

তার ওপর সদানন্দ ঘোষালের সঙ্গে সর্বব্যাপারে তাঁর মতের মিলটা প্রায় আশ্চর্য ব্যাপার। ঘোষালের মুখ দিয়ে কথা বেরুবার আগেই বিস্ময়কর তৎপরতায় নিরঞ্জন বোস তা সমর্থন করতে পারেন। বিনয় তালুকদারও পারেন, কিন্তু বোসের মতো অতটা চৌখস নন তিনি। কিন্তু আমি? আমারও ওঁদের মতো পারার ইচ্ছেটা তো মনে মনে ষোল আনা। নিজের অকর্মণ্যতায় নিজের প্রতিই একটা বিদ্বেষ পুষ্ট হয়ে উঠেছিল আমার মনে।

ভাবছি,...খুব সম্ভব সেটা-এ ছবি পরিচালনার ভার নিরঞ্জন বোসকেই দেবেন সদানন্দ ঘোষাল, আর ফোটোগ্রাফির দায়িত্ব দেবেন বিনয় তালুকদারকে। কারণ ওই দুই ব্যাপারে দুজনেই তাঁরা অভিজ্ঞাতাসম্পন্ন। দুজনেই অনেক বছর ধরে অনেক ছবিতে সহকারীর কাজ করে আসছেন। এ পর্যন্তও তাঁদের সহকারী নাম খণ্ডন হয় নি, তার কারণ এদেশে আইডিয়া-ওয়ালা প্রযোজকের সংখ্যা বড় কম। সবাই গতানুগতিক রাস্তা ধরে চলেন আর সেই আদ্যিকালের লোকদের ধরে ধরেই কাজের ভার দেন।

একমাত্র সদনন্দ ঘোষালই স্বতন্ত্র। তবু এটুকু ভালো করেই জানি, আর জানেন বোধ হয় নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদারও—ঘোষালের ছবির যিনিই পরিচালক হোন, আর যিনিই চিত্রশিল্পী হোন—পরিচালনা চিত্র-গ্রহণ শব্দ-গ্রহণ সম্পাদনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ সম্পন্ন হবে সদানন্দ ঘোষালের ইঙ্গিতে। সব কাজেই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত।

এই সব ভাবনা-চিন্তার মধ্যেই এক অকল্পিত ব্যাপার ঘটল সেদিন। কারা সব দেখা করতে এসেছেন শুনে নীচে এসে যুগপৎ বিস্ময়ে আনন্দে আমি হাঁ। নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদারকে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে স্বয়ং সদানন্দ ঘোষাল এসে হাজির আমার বাড়ি। কি করি, কি বলি, ভেবে অস্থির আমি।

নিরঞ্জন বোস টিপ্পনী কাটলেন, আঙুল ফুলে কলা গাছ যে একেবারে, দেখাই নেই—

নিজের বাড়িতে এটুকু শ্লেষ তুচ্ছ। পরম সমাদরে বসাবার ব্যবস্থা করলাম তাঁদের। তারপর দৌড়ে এলাম স্ত্রীর কাছে। দুটো টাকা ধার করে জলযোগের ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

ঘোষাল বললেন, কাগজে সব দেখেছেন তো?

হ্যাঁ, দেখছিলাম...

বিনয় তালুকদার অসন্তোষ জ্ঞাপন করলেন, দেখেও একবার যেতে পারেন নি?

সদানন্দ ঘোষাল মৃদু মৃদু হাসছেন। বললেন, মহম্মদ পর্বতের কাছে না গেলে পর্বতই মহম্মদের কাছে আসে -

না, এই যাব যাব করছিলাম...। মিষ্টি আসার আগে বিনয় বচনে তুষ্ট রাখার চেষ্টা।

বিরসমুখে অন্যদিকে চেয়ে বসে আছেন নিরঞ্জন বোস, যার শাদা অর্থ আমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতা সীমা ছাড়িয়েছে।

ঘোষালই আলোচনা শুরু করলেন। যাক, আজ থেকেই রোজ দুপুরে আমার বাড়ি আসুন, গল্প নিয়ে অনেক আলোচনা আছে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কার গল্প নিলেন?

এতক্ষণ যেন অনেক সহ্য করেছেন, আর সহ্য করা দায়—সেইভাবেই মুখোমুখি ঘুরে বসলেন নিরঞ্জন বোস। বললেন, দেখুন মশাই, আমার কথাবার্তা তো আপনার ভালো লাগে না—কিন্তু এসব শুনলে চুপ করে থাকি কি করে?

আমার সসংকোচ প্রতীক্ষা। সেই দুরবস্থা দেখে ঘোষালের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। আর ঝাঁঝটা এবারে অনেক ওপর দিয়ে যাবে সেটা বুঝেই বিনয় তালুকদারও নীরব, গম্ভীর।

নিরঞ্জন বোস সকলকেই এক নজর দেখে নিয়ে গলার স্বর নাটকীয় ভাবে নামিয়ে নিয়ে তারপর ক্রমশ চড়াতে লাগলেন।—গল্প কি আপনার গাছের ফল যে পেকে আছে ঝুলে গাছে—হাত বাড়িয়ে টুক করে পেড়ে নিলেই হল। না কি ভাবেন, আপনারা যা লেখেন তারই একটা নিয়ে চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হবে। সে রকম যদি লিখতে পারতেন তা হলে বাংলা ছবির আজ এই দুরবস্থা হবে কেন? শরৎবাবু চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে প্রডিউসার আর ডাইরেক্টরের সেই সুখ গেছে।

যত আপত্তিকরই হোক, এটুকু অন্তত বোঝা গেল, গল্প এখনও মনোনীত অথবা নির্বাচিত হয় নি এবং সেই জন্যেই এঁদের আগমন। অতএব, নিরঞ্জন বোসের কথায় আমার আহত হবার একটুও কারণ নেই। বরং ভিতরে ভিতরে খুশির ভাবটুকু চেপে তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য সমর্থন করলাম।

চা জলখাবার আসতে বোস এবং তালুকদার এই প্রথম সম্ভবত আমার একটুখানি কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পেলেন। তাঁদের দিকে চেয়ে আমিও আশ্বস্ত হলাম।

ঘোষাল কথার মাঝে কথা বলেন না। হাসেন শুধু একটু একটু। নিরঞ্জন বোসের মুখ থামতে তিনি ধীরে-সুস্থে জানালেন, আর সময় বেশি নেই, এরই মধ্যে সব দিক

সামলে কাজে নেমে যেতে হবে। গল্প বাজারে হাজার হাজার আছে—কিন্তু তারই একটা নিয়ে নেমে পড়া আর নিজের হাত-পা বেঁধে নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া একই ব্যাপার। ছবি করার মতো গল্প বাজারে নেই, গল্প তৈরি করতে হবে। তাঁর এবং আর সকলের পরামর্শ মতোই গল্প তৈরি হবে—তবে কলমটা আমার হাতেই থাকবে বটে। এইটুকু পরিশ্রমের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি আমাকে দিতে পারেন।

শুনে আমার বসার আসন আর পায়ের নীচের মাটি দুলে উঠল। ভূমিকম্পের নয়, নাচের দোলার মতো। টাকার অঙ্ক শুনে নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদারও সবিস্ময়ে তাকালেন ঘোষালের দিকে। নিরঞ্জন বোস শেষ পর্যন্ত নিজের কানের ওপর আস্থা রাখতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, কত বললেন, পাঁচ শো না পাঁচ হাজার?

ঘোষাল কনফার্ম করলেন, পাঁচ হাজার...।

সামলে নিয়ে নিরঞ্জন বোস আমাকেই আক্রমণ করলেন ফিরে, হাঁ করে চেয়ে আছেন কি—ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার কোম্পানি নয় এটা—কাজটাই আসল, বুঝলেন? কাজের মতো কাজ হলে এক টাকার জায়গায় দশ টাকা দিতে কেউ আপত্তি করবেন না।

আমি সবিনয়ে চায়ের পেয়ালার চুমুক দিতে লাগলাম।

সেদিনই দুপুর থেকে আলোচনার আসরে যোগ দেবার কথা আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁরা গাত্রোত্থান করলেন। তাঁদের বিদায় দিয়ে আমি উড়তে উড়তে অন্দর-মহলে চলে এলাম।

সমাচার শুনে গৃহিণী দু টাকার খেদ ভুললেন। ধাব নিয়ে শোধ করার কথা যে মনে থাকে না আমার, সেই অভিযোগও মুলতুবী বাখলেন। মুখ দেখেই বোঝা গেল, পাঁচ হাজাব টাকা প্রাপ্তির আনন্দমিশ্রিত দুর্ভাবনাটা চাপিয়ে দেবার ফলে এবারে অনেক অগ্নিউদগিরণ থেকে অব্যাহত পাওয়া যাবে।

নির্দিষ্ট সময়ে ঘোষালের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, শুধু বোস আর তালুকদার নয়—আরও অনেকেরই শুভাগমন হয়েছে সেখানে।

প্রচার সচিব, সম্পাদক, সঙ্গীত-পরিচালক, এমন কি গীতিকার পর্যন্ত। নীচের একটা বড় ঘরে গালচে পেতে দেশীয় প্রথায় অফিস ঘর সাজানো হয়েছে। মোটা মোটা তাকিয়াও আছে অনেকগুলো। আমার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন বোস ঘড়ি দেখলেন। দু-পাঁচ মিনিট আগেই উপস্থিত হয়েছি, অতএব নিরাপদ।

এদিকে খোদ মালিক, অর্থাৎ, ঘোষালই নামেন নি তখনও। শুনলাম, শুধু ঘোষাল নয়, ঘোষালের স্ত্রী করুণাময়ীও নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন এই আলোচনার আসরে। ছবি নির্মাণের এই নবপ্রতিষ্ঠান নাকি স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামে। চিত্রশিল্পী বিনয় তালুকদার নিরঞ্জন বোসের পাল্লা দেবার জন্য অথবা খোদ মালিককে খুশী করার জন্য আমার সঙ্গে যত কড়া ব্যবহারই করুন—ভিতরে ভিতরে ভদ্রলোক তেমন রুক্ষ নন। তাঁর পাশে বসে তাঁর কাছ থেকেই নবপ্রতিষ্ঠানের খবর বার্তা সংগ্রহ করতে লাগলাম।

...মস্ত ব্যবসাদারের মেয়ে করুণাময়ী, কাজেই ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলে সব সময়েই ব্যবসায়ে নামতে রাজী। তা ক্ষেত্রটা এবারে বেশ ভালোই তৈরি করেছেন সদানন্দ ঘোষাল। প্রতিষ্ঠানের নামে করুণাময়ী আপাতত এক লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন। তবে ছবির ব্যাপারে যত বিশ্বাসই থাকুক স্বামীর ওপর, টাকার ব্যাপারে নেই। কাজেই ব্যাঙ্ক থেকে এক কপর্দক তুলতে হলেও স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই চেক সই করতে হবে।

শোনামাত্র নিজের পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনার ওপর কেমন একটা ছায়া পড়ল যেন।

কিন্তু তালুকদারের পরের কথায় সেটা অপসৃত হতে সময় লাগল না। তিনি জানালেন, এর মধ্যে আমারই বরাত নাকি প্রসন্ন, কারণ, গল্পের ব্যাপারে করুণাময়ী আমার অনুপস্থিতিতে কোনো আলোচনায় যোগ দিতে রাজী হন নি। ছবির জন্য যে প্লটই স্থির হোক, আমাকে দিয়ে লেখাতে হবে সেটা নাকি তাঁরই নির্দেশ। সকালে যে তাঁরা সদলবলে আমার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন, সেও নাকি তাঁরই তাগিদে।

মনে মনে মহিলার প্রতি শ্রদ্ধায় ভেঙে পড়তে লাগলাম। ঘোষালের পাঁচ হাজার টাকা ঘোষণার কারণও একটু-আধটু স্পষ্ট হতে লাগল।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এক লাখ টাকায় ছবি হবে কি করে?

অজ্ঞতার বহর দেখে বিনয় তালুকদার হেসে ফেলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন অদূরে নিরঞ্জন বোসের দিকে। বোস অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিলেন, এবারে উঠে সরাসরি কাছে এসে বসলেন।

কি বলছেন?

তালুকদারের সুসময়। জবাব দিলেন, এক লক্ষ টাকায় ছবি হবে কি করে সেই ভাবনায় পড়েছেন ইনি।

বোস চিড়বিড়িয়ে উঠলেন, আপনার থেকে কিছু ধার নেওয়া হবে। উঃফ্... ! কি গল্পই যে লিখবেন মশাই, আপনিই জানেন।

পাছে সুযোগ ফসকায় সেই ভয়ে তালুকদার তাড়াতাড়ি আমার সংশয় ভঞ্জন করলেন, সদানন্দ ঘোষাল এক লক্ষ টাকা খরচা করে ছবি শুরু করে দিয়েছেন শুনলে ডিস্ট্রিবিউটাররা টাকা নিয়ে তাড়া করবে, বুঝলেন?

নিরঞ্জন বোস সব সময়েই তালুকদারের ওপর দিয়ে যান। তিনি বললেন, ডিস্ট্রিবিউটারের টাকা নেবেন কেন ঘোষালদা, টাকার অভাব নাকি! গোটা বইটাই নিজে করার কথা ভাবছেন তিনি। বৌদি বলেছেন ছবি ভালো হলে যত টাকা লাগে তাঁর দিতে আপত্তি নেই। বৌদি অর্থাৎ করুণাময়ী। এই অন্তরঙ্গ কথাগুলো তিনি বোসের কাছে বলেছেন ভেবেই বোধ হয় বড় একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তালুকদার।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ঘোষাল এবং করুণাময়ী এলেন।

তারপর ঘোষাল বাংলা ছবির গলদ প্রসঙ্গে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করলেন। গল্পের গলদ, প্রযোজনায় গলদ, পরিচালনায় গলদ, চিত্রায়ণে গলদ, শব্দগ্রহণে গলদ, সম্পাদনায় গলদ, শিল্পী নির্বাচনে গলদ—ইত্যাদির অজস্র গলদের একটিও তাঁর দৃষ্টি

এড়ায় নি। প্রত্যেকের কাজ কী রকম হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে ঘোষাল স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করলেন। পরিচালনা প্রসঙ্গ নিরঞ্জন বোস অবহিত হয়ে শুনলেন, চিত্রায়ণপ্রসঙ্গ বিনয় তালুকদার। গান কী ভাবে লেখা উচিত গীতরচয়িতাকে সেই নির্দেশ দিতে ভুললেন না ঘোষাল।

সকলেই একটা নীরব প্রেরণা অনুভব করছেন। করুণাময়ী উপস্থিত থাকায় আমার অন্তর আরও ভালো লাগছিল। সার্থক চিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে স্বামীর স্পষ্টভাষণটি তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে বোঝা যায়। যেভাবে শুনছিলেন—তাঁর ভদ্রলোকটি এত সব দিকে মাথা ঘামিয়েছেন এ যেন তিনিও জানতেন না।

অতঃপর আর সকলকে বিদায় দিয়ে আমাদের নিয়ে ঘরোয়া আলোচনায় বসলেন সদানন্দ ঘোষাল। আমাদের বলতে আমি, নিরঞ্জন বোস, বিনয় তালুকদার আর করুণাময়ী। প্রথমেই ঘোষাল জানালেন, বিজ্ঞাপনের জবাবে এ পর্যন্ত কত শিল্পী যে ফটোগ্রাফসহ আবেদন জানিয়েছেন এখন আর তার হিসেবে রাখা যাচ্ছে না। ফটোগ্রাফ দেখে বোস আর তিনি দুজনে মিলে তার থেকে মোটামুটি দশ-বিশটি বাছাই করে নিয়েছেন। আগামীকাল থেকে প্রথম দু-ঘন্টা তাঁদের ইন্টারভিউ নেওয়া হবে—তারপর যথাবিধি অন্যান্য আলোচনা।

ভয়ে ভয়ে বললাম, আগে গল্প ঠিক না হলে আর্টিস্ট সিলেকশন কি করে হবে?

শোনামাত্র চোখ পাকিয়ে ঘুরে বসলেন নিরঞ্জন বোস। বিনয় তালুকদার বিরক্ত। ঘোষাল হাসছেন মৃদু মৃদু। শুধু করুণাময়ীর মুখে সামান্য সমর্থনের আভাস দেখলাম যেন।

ঘোষাল বললেন, আপনি যুদ্ধে যাচ্ছেন—আপনার সৈন্য কারা আর কি দরের জানা থাকলে আপনার সুবিধে হয় না অসুবিধে হয়?

আমি নিরুত্তর। বোস ঘোষালের উদ্দেশে বললেন, কেন সময় নষ্ট করছেন দাদা—। আমার দিকে তাকালেন তারপর, আপনি ফোড়ন না কেটে দাদা যা বলছেন চুপচাপ বসে শুনলে খুশী হব।

কিন্তু মৃদু প্রতিপাদ করলেন করুণাময়ী। স্বামীকে বললেন, তোমার খালি বড় বড় কথা, এটা কি যুদ্ধ নাকি। হলেও, কি যুদ্ধ কোথায় যুদ্ধ কার সঙ্গে যুদ্ধ সেটা তো জানাবে—নাকি সব নিয়ে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়বে। আমার তো মনে হয়, উনি ঠিক কথাই বলছেন, কি ছবি করবে আগে ঠিক কর, তারপর আর্টিস্ট বাছাই কর।

বোস আর তালুকদারের উভয় সংকট। কিন্তু ঘোষাল ঘায়েল হবার পাত্র নন জবাব দিলেন, কখন কি করতে হবে না হবে আমি একটু-আধটু বুঝি—ও নিয়ে তুমি ভেবো না। ভাল একটা বাগান করতে হলে যেখানে যা ভালো চারা পাওয়া যায় নিয়ে আসতে হয়—তারপর সাজানো-গোছানোর চিন্তা। আর্টিস্ট নানা রকমের হ... গল্পকে দশটা নতুন রাস্তায় নিয়ে যেতে অসুবিধে কি?

করুণাময়ী চুপ করলেন, অর্থাৎ মেনেই নিলেন। বোস খুব মিষ্টি করে বললেন, আপনার কথা সবই ঠিক বৌদি, কিন্তু ইনি (অর্থাৎ আমি) যা বলছেন একেবারে

গতানুগতিক ব্যাপার—সে-রকম কিছু তো আমরা করতে যাচ্ছি না।

তালুকদার সায় দিলেন, রাইট— !

অতঃপর আমাকে নিয়েই পড়লেন সদানন্দ ঘোষাল। হেসে বললেন, গল্প নিয়ে ভাবনা নেই, গল্পের কথায় আমি এক্ষুনি আসছি। কিন্তু একটা কথা, আজ পর্যন্ত আপনি কখানা বই লিখেছেন ?

প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝা শক্ত।—তা গোটাকতক হবে...

ঘোষাল বললেন, আমাদের ছবির এই ব্যাপারে একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আপনি যে একখানাও বই লিখেছেন একদম ভুলে যেতে হবে—আপনি যে লিখতে পারেন তাও ভুলে যেতে হবে।

বোস আর তালুকদার সমস্বরে হেসে উঠলেন। হাসলেন একটু করুণাময়ীও। কিন্তু সেটা অকরুণ নয় খুব। ভ্রূকুটিও করলেন তিনি, এভাবে তোমার বলা অন্যায় কিন্তু...।

—এ অন্যায়ের জন্য পরে উনিই সব থেকে বেশি খুশী হবেন।

অতঃপর গল্পের আলোচনা শুরু হল। ঘোষালের মতে অন্যান্য ছবির ফলাফল এবং নজির দেখে গল্প লেখা উচিত। যে ছবিই আজ পর্যন্ত বাজারে একটু-আধটু নাম করেছে সেই ছবিই পুঙখানুপুঙখভাবে তিনি বিশ্লেষণ করে তার সাফল্যের কারণ বার করেছেন। এসব থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশের দর্শক কি চায়।...দর্শক প্রথমেই চায় আনন্দ। কাজেই গল্পে হাসি-আনন্দের খোরাক থাকতেই হবে। সেই কারণেই নাচগানের জায়গাও রাখতেই হবে।

কিন্তু ট্র্যাজেডিও দু-চারখানা কম উত্‌রায় নি। অতএব, চোখে জল আসে এমন করুণ অধ্যায়ও না থাকলে চলবে না। নায়ক বা নায়িকার খুব প্রিয় এক-আধটা বুড়ো-বুড়ি মেরে অনায়াসে করুণ রসের সৃষ্টি হতে পারে। তার পর চাই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত—বাংলাদেশ ভাবপ্রবণ দেশ মশাই, মেলোড্রামা একটু-আধটু দরকার—নায়ক-নায়িকার ভুল বোঝাবুঝি চরমে তুলে দিতে পারলে ওটা করা সহজ ব্যাপার। অবশ্য তাদের ভালোবাসার সীনও থাকবেই—আর সেটা হবে কাব্যের মতো। ওদের রোমিও জুলিয়েট দেখেছেন তো—অভাব আছে কিছুর ?

...তারপর গল্পে আরও একটা বড় জিনিস থাকা দরকার—শিভালরি। আত্মত্যাগের শিভালরি, আবার জোর করে দখল করারও শিভালরি—ভালো শিভালরির বই মশাই এ পর্যন্ত একটাও মার খায় নি। কোনো দেশেই না।

নিরঞ্জন বোস স্মরণ করিয়ে দিলেন, স্টাণ্ট-এর কথাটা বললেন না দাদা ?

—সব বলছি, কিচ্ছু ভুলি নি। স্টাণ্ট-এর এক-আধখানা ছবি দেখেছেন না দেখেন নি ? (আমার উদ্দেশে)।...সে-রকম স্টাণ্ট দিতে পারলে দর্শক হকচকিয়ে যায় একেবারে। যে যা করছে হঠাৎ তার উল্টো একটা কিছু করে বসল, বা যাকে সবাই ভাবছে ভাল লোক—শেষে দেখা গেল সে ভালো লোক নয়, আসলে যাকে দর্শক খারাপ ভাবছে সারাক্ষণ সে-ই পূজ্য ব্যক্তি—গল্পে এ-রকম গোছের ব্যাপার থাকবে।

তালুকদার বললেন, আর ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের কিছু...

বোস মন্তব্য করলেন, দাদা যা বলছেন সেগুলো করলেই ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল আপনি হবে।

আমার মুখ শুকিয়ে গেছে বুঝতে পারছি। ভিতরে ভিতরে কেমন একটা ত্রাস অনুভব করছি।

ঘোষালের বক্তব্য শেষ হয় নি তখনও। জানালেন, সমাজের অর্থাৎ আধুনিক সমাজের ভালো-মন্দের প্রতি সবল ইঙ্গিতও কিছু থাকতে হবে। বঞ্চিত দলের প্রতি সহানুভূতি না দেখালে দর্শক সেটা নিজের ছবি ভাববে কেন। মোট কথা একটা গল্পের মধ্যে একটা যুগের পুরোপুরি ছবিটা পাওয়া চাই।

হৃষ্টচিত্তে এতক্ষণে সিগারেটের টিন খুললেন সদানন্দ ঘোষাল।

নিরঞ্জন বোস মিটি মিটি হাসছে আমার দিকে চেয়ে। ভিতরের অস্বস্তি পাছে প্রকাশ হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় নীরব আমি। তবু করুণাময়ী আমার করুণ অবস্থাটা অনুধাবন করলেন বোধ হয়। একটু ভেবে চিন্তে বললেন, দেখো, আমি বলি, এত ভেবে সব ঘুলিয়ে না দিয়ে গল্পের ভারটা আপাতত ওঁর ওপরেই ছেড়ে দাও না—উনি প্রথমে একটা কিছু করুন, তারপর যেটুকু আলোচনা দরকার করা যাবে।

বোস সশঙ্কে তাকালেন ঘোষালের দিকে। ঘোষাল জবাব দিলেন, তা হলে ছবির ভালো-মন্দের দায়িত্ব আর আমার থাকবে না। ঘুরে স্ত্রীকে বোঝাতে বসলেন তিনি সমস্যাটা, শতকরা পঁচানব্বইটা ছবি মার খায় গল্পের জন্য—আর সেই সব গল্প লেখকরাই লিখে থাকেন -আমারও সেই রিস্ক্ নিতে পারি কখনও?

বোস সাগ্রহে সমর্থন করলেন, তা হলে তো সর্বনাশ। আপনি যা বলেছেন তাও ঠিক বউদি, কিন্তু সে বকম লেখক কোথায়—সেই দরের লেখক থাকলে আর ভাবনা ছিল কি?

ঘোষাল প্রশ্ন করলেন, লেখক নিজে কি বলেন?

পাঁচ হাজাব টাকাব মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছি না, তার ওপর হৃদাতার সম্পর্কটাও এমন যে কিছু বলা দায়। আমতা আমতা করে জবাব দিলাম, সবাই মিলে পরামর্শ কবেই একটা কিছু ঠিক করা মন্দ নয়...।

বোস ফোঁস করে উঠলেন অমনি, মন্দ নয় মানে—সবাই মিলে ঠিক না করলে দাদা যতগুলো পয়েন্ট বললেন সব আপনার একার মাথায় থাকবে নাকি?

সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ হল। কবুণাময়ী ওঠার চেষ্টা করতেই ঘোষাল বাধা দিলেন। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চেক বই আর কলম এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।—বিশ পঁচিশটা চেক অন্তত সই করে রাখো, কতজনের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করতে বেরুতে হবে ঠিক নেই—। যেমন যেমন দরকার টাকার অঙ্ক আমি বসিয়ে নেব'খন।

বিনয় তালুকদারের খবরটা মনে পড়ল, দুজনের সই ছাড়া টাকা উঠবে না। ছবিব ব্যাপারে করুণাময়ীর আস্থা ঘোষাল পুরোপুরিই পেয়েছেন মনে হল। কারণ, মহিলা এক গাদা ব্ল্যাঙ্ক-চেক খসখস করে সই করে দিলেন। তবু কেন জানি চেকগুলো একেবারে নির্দ্বিধায় সই করছেন বলে মনে হল না আমার।

কিন্তু পরদিনই তাঁর উৎসাহে যেন একটু তারতম্য দেখা গেল। তার পরদিন আরও।

এ দুদিন আমন্ত্রণ অনুযায়ী যেসব ভাবী শিল্পীরা দেখা করতে এলেন তাঁরা সকলেই মহিলা এবং সকলেরই বয়স কুড়ি থেকে ছাব্বিশের মধ্যে। মোটামুটি সুশ্রী। প্রসাধনের আতিশয্য না থাকলে হয়তো আরও একটু সুন্দর দেখাত। প্রথম দিন যে কটি মেয়ে এসেছিলেন, তাঁদের ইন্টারভিউয়ের মহড়া দেখতে ক্রমশ গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন করুণাময়ী। প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ডেকে ঘোষাল এবং বোসের নির্দেশমত নানান ভঙ্গিতে ছবি নিচ্ছিলেন বিনয় তালুকদার। তা ছাড়া তাঁদের দাঁত দেখা, চুল দেখা, দৈর্ঘ্য মাপা ইত্যাদির সময়ে করুণাময়ীর দিকে চোখ পড়তে দেখি, সে মুখ থমথমে গম্ভীর। কিন্তু শিল্পীর যাচাইয়ের আগ্রহে এবং ব্যস্ততায় ঘোষাল বা বোসের সেদিকে খেয়াল নেই। যাঁকে পছন্দ হয় নি।,তাঁরও বিশেষ রোল অনুযায়ী দু-চারটে বিশেষ গুণাবলী আবিষ্কার করলেন তাঁরা। মোট কথা, প্রথম দিনের সব কটি মেয়ে বেশ আশা নিয়েই ফিরে গেলেন।

তার পরের দিনের শিল্পী নির্বাচনের আসরে করুণাময়ী অনুপস্থিত।

শুনলাম তাঁর শরীর ভালো নেই, আসবেন না। তিনি না আসায় ঘোষাল বা বোসের সংকোচ আরও একটু কমেছে দেখলাম। একটি করে মেয়েকে ডাকা হচ্ছে এবং নানাভাবে তাঁর শিল্প-প্রতিভা আবিষ্কারের চেষ্টা হচ্ছে। আমার অনেকেবারই মনে হয়েছে সম্ভাব্য শিল্পী এই বুঝি এ ধরনের চেষ্টার প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত কেউ করলেন না।

ঘোষাল আর বোস অপরিমিত উৎসাহে কর্তব্য সম্পাদন করে চলেছেন। আমার প্রথম মনে হয়েছিল, নিরঞ্জন বোস বুঝি আগে থাকতেই এই সব কটি মেয়ের পরিচিত। প্রত্যেকের কাঁধে পিঠে হাত দিয়ে; ঘরে নিয়ে আসছেন এবং যাচাইয়ের শেষে প্রত্যেকেরই হাত ধরে দরজার বাইরে এগিয়ে দিয়ে আসছেন। আর, যেভাবে এক-একজনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অভিনয়-প্রসঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করছেন, মনে হবে শুধু পরিচিত নয়—অন্তরঙ্গও। অবশ্য পরে শুনেছি, বড় ডাইরেক্টর মাত্রেই এসব তুচ্ছ সংকোচের অনেক উর্ধ্বে। বোস বড় ডাইরেক্টর না হোন, বড় ডাইরেক্টর হতে চলেছেন।

বোস আর ঘোষালের শিল্পী যাচাইয়ের প্রেরণা যখন ঘনীভূত, ঠিক তখনই একটা ছন্দপতন ঘটে গেল।

সদানন্দ ঘোষাল তখন একটি মেয়ের চিবুকে হাত দিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গিমা ঠিক করে দিচ্ছেন। আর সেই সঙ্গে প্রশ্রয়-মিশ্রিত ক্রোধের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলার আর্ট শেখাচ্ছেন। বিনয় তালুকদার ক্যামেরায় প্রস্তুত, বিরাট দেহটি নিয়ে ঘোষাল সরে দাঁড়ালেই তিনি ক্যামেরায় চোখ লাগাতে পারেন। কিন্তু ঘোষালের সরার লক্ষণ নেই।

পিছন দিকের দরজা দিয়ে ঘরে কেউ ঢুকল অনুমান করে চেয়ে দেখি স্বয়ং করুণাময়ী।

স্থির নেত্রে তিনি স্বামীর শিল্পানুরাগ দেখছেন। সকলেরই নিবিষ্ট দৃষ্টি সামনের দিকে, তিনি যে এসেছেন কেউ খেয়াল করলেন না। অস্বস্তি লাগছে, কি করে এঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব ভেবে পাচ্ছি না। কারণ করুণাময়ীর দিকে এক নজর তাকিয়েই কেমন

মনে হল, শিল্পের প্রতি তাঁর তেমন প্রগাঢ় নিষ্ঠা নেই।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বোস দেখলেন তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে তটস্থ। কিন্তু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি প্রশংসনীয়। সানন্দে বলে উঠলেন (বোধ হয় ঘোষালকে সচেতন করবার জন্যেই), বসুন বৌদি বসুন, আপনার কথাই ভাবছিলাম—এখন একটু ভালো তো?

শোনামাত্র একটু হকচকিয়ে গিয়ে ঘোষাল মেয়েটির কাছ থেকে সরে এলেন। তার পরই সামলে নিয়ে গম্ভীর মুখে তালুকদারকে আদেশ দিলেন, দেখুন এবার হয় কিনা—

পরিস্থিতি বুঝেই যেন তালুকদারও চটপট দেখা সারলেন। এত তোড়জোড়ের পর এমন গদ্যাকারের বিদায় বোধ হয় মেয়েটিরও প্রত্যাশিত ছিল না। ভয়ে ভয়ে একবার করুণাময়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি প্রস্থান করলেন।

করুণাময়ী এক কোণে এসে বসলেন চুপচাপ। একটু শান্তভাবেই ঘোষাল তাঁর সামনে ধুপ করে বসে পড়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, দূর, এর দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

বোস তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন, হ্যাঁ, ওই চেহারাটুকুই সার—কোনোও পার্টস নেই।

এই প্রথম শুনলাম এই ধরনের মন্তব্য। অথচ এ পর্যন্ত যতজন এসেছেন, তার মধ্যে এই মেয়েটিকেই সব থেকে বেশি ভালো লেগেছিল আমার। ভেবেছিলাম, এঁদেরও তাই। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।

করুণাময়ী হঠাৎ বোসের দিকে চেয়ে গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন, এই দুদিনে কজনের ইন্টারভিউ হল?

শশব্যস্তে খাতা ওলটালেন বোস।—কাল আট জন আর আজ এ পর্যন্ত ছজন...।

সকলেই মেয়ে?

হ্যাঁ, মানে...

আপনাদের এই ছবিতে শুধু মেয়েরাই অভিনয় করবে?

বোস নিরুপায় মুখে তাকালেন ঘোষালের দিকে। ঘোষাল হাসিমুখেই হাল ধরলেন।—কি যে বল, যখন ছেলেদের ডাকব, তখন শুধু ছেলেদেরই ডাকব।

শুনেও করুণাময়ী খুব পরিতুষ্ট হলেন মনে হল না। সরাসরি আমার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন, আপনার 'গল্প কদ্দুর?

ঘোষাল জানালেন, গল্পের আলোচনা তিনটের পর—

তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না করুণাময়ী—আমিই যেন প্রধান আসামী। বললেন, তিনটের পর থেকে তো আপনি এত আগে আসেন কি করতে, শিল্পী বাছাই করতে?

গতকাল একটু দেরিতে এসেছিলাম বলে ইনিই হাসিমুখে ঠাট্টা করেছিলেন, লেখকদের সময়-জ্ঞান নেই—আর বোস সরোষে সমর্থন করেছিলেন তাঁকে। আজ এ কথা শুনে আমি বিভ্রান্ত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আজও বোস সায় দিলেন করুণাময়ীর কথায়। বললেন, ঠিক কথা, আপনার তো তিনটের আগে আসার দরকার নেই—আপনি ততক্ষণ গল্প নিয়ে বসে একটু-আধটু ভাবলেও তো কাজ হয়—নাকি ভাবেন, সবই আমরা করে দেব।

আমি নিরুত্তর। করুণাময়ী যেভাবে তাকালেন বোসের দিকে,অতঃপর নীরব তিনিও।

খানিক বাদে করুণাময়ী উঠে চলে গেলেন। ইন্টারভিউয়ের জন্য তখনও আরও দুটি মেয়ে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু পরের ইন্টারভিউ আর যেন তেমন রসোত্তীর্ণ হল না।

দিন পনের কেটেছে এরপর। ইতিমধ্যে করুণাময়ীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। শুনেছি তিনি বাপের বাড়ি গেছেন। এর মধ্যে ঘোষাল আর বোস গল্প নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। দিবারাত্র নাজেহাল অবস্থা আমার।

সমস্তদিন আর সারা রাত জেগে লিখে ঘোষাল আর বোসের উপকরণ নিয়েই মোটামুটি একটা গল্প দাঁড় করিয়েছিলাম। কিন্তু সেই গল্প আদৌ তাঁদের পছন্দ হয় নি। অতএব সেই গল্পের মধ্যে ঘোষালের সুপরিকল্পিত পাঁচ-ছটা অধ্যায়, নিরঞ্জন বোসের আবিষ্কৃত গোটাতিনেক চমকপ্রদ অধ্যায় এবং বিনয় তালুকদারের ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলের গোটা দুই অধ্যায় অনুপ্রবেশ করল। সব মিলিয়ে যা দাঁড়াল, ওই তিনজনের মনে সেটা মার্ভেলাস, অভূতপূর্ব, ইত্যাদি—।

কিন্তু আমি স্বস্তি বোধ করছি না, আর বেশ একটু ঘাবড়েই গেছি। নিরঞ্জন বোস ফোঁস করে টিপ্পনী কেটেছেন, সব ঠিক করে দিলাম আমরা, আর লেখক নামটা তো মশাই পাবেন আপনি একলা—আপনারই বরাত।

কিন্তু এমন বরাত সত্ত্বেও কেমন যেন চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি আমি। কিছুই ভালো লাগছে না।

এরপর হঠাৎ আবার এক বিপর্যয়। বিপর্যয় ছাড়া আর কি বলব। প্রায় উদভ্রান্তের মতই নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদার আমার বাড়ি এসে হাজির। প্রথম সংবাদ, করুণাময়ী নাকি বাপের বাড়ি বসেই মন্তব্য করেছেন, আমার গল্প লেখা ছেড়ে দেওয়া উচিত। গল্পটা সেখানে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু সেটা এমন কিছু সংবাদ নয়, তার থেকেও অনেক বড় দুঃসংবাদ আছে। যেসব মেয়েদের ইন্টারভিউ দেওয়া হয়েছিল তাঁদের প্রায় সকলকেই কিছু না কিছু রোলের জন্য সিলেক্ট করা হয়েছিল। সকলের সঙ্গেই বিধিমত কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে এবং ঘোষাল তাঁদের কিছু কিছু অ্যাডভান্স করেছেন। করুণাময়ী চেক সই করাই ছিল, তার নীচে নিজের নাম সই করে সকলকেই চেক দিতে পেরেছেন সদানন্দ ঘোষাল।

কিন্তু করুণাময়ী বাপের বাড়ি গিয়েই যে এক কাণ্ড করে বসে আছেন কেউ জানেন না। ব্যাঙ্কের নামে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে লিখেছেন, ব্যবসায়ের সুবিধের জন্য আগেই তিনি চেক সই করে রেখেছিলেন, কিন্তু যুগ্ম ব্যবসায়ে স্বামীর সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় উক্ত ব্যবসা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন। অতএব এই চিঠির তারিখের পর থেকে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত দুজনের সই থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক থেকে যেন একটি পয়সাও না দেওয়া হয়।

...ভাবী শিল্পীদের ছাড়া আরও অনেককে চেক দেওয়া হয়েছিল। ব্যাঙ্ক সকলের চেকই ফেরত দিয়েছেন। ফলে যাঁদের চেক দেওয়া হয়েছিল একে একে তাঁদের সকলের কাছ থেকেই উকিলের চিঠি আসতে শুরু করেছে। সকলেই কেস করবেন বলে

শাসিয়েছেন।

এ শুনলে প্রত্যেকেই হতভম্ব হবেন। আমিও হয়েছি। কিন্তু আমার জন্যে আরও কিছু বাকি ছিল।

...সদানন্দ ঘোষাল স্ত্রীর প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেই নাকি গোটা ছবির টাকাটা সংগ্রহ করার জন্য বেরিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও ডিস্ট্রিবিউটার আজ আর এক কপর্দকও দিতে রাজী নয়। কারণ শিল্পী, স্টুডিও, টেকনিসিয়ান প্রভৃতি সকলের চেক ফেরত আসাটা এরই মধ্যে বাজারে রটে গেছে। এ লাইনে নাম একবার হতে যত সময় লাগে, পড়তে তার থেকে দশ ভাগ কম সময় লাগে।

অগত্যা নিরুপায় হয়ে সদানন্দ ঘোষাল শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু দেখা হয় নি। করুণাময়ী নাকি তখন ঘুমুচ্ছিলেন তাঁকে ডেকে তোলেন অত সাহস নাকি শ্বশুরবাড়ির কারও নেই। অর্থাৎ, স্বামীর সঙ্গে করুণাময়ী দেখা করেন নি।

আর কোনোও পথ না পেযে সদানন্দ ঘোষাল নিবঞ্জন বোসকে দূত হিসেবে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছেন, কিন্তু করুণামযী তাঁর সঙ্গেও দেখা করেন নি। তবে ওপর থেকে বলে পাঠিয়েছেন, লেখককে, অর্থাৎ আমাকে একবার যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়।

শুনে আমাব চক্ষুস্থির। এত দুর্ভাবনার মধ্যেও বোসের জ্বালা কম নয়। টিপ্পনী কাটলেন, কীভাবে গুণ করেছেন আপনিই জানেন মশাই—যান দেখা করে আসুন।

চুপ করে থাকতে দেখেও সহ্য হল না। ঝাঁজিয়ে উঠলেন প্রায়, হাঁ করে ভাবছেন কি অত, কখন যাচ্ছেন?

বললাম, আমি যাচ্ছি না।

যাচ্ছেন না মানে, ঘোষালদার এমন বিপদ, রোজ উকিলের চিঠি আসছে একখানা দুখানা করে—আর আপনি চুপ করে বসে থাকবেন? আপনার কোনোও দায়িত্ব নেই?

আমার তো শুধু লেখার দায়িত্ব।

জবাব শুনে বোস প্রায় স্তম্ভিত যেন। কিন্তু কড়া কথায় ফল হবে না বুঝে গলার সুর বদলালেন। বললেন, মশাই, আমাদের এতদিনের এত চেষ্টা সব পণ্ড হচ্ছে বুঝতে পারছেন? তা ছাড়া আপনার লেখার জন্যেই তো এত গণ্ডগোল, গল্প পছন্দ হলে বৌদি অত বিগড়োতেন?

ভাবলাম বলি, বৌদি বিগড়েছেন আপনাদের শিল্পী বাছাইয়ের ঘটা দেখে। কিন্তু অতটা বলার মতো সাহস নেই আমার। আর তা ছাড়া আমি ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে চাইছি না মনে মনে নিজেই বিলক্ষণ ঘাবড়ে গেছি বলে।

বোস এবার আন্তরিক ভাবেই অনুরোধ করলেন, উনি নিজে থেকে আপনাকে ডেকেছেন যখন একবার যান—একটু চেষ্টাচরিত্র করুন। ঘোষালদা ওই জন্যেই আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আমাদের। আপনি যাচ্ছেন না শুনলে এই বিপদের সময় উনি কি ভাববেন খেয়াল আছে? হয়তো নিজেই ছুটে আসবেন—

এও এক ভাবনার কথা। নিরুপায় হয়ে করুণাময়ীর বাপের বাড়ির ঠিকানা-পত্তর রেখে তাঁদের বিদায় দিলাম। তারপর শুকনো মুখে সন্ধ্যের দিকে হাজিরও হলাম সেই বাড়িতে।

খবর পেয়েই করুণাময়ী এলেন। দিব্যি হাসিখুশী। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। বাপের বাড়ির লোকেদের কাছে মস্ত লেখক বলে পরিচয় দিলেন, থালাভরা জলখাবার খাওয়ালেন। শেষে নিরীহমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের ছবি কত দূর এগোল ?

আর এগোবে কি করে, সব তো আপনার জন্যেই বন্ধ।

ও মা, আমি আবার কি করলাম ?

ভরসা পেয়ে কি তিনি করছেন একটু-আধটু শোনালাম। কিন্তু তাঁর যেন আনন্দ বাড়ল আরও। খুব হাসলেন। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ও গল্পটা কে লিখল শেষ পর্যন্ত, আপনি ?

বুঝতে পারছি বিপদ ঘনাচ্ছে আবার। দ্বিধান্বিত জবাব দিলাম, আমিই লিখেছিলাম প্রথম, তারপর ওঁরা ঠিকঠাক করেছেন...।

ঠিকঠাক করার পর কেমন দাঁড়াল ?

ইয়ে, ঠিক বুঝতে পারছি না—

করুণাময়ী হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, আপনি এত ভীতু কেন ?

ভয় কেটে গিয়েছিল, এবারে আরও একটু সাহস পেলাম।—ভীতু নয়, গল্প পছন্দ হয় নি যখন যে কোনোও লেখক অন্য গল্প লিখে দিতেন—তার জন্যে সব একেবারে বন্ধ করে দিলেন কেন ?

করুণাময়ী প্রায় অপ্রস্তুত সে-জন্যে বন্ধ করেছি কে বললে !...ও, সব দোষ বুঝি এখন আপনার ওপর পড়েছে ? কোনো লেখক ও গল্প লিখতে পারেন না সে আমি জানি।

তা হলে এই কাণ্ড করলেন কেন ?

কি কাণ্ড করলাম ?

এই...সব বন্ধ হয়ে গেল।

হল তাতে কী ?

আচ্ছা মুশকিল। বুঝেও না বুঝতে চাইলে কি আর বলা যায়। বেশ স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করলাম, বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছে, সকলের সব চেক ফেরত এসেছে—

আপনার চেক ছিল বুঝি ?

না, আমার ছিল না।

তা হলে আপনার এত মাথা-ব্যথা কেন ?

জবাব হাতড়ে পেতে সময় লাগল। বললাম, মাথা-ব্যথা ঠিক নিজের জন্যে নয়, সদানন্দবাবুর জন্যে। সকলের চেক ফেরত হতে সবাই উকিলের চিঠি দিচ্ছেন একে একে—কেস করবেন বলে শাসাচ্ছেন। ভদ্রলোক ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়েছেন, রাতদিন ছোটাছুটি করছেন—

টাকার জন্যে ?

তা ছাড়া আর কি।

স্বল্পক্ষণ কি যেন ভাবলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি সত্যি বিব্রত হয়েছেন না এমনি তাঁর হয়ে বলার জন্যে বলছেন ? জুতসই জবাব দিলাম, আমি কারও হয়ে কিছু বলতে আসি নি, আপনি ডেকেছিলেন শুনেই এসেছি। ভদ্রলোকের সত্যি নাজেহাল অবস্থা...।

উকিলের চিঠি পেয়ে ?

হবে না, দুর্ভাবনা কম নাকি ? উকিলরা কি যে সে লোক, এমন শাসায় প্রত্যেককে—যেন দুনিয়ায় অমন অপরাধী আর হয় না।

আবারও চুপচাপ খানিক বসে ভাবলেন করুণাময়ী। এবারে আর একটু বেশিক্ষণ। তারপর বললেন, আচ্ছা, যেসব চেক ফেরত হয়েছে, শুধু সেই সব চেকের টাকা ব্যাঙ্ক যাতে দেয় আমি কালই লিখে দিচ্ছি। যাঁদের চেক দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন আবার সেই চেক নিয়ে ব্যাঙ্কে দাখিল করেন, বলুন গে যান—।

সর্ব রক্ষা।

খবর পেয়ে সদানন্দ ঘোষাল এই প্রথম বোধ করি আমাকে একটা মানুষের মতো মানুষ বলে বিবেচনা করলেন, ওই বিশাল-বপুর আলিঙ্গন-মুক্ত হবার জন্য হাঁসফাঁস করতে লাগলাম। নিরঞ্জন বোসও বাধ্য হয়েই একটু আনন্দ প্রকাশ করলেন।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার শঙ্কা যায় নি। যাঁদের চেক দেওয়া হয়েছিল সত্যিই তাঁরা টাকা পাবেন কিনা ব্যাঙ্ক থেকে, সেই চিন্তাটা ছিলই। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ঘোষাল খবর নিয়ে জেনেছেন, সব পাওনাদারই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পেয়ে গেছেন।

যাক, করুণাময়ী আর একটু ঠাণ্ডা হলেই ছবির কাজ আবার শুরু হবে বোঝা গেল। অতএব আমার আবার সেই পুরনো ভাবনা শুরু হল। গল্পের ভাবনা।

কিন্তু ওপরওয়ালার কারসাজি অন্যরকম।

কোনোও ভাবনা-চিন্তারই দরকার ছিল না আমার। ঠিক দুদিন বাদে ঘোষাল এবং বোস আমার বাড়ি এসে হাজির। ঘোষালের সেই মূর্তি আমি কল্পনা করতে পারি নে। তাঁর ওপর দিয়ে যেন বিরাট একটা ঝড় বয়ে গেছে। উস্কখুস্ক উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি। নিরঞ্জন বোসেরও সমস্ত মুখ শুকনো, পাংশু।

আমাকে দেখেই প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন সদানন্দ ঘোষাল। —আপনার সঙ্গে আমার স্ত্রী কি কথা হয়েছে ? এসব কি কাণ্ড ?

. আমি বিমূঢ়।—কেন, কি হয়েছে ?

অতঃপর কি হয়েছে সেই সমাচার শুনলাম। আর শুনে আমিও স্তব্ধ, নির্বাক।

...আর একখানা উকিলের চিঠি পেয়েছেন সদানন্দ ঘোষাল। সেটা এসেছে তাঁরই স্ত্রী করুণাময়ীর উকিলের তরফ থেকে। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হওয়াতে ঘোষাল সেই চিঠি আমার হাতে গুঁজে দিয়েছেন। চিঠির সার মর্ম, সদানন্দ ঘোষাল তাঁর স্ত্রী করুণাময়ীর পারিবারিক

জীবন নানা অপরাধে দুঃসহ এবং দুর্বহ করে তুলেছেন। স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে কম করে গণ্ডা দশেক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ। অতএব বিবাহ-বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। উকিলের মাননীয়া মক্কেল, অর্থাৎ, করুণাময়ী আদালতে বিচ্ছেদের মামলা রুজ করতে চলেছেন।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। আমাকে আবারও ছুটতে হয়েছিল করুণাময়ীর বাপের বাড়ি। কিন্তু এবারে একা নয়, তাঁর স্বামী সদানন্দ ঘোষাল ছিলেন সঙ্গে। ছবির পরিকল্পনা বর্জন করে এবং আরো অনেক কিছু শর্ত করে যেভাবে স্ত্রীকে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন সদানন্দ ঘোষাল সে-ও আর প্রকাশ্যভাবে লেখার মতো নয়।

ঘোষালের বাড়ি গেলে করুণাময়ী এখন আর মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়েন না।

সদানন্দ ঘোষালের গল্প

চতুর্থ সর্গ

বসন্ত-কোকিলের গলায় ডাক নেই, পূর্ণিমায় জ্যোৎস্না নেই, গোলাপে গন্ধ নেই।

সদানন্দ-ঘোষালের মুখে হাসি নেই।

তফাত নেই খুব।

সদানন্দ ঘোষালের আনন্দে টান ধরেছে, সেটা সকলেই লক্ষ্য করছিল। লক্ষ্য করে আসছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী করুণাময়ীও লক্ষ্য করলেন।

লোকের কথা শুনে শুনে শেষে তাঁরও মনে হল অমন তরতাজা নধরকান্তি দেহ ক্রমে সত্যিই যেন শীর্ণ হচ্ছে। এমনিতে ভদ্রমহিলা তোয়াজেই রেখেছেন স্বামীকে। যখন যা প্রয়োজন হাতের কাছে যোগান দেন। কোনও কিছুর অভাব নেই, সবই দিয়েছেন। সবই দিচ্ছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে পায়ে একটা বেড়িও পরিয়ে রেখেছেন যা চাও সব পাবে, কিন্তু আমার হাত দিয়ে পাবে। বেড়াতে যেতে চাও—চল আমি যাচ্ছি সঙ্গে, থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখবে—আচ্ছা আমি টিকিট করিয়ে রাখব'খন। খানা-পিনা গান-বাজনার আয়োজন চাই—বাড়িতেই করিছি ব্যবস্থা।

কিন্তু নড়তে-চড়তে সকলের আগে ওই বেড়িটাই খচখচিয়ে বাজছে ঘোষালের পায়ে। মুক্ত পাখিকে খাঁচায় এনে পুরে যত আড়ম্বরেই তার সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করা হোক, সে যেমন দিনে দিনে শুকোয়— সদানন্দ ঘোষালও তেমনি স্তিমিত হয়ে আসছেন।

হাজার হোক স্ত্রী তো। কত দিন আর সাহসে নির্ভর করে শক্ত হয়ে বসে থাকতে পারেন! পাঁচজন শুভার্থীরা এসে পাঁচরকম বলছে তার ওপর। সেই বলার মধ্যে অনুযোগের আভাসও প্রচ্ছন্ন। এমন এক জনকর্মঠ পুরুষকে পঙ্গু করে রাখলে হিতে বিপরীত হওয়া যে বিচিত্র নয়, সেই আভাস।

শেষ পর্যন্ত করুণাময়ীও মনে মনে ঘাবড়ালেন বেশ।

ঘোষালের সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, এত খবরও জানা ছিল না। সেদিন বিনয় তালুকদার আর নিরঞ্জন বোসের পদার্পণে অনেক পুরনো সমাচার নতুন করে শোনা গেল। তবে নতুন খবরও আছে। আমার কাছে প্রায় তাজ্জব খবরই সেটা। করুণাময়ীই নাকি তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছেন আবার এবং আগের মতোই আসা-যাওয়া করতে অনুরোধ করেছেন।

বোস আর তালুকদারের আমার এখানে আবির্ভাব অনেক দিন পরেই। আসা নিরর্থক বিবেচনা করেই আসেন নি। আমার ওপর আর তাঁদের আস্থা ছিল না বলেও হয়ত আসেন নি। অন্যথায় এখানে আসতে তাঁদের বাধা ছিল না। তাঁদের সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর মুখমন্ডলে যে ভ্রূকুটি সঞ্চার হয়, সেটাও তাঁরা চাক্ষুষ দেখেন নি কোন দিন।

কিন্তু করুণাময়ীর ভ্রূকুটি তাঁরা দেখেছিলেন। মুখে কিছু না বললেও তাঁদের আসাটা যে তিনি পছন্দ করেন না সেটা তিনি ওই ভ্রূকুটির দ্বারাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর বোস-তালুকদারও তা এমনই বুঝেছিলেন যে বহুদিন পর্যন্ত ওই পাড়াসুদ্ধু মাড়ান নি।

সেই করুণাময়ী তাঁদের আবার বাড়িতে ডেকে এনে আদর যত্ন করেছেন, এ একটা খবরের মতো খবর বইকি।

আমার বিস্ময় দেখেই নিরঞ্জন বোস চোখ পাকালেন কিনা বলা যায় না। বললেন, করবেন না তো কি, ঠেলায় পড়লে ঢেলায় সেলাম করে লোকে, আমরা তো মানুষ। আর ঠেলাও কম ঠেলা নয়, নিজের স্বামী নিয়ে ঠেলা, হেঁজিপেঁজি কেউ নয়।

বিনয় তালুকদার যোগ দিলেন, তা ছাড়া বন্ধু সবাই নয় এটাও বুঝেছেন ভদ্রমহিলা—টাকায় সব মেলে, নিঃস্বার্থ বন্ধু মেলে না।

তবে? নিরঞ্জন বোসের উদ্দীপিত সমর্থন।

অতঃপর ঘোষালের অবস্থা নিরঞ্জন বোসই শুনিয়েছিন। তাঁদের দেখে ঘোষালদার দু-চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল একেবারে। বলেছেন, আপনারা তো আমাকে ত্যাগই করলেন, হঠাৎ হয়তো একদিন শুনতেন আপনাদের ঘোষালদা আর নেই।

নিরঞ্জন বোস টসটসিয়ে কেঁদেই ফেলেছিলেন,, আর বিনয় তালুকদারের ক্যামেরায় চোখ রেখে নেহাত চোখের জোরে বেড়ে গেছে বলে জলটা একেবারে ভেঙে বেরিয়ে আসে নি, কিন্তু কাঁদ-কাঁদ হয়েছিলেন তিনিও। করুণাময়ী অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন। নিরঞ্জন বোসের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছিল, আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন নি তিনি। অন্তরের আবেগেই করুণাময়ীকে বলে বসেছিলেন, বউদি আমরা না-হয় শত্রু আপনার, কিন্তু ঘোষালদা তো শত্রু নয়, তাঁর এই হাল করেছেন আপনি?

তার পর? মহিলার দেমাক কম ভাবেন নাকি? ঝাঁঝিয়ে উঠেছেন অমনি, বাজে বকবেন না। কিন্তু বললে কি হবে, মুখ একেবারে আমসি।

এর পর বন্ধুর কাজ করেছেন বোস আর তালুকদার। আগের ডাক্তার আর ওষুধপত্র আর তাঁর বিধি-ব্যবস্থা এব একসঙ্গে বাতিল করে দিয়েছেন। দেখেশুনে নতুন ডাক্তারও মহিলাটিকে ছাড়েন নি, ঠেসে বকেছেন। স্পষ্টই বলেছেন, মনে আনন্দ না থাকলে এ

ধরনের মানুষের পট করে কিছু একটা হয়ে বসা বিচিত্র নয়, আর, তাঁর স্বাভাবিক আনন্দ সব কেড়ে নিয়ে হাজার তোয়াজ করলেও কিছু হবে না—দেহ থেকে রক্ত টেনে নিয়ে ওষুধ ঢোকানো যেমন নিষ্ফল, এও তাই।

নিরঞ্জন বোস মুচকি হাসলেন।

সেই হাসি দেখে আমার পাপ-মনে কেমন একটা সন্দেহের উদ্রেক হল। নিরঞ্জন বোসের বিশ্বাস আর ভাষ্যটাই চিকিৎসকের মুখ দিয়ে প্রকাশ করানোর ব্যবস্থা হয়েছে কিনা কে জানে। টাকায় সব হয় শুনি।

যাবার আগে তাঁরা বলে গেলেন, সেদিন করুণাময়ী হঠাৎ নাকি আমার খোঁজখবর করছিলেন—আমি যাই না কেন জিজ্ঞাসা করছিলেন।

—যাবেন একদিন, আপনাকে তো সুনজরেই দেখেন মহিলা, বিনয় তালুকদারের টিপ্পনী, গোবেচারী গোছের এক-আধজন কেউ হাতের কাছে থাকলে মেয়েদের মেজাজ ভালো থাকে মশাই।

বোস বললেন, যাবেন। যাওয়াটা একেবারে লোকসানের হবে না হয়তো, আপনারা তো আবার লাভ-লোকসান না খতিয়ে এক পা নড়েন না—ওদিকে, লেখকরা শুনি টাকার উল্টো-সোজা চেনে না।

বলবেন না, বলবেন না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি কানে একটুখানি আশার সম্ভাবনা ছড়িয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত।—একটা নতুন প্ল্যান করছি আমরা, কথাবার্তাও অনেকটা এগিয়েছে—লাগলে ধুলো ফেলে সোনা তোলা যাবে। হোক আগে, বলব'খন—এ নিয়ে আবর হই-চই করবেন না যেন, আপনাকে কিছু বলা মানে তো ঢাকের কাঠি উসকে দেওয়া।

আজ যাব কাল যাব করত করতে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। শেষে মনে হয়েছে, কি করতেই বা যাব। বোস-তালুকদারের আশার সম্ভাবনায় নতুন করে মাথা গলানোর লোভ আর নেই।

কিন্তু হঠাৎই সেদিন বিকেলে বাড়ির দরজায় ঘোষালের মস্ত গাড়িখানা এসে দাঁড়াতে দেখে হন্তদন্ত হয়ে অভ্যর্থনায় এগিয়ে আসতে হল। মরা হাতি লাখ টাকা, আমার মতো লোককে ব্যাতিব্যস্ত করে তুলতে ওই একখানা গাড়িই যথেষ্ট।

কিন্তু বাইরে এসে অবাক, অভ্যর্থনা কাকে করব। গাড়িতে শুধু হিন্দুস্থানী ড্রাইভার। সেলাম ঠুকে দাঁতভাঙা বাংলায় জানাল, মাইজি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন, এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

মাইজি অর্থাৎ করুণাময়ী।

এমন অকল্পিত আহ্বানে হকচকিয়ে যাব না তো কি! যথাসত্বর জামা-কাপড় বদলে গাড়িতে এসে বসলাম। হঠাৎ মনে হল, ঘোষালদা কেমন আছেন, বাড়াবাড়ি নয়তো কিছু? ড্রাইভারকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, তার বাবুর তবিয়ত কেমন আছে।

জবাবে ড্রাইভার বাংলা করে যে জবাবটা দিল তা আমার হিন্দির থেকেও দুর্বোধ্য।

'বালো আছেন' বলল কি 'বালো আছে না' বলল ঠাওর করে ওঠা গেল না। তাই আবারও জিজ্ঞাসা করতে হল, বাবু কোথায় এখন?

ড্রাইভারটি স্বল্পভাষী, খানিক চুপ করে থেকে সামনের দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল, বাবুকে দোসরা বাবুরা বাহার করেছেন।

বাহার করেছেন। এ আবার কি কথা। করুণাময়ী গাড়ি পাঠিয়ে ডাকছেন, বাবুকে বার করা হয়েছে—ভাবতে গিয়ে একটা অশুভ চিন্তায় বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল একেবারে।

গাড়িতে দশ-পনের মিনিটের পথ মাত্র। কিন্তু এই দশ-পনের মিনিটই যেন আর ফুরোয় না। নেমে পায়ে পায়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম। বাড়িতে জনপ্রাণী নেই যেন, টুঁ শব্দটি নেই কোথাও। কি দৃশ্য দেখতে হবে ভেবে পা আর চলে না, কণ্ঠতালু শুকনো।

সামনের বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় গা ছেড়ে বসেছিলেন করুণাময়ী। আমাকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন, সহজ অন্তরঙ্গ মুখেই আহ্বান করলেন, আসুন—আমি ভাবছিলাম এ- সময় আপনাকে আবার বাড়িতে পাবে কিনা। বসুন—।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। দিব্বি তরতাজা মুখ, শোকতাপের চিহ্ন নেই। মনে মনে ড্রাইভার লোকটার এক দফা মুণ্ডপাত করে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘোষালদা কেমন আছেন?

ভালোই। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বেরিয়েছেন।

জবাবের মধ্যে কেমন যেন একটু নিরুপায় অসহিষ্ণুতা। তাঁর অনুপস্থিতিতে এভাবে আমাকে তলব করে আনার কারণ না বোঝা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে হল। তিনি চায়ের কথা বললেন প্রথম, চা খাব না শুনে নীরবে বলে রইলেন খানিক। তার পর ঈষৎ বক্রস্বরে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, আপনার আর দেখা নেই কেন, পাছে অমন অভূতপূর্ব গল্পটা শুনতে চাই, সেই ভয়ে?

অভূতপূর্ব গল্পের প্রসঙ্গে আমার অভূতপূর্ব বিস্ময় তাঁর চোখে পড়ল হয়ত। ফলে তাঁর বিরক্তি বাড়ল আরও। বললেন, আপনাদের গল্পে-টল্পে আর আমার কোনোরকম আগ্রহ নেই, লোকটা যা-হোক কিছু নিয়ে ভালো থাকুক এই শুধু চাইছি। থামলেন একটু, তার পর সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, এঁদের এবারের প্ল্যান সম্বন্ধে আপনার মতামত কি, দেব বিশ হাজার টাকা?

আমাকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে তিনি নীরস গলায় বললেন আবার, অন্য কোনো ব্যাপার হলে বিশ হাজার ছেড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ দিতেও আমার আপত্তি ছিল না—না হয় হতই টাকাটা লোকসান, কিন্তু এদিকেই ঝোঁক, কি আর করা যাবে।....এতেই আবার এঁকে উসকে না দিলেও পারতেন, অবশ্য আপনার আবার তাতে লোকসান।

কোন্ অভিযোগের জালে জড়িয়ে পড়ছি সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি কোন ব্যাপারে আবার কাকে উসকে দিতে গেলাম? আমার হতভম্ব মূর্তিটা এবারে তিনি লক্ষ্য করলেন বোধ হয়। কিন্তু আর চুপ করে থাকা সমীচীন নয়, মাকড়সার জালের মতো কিছু একটা চক্রান্ত যেন গুটিগুটি কাছে এগিয়ে আসছে। বললাম, আপনি

কি যে বলছেন আমি তা কিছুই বুঝছি না, ঘোষালদার সঙ্গে আমার তো শিগগির দেখা পর্যন্ত হয় নি! কিসের প্ল্যান? কেন দেবেন আপনি বিশ হাজার টাকা? তার সঙ্গে আমার স্বার্থ কী?

ভদ্রমহিলার দুই চোখ যেন আমার অন্তস্তলে বিচরণ করে শেষে মুখে এসে থামল। অবিশ্বাস করেন নি হয়তো, কিন্তু বিলক্ষণ অবাক হয়েছেন।

আপনারই কি এক যুগান্তকারী কাহিনী নিয়ে এত জটলা, এত জল্পনা-কল্পনা, আর আপনিই কিছু জানেন না?

জানি না যে সে তো দেখাই যাচ্ছে। এমন কি সে-রকম কোনো কাহিনী আমি রচনা করেছি সেও এই প্রথম শুনলাম। আমার এতখানি অজ্ঞতার বহর দেখে করুণাময়ীকে একটু সদয় মনে হল এতক্ষণে। ধীরে সুস্থে অজ্ঞতার পর্দাটা তিনিই সরালেন।

টাকা পয়সা রিস্ক্ করে এবারে আর কোনো ছবি তৈরি করা নয়, শিল্পী নির্বাচন নয়, কাহিনী নির্বাচন নয়—কোনোও ঝামেলার মধ্যেই মাথা গলানো নয়! অন্য প্রযোজকের হয়ে সদানন্দ ঘোষাল এবারে শুধু একখানা ছবি পরিচালানা করবেন—তিনি চিত্র-পরিচালক হবেন। দায় দায়িত্ব সব অপরের। ঘোষালের প্রতিভার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা আছে এমন গুণীজন এখনও দুপাঁচজন আছেন। কোনও এক নামকরা চিত্র-প্রতিষ্ঠান বিশেষ আগ্রহ সহকারে ঘোষালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেনা। ছবির বাজারে উদ্ভাবনী-শক্তিসম্পন্ন শিক্ষিত পরিচালকের দুর্ভিক্ষ। দিন বদলেছে। আদ্যিকালের ছকে বাঁধা বুদ্ধিসুদ্ধি জ্ঞানগম্যি নিয়ে যাঁরা ছবি পরিচালনা করেন, তাঁদের দিন গেছে।

শাদা কথায়, সদানন্দ ঘোষাল এবারে ছবির ডাইরেক্টর হবেন। উক্ত চিত্র-প্রতিষ্ঠান তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে রাজী আছেন।

কিন্তু এর মধ্যে আমি কে? আমি কি?

আমি অনেকখানি।

গল্প নির্বাচনের অধিকার এবং দায়িত্ব প্রযোজকের হলেও ঘোষাল আমার একটা গল্পের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন তাঁর কাছে। ঘোষালের প্রশংসা নির্বাচনেরই সামিল। প্রযোজকও সেই গল্প পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন, এবং সেই গল্পই চিত্রায়িত করা সাব্যস্ত হয়েছে।

করুণাময়ীর মুখে গল্পের নাম শুনে আমি বিস্ফারিত। আনন্দে বা প্রত্যাশায় নয়। ওই নামে গল্প একটা লিখেছিলাম বটে। ঐতিহাসিক পটভূমিতে একটি মেয়ের সংঘাতময় প্রণয়জীবনের কথা। কিন্তু সে ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইতিহাসের গল্প সব লেখকেরই দু-চারটে করে আছে অথচ আমার নেই, সেই দুর্বলতা ঢাকতে নিজেই একটুখানি ইতিহাস রচনা করেছিলাম। ভেবেছিলাম, কে আর কালের যবনিকা সরিয়ে সত্য মিথ্যা যাচাই করতে যাবে! কিন্তু লেখার পর সেই কাহিনী কোনও বহুলপ্রচারিত সাময়িকী বা মাসিকপত্রে ছাপতে সাহস করি নি, খুব একটা ছোট কাগজে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল।

সেই কাহিনী নিয়ে ছবি! আমার আঁতকে ওঠারই কথা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আপনি বিশ হাজার টাকা দেবেন কেন?

করুণাময়ী জানালেন, চিত্র প্রতিষ্ঠানটির প্রযোজক পরিচালকের আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ সামান্য কিছু টাকা ফেলতে অনুরোধ করছেন। এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে বিশ হাজার টাকা যে টাকা নয় তা করুণাময়ীও জানেন। কিন্তু তাঁর স্বামীটি ওই সামান্য টাকাটা দিতে চান অন্য কারণে। বিশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি ষাট হাজারের ফলটি আদায় করে ছাড়বেন। শর্তের মধ্যে একটা লাভের অংশ আদায় করে নেবার এমন সুযোগ জীবনে খুব বেশি আসে না। প্রযোজকটি অন্ধ ভক্ত বলেই এ রকম যোগাযোগ ঘটা সম্ভব।

বসেছিলাম।

করুণাময়ী তাড়া দিলেন, চুপ মেরে গেলেন কেন, বলুন কিছু!

অমি, ইয়ে —আমি আর কি বলব?

দেব বিশ হাজার টাকা?

সাহসে ভর করে, অথবা মিথ্যে আশ্বাস দেবার সাহস ছিল না বলে সত্যি জবাবটাই দিলাম। বললাম, আমি তো কিছুই জানি না, কিন্তু আমার ঠিক ভালো মনে হচ্ছে না।....।

করুণাময়ী মুখ টিপে হাসলেন একটু, ভালো মনে হচ্ছে না কেন, বেশ তো আপনার একটা গল্প ছবি হয়ে যাবে।

ওই গল্প ছবি হলে আমাকে কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে।

সততায় করুণাময়ী প্রীত হলেন মনে হল। হাসলেন বেশ। তার পর বললেন, অমন গল্প লেখেন কেন? পরে আশ্বাস দিলে, যাই হোক, এবারে তো আর এঁরা বিচারক নন, আপনার গল্প আপনি পছন্দমতো ঠিকঠাক না করে দিয়ে ছাড়বেন কেন?

তবু মন সায় দিচ্ছে না কেন জানি। করুণাময়ী অবার বললেন, কিছু একটা নিয়ে না থাকলে শরীর মন এদিকে দিনকে দিন খারাপ হয়ে পড়ছে ঠিকই। পাঁচজন আমাকেই দুষছে।..... তা ছাড়া এটা এমন তো কিছু ব্যাপারও নয় শুনলাম, স্টুডিওতে গিয়ে সেট-এ দাঁড়িয়ে ডিরেক্‌শন দেবেন আর বাড়ি চলে আসবেন— আমি আর তা হলে বাধা দিই কেন, এত ঝোঁক যখন এদিকে।

আমি বাধাও দিতে পারলাম না, আবার সায়ও দিয়ে উঠতে পারলুম না। ওঠার আগে করুণাময়ী অবশ্য আবারও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কথাবার্তা এত দূর এগিয়েছে অথচ আমার সঙ্গে কেউ এ নিয়ে একটি কথাও বলেন নি কেন! সতর্ক করে দিয়েছেন, নিজে থেকে আমি যেচে যেন কিছু না বলতে যাই, ব্যবস্থা যা করার তিনিই করছেন।

তিন দিনের মধ্যে তাঁর ব্যবস্থার নমুনা দেখে আমার চক্ষুস্থির। সকালে বাড়ির দোরে ঘোষালের সেই গাড়ি । গাড়িতে তিনজনেই সমাসীন, নিরঞ্জন বোস, বিনয় তালুকদার এবং স্বয়ং সদানন্দ ঘোষাল।

আমি বাইরের ঘরের ছিলাম। তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে উঠে যথাযোগ্য অভ্যর্থনারও

সুযোগ পেলাম না। বিনা আপ্যায়নেই ঘোষাল আর বিনয় তালুকদার বসলেন। নিরঞ্জন বোস কোমরে দু হাত তুলে দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আমাকে দেখলেন খানিকক্ষণ। শিকারে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে টিকটিকি যেমন করে কাঁচপোকা দেখে তেমনি। আমার বিনয়নম্র মূর্তিটা আরও চক্ষুশূল হল বোধ হয়। দেখার ধৈর্যও গেল।

মশাই, বিভীষণের নাম শুনেছেন?

আমি নিরুত্তর।

বলি লঙ্কা-কাণ্ডে বিভীষণের নামটা কি মশাইয়ের শোনা আছে?

সঠিক অনুধাবন না করেই ঘাড় নাড়লাম, আছে।

যতই রাম-অবতারের দলে এসে যোগ দিক, কেউ তার সুখ্যাতি করে নি, সবাই তাকে ঘরের শত্রু বলেছে, বুঝলেন?

বুঝলাম, বুঝেও চুপচাপই বসে রইলাম।

এবারে বেশ কড়া করে আর এক দফা আক্রমণের জন্যেই যেন প্রস্তুত হয়ে আসন নিলেন তিনিও—মশাই, এত পরিশ্রম করে, অসুস্থ শরীর সত্ত্বেও ঘোষালদাকে নিয়ে (ঘোষালদার শরীরে অসুস্থতার কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে নি) প্রাণপাত পরিশ্রম করে এতখানি এগোলাম—আর আপনি গিয়ে কুটকুট করে ভাঙানি দিয়ে এলেন? বলিহারি মশাই এই লেখকরা!

ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠেছি, স্বভাববিরুদ্ধ বলে নিজেও সেটা উপলব্ধি করি নি। করলাম, সবটুকু বক্তব্য কণ্ঠনিঃসৃত হয়ে যাবার পর। বলেছি, আপনি কি বলছেন ভেবে বলুন, কোথায় বসে বলছেন ভেবে বলুন, আমার ঘরে বসে এভাবে আমাকে অপমান করার অধিকার আপনার আছে বলে আমি মনে করি না। আমি কাউকে ভাঙানি দিতে যাই নি। মিসেস ঘোষাল আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গেছেন বলে গেছি। আমি শুধু বলেছি, আমি আপনাদের কোনো প্ল্যানেরই খবর রাখি না। আপনারাই বরং আমার নাম ভাঙিয়েছেন, বলেছেন আমার গল্প ছবি করবেন। আমি বলেছি আমি তাও জানি না। কিছু না জানলে কি করে বলব আমি জানি? আমার গল্প আপনাদের ছবি করতে হবে না, আমি নেহাত অপদার্থ লেখক বলেই আপনার সঙ্গে জুটেছি। আজই আমি মিসেস ঘোষালকে জিজ্ঞাসা করব, কি ভাঙানি দিলাম আমি—

আরও কিছু বলেছিলাম কিনা মনে নেই, হঠাৎ বোসের সঙ্গে চোখাচোখির ফলে ঝোঁক কেটে যেতে থেমে গিয়ে দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

নিরঞ্জন বোস পৃথিবীর সপ্ত বিস্ময়ের একটির সম্মুখীন যেন, কিন্তু তাঁকে মুখ-ব্যাদানের অবকাশ দিলেন না সদানন্দ ঘোষাল। বিনয় তালুকদার বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। নড়েচড়ে বসে একটা সিগারেট ধরালেন, তার পর অন্তর্তুষ্টিতে একটু জোরেই হেসে উঠলেন। বললেন, এই জন্যেই লেখকদের আজও আমি শ্রদ্ধা করি, আপনি মশাই আমাদের মস্ত একটা দুর্ভাবনা কাটালেন, দরকার হলে আপনিও যে সততার ভিত্তিতে শক্ত হতে পারেন সে সম্বন্ধে আর আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি খুশী হয়েছি, আর মনে বলও পেয়েছি, রিয়েলি আই অ্যাম গ্ল্যাড!

তাঁর কথা শুনে হকচকিয়ে গেছি আমি আর নিরঞ্জন বোস—দুজনেই। কিন্তু বোসের ক্ষমতার সামনে আমি নগণ্য। দু-চার মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মুখভাব বদলে গেল। সোজাসুজি একখানা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। আমার হাত টেনে নিয়ে তাঁর প্রসারিত হাতখানা ধরিয়ে দিলেন।

বোসের সঙ্গে চোখাচোখি আবার। তার পর জলবৎ—

সব কিছু বিশদ বিশ্লেষণের দায়িত্ব সদানন্দ ঘোষালই নিলেন এবারে। তার সারমর্ম, আসল কাজ নিয়ে এত ব্যস্তছিলেন তাঁরা যে আমার সঙ্গে আলোচনার কোনো অবকাশ পেয়ে ওঠেন নি। ডান হাতের কাজে বাঁ হাতের যেমন আপত্তি থাকে না, আমার সমর্থন এবং অনুমোদন প্রসঙ্গেও তাঁরা তেমনই নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু মাঝখানে করুণাময়ী যে হঠাৎ আমাকে ডেকে বসবেন সেটাই কেউ ভাবেন নি। কাজেই দোষ তাঁদেরও না, আমারও না। তবে করুণাময়ীর টাকাটা দেবার ব্যাপারে আমি আর একটু উৎসাহ দেখালে ভালো করতাম। অবশ্য টাকা করুণাময়ী দিতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু ওই সামান্য কটা টাকার জন্যে তাঁর মনে কোনোরকম খটকা না লাগলেই ভালো হত, ইত্যাদি।

আমি বললাম, টাকার জন্যে তো তাঁর একটুও খটকা লাগে নি—বিশ হাজার ছেড়ে চল্লিশ হাজারও দিতে আপত্তি নেই বলেছেন, শুধু সিনেমার ব্যাপারটাই তেমন পছন্দ নয়।

উদার প্রসন্নতায় ঘোষাল নিঃশব্দেই হেসে নিলেন খানিক। তার পর জবাব দিলেন, নিজের স্ত্রী হলেও মেয়েছেলে নন তিনি, এ তো আর বলতে পারি নে। তাঁর মনে পাঁচরকম সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দেওয়াই স্বাভাবিক। পুরুষের শিল্পক্ষুধার ফলটি হাতেনাতে ধরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁদের পুরোপুরি বোঝানো যাবে না। সখেদে বড় করে নিশ্বাস ফেললেন একটা, নেহাত একটু দুঃসময় চলেছে, নইলে ওই বিশ-চল্লিশ হাজার টাকা তো আমার পকেট ঝাড়লেও বেরুত একসময়।

মিথ্যে গর্ব যে করেন নি সে তো নিজেই জানি। ভদ্রলোকের জন্যে ভিতরে ভিতরে দরদই অনুভব করতে লাগলাম একটু। একটু সান্ত্বনা দেওয়াই উচিত মনে হল। বললাম, আপনার স্ত্রী মেয়েছেলে হলেও সেরকম মেয়েছেলে নন, আপনার প্রতি তাঁর ইয়ে, মানে অনুরাগ স্ত্রীর মতোই।

ঘোষাল খুশী হলেন, এবং তাঁকে খুশী হতে দেখেই বোস আর তালুকদার সম্ভবত এই প্রথম আমার মতামত সমর্থন করলেন। বোস বললেন, নিশ্চয়, তাঁর মতো মহিলা হয় নাকি।

তালুকদার বললেন, শি ইজ ডিভাইন।

অতঃপর ব্যবসায়ের আলোচনা। প্রথমেই শুনলাম, আসন্ন ছবির অংশীদার হবার জন্য ঘোষালকে ষাট হাজার টাকা দিতে হবে।

শুরুতেই বাধা দিতে হল।— মিসেস ঘোষাল যে বললেন, কুড়ি হাজার দিতে হবে।

সদানন্দ ঘোষাল মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন আবার। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সকল কৃতিত্বের

রহস্যটা ফাঁস করে দিতে চান না। সেই হাসি বোস আর তালুকদারের মুখেও। তালুকদার সকৌতুকে জিজ্ঞাসাই করে বসলেন, ভাবুন দেখি কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে ষাট হাজারের অংশীদার হওয়া যায় কেমন করে?

বোস বললেন, তবে আর এতদিন ধরে এত খড়কুটো পোড়ালুম কি মশাই—সাধে কি আপনার কাছে আসা হয় নি, আমাদের কি আহার নিদ্রা জ্ঞান ছিল।

রহস্যটা বেশ রসিয়েই উদ্‌ঘাটন করলেন তাঁরা।

প্রযোজককে ছবির জন্যে নগদ কুড়ি হাজারই দেওয়া হবে। বাকি চল্লিশ হাজার যে-ভাবে দেবেন তাও নগদ দেবারই সামিল। পরিচালক হিসেবে ঘোষালের পারিশ্রমিক ধার্য হয়েছে কুড়ি হাজার টাকা। সেই টাকা তিনি নেবেন না— সেটা মুলধনের সঙ্গে যোগ হবে। হল চল্লিশ হাজার। বোস আর তালুকদার সহকারী পরিচালক এবং সহকারী আলোক-শিল্পী হিসেবে কাজ করবেন। এমন দুটি নিপুণ শিল্পীর এতখানি আত্মত্যাগের প্রশংসা করলেন ঘোষাল। বোস সহকারী পরিচালক হবেন কারণ, পরিচালক স্বয়ং ঘোষাল, আর তালুকদার সহকারী আলোক-শিল্পী হবেন, কারণ প্রযোজকের নিজস্ব একজন আলোক-শিল্পী আছে। এই সহকারীদ্বয়ের সঙ্গে চার হাজার করে আট হাজারের চুক্তি। আর কাহিনীকার হিসেবে আমার সঙ্গে ছ হাজারের চুক্তি হবে—হল চৌদ্দ হাজার। এই চৌদ্দ হাজারের এক কর্পদকও প্রযোজককে দিতে হবে না—এটাকার দায়িত্ব সদানন্দ ঘোষালের। তা হলে ষাট হাজারের আর বাকি থাকল ছ হাজার। এ-টাকাটা পুষিয়ে দেওয়া হবে প্রযোজককে বাড়তি টাকা-প্রাপ্তির রিসিট দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর ইনকাম-ট্যাক্স বাঁচিয়ে। যেমন , পরিচালক হিসেবে ঘোষালদের সঙ্গে বিশ হাজারের কনট্রাক্ট হলেও তিনি তিরিশ হাজার টাকার রিসিট দেবেন, আমি দেব ন হাজার টাকার রিসিট, বোস-তালুকদার দেবেন ছ হাজার ছ হাজার বারো হাজার টাকা প্রাপ্তির রিসিট। ফলে ইনকাম-ট্যাক্সের দিক থেকে ছ হাজার টাকার বেশিই বাঁচবে প্রযোজকের—বেশি লাভ হলে সবই তো প্রায় ইনকাম-ট্যাক্সের গহ্বরে যায়। তা ছাড়া ঘোষালের গাড়িটাও বিনা পয়সায় খাটবে, সেও কম টাকার ব্যাপার নয়।

প্রস্তাব শুনে আমি তাজ্জব।

তাই দেখে ঘোষালের উদ্দেশে বক্রসুরে বোস বললেন, ওঁর মনে বোধ হয় এখনও খটকা লেগে আছে কিছু।

মুচকি হেসে সদানন্দ ঘোষাল অভয়ই দিলেন বলতে গেলে, আপনার কিচ্ছু ভাবনা নেই মশাই—টাকাটা দিনকতক পরে পাবেন, এই যা—কিন্তু তাও ডবল পুষিয়ে যাবে।

ডবল পুষিয়ে যাবে কি করে সেটা জেনেও কেন জানি আশ্বস্ত হওয়া গেল না। সদানন্দ ঘোষাল ওই ছবির মূলধন উঠে আসার পর পাঁচ আনার লাভের অংশ পাবেন। শুধু মূলধন উঠলেই তো আমরা যে যার টাকা পেয়ে গেলাম।

কিন্তু শুধু ওইটুকু দিয়েই বিদেয় করবেন আমাদের তেমন অনুদার লোক নন সদানন্দ ঘোষাল। পাঁচ আনার লাভের অংশে আমরা তিনজন এক আনা করে তিন আনা পাব, আর তিনি নিজে কুড়ি হাজার নগদ আর কুড়ি হাজার পরিচালনার বাবদ দিয়েও

(এ ছাড়া ইনকাম-ট্যাক্সের বাড়তি দায় ঘাড়ে নেওয়া তো আছেই) মাত্র দু আনা দেবেন।

অর্থাৎ, আসন্ন চিত্রটির আমরা এক আনা করে প্রযোজক হয়ে বসেছি!

খোদ প্রযোজকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা, সই-সাবুদ,গল্পের চিত্রনাট্য দাঁড় করানো ইত্যাদিতে কোথা দিয়ে যে গোটা দুটো মাস কেটে গেল, টের পেলাম না। করুণাময়ী বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে নিজের এক ছোট মামাতো ভাইকেও জুড়ে দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বেকার বসে আছে, কাজে-কর্মে সাহায্যে করবে, দিদিকে ধরে পড়েছে। তাকে হাত-খরচা যা দেবার করুণাময়ীই দেবেন বলেছেন।

ছেলেটিকে বেশ চটপটে চালাক-চতুর মনে হয়, নাম বগলাচরণ। স্বল্পভাষী কিন্তু বেশ মন যুগিয়ে চলতে পারে। সদানন্দ ঘোষাল গোড়ায় গোড়ায় তার ওপর বিরূপ ছিলে একটু মন্তব্য করেছিলেন, শালা ত্যাঁদড়—ওভাবে থাকলে কি হবে! কিন্তু পরে খুশী হয়েছেন, কারণ বগলাচরণ দিন কতকের মধ্যেই প্রযোজকের কাছ থেকে একটা মাসোহারা আদায়ের ব্যবস্থা করে বাইরে বাইরে তাঁর লোক হয়ে বসেছে, আর ভিতরে ভিতরে তাঁদের আলাপ-আলোচনা আশাভরসার খবরাখবর আমাদের সরবরাহ করছে।

ইতিমধ্যে অনিশ্চিত পরিকল্পনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সেই অস্বস্তি আমারও কেটে গেছে। ভিতরে ভিতরে একটা উদ্দীপনা অনুভব করছি। বেশ ছবির আলোচনায় বাতাস সরগরম। খবরের কাগজ আর চিত্র-সাহিত্য-পত্রগুলি এই ছবি প্রসঙ্গে নিঃসংশয়ে এক অভূতপূর্ব শিল্পসৃষ্টির কথা লিখেছেন। তাঁদের ঢালা প্রচার-কার্যে প্রযোজকটি গোড়ায় গোড়ায় অন্তত ভারী খুশী। সদানন্দ ঘোষালের প্রতিভায় আস্থা তো ছিলই, সুচনাতেই এত আড়ম্বর দেখে সেই আস্থা আরও বেড়েছে।

একটা কথা বলে রাখা দরকার। ঐতিহাসিক পটভূমির প্রেমের গল্পে ঘোষাল, বোস আর তালুকদারের অনুরোধে শৌর্য, মারামারি, আত্মদান, হাস্যরস কিছু কিছু ঘটনা সংযোগ করতে হলেও এবারে আর গল্প নিয়ে তাঁরা তেমন নির্মমভাবে নাকাল করেন নি আমাকে। আমি তাঁদের কিছু কিছু মেনে নিয়েছি, তাঁরাও আমার কিছু কিছু মেনে নিয়েছেন। তাঁদের এ ধরনের সহিষ্ণুতা দেখে একটু অবাকই লাগছিল। পরে মনে হয়েছে এর পিছনে করুণাময়ীর কড়া নির্দেশ কিছু আছে। তাছাড়া গল্প দাঁড় করানোর সময় প্রযোজক এবং তাঁর আস্থাভাজন গল্প-বোদ্ধা দুই-একজন সব সময়েই উপস্থিত থাকতেন।

যাই হোক, ছবির চার আনা কাজ একরকম নির্বিঘ্নেই উতরে গেল। অবশ্য বগলাচরণের রিপোর্ট খুব নির্বিঘ্নে নয়, ছোটখাটো মতান্তর কিছু কিছু লেগেই আছে প্রযোজকের সঙ্গে। কিন্তু প্রযোজকই বুদ্ধিমানের মতো আপস করে নিয়েছেন। ছবি করতে গেলে পরিচালককে চটানো চলে না এটুকু তিনি জানেন।

কিন্তু এর পর ক্রমশ প্রযোজকটির মুখ-ভার দেখা যেতে লাগল। ঘোষাল নিখুঁত ছবি করবেন, কোনো ত্রুটি থাকতে দেবেন না, তার ফলে এক-একটা 'শট্' ক'বার করে 'টেক' আর 'রিটেক' করা হচ্ছে, এখন আর তার হিসেব রাখাই মুশকিল। এই

ত্রুটিহীনতার প্রতি ক্রমশই নিষ্ঠা বাড়ছে ঘোষালের। শুধু ঘোষালের নয়, তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী দুটিরও। ফলে ছ আনা ছবি হতে যে ফিল্‌ম খরচা, তাতে দেড়খানা আস্ত ছবি হতে পারে।

এ ছাড়া এতদিনে গোটা ছবিটাই শেষ হয়ে যাবার কথা, তার বদলে এই শম্বুকগতির দরুন স্টুডিও ভাড়া পড়বে তিন গুণ, আর্টিস্ট খরচা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচাও তাই।

বগলাচরণ একদিন চুপিচুপি জানলে, প্রযোজক মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। ঘোষালের কাছে নাকি আবেদনও করেছিলেন, হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, বলেছেন, শেষ হোক আগে ছবি, মুখের হাসি তখন মুখে কুলোবে না—ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন স-সঙ্গী ঘোষালের প্রস্তাব শুনে আমাকেও মাথায় হাত দিতে হল। তাঁদের বক্তব্য, নায়িকার ভূমিকাটিতে যিনি অভিনয় করছেন, অর্থাৎ, শম্পা দেবী বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছেন না, বরং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনোরমা দেবী 'সেট' মাত্ করে দিচ্ছেন, অতএব গল্পটাকে খানিকটা ঘুরিয়ে তাঁকেই নায়িকার মর্যাদা দিতে হবে। সবাই যাঁকে নায়িকা ভাবছেন আসলে তিনি নায়িকা নন দেখা যাবে যখন, সেটা একটা ভালো স্টান্টও হবে। সেই অভিনবত্বে দর্শকও মুগ্ধ হবে।

ব্যাপারটা আর একটু বিশদ করে বলা দরকার শম্পা দেবী নতুন বয়সের বেশ নামী অভিনেত্রী। তাঁর জনপ্রিয়তার খবর প্রযোজক ভালোই রাখেন বলে চড়া মূল্যে তাঁকে নায়িকার ভূমিকায় এনে দাঁড় করানো হয়েছে। আর মনোরমা দেবী ঠিক বিগতযৌবনা বা বিগতশ্রী না হলেও বয়স্কা শিল্পী। এখন তাঁর চাহিদা আর আগের মতে নয়। ছবির গল্পেও সেই ভূমিকাটি একটি বয়স্কা নারীরই। প্রণয়দ্বন্দ্বে নতুন বয়সের নায়িকার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ছলাকলা কখনও কুটিল কখনও বা হাস্যকর। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিণতি করুণার উদ্রেক করার কথা।

কিন্তু সদানন্দ ঘোষাল আর তাঁর সহকর্মীরা এক অপূর্ব আত্মত্যাগ পর্বের মধ্য দিয়ে তাঁকে এমন মহীয়সী করে তুলতে চান যে, নায়ক শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রতি অনুরাগী হবেন এবং তাঁকে গ্রহণ করবেন। আর আসল নায়িকাটি তখন এক অভাবিত হিংসার আগুন জ্বেলে নিজে দগ্ধ হবেন এবং সকলকে দগ্ধ করতে চাইবেন।

গল্পে এ কাজটুকু করা যে কত সহজ অথচ কত বড় ফলপ্রসূ ধাক্কার ব্যাপার সেটাই আমাকে বোঝানো হল অনেকক্ষণ ধরে।

হাঁ না কিছুই বলে উঠতে পারলুম না। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। একটু ভাবনা-চিন্তার অবকাশ প্রার্থনা করে তখনকার মতো অব্যাহতি পাওয়া গেল।

দুপুরে স্টুডিওতে এসে দেখি প্রযোজকের মুখ কালো। উস্কোখুস্কো কাঁদ-কাঁদ মূর্তি। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে হাত দুটো ধরে সকাতরে বললেন, এমনিতেই ডুবতে বসেছি, এবারে একেবারে গেল্লাম—আপনি বাঁচান। মরণকালে লোকে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে শুনেছি, প্রযোজক আমাকে আঁকড়ে ধরলেন।

আট আনা ছবি তুলতেই তাঁর এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে।

এক মনোরমা দেবী ছাড়া অন্য প্রায় সব আর্টিস্টই বিগড়েছে শুনলাম। টেকনিশিয়ানরাও। এখন গল্প অন্যথায় নায়িকা বদলের ব্যাপারটা ঘটে গেলেই ভরাডুবি সম্পন্ন হতে পারে।

নায়িকা-বদলের পিছনে আসল রহস্যটাও আঁচ করা গেল। প্রযোজকের ইশারা সত্ত্বেও নায়িকা শম্পা দেবী পরিচালককে অথবা তার সঙ্গী দুজনকে তেমন প্রশ্রয় দেন নি। প্রশ্রয় একটু বেশিরকমই প্রত্যাশা করেছিলেন তাঁরা ও সেটা বোঝা গেছে মনোরমা দেবীর প্রতি তাঁদের প্রীতির বন্যা দেখে। সেট-এ পর্যন্ত বিসদৃশ ঠেকেছে সকলের চোখে। স্বয়ং পরিচালক আর তাঁর সঙ্গীরা বাড়ি থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসেন তাঁকে—দুপুরে এক ঘণ্টার জায়গায় আড়াই ঘণ্টা বসে তাঁরা নিরিবিলিতে তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খান। আবার শুটিং-এর পর নিজেদের গাড়িতেই তাঁকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোন।

আর বেশি বলা দরকার ছিল না। ব্যাপার কত দূর গড়ানো সম্ভব সে অভিজ্ঞতা কিছু ছিলই। এর ওপর সেদিন শুটিং ফ্লোর-এ এসে স্বচক্ষেও দেখলাম কিছুটা।

শম্পা দেবী আর মনোরমা দেবী দুজনার শুটিং ছিল—একটা গুরুগম্ভীর মুহূর্তে পরস্পরের সম্মুখীন তাঁরা । শম্পা দেবীর চোখে সেদিন আগুন জ্বালার কথা, সেই আগুন একটু বেশি মাত্রাতেই জ্বলছিল দেখলাম। কিন্তু তার সবটা অভিনয়ের দরুন নয় বোধ হয়। পরিচালক এবং তাঁর সহকারীদের সমস্ত মনোযোগ মনোরমা দেবীর প্রতি। শুটিং ফ্লোরে জোরালো আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন নায়িকা এবং সহনায়িকা। মেক-আপ ম্যানের হাত থেকে পাফ নিয়ে নিরঞ্জন বোস ব্যস্তসমস্তভাবে নিজের হাতে মনোরমা দেবীর মুখে বুলিয়ে দিয়ে এলেন ধারকতক। বিনয় তালুকদারের মতে মহিলার কাঁধের শাড়িটা একটু বেশি নেমে গিয়েছিল বোধ হয়, তিনিও সেটুকু শুধরে দিয়ে এলেন। পরিচালক সদানন্দ ঘোষাল মনোরমা দেবীর কাঁধে হাত রেখে শেষ বারের মতো পার্ট বুঝিয়ে দিলেন। সকলেই জানে ঘোষাল নিজে অভিনয়-কুশলী—অভিনয় করেই অভিনয় বুঝিয়ে দেন তিনি।

রেডি। সাইলেন্স। অল লাইটস অন্। মনিটার। নিন, বলুন। মনোরমা দেবীর প্রতি ঘোষালের ইঙ্গিত।

সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা দেবী যে কথা বললেন তাতে শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকা নন, দূরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমিও হতভম্ব।

জবাবে নায়িকা শম্পা দেবীর কি বলার ছিল তা আর মনে নেই। কিন্তু যা তিনি বললেন, সেটুকু স্পষ্টই কানে গেল। স্থির নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে তিনি বললেন, আপনার তো এসব কথা বলার ছিল না?

বিব্রতমুখে মনোরমা দেবী ঘুরে তাকালেন পরিচালকের দিকে।

লাইটস্ অফ। পরিচালক এগিয়ে এলেন, ওনার যা বলার উনি ঠিকই বলেছেন, ডায়লগ একটু অদলবদল করা দরকার হয়েছে— আপনার যা বক্তব্য আপনি বলে যান না।

নায়িকার মেজাজ গরম, সদর্পে প্রতিবাদ করলেন, উনি আমাকে এভাবে গালাগাল দিয়ে কথা বলবেন কেন, ওঁর তো আমার সামনে শুকনো মুখে ভয়ে ভয়ে থাকার

কথা, গালাগাল তো শেষের দিকে আমি ওঁকে করব।

অন্য সকলে নির্বাক দ্রষ্টা। ঘোষাল জবাব দিলেন, শেষের দিকে আপনি কি বলবেন সেটা শেষের দিকে ঠিক করা যাবে, এখন আপনার যা পার্ট আপনি তাই বলে যান।

নিরঞ্জন বোস সাহায্যোর্থে এগিয়ে এলেন, মিষ্টি করেই বললেন, আপনি এতদিন অভিনয় করছেন, দরকারে ডায়লগ এমন কি পার্টসুদ্ধু ওলট-পালট করে দিতে হয় এ তো জানেনই—

আপনি থামুন। চোখ পাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন শম্পা দেবী, তারপর ঘোষণা করলেন, ডায়লগ বা পার্ট কি ঘোরানো হয়েছে শেষ পর্যন্ত না জেনে তিনি একটি কথাও বলবেন না।

নিজের মাথার চুল ছেঁড়ার উপক্রম করে অসহায় প্রযোজক আমাকে শুনিয়ে চাপা আক্রোশে বললেন, ওই দেখুন। রোজ এই একটা না একটা ফ্যাসাদ বাধবেই, একজনের মুখ দিয়ে উনি রাজ্যের ভালো ভালো কথা বলাবেন, আর একজন জ্বলে জ্বলে উঠবেন। আমি যাই কোথা?

বলতে বলতে হন্তদন্ত হয়ে সেট-এর দিকেই গেলেন তিনি। রফাও শেষ পর্যন্ত একটা করে এলেন। পার্ট বদলের ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবী থাকল। সংলাপ বদলের ব্যাপারে মনোরমা দেবী আর একটু নরম মুখ করে এবং আর একটু কম কড়া করে কথাগুলো বললেন শুধু।

এর পর শম্পা দেবীর সংলাপে অভিনয়ের স্থিরতা বা ধীরতা গেল। উগ্র ঝাঁঝালো কর্কশ শোনাল তাঁর কথাগুলো।

প্রযোজক দূর থেকে আবার মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, গেছি—।

যাই হোক, ঢিমে তেতালায় শুটিং চলল এক রকম। গোটা দিনে গুটি তিনক 'শট' নেওয়া হল। তারপরেই ছোটখাটো আর এক গোলযোগ।

সেই শট-এ সেট্ থেকে নায়িকা শম্পা দেবীর রোষকষায়িত নাটকীয় প্রস্থানের ব্যাপার ছিল একটা। রাগ আর চেষ্টা করে ফলাতে হয় নি তাঁকে, সেটা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। কিন্তু পদক্ষেপের গোলযোগেই হোক বা যে কারণেই হোক প্রস্থানের মুখে নায়কের সঙ্গে সোজাসুজি সামনাসামনি ধাক্কা লেগে গেল একটা, আর তার ফলে ত্রস্ত বুকের বসন একটু বিসদৃশ ভাবেই স্খলিত হয়ে পড়ল।

শম্পা দেবী বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, টেম্পো কেটে গেল।

কাট্। পরিচালক ঘোষাল গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন। নায়িকাকে নির্দেশ দিলেন, যা ঘটে গেল সেটাই রিয়েলিস্টিক, শটটা ঠিক ওই ভাবেই তোলা হবে। অর্থাৎ ওই রকমই ধাক্কা খেতে হবে একটা, আর শাড়িটাও ওইভাবেই খুলে পড়বে। সত্যিকারের রাগের সময় এই রকমটিই স্বাভাবিক।

সোৎসাহে মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করলেন নিরঞ্জন বোস—রাইট।

নায়িকা বেঁকে বসলেন। ছোটখাটো ধাক্কা একটা লাগাতে রাজী আছেন, কিন্তু শাড়িটা ওভাবে খুলে পড়তে দিতে রাজী নন তিনি।

কিন্তু ঘোষালও ছাড়বার পাত্র নন, এই রিয়েলিস্টিক শটই নেবেন তিনি।

শেষে প্রযোজকের সকাতর মধ্যস্থতায় নায়িকা মাঝামাঝি রফা করলেন একটা, ধাক্কাটা ঠিকই থাকবে, আর শাড়ির অতটা বিসদৃশভাবে না হোক, কিছুটা খসে পড়বে।

কিন্তু শট্টা আর তোলার সময় হল না সেদিন, কারণ, নিখুঁত রিয়েলিস্টিক করার জন্য পরিচালক ধাক্কা খাওয়ার এবং আঁচল বিস্রস্ত হওয়ার এই একটি শট-এর 'মনিটার' করলেন, অর্থাৎ, রিহার্সাল দিলেন কম করে ছবার।

পর দিন থেকে দুই দলের টানা-হেঁচড়ায় হিমশিম অবস্থা আমার। সর্পাষদ পরিচালক বলেন, গল্প ঘোরান, মনোরমা দেবীর ভূমিকা বড় করে তুলুন—অভূতপূর্ব ছবি হবে তাতে। আপনি না পারেন আমরা করে নিচ্ছি।

অন্যদিকে প্রযোজকের কাতর মিনতি, রক্ষা করুন, মরে গেলাম।

রক্ষা আমিই করতে পারি—এই বিশ্বাস তাঁর কেমন করে হল বলতে পারি না—কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি সব ঠিক করে দিতে পারি এই ঈঙ্গিত তিনি অনেকবার করেছেন। মনে হয়, টিপটা বগলাচরণই দিয়েছে তাঁকে। ঘোষাল তাঁর স্ত্রীটিকে বিশেষ সমীহ করে চলেন, আর সেই স্ত্রীটি সুনজরে দেখেন আমাকে—প্রযোজকের কথায় আভাসে এই রকমই মনে হয়েছে।

কিন্তু করুণাময়ী সুনজরে কেমন দেখেন আমাকে, তাও সেদিন সভয়ে প্রত্যক্ষ করা হয়ে গেল আমার। সদানন্দ ঘোষালের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। সামনা সামনি করুণাময়ীর সঙ্গে দেখা। একটু অভ্যর্থনাও করেন নি বা একটা ভদ্রতাসূচক কুশল প্রশ্নও না। থমথমে গম্ভীর মুখে শুধু তাকিয়েছেন, দুই চোখের আগুনে সর্বাঙ্গ যেন ঝলসে দিয়েছেন এক দফা, তার পর ঘরে ঢুকে গেছেন। সেই দৃষ্টির সামনে পড়ে আমার মুখ থেকে বুক পর্যন্ত কাঠ।

বুঝলাম, বগলাচরণ শুধু প্রযোজককেই ত্রাণের রাস্তা দেখায় নি, করুণাময়ীকেও ঘোষালের অভূতপূর্ব ছবির সকল সমাচার সরবরাহ করে আসছে। শুধু এটুকুর জন্যেই যে তাকে এই ছবির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সে-সম্বন্ধেও আর আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। ঘোষালের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, বলছি না, ঘোষাল আর তাঁর সঙ্গী দুজন যা বলছেন শুনছি শুধু, এমন সময় চাকর এসে খবর দিল, মা পাশের ঘরে ডাকছেন আমাকে।

সকলেই চমকে উঠেছিলম। অবশ্য আমি একটু বেশি। ঘোষাল চাপা-গলায় নির্দেশ দিলেন, যান, ছবির কথা কিছু জিজ্ঞাসা করলে একটু ভালো করে বলবেন-টলবেন—সেটা মিথ্যে বলা হবে না কিছু।

যে-মুখ করে করুণাময়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম, লক্ষ্য করলে তাঁর করুণা হবার কথা। লক্ষ্যও করলেন কিন্তু উল্টে যেন অকরুণ হয়ে উঠলেন আরও। বসতে বললেন না, নিজে বসে গোটাকতক সিনেমার মাসিক-পত্র ওলটাচ্ছিলেন। সেই সব কাগজের ফোটোগ্রাফারা নবাগত-প্রতিভা পরিচালক সদানন্দ ঘোষালের সঙ্গে যশস্বিনী অভিনেত্রী মনোরমা দেবীর আলোচনারত কতকগুলো অন্তরঙ্গ-মুহূর্ত ক্যামেরায় ধরে ফেলেছেন।

আমার আগেই দেখা ছিল।

করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আজ এখানে কি জন্যে এসেছেন?

ঢোক গিলে বললাম, ছবির আলোচনা ছিল....

কি আলোচনা? অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর।

গল্প সম্বন্ধে.....

কেন, গল্প আপনি লিখে দেন নি?

দিয়েছিলাম, এখন বদলাবার দরকার ভাবছেন ওঁরা...

আপনি কি ভাবছেন?

আমি নিরুত্তর। করুণাময়ী চেয়ে আছেন। কঠিন হাসির আভাস।—মনোরমা দেবী তা হলে আপনাকেও একটু-আধটু খাতির-টাতির করছেন?

রাগই হয়ে গেল, কাঁহাতক সয়। এমনিতেই বিনা পয়সায় খেটে মরছি। বললাম, আপনি অনুরোধ করেছিলেন বলেই আমি এতে এসেছি, নইলে আমি এ-সবে আসতুম না, আমার কারও খাতির-টাতিরে দরকার নেই।

মুখভাব এবারে বদলাল একটু, কঠিন ভাবটা গেল। বললেন, আমার অনুরোধেই বা আসতে গেলেন কেন তা হলে? হাসি চেপে গম্ভীর হলেন পরক্ষণে, আপনি আগে মেয়েছেলের নামে গল্প লিখতেন শুনেছি, এখন পুরুষের নামে লিখছেন যখন নিজেকে পুরুষ ভাবাই উচিত—যা বললেন আপনার মনে থাকবে আশা করি।

রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরেছি, ঘোষালের সঙ্গেও আর দেখা করি নি। এর পর ঘোষাল বা যে-কেউ কিছু বলতে এলে কি জবাব দেব সরোষে তাও মনে মনে অনেকবার ঝালিয়ে রেখেছি।

কিন্তু গল্প নিয়ে কেউ আর কিছু বলতে এলেন না। অবাক হয়ে দেখলাম, ঘোষাল গল্পের পূর্বপরিকল্পিত কাঠামো ধরেই ছবি পরিচালনা করতে লাগলেন। শুধু আমার প্রতি স-সঙ্গী ঘোষালের ব্যবহারের একটু ব্যতিক্রম দেখা যেতে লাগল। দেখা হলে নিরঞ্জন বোস কটমটিয়ে তাকান, বিনয় তালুকদার উদাস নেত্রে অন্য দিকে চেয়ে থাকেন— যেন ভালোমত চেনেনও না। আর ঘোষাল পরিচালকের গাম্ভীর্যে ছবির চিন্তায় মগ্ন হন। একদিন সখেদে টিপ্পনী কেটেছিলেন শুধু, নায়িকার বয়স আর চেহারা দেখে আপনিও ভুললেন তা হলে...... গল্প-লেখক হিসেবে কোথায় উঠতে পারতেন একবারও ভাবলেন না!

প্রযোজক অবশ্য কৃতজ্ঞ আমার প্রতি। সকলেরই ধারণা, ভিতরে ভিতরে কলকাঠিটি আমিই ঘুরিয়েছি। আমি বেচারা যে কিছুই করি নি সে-শুধু আমিই জানি।

কিন্তু আসল ব্যাপার অর্থাৎ শ্যুটিং-এর কাজ শেষের মাথায় এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রযোজক অর্ধমৃত। আরও সাত-আট মাস লেগে গেল প্রায়।

ভাবনা-চিন্তায় ভদ্রলোক আধপাগল। কোনো একটা তুচ্ছ ব্যাপারেও রিয়েলিস্টিক টাচ না লাগিয়ে ছাড়বেন না। পরিচালক ঘোষাল, ফলে প্রতি শট্ই উল্টেপাল্টে তিনবার করে তোলা হয়। তা ছাড়া ছবিটা যেন মহিলা শিল্পীদের নিয়েই। সেন্সারের কাঁচি যে

কী-ভাবে কচকচিয়ে উঠবে সেটা ভেবেও প্রযোজক ভয়ে দিশেহারা। এ-ছাড়া মহিলা শিল্পীদের সঙ্গে ঘোষাল এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাক্তিগত হৃদ্যতার ধকল কাটিয়ে উঠতেও হিমশিম অবস্থা তাঁর।

শেষের এই কটা মাস তোয়াজে তোষামোদে পরিচালকের পদযুগল ক্রমাগত তৈলসিক্ত করে কোনও প্রকারে শেষের মাথায় এসে পৌঁছলেন তিনি।

শেষ দিনের শ্যুটিং।

মাঝের একটা প্রহসনই বাকি ছিল শুধু, সেটা সেইদিন তোলা হবে।

বিষয়বস্তু, দুই দলের একটা মারামারি ধ্বস্তাধ্বস্তি হই-চই, খুন-জখমের ব্যাপার। নায়িকাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে উপনায়কের ষড়যন্ত্রে গুন্ডাদলের আক্রমণ। কিন্তু নায়কের দল আগেই সেটা টের পেয়ে গিয়েছিল, এবং এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুতও ছিল।

শেষ দিনের শ্যুটিং, তাই সকলের মনে আনন্দ। যাকে বলে, মেরি ডে। পরিচালকের কাছে প্রযোজকের আবেদন, এ সিন্‌টা যেন হাস্যকর না হয়, বাস্তব হয় যেন। তার জন্যে যত ফিলম্‌ দরকার তিনি খরচা করবেন। ঘোষাল তাঁকে অভয় দিয়েছেন। মারামারির অভিনয়ের জন্য অনেকগুলো ষন্ডাকৃতি লোকই তিনি ভাড়া করে এনেছেন। তা ছাড়া গুন্ডাদলের সর্দার হয়ে ঘোষাল নিজেই নামছেন, অনেকবার অনেক জায়গায় তিনি নেমে পড়তে চেয়েছেন আগে— এদিকে ভদ্রলোকের অপরিসীম আগ্রহ। কিন্তু প্রযোজক বাধা দিয়েছেন তখন। কিন্তু শেষের এই সিন-এ নেমে পড়ার উৎসাহ তিনিই দিয়েছেন। এসব সিন-এ স্টুডিওর টেকনিসিয়ানরাও মহানন্দে দল বেঁধে নেমে পড়েন— কারোরই নামতে বাধা নেই। ঘোষাল প্রযোজককেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আপনিও নেমে পড়ুন না—।

প্রযোজক জানালেন, তাঁর শরীরটা ভালো নয়, ধস্তাধস্তি পোষাবে না—

ঘোষাল বললেন, আপনি তা হলে এ সিন্‌টার ফ্লোর কনডাক্ট করুন—কিন্তু ক্যামেরাম্যানকে যেন চট করে থামিয়ে দেবেন না আবার, অনেকক্ষণ চলবে সিন্‌টা। তার পর যতটা দরকার বেছে বেছে রেখে বাকিটা কেটে বাদ দেওয়া যাবে'খন।

প্রযোজক সায় দিলেন, সেই ভালো, নইলে রিয়েলিস্টিক হবে না হয় তো।

বলা বাহুল্য, ঘোষালের সঙ্গে পাগড়ি মাথায় বেঁধে বোস আর তালুকদারও নেমে গেছেন এই সিন-এ। তালুকদার আমাকেও নামার জন্যে টানাটানি করলেন, কিন্তু আমি রাজী নই দেখে অপদার্থজ্ঞানে বোস অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

যাই হোক, অনেক তোড়জোড়ের পর সিন শুরু। ঘোষাল সকলকে বুঝিয়েছেন, মারধোরটা যেন সত্যিকারের মনে হয়, একটু-আধটু লাগলে লাগবে।

পরিচালকের হয়ে প্রযোজক হাঁক দিলেন, সাইলেন্স ! রেডি--। লাইটস অন্‌ ! স্টার্ট সাউন্ড ! স্টার্ট— !

সঙ্গে সঙ্গে দুই দলের তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। ক্যামেরা চলতে লাগল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছি। সত্যি চমৎকার হচ্ছে। একটুও সাজানো মনে হয় না, সত্যিকারের

একটা নৃশংস হানাহানি যেন। মারপিট, চিৎকার, চেঁচামেচি। জনাচারেক লোক ঘোষালকে ধরাশায়ী করেছে, বোস-তালুকদারও মাটি নিয়েছে। নাটকে তাদের হারারই কথা, হারছেনও। করুণভাবে হারছেন। ওদিকে ক্যামেরা চলেছে তো চলেইছে।

কিল-চড়, এলোপাথাড়ি ঘুষোঘুষি।

একি কাণ্ড। কতক্ষণ চলবে আর ক্যামেরা ? কেমন একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছি আমি। মারামারিটা এত বাস্তব লাগছে কেন ?

হঠাৎই এক সময় প্রযোজক চেঁচিয়ে উঠলেন, কাট্ ! কাট্ !

মারামারি থেমে গেল। সকলে সরে দাঁড়াল।

কিন্তু সদানন্দ ঘোষাল, নিরঞ্জন বোস আর বিনয় তালুকদার মাটি থেকে আর ওঠেন না।

তাড়াতাড়ি অনেকেই এগিয়ে এলেন। আমিও। কিন্তু তার পরেই দুই চক্ষু স্থির আমার। ঘোষালের জ্ঞান নেই। মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন, সর্বাঙ্গে মারের দাগ, নাক মুখ পর্যন্ত থেঁতলে গেছে।

নিরঞ্জন বোসেরও প্রায় সেই অবস্থা, তবে অতটা নয়। এঁদের তুলনায় বিনয় তালুকদারের অবস্থা একটু ভালো, কিন্তু এমনিতেই দুর্বল বলে নড়াচড়ার শক্তি নেই তাঁরও।

প্রযোজকের ক্ষুব্ধ চিৎকারে চমক ভাঙল আমার। ভাড়াটে লোকগুলোর ওপর মারমুখী তিনি, যত সব কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খগুলোকে ধরে আনা হয়েছে, এটা যে অভিনয়, তা পর্যন্ত ভুলে গেছে, কাউকে এক পয়সা দেবেন না তিনি, উল্টে সকলকে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন, ইত্যাদি। টেকনিসিয়ানদের ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন কি সব, জল আনুন, ধরাধরি করে তুলুন !

কিন্তু তাতেও কিছু হল না। পর পর তিন-চারজন ডাক্তার এনে ফেললেন প্রযোজক, শেষে হাসপাতালে পাঠানো হল ঘোষালকে।

নির্বাক মূর্তির মতো একধারে দাঁড়িয়েছিলাম চুপচাপ। ক্যামেরা যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি পাশে এসে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন, কেমন দেখলেন দাদা রিয়েলিস্টিক সিন্‌টা ?

বোধশক্তিটুকু পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে ছিল এতক্ষণ। শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে রহস্যটা উপলব্ধি করলাম। তার পরেই নির্বাক আবার।

দিন সাতেক বাদে।

ঘোষালকে হাসপাতালে দেখতে গেছি। রোজই যাই একবার করে। প্রযোজকও প্রায়ই আসেন তাঁকে দেখতে। কোথা থেকে যে কতকগুলো জংলী মূর্খ ধরে আনা হয়েছিল সখেদে সেই বিস্ময়েই জ্ঞাপন করেন বার বার। সদানন্দ ঘোষাল তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না।

হাসপাতালে সেদিন করুণাময়ী সঙ্গে দেখা। তিনি রোজই বিকেলে আসেন জানি,

তাঁকে এড়াবার উদ্দেশ্যেই আমি সখেদে সেই বিস্ময়ই জ্ঞাপন করেন বার বার। সদানন্দ তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না।

হাসপাতালে সেদিন করুণাময়ীর সঙ্গে দেখা। তিনি রোজই বিকেলে আসেন জানি, তাঁকে এড়াবার উদ্দেশ্যেই আমি সকালে আসি। কিন্তু সেদিন সকালে এসে হাজির তিনিও।

আগের মতই কুশল-সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন। কোনোপ্রকারে ঘাড় নাড়লাম আমি, অর্থাৎ ভালো আছি।

ঘোষাল একটা কাগজ এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে, এই নাও করুণা, এতে সকলের নাম ঠিকানা আছে, প্রযোজকের, ক্যামেরা-ম্যানের আর আরও জনাকতকের—কাল-পরশুর মধ্যেই উকিলের চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা হয় যেন। থানায় ডায়েরিটা করা হয়েছে তো ঠিকমত?

জবাব না দিয়ে করুণাময়ী তাঁর হাত থেকে কাগজখানা নিলেন শুধু। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকে কবে ছাড়া পাচ্ছ বলেছেন এঁরা?

তরশু। কিন্তু তুমি এই চিঠির ব্যাপারটা ভুলো না।

করুণাময়ী জবাব দিলেন, না, ভুলব না।

ঘোষালের বাড়ি ফেরার দিনই একটা আমন্ত্রণ-পত্র পেলাম করুণাময়ীর, খুব সকালেই আসতে হবে এবং এখানেই খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

গেলাম। কিন্তু গিয়ে অবাক। ঘোষাল হাসপাতাল থেকে আসেন নি তখনও। এদিকে খাওয়া-দাওয়ার বেশ একটা বড় রকমের আয়োজন ফেঁদে বসেছেন করুণাময়ী। আমাকে বললেন, খাওয়া বিকেলে, আমাকে সাহায্য করার জন্যেই সকালে ডেকেছি আপনাকে।

কিন্তু কি ব্যাপার?

ব্যাপার আবার কি, এতদিন বাদে ফিরছেন, একটু আনন্দের আয়োজন দেখলে খুশী হবেন না?

বেলা দশটা নাগাদ গাড়ি করে নিজেই গিয়ে ঘোষালকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলেন তিনি। ঘোষাল সম্পূর্ণই সুস্থ হয়েছেন। আয়োজন দেখে এবং কারণ শুনে মনে মনে খুশীও একটু হলেন বোধ হয়। কিন্তু মাথায় তাঁর অন্য চিন্তা ঘুরছে। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওদিকে কত দূর কি হল, উকিলের চিঠি পাঠিয়েছ?

জবাবে করুণাময়ী আমার দিকে তাকালেন একবার, পরে তাঁর দিকে। চেয়েই আছেন।

পাঠাও নি?

পাঠিয়েছি। উকিলের চিঠি নয়, নেমন্তন্নের চিঠি। বিকেলে তাঁরা আসবেন কথা দিয়েছেন।

করুণাময়ী ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর অনেক কাজ।

সদানন্দ ঘোষাল চিত্রার্পিত। আমিও।

কুমারসম্ভব

এক দিন গেল। দু'দিন গেল। তিন দিন গেল। চার দিন গেল।

পাঁচ দিনের দিন খবরটা যেন খড়ের গাদায় আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ল। সকালে উর্মিলা খাটেব পা ছড়িয়ে বসে ছিল। বৃদ্ধা শাশুড়ী ঘরে ঢুকলেন প্রথম। মাথার কাপড় টেনে উর্মিলা উঠতে যাচ্ছিল। তিনি ব্যস্ত হয়ে বাধা দিলেন, থাক্ থাক্ উঠতে হবে না, বসো।

বউয়ের গা ঘেঁষে নিজেও বসলেন তিনি। মুখের কাছে মুখ এনে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। ছানি-কাটা চোখে আবছা দেখেন। সময় লাগল তাই। পরে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যি নাকি? অ্যাঁ? সত্যি?

আশায় আগ্রহে বৃদ্ধার ঘোলাটে চোখও চক্চকে দেখাচ্ছে। বউয়ের পিঠে ঘন ঘন হাত বোলাতে লাগলেন তিনি। অধীর কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বল না গো, বড় বৌমা যা বললে সত্যি?

উর্মিলা সামান্য মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল, সত্যি।

পিঠের ওপর শাশুড়ির শীর্ণ হাত থেমে গেল। দু'চার মুহূর্ত চোখ বুজে ইষ্টদেবতাকেই স্মরণ করে নিলেন বোধ হয়। পরে আবার তেমনি ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস...... ?

উর্মিলা এবারে আরো সুস্পষ্ট ভাবে মাথা নাড়লে।

আসল খবরে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি চাপা রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠলেন, কি জানি বাছা, কেমনতরো কাণ্ডজ্ঞান তোমাদের, আমাকে যমে ভুলেছে বলে তোমরাও ভুলতে বাকি রাখলে না কিছু।....বড় বৌমা কবে জেনেছে, আজ সকালে?

উর্মিলা নত মুখে জবাব দিল, চার পাঁচ দিন।

চার পাঁচ দিন। আবার কাছে ঘেঁষে এলেন তিনি। প্রচ্ছন্ন উত্তেজনায় মুখখানা বিকৃত দেখালো প্রায়। কানে কানে বলার মতো করে বললেন, দেখলে আক্কেলখানা? আমাকে এই তো একটু আগে জানালো। আর তোমাকেও বলি , সাত তাড়াতাড়ি বেছে তাকেই আগে বলতে গেলে? আমাকে খবর দিলে না তো হাঁড়িমুখ করে যেন শোককথা শোনালে—ষাট্ ষাট্ ষাট—তুমি বাছা একটু বুঝেসুঝে চলো।

আনন্দাতিশয্যে গাত্রোত্থান করে তাড়াতাড়ি তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। এর পরে কি হবে উর্মিলা আঁচ করতে পারে। এত কাল ধরে ঠাকুর দেবতাদের যত মানসিক পাওনা হয়েছে, এবারে সেগুলো সব সুদে আসলে মিটবে। কিন্তু আবারও ফিরলেন তিনি।—নিশি খবর পেয়েছে? তাকে জানিয়েছ তো?

উর্মিলা জবাব দিলে না। এক বারে জবাব না পেলে শাশুড়ি রেগে ওঠেন জেনেও। গলা চড়ল তাঁর, কথাটা তোমার কানে যাংচ্ছ না?

নিশিকে খবর দেওয়া হয়েছে?

উর্মিলা এবারে হেসে বলল, জায়গায় জায়গায় ঘুরছেন, কোথায় কোন ঠিকানায় লেখা হবে? চিঠি আসুক।

সত্যি কথা নয়। আবার এক পশলা থেকে অব্যহতি পাবার জন্যেই এ রকম বলল। জবাবটা শাশুড়ির মনঃপুত হল না খুব। ছেলের উদ্দেশে গজ গজ করতে করতে তিনি প্রস্থান করলেন।

দত্ত বাড়িতে পোষ্য-সংখ্যা খুব কম নয়। ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে এক জন পিসি-শাশুড়ি গোটা সংসারর এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। শাশুড়িরই সমবয়সী বিধবা তিনি। খবরটা শাশুড়ি প্রথম তাঁর কাছেই সংগোপনে প্রকাশ করলেন। ফলে অন্যান্য সকালে আধ ঘণ্টার মধ্যেই জেনে গেল। একে একে তারা এসে উর্মিলার ঘরে উঁকিঝুকি দিতে লাগল। ব্যাক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবতে গেলে খুব সুখবর নয় হয়তো। তবু খবর তো একটা। একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত খবর। যে ঝি-চাকরানীদের সাতবার ডেকেও সাড়া পাওযা যায় না, খুটিনাটি কাজের অছিলায় তারাও এক আধ বার দর্শন দিয়ে গেল। দুপুরের দিকে পাড়া-প্রতিবেশিনীদের আসা-যাওয়া সুরু হল। খবরটা তাদেরও কানে পৌছেছে। খবরের মত খবর, পৌছুবে বই কি। কেউ শুধু দেখে গেল। কেউ উপদেশ দিলে। কেউ বা ঠাট্টা-তামাশা করলে। শাশুড়ি মিষ্টি-মুখ না করিয়ে ছাড়লেন না কাউকে। বিকেলের মধ্যে বোধ করি গোটা মহেশপুরে জানাজানি হয়ে গেল, বংশধর আসছে দত্ত-বাড়িতে।

বংশধর। দত্তবাড়িতে? পশুপতিনাথ দত্তের বাড়িতে বংশধর।

এ বিস্ময়ের পিছনে একটুখানি সেকেলে ধরনের ইতিহাস আছে।

মহেশপুরে দত্ত-বাড়ির নাম-ডাক পাঠক অনুমান করে নিতে পারেন। সবাই চেনে। আর এ-বাড়ি সম্বন্ধে এখনো এক ধরনের আগ্রহ আছে সকলের মনে। মহেশপুরের মহেশ দত্ত আজ বিস্মৃত পুরুষ। কিন্তু পশুপতিনাথ দত্ত এখনো গল্পের মতই বহুবিশ্রুত। তাঁর রাগ, তাঁর দাক্ষিণ্য আর তাঁর বিলাস-অপচয়-এই তিন নিয়ে তাঁর পরিচয়। ক্রোধের আগুনে বহু জনের সর্বস্ব পুড়েছে, দাক্ষিণ্যের করুণায় বহু জনের সর্বস্ব লাভ হয়েছে। আর অপচয়ের ফাটল দিয়ে প্রাচুর্য-লক্ষ্মী দ্রুত নিঃসৃত হয়েছে। কিন্তু এ বাড়িতে নতুন বংশধর আসার সম্ভাবনায় লোকের আগ্রহ এবং বিস্ময়ের পিছনে রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে। এই বাড়ি বলেই সম্ভবত লোকে ভোলেনি সে কাহিনী। কোন সিদ্ধবাক্ ব্রাহ্মণ-পন্ডিতের না কি অভিশাপ আছে, নির্বংশ হবে দত্ত-বংশ। কেউ এর সঙ্গে ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যাকে জড়িয়েছে, কারো বা বিশ্বাস, পরদেশীয় বিচারলয়ে ব্রাহ্মণের একটি ছেলের ফাঁসির অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল পশুপতিনাথের জটিল ষড়যন্ত্রে এবং বিশ্বাসঘাতকতায়।

একটা অভিনব যোগাযোগও ঘটে যায়। পশুপতিনাথের হঠাৎ খেয়াল হয়, বড়

ছেলে আদিত্যনাথ নিঃসন্তান। বছর দশেক আগে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। অন্দর মহলে অবশ্য আড়ালে-আবডালে অনেক কথা হত। কিন্তু কর্তার ভয়ে বাইরে কেউ টুঁ শব্দটি করত না। কারণ, এই দুর্ধর্ষ মানুষটির অদ্ভুত দুর্বলতা ছিল বড় বউ শৈলবালার প্রতি। এই একজনের বেলায় স্নেহ-মমতায় একেবারে অন্ধ ছিলেন যেন। একবার বউকে গঞ্জনা দেবার ফলে ছেলেকে খড়ম-পেটা করে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন তিনি। বাড়ির বউকে এতটা প্রশ্রয় দিতে দেখে শাশুড়ি রাগে জ্বলতেন। আজও সংসারে বড় বউয়ের গুরু-গম্ভীর আধিপত্য দেখে সখেদে স্বর্গগত স্বামীকে টেনে আনেন তিনি— আশকারা দিয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিয়ে গেছে, ইত্যাদি। আজকের কথা থাক। কনিষ্ঠ নিশানাথ তখন ছোট। পশুপতিনাথ হঠাৎ আদিত্যনাথকে ডেকে আদেশ করলেন, আবার বিয়ে করতে হবে, এবং অচিরেই। শুনে আদিত্যনাথ হতভম্ব। পরে অবশ্য খুশি হলেন। বৌয়ের দেমাক ভাঙবে। বাবার ভয়ে হোক বা যে জন্যে হোক, বউকে বিলক্ষণ সমীহ করে চলতেন তিনি। আর খুশি বোধ হয় শাশুড়ীও হলেন। কত জায়গা থেকে অর্থব্যায় করে এক একটা তাবিচ-কবচ সংগ্রহ করে আনাতেন তিনি, কিন্তু ভক্তিভরে সে সব ধারণ করা দূরে থাক, গরবিনী একবার হাতে তুলে নিয়েও দেখেন নি, এবারে বুঝুক মজা—

কিন্তু মজা আবার ফিরে তাঁরাই দেখলেন। বিয়ের কথাবার্তা তোড়জোড় চলছে। শৈলবালা শ্বশুরকে শুনিয়ে শান্ত মুখে জানিয়ে দিলেন, বিয়ে আর একটা ছেড়ে পাঁচটা হোক, তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু এ রকম সংসারে ছেলেপুলে হবার নয়, এটা তিনি জেনে রেখে দিতে পারেন, এর জন্য বাইরে কারো শাপ-শাপান্তের দরকার ছিল না।

কথাগুলোর ইঙ্গিত স্পষ্ট। পশুপতিনাথ নির্বাক্। সেই থমথমে গম্ভীর মূর্তি দেখে দুরুদুরু বুকে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সকলে। এবারে নারী হত্যাই ঘটে কিনা কে জানে। কিন্তু কিছুই ঘটল না। শুধু বিয়ের কথাবার্তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তবে যত দিন জীবিত ছিলেন, পুত্রবধূকে আর কাছে ডাকেন নি কোনোদিন। দু'বছর না যেতে শৈলবালা যখন বিধবা হলেন, তখনো না। তাঁর অজস্র অপচয়ের মধ্যেও খানিকটা পৌরুষ ছিল, কিন্তু দুর্বলচিত্ত আদিত্যনাথ ভিতরে ভিতরে বিকল হয়ে আসছিলেন অনেক দিন ধরেই। তবু তাঁর মৃত্যুতে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতের যোগাযোগটাই বড় করে দেখলে মহেশপুরের লোকেরা। অভিসম্পাতের দশ বছর আগে থেকেই তিনি যে নিঃসন্তান ছিলেন, এও বিশেষ মনে থাকল না কারো।

তারপর পশুপতিনাথও গত হয়েছেন। একটানা কতগুলো বছর কেটে গেছে। পড়াশুনা শেষ করে নিশানাথ ধীরে সুস্থে বিষয়-আশয় বুঝে নিয়েছে। শৈলবালা বুঝিয়ে দিয়েছেন। দেওরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ঠিক প্রীতির নয়, বরং স্নেহের বলা যেতে পারে। কিন্তু তাও অনেকটাই প্রচ্ছন্ন। উচ্চ শিক্ষার দরুন হোক বা যে জন্যেই হোক, বংশগত অপচয়ের প্রভাবটুকু নিশানাথকে তেমন স্পর্শ করেনি। কিন্তু পিতৃকুলের সেই দুর্দম স্বভাব, বনিয়াদী মেজাজ, অথবা খেয়ালী চাল চলনের কিছুটা মিল লক্ষ্য করলে ওর মধ্যেও দেখা যেতে পারে। শিক্ষার সংযম এ দিকেও অনেকটাই রাশ টেনে রেখেছে

বটে, তবু বোঝা যায়।

সময় মতোই বিয়ে করেছে। সেও আজ আট-ন' বছর হয়ে গেল। কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি। হবার আশাও সবাই ছেড়েছে। শাশুড়ী এবারে অবশ্য ঊর্মিলাকে ইচ্ছে মতো তাবিচ-কবচ পরিয়েছেন। শৈলবালা দেখেছেন। বাধা দেননি। বরং মাঝে-মধ্যে বিদ্রূপ করে বলেছেন, পর, পরে দ্যাখ্— এ বাড়িতে ছেলেপুলে হওয়া তো দৈবেরই ব্যাপার।

এ ধরনের শ্লেষ কানে এলে নিশানাথের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অগ্রজের দ্বিতীয় বিবাহ পরিকল্পনার প্রহসন ভোলেনি। তবু চুপ করেই থাকে। ভয়ে নয়, ভক্তিতেও নয়। সে সব ধাতে লেখেনি। বলে না, বলে কিছু লাভ নেই বলে। শৈলবালা ঝগড়া-বিবাদের ধার দিয়েও যাবেন না। তাঁর শান্ত নীরবতাই ফিরে ব্যঙ্গ করবে ওকে। তা ছাড়া, ভ্রাতৃজায়ার অন্তরের বলিষ্ঠতার সঙ্গে ওর নিজের বলিষ্ঠতার কোথায় যেন আপস আছে। সেটা ক্ষুণ্ণ করতে গেলে নিজেরটাও ক্ষুন্ন হবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করাঘাত করে শাশুড়ি নিজেই হাল ছেড়েছেনা, দৈব অনুগ্রহও তাঁর অদৃষ্টে জুটল না ধরে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তিনি।

এহেন দত্ত-বাড়িতে সহসা বংশধর আসার সম্ভাবনায় ঘরে-বাইরে একটা সাড়া পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

ঊর্মিলা নিজেই বোধ করি হতভম্ব হয়েছিল সব থেকে বেশি। নিশানাথ জাপান গেছে। উদ্দেশ্য, বৈজ্ঞানিক চাষের কি একটা শিখে আসবে। বছর খানেক লাগবে ফিরতে। সে রওনা হওয়ার দিন পনেরর মধ্যে ঊর্মিলা খেয়াল করল, মাসটা একটা ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। ব্যতিক্রমটা পরে মাসেও বজায় থাকল। ঊর্মিলা বিশ্বাস করবে এমন সাহস নেই। অথচ কিছু একটা ঘটছে সন্দেহ নেই। মুখে একেবারে তালা এঁটে দুরু-দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। তৃতীয় মাসে আর কোনো সন্দেহ রইল না, কতকগুলো লক্ষণ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করলে সে। আর গোপন রাখা সমীচীন নয়। কিন্তু একমাত্রা বড়জা' ছাড়া বলবেই বা কাকে? শৈলবালার কর্তব্যপরায়ণতার ওপর সবারই আস্থা।

তাঁকেই বলল। শৈলবালা হঠাৎ যেন বুঝে উঠলেন না কি বলতে চায়। বোঝামাত্র স্বভাববিরুদ্ধ আনন্দোচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন তাকে। কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন। নিস্পলক চোখে চেয়ে রইলেন শুধু। অনেকক্ষণ। স্বভাবগত গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে সংযত করে নিলেন। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, তিন মাস বললি নে?

ঊর্মিলা এ ভাব-পরিবর্তন দেখে মনে মনে অসন্তুষ্ট। ঘাড় নাড়ল।

ঠাকুরপো জেনে গেছে?

না, যাবার দিন পনের বাদে তো প্রথম টের পেলাম।

পরে জানিয়েছিস?

ঊর্মিলা মাথা নাড়ল আবারও, জানায় নি।

কেন? প্রায় তীক্ষ্ণ শোনাল কণ্ঠস্বর। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আগেই ফুটে উঠেছে।

উর্মিলা জবাব দিল, ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি নি। মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠছে সে। কিন্তু কি আর করবে।

শৈলবালার দু'চোখ তার মুখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকেই বা আগে বলিস নি কেন?

বললাম তো, নিজেরই ঠিক বিশ্বাস হয়নি। হাসল। এই বড় জা'টিকে শক্ত কথা কিছু বলতে হলে হাসি মুখেই বলতে হবে। বলল, হল কি, তুমি যে দেখি একেবারে পুলিসের জেরা সুরু করে দিলে।

শৈলবালা আর বললেন না কিছু। শুধু আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে উঠে চলে গেলেন। ফিরে দেখলে দেখতে পেতেন, উর্মিলা আগুন হয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। এই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে উর্মিলা একবারও ভাবে নি। এখন যেন তাই মনে হচ্ছে।

সন্দেহটা পরদিন থেকে ঘনীভূত হল আরও। এক দুই করে পর পর চার দিন কেটে গেল, অথচ বড় জা' মুখ খুললেন না কারো কাছে। শুধু উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিঃশব্দে লক্ষ্য করে গেলেন তাকে। উর্মিলা সেটা বুঝেও না বোঝার ভাণ করে কাটিয়েছে। মনে মনে শঙ্কিতও হয়েছে সে। নিশানাথ নেই এখানে, এখন ওনার ওপরেই সব নির্ভর। অথচ মতি-গতি যা দেখছে...

পাঁচ দিনের দিন আবার ঠিক বিপরীত কারণে রাগ হল বড় জা'য়ের ওপর। চার চারটে দিন মুখ সেলাই করে কাটালেন, আবার যখন ঢাক-পেটানো শুরু করেছেন, তখন আর বাকি নেই কেউ। ওর ধারণা,তাঁর জন্যেই খবরটা এ ভাবে ছড়িয়েছে। সারা দিন নানা শুভার্থিনীর পর্দাপণে মুখ বুজে বসে থেকেও যেন একটা ধকলের মধ্য দিয়ে কাটল। সন্ধ্যে পার হতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ বাদে বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার। এবারে পুরুষের ভারী পায়ের শব্দ। উর্মিলা উৎকর্ণ হল। শব্দটা চেনা বটে। বিরক্তি নয়, বরং খুশির ছোঁয়া লাগল মুখে। উঠে বসল।

বাইরে থেকে গলা শোনা গেল, আসব?

আসুন। উর্মিলা শাড়ির আঁচল মাথার টেনে দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

শৈলবালার ছোট ভাই শশাঙ্ক। শশাঙ্ক বোস। হাসি চেপে ভুরু কুঁচকে উর্মিলার দিকে চেয়ে রইল সে।

বসুন।

শশাঙ্ক শয্যার অপর প্রান্তে আসন নিয়ে তেমনি ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, এই কান্ড তোমার?

উর্মিলা বিস্ময়ের ভাণ করল, কি কান্ড?

শশাঙ্ক হাসল এবার।—ও, নিজের কানে শুনলে অমৃত ঝরবে বুঝি! বলব?

থাক বলতে হবে না। উর্মিলা বিরক্তির ভাব দেখিয়েও হেসে ফেলল, আপনি শুনলেন কোথায়?

শশাঙ্ক হাসতে হাসতে জবাব দিল, শুধু আমি? আজকে না ভূত দ্যাখো তুমি, ভাবী বংশধরের পিতামহ পশুপতিনাথও স্বর্গ থেকে হোক বা নরক থেকে হোক, ছুটে আসতে পারেন। শুভ সংবাদ হয় সে সেখানে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এতক্ষণে।

হঠাৎ কি মনে পড়তে হাসি থামল তার। জিজ্ঞাসা করল, রাস্কেলটা খবর জেনেছে তো?

কার উদ্দেশে এই মধুর সম্ভাষণ জেনেও ঊর্মিলা নিরীহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, কোন রাস্কেলটা?

তোমার রাস্কেল, আবার কোন রাস্কেল।

আমার কোনো রাস্কেল-টাস্কেল নেই। স্বামী নিন্দা শুনলে রেগে যাবো বলছি।

শশাঙ্ক হেসে আবার জিজ্ঞাসা করল, জেনেছে?

আপনার এক যুগ দেখা নেই, খবর দেবে কে?

জবাবে শশাঙ্ক একটা স্থূল ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। একে একে দু'জনের দিকেই তাকালেন। পরে ভাইকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এসেছিস?

এই তো। শুধু হাতে যে, মিষ্টি কই?

মুখে কোনো ভাবলেশ নেই শৈলবালার। ঠান্ডা গলায় বললেন, তোকে একটা খবর পাঠাব ভাবছিলাম, কথা আছে শুনে যাস।

যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। শশাঙ্ক ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে তাকালো ঊর্মিলার দিকে।—কি ব্যাপারে?

ঊর্মিলা ঠোঁট উল্টে দিলে, কি জানি—।

এই লোকটির সঙ্গে ঊর্মিলার হৃদ্যতা সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। হৃদ্যতা নিশানাথের সঙ্গেও আছে। কিন্তু সে এক অদ্ভুত পরস্পর -বিরোধী হৃদ্যতা। ছোট থেকে একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে। কিন্তু ওদের ছেলেবেলার রেষারেষি আজও তেমনি আছে। কে কাকে ব্যঙ্গ করবে বিদ্রূপ করবে জব্দ করবে এই নিয়েই আছে। সোজাসুজি বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ বহু কাল ধরে। কারণটাও কম বিচিত্র নয়। একদা পাখি শিকারে বেরিয়েছিল নিশানাথ। সঙ্গে শশাঙ্কও আছে। কেউ কাউকে শ্লেষ না করে এক মুহূর্ত থাকতে পারে না, তবু পরস্পরের সঙ্গটা চাই। শিকার জিনিসটা শশাঙ্কর পছন্দ নয় তেমন। বন্দুক বাগিয়ে ধরে পাখিরা ঝাঁকের দিকে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল নিশানাথ, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে। আর একটু এগিয়ে গেলেই হয়, হঠাৎ পিছন থেকে এক ঢিলে শশাঙ্ক পাখির ঝাঁক দিলে উড়িয়ে। নিশানাথ নিশানা ঘুরিয়ে দিলে, শশাঙ্ক পিছনে দাঁড়িয়ে হাসছে— সেই দিকে। শশাঙ্ক ভাবলে ভয় দেখাচ্ছে। নিশানাথ ঘোড়া টিপলে। হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। গুলী শশাঙ্কর কাঁধ থেকে কোমরে ঝোলানো বিশালকায় থলেটা বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গেল। আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ল শশাঙ্ক। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর-থর করে। মৃত্যু-বিবর্ণ।

নিশানাথ বন্দুক কাঁধে তুলে তার কাছে এসে দাঁড়াল। চোখে যেন তখনো পাখি-

মারা একাগ্র দৃষ্টিটা বসে আছে। বলল, এইমৃটা কেমন দেখে রাখো।

শশাঙ্ক আর একটি কথাও না বলে বাড়ি ফিরেছে। সেদিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। এর পরে নিশানাথ তার বাড়ি আসতে শশাঙ্ক স্পষ্ট জানিয়ে দিল, তার সঙ্গে বাক্যালাপ রাখতেও সে ঘৃণা বোধ করে। দেহের রক্তকণিকা আবার টগবগিয়ে উঠল নিশানাথের। কিন্তু কিছু না বলে সে ফিরে এলো।

সেই থেকে মুখোমুখি কথাবার্তা বন্ধ। সময়ে ক্রোধ উপশম হয়েছে দু'জনারই। তবু শশাঙ্কর বুদ্ধির ধার বেশি, আর নিশানাথের আভিজাত্যের পৌরুষ বেশি। ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। শৈলবালা মাঝে থাকার দরুন যোগাযোগটা বন্ধ হয়নি। নিশানাথের বিয়ের পর দেখ-শোনাও আরো বেড়েছে। তার বিয়েতে প্রধানা উদ্যোগী কর্মকর্তা ছিল শশাঙ্ক। এর আগে অবশ্য শশাঙ্কর পিতৃশ্রাদ্ধ নিশানাথ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্বাহ করে দিয়ে এসেছিল। এখন উর্মিলা বা শৈলবালা অথবা তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ কাছে থাকলে পরোক্ষে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চলে। সে কথাবার্তাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আর এখনো সেই রেষারেষি অনেক সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নিশানাথ সহজে তোতে ওঠে। কিন্তু শশাঙ্কর মেজাজ অনেক ঠান্ডা, তাই তার সুবিধেও বেশি।

বছর খানেক আগের কথা। শশাঙ্ক কি একটা শক্ত অসুখে পড়তে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এনে সাড়ম্বরে তার চিকিৎসা শুরু করে দিল নিশানাথ। শশাঙ্ক সেরে উঠল। এর মাস পাঁচ ছয় বাদে কি করে যেন পা মচকে যায় নিশানাথের। বিছানায় শুয়ে আছে, উর্মিলা কি একটা মালিশ করে দিচ্ছে। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখে, শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে এক জন বড় সার্জেন নিয়ে এসে হাজির। ইশারায় রোগী দেখিয়ে দিতে সার্জেন পায়ের দিকে মনোনিবেশ করলেন। নিশানাথের ইচ্ছে হল, সার্জেনকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়ে শশাঙ্ককে জব্দ করে। কিন্তু মুখ বুজেই রইল সে। সার্জেন পা দেখে মনে মনে হেসে গম্ভীর মুখে একটা লম্বা প্রেসকৃপশান লিখে দিয়ে ফীস্ নিয়ে প্রস্থান করলেন। উর্মিলার বিস্ময় কাটেনি তখনো। নিশানাথ আড়চোখে একবার শশাঙ্কর মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স-মনোযোগে প্রেসকৃপশানটা টুকুরো টুকরো করে ছিঁড়ল।

শশাঙ্ক উর্মিলাকে লক্ষ্য করে বলল, একটু চুণ-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দাও। মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

উর্মিলা প্রথম প্রথম এদের রকম-সকম দেখে ভারী অবাক হত।

পরে বেশ মজাই লাগত তার। বলত, বুড়োখোকারা ঝগড়া করে সবাই দেখে হেসে মরে! এখন অবশ্য ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে অবাক লাগে তার, দু-দুটো লোক এ ভাবে বছরের পর বছর কাটায় কি করে। উর্মিলার এখনও সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে, শশাঙ্ক সাড়ম্বরে চালের কারবারে নেমেছে বলেই তার ওপর টেক্কা দেবার জন্যে নিশানাথ জাপান গেছে বৈজ্ঞানিক কৃষিবিদ্যা শিখতে।

তিন চার দিনের মধ্যেই চিকিৎসক এনে উর্মিলাকে দেখানো হল। এত তাড়াতাড়ি এর দরকার ছিল না সেটা উর্মিলাও জানে। ভাইকে দিয়ে বড় জা এই ব্যবস্থা করেছেন

জানা কথা। সমস্ত দিনে তার সঙ্গে এখন দু'চারটে কথাও হয় কি না সন্দেহ, এ দরদে মন ভিজল না। শাশুড়ি অবশ্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসক একবার পরীক্ষা করে কিছু মামুলী বিধিনির্দেশ দিয়ে বলে গেলেন, দু'মাসের আগে আর তাঁর দেখার প্রয়োজন নেই। তবে, তেমন দরকার হলে যেন তাঁকে খবর দেওয়া হয়।

রাত্রিতে উর্মিলা চিঠি লিখতে বসল নিশানাথের কাছে। এটা দ্বিতীয় চিঠি। অনেক কাটা-ছেঁড়া অদল-বদল করে প্রথম চিঠিতে বারতা পাঠিয়েছে। লজ্জা কেটে যাওয়ার এবারে অনেকটা সহজ ভাবেই লিখতে বসল। কিন্তু লেখা হয়ে উঠছে না। বছর খানেক বাদে নিশানাথ ফিরে এসে পরিবর্তনটা কি রকম দেখবে, কল্পনায় সেই দৃশ্যটা আস্বাদন করতে করতেই অনেকক্ষণ কেটে গেল।

..নিশানাথ সন্তান চেয়েছে। মনে প্রাণে চেয়েছে। বংশের গায়ে ও রকম একটা কালি লেগে আছে বলেই আরো বেশি চেয়েছে। কোনো দিন সে এটা ব্যক্ত না করলেও উর্মিলা বুঝতে পারতো। নিশানাথ মুখে বরং উল্টো কথা বলতো। বলতো, দরকার নেই তার ছেলেপুলের । ওকে নিয়েই দিব্যি সুখে আছে।

সুখে আছে একথা অবশ্য উর্মিলাই ভাবত মনে মনে। কিন্তু মুখ ফুটে সে নিশানাথকে একবার অনুরোধ করেছিল, কলকাতায় একবার তাকে কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে। শুনে নিশানাথ যেন চমকে উঠেছিল প্রথমটা। পরে হাল্কা ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে কেন আমাকে নিয়ে তোমার চল্‌ছে না?

খুব চলছে, কিন্তু হবে না-ই বা কেন? বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে চলো না একবার যাই!

নিশানাথ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, আমরা দু'জন দু'জনকে নিয়ে বেশ সুখে আছি জানতুম।

এই তুচ্ছ কথার মান ভাঙতে উর্মিলার যেন একটু বেশি সময় লেগেছিল। নিরালা রাতে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে স্বীকার করেছে, শাশুড়ির কথা ভেবে, বংশের কথা ভেবে, তার মাঝে মাঝে ভারী ইচ্ছে করে বটে একটি সন্তান আসুক—নইলে সত্যিই এ নিয়ে নিজের তার বিশেষ খেদ নেই।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে উর্মিলার, খুব সত্যি কথা বলেনি সেদিন। মনে হচ্ছে, যে আসছে সে না এলে জীবনই বৃথা। ভাবতে ভাবতে সে রাত্রে চিঠি লেখা হল না।

একদিন দু'দিন করে আরো দু'মাস কেটে গেল। দেহের অস্বস্তি যেন ক্রমশই বাড়ছে উর্মিলার। কিন্তু তার থেকে চতুর্গুণ বেশি অস্বস্তি মনের।

ইতিমধ্যে কোথায় যেন একটা দুর্যোগ ঘটে গেছে।

বিগত দু'মাসের মধ্যে এয়ারমেলে পর পর সাতখানা চিঠি লিখেছে উর্মিলা, কিন্তু নিশানাথ একখানারও জবাব অবশ্য দেয়নি। শেষে তার পাঠানো হয়েছে। তারের জবাব অবশ্য এসেছে। সেও তার কাছে নয়, শৈলবালার কাছে। সংক্ষিপ্ত জবাব। সে ভালো আছে, তার জন্যে কোনো চিন্তার কারণ নেই।

আরো এক মাস গেল। উর্মিলা আবারো চিঠি লিখল। চিঠিতে মাথা খুঁড়ল প্রায়।

কি হয়েছে, কেমন আছ, জানাও। শেষে আবার তার পাঠালো। এবারও ভ্রাতৃজায়াই জবাব পেলেন।—ভালো আছে, চিঠি লিখে বা তার পাঠিয়ে তাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়। মান অভিমান ভুলে উর্মিলা শৈলবালার কোলে মুখ গুঁজে ভেঙ্গে পড়ল এবার। শৈলবালা তেমনি কঠিন নীরব। একটি কথাও বললেন না। উর্মিলা মুখ তুলে দেখে, তাঁর মুখ কাগজের মত শাদা।

শশাঙ্ক ডাক্তার নিয়ে এলো আবার। তিন মাস আগে সেরকম কথাই ছিল। কিন্তু উর্মিলা বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে আছে সেই থেকে। দিদির শরণাপন্ন হল শশাঙ্ক। কি ব্যাপার, ডাক্তারর বসে আছে, ওদিকে যে উঠছেই না।

রূঢ় কঠিন কণ্ঠে শৈলবালা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন প্রায়, উঠ্‌ছে না তো আমি কি করব। আর তোরই বা অত দরদ কিসের? না ওঠে তো ডাক্তারকে বিদেয় করে দিয়ে নিজের কাজ দ্যাখগে যা।

শশাঙ্ক হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। নিশানাথের ব্যবহার তারও অজ্ঞাত নয়। দিন কতক আগে সেকথা শোনার পর আক্রোশে একেবারে ফেটে পড়েছিল। চড়া গলায় কটূক্তি করে উঠেছিল, তোমাদের অত সাধের বনেদি ঘরের ছেলেদের বিশেষত্বই তো এই—কোথায় কার খপ্পরের গিয়ে পড়েছে দ্যাখো। শৈলবালা সেদিনও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ধমকে উঠেছিলেন তাকে। তাঁর চোখের সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির আঁচ যেন গায়ে শুনেই সম্ভবত একবারও মুখ তোলেনি।

শশাঙ্ক সোজা উর্মিলার ঘরে এসে ঢুকল। বাহুতে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে সে। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল, ডাক্তার এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ, তাঁকে এখানে নিয়ে আসব না ফিরে যেতে বলব?

সাড়া-শব্দ নেই।

চলে যেতে বলি তাহলে? আমারও এত সময় নেই যে একটা অপদার্থ লোকের কথা ভেবে ভেবে তুমি নিজের সব কিছু মাটি করবে আর আমি বসে বসে সাধ্য-সাধনা করব। উঠবে?

উর্মিলা চোখের ওপর থেকে হাত নামলো। বসলও উঠে। ফর্সা মুখ নিঃসাড় পাণ্ডুর দেখাচ্ছে। শশাঙ্ক চেয়ে রইল খানিক। পরে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। একটু বাদেই চিকিৎসক সঙ্গে করে ফিরল আবার। শৈলবালাও এলেন। শশাঙ্ক বাইরে এসে বারান্দার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

এখনও চিকিৎসকের দেখবার বিশেষ কিছু নেই। নিয়মিত পরীক্ষা শুরু হবে মাস খানেক পর থেকে। তবে, উর্মিলার শরীরের জন্য একটু উদ্‌বেগ প্রকাশ করে গেলেন।....শরীর এ সময়ে খারাপ হয় বটে, তবে এ যেন একটু বেশি খারাপ।

বাড়িতে কি একটা অশান্তি চলেছে শাশুড়ি ঠিক বুঝে ওঠেন না। নিশানাথের খবর জিজ্ঞাসা করলে শৈলবালা বলেন, ভালো আছে। শাশুড়ি ধরে নিয়েছেন হিংসেয় মুখখানা অমন পাথর করে রেখেছে বড় বৌ। চুপি চুপি উর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কোনো দুর্ব্যবহার করে কি না তার সঙ্গে! উর্মিলা মাথা নাড়ে। চোখে তিনি কম দেখেন।

ঊর্মিলার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, ভারী রোগা হয়ে গেছ যে। নিজের হাতে পাঁচ রকম মুখরোচক খাবারের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া আর এক চিন্তায় ব্যাতিব্যস্ত তিনি। সাত মাস এসে পড়ল। ঘটা করে সপ্তামৃত দিতে হবে বউকে। কোনো বাড়ির এয়ো বাদ থাকবে না। সবাইকেই ডাকতে হবে। দত্ত বাড়িতে আসছে বংশধর, এতে আর যাই হোক, কোন কার্পণ্য বরদাস্ত করতে পারবেন না তিনি।

ঊর্মিলার থেকে থেকে মনে হয়, সমস্ত শরীরটা কেমন যেন বিষিয়ে উঠছে। মন বিষিয়ে যাচ্ছে ব'লে কি? কিছু ভালো লাগে না তার। কিছু না। এ সময়ে নাকি একটু নড়াচড়ার ওপরের থাকতে হয়। কিন্তু নড়তে-চড়তে বিষম কষ্ট। দিনের বেশির ভাগ সময়ই শুয়ে কাটায় আর আবোল তাবোল ভাবে।

সেদিনও সকালের দিকে শুয়েই আছে।....বাইরে যেন অনেকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। একটু কোলাহলও। পরক্ষণে ঝি উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকে খবর দিযে গেল, ছোটবাবু এসেছেন গো বৌদিমণি। কর্তামায়ের সঙ্গে কথা কইছেন।

ঊর্মিলার বুকের ভেতরটা আচমকা ধড়াস করে উঠল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল সে। নিচের দিকে কেমন একটা যাতনা অনুভব করল। তাড়াতাড়ি উঠতে গেছে বলেই বোধ হয়। দরজার দিকে তাকালো। উত্তেজনায় বুক কাঁপছে ঠক ঠক করে।

ভাবী জুতোর শব্দ শোনা গেল বাইরে। ধীর পদক্ষেপে কেউ আসছে। নিশানাথ—। ঊর্মিলার স্বামী নিশানাথ। শয্যার হাত দুই দূরে এসে দাঁড়াল।

পরস্পরের দৃষ্টি সংবদ্ধ থাকে কিছুক্ষণ। সামলে নিয়েই ঊর্মিলাই প্রথম কথা বলল। কিন্তু ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে থর-থর করে।

...কেমন আছ?

নিশানাথ চেয়ে আছে তেমনি। পরে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে শয্যার ওপরেই বসল। চোখ দুটো একবার ঊর্মিলার সারা দেহে বিচরণ করে বেড়াল,যেন বিশ্লেষণ কবে কবে দেখছে কিছু। তারপরর সেই স্থির সূক্ষ্ম দৃষ্টি ওর মুখের ওপর ফিরে এসে থামল। জবাব দিলো, ভালো—।

এমন না জানিয়ে চলে এলে যে?

এলাম...কেন খুশি হওনি?

এই কথাগুলোই অনুরাগসিক্ত হলে অন্য রকম শোনাত। কিন্তু সে রকম শোনাল না। ঊর্মিলা নির্বোধ নয়। যে নিশানাথ বিদেশে গিয়েছিল, আর যে নিশানাথ ফিরে এসেছে তারা একই মানুষ হলেও এক যে নয়, এটা সে উপলব্ধি করতে পারে। তফাতের পরিমাণটা বুঝতে হবে, তফাতের কারণটা বুঝতে হবে। চোখের জল জোর করে ঠেলে আবার যেন ভেতরে পাঠিয়ে দিলে সে। কাঁদবে কি!....কৈফিয়ত নেবে। সে শক্ত হবে। কঠিন হবে। কথা কটা শোনা মাত্র সারা দেহে যেন জ্বালা ধরে গেল। কিন্তু তাড়া কিছু নেই। এত দিন তিলে তিলে জ্বলেছে, আরও দু'চার ঘণ্টা সহ্য হবে। ঊর্মিলা দেখছে চেয়ে চেয়ে।

দবজার কাছে শৈলবালা এসে দাঁড়াতে নিশানাথ খাট ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে এলো।

উর্মিলা মাথায় কাপড় দিলে। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করলেন। নিশানাথ পায়ের ধুলো নিলে। তিনি মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্বল্পক্ষণ। পরে বললেন, যে চালের চাষ শিখতে গিয়ে এমন মূর্তি করে আনলে, সে চাল লোকের সহ্য হবে তো?

নিশানাথের মুখে হাসির মতো দেখা দিল একটু। জবাব দিল। কি মনে হয়, সহ্য হবে না?

কোনো অর্থ আছে কি না কে জানে! শৈলবালার সহজ ভাবটা মিলিয়ে গেল। উর্মিলার দিকে তাকালেন একবার। সে নতনেত্রে বসে আছে। পরে শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, কত দিনের মধ্যে একটা খবর পর্যন্ত নেই... হুট করে চলে এলে যে?

নিশানাথ নিস্পৃহ জবাব দিল, পাসপোর্ট পেলে আরো আগেই আসতুম। হাসল।—আমার খবরের জন্যে তোমরা সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে, না?

না, আমরা আর এমন কি আপনার লোক, তবে মা আছেন বাড়িতে, সেটা খেয়াল রাখতে পারতে।

শাশুড়ি বোধ হয় এখনও আয়ুর জোর আছে। দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। তাড়াতাড়ি জপটা সেরে এলেন বোধ হয়। বললেন, তুই এখনো রাস্তার জামাকাপড় পর্যন্ত ছাড়িস নি! ও-গুলো ছেড়ে হাত-মুখ ধো। নয়তো একেবারে চানই করে আয় আগে। জল-টল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তার পর যত খুশি গল্প কর বসে।

শৈলবালার দিকে চেয়ে একগাল হাসলেন তিনি। দেখো বড় বৌমা, ভগবান কেমন সুমতি দিয়েছেন ওকে। যত দিন যাচ্ছে, আমি তো ভয়ে সেঁধোচ্ছিলাম, কে দেখে কে শোনে! খেয়াল হ'ল বোধ হয়, এ রকম বলাটা ঠিক হল না। তাড়াতাড়ি শুধরে নিতে গেলেন, শশাঙ্ক আছে তাই নিশ্চিন্দি। ডাক্তার ডাকা ওষুধ আনা খোঁজা খবর করা—সোনার টুকরো ছেলে, নইলে পরের ছেলে কে আর অতটা করে?

নিশানাথ বক্র কটাক্ষে উর্মিলার দিকে তাকালো একবার।পরে শৈলবালার দিকে। নিষ্প্রাণ পটের মূর্তি। ঝিয়ের মুখে কুলপুরোহিতের আগমন-বার্তা শুনে বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। পরশু কাজ, তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করল,কি একটা উৎসবের কথা যেন বলছিলেন মা, কবে?

শৈলবালা জবাব দিলেন, পরশু। পরে বললেন, চান-টান যা করবে করো,আমি এদিকে দেখছি। তিনি নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

নিশানাথ শয্যায় বসল আবার। জামার বোতাম খুলতে খুলতে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, দত্ত-বাড়িতে বংশধর আসছে তাহলে... ?

উর্মিলা নিরুত্তরে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল । নিশানাথ কি ভেবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, শশাঙ্ক ব্যবসা-ট্যবসা ছেড়ে দিয়েছে?

উর্মিলা তাকালো তার দিকে।—ছাড়বে কেন?

ডাক্তার ডেকে ওষুধ-পত্র এনে এত খোঁজ- খবর করে আর ব্যবসার সময় পায়?

ওদের একজনের বিরুদ্ধে আর এক জনের এ রকম ঠেস দেওয়া কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত উর্মিলা। আজ সংশ্লেষে পাল্টা প্রশ্ন করল। —তুমি এত দিন নাকে তেল দিয়ে

ঘুমুচ্ছিলে কেন? দরকার হলে সব ছেড়ে-ছুড়ে সে এখানে এসে বসে থাকতে পারে সেই ভরসায়?

নিশানাথ দেখছে। উর্মিলা আবার বলল, যাও চান সেরে এসো, দিদি অপেক্ষা করছেন।

নিশানাথ হঠাৎ হাসতে হাসতেই উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেল। উর্মিলার মনে হলে, মানুষটার হাসিও বদলেছে, তাতেও শ্রী নেই।

বিকেলের আগে নিশানাথের আর দেখা পাওয়া গেল না। উর্মিলা খোঁজ নিয়ে জেনেছে, বাইরে মহলে আছে। বিকেলে মায়ের সঙ্গে স্বল্পক্ষণ কথাবার্তা বলে নিশানাথ ভ্রাতৃজায়ার ঘরের পাশ কাটাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ঘরে আর কেউ আছে। গলার স্বরে বুঝল কে। ভাবল ভিতরের ঢোকে। কিন্তু কি ভাবে চলে এলো।

উর্মিলা খাটের রেলিং-এ ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত লাগছে। কেমন একটা যাতনাও। কিন্তু ভিতরের বিক্ষোভ আরও বেশি নিশানাথ এলো। অদূরে একটা চেয়ার টেনে বসে হাই তুলল।

উর্মিলা শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, সারা দুপুর ঘুমুলে?

হ্যাঁ।

এখানে ঘুম হ'ত না?

নিশানাথ জবাব দিল, না।

একটু বাদে উর্মিলা আবার প্রশ্ন করল, যা শিখতে গেছলে শেখা হয়ে গেছে?

না। শেখার কি আর শেষ আছে.....? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

কোথায় যাচ্ছ?

ঘুরে আসি।

দাঁড়াও। উর্মিলার মুখে বিকৃত রেখা পড়ে গেল। — বোসো, আমার কিছু শোনবার আছে।

নিশানাথ তার মুখের দিয়ে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে হাল্কা জবাব দিল, তাড়া কিসের —আপাতত আমি আছি এখানে।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ইচ্ছে করেই শৈলবালার ঘরের পাশ দিয়ে চলল সে। কিন্তু এবার আর কারও কণ্ঠস্বর কানে এলো না। কি ভেবে ঘরে ঢুকল। শৈলবালা মেঝেতে একাই বসেছিলেন। উঠে একটা আসন পেতে দিতে গেলেন।

নিশানাথ বলল, না বসব না এখন, এদিক দিয়ে আসতে তখন শশাঙ্কর গলা শুনলাম যেন, চলে গেছে?

শৈলবালার কণ্ঠস্বর মৃদু শোনাল—এই তো গেল।

নিশানাথ হাসতে লাগল। বলল, বাড়ি এসেও জাপান-ফেরত মূর্তিটি দেখে গেল না!

কোন রকম শ্লেষ সহ্য করাটা ধাতে নেই শৈলবালার। বললেন, আমি দেখা করে যেতে বলেছিলাম তাকে। বলল, গরজ থাকে তো তুমি তার বাড়ি গিয়ে দেখা কোরো,

তার অত সময় নেই।

হুঁ? হাল্কা বিস্ময়। —কিন্তু যাবার সময় তো কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দেবারও সময় ছিল!

শৈলবালা এবারে চুপ। শশাঙ্ক নিশানাথকে কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল উর্মিলার চলনদার হিসেবে। তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে সে উর্মিলাকে নিয়ে মহেশপুরে ফিরেছে।

সেদিন রাত্রিটাও সদরে কাটালো নিশানাথ। পরদিন সকালে উর্মিলা শুনল, খুব ভোরে মহেশপুর ছেড়ে কলকাতা চলে গেছে সে। তাকে জানায়নি কিছু। মা এবং বৌদিকে নাকি বলে গেছে। কিন্তু তাঁরাই এসে ওকে নানা ভাবে জেরা করতে লাগলেন। হঠাৎ কলকাতায় তার এমন কি জরুরী কাজ পড়ল। আজ বাদে কাল একটা শুভ কাজ, অথচ ছেলে এত দিন বাদে বাড়ি এসে জেনে -শুনেও চলে গেল। ছেলেকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আটকাতে চেয়েছেন। কিন্তু তার দিকে চেয়ে বেশি কিছু বলতে সাহস পাননি। উর্মিলার কাছে এসে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বলো তো বৌমা, আমার যেন কিছু ভালো লাগছে না।

উর্মিলা জবাব কি দেবে। তার বেদনা-বিবর্ণ মুখ বিকৃত হয়ে উঠল শুধু।

সেদিন গেল। পরদিন তাকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেল নিমন্ত্রিত এয়োদের মধ্যে। উঠতে বসতে কষ্ট হচ্ছে। ভেতরের যাতনাটা বেড়ে চলেছে। তবু কলের মতো তাকে উঠতে হচ্ছে, বসতে হচ্ছে। কথা বলতে হচ্ছে। এমন কি একটু-আধটু হাসতেও হচ্ছে। উৎসব মিটতে বিকেল গড়িয়ে গেল। শরীরের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল এক প্রস্থ। উর্মিলা দাঁড়াতেও পারছে না আর। সন্ধ্যা হতে না হতে শয্যার আশ্রয় নিল।

খানিক বাদে শৈলবালা এলেন। উর্মিলার ক্লেশটুকু অনেকক্ষণ ধরেই উপলব্ধি করছিলেন তিনি। কপালে হাত রাখলেন। গায়ে তাপ উঠেছে। উর্মিলা চোখ মেলে তাকাল। পরে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

নিশানাথ কলকাতায় এসেছে। কিন্তু অকারণে নয়। বিদেশ থেকে ফিরে মহেশপুরে যাবার মুখে কলকাতার তিনটি নামকরা মেডিকেল ক্লিনিকের সঙ্গে সে যোগাযোগ করে গিয়েছিল। এখন রিপোর্টগুলো নিতে হবে। আগেও অনেকবার নিয়েছে। কিন্তু শেষ বারের মতো নিঃসন্দেহ হওয়া ভালো। এক জায়গা থেকে নয়, তিন জায়গা থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ হল। না, ভুল নেই। ভুল থাকবে না জানা কথাই। বিদেশেও নামী চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নিয়েছে। এবারেও তিনটে রিপোর্ট থেকে সেই একই তথ্য আহরণ হল।

.....সন্তান-সম্ভাবনা নেই তার।

...তবু বংশধর আসছে।

এই বার নিশানাথ ধীরে-সুস্থে কাজের কথা ভাবতে লাগল। কি করবে সে? কিছু

একটা করবেই। .....কিন্তু কি করবে?

তিন দিন বাদে মহেশপুরে পৌঁছেও ঠিক করতে পারল না কি করবে। পশুপতিনাথের ছেলে সে। একেবারে নির্মূল করে দেবে বংশধর-বহনকারিণীকে সুদ্ধু ? কিন্তু তার পরেও বাকি থাকে। বাকি থাকে শশাঙ্ক। তাকে কি করবে ?.....গুলি করে মারবে ?.....জীবন্ত পুঁতবে ? হঠাৎ নিশানাথের মনে হল যেন অন্য রকম রক্ত বইছে তার ধমনীতে। পশুপতিনাথের রক্তে বুঝি মরচে পড়েছিল এতকাল !

সাক্ষাৎমাত্রে তীব্র তীক্ষ্ম কণ্ঠে উর্মিলা বলে উঠল, এসবের অর্থ কি, আমি জানতে চাই ?

উঠে বসার ক্ষমতা নেই। জ্বরও ছাড়েনি। কাঁপছে থর-থর করে। শরীর বিষিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। তবু উঠে বসল, মাথা সোজা রাখল।

নিশানাথ শান্ত। দেখছে। কুৎসিত, বীভৎস। এই নারীদেহ সে ভালোবেসেছিল একদিন ! আশ্চর্য !

কি জানতে চাও, বংশধর আসছে শুনেও আনন্দে লাফালাফি করছিনে কেন ?

আনন্দ যে হয়নি তোমার দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন হয়নি ? চাওনা তুমি ?

উর্মিলা যেন একটা পথ দেখিয়ে দিল নিশানাথকে। হ্যাঁ, সন্তান সে চায় বই কি। সন্তান চায়, বংশধর চায়। সে আসছে আসুক। নিশানাথের সন্তান। দত্তবাড়ির বংশধর। সে থাকবে।.....কিন্তু উর্মিলা থাকবে না। .....আর থাকবে না শশাঙ্ক।

হিংস্র আনন্দে নিশানাথ মুখ তুলে তাকালো। সে দিকে চেয়ে উর্মিলা অকস্মাৎ ভয়ে বিমূঢ় হয়ে গেল যেন। মানুষের এমন শ্বাপদচক্ষু আর কখনো দেখিনি।

পরদিন খুব সকালেই নিশানাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোনো উদ্দেশ্যে নিয়ে নয়, এমনি । কিন্তু এক সময় কি ভেবে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরল সে।

শশাঙ্ক বাড়িতেই ছিল। নিশানাথকে দেখে কোন রকম অভ্যর্থনা না করে নীরবে তাকাল।

নিজেই একটা চেয়ার টেনে বসল নিশানাথ। বেশ স্বাভাবিক ভাবেই বলল, তুমি বউদিকে বলে এসেছ শুনলাম গরজ থাকলে যেন বাড়ি এসে দেখা করি। গরজ আছে।—তোমার কিছু ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে। সেটা দেব। আর আমার কিছু কৈফিয়ত পাওনা আছে... সেটা নেব।

শশাঙ্ক এবারেও একটি কথাও বলল না।

নিশানাথ বলল, আমি যখন ছিলুম না, শুনলাম তুমি তখন আমার স্ত্রীর খোঁজ-খবর করেছ, ডাক্তার দেখিয়েছ, ওষুধ-পত্র এনে দিয়েছ, ধন্যবাদটা সেই জন্য।

শশাঙ্কর মুখে ক্রোধের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবু চুপচাপ অপেক্ষা করে সে।

· নিশানাথ একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, জাপানে থাকতে তোমার একটা চিঠি পেয়েছি। স্ত্রীর প্রতি আমার কর্তব্যে ত্রুটির জন্য অভদ্র অপমানকর চিঠি লিখেছ। পশুপতিনাথের ছেলে কারো গালাগালি শুনে বা গরম চক্ষু দেখে অভ্যস্ত নয়। এর জবাব দিতে হবে।

শশাঙ্কের চোখের সমুখে হঠাৎ যেন একটা রহস্য উদঘাটিত হল। দিদি সে দিন তাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবার জন্য আকুতি মিনতি করেছিলেন। আজ নিশানাথের দিকে চেয়ে তার মনে হল, দিদি ওকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন তার নিজের কোনো অশান্তির কারণে নয়, এই লোকটার হাত থেকে তাকেই রক্ষা করবার জন্য। কিন্তু কেন ! কিন্তু কেন ! তীক্ষ্ণধী মানুষটির কাছে কি একটা আভাস যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। চেয়ে আছে, দেখছে।

ধীরে-সুস্থে বলল, জবাব যদি দিই, প্রবল-প্রতাপ পশুপতিনাথের ছেলের কি সেটা ভালো লাগবে ? আমার একমাত্র জবাব হতে পারে, ওই যে বাগানে চাকরটা আর দুটো মালী কাজ করছে, তাদের ডেকে পশুপতিনাথের ছেলেকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে বলা।

নিশানাথের চোখে সেই হিংস্র আগুন জ্বলে উঠল আবার। মনে হল, এক্ষুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে মানুষটাকে। কিন্তু সামলে নিল।—নিঃশব্দে উঠে চলে গেল তারপর।

অন্দর মহলে প্রথমেই শৈলবালার সঙ্গে দেখা। বলল, শশাঙ্ক সঙ্গে দেখাটা করে এলাম।

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন শৈলবালা। নিশানাথ পাশ কাটাল। হাসছে মনে মনে। সত্যটা শৈলবালার কাছেও গোপন নেই তাহলে ! কুশাগ্র-বুদ্ধি শৈলবালার।

কি ভেবে ফিরে এলো নিশানাথ। বাইরের ঘরে এসে আরাম কেদারায় গা ছেড়ে দিল। উর্মিলার সামনে এ সময়ে যাওয়া উচিত নয়। একটা কিছু করে ফেলতে পারে। ওর নীল রক্তের নীল আগুন ক্রমশ যেন মাথার দিকে উঠছে। হত্যা করতে হবে। মাথায় হত্যার জল্পনা-কল্পনা চলছে সেই থেকে। উর্মিলা হাতের মুঠোতেই আছে। কিন্তু শশাঙ্ক ? বিগত দিনের শিকার-পর্বে গুলিতে কাঁধের ব্যাগ ফুটো করে দেওয়া, আর ওর সেই ঠোঁট-কাঁপুনির দৃশটা মনে পড়তে নিশানাথের হাসি পেল। নির্মম ক্রূর হাসি।

হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে সচকিত হল। তার মা হাউ-মাউ করে এসে কেঁদে পড়লেন।—হ্যাঁ রে, বউটাকে কি মেরে ফেলবি ? কি হল তোর ? ওদিকে যে অজ্ঞান হয়ে আছে সেই থেকে সারা অঙ্গ নীল বর্ণ।

শুনে নিশানাথ নিস্পৃহ মুখে বললে, ডাক্তারকে খবর দিতে বলো।

হা রে পোড়াকপাল, ডাক্তার কি আর এখানে ! শশাঙ্ককে খবর পাঠিয়েছে এক্ষুনি তাকে ধরে নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু কি হবে, পেটের সন্তান বাঁচবে তো ? তোর কি হল ? তুই একবার এসে দেখে যা না ?

শশাঙ্ককে ডাক্তার ডেকে আনার জন্যে খবর দেওয়া হয়েছে শুনেই নিশানাথ গর্জে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু পরের কথাগুলো কানে যেতেই সে তড়িত-স্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ল। উর্মিলা যায় যদি যাক। একটা হত্যার দায় কমবে। কিন্তু যে আসছে তার না বাঁচলে নয়।

তৎক্ষণাৎ অন্দর মহলে এলো। শয্যার চোখ বুজে পড়ে আছে উর্মিলা। শৈলবালা

চোখে-মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। নিশানাথ তাড়াতাড়ি আর একজন কর্মচারীকে ডাক্তারের কাছে পাঠালো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ডাক্তার এলেন। নিশানাথ লক্ষ্য করে দেখল, তিনি একাই এসেছেন, সঙ্গে শশাঙ্ক নেই। কিছুক্ষণ বাদে রোগীনী পরীক্ষা করে চিকিৎসক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। নিশানাথের নীরব প্রশ্নের জবাবে শুধু বললেন, এক্ষুনি ঘুরে আসছেন। গাড়িতে উঠে তীর বেগে প্রস্থান করলেন তিনি। ফিরলেন আরো ঘণ্টাখানেক পরে। কিন্তু একা নয়। শহরের একজন নামজাদা সার্জেনকে সঙ্গে নিয়ে।

একসঙ্গে আবার রোগিনী দেখলেন তাঁরা। তাঁদের কথাবার্তা দুর্বোধ্য লাগছে নিশানাথের। শেষে তাকে আড়ালে ডেকে তাঁরা যা বললেন, তার মর্মার্থ—এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে, পেটে যা আছে সেটা সন্তান নয়, জরায়ুতে টিউমার জাতীয় কিছু। ঠিক শিশুর মতোই সেটা আস্তে আস্তে বাড়ে, আর অনেক লক্ষণই হুবহু মিলে যায়। বিশেষ করে, রোগিনীর সন্তান-কামনা বেশি হলে এ লক্ষণগুলো আরো সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ রোগ হলে প্রথম কিছু কাল পর্যন্ত চিকিৎসকেরও ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। রোগিনীর প্রথম যখন জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়, তখনই খবর দেওয়া উচিত ছিল। বাঁচার আশা কম, তবে এখনো একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

নিশানাথ কি শুনছে, কোন প্রস্তাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিচ্ছে, কিছুই হুঁশ নেই.....আবার এক সময় দেখল, গাড়ি-বোঝাই যন্ত্র-পাতি এলো। ডাক্তার ছাড়াও সহকারী এলেন দু'জন, দু'জন নার্সও। দেখতে দেখতে তার ঘরটার ভোল বদলে গেল যেন। ডাক্তার প্রস্তুত হলেন। সহকারীরা প্রস্তুত হলেন। নার্সরাও প্রস্তুত। অপারেশান করবেন যে সার্জেন তিনি এবার ইশারায় নিশানাথকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন। কিন্তু ঘরের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে লইল নিশানাথ। অপর ডাক্তার এসে অনুরোধ করলেন, সে নড়ল না। ডাক্তার সার্জেনের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললেন কি যেন।

নিশানাথ বিমূঢ় নেত্রে দেখছে চেয়ে চেয়ে। উর্মিলাকে ধরাধরি করে টেবিলে তোলা হল। অসময়ে যাতে জ্ঞান ফিরে না আসে সম্ভবত সেই ব্যবস্থা হচ্ছে এখন।...সার্জেনের হাতে একটা ঝক্‌ঝকে ছুরি ঝকমকিয়ে উঠল। তার পরেই দু'চোখ বুজে ফেলল নিশানাথ। ছুরিটা সমূলে যেন তারই দেহে বিদ্ধ হয়ে জঠর-দেশ দু'খানা করে চিরে দিয়ে গেল। অব্যক্ত যাতনায় চোখ মেলে তাকালো সে। টেবিলে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছে! উন্মুক্ত, বীভৎস্য দৃশ্য। সার্জেনের আচ্ছাদনে ঢাকা মোটা মোটা হাত দুটো যেন রক্তে অবগাহন করছে।

নিশানাথের গা ঘুলিয়ে উঠল। পা টলছে। মাথা ঘুরছে। দু'হাতে মুখ চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে রেলিং-এ মাথা রাখল। অনেকক্ষণ পড়ে রইল তেমনি। মাথা তুলল আবার। কিন্তু পিছন ফিরে ঘরের দিকে তাকাবার সাহস নেই আর। এক'পা দু'পা করে সামনের দিকে এগোলো সে।

কিছুক্ষণ।

যেন বহুক্ষণ। আত্মবিস্মৃতের মতো নিশানাথ এ-ঘর ও-ঘর করছে। মায়ের ঘরে

গেল। প্রণামের ভঙ্গীতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন তিনি। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। ওকে দেখে আর এক দিকে মুখ ফেরালেন। নিশানাথ বেরিয়ে এলো। নিজের অজ্ঞাতেই সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এলো সে।

উঠোনের এক পাশে শশাঙ্ক দাঁড়িয়ে।

এগিয়ে গেল। কাছে। আরো কাছে। খুব কাছে। একেবারে তার বুকের কাছে। হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে সবলে আঁকড়ে ধরে ওর কাঁধে মুখ গুঁজে ছোট ছেলের মতো ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

ও দিকে শশাঙ্ক চোখে ঝাপসা দেখছে সব কিছু।

মাশুল

শীতের ধোঁয়েটে রাত্রি। কন-কনে ঠান্ডা হাওয়া হাড়ের ভেতর সেঁধোয়। আবছা অন্ধকারে সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জয়ন্ত। লক্ষ্য, ফুটপাথের ওধারে জীর্ণ তিনতলা বাড়িটার দিকে। দাঁতের ফাঁকে অর্ধ-দগ্ধ চুরুট জ্বলে জ্বলে নিভে গেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত।

যাবে ?

যাবে না ?

যাবে ?

কিন্তু এরই নাম মুক্তি ? নয়ই বা কেন। উষ্ণ ঘন পিচ্ছিল বিস্মৃতি....। মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কোথায় নেই এই দেনা-পাওনার বোঝাপড়া। সঞ্চয়ের তবিল স্ফীত নয় বলেই তো আজ এই নিঃসঙ্গ শীতের রাতেও ওর প্রতীক্ষায় বসে নেই কেউ।

অযোগ্যতা.... ?

যোগ্যতার মাপকাঠিতে দুনিয়া চলে ? ওই যে তিনতলার ছোট ঘরে বসে আছে মেয়েটি,যে-কোনো আগন্তকের প্রতীক্ষায়, কোন যোগ্যতার অভাব ছিল তার ! সুশ্রী নম্র বুদ্ধিমতী....। কিন্তু বিধিলিপি এমন কেন ?

পানের দোকানোর পাশে ছোট অপরিসর গলির মধ্য দিয়ে প্রবেশপথ। আশে পাশে ভদ্রলোকের বসতি। এমন কি এ বাড়ির পাঁচ মিশালি বাসিন্দাদের মধ্যে ও গরীব গৃহস্থ আছে দু'চার ঘর। ভুল করে কোনো আগন্তুক যদি তাদের দরজায় ঘা দেয়, আধ-বয়সি গৃহস্থ বউ দরজা খুলে নিস্পৃহ মুখেই জানিয়ে দেবে ভুল জায়গায় এসেছে।

দু'তিন দিনের যাতায়াতে বাড়িটার আনাচ-কানাচ চেনা হয়ে গেছে জয়ন্তর। ভাঙা সিঁড়ি ধরে সোজা উঠে যাবে তিনতলায়। সামনের সরু অন্ধকার বারন্দার এক কোণে রেলিং ঘেঁষে বসে আছে বুড়ি ঝি। বয়সের ভারে দেহ সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। আফিং খেয়ে ঝিমোয় সারাক্ষণ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা মাত্র তার দুমড়নো শিরদাঁড়া সোজা হবে। অন্ধকার ভেদ করে ঘোলাটে দুটো চক্ষুকোটর সংবদ্ধ হবে আগন্তকের মুখের ওপর। আস্তে আস্তে দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে আবার।

বিড় বিড় করে বলবে, ভিতর যান, ঘরে আছে—।

ব্যতিক্রম ঘটল। এই দারুণ শীতেও স্যাঁতসেঁতে সরু বারান্দায় বুড়ি বসে আছে ঠিকই। কোলে কম্বল জড়ানো পুঁটলির মতো একটা কি। অন্ধকারে জয়ন্ত ঠাওর পেল না। বুড়ি তেমনি মুখ তুলে দেখলে ওকে, বলল, বাইরে গেছে, ঘরে গিয়ে বসুন।

অপ্রত্যাশিত নিরাশা। কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না জয়ন্ত। বুড়ি আবার বলল, সামনেই দোকানে গেছে, এক্ষুণি আসবে, ঘরে গিয়ে বসুন—।

প্রায় আদেশের মতো শোনায়। ওই একটি মাত্র ঘর তিনতলায়। ভিতরে প্রবেশ করে জয়ন্ত দরজাটা ভেজিয়ে দিল আবার। বুড়ির দৃষ্টির নাগালের কাছে থাকাটাও অস্বস্তিকর। সুপরিচ্ছন্ন ছোট ঘর। ধপ ধপে বিছান পাতা। দেয়ালের গায়ে গোটা কতক দেবদেবীর মূর্তি। ঘরের অধিবাসিনীর ফোটোও আছে একটা। নাম নীলা।

বসে আছে জয়ন্ত। খুশির আমেজ লাগছে যেন। একটু বিরক্তিও। যেন নিজের ঘরটিতে বসে আছে সে, আর তারই নিতান্ত আপন কেউ বলা নেই কওয়া নেই নিশ্চিন্ত মনে বাইরে ঘুরছে কোথায়। এত শীতে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করাও তো বিচিত্র নয়।

লঘু পদধ্বনি। কণ্ঠস্বরও শুনল একটু বাদেই, মা গো, কি শীত বাইরে, একি। এই ঠাণ্ডায়......

বুড়ির শীতল কণ্ঠে বাধা পেয়ে থেমে গেল।—একজন বাবু বসে আছে ঘরে।

জয়ন্ত উৎকর্ণ। অনুচ্চ কণ্ঠের তর্জন শোনা গেল, পারিনে আর, যেতে বলে দিলে না কেন—।

বুড়ি ততোধিক শান্ত—জয়ন্তবাবু অনেকক্ষণ বসে আছে, ঘরে যা—।

মর্যদাটুকুর অর্থ স্পষ্ট ও নগ্ন। আফিংখোর বুড়ি ঝিও জয়ন্তর দুর্বলতার খবর জানে। বাদানুবাদ দূরে থাক, গেল বারে কত দিল না দিল ভালো করে না দেখেই সে পালিয়েছিল। একটু আগের খুশির ভাবটুকু কেটে গেল। বিকৃত হাসি দেখা দিল মুখে, প্রতিমূহূর্তের অভ্যর্থনা এখানে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় জেনেই তো আসা।

আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করল মেয়েটি। দরজা আবজে দিল। গায়ের গরম আলোয়ানটা আলনায় রাখল। মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল তারপর।

জয়ন্ত দেখছে। অভিসারিকার বেশ নয়, শাদাসিধে আটপৌরে শাড়ি, ব্লাউজ। দোকানে যাওয়ার কথাটা বুড়ি বানিয়ে বলেনি হয়ত।

অনেকক্ষণ বসে আছেন তো ?

জয়ন্ত স্থির, শান্ত। দেনা-পাওনার সম্পর্কটা আজ ভুলবে না কিছুতে। বলল, ঝি যেতে বলে দেয়নি, তুমি বললেও তো পারো।

তার পাশ ঘেঁষে বসল নীলা। বলল, বাবা, এও কানে গেছে !

কিন্তু আপনার নাম শুনে তো আর কিছু বলিনি—।

অন্য দিনের মতো আজ আর গল্প জমল না। জয়ন্তর ভাবুক মনের তাল কেটেছে। শুধু তাই নয়, নীলাকেও অন্যমনস্ক দেখছে কেমন। অন্যদিন ও অনভিজ্ঞ অতিথির বিপর্যস্ত হাবভাব লক্ষ্য করেছে নিঃশব্দ কৌতুকে। আজ নিজের অজ্ঞাতে বন্ধ দরজার

দিকে ফিরে তাকাচ্ছে বারবার। হঠাৎ জোর করেই একটা হাই তুলে নীলা বলে ফেলল, ঘুম পাচ্ছে....।

মুহূর্তে দু'চোখ জ্বলে উঠল জয়ন্তর। এও তো যেতে বলারই নামান্তর। অর্থাৎ যত শীগ্‌গির পারো টাকা দিয়ে বিদেয় হও। কিন্তু আজ জয়ন্তও করবে দোকানদারী।

নির্মম দৃঢ় নিষ্পেষণে সে কান পেতে শুনতে চাইল ওর বুকের উষ্ণ স্পন্দন। বদলে বাইরে থেকে হঠাৎ কান এলো শিশুর সুস্পষ্ট গোঙানির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে নীলা চমকে উঠল যেন।

কী— ?

নীলা জবাব দিল, কিছু না।

পরক্ষণে আবারও। এবারে কাতর কান্না। বাইরে বুড়ি ঝির তাকে থামাবার চেষ্টা। ঘরে দুই সবল বাহুর মধ্যে নীলার অস্বস্তি।

জয়ন্ত উঠে বসল।—বাইরে কাঁদছে কে ?

নীলা থতমত খেয়ে গেল কেমন।

কে কাঁদছে বাইরে ?

মেয়ে।

কার মেয়ে ?

আমার।

জয়ন্ত নির্বাক ! দুই চোখে নির্বোধ বিস্ময়। বুড়ির কোলে পুঁটলির দৃশ্যটা মনে পড়ে। এই প্রচন্ড শীতে ঘরের মধ্যে জায়গা হয়নি। ....একটি মাত্র ঘর।

কত বড় মেয়ে ?

দেড় বছর....।

অন্য দিন তো দেখিনি ?

একটু চুপ করে থেকে নীলা বলল, নিচের তলায় একজন ভাড়াটের কাছে থাকত...।

জয়ন্তর সমস্ত দেহে কি একটা শীতল পদার্থ যেন ওঠানামা করছে। গম্ভীর মুখে আদেশ দিল, ঘরে নিয়ে এসো।

নীলা হকচকিয়ে গেছে আগেই। উঠে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে গেল। জয়ন্ত কান পেতে শুনল, বুড়ি ঝি ফিস ফিস করে বলছে,—জ্বরে গা পুড়ে গেল, কতক্ষণ আর ঘুমুবে !

নীলার অন্যমনস্কতা, ঘুম পাওয়া, কান্না শুনে চমকে ওঠা, সব কিছুর অর্থ সুস্পষ্ট হল এতক্ষণে। হাসি পাচ্ছে জয়ন্তর। নির্মম, নিষ্করুণ হাসি। মেয়েদের মাতৃত্ব-বোধ বিধাতার সকলের বড় আশীর্বাদ....সকলের বড় অভিশাপও নয় কেন ?

মেয়ে কোলে নীলা ফিরে এলো। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বসল চৌকির ওপর। জয়ন্ত চেয়ে আছে বিস্ফারিত নেত্রে।.... একমাথা অবিন্যস্ত কোঁকড়া চুল, শীতে আর জোলো হাওয়ায় গাল দুটো ফেটে দগদগে লাল হয়ে গেছে ! পাতলা বিবর্ণ দুই ঠোঁট থেকে থেকে কেঁপে উঠছে থরথর করে। নইলে আর পাঁচটি শিশুর মতোই সুন্দর।

জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে আবার ; বুকের সর্দিতে প্রতিটি শ্বাসের ঘড় ঘড়ানি শুনতে পাচ্ছে জয়ন্ত। ওর বুকের ভেতরটাও কে যেন নিংড়ে দুমড়ে একাকার করে দিল হঠাৎ। বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ দিয়েছ কিছু?

আনতে গিয়েছিলাম, দোকান বন্ধ।

অনুচ্চকণ্ঠে জয়ন্ত ধমকে উঠল, এ তো আর তোমার দোকান নয় যে সারা রাত খোলা থাকবে, আগে কি করছিলে?

নীলা শান্ত মুখে তাকাল তার দিকে,—আগে টাকা ছিল না।

আর সাড়া শব্দ নেই। জয়ন্ত নির্বাক নিস্পন্দ।.....মৃতকল্প শিশুর জায়গা তখনো ছিল বাইরের অন্ধকারে ওই স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায়, বুড়ির কোলে। এই একটি মাত্র ঘর ওষুধের টাকা জুগিয়েছে। কিন্তু দোকান তখন বন্ধ। দরজার দিকে চোখ পড়তে জয়ন্ত দেখল, বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। ঘরে ঢুকল। খানিক নীরব থেকে ঘরের পরিস্থিতি অনুভব করল যেন। টানা গলায় নীলাকে বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে, দে নিয়ে যাই।

নীলার বিব্রত দুই চোখ পড়ে সামনের মানুষটার দিকে। কপাটির কাছটায় দপদপ করছে জয়ন্তর। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল চৌকি ছেড়ে। জ্বলন্ত দৃষ্টি বুড়ির মুখের ওপর। বুড়িও চেয়ে আছে তার দিকে।...নির্বিকার, নিস্পৃহ। মড়ার মতো ঘোলাটে চোখ দুটো যেন হেসেও উঠল একবার। খুক খুক করে কাশতে কাশতে বাইরে চলে গেল বুড়ি।

অকস্মাৎ একটা সন্দেহ সজোরে নাড়া দিল জয়ন্তকে। তাকালো নীলার দিকে।—ওই বুড়ি কে?

নীলা ভয় পেয়ে গেছে। শুকনো মুখে চকিতে দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একবার।

কে, ও?

মা।

ঘর ফাটিয়ে আবার হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে জয়ন্তর। ঠিকই অনুমান করেছিল। নীলা বসে আছে মূর্তির মতো। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা দেখছে জয়ন্ত।....বিশ বছর, পঁচিশ বছর পরের একটা সম্ভাবনা ভাসছে। সামনের তাজা নারী দেহ মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। তার বদলে বসে আছে পলিতকেশ লোলচর্ম এক জরাজর্জর বৃদ্ধা, কোলে তার নতুন কোনো আধমরা শিশু, মাথার ওপরে ছাদ নেই, ভিজে স্যাঁতসেতে শীতের হাওয়া—সামনে দরজা বন্ধ।.....নগ্ন প্রত্যাশার উল্লাসে সেখানে ধক ধক, ধক ধক করছে এক আদিম নর-দানবের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড—নির্মম, নৃশংস, মাংস-লোলুপ।

তিলে তিলে তিলোত্তমা।

আজব শহরের আজব বাহার।

ঘড়ি ধরে সন্ধ্যা ছ'টায় খোলে, ন'টায় বন্ধ হয়। আশেপাশে প্রায় সকাল ছ'টা থেকে রাত ন'টা পযন্ত যাদের দোকান খোলা, তারাও তখন এদিক পানে চেয়ে থাকে, আর বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ে। প্রাসাদোপম এই অট্টালিকায় অনেক ব্যবসায়ী অনেক রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। কিন্তু বিউটি হাউসের তিন ঘণ্টা ওদের তিরিশ ঘণ্টা।

'সব রাস্তা রোমের দিকে'। এখানে সব আগন্তুক বিউটি হাউসের দিকে।—স-সঙ্গিনী তিন ঘণ্টা সিনেমায় কাটানো যায়, লার্ডাস পার্কের আবছা আলোয় নিরিবিলিতে বসে তিন মিনিটে তিন ঘণ্টার অবসান হতে পারে, হাত ধরা ধরি করে শিথিল চরণে মার্কেট প্লেসের শো-কেইস দেখেও ঘণ্টা তিনেক উতরে দেওয়া যায়। কিন্তু এখানকার এই তিন ঘণ্টার স্রোত একেবারে অন্য খাতে বইছে। এই তিন ঘণ্টায় মনো-বৈচিত্র্যের নিখুঁত নকশা আঁকতে পারে, এমন লিপি-বণিক জন্মায় নি বোধ হয়।

রূপ-চর্যার জীবন্ত মিছিল।— বিধাতার মার হার মেনেছে বিউটি হাউসের মার-প্যাঁচের কাছে। খোদার ওপর খোদকারীর নমুনা দেখাচ্ছে বিউটি হাউস। বিউটি হাউস মুশকিল-আসান।

নারীপুরুষের বিচ্ছিন্ন সমাগম। সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে বড় কেউ আসে না এখানে। অন্যের চোখে নিজেকে অভিরাম করে তোলার তাগিদে কোঅপারেশন অচল।

প্রকান্ড হল। সাদা আলোয় মেঝেতে পুরু কার্পেটের রোঁয়া পর্যন্ত দেখা যায়। এক দিকে সারি সারি শো-কেইস-এ রঙ-বেরঙের প্রসাধন-সামগ্রী সাজানো। সে সবের উপযোগিতা আর ব্যবহার বুঝিয়ে দেবার জন্য আছে এক্সপার্ট সেলসম্যান। অন্য দিকে ছোট ছোট চেম্বার। হাতে-কলমে কলা-কৌশল শেখানোর মহড়া চলেছে সেখানে।

বয়সের ভারে কোঁচকানো চামড়ায় যৌবনের জলুস আনা যেতে পারে। ... কালোর চেকনাই ছোটানো যেতে পারে সাদা চুলে।....তোবড়ানো গাল ভরাট দেখাবার উপকরণ পেতে হলে এখানে আসতে হবে।......এখানে আসতে হবে প্লাস্টার-পালিশে বাঁকা-চোরা বিকৃত দাঁতে কুন্দ-দন্তের শোভা আনার কৌশলটি জানতে হলে। পটলচেরা চোখ বা কোঁকড়ানো চুল চাই তো এসো বিউটি হাউসে। আর রঙ কালো ?.....ওতেই স্পেশ্যালাইজ করেছে বিউটি হাউস।—শধু এখানকার উপকরণ আর পনের দিনের ট্রেনিং— এর পরে মুখের ওপর সার্চ-লাইট ফেলল প্রসাধন যদিও বা ধরা পড়ে, আসল রঙটি ধরা যাবে না। শোনা যায়, এ বিদ্যে শেখানোর জন্য প্যারিস থেকে ট্রেইনার ধরে এনেছে দোকানের মালিক ভাট্‌নগর। নিরুৎসুক জনের খটকা লাগতে পারে, যে-

দেশে কালো রঙের সমস্যা নেই, সে দেশে অমন এক্সপোর্ট গজায় কি করে? কিন্তু নিরুৎসুক জনকে নিয়ে কারবার নয় বিউটি হাউসের।

চটপটে ছটফটে মানুষ ভাটনগর। হাসছে গল্প করছে তদবির তদারক করছে। নতুন খদ্দের দেখলেই বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়, সাদরে নিয়ে গিয়ে বসায় নিজের নিরিবিলি বসবার জায়গাটিতে। গভীর সহানুভূতিতে সমস্যা। শোনে, মাথা নাড়ে। সম্ভাব্য সমাধান বাতলে দিয়ে আশ্বস্ত করে তার পর। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের গায়ে লাগানো বোতাম টেপে। প্যাঁক করে শব্দ হয় একটা। বেয়ারা দৌড়ে আসে।

—সাব্‌কো (অথবা মেমসাব্‌কো)....নম্বর কামরা দেখাও।

পুরনো বা চেনা-জানা খদ্দেরের সঙ্গে তার হাসি-খুশি ভরা অন্তরঙ্গতায় ব্যবসায়ীর দূরত্ব নেই এতটুকু। কোনো ভদ্রলোকের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সোচ্ছ্বাসে বলছে, গ্রোইং ওয়ানডারফুলি ইয়ং স্যার! উত্তরতিরিশ কোনো মহিলাকে সবিনয় অভিবাদনে স্তুতি জানাচ্ছে, ইউ লুক হার্ডলি টুয়েন্টি মাদাম্‌—!

যার রূপ আছে সেও আসে। যতটুকু আছে তার থেকে বেশি একটু থাকতে আপত্তি কি! আর যার নেই তার তো কথাই নেই। কিন্তু সবাই যে এখানে এসে একেবার রূপচয়নে বসে যায় বা তেমনি কোনো সমস্যা নিয়ে হাজির হয় এমন নয়। সাধারণ প্রসাধন-সম্ভারও হরদম বিক্রি হচ্ছে এখানে, যা আজকাল ঘরে ঘরে লাগে। সে সব কেনার ছুতোয় কৌতূহল মেটাতে আসে অনেকে।

কিন্তু আরো একটা আকর্ষণ আছে বিউটি হাউসের।

স্বপ্না বোস।

দীপ-শিখা যেমন পতঙ্গ টানে তেমনি ওরও আমোঘ একটা আকর্ষণ আছে। পিছনের দরজা দিয়ে গট্ গট্ করে ঢোকে যখন, মনে হয় এত বড় হল্‌টা ঝলমলিয়ে হেসে উঠল।

বিউটি হাউসের প্রাধানা আপ্যায়িকা স্বপ্না বোস।

কিন্তু অন্তরঙ্গ সকলেরই বিশ্বাস, শুধু কর্মচারিণী নয়, ব্যবসায়ের কলকাঠিও এই মহিলাই আগলে বসে আছে। আর ধারণা, স্বপ্না বোস ছাড়া ভাটনগরের জীবন-জোয়ারেও চড় চড় করে ভাঁটা নেমে আসবে। অনেকের ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট। বোস পদবীটা এখনো রেখেছে ব্যবসায়ের আবহাওয়ায় রোমান্স ছড়াবার জন্য নইলে, ইত্যাদি।

আশ্চর্য, মেয়েদের সঙ্গে পর্যন্ত ভারি সহজ একটা হৃদ্যতা ওর—যা হবার কথা নয়। তারা আসে রূপচয়ন করতে। এ নারী রূপেরই জীবন্ত-উৎস। ঈর্ষা হবার কথা, কিন্তু হয় না। বরং শলা-পরামর্শ নির্দেশ-উপদেশের জন্য ওরই কাছে মন খুলে দেয় তারা। ওকে দেখে আপন অভিলাষ ব্যক্ত করতে নবাগতদের হয়ত একটু সঙ্কোচ হয়, হয়ত বা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে চাপা নিঃশ্বাসও পড়ে দুই একটা। কিন্তু যাদু জানে স্বপ্না বোস। হেসে, জড়িয়ে ধরে, কানে কানে কথা বলে, নিরিবিলি চেম্বারে টেনে নিয়ে গিয়ে মনের কথা শুনে আর মনের মতো কথা শুনিয়ে বৈষম্যের অনুভূতিটুকু পর্যন্ত ধুয়ে মুছে দেয়।

পুরুষদের সঙ্গে অবশ্য স্বপ্না বোসের রীতি-নীতি ভিন্ন। এদের মধ্যে সমস্যা নিয়ে যারা আসে, তারা আর যাই হোক ওর কাছে আসে না। তারা সোজা যায় ভাটনগরের কাছে, নয়ত তার অন্য কোনো পুরুষ সহকারীর কাছে। কিন্তু স্বপ্না বোসের সঙ্গ-অভিলাষী আগন্তুকের সংখ্যাও কম নয়। বারোমাস তিরিশ দিনের প্রসাধন সামগ্রীই হয়ত কিনতে আসে তারা। একের জায়গায় তিন গছিয়ে দেয় স্বপ্না বোস। কৃত্রিম বিপন্ন ভাবটি ফুটিয়ে তুলে তারা হয়ত বলে, বাঃ রে, এত কি হবে?

নিয়ে যান, বউ খুশি হবে।

বউ খুশি হোক না হোক আর কেউ যে খুশি হবে, সেটা জেনেই ওরা খুশি।

কাউকে বা স্বপ্না বোস ছদ্ম-কোপে ঝঁঝিয়ে ওঠে, আপনারা না নিলে আমাদের দোকান চলে কি করে?

ওদের দোকান সচল রাখতে গিয়ে নিজে অচল হচ্ছে কি না, সেটা তখনকার মতো অন্তত অনেকেরই মনে থাকে না।

বাড়ি-গাড়িঅলা সুপরিচিতদের ছদ্ম-ত্রাস জড়িত অন্তরঙ্গতার সুরও বৈচিত্র্যহীন নয়।—বাঃ রে, এলেই এক কাঁড়ি জিনিস নিতে হবে তার কি ম্যানে আছে, গরীব মানুষ অত টাকা কোথায় পাব?

স্বপ্না বোস কখনো একঝলক হেসে ফস করে জবাব দেয়, তবে দোকানে আসেন কেন? কখনো বা তেমনি ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলে, সত্যি কথাই তো, টাকার এত টানাটানি আপনার—আচ্ছা নিয়ে যান, জিনিসগুলো আমার নামে লিখিয়ে রাখব 'খন।

সানন্দে হার মেনে জিনিস নেয় তারা।

হল-এর এক প্রান্তে ভিজিটারদের জন্য দামী সোফা সেটি কৌচ পাতা। অন্তরঙ্গজনদের নিয়ে সেখানে দিব্বি আড্ডা জমে যায়। প্রায় চা আসে, সিগারেট আসে। ভাট্‌নগরের সেদিকে একটুও কার্পণ্য নেই। সপ্রগলভ আড্ডার মাঝেই স্বপ্না বোস এক এক সময়ে সকলকে সচেতন করে দেয়।—বেচারী ভাট্‌নগর ড্যাব-ড্যাব করে দেখছে দেখুন, আপনাদের ব্যাপার দেখে হার্টফেল না করে বসে।

জোড়া জোড়া চোখ ছোটে অদূরে মালিকের দিকে। দু'হাত তুলে ভাটনগর একটা হতাশার ভাব দেখায় কখনো বা স্বপ্না বোসের দিকে চেয়ে হাসে মৃদু-মৃদু। আবেশ জড়ানো হাসি। আর এদিক থেকে সে নীরব প্রত্যুত্তরও বোধ করি সবারই চোখে পড়ে। বুকের ভেতরটা খচ খচ করে ওঠে অনেকেরই। কিন্তু ভাটনগরের কাছ থেকে তাকে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব নয় কোনো মতে, এও এত দিনে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। অবাঙালি ভাট্‌নগরের ভাগ্য দেখে তারা ঈর্ষা করাও ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেটা সরস হাস্য-কৌতুকের ব্যাপার।

স্বপ্না বোস শত্রু-মুখে রসালাপের ছোট্ট বড়েটা এগিয়ে দেয় যেন।—চাকরিটা আমার আপনারাই খাবেন দেখছি।

হাঁ-হাঁ করে ওঠে তারা—নিশ্চয় খাবো, আলবত খাব, কবে খাব বলুন—ভাটনগর সত্যিই যদি তার চাকরি খেয়ে এদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করে, বিউটি হাউস দু'দিনেই

তাহলে মরুভূমি হয়ে যাবে এও বোঝে। খাওয়া তাদের একদিন জুটবেই। তবে, ভাটনগরের গৃহস্বামিনী হলেও শুধুই ঘরের বউ হয়ে থেকে স্বপ্না বোস ব্যবসা মাটি করবে না, এটুকুই ভরসা।

অবকাশ কালে ভাটনগরও সহাস্য বদনে এদের হাল্‌কা ফুর্তিতে যোগ দেয়। বিভিন্ন পেশার লোক আছে স্তাবক দলের গুঞ্জন-সভায়। ভাটনগর ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলে, একবার স্টেথ্‌স-কোপটা লাগান দেখি। কখনো বা নব্য ব্যারিস্টারের উদ্দেশ্যে বলে, আপনি রেডি থাকুন স্যর, ওর এগেইনসট-এ হয়ত শীগগিরই কেইস ঠুকতে হবে। ওর মানে স্বপ্না বোসের। কখনো বা অসহায় মুখে প্রোফেসার নামখ্যাত লোকটিরই স্মরণ নেয়। কিসের প্রোফেসার, কোথাকার প্রোফেসার জানে না (জানে না বোধ হয় কেউ-ই), তবু বলে, আপনার কাছে আমি দর্শন পড়ব প্রোফেসার—এ জীবন আর কি সুখ।

হাসাহাসি পড়ে যায়। স্বপ্না বোসের পাশেব জায়গাটা আপনিই খালি হয়ে যায়। জায়গাটা কে ছেড়ে দিলে ভালো করে খেয়াল না করেই ওর গা ঘেঁষে বসে পড়ে ভাটনগর। স্বপ্না বোস তাকায় আড়চোখে। সে কটাক্ষ-বানে ভাটনগর কতটা বিদ্ধ হয় বলা শক্ত। কিন্তু আর যারা ব'সে, তাদের দৃষ্টি-পথে সে কটাক্ষ একেবারে মর্মে গিয়ে কাটা-ছেঁড়া করতে থাকে। হাসি-বিদ্যুৎ-প্রেম—এ তিনের একখানি ঝকঝকে ছুরি যেন। চোখের দু'কোণে একটু লালিমা, চোখের তারায় তড়িৎ-ঝলক, আর চোখের গভীরে কাজল-দিঘির নিবিড়তা। আঁখি-কোণের ওই লালিমা অবশ্য তারা যখন তখন দেখে। দেখে পাগল হয়। কিন্তু এই তিনের ট্রায়ো সব সময়ে বড় চোখে পড়ে না।

আর, এই দৃষ্টি-মাধুর্য দর্শন থেকেই হয়ত সকলে এরা মনে মনে উপলব্ধি করেছিল, ভাটনগরের কাছ থেকে স্বপ্না বোসকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা স্বপ্নের মতই ব্যর্থ হবে। কারণ, মানুষটা তার এই বিচিত্র আত্মসমর্পনের ভেতর দিয়েই এই নারীর প্রসন্নতার শতকরা সবটুকুই দখল করে বসে আছে।

তবু কিন্তু চেষ্টার কসুর হয়নি।

চায়ের নেমন্তন্ন, সিনেমার আমন্ত্রণ, পিকনিক পার্টির আহ্বান— এমনি অনেক কিছুর সাদর এবং সাগ্রহ আকুতি সলজ্জ বিব্রত মুখে একের পর এক প্রত্যাখ্যান করেছে স্বপ্না বোস। খুব যে একটা জোরালো কারণ দেখাতে পেরেছে এমন নয়। পারেনি বলে বিব্রত হয়েছে, লজ্জিত হয়েছে আরো বেশি। নিরুপায় হয়ে রূপ-রসিকের দল যুগ্ম আহ্বান জানিয়েছে ওদের। ভাটনগর খুশিতে ডগমগ। পারলে তক্ষুণি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ছোটে। হাঁক-ডাক করে স্বপ্না বোসকে ডেকে সুসংবাদ শোনায়।

জবাবে আবার সেই কটাক্ষ-বাণ। ভ্রূকুটি করে স্বপ্না বোস শেষে এমন একটা কিছুর ওজর দেখায়, যাতে করে আমন্ত্রণকারীদের সামনেই ভাটনগরের সকল উৎসাহে যেন ঠাণ্ডা জল পড়ে এক প্রস্থ। বলে, অমুক দিন অমুক জায়গার অ্যাপয়েন্টমেণ্টা ভুলে বসে আছ এরই মধ্যে?

বলে, মিস্টার আর মিসেস অ্যাডভানিকে কি কথা দিলে যে সেদিন?

বলে, সেদিন আমাকে নিয়ে কোথায় যাবে বলে নাকে খত দিয়েছিলে?

অথবা, কিছু না বলে একেবারে হতাশার দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই থাকে, যার অর্থ—এমন লোককে নিয়ে তো আর পারিনে!

ভাটনগরের তাতেই পূর্ব কোনো প্রতিশ্রুতি বা তেমনি কিছু একটা মনে পড়ে যায়। মাথা চুলকে বিব্রত মুখে মাপ চায় আমন্ত্রণকারীদের কাছে।

এই ক'বছরে সকলেই সখেদে উপলব্ধি করেছে, বিউটি হাউসের এই তিন ঘণ্টা ছাড়া স্বপ্না বোসের মনের আঙিনায় আর পলকের ঠাঁই হবে না কারো। কিন্তু স্বপ্না বোস যাদু জানে, এই তিন ঘণ্টার সপ্রগলভ্ সান্নিধ্য-প্রাচুর্যের মোহও ভক্ত জনেরা কাটিয়ে উঠতে পারে না শেষ পর্যন্ত। পারতে চায়ও না। কিন্তু এর পরে কোথায় থাকে স্বপ্না বোস, কোন জগতে তার গতিবিধি, তার অবকাশ কালের কতটা দখল করে আছে ভাটনগর—এসব প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসার জবাব মেলেনি কিছু। মিলেছে এক টুকরো হাসি, এক লাইন কাব্য বা একটু কিছু হেঁয়ালী। শেষ পর্যন্ত ভাটনগরের ভাগ্যের ওপর ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে কৌতূহলে ক্ষান্ত দিয়েছে সকলেই।

বিউটি হাউসের আর এক বিপরীত আকর্ষণ ভূতনাথবাবু।

ভূতের যিনি নাথ তিনি আর যাই হোন, নিজে ভূত নন। কিন্তু এ ভূতনাথের নামের সার্থকতা ষোলকলার পূর্ণ। হল-এর একটা কোণের দিকে ছোট টেবিলে পেতে বসে এক মনে একের পর এক ক্যাশমেমো কাটে। টাকা লেন-দেনের জন্য আলাদা ক্যাশকাউন্টার আছে। যে যাই কিনুক, সেলসম্যান অথবা সেলস্গার্লকে মাল নিয়ে আগে ওর টেবিলে ফেলতে হবে। এই তিন ঘণ্টায় মুখ তোলার অবকাশ থাকে না বেচারীর। তবু এরই মধ্যে ওকে নিয়ে প্রায়ই একটু -আধটু হাস্য-কৌতুকের প্রহসন ঘটে যায়।

মানুষটার চেহারার মধ্যে যেন বেপরোয়া কারুকার্য চালিয়ে গেছেন বিধাতা। গায়ের রঙ আবলুস কাঠকে হার মানায়। ছোট-ছোট চোখ দু'টোয় এতটুকু জীবনের সাড়া নেই।—একেবারে নিরাসক্ত, নিষ্প্রাণ। নাকটা হঠাৎ যেন সামনের দিকে তুবড়ে গেছে। পুরু ঠোঁট, প্রকাণ্ড মাথা, আর মাথাবোঝাই অবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রঙে চুলের রঙে মিশে গেছে। চোখ ধাঁধান বিউটি হাউসের ঝকমকানি একাই যেন ব্যালান্স করেছে ভূতনাথ। ভাটনগরের রসজ্ঞানের তারিফ করে খদ্দের বন্ধুরা। সেলস্ম্যান, সেলস্গার্লরা একতরফাই হাসি-তামাশা করে ভূতনাথের সঙ্গে। একতরফা কারণ, ভূতনাথ কোনো কথার জবাব দেয় না, মুখ তুলে মড়া চোখে তাকায় একবার, মাথা নিচু করে মেমো কাটায় মন দেয় আবার।

ওর সঙ্গে স্বপ্না বোসের অন্তরঙ্গতাটুকু সব থেকে বেশি উপভোগ্য। এ অন্তরঙ্গতাও একতরফাই। অর্থাৎ স্বপ্না বোসের তরফ থেকে। ভূতনাথকে নিয়ে কেউ কিছু বললেই সে প্রতিবাদ জানায় তৎক্ষণাৎ। বলে, রাহু ছাড়া চাঁদ মানায় না, ভূতনাথ ছাড়া বিউটি হাউস মানায় না। মেমো লেখাতে গিয়ে হাল্কা চাপল্যে তার মাথার ওই ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে দুই একবার ঝাঁকুনি দেওয়াটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে ওর।

কোন রসিক ভক্ত ঠাট্টা করে। —এও যেন রাহুর সঙ্গে চাঁদের মিতালি।

মুচকি হেসে স্বপ্না বোস জবাব দেয়, একমাত্র রাহু ছাড়া চাঁদের কাছে আর ঠাঁই কার ?

মাঝে মাঝে আরো বেশ খানিকটা গড়ায়। এখানকার সর্বজনজ্ঞাত একটা বড় তামাশার কথা হল যে, ভূতনাথবাবু নাকি স্বপ্না বোসের প্রেমে পড়েছে। কার মাথার যে প্রথম এই রসিকতাটুকু এসেছিল, সে আর কারো মনে নেই। কিন্তু কথাটা থেকে গেছে। কালোর সঙ্গে আলো মেশে না বলেই হয়ত এ ধরনের রসিকতা জমে ভালো। ভাটনগরও সানন্দে যোগ দেয় এসব হাসি-ঠাট্টায়।

স্বপ্না বোস হয়ত বলে, মিথ্যে ওকে দোষ দেওয়া কেন, আমিই বরং ওর প্রেমে পড়ে গেছি।

শোনা মাত্র ভাটনগরকে সচেতন করে দিতে চায় কেউ, বলে, সাবধান ভাটনগরজী, ওই ভূত বাবাজিই কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আপনার ঘাড় থেকে—

মনোমত কথাটা আর হাতড়ে পায় না।

স্বপ্না বোস আলতো করে জুড়ে দেয়, পেত্নী ছাড়াবে।

সমস্বরে হেসে ওঠে সকলে। ভাটনগর একবার সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দূরে কর্মরত মূর্তিটির দিকে। বলে, ভূতনাথ ইজ এ জ্যুয়েল—এ ব্ল্যাক জ্যুয়েল—রত্নের প্রতি আর লোভ না থাকে কোন, মেয়ের।

তবু, মুখে যে যত হাসি তামাশাই করুক, একমাত্র ভাটনগর ছাড়া স্বপ্না বোসকে যখন-তখন তরল হাস্যে ওই ভূতনাথের গায়েপিঠে হাত বুলোতে দেখে বা ঝাঁকড়া চুলের গোছায় বেপরোয়া চাঁপাকলি আঙুল চালাতে দেখে বুকের ভেতরটা চড়চড় করে ওঠে অনেকেরই।

* * *

রাত ন'টা বেজে গেছে।

বিউটি হাউসের গেট বন্ধ। কর্মচারী কর্মচারিনীরা বিদায় নিয়েছে। কোমর-উঁচু ঝকঝকে কাঠঘেরা গণ্ডীর মধ্যে মালিকের নির্দিষ্ট গদি আঁটা আসনে বসে গভীর মনোযোগ হিসেব দেখছে ভাটনগর।

হল্-এর অন্য প্রান্তে নিজের জায়গায় বসে সেদিনের বিক্রির মেমো ওলটাচ্ছে ভূতনাথ। মাঝে এক-আধবার চোখ যাচ্ছে তার বিপরীত কোণের দিকে, যেখানে ক্রেতা-অভ্যাগতদের জন্য শৌখীন সোফা-সেটি পাতা। কৌচের ওপর দেহ এলিয়ে দিয়েছে স্বপ্না বোস। শুধু এখন নয়, কাজের মধ্যেও আজ একাধিক বার নিবিষ্টচিত্ততায় ছেদ পড়েছে ভূতনাথবাবুর। ওই নারীমুখের হাস্যলাস্যের মাত্রাটা আজ বেড়েছিল, একটু একটু করে বেড়েই যাচ্ছে যেন। ছোট ছোট ঘরে নিরিবিলি সান্নিধ্যে আজ দু'বার দু'টো লোকের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছে বেশ খানিক্ষণ ধরে, তাও লক্ষ্য করেছে। মেমো লেখা ছেড়ে ভূতনাথ মুখ তোলে না বড়। কিন্তু চোখ এড়ায় না কিছু, ভূতনাথবাবু সব দেখে।

কৌচের ওপর স্থাণুর মতো পড়ে আছে স্বপ্না বোস। শ্রান্ত, ক্লান্ত। প্রায় নির্জীব যেন। ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। কান্নার মতো একটা বিষাদের তরল স্রোত বইছে সর্বাঙ্গে। ভাবছে, কিছু ভাববে না। ভাবলেই তো ভাবনার বিভীষিকা বাড়ে। ভাবছেও না কিছু। তবু দুর্বোধ্য বোঝার মতো কি যেন বুকে চেপে আছে।

অদ্ভুত নীরবতা বিউটি হাউসে। সবগুলো আলো জ্বলছে তেমনি। তেমনি ঝকঝক করছে শো-কেইসের দ্রব্যসম্ভার। কোথাও টুঁ-শব্দটি নেই। শুধু তিন কোণে তিনটি প্রাণী। সামনের দরজা বন্ধ। পিছনের পথ দিয়ে বেরোয় তারা। প্রাসাদ-সৌধের পিছন দিকেও একাধিক নির্গমনের ব্যবস্থা আছে। সেদিক দিয়ে বেরুলে বাড়ির মধ্যেই দশ দিকে দশ পথ।

ঠং করে ঘড়িতে শব্দ হল একটা। সাড়ে ন'টা বাজল। কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বপ্না বোস। অলস মন্থর গতিতে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো ভূতনাথ বাবুর কাছে।

মুখ না তুলেই ভূতনাথ বলল, বোসো।

হয়নি তোমার?

হয়েছে। মেমো-বইয়ের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে চোখে চোখ রাখল তার। তেমনি মড়া চোখ, ভাবলেশহীন, নির্বিকার। সে চোখে এতটুকু আগ্রহ নেই।

সামনের চেয়ারে বসে পড়ল স্বপ্না বোস। বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

কিছু না, —খুব ক্লান্ত? এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

নাঃ ভালো লাগছে না কিছু।

লাগবে না তো।

কেন? কণ্ঠস্বর তিক্ততা প্রকাশ পায় আবার।

ভূতনাথ শান্ত কণ্ঠে বলল, এখন শুধু ভালো লাগছে না, আর কিছু দিন বাদে তিলে তিলে জ্বলতে হবে। জেনে-শুনে নিজে দুঃখ সৃষ্টি করলে দুঃখের শেষ কোথায়?

থামো, থামো—। অস্ফুটকণ্ঠে প্রায় গর্জে ওঠে স্বপ্না বোস।

চাপা কর্কশ স্বরে বলে ওঠে, খুব সাহস দেখি যে?

হ্যা-ল্-লো, ডোন্ট ফাইট মাই ডিয়ার।

শশব্যাস্তে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল দু'জনেই। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, পায়ের শব্দ শোনা যায় না। ভাটনগর কখন এসেছে, দু'জনের কেউ খেয়াল করেনি।

সিট ডাউন, সিট ডাউন প্লীজ—।

বসল দু'জনেই।

এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে ভাটনগর একটা শূন্য চেয়ারে এক পা তুলে দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ডাকল, স্বপ্না।

ইয়েস স্যার!

তোমাকে কিছু বলবার আছে।

ইয়েস, স্যার...

ভাটনগর তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করল আবার একটু।—ইউ সিম্‌টু ফরগেট ইওরসেলফ.... অপরকে ভোলানো আর নিজে ভোলা এক কথা নয়.... ডোন্ট রিসিভ

ইন্‌ডিভিজ্যুয়াল অ্যাটেনশান এণ্ড ইনভাইট ট্রাবলস্‌ ..... আন্ডারস্ট্যান্ড?

শুষ্ক কণ্ঠে স্বপ্না বোস জবাব দিল, ইয়েস্‌ স্যার...।

মেমো লেখা ছেড়ে ভূতনাথ মুখ তুলে তাকাল।

গুড নাইট।

পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ভাটনগর। আর হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলে উঠেছে স্বপ্না বোসের দুই চোখ। সে অদৃশ্য হবার পরেও সেই দিকে চেয়ে নিঃশব্দে আগুন ছড়ালো আরো খানিকক্ষণ।

পরে মাথা রাখল. ভূতনাথের টেবিলের ওপরেই।

চেয়ার ছেড়ে ভূতনাথ উঠে দাঁড়াল। এক দিকের কাঁচের আলমারি খুলে একটা আরকের শিশি বার করল। ড্রপারে করে সাদা জলের মত আরক তুলে নিল কয়েক ফোঁটা। কাছে এসে বলল, ওঠো, রাত হয়েছে, এর পরে তো আরো কতক্ষণ লাগবে ঠিক নেই।

স্বপ্না বোস মাথা তুলল। কিছুটা সংযত, কিছুটা শান্ত। নিজেই দু'হাতের আঙুলে করে একটা চোখের ওপর নিচ টেনে ধরে আলোর দিকে মুখ ফেরালো। ভূতনাথ ড্রপ ফেলল চোখে। একে একে দুই চোখেই।

নীরবে উঠে গেল স্বপ্না বোস। এক কোণের আড়াল থেকে একটা পেটমোটা ভারী চামড়ার হাতব্যাগ তুলে নিয়ে পাশের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ভূতনাথ বসে আছে। নীরব, নিস্পন্দ। যেন ঘুমিয়ে আছে। কোনো তাড়া নেই। কোনো চাঞ্চল্য নেই। সময় কেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে ওই ব্যাগ হাতে নিয়ে আবার দেখা দিল যে নারী, তাকে চিনবে না বিউটি হাউসের অতি পরিচিত কোন খদ্দেরও।

ঘড়ির দিকে তাকালো ভূতনাথ। এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।

হবারই কথা। রোজ ঘণ্টা তিনেক লাগে যে প্রসাধন সম্পূর্ণ হতে, সেটা তুলতে কম করে এক ঘণ্টা তো লাগবেই। এমনিতেই ওঠে না। ওই হাতব্যাগে আছে নানা রকম রাসায়নিক নির্বাস। সেটা যথাস্থানে রেখে ভূতনাথের মুখোমুখি বসল আবার।

সদ্যঃস্নাতা। আটপৌরে বেশবাস। সর্বাঙ্গের চাঁপাহলুদ পেলবতা ধুয়ে-মুছে গেছে। শ্যামাঙ্গী। কুৎসিত। চোখের ড্রপে নেত্র-কোণের সেই মন-মাতানো লালিমার আভা কেটে গেছে। দাঁতের নিখুঁত প্লাস্টার-পালিশ উঠেছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে অধর-কোণের কামনা জাগানো তিলটাও।

অবসন্ন, বিষাদক্লিষ্ট দুই চোখ মেলে স্বপ্না বোস তাকালো ভূতনাথের দিকে।

ভূতনাথও তাকেই দেখছিল।

তার সেই মড়া চোখের দৃষ্টি যেন বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে। নিস্পৃহতার আবরণটুকুও সরে যাচ্ছে। কোমলতার আভাস আসছে যেন। চেয়েই আছে ভূতনাথ।

ভারী সহজ লাগছে তার বিধাতার গড়া ওই নারীমূর্তি।

কুৎসিতের মধ্যেও কোথায় যেন সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে সে।

করিডোরে কতগুলো পায়ের শব্দ শুনে সান্ত্বনা সেন হিসেবের খাতা বন্ধ করে ফেলে দরজার দিকে তাকাল। প্রথম মহিলার দর্শন মাত্রে দু'চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়, আমি তারই লাগি পথ চেয়ে রই পথে যে জন ভাসায়'।

সমবেত হাসির শব্দে পুরুষ-কণ্ঠ কানে আসতে ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে সান্ত্বনা চোখ মেলে তাকাল। চার আঙুল জিব কেটে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তারপর। পুরুষ একজন নয়, তিনজন। ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত, প্রফেসর রে, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার নন্দী।

প্রিয় বান্ধবী মঞ্জুশ্রী দত্ত কল-কণ্ঠে বলে উঠল, আর বসে থাকতে হবে না, সর্বনাশের তেরস্পর্শ একেবারে ঘরের ভেতরে হাজির, এঁরা এবারে তোমাকে পথে ভাসাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েই এসেছেন, অতএব তুমি স্যুটকেস আর হোল্ডঅল গুছিয়ে প্রস্তুত হও।

মঞ্জুশ্রী রেডিও আপিসে শুধু চাকরি করে না, প্লেও করে। অদূর ভবিষ্যতে চিত্র পরিবেশকের সুপারিশে কোনো ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে রাতারাতি যশস্বিনী হবার উষ্ণ আশা মনে মনে পোষণ করছে। (নন্দীর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা শুধু এই জন্যে, নইলে আসল চোখ দু'টো তো তার দত্তগুপ্তকেই আঁকড়ে আছে)। সান্ত্বনার লজ্জাভিনয়টুকু নিখুঁত বলেই পীড়াদায়ক ঠেকল। জেনে-শুনেই অমনটা করল জানা কথা। কিন্তু ওতে প্রায় পুরুষেরই মুণ্ডু ঘুরবে সে-ও জানা কথাই।

স্মিত হাস্যে সান্ত্বনা আপ্যায়ন করল সকলকে, বসুন, বসুন—। ছদ্ম-কোপে মঞ্জুশ্রীকে চোখ রাঙাল, তুমি ভারী যাচ্ছেতাই তো। এমন সব গণমান্য অতিথি নিয়ে আসছ, বাইরে থেকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে আসতে হয়, আমি কি করে জানব—

চোখ টাটালেও মঞ্জুশ্রী বান্ধবীর গুণানুরাগিণী। সাদা কথায় অনুগ্রহ প্রত্যাশিনী। জবাব দিল, ওয়ার্নিং দিয়ে এমন লজ্জারক্ত দৃশ্য থেকে গণ্যমান্য অতিথিদের বঞ্চিত করলে আমার নরকেও ঠাঁই হত না। ঠিক না মিঃ দত্তগুপ্ত?

দত্তগুপ্ত মাথা ঝাঁকাল।—ঠিক। কিন্তু এ সময়ে আপনাকে চড়াও করে বিরক্ত করলাম না তো? করছিলেন কি, হিসেব দেখছিলেন নিশ্চয়?

ছোট টেবিলে মার্কামারা মোট লাল খাতাটার ওপর চোখ গেল সকলের। নন্দী বলল, 'রেস্ট হাউস' আপনাকে আর এক মুহূর্ত রেস্ট দিলে না। এবার বিদ্রোহ। আমাদের আরজিটা আপনিই পেশ করুন মঞ্জুশ্রী দেবী।

আরজির সাফল্যের প্রতি মঞ্জুশ্রীর বেশ আগ্রহ আছে দেখা গেল। বলল, পথে ভাসবার জন্য সান্ত্বনা পথ চেয়েই আছে এ আপনারা না ভুললেই হল। এর পরে

আর কোনো অজুহাতে ছাড়ন-ছোড়ন নেই।

প্রোফেসার রে বাক নিঃসরণের সুযোগ পাচ্ছিল না। কলেজের মাস্টার, দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সান্ত্বনার কাছ ঘেঁষা তার কর্ম নয়। অত বড় আশাও রাখে না। চাকুরে মেয়ে মঞ্জুশ্রীকে পেলেই সে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেতে পারে। এবারে উসখুস করে উঠল, রাইট ! সেটা ভুললে কাব্যে উপেক্ষিতার মত হবে।

সঙ্গিদ্বয়ের ঠান্ডা চোখে চোখ পড়তে সে আবার চুপসে গেল। সান্ত্বনা এদের বক্তব্যটা সঠিক বুঝে উঠল না। বলল, কি ব্যাপার, ঘাবড়ে যাচ্ছি যে। আচ্ছা পরে শুনব, আগে একটু চা হোক।

দত্তগুপ্ত লাফিয়ে উঠল, শুধু চা হবে মানে ? চায়ের সঙ্গে অনেক কিছু হবে। কিন্তু এখানে কিছু হবে না। নিজেদের অমন জায়গা থাকতে এখানে চা খেতে যাব কেন ! তা'ছাড়া, উই ওয়ান্ট ইয়োর আনকনডিশনাল সারেন্ডার। চলুন রেস্ট হাউস-এ, সেখানে আমাদের আরজি নিয়ে আপনার সঙ্গে দস্তুরমত ফাইট চলবে।

সবার আগে মঞ্জুশ্রী সমর্থন-সূচক হাত তুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলেরও হাত উঠল। এবং একে একে উঠেও দাঁড়াল সকলে। সান্ত্বনা মৃদু মৃদু হাসছে।—বেশ, রাজি আছি চলুন। কিন্তু এক শর্তে। আজ সবাই আপনারা অতিথি, রেস্ট হাউসের বিল্ পাবেন না।

মঞ্জুশ্রী এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবে না। ধুপ করে আবার সে সোফায় বলে পড়ল।—আমি রাজি নই, তোমরা যাও তাহলে। বিজনেস্ ইজ বিজনেস্, সেটা তোমার বলে তুমি যা খুশি করতে পারো না। বিশেষ করে আমি যখন জানি কত বড় নিয়ম নিষ্ঠার ফলে রেস্ট হাউস আজ দাঁড়াবার মত দাঁড়িয়েছে। আজকের পার্স আমার—

চিত্র-পরিবেশক নন্দী উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, আমরাই কি দেব নাকি ওঁকে অমন অবিচার করতে, নিজেরা ব্যবসা করছি আর ব্যবসার মর্ম বুঝিনে ? কিন্তু তা বলে আপনি কেন, এ নিয়ে দত্তগুপ্তর সঙ্গে আমার বরং হাতাহাতি হতে পারে।

দত্তগুপ্তও তেমনি সায় দিল, এক্জ্যাক্টলি সো, এবং আমার লোহা-পেটা শরীর, তুমিও মানে মানে এখান থেকেই হার স্বীকার করে নাও। চলুন, আর দেরি নয়, আসল কথাটাই এখনো বাকি।

মঞ্জুশ্রীই হাসি মুখে অগ্রবর্তিনী হল এবার। রেস্ট হাউসের প্রতি এমনি অবিমিশ্র দরদে কর্ত্রীর মন কতটা ভিজল সেটা তার পক্ষে আঁচ করা শক্ত নয়। রেস্ট হাউসের অংশীদার, অনাথায় ওয়ার্কিং পার্টনার হতে পারাটা বর্তমানের চরম লক্ষ্য। অনেক দিন ধরেই এই আমন্ত্রণের প্রত্যাশার আছে।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দীর মোটর দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনার গাড়ি বার করবার দরকার নেই। নিজের ড্রাইভারকে যথাসময়ে হাজিরা দেবার নির্দেশ দিয়ে সে তাঁদের একজনের গাড়িতে গিয়ে বসল।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে হুজুরানিকে সদলবলে আসতে দেখে কোট-প্যান্ট পরা ম্যানেজার থেকে তক্মাপরা বেয়ারা-খানসামা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে পড়ল। রেস্ট হাউসের

মাইনে বেশি কিন্তু চাকরি যেতে সময় লাগে না। এতটুকু ত্রুটি ঘটলে পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে পত্রপাঠ বিদেয় করে দেওয়াই রীতি।

দোতলার বড় ক্যাবিনে সকলকে বসতে বলে সান্ত্বনা সেন এক নজরে চতুর্দিক দেখে নিল। ছুটির দিনে এরই মধ্যে ভিড় মন্দ হয়নি। এ-কোণ ও-কোণ থেকে দু'চারজন মুখচেনা ধনীর দুলাল একটুখানি প্রসন্নতা বর্ষণের আশায় বার বার উৎসুক-নেত্রে তাকাতে লাগল। বঞ্চিত হল না। দূর থেকে পরিচয় সূচক কটাক্ষের উষ্ণপুলকে চায়ের স্বাদ বদলে গেল তাদের। নিচের ছোট ক্যাবিনগুলোর বেশির ভাগই পর্দা-টানা। ফাঁকে ফাঁকে যুগ্ম দয়িতের আভাস মেলে। মৃদু হাসি, মৃদু গুঞ্জন, আর মৃদু মৃদু ঠুনঠান। অদূরে একজন তরুণ লেখক বেপাড়ার সঙ্গী নিয়ে গল্পের প্লট সংগ্রহ করতে এসেছে। সঙ্গীর নির্বাক্ দৃষ্টি অনুধাবন করে মুচকি হেসে বলল, দেখো, কিন্তু চোখ দিও না।

চোখ আপনি যাচ্ছে, মহিলা কে?

ট্যান্টেলাস কাপ। গলা জলে ডুবলেও জল-তেষ্টায় মারা যাবে।

কর্ত্রীর আগমনে কায়দা-দুরস্ত ম্যানেজার মোটা গদির চেয়ার ছেড়ে খদ্দেরের কাছে ঘুরে ঘুরে অমায়িক তদবির-তদারকে লেগে গেছে। বেয়ারারা এরই মধ্যে নিজ এলাকার খালি টেবিলগুলোও একাধিক বার ঝাড়ামোছা করে ফেললে। সান্ত্বনা নিজের চেম্বারে প্রবেশ করল। কোনো কাজে নয়, এমনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ভেতরের দরজা দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

দত্তগুপ্ত সকলের মতামত নিয়ে মেনু পাস্ করে দিয়েছে। উৎফুল্ল মুখে আহ্বান জানাল, আসুন—আমরা ভাবলুম আবার নিচে গিয়ে আপনাকে গ্রেপ্তার করে আনতে হবে।

সান্ত্বনা সেন বসল। প্রোফেসর রে এবং মঞ্জুশ্রীর মাঝের চেয়ারে। নন্দী বিরক্ত হল অধ্যাপকের ওপর, পাশের চেয়ারটিতে তার সরে যাওয়া উচিত ছিল। আর দত্তগুপ্ত ভাবল, মঞ্জুশ্রী ইচ্ছে করেই জায়গাটা ছেড়ে দিলে না। মাঝখান থেকে রে আড়ষ্ট হয়ে গেল একটু।

সান্ত্বনা বলল,—নিন, এবার আপনাদের বক্তব্য শোনান।

মঞ্জুশ্রী শুরু করল, বক্তব্যটা তোমার কানে নীরস লাগবে কিন্তু।

দত্তগুপ্ত বলল, শুধু একঘেয়ে কাজের অপকারিতা সম্বন্ধে আগে ছোটখাট একটা বক্তৃতা করে নিতে পারলে হত। ওহে রে, ওটা তোমার জুরিসডিকশান্, একবার দেখ না চেষ্টা করে, বাড়িতে তো হোমিওপ্যাথি দু'চার ফোঁটা করো শুনেছি।

হাসতে চেষ্টা করে রে আরো বেশি হাসালো সকলকে। কিন্তু ইতিমধ্যে কেবিনের পরর্দা নড়ে উঠল। বড় বড় দুটো ট্রে হাতে দু'জন বেয়ারা পরর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকছে। সন্তর্পণে তারা টেবিলে খাবারের ডিশ সাজিয়ে দিয়ে গেল। দত্তগুপ্ত জিভে একটা শব্দ করে সাড়ম্বরে বড় নিঃশ্বাস টেনে সবটা সুঘ্রাণ আস্বাদন করে ফেলল যেন।—আমাকে এখানেই একটা চাকরি দিন না সান্ত্বনা দেবী, সব ছেড়ে-ছুড়ে কাটলেট কামড়ে পড়ে থাকি।

হাসির শব্দে ঘর ভরে গেল।

সান্ত্বনা জবাব দিল, ওই বাইরে থেকেই, একবার ভেতরে এলে আর পালাতে পথ পাবেন না। অতঃপর আহার সংযোগে নানা ভণিতার মধ্য দিয়ে এদের আসল সঙ্কল্পটার মর্মোদ্ধার করল সে। কথা আর কিছুই নয়, দিন কতকের জন্যে সকলে মিলে প্লেজার ট্রিপে বেরুবে কোথাও। একঘেয়ে কাজের চাপে জীবন একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠেছে নাকি।

দু'চোখ কপালে তুলে ফেললে সান্ত্বনা, কিন্তু আমি বেরোই কি করে।

দত্তগুপ্ত শক্ত হাতে হাল ধরলে, কেন আপনি কি একেবারে দাসখত লিখে দিয়েছেন রেস্ট হাউসের কাছে যে দু'দন্ডও বিশ্রাম পাবেন না? আমার লোহালক্কড় পেটা শরীর তাতেই হাঁপ ধরে গেল, আর আপনার তো—

কথাটা আর শেষ হল না। নন্দী মুখের মাংসখন্ড জঠরে চালান করে আবেদনের সুতো ধরল।—মোটা মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার, কর্মচারী সব রেখেছেন, দরকার হলে ক'টা দিন তারা চালিয়ে নিতে পারবে না সেও তো ভালো কথা নয়। পারে কি না দেখার জন্যেই তো আপনার মাঝে মাঝে গা ঢাকা দেওয়া উচিত।

রে এবং মঞ্জুশ্রীর কান খাড়া থাকলেও হাত এবং মুখের অবকাশ নেই। তবু সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে মঞ্জুশ্রী দত্ত। সমস্যা সমাধানে অগ্রবর্তিনী হল এবার। বলল, এ ভাবে সব ফেলে রেখে সান্ত্বনার পক্ষে যাওয়া অবশ্য শক্ত। বারো ভূতের কারবার, কে কী করে বসে থাকবে ঠিক নেই। সুনাম একবার গেলে তো সব গেল... কিন্তু এমন করে এঁরা যখন ধরেছেন তোমার যাওয়াই উচিত সান্ত্বনা। তা ছাড়া সত্যিই রেস্টও দরকার। আমি তো আছিই, যতটা পারি দেখাশুনা করব'খন দুবেলা—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে এসো দিন কতক।

সে যে যাচ্ছে না দলের সঙ্গে এটা শুধু সান্ত্বনা নয়, অন্য সকলেও এই প্রথম শুনল এবং বিস্মিত হল। নন্দী জিজ্ঞাসা করে ফেলল, আপনি আছেন মানে?

মঞ্জুশ্রী অল্প হেসে ভুরু কোঁচকাল।—বা রে, আমার চাকরি আছে না? তা ছাড়া দু'জন গেলে চলে না শুনছেন তো?

সান্ত্বনা প্রথমে যতই আকাশ থেকে পড়ুক, সদলবলে দিনকতক কোথাও বেড়িয়ে আসার প্রলোভন একেবারে এড়াতে পারল না। রেস্ট হাউস ফেঁদে বসার পর থেকে কোথাও আর বেরুনো হয়ে ওঠেনি। মঞ্জুশ্রীর কথার জবাবে একটু ভেবে প্রায় স্বীকৃতির আভাস দিয়ে ফেলল।—তোমাকে এই ঘানিতে লাগিয়ে দিয়ে আমি বুঝি ফূর্তি করতে বেরুব, গেলে সবাই একসঙ্গেই যাব, এখানকার কাজ এরাই চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু, কোথায় যাবেন আপনারা?

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। এমন কি রে-ও সানন্দে যোগ দিল তাতে। আর আসল উদ্দেশ্যই যখন ভেস্তে গেল, মঞ্জুশ্রী চাকরির দায়িত্বের প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করাটাও সমীচীন বোধ করলে না। এবারে স্থান নির্বাচনের সমারোহ। নন্দী প্রস্তাব করলে, অজন্তা ইলোরা পর্যন্ত টার্গেট করে নিয়ে চলুন বেরিয়ে পড়ি। শুনে

রে'র মুখ শুকাল সবার আগে। তার ধারণা ছিল, প্লেজার ট্রিপ বলতে হাজারিবাগ রাঁচী নয় তো ভুবনেশ্বর পুরী। এবং এও ভেবে রেখেছে, কপাল ঠুকে জমান টাকা নিঃশেষ করে মঞ্জুশ্রীর খরচার ভারও সবটা বহন করে দেখবে কপাল ফেরে কি না। কিন্তু এ যে তার নিজেরই যাওয়া দায় হয়ে উঠল! ও দিকে মঞ্জুশ্রীরও একই অবস্থা।

কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার দত্তগুপ্ত অজন্তা ইলোরা এক কথায় নাকচ করে দিলে।—ওসব কাব্য আমার ভালো লাগবে না। তার থেকে চলো গোয়ালিয়র-ঝাঁসি—একেবারে ইতিহাসের খট্‌খটে মরুভূমি। একটু কষ্ট করলে জয়পুরও সেরে আসা যায়।

ফুটন্ত তেলের কড়া আর জ্বলন্ত আগুন দুই-ই সমান। রে এবং মঞ্জুশ্রী নিস্পৃহ মুখে পুডিং নাড়াচাড়া করতে লাগল। সান্ত্বনা মনে মনে প্ল্যান ছকে ফেলেছে।...বেরুবেই যখন, সেই লোকটার কালো মুখ আরো কালি করে দিয়ে আসা যাক না কেন? মনে হতেই একটা নারীসুলভ কৌতূহলও সুপরিস্ফুট হল মুখে। বলল, এরকম বেড়ানোর নাম বুঝি বিশ্রাম! ওতে আমি নেই, তার থেকে বরং লক্ষ্ণৌ চলুন, বেশ ভালো জায়গা।

বলা বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত তাই সাব্যস্ত হল। আলোচনায় দেখা গেল, লক্ষ্ণৌ সত্যিই ভালো জায়গা, বেশ নিরিবিলি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভালো হোটেল আছে, ইত্যাদি। প্রফেসর রে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, নিজের খরচটা চালিয়ে সঙ্গী তো হতে পারবেই। মঞ্জুশ্রীরও খুব নাগালের বাইরে মনে হল না। শুধু যাতায়াত এবং হোটেল-খরচা। দেখা-শুনা বেড়ান চা রেস্তরাঁর আনুসঙ্গিক ব্যয়ভার সঙ্গীরাই কাড়াকাড়ি ভাগ-বাঁটরা করে নেবে জানা কথা।

যে কালো মুখ কালি করে দেবার আগ্রহে সান্ত্বনা সেন হঠাৎ লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাওয়া স্থির করে ফেললে, সেদিকে এগোতে হলে কাহিনীর গোড়ার দিকে খানিকটা পিছিয়ে আসতে হবে। সেই কালো মুখ, অর্থাৎ, শিবদাস সেন ওর দিদির দূর সম্পর্কের দেওর হত। কিন্তু দাদার শালীর সঙ্গে দিদির দেওরের যে সহজাত রোমান্সের সম্ভাবনা ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি গজিয়ে উঠতে পারে, তার ধার-পাশ দিয়েও এরা যায়নি। একই বাড়িতে অনেক দিন কাটিয়েছে, তবু না। তার দু'টো কারণ। প্রথমত, অমন চাষাড়ে গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষের সঙ্গে রোমান্স হয় না। দূরসম্পর্কের দাদার আশ্রয়ে থেকে লোকটা যুদ্ধের আপিসে সামান্য কেরানিগিরি করে দেশে নিজের বিধবা মা-বোনের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করত কোন রকমে। দ্বিতীয়ত, সান্ত্বনা সেনের টাকার ওজন না থাকুক, নিজের রূপের ওজনটুকু সম্বন্ধে সে ছেলেবেলা থেকেই দিব্বি সচেতন। সেটা ওর দোষ নয়, আর পাঁচজনে এমন করেছে, যখন ফ্রক পরত, পাড়া-প্রতিবেশী বলত, ফুটফুটে মেয়ে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরে হেঁটে স্কুলে যাবার সময়ে রোজ ক'টা ছেলেকে টেনে আনছে মেয়ে-স্কুলের দোরগোড়া পর্যন্ত, সকৌতুকে সেটা খেয়াল করত। কলেজে ছাত্র এবং তরুণ প্রোফেসারদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েও কোন রকমে ঘষেমেজে আই-এ টা পাস করে ফেলল। কিন্তু স্তাবক-পরিকীর্ণ হয়ে আর এগোনো গেল না। পর পর দু' বার বি. এ. ফেল করে পড়াশুনায় ইস্তফা দিল।

মোটামুটি ঘরে-বরে বিয়ে করতে রাজি হলে তার আত্মীয়-পরিজন অনায়াসে সে

ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু সান্ত্বনা আমল দিলে না। কারণ, সে রকম যোগাযোগ থাকলে ওই রূপের জোয়ারে দু'চারজন আই. এ. এস, আই. পি. এস. অন্তত হাবুডুবু খেত, সেটা সে উপলব্ধি করতে পারে। যখন হল না, কাজ নেই বিয়েতে। চাকরির চেষ্টা করবে বলে দিদিকে চিঠি লিখে ছোট শহর কানা করে সে চলে এলো আজব শহর কলকাতায়। দিদি বললেন, ভালো করেছিস, এখনি হাঁড়ি ঠেলতে যাবি কেন, তার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।

কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়ানও অত সহজ নয়। দরখাস্তর মধ্যে তো আর রূপের কথা লেখা যায় না। বি. এ. ফেল মেয়ের দরখাস্ত বেশির ভাগই ওয়েস্ট পেপার বাস্‌কেট-এ সমাধি লাভ করছিল। শিবদাস সেন প্রস্তাব করল, কেরানিগিরি করতে রাজি থাকে তো তাদের আপিসে চেষ্টা করে দেখতে পারে। যুদ্ধের আপিসে কেরানির মাইনেও খারাপ নয়।

অভিমানাহত দৃষ্টিবাণে সান্ত্বনা বিদ্ধ করতে চাইলে তাকে।—বেশ। এতদিন পরে বুঝি এই কথা। কোন্ সাম্রাজ্ঞীগিরিটা জুটছে যে কেরাণিগিরি করব না?

শিবদাস জবাব দিলে, আমাদের আপিসে সাম্রাজ্ঞীগিরিও করছেন কেউ কেউ, জায়গাটা খুব ভালো না বলেই এতদিন বলিনি।

সান্ত্বনার আগ্রহ চতুর্গুণ হল। ছদ্ম কোপে বলল, ঠাট্টা রাখুন, আমার বলে প্রাণান্ত অবস্থা—আপনি আজই চেষ্টা করুন।

ইন্টারভিউর দু'দিনের মধ্যে সান্ত্বনার চাকরি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যের চাকাও ঘুরল। পাঁচমিশালি নবীন অফিসারদের সমাবেশ সেখানে। বছর না যেতে তাদের মোটরে যাতায়াত, বিলিতি রেস্তরাঁয় অবকাশ বিনোদন এবং সিনেমা দেখাটা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দিদির আশ্রয় ছেড়ে একটা বোর্ডিং-এ আলাদা ঘর নিয়েছে।

শিবদাসের গাত্রদাহ সকল সময় চাপা থাকে না। বলে, বেশ আছেন।

সান্ত্বনা হাসে। জবাব দেয়, আছি তো।

কিন্তু সত্যিই সান্ত্বনা বেশ নেই। অন্যের গাড়িতে চড়ে সুখ কতটুকু? তাতে করে চাকরিতে বড় জোর বছরে এক আধটা লিফট পেতে পারে। পেয়েছেও।

কিন্তু তার বাসনার সাম্রাজ্যে ওটুকু উন্নতির কানাকড়িও দাম নেই।

যার যেমন ভাবনা, তার তেমন সিদ্ধি। সান্ত্বনার বিক্ষুব্ধ মস্তিষ্কে একদিন হঠাৎ যেন এক ঝলক আলোকপাত হয়ে গেল। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বড় রেস্তরাঁয় ঢুকে আগে শুধু সকৌতুকে লক্ষ্য করত, সেখানকার আবহাওয়া খানিকক্ষণের জন্যে বদলে যায়, প্রবেশ-পথে চারদিক থেকে সোজা বাঁকাচোরা কটাক্ষ ছাড়াও মনে হত কেবিন থেকে তার নিষ্ক্রমণের প্রতীক্ষায়ও অনেকে বসে থাকে শুধু আর একবার চোখের দেখা দেখবে বলেই। এই থেকেই হঠাৎ একদিন ভিতরে একটা সঙ্কল্পের সূত্রপাত দেখা দিল।

তারপর দু'চারদিন সে একা এলো রেস্তরাঁয়। পরদা দেওয়া কেবিনে প্রবেশ না করে সোজা গিয়ে বসল বাইরের খোলা টেবিলে। দু'এক পেয়ালা চায়ের অবকাশে অন্যমনস্কের মতো সময় কাটাল অনেকক্ষণ ধরে। আসল চোখ দু'টো তার ঠিকই সজাগ

আছে। খদ্দের আসছে স্বাভাবিক হারেই, বেরুচ্ছে কম।...ওই কোণের টেবিলের চারজন চা দিয়ে সুরু করেছিল, এখন খাবারের অর্ডার দিচ্ছে। সামনের দু'তিনটে লোকের এক পেয়ালা চায়ে তৃষ্ণা মিটল না, আবার চা ফরমায়েশ করল। দু'টো টেবিল পরের ওই অভিজাত তরুণ দলটি পর্দা ঠেলে ক্যাবিনে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেন যেন ক্যাবিন পছন্দ হল না তাদের, বাইরেই বসেছে। বয় এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, কিন্তু কি খাবে সে জটলাই শেষ হচ্ছে না তাদের।

সান্ত্বনার ভাবনা ঘনীভূত হতে থাকল। এই প্রথম একজন যোগ্য সঙ্গীর অভাব অনুভব করল সে। শেষে আপিস ফেরতা শিবদাসকেই একদিন সঙ্গে করে রেস্তরাঁয় ঢুকল। লোকটা সরল হলেও নির্বোধ নয়, তার ওপর কাঠগোঁয়ার। কাজে লাগাতে পারলে ভালোই কাজে লাগে। বাড়িতে ওকে অনেক বেগার খাটতে দেখেছে।

ভিড় ছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সান্ত্বনা এক সময় বলল, রেস্তরাঁগুলোয় কেমন বিক্রি দেখছেন... !

শিবদাস ঘাড় নাড়লে, বললে, কলকাতার ব্যাপার—।

কি ছাইয়ের চাকরি করেন, এরকম একটা খুলে বসুন না ?

শিবদাস ভাবল কথার কথা। বলল, এটাই বাকি আছে।

কেন, পছন্দ হল না বুঝি ?...অমন নিশ্চিন্ত কেরানিগিরি করছেন, পছন্দ হবেই বা কি করে !

শিবদাস বিরক্ত হল। বলল, তত্ত্বকথা রেখে চা'টা খেয়ে ফেলুন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা খুলে বসতে যে পুঁজি লাগে সেটা থাকলে কেরানিগিরি করতাম না।

সান্ত্বনা কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল তার মুখের দিকে, পরে এক নিঃশ্বাসে চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে জবাব দিল, আপনার চোখ থাকলে তো পুঁজি চোখে পড়বে—।

বলা বাহুল্য, এবারে শিবদাস বিস্মিত হল। কিন্তু সান্ত্বনা ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

এরপরে হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা গেল। বড় কর্তাদের মোটরগাড়ি অথবা সিনেমা রেস্তরাঁর আমন্ত্রণ যেন রাতারাতি জয় করে ফেলল সান্ত্বনা। ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে শিবদাসকে টেনে তুলে তাঁদের নাকের ডগা দিয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে আসে। কোনো দিন দিদির বাড়ি যায়, কোনো দিন নিজের বোর্ডিংএ নিয়ে আসে তাকে, কোনো দিন বা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এ ব্যতিক্রম দেখে সকলেই বিস্মিত, শিবদাস নিজেও। অফিসাররা ভাবেন, এ আবার কোন কুগ্রহ এসে উদয় হল। সহকর্মীরা ভাবেন, অমাবস্যা-নন্দিত মূর্তিটির বরাত বটে !

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশিদিন স্থায়ী হল না। ওপরওয়ালার বিষদৃষ্টিতে পড়ল শিবদাস। কাজে ত্রুটি ঘটলেই খিটির-মিটির বাঁধতে লাগল। আর ইদানীং ত্রুটি ঘটছেও কাজে। তার ওপর শিবদাসও রগচটা, ফস্ করে দু'এক কথা বলে বসত। ছুটির পরেও কাজ চাপানো হতে লাগল তার ওপর। কিন্তু সান্ত্বনা তাকে এক মিনিটও বেশি বসে থাকতে দেবে না। কাজ ধামাচাপা পড়ে থাকত পরের দিনের জন্য। গাড়িতে প্রতীক্ষারত ওপর-

ওয়ালাকে দেখেও দেখে না সান্ত্বনা। শিবদাসের গা ঘেঁসে ডগমগিয়ে গল্প করতে করতে আপিস থেকে বেরিয়ে যায়।

যুদ্ধের আপিসের চাকরি। পেতেও সময় লাগত না, যেতেও না। একদিনের বাক্-বিতণ্ডা এবং সামান্য বচসার পরে শিবদাস একটা নোটিস পেল। স্তম্ভিত হয়ে দেখল, তার চাকরি গেছে। প্রথমেই সমস্ত রক্ত গিয়ে মাথায় উঠল। তারপর দেশে বিধবা মা-বোনের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ল। সারাদিন বাড়ি বসে কাটিয়ে ছুটির সময় আপিসে এল। কিন্তু সসঙ্গিনী বড়কর্তার ঝকঝকে চাকাগুলো যেন তার হাড় পাঁজর গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

এর পরের ছুটির দিনে সান্ত্বনা নিজেই এলো তার সঙ্গে দেখা করতে। নিরিবিলিতেই পেল তাকে। অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করবেন?

শিবদাস জবাব দিলে না।

সান্ত্বনা আবার বলল, হাত পা ছেড়ে বসে থাকলে তো চলবে না, কিছু একটা করা দরকার।

শিবদাস জবাব দিল, ওপরে আপনার দিদি আছেন, সেখানে যান—নইলে কিছু একটা করে বসতেও পারি।

হুঁ, হুঁ—? সান্ত্বনা হেসে উঠল।

শিবদাসের গা জ্বলে যায়। বলল, ওরকম হাসি আপনার সাহেবের জন্যে তুলে রেখে দিন, কাজে লাগবে।...কিছু করবার আগে ওই লোকটাকে হাসপাতালে পাঠাব, সে খবরটাও তাকে দিয়ে দিতে পারেন।

দেব। সান্ত্বনার দু'চোখ স্থির সংবদ্ধ থাকে তার মুখের ওপর। অনেকক্ষণ পরে বলল, তুমি একটি অপদার্থ, চাকরি খেয়েছে বেশ করেছে। পুরুষমানুষ হয়ে কেরানিগিরির শোকে অমন মাথা খারাপ করতে লজ্জা করে না?

শিবদাস হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল।

সান্ত্বনার কণ্ঠে স্থির আদেশের সুর ফুটে উঠল আবার।—যত দিন না তেমন রোজগার হচ্ছে, তোমার দেশের খরচা আমি চালাব। ব্যবসা করতে হবে। হাজারখানেক টাকা আমার জমেছে, আরো কিছু যোগাড়ের চেষ্টায় আছি। ছোট করে শুরু করাই ভালো—

শিবদাস হাঁ করে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।—কি ব্যবসা, রেস্তরাঁ?

সান্ত্বনা মাথা নাড়লে, তাই—। তুমি ঠিকঠাক মতো একখানা ঘর দেখে নাও।

তুমি চাকরি ছাড়বে?

বুদ্ধির বলিহারি! এক্ষুনি দু'জনেই চাকরি ছাড়লে চলবে কি করে? ব্যবসা দাঁড়াক, তোমার ওই চক্ষুশূল সাহেবের গালে চড় বসিয়ে চাকরি ছেড়ে আসব। কিন্তু অমন হাত পা ছেড়ে বসে থাক যদি, জীবনে আর মুখ দেখব না মনে থাকে যেন—

সান্ত্বনা সেন প্রস্থান করল। বিমূঢ় নেত্রে সেদিকে চেয়ে বসে রইল শিবদাস সেন। মানুষটা গোঁয়ার এবং সরল হলেও নির্বোধ নয়, আগেই বলা হয়েছে। কেমন যেন মনে হতে লাগল, তার চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে প্রকারান্তরে এই দেবীটির হাত আছে।

কিন্তু তবু হাত-পা ছেড়ে আর বসে থাকল না শিবদাস। মুখ দেখাবার জন্যে না হোক, মুখ দেখবার তাগিদটুকু ভিতরে ভিতরে অনস্বীকার্য। যুগ্ম জল্পনা-কল্পনা চলল। চলল ঘর দেখাদেখির পর্ব। শেষে ক্ষুদ্রাকৃতি 'রেস্ট হাউস'-এর পত্তন ঘটল একদিন। ছোট ঘর, স্বল্প আসবাবপত্র, স্বল্প বিধি-ব্যবস্থা। শুধু আশাটাই বড়।

শিবদাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আপিস ফেরতা সান্ত্বনা সটান চলে আসে এখানে। কোনো দিন ছুটি নিয়ে আগেই আসে, কোনো দিন বা আপিস কামাই করে। ছুটির দিনে সারাক্ষণ থাকে। বসে বসে শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে সব কিছু। কিন্তু ঠিক যেন আশাপ্রদ হচ্ছে না।

আপিস থেকে টাকা ধার করে যতটা সম্ভব সাজসরঞ্জাম বাড়াল, পোশাক পরিচ্ছদ বদলে দিল 'বয়' দুটোর এবং খদ্দেরের তত্ত্বাবধানে অগ্রসর হল সে নিজেই।—আপন মনে বসে চা খাচ্ছে কলেজের তরুণ, তাকে গিয়ে বলল, শুধু চা খান কেন—ওতে লিভার ঠিক থাকে না, যখনি চা খাবেন আগে একটু কিছু মুখে দিয়ে নেবেন, আমার এখানে বলে বলছি না, সব জায়গাতেই। বয়! বাবু বিস্কুট কি নেবেন দেখো। কলেজের তরুণ খাবি খেতে খেতে বিস্কুট খেল। তারপর কাউকে বলল, পুডিং তার নিজের হাতের তৈরি, ব্যবসার ভেজাল নেই তাতে, কাউকে বা সহাস্যে জানাল তার চপ কাটলেটের স্যাম্পেল খাদ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবার বাসনা আছে।

রেস্ট হাউসের ভোল বদলাতে লাগল এবার। প্রথম স্কুল-কলেজের ছেলে ছোকরার ভিড়। গুজব শুনে অনেকের অভিভাবক-স্থানীয়রা এলেন পরিদর্শন করতে। সেই ছেলেদের আসা খানিকটা বন্ধ হল বটে কিন্তু এঁদের অনেকে আটকে গেলেন। মেয়ে পরিচালিকার কথা শুনে শুভার্থিনী মেয়েরা আসতে লাগল দলে দলে। ফলে ছেলের সংখ্যা চতুর্গুণ বাড়লই।

ছোট ঘর বড় হ'ল। বড় ঘর আরো বড়। বিলিতি ফ্যাশান এবং বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সান্ত্বনা চাকরি ছেড়েছে। শিবদাসের চক্ষুশূল বড় কর্তার গালে চড় মেরে নয়, সেখানকার নানা পার্টিতে খানা সরবরাহের ব্যবস্থা করে।

কিন্তু রেস্তরাঁর অতিথিদের প্রতি তার এ সপ্রগল্‌ভ অভ্যর্থনা শিবদাস ঠিক বরদাস্ত করে উঠতে পারত না। ফলাফল হাতেনাতে দেখছে, তবু না। সান্ত্বনা সেটা মনে মনে উপলব্ধি করতে পারে, বিরক্ত হয়, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এক নন্দীর কল্যাণেই তো কত সিনেমার পরিচালক থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রীর আনাগোনা। জনাকীর্ণতা সৃজনের বীজাণু তারা, এ সত্যটা আর যেই ভুলুক সান্ত্বনা ভুলবে না। দত্তগুপ্তর মতো ইঞ্জিনিয়ার, রে'র মতো প্রোফেসারের আনাগোনা দরকার রেস্ট হাউসের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে। তাছাড়া দত্তগুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কতকগুলো খেলার প্রতিষ্ঠানের, রে'র সঙ্গে কাল্‌চারাল অ্যাসোসিয়েশনের।

অতিথিদের প্রতি সান্ত্বনার অন্তরঙ্গতা বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল শিবদাসকে সচেতন রাখবার জন্যেও। তাকে বিশ্বাস করে, ডান হাত বলে মনে করে এখনো। আগে অনেকদিন বিকেলে আফিস থেকে এসে দেখেছে তার তখনো পর্যন্ত খাওয়া

হয়নি। সেই সততার ফল পাচ্ছে।, চাইলে আরো বেশি দিতে পারে সান্ত্বনা, আপত্তি নেই। কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোনো কটাক্ষ বরদাস্ত করবার পাত্রী নয়, আভাস মাত্রে সেটা সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়। তবু শিবদাস বলেই ফেলে, ভালো গোলকধাঁধা বানিয়েছে, একবার ঢুকলে আর বেরুবার পথ নেই।

সান্ত্বনা গম্ভীরমুখে জবাব দেয়, একটা চোখ আমার দিকে না রেখে দু'টো চোখই নিজের কাজে দাওগে যাও, নইলে গোলকধাঁধা থেকে কেড কেউ বেরিয়ে পড়তেও পারে।

পরক্ষণে হেসে ফেলে জবাবের তীব্রতা নরম করে নেয়। তা ছাড়া শিবদাস সঠিক বোঝেওনি। তার এ ঈর্ষা কোন্ প্রত্যাশায় সেটা অবশ্য সান্ত্বনা ভালই জানে, আর সে ঈর্ষা রেস্ট হাউসের নিরঙ্কুশ সফলতার প্রধান অন্তরায়। তাই সেটা অসহ্য আরো বেশি।

শিবদাসকে বিয়ে করার কথাটা কোনো দিনও মনে স্থান দেয়নি সান্ত্বনা। আজও না। যেটুকু অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আগে ওকে দিয়েছে সে শুধু তাকে সক্রিয় এবং সচল রাখবার জন্য। এখন সে প্রয়োজন প্রায় ফুরিয়েছে। তাছাড়া, আপাতত সে কাউকেই বিয়ে করতে রাজি নয়। সারা দেহে ভরা প্রাচুর্যের স্বাভাবিক তাড়নাটুকু অনুভব করেনি এমন নয়। কিন্তু তবু না। কারণ ঈর্ষা বস্তুটা শুধু শিবদাসেরই একচেটে নয়, সবারই এক অবস্থা হবে। বয়স বাড়ছে ? বাড়ুক......। আরো টাকা হোক, প্রচুর টাকা, অগুনতি টাকা। তারপর যাকে হোক ডেকে নিলেই হবে।

কিন্তু বিধির ব্যবস্থা অন্য রকম। অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গটা ক্রমশ শিবদাসের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে লাগল। সান্ত্বনার মধ্যেও। সেটা প্রকাশ পেল অন্য ভাবে। কর্মচারীদের প্রতি সান্ত্বনার ব্যবহার খুব দরদী নয়। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে চাকরি যায়। শিবদাস আসে ওদের হয়ে সুপারিশ করতে। ফল হয় না, উল্টে দুজনেরই বিক্ষোভ বাড়ে। এমনি একটা সামান্য উপলক্ষ নিয়েই মর্মান্তিক হেস্তনেস্ত হয়ে গেল একদিন।

রেস্ট হাউসের প্রথম আমলের 'বয়' দুটোর একজনের জবাব হয়ে গেছে। অবশ্য অপরাধ তার কম নয়। একদল অতি আধুনিক খদ্দেরকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা এবং পরিবেশন করেও এক পয়সা বখশিশ না পেয়ে বেফাঁস কি যেন বলে ফেলেছিল।

কাজে জবাব হতে কান্নাকাটি জুড়ে দিল সে। তাতে যদি বা কাজ হত, সান্ত্বনা আরো বিগড়ে গেল শিবদাস সুপারিশ করতে আসায়। বলল, কোনো কথা শুনতে চাইনে, তুমি এবার থেকে ওদের আশকারা না দিলেই খুশি হব।

শিবদাসের রাগ চড়তে ওটুকুই যথেষ্ট। বসল তার মুখোমুখি। বলল, আর তুমিও কর্মচারীদের ওপর কথায় অমন দুর্ব্যবহার না করলে আমি খুশি হব। —প্রথম থেকে আছে লোকটা, এককথায় তাকে যেতে বললেই হল ?

সান্ত্বনা কণ্ঠস্বর সংযত করল কোন প্রকারে। ধীরে-সুস্থে পরিষ্কার জবাব দিল, তেমন কারণ ঘটলে প্রথম থেকে আছে এমন ওর থেকে আরো অনেক বড় কর্মচারীকেও যেতে হতে পারে।

শিবদাস হতবাক্।......তার মানে ?

বুঝে নাও।

যা ঘটবার ওই সামান্য কটি কথাতেই ঘটে গেল। সমস্ত আশা আশ্বাস একে মুহূর্তে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল শিবদাসের। নিশ্চল মূর্তির মতো বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পরে একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে উঠে চলে গেল।

সান্ত্বনা মনে মনে দুঃখিত হয়েছে। কিন্তু এ রকম একটা দিন আসবে সে জানত। আগে এসেছে, ভালোই। ও চাইলে টাকা ছাড়া রেস্ট হাউসের কিছু অংশও তাকে লিখে দিত। কিন্তু মালিকানার শর্তে নয়, কর্ম-পরিচিতির সানুগ্রহ পুরস্কার হিসেবে। কিন্তু ওতে সে সন্তুষ্ট থাকবে না এও সান্ত্বনা জানতই।

দিদির বাড়ি থেকে খবর পেয়েছে লোকটা কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানেই একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে হয়ত। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবার জন্যেই খুব পরিষ্কার করে শিবদাসকে একটা চিঠি লিখেছিল।—কোন্ সম্পর্ক নিয়ে পাশাপাশি তারা এখনো সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে রেস্ট হাউসের সঙ্গে, সে সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসবিহীন বাস্তব সম্ভাবনা সমন্বিত পত্র।

সে চিঠি শিবদাস পেয়েছে। জবাব দেয়নি। তার চোখের আগুনে প্রতিটি ছত্র যেন পুড়িয়ে ঝলসে ফেলতে চেয়েছে। নির্মম ক্রূরতায় ওই নারীদেহের হাড়গোড়সুদ্ধু পিষে তালগোল করে ফেলতে পারলে জিঘাংসু মন শান্ত হত।

এবারে বর্তমানের কাহিনী নিয়ে অগ্রসর হওয়া চলে। দত্তগুপ্ত নন্দী-রে' অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে হঠাৎ বেড়াতে আসা সাব্যস্ত করে কৌতুকবশেই হয়ত সান্ত্বনা এতদিন বাদে আবার শিবদাসকে চিঠি লিখল।—'লক্ষ্ণৌ বেড়াতে আসছে, পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।' কিন্তু সবটাই হয়ত কৌতুক নয়। ওকে ছাড়াও রেস্ট হাউস বিপুল গতিতে চলতে পারে এটা যদি সে বুঝে থাকে তাহলে এখনো তার ফিরে আসার পথ খোলা আছে, সে উদার আভাসও সান্ত্বনা সাক্ষাতে দেবে। মোটা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার রেখেছে, তবু তার কাজের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ এখনো সে ওকেই সকলের ওপরে প্রাধান্য দিতে রাজি আছে। নিজের উদারতা দেখে সান্ত্বনা নিজেই মনে মনে বিস্মিত হল, খুশি হল, তৃপ্ত হল। সে চিঠিও পেল শিবদাস এবং আগের মতই মনে মনে সমস্ত নখ-দন্ত দিয়ে যেন বিদীর্ণ করে ফেলতে চাইল তাকে।

লক্ষ্ণৌ শহরে দ্বিতীয় দিনে হোটেলে সান্ত্বনার সঙ্গে আবার দেখা হল শিবদাসের। তিন বছর পরে দেখা। শিবদাসই এসেছে। সান্ত্বনা জানত আসবে। উৎফুল্ল মুখে অভ্যর্থনা করল, এসো এসো, আমি তো ভেবেছিলাম কালই আসবে। এলে না যে ?

কাল আসেনি, আজই বা কেন এলো শিবদাস জানে না। এখানে সান্ত্বনা রেস্ট হাউসের কর্ত্রী নয়। হাস্যে-লাস্যে কৌতুকময়ী প্রিয় সখীটি যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ও মূর্তি শিবদাস চেনে।

সান্ত্বনার প্রথম সঙ্কল্প সফল হল। মানুষটার কালো মুখ আরো কালো হয়েছে। অপাঙ্গে ভালো করে লক্ষ্য করে নিল একটু, পরে তেমনি কলকণ্ঠেই বলল,

বোসো—চেহারার তো দিব্বি উন্নতি হয়েছে দেখছি, ডন-বৈঠক করছ না কি! সঙ্গীদের দিকে তাকালো, মিঃ দত্তগুপ্ত, একে চিনলেন?

শুধু দত্তগুপ্ত নয়, বাকি সকলেও চিনেছে। সামান্য একজন পুরনো ম্যানেজারের প্রতি এতটা প্রীতি বর্ষণের তাৎপর্য কেউ বুঝল না। আহুত হয়ে দত্তগুপ্তও তেমনি পরিহাস-তরল কণ্ঠে বিস্ময় জ্ঞাপন করল।—আই সি! আপনার পুরনো ম্যানেজার তো—ব্যাট ইউ. পি. রাইস সিমস্ টু স্যুট হিম সো নাইস্! হি লুকস্ এ পা-ফেক্ট ডেভিল নাও!

শিবদাসের চোখ দু'টো স্বল্পক্ষণ পড়ে থাকে তার মুখের ওপর। বলল, রেস্টুরেন্ট-এ ম্যানেজারি করলেও একটু-আধটু ইংরেজি বুঝি মশাই, ইউ. পি'র চালের কাছে বাংলার চাল ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়তে পারে।

ছন্দপতন ঘটল। সান্ত্বনার মুখেও শঙ্কার ছায়া নামল। এমন সামান্য লোকের মুখে এত বড় স্পর্ধার কথা শুনতে অভ্যস্ত নয় দত্তগুপ্ত। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

হোয়াট্।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল শিবদাসও। দত্তগুপ্ত নীরবে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। পরে আবার চেয়ার নিল। বসল শিবদাসও।

নন্দী মনে মনে খুশি। লোহ-লক্কড়-পেটা শরীরের কথাটা মনে পড়ল বোধ হয়। মঞ্জুশ্রী এবং প্রফেসার রে' তখনো হতভম্ব। জের সামলাতেই হল সান্ত্বনাকেই। অন্তত চেষ্টা করল সামলাতে। প্রথমে এক দফা হাসল খুব। অজস্র হাসি। পুরুষের চোখ বিভ্রান্ত করার মতো হাসি। পরে বলল, কাউকে রাগতে দেখলেই আমার হাসি পায়।—সত্যি বলছি মিঃ দত্তগুপ্ত, ও একেবারে রাগের ডিপো, কিন্তু তাহলেও লোক বেশ ভালো, বেশ নয়, খুব ভালো—তাই না?

শেষের প্রশ্নটা শিবদাসের ওপরেই নিক্ষিপ্ত হতে আবহাওয়া ফিরল একটু। কিন্তু শিবদাস আবার উষ্ণ হয়ে উঠছে মনে মনে। খানিক বাদে শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, রেস্ট হাউস চলছে ভালো?

সান্ত্বনা নিরীহ মুখে জবাব দিল, কই আর চলছে, লোকসান খেয়ে খেয়ে তো হয়রান হয়ে গেলাম।

এবারে মঞ্জুশ্রী সশব্দে হেসে উঠল। শিবদাস আবার জিজ্ঞাসা করল, এখানে আছ কত দিন?

তার তুমি সম্বোধনটা সকলের মনেই একটু-আধটু বিস্ময় উদ্রেক করল। সান্ত্বনা দু'হাত উল্টে জবাব দিল, এঁরা জানেন।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে। কারো দিকে না চেয়ে বা কোনো রকম অভিবাদন না জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আবারও দেখা হল ঠিকই। পরদিনই। দলের সঙ্গে সঙ্গে এখানে-সেখানে ঘুরলও। কিন্তু কদাচিৎ কথা বলল। সেও সান্ত্বনা গায়ে পড়ে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা

করতে। তাকে কলকাতা ফিরিয়ে নেবার সঙ্কল্প প্রথম দিনের সাক্ষাতেই প্রায় বাতিল করেছে, তাই অন্তরঙ্গতা প্রকাশে খুব কার্পণ্য করল না। কিন্তু এই খাপছাড়া লোকটা সঙ্গে থাকাতে দলের অর্ধেক আনন্দই মাটি। এমন কি অস্বস্তি লাগছিল সান্ত্বনারও। লোকটার চোখের ঠান্ডা দৃষ্টিতে যেন কি আছে।

পরদিনও সকালের দিকেই এলো শিবদাস। সঙ্গিনী এবং সঙ্গীরা ইচ্ছে করেই কথা বলতে বলতে অন্য দিকে সরে গেল। সান্ত্বনা জানালো, মধ্যাহ্নে তারা যাচ্ছে 'ভুলভুলাইয়া' দেখতে। গোলকধাঁধা ভুলভুলাইয়া—হঠাৎ কি মনে পড়তে হেসে ফেলল। নিজের অজ্ঞাতেই জিজ্ঞাসা করল, তুমিও আসছ নাকি?

যেতে পারি। কিন্তু তোমার ও গোলক-ধাঁধার কাছে এ আর এমন কি!

আমারটাই বা কি এমন? সান্ত্বনার কণ্ঠেও পরিহাসের সুর বাজল, তুমি তো দিব্যি সুট্ করে বেরিয়ে আসতে পারলে।

শিবদাস চেয়ে আছে। অনাদরের নির্মম আঘাতে সকল আশা সকল আনন্দ ধূলিসাৎ করে একদিন তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছে যে নারী, তার এই মৌখিক আদরে সে আর বিচলিত হবে কতটুকু? দেখছে চেয়ে চেয়ে। দেখছে রেস্ট হাউস-এর সেই স্বার্থচারিণী মালিককে। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র শ্বাপদ যেমন স্থির দৃষ্টিতে লেহন করে কাছের অথচ নাগালের বাইরের শিকারকে।

....দেখছে। দেখছে আর যেন ভাবছে কি। হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল সে। বলল, আচ্ছা সেখানে থাকব আমি।

দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। নিজের উপরেই বিরক্ত হল সান্ত্বনা।

কেন আবার আপ্যায়ন করতে গেল ছাই।

যথাসময়ে বড় ইমামবাড়ার ফটকে প্রবেশ করল তারা। ইতিহাসের স্মৃতিচিহ্ন। ওরই দোতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত সেই রোমাঞ্চকর ভুলভুলাইয়া।

ইমামবাড়ার সিঁড়ির কাছে আসতে সকলেরই চোখ গেল অদূরে ঘাসের ওপর শিবদাস শুয়ে আছে। তাদের দেখে ধীরে-সুস্থে উঠে এলো। একমাত্র সান্ত্বনা ছাড়া সকলেই বোধহয় মনে মনে কটূক্তি করল। সান্ত্বনাও কোনো সম্ভাষণ জানালো না।

সিঁড়ি ধরে উঠে প্রথমে বিশাল হল্-ঘর। দু'চারজন গাইড এগিয়ে আসছিল। কিন্তু অন্য দিক থেকে একজন বৃদ্ধ গাইডকে ইশারায় ডাকল শিবদাস। বলল, এই লোকটাই সব থেকে বেশি এক্সপার্ট। গাইড আ-ভূমি কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

তাদের নিয়ে হল্-ঘরে প্রবেশ করে গাইড মুখ ছোটাল। ইতিহাস আর গল্পের চাটনি। এ ধরনের এত বড় হল-ঘর নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। নবাব আসাফউদল্লার কীর্তি। বিরাট দুর্ভিক্ষ লেগেছিল দেশে। খেতে না পেয়ে মানুষ পিঁপড়ের মতো মরছিল। কিন্তু মোল্লা যাকে দেয় না কিছু, তাকেও দেয় আসাফউদল্লা। নবাব হাজার হাজার লোক লাগালেন এই ইমারত গড়তে। বদলে তারা খেতে পাবে। কিন্তু এত লোকে একখানি ইমারত গড়তে ক'টি দিন আর লাগতে পারে! তারপর তো আবার সেই উপবাস। বিচিত্র ফন্দি আঁটলেন নবাব আসাফউদল্লা। দিনের বেলায় তারা যতটুকু

গড়ে দিয়ে যায়, রাতের বেলায় নবাব-কর্মচারী সেটা ভেঙে ফেলে। এই করে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর ধরে অনিবার্য অনশনের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করলেন দয়ার অবতার নবাব আসাফউদল্লা। দুর্ভিক্ষ দূর হতে তাদের নির্মাণ-কাজ শেষ হল।

চোস্ত উর্দুতে ইতিহাসের গল্প শুনে মশগুল হয়ে গেল সবাই। সব-কিছুর পিছনেই গাইড গল্প ফাঁদতে লাগল। সিংহাসন, সোনামোড়া আয়না, মোমের তাজিয়া, হাজার-পাতি ঝাড়—। তারা শুনছে, দেখছে। হঠাৎ মঞ্জুশ্রী বলল, ও মা ! বেলা গড়িয়ে আসছে, ভুলভুলাইয়াতে উঠব কখন ? পাঁচটার পরে তো আর উঠতে দেবে না।

দেখা গেল গাইড বাংলা বোঝে। জানালো, সেটা নিয়ম বটে, তবে নিয়মের কড়াকড়ি হুজুর আর হুজুরানী বিশেষে নির্ভর করে। তা'ছাড়া পাঁচটার দেরিও আছে, ঠিক দেখা হবে।

অন্ধকার হয়ে যাবে না ?

গাইড সেটা আর অস্বীকার করলে না। পায়ে। পায়ে অগ্রসর হল সকলে। নন্দী জিজ্ঞাসা করল, ভুলভুলাইয়া কী ?

ভুলভুলাইয়া ? গাইড সাগ্রহে ঘুরে দাঁড়াল এবং গম্ভীর মুখে গল্প সুরু করল আবার।—ভুলভুলাইয়া হল বিচিত্র রকমের এক গোলকধাঁধা। দোতলা থেকে বিপুল প্রাসাদ-সৌধের ওই পাঁচতলা পর্যন্ত। বেগমদের সঙ্গে কোনো সুরসিক নবাব লুকোচুরি খেলত সেখানে। পরের নবাবেরা অবিশ্বাসিনী বেগমদের এখানে এনে ছেড়ে দিত। উপবাসে অনিদ্রায় দিনের পর দিন তারা আর্ত হাহাকারে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে বেড়াতো। পাগল হয়ে শেষকালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করত তারা। ভুলভুলাইয়ার একটি মাত্র প্রবেশ-পথ এবং বেরুবার পথও ওই একটিই। কিন্তু একবার ঢুকলে খুঁজে আর সে পথ বার করা যায় না।

গল্প শুনে মঞ্জুশ্রীর গা ছমছম করে উঠলো। বলল, আমার ভয় করছে, শেষে যদি না বেরুতে পারি ! সান্ত্বনারও কপাল ঠুকে আত্মহত্যার কাহিনী শুনে কেমন লাগছিল। তবু ঠাট্টা করল, না বেরুতে পারলে এঁদের মধ্যেও কেউ থেকে যাবেন, সুখে ঘরকর্না কোরো। বক্র কটাক্ষপাতটা অধ্যাপকের উদ্দেশে।

কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিল দত্তগুপ্ত। বলল, হুঁ, যত সব আজগুবি গল্প। বেরুতে দেরি হতে পারে, তা'বলে একেবারে বেরুনো যাবে না কি !

আভূমি নত হয়ে আবার কুর্নিশ করলে গাইড। বলল, বান্দার গোস্তাকি মাফ হয়, বেরুতে পারলে পাঁচ তলার ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে গর্দান দেবে সে, কিন্তু না পারলে হুজুর যেন খুশি হয়ে একখানা এক শ' টাকার নোট্ নেক্‌নজর করেন।

এ রকম একটা বাজি ধরা কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু শুনে সকলেরই কৌতূহল উদ্দীপিত হল আরো।

গাইডের পিছন পিছন ভুলভুলাইয়ার সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠল সকলে। গাইড বলল, এই এক সিঁড়ি মিললে তবে নেমে আসা যাবে, কিন্তু দেখা যাক্ মেলে কি

না। এঁকেবেঁকে নানা পথ ধরে সৌধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল সকলকে নিয়ে। ছোট বড় অগুনতি সিঁড়ি এবং অজস্র সরু সরু পথের অভিযান। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছে সব গুলিয়ে গেল। দোতলা থেকে তিনতলায় উঠেছে কখন তাও ঠাওর পেল না। অজস্র পথের জটিল সমারোহ আর অজস্র ওঠা-নামা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল গাইডের লুকোচুরি খেলা। হঠাৎ একটা দেওয়ালের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ডাকলে, আইয়ে। আবছা অন্ধকারে সকল অনুসরণ করল। ও মা। কোথায় আইয়ে! এ-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ও-ধার থেকে ডাকছে, আইয়ে! ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—কিন্তু তার টিকিটি নেই। এ দিকে দলের মধ্যে হাসাহাসি ছুটাছুটি পড়ে গেল। নিজেদের অজ্ঞাতেই ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে তারা। আশে-পাশে দূরে কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরছে সরু সরু কানা গলির মধ্যে। এ-ধারে থেকে ও-ধার থেকে তাদের হাসির শব্দ প্রতিধ্বনি হচ্ছে পাষাণপুরীতে। চকিতে কাউকে দেখা দেখা দেয় গাইড, ডাকে আইয়ে, পরক্ষণেই কোন্ পথ দিয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, হদিশ পায় না।

অন্ধকার হয়ে আসছে আরো। ফস্-ফস্ করে দেশলাই জ্বালা হচ্ছে বার বার। দত্তগুপ্তর হাঁপ ধরে গেল। এক দিক থেকে তার হাঁক শোনা গেল, গাইড। পরক্ষণে অবিকল তার কণ্ঠস্বর নকল করে দূর থেকে গাইড জবাব দিল, আইয়ে! আবার জমে উঠল। এ দিক থেকে নন্দী ডাকে, ও দিক থেকে মঞ্জুশ্রী, আর একদিক থেকে রে। সকলেরই কণ্ঠস্বর নকল করে প্রত্যুত্তর দেয় গাইড। একটু বাদে বেশ দূর থেকে সান্ত্বনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল যেন। দত্তগুপ্ত আর মঞ্জুশ্রী তখন একত্র হয়েছে। মঞ্জুশ্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি সাংঘাতিক লোকটা—ঠিক সান্ত্বনার গলা নকল করছে।

কিন্তু সে কণ্ঠস্বর নকল নয়। তাদের মধ্যেই কারো পদধ্বনি অনুসরণ করে সান্ত্বনাও ছিটকে পড়েছিল কোথা থেকে কোথায়। পথ হারিয়ে ফেলে পথ খোঁজার নেশায় সে-ও মেতেছিল। সত্যিই তো আর ভয়ের কিছু নেই। কত দূরে এসেছে, এত বার ওঠা-নামা করে কোন্ তলায় আছে কিছুই ঠাওর করতে পারছিল না, মজা লাগছিল বেশ।...একটা গাঢ় অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে পড়ে থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণে মনুষ্যস্পর্শে থরথর করে কেঁপে উঠল সে। সহসা কার দু'টো কঠিন বাহুর নির্মম নিষ্পেষণে দেহের হাড়গোড়-সুদ্ধ গুঁড়িয়ে যেতে লাগল তার। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল একবার। দ্বিতীয় বারের চেষ্টা এক হিংস্র অধরগহ্বরেই বিলীন হল।...দ্রুত...দ্রুত...দ্রুত হারিয়ে ফেলছে সান্ত্বনা নিজেকে। হাল ছেড়ে দিল। হারিয়ে গেল।...অব্যক্ত যন্ত্রণা।...অব্যক্ত বিস্মৃতি!...নিশ্চেতন... কল্পান্ত।

গাইডের উদ্দেশে দত্তগুপ্তর উত্তেজিত বকাবকি শুনে যেন এক যুগ বাদে চেতনা ফিরল সান্ত্বনার। অনেকগুলি পদধ্বনি। উর্দুভাষী গাইডের বিনম্র আকুতি,—এক্ষুনি তালাশ মিলে যাবে হুজুর, ঘাবড়িও না। দেওয়াল ধরে ধরে সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল। দেহের সব বাঁধুনি যেন পৃথক হয়ে গেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করল, সংবৃত করল। পারছে না, তবুও।

তাকে আবিষ্কার করে সকলে কলকণ্ঠে চেঁচামেচি করে উঠল। দেশলাইয়ের ক্ষণিক

আলোতেও নিঃসাড় পাণ্ডুর মূর্তিটি চোখে পড়ল সকলের। ভাবল, ভয় পেয়েছে খুব। মঞ্জুশ্রী বলল, আধ ঘণ্টা ধরে ডাকাডাকি করছি, একটা সাড়া দিলে না পর্যন্ত, ফিট হয়ে গেছলে না কি! হাত ধরল।

দত্তগুপ্ত এবং নন্দী গাইডকে ধরে সেখানেই মারে আর কি।

শ্রান্তক্লান্ত হয়ে গোলকধাঁধা থেকে বেরুবার তাড়ায় আর একজনের কথা অন্তত এদের কারো মনে নেই। শিবদাস। বাইরে এসে দেখা গেল আবছা অন্ধকারে সে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সান্ত্বনা কোনো দিকে দৃকপাত না করে সোজা গাড়িতে উঠল।...হোটেল। তারপর কলকাতা।

সান্ত্বনার পরিবর্তন দেখে সঙ্গী-সাথীরা আকূল পাথারে পড়ল। বিস্মিত হল, উদ্বিগ্ন হল, বেদনাহত হল তার অস্বাভাবিক ব্যবহারে। দিন যায়, মাস যায় একটা, দুটো। কিন্তু মুখে সেই দুরূহ গাম্ভীর্যের বর্ম আঁটা। রেস্ট হাউসে আসে, নিজের চেম্বারে বসে থাকে চুপ করে, অতিথি অভ্যর্থনায় হাসিমুখে এগিয়ে আসে না আর, কর্মচারীদের সঙ্গেও কথা বলে না বড় একটা। মাঝে মাঝে কামাইও করে। বেগতিক দেখে দত্তগুপ্ত বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল। নন্দীও। কিন্তু ওর ভ্রূকুটিতে মুখ চুন করে ফিরে গেছে।

শেষে একদিন মঞ্জুশ্রীকে নিজে থেকেই ডেকে এনে রেস্ট হাউসের কিছুটা অংশ লেখাপড়া করে দিল। দেখাশুনার সকল ভার অর্পণ করল তার ওপর। এতদিনের আশা।...বিগলিত হয়ে মঞ্জুশ্রী জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলবে না?

সান্ত্বনা ক্ষুদ্র জবাব দিল, কিছু না।

হয়েছে যা, তার স্থূল দিকটার জন্যে সান্ত্বনার এমন অস্বাভাবিক পরিবর্তন নয়। টাকা আছে। টাকা থাকলে ব্যবস্থাও আছে। বিজ্ঞানের যুগ। ব্যবস্থা এক রকম করেই রেখেছে। ইতিমধ্যেই নিশ্চিন্ত হতে পারত। কিন্তু থাক না, তাড়া কি।...অন্য পরিবর্তনটাই বিষম। ওই সম্ভাবনাটুকু একেবারে নির্মূল করে ফেলতে মন চাইছে না, এ সত্য নিজের কাছেও যে গোপন থাকছে না আর! তা' ছাড়া, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কল্পনায় যে মানুষ-দানবকে ফাঁসিতে লটকেছে দিনে ক'বার করে আর নির্মম আনন্দ উপভোগ করেছে তার তাজা দেহের ছটফটানি দেখে, তারই সেই পশু-শক্তিটা আজও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে আছে অক্টোপাসের মতো। সেই অব্যক্ত যাতনা, আর অব্যক্ত বিস্মৃতি...।

সব শেষে নিজের ওপরেই আগুন হয়ে উঠল সান্ত্বনা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি নয়। আর দুর্বলতাও নয়। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল ডাক্তারের সঙ্গে।...টাকা নিল। মোটা টাকা লাগবে। মোটা টাকাই নিল। কিন্তু মোটরে বসে সমস্ত দেহমন যেন শিথিল হয়ে আসছে আবার। মনে হল, একটা নির্মম হত্যা অনুষ্ঠিত করতে চলেছে সে। হত্যা?...হত্যা বই কি!...তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ড্রাইভারকে যেদিকে যেতে আদেশ

দিল সান্ত্বনা, সেটা হাওড়া স্টেশনের পথ।

...কিন্তু দিন কতকের মধ্যেই ফিরল আবার। ফিরল একা। ফিরল ভুলভুলাইয়ার দেশ থেকে। বাসস্থান বদলে ফেলল সকলের অজ্ঞাতে। রেস্ট হাউস চলে। মঞ্জুশ্রী চালায়। নতুন আবর্তের সৃষ্টি হয় তাকে ঘিরে। সান্ত্বনা খবর রাখে না। সারাক্ষণ দরজা বন্ধ তার ঘরের। সান্ত্বনা পথ হারিয়েছে। ভুলভুলাইয়ার একটি মাত্র পথ। সে পথের খোঁজ দেবে যে, সে নিখোঁজ।

শিকার

অন্ধকারে বিহারীলালের চোখও বিড়ালের মতোই জ্বলে। যারা দেখেছে তারা বলে। যারা দেখেনি তারাও বলে। সামনে বা আড়ালে বিহারীলালকে নিয়ে কম বলাবলি হয় না।

বড়বাবুর পরেই পদমর্যাদা। বড়বাবু অর্থাৎ থানার ও. সি. বা ইনস্‌পেক্টর। বিহারীলাল সাব্-ইনস্‌পেক্টর। ছিল কি? প্রথমে লিটারারি কন্‌স্টেব্‌ল, তারপর অ্যাসিস্‌ট্যান্ট সাব্-ইনসপেক্টর, আর তারপরে দেখতে দেখতে এই। আরো দু'জন সাব্-ইনস্‌পেক্টর আছেন থানায়। তাঁরা বয়সে প্রবীণ এবং চাকুরিতে সিনিয়র হলেও মনে মনে শঙ্কিত। যে রেট্-এ টপকে আসছে, খুব নিশ্চিন্ত থাকার কারণ নেই।

বড়বাবুর মাথার তিনভাগ চুল সাদা। তাঁর তেমন ভয় নেই। তবু হালকা টিপ্পনী কাটেন মাঝে মাঝে, মুখখানা দেখো একবার, যেন দুনিয়াসুদ্ধ লোক অপরাধী—এই এলাকার সবগুলো লোককে থানায় এনে পুরতে পারলে বোধ হয় বিহারীলালের সব থেকে বেশি আনন্দ, কি বলো?

বিহারীলাল বলে না কিছু। হাসে একটু, বা চেষ্টা করে হাসতে। তারপর দিনগত রিপোর্ট লিখতে বসে যায়।

প্রৌঢ় সহকর্মী দু'জনও ঠাট্টার ছলে নিজেদের জ্বালা জুড়োন একটু। একে অন্যকে লক্ষ্য করে বলেন, গোঁড় হিন্দু জাত খোয়ালে কি হয়? পরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, ওই—! অর্থাৎ বিহারীলাল হয়। অর্থাৎ অমনি মায়া-দয়াশূন্য হয়।

আরো মন দিয়ে রিপোর্ট লেখে বিহারীলাল। আর, আড়ালে যা বলেন তাঁরা, স্বকর্ণে না শুনুক, কানে আসে। বলেন, এই করেই কয়লার কালি উঠবে ভেবেছে, নিজে কোন্ আস্তাকুঁড়ে ছিলি মনে নেই।

সব ক'টা শ্লেষের পিছনেই একটু ইতিহাস আছে।

বিহারীলাল বাঙালী নয়। কিন্তু এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলার বাইরে কখনো পা ফেলেছে বলেও মনে পড়ে না। কোথা থেকে কেমন করে একদিন শহরের সেই নারকীয় আশ্রয়ে ভেসে এসেছিল জানে না। কেমন করেই বা সেই নিদারুণ অভাব অনটন অনাচারের মধ্যে পাঁচ থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত নির্বিকারে একটানা কাটিয়ে

দিল, সেও এক বিস্ময়। আশ্রয়চ্যুত হয়েছিল যখন বি. এ. পড়ে। স্কুলে থাকতেই ছেলে পড়িয়ে পড়া চালাত। নিজের মাইনে লাগত না। যা পেত প্রতিষ্ঠান কর্তাদের হাতে তুলে দিত। নইলে তারা পড়তেই বা দেবে কেন, খেতেই'বা দেবে কেন ? কঠোর বিধিব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সেখানে পড়াশুনা শুরু করতে হত সকল শিশুকেই। কিন্তু সে অধ্যায় আবার শেষও হত দু'চার বছরের মধ্যেই। বিহারীলালের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছিল। কেন, নিজেও জানে না। চেষ্টা ? অধ্যবসায় ? কিছু না, কিচ্ছু না। যে কোনোদিন শেষ হতে পারত। হয়নি এই পর্যন্ত...।

সেই আশ্রয়ের স্মৃতি কিছু মনে নেই বিহারীলালের ? আছে বই কি। তার অনেক সতীর্থ আজ ওরই কর্ম-তৎপরতায় জেল খাটছে। প্রতিষ্ঠান-কর্তাদেরও দুই একজনকে টেনে এনেছে। অসহায় বিস্ময়ে তারা একদা তাদেরই আশ্রিত এই পাথর মূর্তিটি দেখেছে চেয়ে চেয়ে।

সুখস্মৃতি কিছু ? না। ওখানে সুখও ছিল না কিছু, দুঃখ না। সুখদুঃখ বোধের বালাই নিয়ে ও জায়গায় কারো টেকা সম্ভব নয়। তবু এরই মধ্যে এক বুড়ীকে ধোঁয়া ধোঁয়া মনে পড়ে বিহারীলালের। স্কুলের উঁচু ক্লাসেই পড়ত তখন। খুব অসুখ হয়েছিল। বেদম জ্বর। ওই বুড়ী আসত। জলবাতাস করত। ওর মাথাটা কোলে নিয়ে বসত। একদিন তার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেওছিল বিহারীলাল, মনে আছে। থাকবেই বা না কেন, কান্নাকাটি আবার কবে করেছে তারা ? সেই বুড়ীও তারই মত আশ্রিত। কিন্তু ভালো হয়ে আর খুব বেশিদিন দেখেনি তাকে।

বিহারীলালের আশ্রয়চ্যুতির কারণ এমন কিছু নয়। ইচ্ছেমত প্রতিষ্ঠানের হিসেবপত্র মিলানো চলছিল তাকে দিয়ে। সেই থেকেই অমিল। বিহারীলাল মুখে তেমন প্রতিবাদ কখনো করেনি। তবু, কেমন করে যেন বুঝেছিল কর্তাবাবুরা, নিজেদের নিরাপত্তার কারণে ওকে সরানো দরকার। বিহারীলাল নির্বিবাদেই চলে এসেছিল।

তারপর চাকরির অধ্যায়। সেও আজ দশ বছর হয়ে গেল...।

চুপচাপ বসে থাকে যখন, অনেকে ফিসফিস করে। বলে, এই রেট-এ এগোলে কবে পর্যন্ত কমিশনার হবে ভাবছে। কখনো বলে, তা নয়, নতুন কিছু জাল ফেলার মতলব আঁটছে। কিছুদিন আগে বড়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে একবার এই নিয়ে বেশ খানিকটা হাসি-ঠাট্টার খোরাক জুগিয়েছে বিহারীলাল। পথের ধারের একটা গাছতলায় দু'টি ভিখারীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নাকি। তাদের বয়েস ? বড়বাবুর মতে ষাটের কম নয়। স্ত্রীলোকটি মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল, আর পুরুষটি বিশ্রাম করছিল তার কোলে শুয়ে। স্ত্রীলোকটি পাকা চুল তুলছিল পুরুষটির মাথা থেকে আর দুজনেই হাসাহাসি করছিল। বড়বাবু বলেন, তাই দেখেই পা দু'টো একেবারে মাটির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল বিহারীলালের। ঘড়ি ধরে পুরো দশ মিনিট তিনি দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছেন, কিন্তু বিহারীলালের হুঁশ নেই। শেষে কাছে এসে বলেছেন, চোখের মধ্যে তো আর এক্সরের ব্যবস্থা বসানো নেই তোমার, শুধু ওটুকু দিতেই কার্পণ্য করেছেন ভগবান। কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে, ও দুটোকে নিয়ে হাজতে পুরে একেবারে নিশ্চিন্ত

হয়ে এসো, আমি না হয় দাঁড়াই ততক্ষণে।

এ হেন বিহারীলালকে দেখে সকলেই সেদিন আঁচ করলে, নতুন শিকারের সন্ধান পেয়েছে।

মিথ্যে নয়, পেয়েছে।

থানার থেকে বেশ খানিকটা দূরে হলেও থানা-এলাকার মধ্যেই পড়ে বস্তিটা। বস্তির মাতব্বর কানাই দাসের সঙ্গে কি যোগাযোগ ঘটেছিল বিহারীলালের তারাই জানে। দু'খানা রিক্‌শ'র মালিক কানাই দাস। লোক রেখে রিক্‌শ খাটায় সকাল দুপুরে বিকেল রাত্তির। ইচ্ছে করলে কানাই দাস পাকা বাড়িতে থাকতে পারে এখন। অন্তত তাই ধারণা বস্তিবাসীদের। কিন্তু এতকাল এখানেই কাটিয়েছে...এখানেই কাটাচ্ছে। বছর চল্লিশ বয়েস, দিব্বি হৃষ্টপুষ্ট। বস্তির সকলে ওকে মাতব্বর মানে এমন নয়। বহু ঘর, বহু বাসিন্দা, যে যার নিজের মতো থাকে। তবু এরই মধ্যে যতটা সম্ভব নিজেকে জাহির করে চলে কানাই দাস। মনে মনে সেটা খুব পছন্দ না করলেও সামনাসামনি কেউ লাগতে আসে না বড়। আপদে বিপদে দু'পাঁচ টাকা ধারধোর পাওয়া যায়, তাছাড়া লোকটার হাতে দু'চারটে ষণ্ডমার্কা চেলাচামুণ্ডা আছে বলে গুজব। অতএব বস্তিতে তার প্রতিপত্তি মন্দ নয়।

কানাই দাসের কেন এত রাগ বিনোদিনীর ওপর সঠিক কেউ জানে না। তবে মনে মনে আঁচ করে অনেকে। আড়াতে আবডালে রসালো আলোচনাও করে। কানাই দাসের মত মক্কেলকেও বিনোদিনী আমল দেয়নি যখন, তাহলে দিয়েছে যাকে সে লোকটা কত বেশি শাঁসালো না জানি। কিন্তু বস্তির ভালোমন্দে কানাই দাসের দায়িত্ব আছে একটা। তাই দুই একজন ঋণানুগৃহীতকে নিয়ে খোলাখুলি সে বিনোদিনীকে সমঝে দিতে এসেছিল একবার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিনোদিনী প্রথমে তাদের বক্তব্য বা অভিযোগ শুনেছিল। বেশ দেখাচ্ছিল তখন তাকে। যারা এসেছিল তারাও অস্বীকার করতে পারবে না তিরিশের ওধারে হলে কি, ঝিগিরি কি আর সাধে ছেড়েছে। নিজের দর বুঝেই ছেড়েছে। আগে বুঝলে আরো অনেক আগে ছাড়ত। যাই হোক, কানাই দাসের নীতিকথা শেষ হতে না হতে তার মুখ খুলল যখন সে এক ভিন্ন মূর্তি। স-সঙ্গী সমুখ থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল কানাই দাস।

অভিযোগ বিহারীলালের কানে সে-ই তুলেছিল। বস্তিবাসীরা গরীব হলেও নীতি মানে—কিন্তু চোখের ওপর এমন দুর্নীতি চললে ছেলেপুলে নিয়ে সকলে ঘর করে কি করে? বস্তির হাওয়া বিষিয়ে দিচ্ছে ওই—

একটা অশ্লীল শব্দ ঠোঁটে এনেও গিলে ফেলেছিল কানাই দাস।

বিহারীলাল সবিস্তারে শুনেছে। কানাই দাসের ভেতরটা দেখতে পায়নি, বা তার ক্ষোভের হেতু আঁচ করেনি, ভাবলে ভুল হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিহারীলালের মুখভাব নির্বিকার। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার রীতি আছে সকল শাস্ত্রে। খবরটা কে দিচ্ছে সে প্রশ্ন অবান্তর। আপাতত খবরটা পাকা হলেই হল।

কানাই দাসের উৎসাহ বাড়ে। পাকা বলে পাকা, একেবারে তালপাকা খবর। প্রায়

প্রত্যেক শনি-রবিবারেই আসে ওই লোকটা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে যায়, নইলে ওই মাগি—মানে—ইয়ে মেয়েলোকটার অমন পটের বিবিটির মতো বসে চলে কি করে বুঝছেনই তো স্যার!

বিহারীলাল ঘাড় নেড়ে জানায়, বুঝেছে। আর, সতর্ক করে দেয়, প্রতিকার কিছু চায় তো আপাতত মুখ একেবারে সেলাই করে থাকে যেন।

—তা আর বলতে স্যার, কাক পক্ষীও জানবে না, এ কি আর ঢাক পিটোবার জিনিস! কানাই দাস বিনয়াপ্লুত।

সেই শনিবারই সাদা পোশাকে তিনজন সঙ্গী নিয়ে বস্তিতে গিয়ে হানা দিল বিহারীলাল। একেবারে সরাসরি নয়। খানিক দূরে বিপরীত দিকের একটা দোকানের দাওয়ায় বসে বস্তির লোকদের আনাগোনা লক্ষ্য করল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। সঙ্গীরা কিছু দূরে মোড়ের আড়ালে ট্রাকে বসে। আজ আবার কোন বেচারীর অমোঘ দুর্ভাগ্যের লিখন পড়েছে কপালে, বিরস বদনে সেই আলোচনা করছিল তারা। দুটো পয়সা রোজগার করে চলে আসবে, এর সঙ্গে বেরুলে তো সেই আশায় ছাই।

বিহারীলাল একের পর এক সিগারেট খাচ্ছে আর দেখছে। কিন্তু দেখবেই বা কি আর বুঝবেই বা কি! মুখ তো চেনে না। নামটা শুনেছিল কানাই দাসের মুখে। কানাই দাস নাম জানল কি করে জানে না। প্রাণের গরজে জেনে থাকবে। কিন্তু বিহারীলাল আশা করছিল মুখ দেখলে চিনবে। মুখ দেখে চেনা অভ্যেস আছে তার।...ধোপদুরস্ত দু' পাঁচজন ঢুকছে বটে কিন্তু রাতের ঘোলাটে আলোয় ঠাওর করা যায়নি ঠিক।

ভিতরে ভিতরে একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে বিহারীলাল। শেষে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ঘড়ি দেখল। রাত ন'টা বেজে গেছে। শিকারে এসে তোলা হাতে ফিরে যাওয়া কোষ্ঠীতে লেখেনি। গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে সঙ্গীদের ডাকল ইশারায়। তারপর গট গট করে ঢুকে পড়ল বস্তির মধ্যে।

বস্তিবাসীরা সচকিত, বিমূঢ়। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল একটা বস্তিময়। খোঁজ করার আগেই কানাই দাস হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে দু'হাত জুড়ে ফিস ফিস করে আপ্যায়ন জানাল, গুড্ নাইট্ স্যার! আপনি এসে গেছেন, এক মিনিট স্যার...জাস্ট্ ওয়ান মিনিট!

চট করে আড়াল হয়ে গেল। ফিরে এলো তক্ষুনি। উত্তেজিত, উদ্ভাসিত। বলল, ঘরের দরজা বন্ধ স্যার! ভালো দিনে এসেছেন মনে হচ্ছে, নিশ্চয় শা—মানে—ওই শালিকবাবু এসে গেছে, একেবারে হাতে-নাতে ধরা যাবে, আসুন স্যার!

সে অগ্রসর হল। স-সঙ্গী বিহারীলাল অনুসরণ করল। আবছা অন্ধকার, উঠোনে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ ভীতত্রস্ত।

উঠোন পেরিয়ে দেড় হাত চওড়া একটুখানি গলি হাতড়ে ঘরের প্রবেশপথ। কানাই দাস বিহারীলালের একখানা হাত ধরে অন্য দিকে আকর্ষণ করল। চাপা গলায় বলল, ওরা ওদিক দিয়ে দরজা ধাক্কাবে'খন, আপনি এদিকে আসুন স্যার।

ইশারায় সঙ্গীদের নির্দেশ দিয়ে বিহারীলাল কানাই দাসের সঙ্গে ঘরের অন্যদিকের দেওয়ালের অন্ধকারে মিশে গেল। মাটির দেওয়ালের কোণের দিকে বাঁশের বাতা সরানো

রন্ধ্র একটা। চালা থেকে খড় ঝুলে পড়ায় বাইরে থেকে এমন কি ভিতর থেকেও হয়ত চোখে পড়ে না সেটা। ওটা আপনি হয়নি বোঝা যায়।

কানাই দাসই রন্ধ্রপথে চোখ লাগাল প্রথম। তারপরেই হতাশ বিস্ময়। অস্ফুট কটূক্তি সামলে উঠতে পারল না এবারে।—এঃ, শালা আজ আসেনি দেখছি।

ওকে ঠেলে সরিয়ে বিহারীলাল ততক্ষণে রন্ধ্রপথে চোখ দিয়েছে।

কাঁধ উঁচু একটা থালায় ডাল দিয়ে এক কাঁড়ি ভাত মেখে তরকারি সহযোগে বিনোদিনী নিজের হাতে দুটি ছেলেকে খাইয়ে দিচ্ছে। একজনের বয়েস বছর দশ, আর একজনের বারো-তেরো। ছেলে দু'টি খুশির মেজাজে খাচ্ছে, আর বিনোদিনী খুশি মেজাজে খাইয়ে দিচ্ছে।

দেখছে বিহারীলাল।--পরনে ময়লা শাড়ি, একটু মোটার দিক ঘেঁষা আঁটসাঁট গড়ন, মুখশ্রী মন্দ নয় বটে। গরাস গরাস ভাত চালান দিচ্ছে একবার এর মুখে আর একবার ওর মুখে। আর প্রসন্ন বদনে অনর্গল বলে চলেছে কি। ঠিক কানে আসছে না। বিহারীলালের. চেষ্টাও করছে না।

তার এই দেখার একাগ্রতা দেখে অন্ধকারে মুখ টিপে হাসছে কানাই দাস।

ওদিকের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল খট্‌খট্‌ করে।

রন্ধ্রপথে চোখ রেখে বিহারীলাল ভুরু কোঁচকাল। ছেলেদের খাওয়ায় আর বিনোদিনীর খাওয়ানোয় ছেদ পড়ে গেল। ছেলে দুটি ভালের গরাস মুখে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দরজার দিকে। বিনোদিনীও।...ঈষৎ বিস্ময়, ভ্রূদ্বয়ে কুঞ্চন রেখা।—কে ?

জবাবে আবার খটাখট্‌ কড়া নাড়ার শব্দ।

একটা ত্রস্তভাব ঘরের মধ্যে। বড় বড় ক'টা ভাতের গরাস বিনোদিনী প্রায় জোর করেই গুঁজে দিল ছেলে দুটোর মুখে। থমকে গেল এর পরেই। থালায় অনেকটা অবশিষ্ট এখনো।

ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌ ঠক্‌ !

খুলছি—।

বিহারীলাল দেখছে, মিষ্টি গলায় জবাব পাঠিয়ে খপ্‌ করে ভাতের কাঁসারিটা তুলে বড় ছেলেটার হাতে দিল বিনোদিনী। পাশের ঘটি থেকে উচ্ছিষ্ট জায়গায় একটু জল ছিটিয়ে হাতে করে মুছে নিল জায়গাটা। পরে ঘটিটা ছোট ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি পিছনের দিকের দরজার শিকল খুলে দিল। কাঁসারি হাতে এবং ঘটি হাতে যেন তস্করের তৎপরতায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ছেলে দুটো। বিনোদিনী দরজা বন্ধ করল আবার।

এবারে আরো জোরে নড়ে উঠল দরজার কড়া।

খুলছি, খুলছি !

কণ্ঠস্বরে সস্নেহ অনুযোগ ঝরল যেন, যার অর্থ, থামো না বাপু, দু'মিনিট আর সবুর সয় না ?

ঊর্ধ্বাঙ্গে বসন ছিল না, তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা টেনে পরে নিল। ক্ষিপ্র হাতে বদলে নিল ময়লা শাড়িটাও। দেওয়ালের আয়নায় তাক থেকে চট করে স্নো-

পাউডার ঘষে নিল একটু। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে দিল দুই একবার। এক মুহূর্ত থেমে আয়নায় প্রসাধনটুকু পরীক্ষা করে নিয়ে, ঠোঁটে হাসির আভাস এনে এগিয়ে গেল দরজা খুলতে।

রন্ধ্র থেকে চোখ তুলে নিল বিহারীলাল। কানাই দাস সরে দাঁড়াল। বিহারীলাল এগিয়ে এলো।

উঠোনে একগাদা মেয়ে পুরুষের রুদ্ধ ও সশঙ্ক প্রতীক্ষা।

দরজা খুলেই একেবারে হকচকিয়ে গেল বিনোদিনী। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইল শুধু। মুখে রক্ত নেই যেন। সঙ্গীদের ঠেলে বিহারীলাল এগিয়ে এলো মুখোমুখি। দেখল নিরীক্ষণ করে। নির্বিকার, নিরাসক্ত।

তোমার নাম বিনোদিনী?

বোবা মুখে ঘাড় নাড়ল।

একজনের নাম করে আবার একটা পুরুষ প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হল, ওই নামের কেউ আসে এখানে?

জবাব নেই।

আসে— ?

কণ্ঠস্বর যেন গুরু গুরু মেঘের ডাক।

ঘার নাড়ল, আসে।

কতকাল চলছে এই ব্যবসা?

জবাব নেই।

ওই ছেলে দুটো কে?

না বুঝে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল বিনোদিনী।

ঘরে ভাত খাচ্ছিল ছেলে দুটি কে?

অস্ফুট জবাব দিল, একজন ছেলে।

অন্য জন?

ভাগ্নে।

দু'চার মুহূর্ত। চেয়ে আছে বিহারীলাল। খর বিশ্লেষণী দুই চোখ।—একবার আসতে হবে সঙ্গে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরতে পারবে।

শিকার-সহ উঠোনে এসে দাঁড়াতেই উঠোন ফাঁকা হয়ে গেল প্রায়। মেয়ে পুরুষেরা জড়সড় হয়ে মাটির ঘরের দেয়ালে দেয়ালে মিশে গেল। বিনোদিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এলো তারা। বিহারীলাল থমকে দাঁড়াল একটু। ইঙ্গিতে ওকে ট্রাকে তুলতে বলে ভেতরে ঢুকল আবার।

বস্তির সমস্ত মেয়ে পুরুষ ততক্ষণে আবার উঠোনে ভেঙে পড়েছে। কল-কোলাহল উঠেছে একটা। বিহারীলালকে দেখেই হকচকিয়ে থেমে গেল। বিগলিত-বদন কানাই দাস সামনে এগিয়ে এলো হন্তদন্ত হয়ে। খুশিতে উপছে উঠেছে।—খুঁজছেন স্যার?

বিহারীলাল ঘাড় নাড়ল। পরে আচমকা প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল গালে। তিন

হাত ছিটকে গিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল কানাই দাস। গটগট করে বিহারীলাল বেরিয়ে গেল আবার।

ট্রাক চলেছে থানার দিকে। ভয়ার্ত নারীমূর্তি ট্রাকের এক কোণে মিশে আছে।

চাপা আনন্দে বিহ্বল হয়ে সিগারেট টানছে বিহারীলাল। চোখমুখ ঝক্‌ঝক্‌ করছে। একটা অন্তর্মুখী আনন্দে বিভোর যেন।

দেখে সঙ্গীরা গা টেপাটেপি করছে নিঃশব্দে। অর্থাৎ কি এমন শিকার ধরেছে রে বাবা ! নিয়ে গিয়েই তো খালাস দিতে বাধ্য—অথচ মুখখানা করেছে যেন থানায় যেতে না যেতে রাজভোগের মতো মস্ত একটা প্রমোশন মুখের সামনে এগিয়ে আসবে। বড়বাবু বলেন মিথ্যে নয়, দেশসুদ্ধ লোককে গারদে এনে পুরতে পারলেই খুশিতে ডগমগ, আর কিছু চায় না।

তন্ময় আনন্দে নতুন সিগারেট ধরাল বিহারীলাল। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে বিবর্ণ পাংশু নারী মূর্তির দিকে। খুশিতে জ্বলজ্বল করছে গোটা মুখ।...ওই ছেলে দুটোকে ভাত খাওয়ানোর দৃশ্যটা চোখে ভাসছে আর অন্তর্তুষ্টিতে বিভোর হয়ে উঠেছে।...যেমন বিভোর হয় বাল্যের রোগ-শয্যায় সেই বুড়ীর কথা মনে হলে, যেমন হয়েছিল গাছতলার সেই বুড়োবুড়ীকে দেখে।

মনের আনন্দে ভাবছে বিহারীলাল, শুধু এদেশেই সম্ভবত একদিন আর জেলখানা থাকবে না একটাও।

মদনভস্ম

শনিবার। একটা না বাজতেই কর্মচারীরা রাগে গজগজ করতে লাগল। সপ্তাহে পাঁচটা দিন তো আজকাল ন'টা-ছ'টা হচ্ছেই, শনিবারেও তিনটে পর্যন্ত আটকে রাখা হবে কেন। 'ইয়ার-এন্‌ডিং' তো তাদের কী ? পয়সার বেলায় ফাউ নেই কানাকড়িও, খাটুনির বেলায় যত আব্দার। জি. এম. নিজে তো ওদিকে দিব্বি একটার সময় রেস-এ কেটে পড়বে'খন, ইত্যাদি—।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়েই সুপারিনটেনডেন্ট বাদল সোম ফাইলে মন দিল আবার। হাত থাকলে একটার আগেই ছেড়ে দিত সকলকে। কাজ হোক চাই না হোক। কারণ, জি. এম. অর্থাৎ জেনারেল ম্যানেজারের ওপর নিজেই সে বীতশ্রদ্ধ সব থেকে বেশি। পর পর তিন বছর তার সকল আশায় ছাই দিয়েছে ওই জেনারেল ম্যানেজার। সকাল-সন্ধ্যা কলের মতো খেটেও একই চেয়ারে আটকে আছে সে। অথচ, একবার এই গণ্ডিটা পেরতে পারলে অফুরন্ত সম্ভাবনা। প্রতিষ্ঠার সিঁড়িগুলো পর পর ছকে বাঁধা। সেলস অফিসার...অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার...সেলস্‌ ম্যানেজার...সেক্রেটারী...কমার্শিয়াল ম্যানেজার...ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার...। দেশময় ছড়ানো কোম্পানীর শাখা-প্রশাখা। জেনারেল ম্যানেজারের একটুখানি কলমের খোঁচায় কিনা হতে পারত। কিন্তু

হল না। অনেক দিন রাঙা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছে বাদল সোম।

জেনারেল ম্যানেজার রামস্বরূপ ভাণ্ডারকার।

খামখেয়ালী মানুষ। চট্‌পটে, ছট্‌ফটে, হাসিখুশিতে ভরপুর। চলনে-বলনে আলগা মর্যাদার মুখোশ নেই। সময় বিশেষে বেয়ারা চাপরাশীর সঙ্গেও রসিকতা করে বসেন। কেরানিদের বিয়েতেও এক রকম যেচে নেমন্তন্ন নেন, দামী উপহার দেন নতুন বউকে। নিজেও কেরানি থেকেই আজ এই সুবর্ণ শিখরে উঠে বসেছেন। যোগ্যতা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু তার থেকেও অনেক, অনেক বেশি ছিল বিগত ম্যানেজিং-ডাইরেক্টারের বেপরোয়া পৃষ্ঠপোষকতা। গত পনের বছর ধরে ওই মানুষটি চোখ-কান বুজে তাঁকে ঠেলে তুলে নিয়ে গেলেন যেন। এমন অস্বাভাবিক ভাগ্য-বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু সমস্ত কোম্পানীর মালিকানা পেলেও ভাণ্ডারকার বিচলিত হবার মানুষ নন বোধ করি।

এঁরই খাস তত্ত্বাবধানে চাকরি করছে বাদল সোম। উচ্চাভিলাষ দুরাকাঙ্ক্ষা নয়। কাজেও তার ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। কিন্তু বাসনার তীরে বসে ক'টা বছর ভাগ্যের জোয়ার-জলের কলধ্বনি শুনল শুধু। একের পর এক বাইরের লোক এসে তার আকঙ্ক্ষার আসনগুলো জুড়ে বসেছে। বাদল সোম আশা ছেড়েছে। নিস্পৃহ একাগ্রতায় এখন নিজের কাজটুকু সম্পন্ন করে যায়।

বড় সাহেবের তলব নিয়ে এলো বেয়ারা। বাদল সোম ঘড়ি দেখল। একটা বাজে। এখন আর জি. এম-এর মাথায় ফাইল-পত্র ঢুকবে না কিছু জানা কথা। তাহলে আবার ডাকাডাকি কেন! উঠল। চোখে-মুখে হাল্‌কা তৎপরতার পালিশ লাগল একপ্রস্থ। অনেক দিনে অভ্যাস।

কিন্তু খানিক বাদে শ্লথগতিতে নিজের জায়গায় ফিরে এলো যখন, মুখভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ভ্রূ-মধ্যে কুঞ্চন রেখা।...চিন্তাচ্ছন্ন। বসে বসে ভাবল কিছুক্ষণ। আবার উঠল। ঘুরে ঘুরে সকলকে নির্দেশ দিল—কাজ শেষ হলে ফাইল তার টেবিলে রেখে যেতে।

রেস্ ফেরত জেনারেল ম্যানেজার ভাণ্ডারকার বাদল সোমের বাড়ি আসছেন আপিসের ফাইল 'ডিসপোজ' করতে।

খুশি হবার কথা। কিন্তু অস্বস্তি বাড়তে লাগল। বড় সাহেবের খেয়াল জানে। কিন্তু তার থেকেও বেশি কিছু জানে বলেই ভাবনা।...পাঁচ বছর হল জেনারেল ম্যানেজার হয়ে এসেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে যোগযোগ নেই, তিনি প্রোষিতভর্তৃকা। কিন্তু নারীবিরহিত জীবন নয় ভাণ্ডারকারের। তাঁর দিব্যাঙ্গনা সহচরীদের দুই-একজনকে মাঝে মাঝে আপিসেও দেখা যায়। এ ছাড়াও নানা গুজব কানে আসে।

বাদল সোমের ভাবনার কারণ, তার সহধর্মিণীটির পাশে অনেক সুদর্শনাকেই নিষ্প্রভ দেখায়। বাড়িতে এ-হেন অতিথির আবির্ভাব সুবাঞ্ছিত নয়।

পরিচিত কড়ানাড়ার শব্দটা কানে আসতে অরুণা তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে এসে দরজা খুলে দিল। সহাস্যে কি বলতে গিয়ে কর্তাটির পিছনে তক্‌মাপরা চাপরাশীকে

দেখে থেমে গেল। কাঁধ থেকে ফাইলের বোঝা টেবিলে নামিয়ে চাপরাশী বিদায় নেবার পর অরুণা জিজ্ঞাসা করল, গোটা আপিসটাকে তুলে আনলে নাকি ?

চেয়ারে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে বাদল সোম সংক্ষিপ্ত সমাচার জ্ঞাপন করল, বড় সাহেব এখানে আসছে এগুলো সই করতে।

শুনে অরুণাও হকচকিয়ে গেল।—বড় সাহেব মানে তোমাদের জেনারেল ম্যানেজার ?

হুঁ। একটু চা'টার ব্যবস্থা রাখতে হবে। খুব তাড়া নেই, রেস্ ফেরত আসবে। যত ঝামেলা—

অরুণা তবু ব্যস্ত হয়ে উঠল। চাকরটা পর্যন্ত এখনো আসেনি। ঘরটাও আর একটু গুছিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু সবার আগে সামনের বিরস মূর্তিটির দিকেই চোখ গেল আবার। কর্মক্ষেত্রে তার এতকালের পুঞ্জীভূত হতাশার আঁচ অরুণাও পায়। বলল, মুখখানা অমন হাঁড়িপানা করে বসলে কেন ? বাড়ি বয়ে আসছে যখন, দেখো বরাত ফিরতেও পারে।

হ্যাঁ, ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি।...সেজন্য নয়, লোকটাও এই—খুব সুবিধের নয়—।

অরুণা এবার সমনোযোগে লক্ষ্য করল তাকে। আভাসে যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু আর সাড়া না পেয়ে নিজেই বলল, কাজের চাপে আপিসে রোজ সন্ধ্যে পর্যন্ত আটকায়, একদিন না হয় বাড়ি এসে আটকাবে। এতে আর সুবিধে অসুবিধের কি আছে ?

বাদল সোম বিরসবদনে জবাব দিল, একদিন তুমি জানছ কি করে ? আজকেই তো আর বছর শেষ নয়, কাজের চাপ এখন তিন মাস ধরে চলবে। এর পর প্রত্যেক শনিবারেই হয়ত এসে হাজির হবেন মূর্তিমান।

বিরাগের হেতুটি এতক্ষণে স্পষ্ট হল অরুণার কাছে। আগেই বোঝা উচিত ছিল। মানুষটির এ দুর্বলতা অজ্ঞাত নয়। এ নিয়ে কখনো রাগ করেছে, কখনো বা তাকে রাগাবার জন্য তারই বন্ধু-বান্ধবের প্রতি প্রকাশ্য অন্তরঙ্গতায় মুখর হয়ে উঠেছে। হাসি চেপে বেশ নিরীহ মুখে প্রশ্ন করল, তা এলেই বা...চা চিনি বেশি খরচ হবে বলে ভাবচ ?

ঠাট্টার এ সুরটা বাদল সোম চেনে। মেজাজ চড়ল।—শুধু চা চিনি কেন, ঘরের বউসুদ্ধ খরচ হয়ে যেতে পারে। লোকটাকে তো চেনো না—।

তোমার বউ ? আরো বেশি বোকা সাজতে গিয়ে অরুণা সোম জোরেই হেসে ফেলল। হাসি আর থামে না। পরে একটু সামলে নিয়ে বলল, লোকটা যখন এমন, তোমার বুদ্ধি থাকলে অনেক আগেই আমাকে একটু ছেড়ে দিতে—। হাসতে হাসতে ঘর ছেড়ে পালাল সে।

যথাসময়ে দোর-গোড়ায় মোটর-হর্ন শোনা গেল। গৃহস্বামী পড়ি মরি করে ছুটে এলো। ভাণ্ডারকার ঘরে এসে বসলেন। তেমনি ব্যস্ত-সমস্ত। ফাইলের স্তূপ দেখে অস্ফুট কটূক্তি করলেন একটা। হাত ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, দু'ঘণ্টায় সব পার করে দেব, বসে যাও—।

বাদল সোম আবেদন জানালো, তার আগে একটু চা—

ভাণ্ডারকার মাথা ঝাঁকালেন।—কিচ্ছু না। রেসে গলা পর্যন্ত হেরে রেস্তঁরায় গলা পর্যন্ত ঠেসে এসেছি। কিছু গলবে না। দেরি কোরো না, হারি আপ্— ! পকেট থেকে কলম বার করলেন তিনি।

বাদল সোম একদিকে যেমন একটু নিশ্চিন্ত হল, অন্য দিকে এক পেয়ালা চা-ও খাওয়ানো গেল না দেখে কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগল। কিন্তু লোকটার কথা বলার ধরনই এমন যার ওপর আর কোন কথা চলে না। মুখোমুখি বসে তাড়াতাড়ি ফাইলের স্তূপ টেনে নিল সে।

ভিতরের আড়াল থেকে অরুণা বড় সাহেবকে দেখার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। মুখের টকাটক্ বাংলা শুনেও বেশ অবাক হল। কিন্তু হাসি পেয়ে গেল স্বামীটির এই বিনয়-বিনম্র মুখচ্ছবি দেখে। এ যেন আলাদা মানুষ।

ফাইলের পর ফাইল ওলটানো হচ্ছে এঘরে। ভাণ্ডারকার শিস দিচ্ছেন, মন্তব্য লিখছেন, মাঝে মাঝে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করছেন, সব শেষে সই করে ফাইল ঠেলে দিচ্ছেন আর একদিকে। বাদল সোমও তন্ময়।

হঠাৎ দোর-গোড়ায় শিশুর খিল্‌খিল্ হাসির শব্দে ভাণ্ডারকারের কলম থেমে গেল। বাইরে থেকে দু'খানি শুভ্র নিটোল বাহু তাকে আটকাতে চেষ্টা করেও পারল না। টলতে টলতে এবং পড়তে পড়তে ক্ষুদ্রকায় শিশু ঘরে প্রবেশ করল। খালি গা, মুখে বুকে দুধের দাগ। দুধ খেতে খেতে এক ফাঁকে মায়ের হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে আসছে। একটু নিরাপদ ব্যবধানে এসে পরম কৌতুকে ঘাড় কাত করে সে অনুসরণকারিণীর দূরত্বটুকু বুঝে নিতে চেষ্টা করল।

এদিকে ছেলের বাবা ছেলেকে একটা তাড়া দেবে কিনা ঠিক বুঝে উঠছে না। কারণ ভাণ্ডারকার সাগ্রহে দৃশ্যটি দেখছেন চেয়ে চেয়ে। টক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ছেলেটিকে যেন লুফে নিয়ে এলেন তিনি। টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের ওপরেই তাকে বসিয়ে দিলেন। হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হবার জন্য শিশুটি প্রস্তুত ছিল না। ঘাড় ফিরিয়ে বাবাকে হাসতে দেখে তবু কিছুটা আশ্বস্ত হল।

ভাণ্ডারকার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন যেন, তোমার ছেলে ?

ছেলের বাবা ঘাড় নাড়ল, তারই বটে।

এবারে বসে বসেই দু'হাতে তিনি শিশুটিকে একেবারে মাথার ওপর তুলে ফেললেন। ছোটখাট ঝাঁকুনি দিলেন গোটা দুই। কোলের ওপর নামালেন। রুমাল বার করে মুখ এবং বুকের দুধের দাগ মুছে দিতে দিতে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলেন একটা।

· ডাগর দু'টি চোখ মেলে ছেলে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল তাঁকে। তাৎপর্য, খারাপ লাগছে না, কিন্তু জীবটি তুমি কে হে বাপু ?

আর একদফা আদরের চোটে ব্যতিব্যস্ত হয়েও এবারে সে কলোচ্ছ্বাসে হেসে উঠল। ভাণ্ডারকার চেয়ারের হাতলের ওপর বসালেন তাকে। দেখলেন আবার। সোমের দিকে তাকালেন। ঈষৎ বিস্ময়ে বলে বসলেন, তোমার তো দেখছি আমার মতোই হতভাগা

মার্কা চেহারা, কিন্তু—। হেসে ফেললেন, আচ্ছা, তোমার বউ দেখব, ডাকো তাঁকে—।

—চার আঙুল জিভ কেটে দরজার আড়াল থেকে অরুণা সরে পড়ল।

বিব্রত হাস্যে ঘাড় নেড়ে বাদল সোম তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে খবর দিল।—ব্যাটা ঠিক ডেকেছে, জানতুম ডাকবে, একবার এসো।

অরুণার রাগও হচ্ছে, হাসিও পাচ্ছে।—যাব না যাও, ওই দস্যি ছেলের জন্যেই তো।

কিন্তু না এসে উপায় নেই। ছেলে কোলেই শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলেন ভাণ্ডারকার—গুড ইভনিং ম্যাডাম, গুড ইভনিং। বোসো, বোসো—। ডেকে বিরক্ত করলাম না তো?

স্মিত হাস্যে অরুণা জবাব দিল, না বিরক্ত হব কেন—

ভাণ্ডারকারের দুই চোখ তার মুখের ওপর সংবদ্ধ থাকে কিছুক্ষণ। পরে সোৎসাহে হাসতে লাগলেন তিনি।—দেখলে সোম, আমার ইমাজিনেশান। তোমার এমন ছেলে-বউ অথচ আমি জানতুম না তো।

বাদল সোম মনে মনে কটূক্তি করল একটা। মুখে হাসল। ওদিকে শিশুটির ভারি ইচ্ছে, টেবিলের ওপর থেকে সাহেবের ঝকঝকে কলমটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেখে। সেদিকে হাত বাড়াতে অরুণা কলম তুলে নিয়ে মালিকের হাতে দিল। পরে সহজ হাস্যে জিজ্ঞাসা করল, একটু চা আনি?

চা—। চা ভালো জিনিস, আনো—কিন্তু শুধু চা।

অরুণা উঠে গেল। ভাণ্ডাকারের চোখ দু'টো অনুধাবন করল তাকে। বাদল সোম দেখল।

বুড়ো চাকর চায়ের ট্রে পৌঁছে দিতে ছেলেটি এবার তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজ তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়নি সেটা এতক্ষণে খেয়াল হল বোধ হয়। অরুণা চা ঢেলে দিল। ভাণ্ডারকার একাই আসর জমিয়ে রাখলেন অনেকক্ষণ। এত বড় অফিসারের লঘু চপলতায় অরুণা বেশ জোরেই হেসে উঠছে এক একবার। কথা বিশেষে হালকা মন্তব্যও করল দু'চারটে। ভাণ্ডারকার খুশিতে আটখানা। তৃতীয় ব্যক্তিটির নীরবতা লক্ষ্য করেই বোধ হয় আত্মস্থ হলেন একটু।—কি হে সোম, তুমি যে একেবারে ঠান্ডা মেরে গেলে। আচ্ছা ম্যাডাম, আর তোমাকে আটকে রাখব না। কাজে বেশি ফাঁকি দিলে সোম আবার রেগে যায়।

সোমের বিব্রত ভাবটুকু নয়নাভিরাম। অরুণা হাঁফ ফেলে বাঁচল। অতিথিকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রস্থান করল সে। ভাণ্ডারকারের দু'চোখ দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল আবারও। এবং এবারেও সেটুকু বাদল সোমের দৃষ্টি এড়াল না।

ফাইল পার হল, একটা, দু'টো।—ভাণ্ডারকার উসখুস করতে লাগলেন কেমন। অনামনস্কে ভিতরের দরজার দিকে তাকালেন একবার। সামনের মানুষটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন হঠাৎ।—আজ আর ভালো লাগছে না, সোমবার আপিসে দেখা যাবে। গুড নাইট। সোজা গাড়িতে এসে উঠলেন তিনি।

বাদল সোমের অনুমান মিথ্যে নয়। পরের শনিবারে ভাণ্ডারকার আবার এলেন আপিসের ফাইল 'ডিস্‌পোজ' করতে। তার পরের শনিবারেও। আর এও বোঝা গেল, বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্তত প্রতি শনিবারেই রেস্‌-ফেরত এখানে আসবেন তিনি। ভাণ্ডারকার ছেলের জন্যে আনেন দামী খেলনা, টফির বাক্স, বিস্কুটের টিন। তাকে কাঁধে চড়িয়ে ছেলে মানুষের মতই হৈ-চৈ করেন। বন্য উৎসাহে মেতে ওঠে দুরন্ত ছেলে, ভাণ্ডাকাররের উল্লাস তাকে ছাপিয়ে যায়।

খানিক বাদে অরুণা আসে। আসতে হয় বলে আসে। ভাণ্ডারকারের প্রাণ-প্রাচুর্য উপচে ওঠে যেন। বাদল সোমের মনে হয়, হাস্য-কৌতুকের আড়ালে অনাবৃত দু'টো চোখ নারীদেহের সর্বাঙ্গ লেহন করছে থেকে থেকে। অরুণা চলে গেলে খোলা ফাইলের দিকে চোয়ই অন্যমনস্কের মতো মৃদু মৃদু হাসেন রামস্বরূপ ভাণ্ডারকার। সই করেন।....... দেখেও, না দেখেও।

যা বোঝবার বাদল সোম বুঝে নিল। সহসা আবিষ্কার করল তারও ভিতরে ভিতরে একটা বোঝা-পড়া চলেছে কিসের।

অবচেতন মনের অস্পষ্ট ইশারা।

কান পেতে শোনে।

হিংস্র রোষে নির্মূল করে ফেলতে চায় সেটা।

কিন্তু আবার শোনে।

আবারও।

অস্বস্তি বাড়ে। অশান্তিও...রাতের নিভৃতে কল্প-নিবাসীদের আনাগোনার বিরাম নেই।

কিন্তু কে ওরা?

কান গরম, মাথা গরম হয়ে উঠেছে। সাহস করে শেষ পর্যন্ত অন্তস্তলে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেয়। অস্পষ্টতার পর্দাটা মুহূর্তে অপসৃত হয়ে যায় যেন। বিস্ফারিত হয়ে দেখে, তারা আর কেউ নয়, তারা ছোট-বড় নানা সম্ভাবনার উজ্জ্বলাসনে সমাসীন বাদল সোম।

...সেলস্‌ অফিসার।

...অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।

...সেলস্‌ ম্যানেজার!

...সেক্রেটারী!

...কমার্শিয়াল ম্যানেজার।

...ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার!

দ্বন্দ্ব ঘোচে। হালকা নিশ্বাস পড়ে। ক্ষতি কী! একটুখানি অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য বই তো কিছু নয়। আর বিনিময়ে?..... রোমাঞ্চ জাগে। না, আর তার স্থৈর্য বিড়ম্বিত হবে না। পাশে ছেলে বুকে আগলে অরুণা ঘুমুচ্ছে। ভারি ইচ্ছে হল তাকে আদর করে একটু। কিন্তু থাক, জেগে যাবে। বাদল সোমও ঘুমলো। নিশ্চিন্ত ঘুম।

অরুণা দেখল, একটা খুশির ছোঁয়ায় মানুষটা যেন বদলাচ্ছে দিনকে দিন। কিন্তু

ঠিক বুঝে ওঠে না। গল্প শোনে। বড় সাহেবের খামখেয়ালীর গল্প। ছেলেটার ওপর নাকি ভারি মায়া পড়ে গেছে, আপিসে রোজ একবার করে অন্তত জিজ্ঞাসা করেন তার কথা। ...আর অরুণারও প্রশংসা করেন খুব।

অরুণা ভুরু কুঁচকে টিপ্পনী কাটে, প্রশংসা ধুয়ে জল খাব, প্রোমোশান্ দেবে— ?

তা, প্রোমোশান এবারে একটা দেবে।

অরুণা অবাক। কর্মোন্নতির প্রসঙ্গে এমন উচ্ছ্বাসহীন নিশ্চিত জবাব আগে কখনো শোনেনি।

শনিবার আসে। অতিথি সংবর্ধনার খরচ বাড়ে। যথাসময়ে বাড়ির দরজায় পরিচিত মোটর-হর্ন শোনা যায়। কিন্তু বাদল সোম কি একটা হিসেব নিয়ে বসেছে। শশব্যস্তে অরুণাকে তাড়া দেয়, ডেকে এনে বসাও, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

অরুণা বিব্রত মুখে ফিরে তাকায় তার দিকে। কিন্তু ওদিকে আবার হর্ন বাজছে। মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি অতিথি অভ্যর্থনায় বেরিয়ে আসতে হয় তাকে। বাদল সোম নিবিষ্ট মনে হিসেব দেখছে।....হিসেবে অনেক ভুল করেছে এতকাল।

পরের তিন মাসের মধ্যে কতগুলো সুযোগ দেখা দিল। কোনোটা স্ব-নিয়ন্ত্রিত, কোনোটা বিধি-প্রদত্ত।

....কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে বাদল সোম সস্ত্রীক এসেছে এবার। সামান্য সুপারিন্টেনডেন্ট-পত্নীর প্রতি বড় সাহেবের প্রীতি-উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে ছোট-বড় অফিসারদের অনেকেরই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। নিজের নিজের গৃহিণীদের দিকে চেয়ে ভাবলেন হয়ত, সময়কালে আর একটু দেখেশুনে বিয়েটা করলে হত।

পরের যোগাযোগটা অন্য রকমের। আপিসে বড় সাহেবের চাপরাশীকে কাছে পেয়ে একটা কাজের ভার দিতে গিয়ে বাদল সোম শুনল, তার সময় নেই, আপাতত সে যাচ্ছে তার সাহেবের জন্য সিনেমার টিকিট কাটতে। চলে যাচ্ছিল, কি ভেবে বাদল সোম তাকে ফেরাল আবার। নিস্পৃহ প্রশ্নে জেনে নিল, কোন্ সিনেমা, ক'টার শো, ক'টা টিকিট কাটছে—। ঘন্টাখানেক বাদে নিজের চাপরাশীকে পাঠিয়ে দিল নির্দেশ মতো দু'টো টিকিট কেটে আনতে। পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি হেঁকে বাড়ি ফিরল। অরুণাকে বলল, চলো, একটা সিনেমা দেখে আসি।

সিনেমা। অরুণা অবাক।

হ্যাঁ, শীগগির তৈরি হয়ে নাও, সময় নেই.......ভালো বই শুনছি।

ছেলের জন্যে ভাবনা নেই, সে পুরানো চাকরের কাছেই বেশ থাকে।

ইন্টারভ্যালের সময় বাদল সোম হলের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। অরুণা জিজ্ঞাসা করল, কাউকে খুঁজছ ?

জবাব পেল না। শোনেইনি। আলো নিভল। শো আরম্ভ হল। যৌবন-প্রাচুর্যভরা বিলিতি নাচগানের হালকা ছবি। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠল অরুণা। বিরক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে দেখে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছে মানুষটা। অন্তত, ছবি যে দেখছে না এটা বেশ বোঝা যায়। কিছুদিনের মধ্যে অনেক পরিবর্তনই লক্ষ্য করেছে অরুণা।

ছবির পর্দায় চোখ রেখে ভাবতে লাগল।

শো ভাঙতে ভিড়ের মধ্যে তারাও আস্তে আস্তে বাইরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অরুণার আবারও মনে হল, নীরব আগ্রহে স্বামীটি কাকে যেন খুঁজছে।

নিষ্ক্রমণ-পথে ভাণ্ডারকারই তাদের আবিষ্কার করলেন দোতলার মাঝ-সিঁড়ি থেকে। হাঁক দিলেন, হ্যালো সোম ! একে ঠেলে ওকে ফেলে হুড়মুড় করে নেমে এলেন তাদের কাছে।—ম্যাডাম, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছ, এই জন্যেই সোমের আপিসের কাজ এগোয় না ! হাসির শব্দে আশেপাশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

অকস্মাৎ একটা নির্মম উপলব্ধি ক্ষণকালের জন্য যেন আড়ষ্ট করে ফেলল অরুণাকে। আড়চোখে দেখে, একজনের প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে। সামলে নিল। হাসলও। হাসি পাচ্ছে।

বড় সাহেবের সঙ্গী এবং সঙ্গিনীরা এসে যোগ দিলেন। তিন জোড়া ঝক্‌ঝকে নারী-পুরুষ। অরুণার সঙ্গে সাড়ম্বর পরিচয় ঘটল তাঁদেরও। ভাণ্ডারকারের প্রস্তাব মতো আবার সকলকে প্রবেশ করতে হল সিনেমা-সংলগ্ন বার-রেস্তোরাঁয়। সম্মিলিত হাস্য-গুঞ্জনের মধ্যেও বাদল সোমের দৃষ্টি নিবদ্ধ অপর তিনটি মহিলার প্রতি। ....বিগত-শ্রী নয়, বিগত-যৌবনা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওজনে তার দিকটাই অনেক ভারী।

রাস্তার উল্টো দিকে সারি সারি মোটর দাঁড়িয়ে। সঙ্গী এবং সঙ্গিনীরা বিদায় নিলেন। নিজের গাড়ির দরজা খুলে দিলেন ভাণ্ডারকার, এসো ম্যাডাম, তোমাদের পৌঁছে দিই।

মোটর ছুটেছে। এ পাশে বাদল সোম, মাঝখানে ভাণ্ডারকার এবং ওদিকের কোণে অরুণা। স্বল্প পরিসর। সপ্রগল্‌ভ সান্নিধ্য। ভাণ্ডারকার মুখর হয়ে উঠলেন আবার। অরুণার কানে ঢুকছে না বর্ণও। একটা নগ্ন প্রত্যাশার আঁচ এসে যেন সারা গায়ে বিঁধছে তার।

বাড়ি ফিরে অরুণা সাদাসিধে প্রশ্ন করল, তোমাদের বড় সাহেবও ছবি দেখতে আসছে এ তুমি আগেই জানতে তো ?

বাদল সোম শুকনো মাটিতে আছাড় খেল যেন। স্বীকার করল, জানত। হেসে সঙ্কোচ কাটাতে চেষ্টা করল, লোকটা আসলে কিন্তু খারাপ নয়, মিশে দেখছ তো—

তার চোখে চোখ রেখে অরুণা শান্ত-মুখেই মাথা নাড়াল। দেখছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। আরো অনেক কিছু দেখছে। ক্ষুদ্র জবাব দিল, নিজের বৌকে দেশে ফেলে রেখে আর পাঁচটা মেয়ে নিয়ে এখানে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে এই বা এমন কি খারাপ !

দিন কতক পরে।

বড় সাহেবকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এসেছে বাদল সোম। বাঙালী খানা খানা করে লোকটা নাকি পাগল।

অরুণার হাতের কাজ থেমে গেল। নিঃশব্দে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বড় সাহেব মাইনে পান কত ?

....হাজার চারেক হবে। কেন ?

অরুণা হাসল, আর তুমি পাঁচশ'ও না, দিনকাল বদলে গেল দেখছি— কোন্ দিন আবার না বাঙালী খানার জন্য সাহেব তার আরদালীকে ধরে বসে।

দুর্বলতা আছে বলেই কটাক্ষ সহ্য হল না। রুক্ষ কণ্ঠে জবাব দিল, ছেলেটার মায়ায় বাড়ি আসে যখন তখন, নইলে ওঁর মত লোক আসাটা ইয়ার্কির কথা নয়।

অরুণা জবাব দিল, মায়াটা ছেলের ওপর না ছেলের মায়ের ওপর ভালোই তো জানো। ঠিক আছে, নিয়ে এসো, স্পেশাল কি রাঁধব বলো, কল্জের কালিয়া ? হাসতে হাসতেই প্রস্থান করল অরুণা।

নেমন্তন্নও সুসম্পন্ন হল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

দিন যায়। বছর শেষ হয়ে এলো। ....প্রতীক্ষারও শেষ লগ্ন। ঘরের মধ্যে ক্রমশ একটা ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছে বাদল সোমও উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু লোভ-দানবের হাতে চলার লাগাম, থামবে কি করে। দু'দিন বাদে সেলস্ অফিসার হতে যাচ্ছে।.... সবে শুরু।

শনিবারের বিকেল। ছেলেটা সেই থেকে বিরক্ত করছিল বলে তাকে চাকরের সঙ্গে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছে অরুণা। ঘড়ি দেখল। আদরের অতিথি একটু বাদেই এসে পড়বেন জেনেও মানুষটা এখনো ফেরেনি। আপিসের বেয়ারা একখণ্ড চিরকুট এনে হাতে দিল। মর্মার্থ, বিশেষ জরুরী কাজে আটকে গেছে, ফিরতে একটু দেরি হবে। বড় সাহেবের অভ্যর্থনায় যেন ত্রুটি না হয়, এবং তার ক্ষণকালের অনুপস্থিতি তিনি যেন মার্জনা করেন।

....চার হাজার টাকা মাইনের বড় সাহেব বাড়ি আসবে জেনেও আপিসের পর কাজে আটকে গেছে। অরুণা বাইরের ঘরে গুম হয়ে বসে রইল।—কতক্ষণ ঠিক নেই। মোটর-হর্ন শুনে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। পরনের আধময়লা শাড়িটাও বদলান হয়নি। সময়ও পেল না। চিরাচরিত ব্যস্ততায় অতিথি ঘরে ঢুকে থমকে গেলেন। আটপৌরে বেশে অরুণার এ রূপটাও অপরূপ লাগল চোখে।

চেয়ার টেনে বসলেন। সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে যাদু করেছ ম্যাডাম, কিন্তু মুখ শুকনো কেন, শরীর ভালো তো ?

অরুণা স্মিত মুখেই জবাব দিল, ভালই তো আছি—। বসল।

সোম কোথায় ?

অরুণা চিরকুটটা বাড়িয়ে দিল।

পড়ে ভাণ্ডারকার অস্ফুট ব্যঙ্গোক্তি করলেন,—খুব কাজের লোক ! ছেলের সাড়া পাচ্ছি না কেন, সেও নেই নাকি ?

এবারেও সপ্রতিভ জবাব দিল অরুণা, এমন হবে কে জানত, ছেলেকে আগেই বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভাণ্ডারকার সকৌতুকে চেয়ে থাকেন তার দিকে।

অস্বস্তিকর মৌন মুহূর্ত দু'চারটে..........।

উঠে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো অরুণা। চায়ের আড়ালে তবু সময় কাটল

কিছুক্ষণ। কিন্তু কতক্ষণ আর। বড় সাহেব যেন চুপ করে থেকেই মজা দেখছেন আজ। জোর করেই সহজ দৃষ্টি মেলে তাকালো অরুণা। মৃদু মৃদু হাসলেন তিনি। চোখ দুটো হাসছে আরো বেশি। হাসছে, না কামনায় জ্বলছে ঠিক বুঝে উঠল না অরুণা। .....অসহ্য লাগছে। এরকম একটা পরিবেশে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু সত্যিই ঘটল না কিছু। চাকরের কাঁধে চড়ে ছেলে ফিরল। দূর থেকেই সাহেবের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। একটু বাদে বাদল সোমও শশব্যস্তে ঘরে প্রবেশ করল। বিনীত কৈফিয়তের মুখেই ভাণ্ডারকার তাকে থামিয়ে দিলেন।— ঠিক আছে, ঠিক আছে, সময় বরং ভালোই কেটেছে আমাদের, কি বলো ম্যাডাম?

সশব্দে হেসে উঠলেন তিনি। দুরন্ত শিশু মুখভঙ্গী করে হাসিটা নকল করতে চেষ্টা করল তৎক্ষণাৎ। ভাণ্ডারকার আবারও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ফেটে পড়লেন যেন।

অরুণা আচ্ছন্নের মতো বসে আছে।

ভাণ্ডারকার বিদায় নিয়ে গেলে বাদল সোম সাগ্রহে কাছে সরে এলো।— সাহেব রাগ করেনি তো?

অরুণার চোখ দু'টি তার মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ থাকে বেশ কিছুক্ষণ।— না, রাগ করবে কেন, ছেলেটা পর্যন্ত বাড়ি ছিল না, বেশ খুশিই হয়েছে। .... তা, তুমি এতটা সময় কাটালে কি করে, পার্কে ঘুমিয়ে?

এভাবে আক্রান্ত হয়ে বাদল সোম রাগতে চেষ্টা করল।—তার মানে?—কিন্তু কণ্ঠস্বর ক্ষীণ শোনাচ্ছে।

কথা কাটাকাটি করতেও রুচিতে বাধছে অরুণার। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

রাত্রি। বাদল সোম জানে অরুণা জেগে আছে। নিজের অজ্ঞাতে একটা বিষণ্ণ শূন্যতা উপলব্ধি করছে কেমন। আগেও করেছে। কিন্তু মাঝখানের ক্ষুদ্র ব্যবধানটুকু অতিক্রম করা সহজ নয়। আজ আরও দুরূহ! বিরক্ত হয়েই অন্য চিন্তায় মন দিল। প্রতিষ্ঠার স্বপনচারিণী দূতীদের আনাগোনায় শূন্যতা ভরাট হতে লাগল। ......সেলস্ অফিসার.....অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার....সেক্রেটারী....

* * *

কিন্তু এবারেও হলো না প্রোমোশান।

বাদল সোম স্তব্ধ, হতভম্ব!

এ মর্মস্পর্শী আশাভঙ্গের জের সামলাতে সময় লাগবে। বিস্মিত অরুণাও কম হয়নি। কর্মোন্নতির সম্বন্ধে সেও নিঃসংশয়ই ছিল। রুক্ষ শুষ্ক পাণ্ডু মূর্তিটি দেখে হিংস্র আনন্দে অরুণা ডগমগিয়ে উঠল যেন। সান্ত্বনা দেবে? .....বলবে স্ত্রীর রূপ বিকালো না বলে দুঃখ কোরো না?

বাক্-বিনিময় আগে থেকেই প্রায় বন্ধ ছিল। এবারে নিঃসীম নীরবতায় কাটল ক'টা দিন।

সকালের দিকে সেদিনও খবরের কাগজে মানুষটির মুখ ঢাকা। একজন পুরানো বন্ধু কি উপলক্ষে বিকেলে তাদের চায়ের নেমন্তন্ন করে গেল। আগ বাড়িয়ে এসে সানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল অরুণা। যাবে বই কি, নিশ্চয় যাবে তারা। বন্ধু চলে যেতে কঠিন দূরত্ব রেখেই অরুণা কাজে মন দিল।

কেউ কিছু না বলে দিলেও যথাসময়েই আপিস থেকে ফিরল বাদল সোম। চাকরের জিম্মায় ছেলে রেখে নীরবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল দু'জনে। ফিরলও নীরবে। কিন্তু বাড়ির কাছে এসে থমকে গেল তারা।

দোর-গোড়ায় বড় সাহেবের মোটর দাঁড়িয়ে।

এ মানুষটি আর এখানে পদার্পণ করতে পারেন এ তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। বাইরের ঘর থেকে একটা কল-কোলাহল কাতে আসছে। ঘরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দু'জনেই।

জেনারেল ম্যানেজার রামস্বরূপ ভাণ্ডারকার চার হাত-পায়ে ঘোড়া হয়ে সমস্ত মেঝে চরে বেড়াচ্ছেন, এবং ছেলে তাঁর পিঠে চেপে বসে প্রবল বিক্রমে সেই মানব-অশ্বটিকে চালাচ্ছে।

দৃশ্য দেখে অরুণা হেসে ফেলল। অশ্বরূপী ভাণ্ডারকার হ্রেষারবে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। দুরন্ত শিশু মত্ত আনন্দে ক্ষুদ্র দু'পায়ে ঘোড়ার পাঁজরে বেপরোয়া ঠোক্কর চালাতে লাগল।

অরুণা দৌড়ে এসে পিঠ থেকে টেনে নামালো তাকে। বাঁদর ছেলে, লাগবে যে।

ভাণ্ডারকার সহাস্যে উঠে দাঁড়ালেন। বাদল সোম নীরব, নিস্পন্দ। একখণ্ড ইস্পাতের মতো হঠাৎ অরুণার সমস্ত মুখখানি ঝকমকিয়ে উঠল যেন। চকিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল একবার তার দিকে। পরে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল, কি কাণ্ড ! কতক্ষণ এসেছ সাহেব ? বোসো—। এঃ ! প্যান্টটা একেবারে গেছে।

নতজানু হয়ে নিজের হাতে প্যান্ট ঝেড়ে দিল। বোসো, চা বলে আসি। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। ফিরেও এলো তক্ষুনি। কাছেই একটা চেয়ার টেনে বসল।—তুমি আসবে আজ কে জানত, তাহলে কক্ষনো বেরুতাম না। তাঁর কোল থেকে ছেলেকে নিজের কোলে টেনে নিল অরুণা।

বাদল সোম স্থাণুর মতো বসে।

ভাণ্ডারকারও বিস্মিত হচ্ছেন।

একাই অজস্র কথা বলছে অরুণা। নেমন্তন্নের কথা, ছেলের দুরন্তপনা, ঘোড়া হওয়ার প্রসঙ্গে বড় সাহেবের ঘোড়া-রোগ নিয়ে ঠাট্টা, ইত্যাদি।

চাকর চা রেখে ছেলে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ—।

অরুণাও চুপ করে গেল এক সময়।

.....অখণ্ড নীরবতা।

ভাণ্ডারকার আপন মনেই হাসছেন একটু একটু। চোখ তাঁর বাদল সোমের মুখের

ওপর। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রমোশান পাওনি বলে দুঃখ হচ্ছে?

বাদল সোমের মাথা টেবিলের ওপর নুয়ে এলো প্রায়। অরুণা নির্বাক। মন চাইছে ঘর ছেড়ে চলে যেতে। পারছে না।

ভাণ্ডারকার শূন্য চায়ের পেয়ালাটা নাড়াচাড়া করলেন দুই-একবার । ভাবলেন একটু। হাসলেনও। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে উদঘাটন করলেন আপন জীবনের একটুখানি অনাবৃত ইতিহাস।.....কেরানি ছিলেন, আজ জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন। কিন্তু ঠিক এমনি নয়, দাম দিয়ে।

থামলেন একটু। তেমনি শান্ত-মুখেই বললেন আবার, আমার একটা অভিজ্ঞতা তোমার কাজে লাগতে পারে....টেক্ ইট ফ্রম মি মাই ডিয়ার বয়, জেনারেল ম্যানেজারীর থেকেও তোমার ওই স্ত্রীটির মূল্য অনেক বেশি। প্রমোশান পেলে কথাটা তোমার মনে থাকত না।

ঘড়ি দেখলেন।—আচ্ছা, গুড বাই। হালকা শিস দিতে দিতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। চকিতের জন্য মানুষটির অন্তস্তল পর্যন্ত দেখা গেল যেন। সর্বগ্রাসী শূন্যতা আর সাহারার তৃষ্ণা।

বোবা নৈঃশব্দ্যে ঘরটা ভরে উঠেছে।

প্রতিটি মুহূর্ত যেন মুগুরের ঘা দিচ্ছে বাদল সোমের বুকে। মুখ তুলল। অরুণা মূর্তির মতো বসে।

কঠিন ব্যবধান।

ছেলে ঘরে প্রবেশ করল। হেসে-দুলে এসে দাঁড়াল দু'জনের মাঝখানে। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল দু'জনকেই। একবার বাবাকে, একবার মা' কে। সন্তর্পণে একটা নিঃশ্বাস উন্মোচন করল বাদল সোম।

অরুণার মুখে স্নিগ্ধ মাধুর্য নেমে আসছে আবার।

ব্যবধান অনতিক্রমণীয় নয়।

মাঝে ক্ষুদ্র শিশু।

ক্ষুদ্র সেতুবন্ধ।

মহুয়াকথা

টেলিফোনে আগেই খবরটা পেয়েছিল অমরেশ।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। রমাপতির পরে স্ত্রী নিরুপমাও ফোন করেছে। জানিয়েছে, ডাক্তার চলে যাবার পরে সে নিজের ঘরে চলে এসেছে। নিজের ঘরে মানে নিচের তলায়। বলেছে, হাজার হোক ভাসুর মানুষ, তাঁর সামনে সে এ ধরনের রোগী আগলে বসে থাকে কি করে! অস্বস্তি লাগে বাপু যাই বলো—।

কারখানায় বসে অমরেশ মাল চালান পাঠাচ্ছিল আর ভাবছিল। পার্টির অর্ডার এবং অভিযোগাদি দেখছিল আর ভাবছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ রমাপতি কারখানায় এলো। নীরব জিজ্ঞাসায় মুখ তুলল অমরেশ। অল্প একটু হেসে রমাপতি নিজের টেবিলে গিয়ে বসল।

অমরেশ খানিক অপেক্ষা করে বলল, আজ আবার আসতে গেলি কেন ?

এলাম...। ভালোই আছে এখন। রমাপতি টেবিলের কাগজপত্র হাতের কাছে টেনে নিল।

মানুষটার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জানা আছে অমরেশের। খুঁচিয়ে না বার করলে ওটুকু হাসি আর ওই জবাবটুকুই শেষ।

উঠে কারখানার ভিতরে একবার টইল দিয়ে এলো অমরেশ। রমাপতির এতক্ষণে হিসেবপত্রের মধ্যে ডুবে যাবার কথা। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা গেল। ঠিক যেন মন দিতে পারছে না। ফাইল পড়ে আছে তেমনি। উসখুস করছে কেমন। কিছু একটা বলবে বলবে করছে। অমরেশ ব্যতিক্রমটা লক্ষ্য করছিল।

রমাপতি বলেই ফেলল শেষে, তোর সঙ্গে একটু আলোচনা করব ভাবছিলাম...।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে অমরেশ ওর টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল।

এই মানে, ওর চিকিৎসার কথা। বিব্রত হাসিটুকু আরো বেশি পরিস্ফুট হল রমাপতির মুখে।—বলছিলাম, অন্য চিকিৎসা কিছু করলে হল, এই মন-টনের চিকিৎসা কিছু, অনেক রকম তো হচ্ছে আজকাল...।

অমরেশের নীরবতা এবারে একটু তীক্ষ্ণ মনে হল রমাপতির। তাড়াতাড়ি সামলে নিতে গেল।—না না, আমি সে-সব কিছু বলছি না—হয়ত বা ভিতরে ভিতরে একটা কিছু জট পাকিয়ে আছে যা সুতপা নিজেই জানে না...একটা বইয়ে পড়েছিলাম এরকম অনেক কারণে হয় নাকি—।

অমরেশ চেয়েই ছিল। মাথা নেড়ে সায় দিল এবারে। শুধু ব্যবসায় নয়, সব কিছুতে রমাপতির ভারি একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি দেখে আসছে। ওর থেকে অমরেশ শিখেওছে অনেক। চিকিৎসা পরিবর্তনের কথাটা সম্প্রতি তার মনেও এসেছিল। বলবে বলবে করেও বলা হয়নি। রমাপতি নিজেই বলল। অমরেশ খুশিই হল। সুতপা, মানে সুতপা বৌদিকে সে ভালোবাসে বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার প্রাক-বিবাহ জীবনের জটিলতা যদি কিছু বেরিয়েই পড়ে, ভাবনার কিছু নেই। রমাপতি নীলকণ্ঠ।

রমাপতির বয়েস সম্প্রতি আটত্রিশ পেরিয়েছে। মোটামুটি ভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে অদৃষ্টবিপর্যয়ে একদিন তাকে দোকানে দোকানে তেল সাবান স্নো পাউডার ক্যানভাস্ করতে হয়েছে। খুব ছোট দুটি ভাই ছিল আর মা ছিল। মা আর নেই। ভাইয়েরা লেখাপড়া শিখে বাইরে চাকরি করে। সম্প্রতি আস্ত একটা সাবান কারখানার দশ আনার মালিক রমাপতি। বাড়ি করেছে। গাড়িও করতে পারে। করেনি। পাঁচশ টাকার মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করার সময় বি. এ. পাস পিসতুতো ভাই অমরেশ ষাট টাকা মাইনের পাকা চাকরি ছেড়ে রমাপতির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ওর মূলধন, উৎসাহ আর উদ্যম।

কারখানার বাকি ছ'আনার মালিক সে। বয়সে মাস দুই ছোট রমাপতির থেকে। আত্মীয়তার বাঁধন যতটুকু, তার থেকে অনেক বেশি ওদের ভিতরের বাঁধন।

অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ দুজনে। একেবারে ভিন্ন ধাতুতে গড়া। আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে অমরেশ বিয়ে করেছে। ছুটির দিনে বা অবকাশ সময়ে সে যখন নিরুপমাকে নিয়ে থিয়েটার বায়স্কোপে যেত বা হৈ চৈ করে বেড়াতে বেরুতে, রমাপতি যেত দক্ষিণেশ্বর বা তেমনি নিরিবিলি আর কোথাও। অমরেশ যখন স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করে, রমাপতি তখন বই পড়ে। পড়াশুনা হয়নি বলে মনে মনে একটু দুর্বলতা ছিল রমাপতির। তাছাড়া একটা শূন্যতার চাপও উপলব্ধি করত থেকে থেকে।

অন্নবস্ত্রের থেকেও গভীর যে প্রয়োজন, মানুষ তাকে খোঁজে নানাভাবে, নানা পথে। রমাপতি খুঁজল বইয়ের মধ্যে। গল্প উপন্যাস নয়, যে বই শুধু নিজেকে প্রবল করে, পরিপূর্ণ করে পাবার ইঙ্গিত দেয়। যে বই বলে, আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ো, আপনাকে না পেলে আপনার চেয়েও যিনি বড় আপন তাঁকে পাবে কেমন করে?

রমাপতি যখন সেই বৃহৎ আপনাকে পাবার চেষ্টায় নিজেকে অনেকটাই বদলে ফেলেছে, অমরেশের ঘরে ততদিনে তিনটি আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটেছে।—কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিতরকার বাঁধন ওদের এতটুকু চিড় খায়নি। বরং আরো বেড়েছে। বিপরীতধর্মী চুম্বকের মতোই ওদের আকর্ষণ।

রমাপতির বিয়ের প্রসঙ্গ অমরেশ মাঝে মাঝে তুলত। রমাপতি প্রথম প্রথম একেবারে কান দেয়নি।—কিন্তু শূন্যতার চাপটা যেন একেবারে যাচ্ছে না। ওদিকে যত দিন যায় অমরেশের মনে হয়, লোকটা যেন স্তিমিত হয়ে আসছে কেমন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বেশ জোর দিয়েই বিয়ের প্রসঙ্গটা ঘন ঘন তুলতে লাগল অমরেশ।

শেষে রমাপতি একদিন বলল, এ বয়সে আবার বিয়ে কি রে—

অমরেশ জবাব দেয়, এ বয়সে যে বয়সের মেয়ে বিয়ে করা চলে সেরকম মেয়ের কিছু অভাব আছে নাকি?

রমাপতি আর একদিন বলল, একটু লেখাপড়া জানা-টানা মেয়ে আমাদের ঘরে আসবে কেন?

অমরেশ হেসে ফেলল, আচ্ছা সে ভার তুই আমার ওপর ছেড়ে দে।

তারপর সুতপার সঙ্গে বিয়ে।

অমরেশের শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে সম্পর্ক আছে কি একটা। বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক সুতপার বাবা। পাঁচ মেয়ে দুই ছেলে তাঁর। মেয়েরা দেখতে বেশ সুশ্রী। কিন্তু সুশ্রী হলেও দেখেশুনে পাঁচ মেয়েকে ভালো ঘরে-বরে পার করার সংগতি বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকদের কমই থাকে। তার ওপর ছেলে আছে দু'টি। প্রথম তিন মেয়েকে পাত্রস্থ করার পর একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। চতুর্থ সুতপা বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ল কিছুদিন। তারপর বলা নেই কওয়া নেই পড়াশুনা ছেড়ে দিলে হঠাৎ। স্বল্পভাষিণী, কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্য কম নয়। একঘেয়ে ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগল না। সংসারের অনটনও আছে। মেয়ে ইস্কুলে মাস্টারি

যোগাড় করে নিল একটা। বছর দুই কাটল নিশ্চিন্তে। তারপর আবার হঠাৎ একদিন সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতেই বসে রইল। স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে চিঠি এলো, জনা দুই ভদ্রলোক দেখাও করতে এলেন ওর সঙ্গে বাড়ি বয়ে। কিন্তু দেখা না করে সুতপা ভিতর থেকে বলে পাঠালো, সে আর চাকরি করবে না।

সুতপার মা বাবা অবাক হলেন। কিন্তু এই নিয়ে আর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না কিছু। ভাবলেন, বলার হলে মেয়ে নিজেই বলত।

আরো একবছর কাটল এমনি বাড়ি বসে। তারপর সেই যোগাযোগ।

ম্যাট্রিক পাস শুনে সুতপার বাবা বেশ দমে গেলেন। কিন্তু অমরেশ যে ভাবে বলল, তাতে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অনায়াসেই রমাপতির ওপর চাপান চলে। তাছাড়া, সত্যিকারের ভালো না হলে নিজেদের মেয়ে নিরুপমারই বা অত আগ্রহ কেন। অন্দরমহলে এবং আড়ালে সুতপার সঙ্গেও কথাবার্তা নিরুপমা-ই চালালে।

মন স্থির করতে না পেরে ভদ্রলোক নিজেই মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন। ভেবেছিলেন, ওর মায়ের মারফৎ মতামত জানা যাবে। কিন্তু সুতপা ঘাড় নেড়ে তাঁকেই জানিয়ে দিলে, বিয়ে হতে পারে, তার দিক থেকে আপত্তি কিছু নেই।

বিয়ে হল।

তারপর যত দিন গেল, সুতপার মনে হল, এরা অত্যুক্তি করেনি কেউ। ভাগ্য তার ভালই। এত ভালো বোধহয় সচরাচর হয় না। একটা ধীর সৌম্য প্রশান্তি যেন মানুষটিকে ঘিরে আছে। সান্নিধ্য মাত্রে শুচিস্পর্শ-বোধ জাগে। আনন্দে হেসে ঠাট্টাও করেছে, সাবানের কারখানার গুণ অনেক।

অমরেশও ছিল সেখানে। বলতে ছাড়েনি, ওঃ, সাবানের কারখানায় যেন আর কেউ কাজ করছে না।

সুতপা তৎক্ষণাৎ জব্দ করেছে ওকে, তা তো করছে, কিন্তু কয়লার গুণ যে আলাদা।

জব্দ হয়ে অমরেশ রমাপতিকেই চোখ রাঙিয়েছে, দ্যাখ, তোর বউ তোর সামনেই আমাকে কয়লা বলছে, ভালো হবে না কিন্তু।

বেড়ানো-টেড়ানো, হৈ-চৈ করার বাহন অমরেশ। তিনটি ছেলেমেয়ের বাবা কেউ বলবে না। ঝিয়ের হাতে তাদের সমর্পণ করে নিরুপমাকেও হিড় হিড় করে টেনে বার করে একটু ফুরসত পেলেই। রমাপতিকেও টানতে চেষ্টা করেছে প্রথম প্রথম। কিন্তু তার খুব পরিবর্তন নেই। বলে, যার জন্যে এসেছিস, তাকেই নিয়ে যা, আবার আমাকে কেন—।

অমরেশ বড় নিঃশ্বাস ফেলেছে একটা।—নিজের একটা বউ নিয়েই হিমশিম খাচ্ছি, আবার তোরটাও শেষ পর্যন্ত আমার কাঁধেই চাপল?

সুতপা হাসে। বলে, শখ দেখে বাঁচিনে—।

নতুন সংসারে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে এবারে মানুষটাকে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করল সুতপা। তার বইটই গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। রমাপতি লজ্জা পায় প্রথম প্রথম। সুতপা বলে, চমৎকার জিনিস তো, কিন্তু সব বুঝতে পারিনে—তুমি বলো

না, শুনি—।

রমাপতি খুশি হয়ে জবাব দেয়। আমিই কি বুঝতে পারি না কি, পারলে আর দুঃখ ছিল কি।

কিন্তু তবু কথায় কথায় আলোচনা ওঠে এক এক দিন। অন্তরদর্শনের কথা। উপলব্ধির কথা। মানুষটা তখন যেন বদলে যায়। বদলে যায় সুতপাও। অন্তস্তল থেকে শিহরন ওঠে একটা। কথাগুলো যেন শব্দ নয়, আলোর স্পর্শ।

এরই মধ্যে দু'একদিন ভগ্নদূতের মতো এসে হাজির হয়েছে অমরেশ। দু'চার মিনিট চেষ্টা করেছে চুপচাপ বসে শুনতে। চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠেছে তারপর।—জল। বাতাস! দমবন্ধ হয়ে গেল! ইত্যাদি—। শব্দব্রহ্মের বিপরীত খাতে পড়ে মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে যায় ওরা। তারপর হাসাহাসি। খানিকটা জল এনে অতর্কিতে ওর মাথায় চাপড়েই দেয় সুতপা। তারপর ওই জল নিয়ে কাড়াকাড়ির ফলে দুজনকেই ভিজতে হয় অল্প বিস্তর।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে আসে।

সুতপার পরিবর্তন হতে লাগল একটু একটু করে। এত ধীরে যে প্রথম প্রথম চোখেই পড়ল না কারো। পড়ল যখন তখন অনেকটা বদলে গেছে। চুপচাপ বসে থাকে। ভাবে কি। ভরা প্রাচুর্যে একটা শুকনো টান ধরে যাচ্ছে যেন। রমাপতি চিন্তিত হয়ে ওঠে। অমরেশকে জিজ্ঞাসা করে, কি রে, কি ব্যাপার?

অমরেশ জবাব দেয়, আমিও তো দেখছি,—জিজ্ঞাসা করে দ্যাখ্ না?

রমাপতি সে চেষ্টা আগেই করেছে। সুতপা হেসে বলেছে, কি আবার হবে, বেশ তো আছি।

জিজ্ঞাসা অমরেশও করেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সইয়ে রসিয়ে। খানিক চুপ করে থেকে সুতপা হেসেই ফেলেছে একটু। কিন্তু যেমনটি হাসত আগে, ঠিক তেমনটি যেন নয়। পরে বলেছে, ভিতরে গলদ থাকলে, সব ভাগ্য সকলের সয় না—।

ছদ্ম-হতাশায়, অমরেশ হাল ছেড়ে দেয় যেন।—তুমিও ভিতর নিয়ে পড়েছ—! ওই মুখ্‌খুটার হাতে পড়ে তোমারও বারোটা বেজে গেছে দেখছি।

সুতপা হাল্কা ঠেস দিয়ে বলে, অমন মুখ্‌খু একটু আধটু হওয়া যায় কিনা চেষ্টা চরিত্র করে একবার দেখই না—

শুনে খুশি হয় অমরেশ।—খুব যে! তা সেটা যখন জানই, গলদটাও সব ওই খানেই উজাড় করে দাও গে যাও না! অমন গঙ্গাজল আর পাবে কোথায়?

শোনামাত্র থতমত খেয়ে সুতপা প্রস্থান করে।

প্রথম প্রথম অন্য রকম ভেবেছিল রমাপতি। নিজের লেখাপড়া না হওয়ার দুর্বলতা একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভাবল, সেটাই দিনে বড় হয়ে উঠছে সুতপার চোখে। কিন্তু পরে মনে হল তা নয়, বরং তার দিকেই যেন আরো বেশি করে ঝুঁকছে ও। তার দিকে আর তার বই পত্রের দিকে। এড়িয়ে চলছে অমরেশকেই।—হাল্কা হাসিঠাট্টা হৈ চৈ থেমে গেছে।

সেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করল এক ছুটির দিনে। কি একটা আলোচনার মাঝে অমরেশ এসে জোর তাগিদ দিল, সিনেমার টিকিট কাটা হয়েছে, ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে রেডি না হলে যেমন আছ তেমনটি টেনে বার করব—।

সুতপা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ও মা, আমরা যে বেলুড় যাচ্ছি একটু বাদে ! সেখানে যাবে তো চল।

খানিক থমকে দাঁড়িয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল অমরেশ। সুতপা হাসতে লাগল। রমাপতি অবাক।—বেলুড় যাবে, কই বলনি তো কিছু !

—বলব ভাবছিলাম। কাজ নেই তো কিছু, চল না বেড়িয়ে আসি একটু ?

রমাপতি তক্ষুণি প্রস্তুত। গঙ্গার ধারে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে পাশাপাশি বসল দু'জনে। দ্বিধা কাটিয়ে রমাপতি তুলেই ফেলল কথাটা। সুযোগ সব সময় আসে না। বলল, কি হয়েছে তোমার আজকাল ঠিক বুঝি না।

কেন, এখানে এলাম বলে ?

না, এখানে আসা তো ভালোই। দেখ, সব কিছুর আগে ভিতরটাকে একেবারে সাদা করে নিতে না পারলে সবই পণ্ডশ্রম। যতই বই পড়ি আর যতই আলোচনা করি। ভিতরে ভিতরে কেন কষ্ট পাচ্ছ বল না খুলে ?

রমাপতির মনে হল হঠাৎ যেন একপ্রস্থ আবীর পড়ল ওর মুখে। তারপর ঠিক তেমনই ফ্যাকাশে হয়ে গেল আস্তে আস্তে। হাসল একটু। পরে ঠাট্টার সুরেই বলল, তোমার সঙ্গে থেকেও ভিতরটা সাদা না হলে কেমনতর গুরুমশাই তুমি— ?

প্রথম অঘটন ঘটল এর দিনকতক পরেই। বসেছিল চুপচাপ। সমস্ত দেহে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। তারপর কাঁপুনি। অবিশ্রান্ত। দাঁতে দাঁত লেগে গেল। হকচকিয়ে গিয়ে রমাপতি পুরোদমে পাখা খুলে দিয়ে মাথায় জল দিতে লাগল। কিন্তু কাঁপুনি বাড়ছেই। অমরেশ দৌড়ে এল। নিরুপমাও।

ডাক্তার বললেন, হিস্টিরিয়া। ওষুধ এবং যথাবিধি নির্দেশ দিয়ে গেলেন। বহুক্ষণ বাদে শ্রান্ত অবসন্নের মতো দেখা গেল সুতপাকে। কিন্তু থেকে থেকে কেঁপে উঠছে তখনো। অমরেশ একাই কারখানায় চলে গেল। নিরুপমাও নিচে নেমে গেল একসময়। একেবারে কাছে, বুকের কাছে, মুখের কাছে ঝুঁকে এল রমাপতি। দু'হাত বাড়িয়ে সুতপা আঁকড়ে ধরল তাকে। ওর বুকের মধ্যে আবার কাঁপতে লাগল ঠক্ ঠক করে। দু'হাতে রমাপতিও যেন আগলে রাখতে চাইল তাকে। ঘরের দরজা খোলা, খেয়াল নেই।

অনেকক্ষণ বাদে সুতপা সুস্থ হল, শান্ত হল। দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ওর এই একান্ত সমর্পণ রমাপতিরও যেন ভালোই লাগছে। আবেশে জড়িয়ে এল সুতপার দুই চোখ। ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়।

খোলা দরজার দিকে চেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল যখন, বেলা গড়িয়ে গেছে। লজ্জা পেয়ে বলল, তোমার আজ অফিস যাওয়া হল না তো ?

না হোক। কেমন লাগছে এখন ?

—ভালো।...হঠাৎ কি রকম হয়ে গেল যেন, তুমি কারখানা থেকে ঘুরে এস একবার,

আর কিছু ভয় নেই, বেশ হাল্কা লাগছে এখন।

প্রথম সূচনা এই।

মাঝে মাঝেই এ রকম ঘটতে লাগল তারপর। বছর ঘুরে এল একভাবেই। ডাক্তার আসছে একজন ছেড়ে আর একজন। কাজকর্মে মন দিতে পারে না রমাপতি। কারখানায় যাওয়া বন্ধ করতে হয় প্রায়ই। অসহায় ছোট মেয়ের মতই সুতপা ওকে আঁকড়ে ধরে থাকে তখন।

অমরেশের কাছে মনের চিন্তা ব্যক্ত না করে পারে না নিরুপমা। নিজেরাই তোড়জোড় করে বিয়ের ব্যাপারটা ঘটিয়েছে, এ জন্যও দায়িত্ববোধ স্বাভাবিক। অনেক কথাই এখন মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে তাদের। সুতপার এম. এ. পড়া ছাড়ার কথা আর তেমনি হঠাৎ তার স্কুলের চাকরি ছাড়ার কথা। বাড়িতে লোকজন আনাগোনার প্রসঙ্গ নিয়েও কথা হল। নিরুপমা বলল, কি জানি বাপু বুঝি না, যে চাপা মেয়ে—তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা কিছু হয়ে আছে কি না কে জানে—ভালো থাকলেও তো আজকাল নিচের সিঁড়ি মাড়ায় না একবার—সারাক্ষণ ওই ছাই-ভস্ম তত্ত্বকথার বই নিয়ে আছে—নয় তো দাদার (রমাপতির) মুখে সেই কথাই শুনছে। ভেতরের একটা কিছু অশান্তি চাপা দেবার জন্যে না হলে এ রকম হয়?

এই একই প্রশ্ন বোধ হয় উদয় হয়েছে রমাপতির মনেও। বিয়ের পর প্রথম প্রথম পড়া বা চাকরি ছাড়া নিয়ে তার সামনেই স্থূল ঠাট্টায় অমরেশ সুতপাকে বিব্রত করতে চেষ্টা করেছে অনেক দিন।

ইদানীং নিবিড় মমতায় রমাপতি অনেক চেষ্টা করেছে ওর মনের ভিতরটা উন্মুখ করে দেখতে। বলেছে, ভিতরে তো আমাদের পর্দার পর পর্দা, সারি সারি পর্দা—এ পর্দা যত ছাড়াবে ততো আনন্দ—অসঙ্কোচে একবার একে সরাতে পারলে দুনিয়ার কোনো লজ্জা, কোনো ভয়, কোনো গ্লানি সেই স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ়ের পরে ছাপ ফেলতে পারে না—ও সব বাইরের জিনিস মাত্র।

সমস্ত আগ্রহ একত্র করে সুতপা শোনে।...পরম নির্ভরে। আর ব্যথায় টন টন করে ওঠে রমাপতির বুকটা। যত দূর সম্ভব চেষ্টা করে ওই আত্মদর্শনের আলোচনার স্পর্শেই ওকে শান্ত করতে, সুস্থ সবল করে তুলতে। গোপনে মনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত বইপত্রও ঘাঁটছে রমাপতি।

ভেবে চিন্তে এই চিকিৎসারই কোনো বিশেষজ্ঞকে দেখানো সাব্যস্ত করে কথাটা সেদিন অমরেশের কাছে উত্থাপন করল।

বিশেষজ্ঞ এলেন।

বেশ নাম ডাক আছে। প্রৌঢ়। রাশভারী প্রকৃতি। সপ্তাহে চারদিন দু'ঘণ্টা করে সিটিং দেবার কথা বাড়িতে। রোজ মোটা টাকা গুনতে হবে এই জন্য। সেজন্য ভাবে না কেউ, কিন্তু তাঁর চিকিৎসার গতি পদ্ধতি দেখে খুব একটা আশ্বাস পাচ্ছে না রমাপতি বা অমরেশ। মোটামুটি কেস শোনার পর প্রথম দিন অবশ্য সুতপাকে পরীক্ষা করেছেন

তিনি, ওর সঙ্গে এবং সকলের সঙ্গেই বসে গল্প করেছেন অনেকক্ষণ। দ্বিতীয় দিনের দু'ঘণ্টা শুধু অমরেশের সঙ্গেই কথা বলে কাটিয়েছেন, সুতপাকে একবার তিনি দেখতেও চাননি। তৃতীয় দিন রমাপতির সঙ্গে গল্প ফেঁদে বসেছেন—যেন ওরই জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন কিছু।

একদিনের দু'ঘণ্টা কাটলেই মোটা টাকা। কাজেই অমরেশ এবং রমাপতি দু'জনেরই কেমন বিসদৃশ লাগল ব্যাপারটা। এদের অনেক ভড়ংচড়ং আছে শুনেছিল। রোগী নিয়ে বসার আগেই তিন দিন কাটল—সিটিং সুরু হলে ক'দিন বা ক'মাস কাটবে ঠিক কি।

কিন্তু এই তৃতীয় দিনেই একটা অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখা গেল মানসিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞটির।

দু'ঘণ্টার অনেক আগেই উঠে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। রমাপতিও এল সঙ্গে সঙ্গে। ওদিকের ঘরে অমরেশ সুতপার সঙ্গে কথা বলছিল, সেও বেরিয়ে এল। তার কাছেই ফীস্-এর টাকা। বলল, আজ চললেন?

ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়লেন।...জবাব না দিয়ে তার দিকে তাকালেন শুধু।

অমরেশ আবার জিজ্ঞাসা করল, কাল থেকে ওঁকে নিয়ে বসবেন?

ওঁকে অর্থাৎ সুতপাকে।

ডাক্তার থমকে ভাবলেন একটু। পরে সাফ জবাব দিলেন, না—। কাল থেকে আর আসব না। আর আসার দরকার হবে না।

তারপরেই রমাপতির দিকে চেয়ে প্রায় রুক্ষ কণ্ঠেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি, বিয়ের পরেও যদি এভাবেই চলবেন ঠিক করেছেন, তা হলে বিয়ে করার দরকার ছিল কি? বনে জঙ্গলে বা গুহাগহ্বরে গিয়ে একটা আশ্রম-টাশ্রম খুলে বসলেই তো পারতেন?

অমরেশ বললেন, ওঁর স্ত্রীর কোনো চিকিৎসার দরকার নেই, এঁরই বরং একটু আধটু চিকিৎসা করুন।

গট্‌গট্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগলেন তিনি।

ওরা দু'জনে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। বিমূঢ়, হতভম্ব।

তারপরই যেন একটা উপলব্ধির আনন্দ উপচে উঠল অমরেশের চোখে। হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে ছুটল সে।

ডাক্তারের ফীস্ দেওয়া হয় নি—।

সেলিম চিশতির কবর

মফঃস্বল শহরের এক পাশ দিয়ে গঙ্গার ধার-ঘেঁষা রাস্তার একটা মাথা এসে থেমেছে মেয়ে-স্কুলের সামনে। উঁচু বাঁধান রাস্তা। নিচে গঙ্গা। একটু দূরে দূরে এক-একটা অতি বৃদ্ধ বট-অশ্বথ ডালপালা ছড়িয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গাকে আড়াল করেছে।

সকাল ন'টা না বাজতে রাস্তাটার ভোল বদলায়। ছোট ছোট মেয়েদের পায়ের

ছোঁয়া পেয়ে এতক্ষণের ঝিমুনিভাব কাটিয়ে যেন সজাগ হয়ে ওঠে। কিশোরী মেয়েদের কল-মুখরতায় লাল গঙ্গা আর লালচে অশ্বথ বটের শান্ত উদাসীনতায় বেশ একটা ছেদ পড়ে কিছুক্ষণের জন্য। দলে দলে মেয়েরা যায় বই বুকে করে, বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে, অথবা বই-ভরা ছোট ছোট টিনের বাক্স দোলাতে দোলাতে। রাস্তা জুড়ে চলে তারা। এরই মধ্যে সাইকেল-রিকশর ভেঁপু কানে এলে দু'পাশে সরে আসে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে কে যায়।

মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশয় ঠাসাঠাসি হয়ে চলেছেন মীরাদি আর প্রভাদি। সাইকেল-রিকশয় ওটুকু বসার জায়গা ওই দুজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। বড় মেয়েরা টিপ্পনী কাটে আর হাসে। ছোট মেয়েরা তাদের হাসির কারণ বুঝতে চেষ্টা করে।

একটু বাদে আবার শোনা যায় সাইকেল-রিকশর ভেঁপু। কে আসে? প্রতিভাদি আর শোভাদি। তাদের দুজনের মাঝখানে আবার একটা ছোট মেয়েকে অন্তত বেশ বসিয়ে নিয়ে যাওয়া চলে। রাস্তার মাঝখানে আবার জড়ো হয়ে চলতে চলতে বড় মেয়েরা এক একদিন সেই পুরনো গবেষণায় মেতে ওঠে। উল্টে-পাল্টে ঠিক করলেই তো পারে সাইকেল-রিকশ—মীরাদির সঙ্গে প্রতিভাদি আর প্রভাদির সঙ্গে শোভাদি। নয়ত, মীরাদি আর শোভাদি, আর প্রভাদি আর প্রতিভাদি। চিরাচরিত সিদ্ধান্তেই এসে থামতে হয় আবার। অর্থাৎ, যার সঙ্গে যার ভাব।

আবার কে আসে?

ও বাবা! মালতিদি আর স্মৃতিদি! হেড মিসট্রেস আর সহকারি হেড মিসট্রেস। সর, সর! রাস্তার দুপাশ ঘেঁষে চলে মেয়েরা। একটানা ভেঁপু বাজিয়ে সাইকেল-রিকশ তরতরিয়ে চলে যায়।

এদিক থেকেই আসেন মেয়ে-স্কুলের বেশির ভাগ টিচার। শেয়ারে মাস-ভাড়া সাইকেল-রিকশ ঠিক করা আছে। সকালে নিয়ে আসে আর বিকেলে পৌঁছে দেয়।

শুধু একজন ছাড়া। অর্চনা বসু।

তিনি হেঁটে আসেন আর হেঁটে ফেরেন। পৌনে দশটা নাগাদ যে মেয়েরা স্কুলের কাছাকাছি এসেছে, নিজেদের অগোচরে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাবে তারা। দেখতে পেলে অস্বস্তি, না পেলে উসখুসুনি। ঠিক সময় ধরে এলে এক জায়গায় না এক জায়গায় হবেই দেখা। হেঁটে আসেন। তবু সামনের মেয়েরা ঘাড় না ফিরিয়েই বুঝতে পারে তিনি আসছেন। কারণ, যেখান দিয়ে আসেন তার আশপাশের প্রাণ-তারুণ্য হঠাৎ যেন থেমে যায় একটু।

কান সচকিত করা ভেঁপু নেই সাইকেল-রিকশর—তবু সরার পালা। পথের মাঝখান থেকে ধারে সরে আসা নয়। ধারের থেকে মাঝখানে বা ওধারে সরে যাওয়া। যিনি আসছেন, গঙ্গার দিকের রাস্তার ধারটা যেন তাঁর খাসদখলে।

ফ্যাকাশে সাদা গায়ের রং, ধপধপে সাদা পোশাক, সাদা চশমা, সাদা ঘড়ির ব্যান্ড, পায়ে সাদা জুতো—সব মিলিয়ে এক ধরনের সাদাটে ব্যবধান। মেয়েদের আভরণে যে-সাদা রিক্ত দেখায়, তেমন নয়। যে-সাদা চোখ ধাঁধায়, প্রায় তেমনি।

আজ দু'বছর হল অর্চনা বসু এসেছেন এই স্কুলে। দু'বছর ধরে ঠিক এই এক রকমটি দেখে আসছে মেয়েরা। কোন দিকে না চেয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে সোজা হেঁটে আসেন। ঠিক কোনো দিকে না চেয়েও নয়। মাঝে মাঝে গঙ্গার পাড়ের দিকে চোখ পড়ে। জলের ধারে ছোট কোনো ছেলেমেয়ে দেখলে থম্‌কে দাঁড়ান। স্কুলের মেয়ে কি না দেখেন লক্ষ্য করে। অনেক চঞ্চল মেয়ে স্কুলে আসার পথে খেলার ছলে উঁচু রাস্তা থেকে দৌড়ে গঙ্গার পাড়ে নেমে যেত, জলের ধার ঘেঁষে ছুটোছুটি করতে করতে স্কুলের পথে এগোতো। বেশি দুরন্ত দুই-একটি মেয়ে অনেক সময় জুতো আর বই হাতে করে জলে পা ভিজিয়ে চলতে গিয়ে আছাড় খেয়ে ভিজে ফ্রক আর ভিজে বই জুতো নিয়ে স্কুলে এসে হাজির হত। আজকাল সেটা বন্ধ হয়েছে। হেড মিস্ট্রেস বা সহকারি হেড মিস্ট্রেসের তাড়নায় নয়। অর্চনাদির ভয়ে। যাকে একবার নিষেধ করা হয়েছে, তাকে দ্বিতীয় বার নিষেধ করতে হয় না আর। ছোট বড় সব মেয়েই জানে, অর্চনাদির বিষম জলের ভয়। কিন্তু তাঁর চোখে পড়ার ভয়ে জলের দিকেও এখন আর পা বাড়ায় না কেউ।

চোখে পড়লে কি হবে? অর্চনাদি রাগ করবেন না বা কটূক্তিও করবেন না কিছু। শুধু কাছে ডাকবেন। শুধু বলবেন, জলের ধারে গেছলে কেন? খেলার তো এত জায়গা আছে। তোমাদের দেখাদেখি আরো ছোটরাও যাবে জলের ধারে। আর যেও না।

· এটুকুর মুখোমুখি হতেই ঘেমে ওঠে মেয়েরা। অথচ অন্য টিচারদের গঞ্জনাও গায়ে মাখে না তারা। অর্চনাদির বেলায় এটুকুতেই কেন এমন হয়, বুঝে ওঠে না।

মেয়েদের চোখে মহিলাটির এই জল-ভীতির পিছনে অবশ্য ছোটখাটো ঘটনা আছে একটা। স্কুলের পিছনেই গঙ্গার বাঁধান ঘাট। বাইরের অনেকেই চান করে সেখানে। বিশেষ করে আশেপাশের খ'ড়ো ঘরের মেয়ে-পুরুষেরা। দুপুরে টিফিনের সময় স্কুলের ছোট মেয়েদের খেলার এবং বড় মেয়েদের বসার জায়গা ওই ঘাট।

ঘাটের দু'পাশের উঁচু-উঁচু ধাপগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা-নামা করে ছোট মেয়েরা। শীতকালে জল অনেকটা নিচে থাকে। কিন্তু বর্ষায় ঘাটের সিঁড়ির অর্ধেকটা তো ডোবেই, ওই উঁচু ধাপগুলোরও দুদিক ছাপিয়ে জল উঠে আসে। গেল বারের বর্ষায় এক দুপুরে একটি আধ-বয়সি মেয়ে তার ছোট ছেলে নিয়ে ওই ঘাটে চান করছিল। ছেলেটি নতুন সাঁতার শিখেছিল। বর্ষার ভরা গাঙের বিষম স্রোত টেনে নিয়ে গেল তাকে। তার মায়ের বুকভাঙা কান্নায় আর চিৎকারে গোটা স্কুলটা যেন ভেঙে পড়েছিল এই ঘাটে। তখন অনেকেই লক্ষ্য করছিল, ওই শোকার্ত মায়ের দিকে চেয়ে দু গাল বেয়ে নিঃশব্দে ধারা নেমেছিল আর একজনেরও।

সেদিন আর ক্লাস নিতে পারেন নি অর্চনা বসু।

এর পরে গঙ্গার দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন শিউরে উঠেছেন তিনি। বর্ষার লাল জলে শিশুদেহগ্রাসী লালসার বিভীষিকা দেখেছেন। মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে, ছুটোছুটি করে ওই ধাপগুলোর ওপর। পা ফসকে বা টাল সামলাতে না পেরে একবার ওপাশে পড়লে—

আতঙ্কে অস্থির হয়ে অর্চনা বসু দৌড়ে গেছেন হেড মিস্ট্রেসের কাছে। টিফিনে মেয়েদের ঘাটে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। বড় মেয়েরা গেলে ছোট মেয়েরাও যাবে—সেটা

ভয়ানক ভয়ের কথা।

হেড মিস্ট্রেস অবাক ! বলেন, কিন্তু ওই ছেলেটা তো চান করতে গিয়ে ডুবেছে। মেয়েদের আটকাব কেন ?

ভয়ের কি আছে এবং কেন আটকানো দরকার অর্চনা বুঝিয়ে দেন। তাঁর সেই বোঝানোর আকুতি দেখে মনে হবে, যেন আর একটি ছোট মেয়েকেই বোঝাচ্ছেন তিনি। হেড মিস্ট্রেস চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন খানিক। পরে বলেন, আচ্ছা আমি তাদের সাবধান করে দেব।

কিছু বলার জন্যেই বলা। নইলে কিছুই তিনি করবেন না জানা কথা। উদার-মত-পন্থিনী প্রধান শিক্ষয়িত্রী কোনো কল্পিত ভয়ে মেয়েদের স্বাধীনতা খর্ব করতে রাজি নন।

কিন্তু অর্চনা বসুর চোখে এ ভয়টা ভয়ই। কাজেই যা করার নিজেই তিনি করতে বসলেন। একদিন দু'দিনে কাজ হল না। কিন্তু চার-পাঁচ দিনের মধ্যে হল। অর্চনা বসু তো মাস্টারি করে বাধা দেননি কোনো মেয়েকে। তাঁর নিষেধের মধ্যে অব্যক্ত অনুনয়ের সুরটুকুও বাধা হয়ে উঠেছিল বড় মেয়েদের কাছে। অবশ্য একবারেই ঘাটের মায়া ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি তারা। কিন্তু অর্চনাদির চোখে চোখ পড়তে কেমন যেন লজ্জা পেয়ে গেছে। অনুযোগ ভরা ওই ঠাণ্ডা দু'চোখের অস্বস্তি তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঘাটে আসা ছেড়েছে আর নিচু ক্লাসের ছোট মেয়েদের আগলে রেখেছে। ফলে টিফিনের সময় ঘাট খাঁ-খাঁ করে এখন।

মেয়েরা জেনেছে অর্চনাদির জলের ভয় খুব। কিন্তু সহশিক্ষয়িত্রীরা মুখ টিপে হেসেছেন। কানে কানে ফিস-ফিস করেছেন মীরাটি আর প্রভাদি, প্রতিভাদি আর শোভাদি। এই বাৎসল্যজনিত আতঙ্কের পিছনে অন্য কিছুর আভাস পেয়েছেন তাঁরা। সেই পুরান কিছুর।

অর্চনা সবে নতুন এসেছেন তখন। তাঁর এই ধপধপে সাদা সাজসজ্জা সত্ত্বেও এমন সাদাটে ব্যবধান গড়ে ওঠেনি তখনও। মেয়েদের সঙ্গে তো নয়ই। বিশেষ করে খুব ছোট মেয়েদের সঙ্গে। স্কুলের মধ্যেই খপ করে এক একটা ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েকে কোলে কাঁধে তুলে নিতেন। ক্লাসের মধ্যে একটা বাচ্চা মেয়েকে টেনে কোলে বসিয়েই হয়ত ক্লাসের পড়া শুরু করে দিতেন। ছোট বড় দু'পাঁচটা মেয়েকে তো রোজই বাড়ি নিয়ে যেতেন। চকোলেট দিতেন, লজেন্স দিতেন, বিস্কুট দিতেন।

রকম-সকম দেখে অন্যান্য টিচাররাও হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। নীরব কৌতূহলে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাঁরা। চেহারা-পত্র, চালচলন বা পুওর-ফাণ্ডএ মোটা চাঁদা দেওয়ার বহর দেখে তো বড়লোকের মেয়ে বলে মনে হয় । এম. এ. পাস, দেখতে সুশ্রী। শুধু সুশ্রী নয়, বেশ সুন্দর । কিন্তু বয়েস তো তিরিশের ওধারে গড়িয়েছে। বিয়ে হয়নি কেন ? তাঁর অন্তরঙ্গ হতেও চেষ্টা করেছিলেন দুই-একজন। কিন্তু ভিতরের কৌতূহলটুকু বড় হয়ে উঠেছিল বলেই হত বন্ধুত্ব জমেনি। উল্টে বিচ্ছিন্নতাই এসেছে এক ধরনের। আড়ালে কানাকানি করেন তাঁরা, হাসাহাসি করেন। মেয়েদের নিয়ে এসব কি কাণ্ড ! বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি।

এই বাড়াবাড়িটাই তাঁদের চোখে চরমে উঠেছিল একদিন। শুনে বিস্ময়ে কৌতুকে প্রায় বিভ্রান্তই হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। তারপর বেদম হেসেছেন। এ ওর গায়ের ওপর পড়ে হেসেছেন।

আসলে এই ব্যাপার!

শিক্ষয়িত্রীদের কাছে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মুখরোচক হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল খবরটাই শুধু শুনেছিলেন তাঁরা, সবটা জানেন না। মাঝারি ক্লাসের একটি মেয়ে তার তিন বছরের ছোট ভাইকে নিয়ে অর্চনাদির বাড়ি গিয়েছিল। কাছেই বাড়ি, গেলে অর্চনাদি খুশি হন জানে। আরো খুশি হন ছোটদের নিয়ে গেলে, তাও জানে। অর্চনা খুশি হয়েছিলেন। দু হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিয়েছিলেন ছেলেটাকে। ঢলঢলে শিশু এভাবে আক্রান্ত হয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে চেয়েছিল তাঁর দিকে। তাই দেখে খুশি ধরে না। তাঁর আদরের ঠেলা সামলে ছেলেটা গম্ভীর মুখে প্রায় যেন কৈফিয়তই তলব করেছিল, তুমি কে?

তার দিদি বলে দিতে যাচ্ছিল কে। অর্চনা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়েছেন। পরে ছেলেটাকেই আর এক প্রস্থ আদর করে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন, বল তো আমি কে?

ছেলেটা বলতে পারেনি। কিন্তু আদরটা ভালো লেগেছে তার। জবাব দিয়েছে, তুমি দুষ্টু।

ছেলের দিদি হাঁ হয়ে তাদের অর্চনাদিকেই দেখছিল। এমন যেন আর দেখেনি। কিন্তু তারপর কানে যা শুনল, এগারো বারো বছরের মেয়ের তাতে বিস্ফারিত হয়ে ওঠারই কথা। অর্চনাদি তার ভাইকে ঝাঁকিয়ে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বলছেন, আমি মা। বল্ দেখি মা?

শিশুটি বলতে চায় না। বলবে কি করে। তার যে বাড়িতে আর একটা মা আছে। কিন্তু যার হাতে পড়েছে, নিষ্কৃতি নেই বুঝেই শেষে তাকে বলতে হল, তুমি মা।

হ্যাঁ, অর্চনা বসু সেই এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত দুনিয়াটাকেই বিস্মৃত করেছিলেন বোধ করি। তারপর হুঁশ ফিরেছিল। সচকিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মেয়েটা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। প্রায় ভয় পেয়ে গেছে যেন। সচকিত হয়ে শিশুকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অর্চনা। শুধু চকোলেট লজেন্স বিস্কুট নয়, রসগোল্লা সন্দেশ আনালেন। দু' গাল ভরে সব চিবিয়ে খুশিমনে ভাইকে নিয়ে বাড়ি চলে গেল মেয়েটি। তারপর মাকে বলল অর্চনাদির কাণ্ড। ভাইকে মা ডাকতে বলেছিল, সেই কাণ্ড।

মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মা কতটা জানলেন, তা তিনিই জানেন। তারপরে প্রথমে আচ্ছা করে ধমকালেন মেয়েকে। মফঃস্বল শহর, মহিলা সমিতির কল্যাণে অনেক শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় আছে। অর্চনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকুক, দেখেছেন অনেক। সমবয়সী একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে সেই রাতেই মা চুপি চুপি ব্যাপারটা বললেন। বললেন, কেমনধারা টিচার ভাই আপনাদের—বিয়ে-থা' করলেই তো পারে।

শিক্ষয়িত্রী কোন রকমে সে রাতটা কাটিয়ে পরদিন স্কুলে গোপনে আর দুই-একজনের কানে তুললেন কথাটা। এমনি গোপনে গোপনে ব্যাপারটা শুনলেন সহকারি হেড মিস্ট্রেস

এবং হেড মিস্ট্রেসও। অর্চনা বসু তার পরদিন স্কুলে এসেই সহকর্মিনীদের প্রচ্ছন্ন উত্তেজনাটুকু উপলব্ধি করেছেন। তাঁদের মুখ টিপে হাসা এবং আড়ে আড়ে চাউনিও দেখেছেন। শেষে হেড মিস্ট্রেস তাঁকে ঘরে ডেকে যখন বেশ সাদাসিদেভাবে বললেন, মেয়েদের বড় বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, অতটা করা ঠিক ভালো নয়—অর্চনা বসুর বুঝতে বাকি রইল না গত দিনের ব্যাপার কতটা গড়িয়েছে। ক্লাসে সেই মেয়েটির দিকে চোখ পড়তে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল সব।

মনে মনে অর্চনা বসু নিজের মৃত্যু কামনা করে কাটালেন ক'টা দিন।

কাজেই, একটা অজানা অচেনা ছেলে জলে ডুবে মরার দরুন অর্চনা বসু অমন উতলা হয়ে উঠেছিলেন কোন অনুভূতির ত্রাসে, সেটা মেয়েরা বুঝুক, শিক্ষয়িত্রীরা বুঝেছিলেন, বুঝে হেসেছিলেন, কিন্তু অবাকও হয়েছিলেন।

বাড়িতে সেই ঘটনার পর থেকেই অর্চনা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ। আর কোনো মেয়েকে বাড়িতে ডাকেন নি, আর কাউকে কোলেও তোলেন নি। গঙ্গার ঘাটের দুর্ঘটনার পর কয়েকটা দিন মাত্র সকলে অস্থির হতে দেখেছিলেন তাঁকে। তারপর আবার যেইকে সেই। যেমন স্থির, তেমনি শান্ত। ওরকম শান্ত বলেই যেন সাজ-সজ্জার শুভ্রতা আরো বেশি করে চোখে পড়ে। আরো দূরে ঠেলে দেয় সকলকে। শুধু মেয়েরা নয়, কাছাকাছি হলে শিক্ষয়িত্রীরাও অস্বস্তি অনুভব করেন কেমন।

অর্চনা বসু স্কুলে আসেন, পড়ান, বাড়ি যান।

বাড়িতে একটা বুড়ি ঝি আছে শুধু। সব ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মন বুঝে যখন তখন চা করে খাওয়ায় বলেই খুব খুশি তার ওপর। বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে মেয়েদের খাতা দেখতে বসে যান। রাত্রিতে বই পড়েন, নয়ত ছোট বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন চুপচাপ। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়েন। বুড়ির রান্না দেখেন, বয়েস কালে তার রান্নার হাতযশ কেমন ছিল সাগ্রহে শোনেন। নয়ত, বই নিয়ে বসেন আবার।

রাতে খাওয়ার পরেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েন। চোখে ভাত-ঘুম আসে, কিন্তু এক একদিন আসে না। আসবে না বুঝলেই তাড়াতাড়ি উঠে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েন আবার। শিশি-ভর্তি ঘুমের বড়ি মজুত থাকে বারো মাস। ঘুম আসে। কিন্তু এক একদিন তাও আসে না। বিবরাশ্রয়ীরা নড়ে চড়ে সজাগ হয়ে উঠতে চায় তখন, স্মৃতিপথে ভিড় করে আসতে চায় চোখের সামনে। প্রথম খানিকটা যোঝাযুঝি করে ঘুমুতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজেও জানেন সে চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা আসছে, তারা আসবে। এবারে হারিয়ে যাবার পালা। রাতের অন্ধকারে দু'চোখ টান করে ওরই মধ্যে এক নারীর বোবা আকুতি দেখার পালা। তার সঙ্গে এক হয়ে যাবার পালা—ওরই ভিতরে রাজ্যের আশা নিয়ে বসে আছে যে নারী, তার সঙ্গে। তিলে তিলে পুড়ে ছাই হচ্ছে সব আশা, কিন্তু তবু আশার শেষ নেই।

শেষ হবে কেমন করে? সেই জ্যোতির্ময়ের আশীর্বাদ মিথ্যে হবে কেমন করে? সে আশীর্বাদের অমৃত-ধারা যে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে এসেছিলেন অর্চনা বসু!

অন্তস্তলে কার যেন পদধ্বনি শুনেছিলেন মুহূর্তের জন্য। একটা সম্ভাবনার ধুক-ধুক স্পন্দন নিজের বুকের স্পন্দনের সঙ্গে এক হয়ে মিলেছিল। সেই সম্ভাবনার সম্পদ আঁকড়ে বসে আছেন সেদিনের সেই অর্চনা বসু।

আজকের মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অর্চনা বসু জানেন কোনো কালে সত্যি হবার নয় তা। বার বার নিজেকে বোঝান, ভ্রূকুটি করেন, চোখ রাঙান—। শেষে হাল ছাড়েন। স্মৃতিপথে যারা আসছে, আসবেই তারা। খরখরে দু'চোখ মেলে অর্চনা বসু দেখতে বসেন তাদের।

—কি কাণ্ডই না হয়েছিল সেদিন! বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গিয়েছিল একটা। ভাইদের উত্তেজনা, ছোট বোনের উত্তেজনা, মায়ের উত্তেজনা, আর সব দেখে অর্চনার নিজেরও। দাদা তো পারলে তক্ষুণি আর একটা বিয়ে দিয়ে দেন। হাতের কাছে তেমন পাত্র কি মজুত নেই নাকি?

আছে সকলেই জানে। এমন একটা দিনে তিনিও এসেছেন বইকি। ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন, আড়ে আড়ে তাকাচ্ছেন অর্চনার দিকে। তাঁর ফর্সা মুখ একটু বেশি লালচে দেখাচ্ছে আজ। ননীমাধব, দাদার ব্যবসায়ের পার্টনার—ছোট বোন বরুণা আড়ালে যাঁকে ভেঙচাতো ননীর পুতুল বলে।

মাত্র দু'ঘন্টা আগেও অর্চনা বসু ছিলেন অর্চনা মিত্র। মিত্রকে বরাবরকার মতো জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে আবার বসু হয়েছেন। কোর্টে রায় বেরিয়েছে। এ রায় বেরুবে সকলেই জানত। কারণ, দু'পক্ষেরই সমর্থনে এই বিচ্ছেদ, কোথাও কোনো ঝামেলা নেই। তবু ঘোষণাটা পাকাপাকি হওয়া মাত্র বাড়িতে যেন সাড়া পড়ে গেল একটা। শুধু বাড়িতে কেন, শুভার্থী আত্মীয়-পরিজনেরাও এলেন। আজকালকার দিনে এটা যে এমন কিছু ব্যাপার নয়, বার বার সে কথাই বলে গেলেন তাঁরা।

বাড়ির মধ্যে বাবাই শুধু চুপচাপ। তাঁর সমর্থন ছিল না অর্চনা জানতেন। সবাই জানতেন। কিন্তু তাঁকে আমল দিচ্ছে কে! হুট করে মেয়ের এরকম একটা বিয়ে দিয়ে বসেছিলেন বলেই তো এরকমটা ঘটল। মায়ের অমত ছিল, দাদারও আপত্তি ছিল। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর সঞ্চয়ের তহবিল জানতেন বলেই কারো কথায় কান দেন নি। স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন, কলেজের প্রোফেসার, বিদ্বান ছেলে, মেয়ে ভালো থাকবে দেখ। স্ত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু মাইনে যে মাত্র চারশ টাকা।

তিনি জবাব দিয়েছেন, চারশ টাকাই বা ক'জন পায়? তা'ছাড়া কালে আরও বাড়বে।

দু'হাজার টাকায় যাদের মাস চলে না, চারশ টাকায় কেমন করে চলবে, স্ত্রী তাই নিয়ে অনেক তর্ক করেছেন। বলেছেন, মেয়ে তাঁর কুৎসিত নয় যে সাত তাড়াতাড়ি এরকম একটা বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধাও দেন নি। তেমন পাত্র আনতে হলে টাকা কত লাগে নিজের ভাইয়ের মেয়েদের বিয়েতে সেটা দেখেছেন।

অর্চনা এম. এ. পড়তেন তখন। মেয়েদের ধরন-ধারণ মায়ের মত হলেও বয়সোচিত উদারতা ছিলই খানিকটা। অদেখা কলেজমাস্টারটির প্রতি খানিকটা যেন করুণাবশেই

বিয়েতে আপত্তি করলেন না অর্চনা। বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু ক'টা দিন না যেতেই উপলব্ধি করতে লাগলেন, মানুষটি করুণার পাত্র নন খুব। ছেলেবেলা থেকে সংসারে মায়ের প্রভাবটাই বড় দেখে এসেছেন। নিজের সংসারে সেটা বাতিল করে চলার পাত্রী নন অর্চনাও। চারশ টাকা মাইনের কলেজের মাস্টারের নিজস্ব সত্তার জোরটাকেই যেন বরদাস্ত করতে পারলেন না অর্চনা। প্রায় স্পর্ধার মতো লাগত। অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল। সুখেন্দু মিত্র—কি নামের ছিরি ! কার মাথা থেকে এল এমন নাম ! নাকের নিচে এক পোঁচ কালির মত ও কি ! আজকাল ওসব ছাই-ভস্ম রাখে কোনো ভদ্রলোক—কি টেস্ট ! পরিষ্কার করে কামিয়ে ফেলতে পার না ? প্যান্ট-কোট পরে কলেজ না করতে পার না-ই করলে, তাই বলে এরকম ধুতি আর এরকম পাঞ্জাবি !

সুখেন্দু মিত্র প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছেন সামঞ্জস্য বজায় রাখতে। স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষ। তর্কের ব্যাপার উপস্থিত হলেই বই নিয়ে বসতেন। কিন্তু কিছুকাল না যেতে এসব ছোটখাট ব্যাপার ছাড়িয়ে একটা বড় রকমের ঘা খেলেন তিনি। সুন্দরী এবং বিদুষী স্ত্রী লাভের মোহ তাঁর ছিল না এমন নয়। এক রাতের উষ্ণ প্রগলভ মুহূর্তে ছন্দপতন ঘটালেন। পরিষ্কার জানালেন, এই আয়ে সংসারে নতুন ঝামেলা যেন না বাড়ে—বিয়ে হয়েছে বলেই সেরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা উনি বরদাস্ত করবেন না।

সুখেন্দু মিত্র নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগলেন আস্তে আস্তে। অর্চনা মিটিং করেন, ক্লাবের শৌখিন থিয়েটারে নামেন, মায়ের সঙ্গে পার্টিতে যান। তাঁর খাতিরে সর্বত্রই নেমন্তন্ন থাকে সুখেন্দুবাবুরও। কিন্তু তাঁকে আর দেখেন না কেউ, অর্চনার কৈফিয়ত দিতে হয় বলেই বাড়ি এসে কৈফিয়ত নিতে ছাড়েন না। সুখেন্দুবাবু বই নামিয়ে অভিযোগ শোনেন। শুনে আবার বই তুলে নেন। এমন কি বাপের বাড়ির কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁর দর্শন পান না কেউ। পাঁচ কথা ওঠে। রাগে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি আসেন অর্চনা। ইচ্ছে করে বইয়ের রাশি ভস্ম করে ফেলতে। মাস্টার জাতটার ওপরেই ক্ষেপে ওঠেন তিনি। চেঁচামেচি করে ওঠেন কখনো। কখনো বা গুম হয়ে থাকেন। কিন্তু মনে মনে উপলব্ধি করেন, ঝগড়া-ঝাঁটি না করলেও মানুষটার গোঁয়ার ধরনের নিজস্বতা আছে একটা। ওই চুপচাপ বই পড়ার মধ্যে একটা অবজ্ঞা-মিশ্রিত হুল ফোটানোর স্পর্ধা দেখেন অর্চনা।

এমনি করে বছর না ঘুরতে বাপের বাড়ির সবাই, বিশেষ করে অর্চনার মা জানলেন, মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এই জানাটাকেই তিনি চেপে না রেখে বরং বড় করে তুললেন সকলের চোখে। মায়ের ক্ষোভে মেয়ের ক্ষোভ পুষ্ট হতে লাগল আরো। ওদিকে ওপরওয়ালার কারসাজি এমনি যে, অর্চনার বিয়ের পর থেকেই দাদার ব্যবসা যেন ফেঁপে উঠতে লাগল। ধুলো-মুঠি ধরলে সোনা হওয়ার দাখিল। ছোট বোন বরুণার জন্য এখন পাত্র দেখা হচ্ছে এমন জায়গায় যেখানে টাকার ওজনে মনের মতো ছেলে কেনা যায়। কাজেই মায়ের উদ্দেশে এখন দাদার উদার অনুযোগও কানে আসে অর্চনার, সাত তাড়াতাড়ি কেন যে তোমরা মেয়েটার এমন একটা বিয়ে দিতে গেলে—দু'দিন

সবুর করলে চলত না!

রুদ্ধ আক্রোশে মাসের বেশির ভাগ দিনই বাপের বাড়ি থাকেন অর্চনা। সত্যি কথা বলতে কি, টাকার অভাবটা তাঁর কাছে খুব বড় নয়। রাগ যত ওই মানুষটার ওপর। তাঁকে বশে আনতে পারছেন না বলে। কোনো সাধ্য যে নেই সেটা স্বীকার করে মাথা নুয়ে থাকেন না বলে।

এ অবস্থায় খুব তুচ্ছ একটা কারণ নিয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল একদিন। ঘটা করে দাদার জন্মদিন হচ্ছে। বৌদি নিজে এসে নেমন্তন্ন করে গেছেন। সুখেন্দু মিত্র যাবেন না, এমন আভাস একবারও দেননি। বরং যাবেন বলেই মনে হয়েছিল অর্চনার।

রাত্রিতে উৎসব-বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর হাত থেকে বই টেনে ফেলে দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন অর্চনা, আমি জানতে চাই এর অর্থ?

উঠে আগে বই কুড়িয়ে আনলেন সুখেন্দুবাবু। বসলেন আবার। চোখে চোখ রাখলেন। বললেন, কিসের অর্থ?

আমাকে এভাবে অপমান করার অর্থ কী?

একটু থেমে সুখেন্দুবাবু জবাব দিলেন, তোমাদের বাড়ি গেলে তোমার মা এমন ভাব দেখান আর এমন উপদেশ দেন যাতে আমিও খানিকটা অপমান বোধ করি।

রাগে জ্বলছে অর্চনা। অনেক টিকা-টিপ্পনী সহ্য করতে হয়েছে আজ তাঁকে। বললেন, আমার মা উপদেশ দেবে না তো উপদেশ দেবে বাইরের লোক এসে?

উপদেশ হলে কিছু বলতাম না, তিনি অপমান করেন। তা ছাড়া, তোমার ক্লাব থিয়েটার দাদার জন্মদিন—এসবে আমি ঠিক খাপ খাইনে।

অর্চনা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, খাপ খাও না সে সবাই জানে, কিন্তু মানিয়ে চলতে চেষ্টা করেছ কখনো? নিজের নেই বলে যাদের আছে হিংসেয় তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে চাও না, কেমন?

স্থির নেত্রে খানিক চেয়ে থেকে সুঁখেন্দুবাবু বললেন, হিংসে করার মতো তোমাদের কিছু নেই, সেটা বুঝলে এ কথা বলতে না। আমার মানিয়ে চলার থেকে তুমি আমার মতো একজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে কি না, সে কথাটাই তোমার আর তোমার বাবা-মায়ের আগে ভাবা উচিত ছিল।

এর পরে, অনেক দিন পরে, আর একবার একটি দিন মাত্র অর্চনা শেষ বোঝাপড়া করার জন্য তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। সোজাসুজি বলেছিলেন, বই নামাও, কথা আছে।

সুখেন্দুবাবু বই নামিয়েছেন।

অর্চনা বললেন, বিয়ের পর থেকে আমাদের বনিবনা হল না, সেটা বোধ হয় আর বলে দিতে হবে না?

সুখেন্দুবাবু বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তা হলে চিরকাল এভাবে চলতে পারে না বোধ হয়?

সুখেন্দুবাবু জবাব দিলেন না।

আমাদের তা হলে ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভালো, কেমন?

কি করে?

অর্চনা শান্ত মুখে বললেন, আইনে যেমন করে হয়।

হাতের বই টেবিলে রাখলেন সুখেন্দুবাবু। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে পায়চারি করলেন একবার। আবার বসলেন। ভাবলেন অনেকক্ষণ। অর্চনা জবাবের প্রতীক্ষা করছেন।

সুখেন্দুবাবু বললেন, যদি তাই চাও, আমার দিক থেকে কোনো বাধা আসবে না।

দু'পক্ষের অনুমোদনের ফলে যা ঘটবার সহজেই ঘটে গেল তারপর। বিচ্ছেদের পরোয়ানা বেরুল।

বাপের বাড়ির আবহাওয়া রীতিমত গরম সেদিন। দাদা ঘোষণা করলেন, শীগগিরই এবার এমন বিয়ে দেবেন অর্চনার যাতে গায়ে আর আঁচটি না লাগে সারা জীবন। মা থেকে থেকে জ্বলে উঠতে লাগলেন সেই অমানুষ লোকটার বিরুদ্ধে, যে একটা দিন শান্তিতে থাকতে দেয়নি তাঁর মেয়েকে—এবারে হাড় জুড়োবে। অর্চনার ছোট বোন বরুণার উত্তেজনা সব থেকে বেশি। তার দিদিকে হেনস্থা করেছে যে লোকটা, তার কত বড় শিক্ষা হল সেটা ভেবে ডগমগিয়ে উঠেছে থেকে থেকে। মাস ছয়েক আগে বরুণার বিয়ে হয়েছে, অদূরে বসে তার স্বামী বেচারি যে ওর আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনাটুকু করুণ নেত্রে লক্ষ্য করছে, সেদিকে খেয়াল নেই।

আর, ঘরের আর এক কোণে বসে ফর্সা মুখ রুমালে ঘষে প্রায় লাল করে তুলেছেন ননীমাধব।

দিন কাটতে লাগল। অর্চনা এম. এ. পড়তে শুরু করলেন আবার। একটা বছর মাত্র বাকি ছিল। পাস করলেন। পাস করেই আবার নতুন কোনো বিষয় নিয়ে পড়াশুনার তোড়জোড় করতে লাগলেন। কারণ, কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে। জীবন থেকে একজনকে ধুয়ে মুছে ফেলেছেন বটে, কিন্তু এ বিচ্ছেদে ভিতরের ক্ষোভ এতটুকু কমেনি। মর্মান্তিক কিছু একটা ঘটলে যেন খুশি হন। কিন্তু কিছুই ঘটল না। দিন যেমন চলছিল, চলতে লাগল। অর্চনার মনে হত, কি করছে সেই মানুষটা, মনে মনে কেমন জ্বলছে, জানতে পেলে হত। জানার উপায় নেই বলেই নিজে জ্বলতেন। তারপর ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসতে লাগলেন কেমন। পার্টি ভালো লাগে না; ক্লাব না, থিয়েটার না। বই পড়েন। কিন্তু বইও ভালো লাগে না সব সময়। তাঁর এই পরিবর্তনটা চোখে পড়ল সকলেরই। বিশেষ করে মায়ের। নতুন বৈচিত্র্যের সন্ধানে মাঝে মাঝে কিছু একটা প্রোগ্রাম করে মেয়ের মত নিতে আসেন তিনি। অর্চনা কখনো অকারণে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, কখনো বা নিস্পৃহভাবে চুপ করে থাকেন।

ওদিকে দাদার পার্টনার ননীমাধবের কদর বেড়েছে বাড়িতে। দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠছে ব্যবসা। সেই সঙ্গে ননীমাধবেরও গুণগান বাড়ছে। যে মা কোনোদিন আমল দেননি তাঁকে, সেই মা আজকাল রীতিমত খাতির করছেন তাঁকে। এলেই চা করে দেন, ভালো-মন্দ খবর নেন, কারণে অকারণে অর্চনাকে ঘরে ডাকেন। যে বরুণা

ভদ্রলোককে দেখলেই মুখ ভেঙচাতো ননীর পুতুল বলে, আর দিদির কাছে ঠাট্টা করত সীতার লক্ষ্মীমন্ত হনুমান বলে, সেও আজকাল ঠাট্টা তো করেই না, বরং কিছু একটা প্রত্যাশা নিয়ে ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে। পারলে একটু যেন তোয়াজ করেও চলে। আর দাদা বৌদির তো কথাই নেই। ননীমাধবের মতো এমন লোক তাঁরা একজনের বেশি দু'জন দেখেছেন বলে মনে হয় না।

দাদা বা মায়ের একটা বিশেষ ধরনের ডাক শুনলেই অর্চনা বুঝতে পারেন, ঘরে আর কেউ আছেন। এবং তিনি ননীমাধব ছাড়া আর কেউ নন। অর্চনার মনে যাই থাক বাইরে কিছু প্রকাশ পায় না। ডাকলে সাড়া দেন, ঘরে আসেন, কথা বলেন। আর, রুমালে করে বার বার মুখ মুছতে মুছতে একখানা ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠছে, তাও লক্ষ্য করেন।

অর্চনা আর বিয়ে করবেন না এমন কথা কখনো বলেন নি, বা এমন মনোভাবও কখনো প্রকাশ করেন নি। সেই বিবাহ-বিচ্ছেদের দিন থেকেই তাঁর আবার বিয়ের কথা উঠেছিল। বরং সেই ক্ষোভের মাথায় কাউকে এনে ধরে দিলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো হয়ত বা বিয়ে করেই ফেলতেন অর্চনা। কিন্তু সামাজিক চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সম্ভাবত প্রথম বছরাবধি সরাসরি এ প্রস্তাব তোলেন নি কেউ। তারপর তাঁর ভাবগতিক দেখে সামনাসামনি কথাটা তুলতে কেউ ভরসা পেয়ে ওঠেন নি খুব। যেটুকু বলেন, আভাসে ইঙ্গিতে। অর্চনা তার জবাবও দেন না।

কিন্তু যত দিন যায়, তাঁর বিয়ের কথা ভেবে তত অস্থির হয়ে পড়তে লাগলেন সবাই। ওদিকে ননীমাধবের হাজিরা দেওয়াটা প্রায় নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। মায়েরই গরজ বালাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিবাহ-প্রসঙ্গটা তিনিই প্রথম উত্থাপন করলেন মেয়ের কাছে। করে ধমক খেলেন। তারপর মায়ের তাড়নায় ভয়ে ভয়ে হাল ধরতে এল বরুণা। এসে সেও ধমক খেল। সব শেষে বৌদি। রঙ্গরস করে তিনি অগ্রসর হলেন, বলি ব্যাপারখানা কি ? রোজ রোজ ভদ্রলোক এসে মুখ শুকিয়ে বসে থাকেন, দেখে মায়াও হয় না একটু ?

অর্চনা খানিক চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে।—কি করতে বল ?

কি আবার বলব, বিয়েটা করলেই তো চুকে যায়।

অর্চনা তেতে ওঠেন ভিতরে ভিতরে। শান্তমুখে জবাব দেন, বিয়ে করব কোনোদিন তোমাদের বলেছি ? তা ছাড়া, করলেও একজন পুরুষমানুষকেই তো বিয়ে করব, না কি ?

তাজ্জব বনে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ভ্রাতৃবধূ। তারপর সরে পড়েন।

আরো একটা বছর ঘুরে এল। মুখে কেউ কিছু না বললেও অর্চনা কেমন করে যেন বুঝতে পারেন, ননীমাধবের সঙ্গে তাঁর বিয়েটা সম্পন্ন করার পিছনে আগ্রহ তাঁর দাদারই সব থেকে বেশি। শুধু বন্ধু নয়, এতবড় এক উঠতি ব্যবসায়ের অর্ধেক অংশীদার। তাঁকে আত্মীয়তার মধ্যে এনে ফেলতে পারলে ষোল আনা নিশ্চিন্ত।

দাদা বৌদি এবং বরুণার মধ্যে গোপনে গোপনে কি পরামর্শ হল ক'টা দিন। অর্চনা হঠাৎ শুনলেন, বেশ কিছুদিনের জন্য বেড়াতে বেরুবেন সকলে। দাদা জানালেন, বিশেষ করে অর্চনার জন্যেই কিছুদিন চেঞ্জে ঘুরে আসা দরকার, দিনকে দিন শরীর খারাপ হয়ে পড়ছে। আর, একঘেয়ে ব্যবসায়ের ঝামেলায় ক্লান্ত নাকি নিজেরাও। নিজেরা বলতে আর কে, না বললেও অর্চনা বুঝে নিলেন। দাদার মুখের ওপর আপত্তি করতে পারলেন না। এমনিতেও বাদ প্রতিবাদ আজকাল কারো সঙ্গেই করেন না বড়ো।

সদলবলে বেরিয়ে পড়া হল একদিন। দাদা বৌদি অর্চনা বরুণা আর ননীমাধব। দিল্লিতে দিন কতক থেকে যাওয়া হবে আগ্রায়। আগ্রায় আবার দিনকতক থাকা, তারপর প্রত্যাবর্তন।

কাছাকছি থাকার দরুন এবারে কিছুটা যেন সহজ হলেন ননীমাধব। তাঁর রুমালে করে মুখ মোছা কমতে লাগল। এর মধ্যে তিনজনই তাঁর দলে, সেটা অনেকদিনই জানেন। সুযোগ সুবিধে মত অর্চনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার অবকাশ তাঁরাই করে দেন। অর্চনাও সদয় ব্যবহারই করেন তার সঙ্গে। হেসে কথা বলেন। অর্চনা ইতিহাসের ছাত্রী। ইতিহাস-স্মৃতি বা ইতিহাস নির্দশনের প্রতি ননীমাধবের সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে হেসেই জবাব দেন, যা জানেন। অন্য তিনজনের শোনার থেকেও দেখার দিকেই ঝোঁক বেশি। কাজেই দেখতে দেখতে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে পড়বেন তাঁরা সে আর বিচিত্র কি।

দিল্লি-পর্ব সেরে আগ্রায় আসার মধ্যেই ননীমাধব অনেকটা ভরসা পেয়েছেন মনে মনে। তাঁর থেকেও বেশি ভরসা পেয়েছেন দাদা বৌদি বরুণা। আগ্রায় এসে ইতিহাসের আশ্রয় ছাড়াও অন্য দু'চারটে কথা বলতে শুরু করেছেন ননিমাধব। যেমন, বেড়াতে কেমন লাগছে, আজকাল কথা এত কম বলে কেন অর্চনা, ইত্যাদি। তাতেও বিরূপ হতে দেখা যায় নি অর্চনাকে। চতুর্থবার তাজহমল দেখতে দেখতে ননীমাধবের কথা শুনে তো বেশ জোরেই হেসে ফেলেছিলেন। ননীমাধব একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তাজমহল যে প্রেমের স্মৃতি-সমাধি, এখানে আসার আগে এমন করে কখনো মনে হয় নি—শাজাহানের দীর্ঘ নিঃশ্বাসগুলোই যেন জমে পাথর হয়ে আছে।

অর্চনাকে হঠাৎ এমন হেসে উঠতে দেখে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন ননীমাধব। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলেন। দাদা, বৌদি উৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছেন। অর্চনা হেসেই বলেছেন, কেন তোমরা রোজ এই তাজমহলে আস বল তো ? ভদ্রলোকের মন খারাপ হয়ে যায়।

এতদিনে দাদা সত্যিই বন্ধুর তারিফ করলেন মনে মনে। খুশির কানাকানি চলতে লাগল বরুণা আর বৌদির মধ্যে। সকলেরই একটা মনের বোঝা হালকা হয়ে আসছে।

পরদিনের প্রোগ্রাম ফতেপুর সিক্রি। মাইল পঁচিশ দূর আগ্রা থেকে। মোটরে চলেছেন সকলে। দূর থেকে ইতিহাসের স্মৃতি সমারোহের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল সকলেরই। অর্চনার দিকে আড়চোখে চেয়ে ননীমাধব নিঃশব্দ কৌতূহলেরই আভাস পেলেন শুধু।

মোটর থেকে নামতেই তিন-চারজন গাইড ছেঁকে ধরল তাঁদের। এ ব্যাপারটা

দিল্লিতেও দেখেছেন, আগ্রাতেও দেখেছেন তাঁরা। অদূরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একজন অতিবৃদ্ধ গাইড। শ্বেত কেশ, শ্বেত শ্মশ্রু। যোয়ানদের সঙ্গে ঠিকমত পাল্লা দিতে পারে না বলেই বোধহয় সবিনয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কেউ নিজে থেকেই ডেকে নেয় তাকে।

ডেকে নিলেন। কেন জানি তাকেই পছন্দ হল ননীমাধবের। বুড়ো মানুষ, দেখাবে শোনাবে ভালো। গাইড ঘুরতে লাগল তাঁদের নিয়ে। গল্প করতে লাগল। ইতিহাসের গল্প। এটা কেন, ওটা কি, ইত্যাদি। চোস্ত উর্দুর অনেক কথাই বুঝলেন না কেউ। চেষ্টাও করলেন না বুঝতে। গাইড তার মনে কাজ করে যাচ্ছে, অর্থাৎ বকে যাচ্ছে। এঁরা নিজের মনে গল্পগুজব করতে করতে দেখছেন। শ্রান্তও হয়ে পড়েছেন একটু। এই বিশাল স্মৃতি-প্রাচুর্যের যেন শেষ নেই। এক সময় ননীমাধবই মন্তব্য করলেন, কি উদ্ভট শখ ছিল আকবর লোকটার, এরকম একটা ছন্নছাড়া জায়গায় এসে এই কাণ্ড করেছে বসে বসে।

গাইড তাঁর কথাগুলো সঠিক না বুঝুক, বক্তব্য বুঝল। গল্পের ভণিতা শুরু করল আবার। শখ নয় বাবুজি, শাহেন শা বাদশা এখানে ফকির চিশ্‌তির দোয়া মেঙে সব পেয়েছিলেন বলেই এখানে এই সব হয়েছিল।

গাইডের বকর বকর শুনে বরুণার কান ঝালাপালা হয়েছে। হালকা মন্তব্য করে সে আগে আগে চলল। দাদা বৌদিও গাইডের কথায় কান না দিয়ে নিজেরা কথা বলতে বলতে চলেছেন। গাইডের পাশে অর্চনা, কাজেই তার পাশে ননীমাধব। গাইড বলতে লাগল, এই তামাম জায়গা তো জঙ্গল ছিল, কেউ আসত না, হাতি-গণ্ডার চরত। শাহেন শা আকবর যুদ্ধ-ফেরত এখানে এক রাতের জন্য আটকে পড়েছিলেন। এই ভীষণ জঙ্গলের গুহায় সাধন-ভজন করতেন এক পয়গম্বর পুরুষ—ফকির সেলিম চিশ্‌তি। এত বড় বাদশা তাঁকে দেখামাত্র কেমন যেন হয়ে গেলেন। তাঁর দোয়া মাঙলেন। শাহেন শার মনে ছিল বেজায় দুঃখ। খাস বেগম মরিয়মের দু'টো ছেলে হয়ে মরে গেছে—আর ছেলে হয়নি। তখত-এ-তাউসে বসবে কে ? কাকে দিয়ে যাবেন মসনদ ?

ফকির চিশ্‌তি বললেন, আল্লার ইচ্ছেয় বাদশাহের ছেলে হবে আবার। বেগমকে এইখানে নিয়ে আসতে বললেন সেলিম চিশ্‌তি। আকবর তাই করলেন। ন' মাস ছিলেন এখানে খাস বেগমকে নিয়ে। তারপর ছেলে হল। ছেলের মতো ছেলে। বাদশা জাহাঙ্গীর। আকবর গুরুর নামে ছেলের নাম রেখেছিলেন সেলিম। ফকির গুরুর আশ্রয়ে বসবাস করার জন্যেই সব জঙ্গল সাফ করে এখানে এত বড় রাজ দরবার গড়ে তুললেন বাদশা আকবর। ফকির বই বাদশা আর কিছু জানতেন না।

কখন যে নিবিড় আগ্রহে শুনতে শুরু করেছেন অর্চনা নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ কেন এমন করে স্পর্শ করল এই কাহিনী তাও জানেন না। শুনতে শুনতে একটি সমাধির কাছে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। মার্বেল পাথরের শুভ্র সমাধি লাল কাপড়ে জড়ান, চারদিকে নকশাকাটা পাথরের জালি দেওয়াল।

গাইড জানাল, এটাই ফকির চিশ্‌তির সমাধি।

অর্চনা দেখছেন চুপচাপ। আর কি যেন একটা অজ্ঞাত আলোড়ন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। দাদা বৌদি বরুণা সামনেই ঘোরাঘুরি করছেন। হঠাৎ অর্চনার চোখে পড়ল, সেই জালির দেওয়ালের অসংখ্য সুতো আর কাপড়ের সরু টুকরো বাঁধা। সুতোয় আর কাপড়ের টুকরোয় সমস্ত জালির দেয়ালটাই বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। অর্চনা গাইডকে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কী?

গাইড জানাল, যাদের ছেলে হয় না তারা ছেলের জন্য ফকিরের দোয়া মেঙে এই সুতো আর কাপড় বেঁধে রেখে যায়। কত দূর দূর দেশ থেকে নিঃসন্তান মেয়েরা সুতো বাঁধার জন্য এখানে আসে। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃস্টান সবাই আসে। ছেলে কামনা করে এখানে এসে ভক্তিভরে সুতো বেঁধে দিলে ছেলে হবেই। ফকিরের আশীর্বাদ কখনো মিথ্যে হয় না। দু'শ বছর হতে চলল, কিন্তু লোকের এ বিশ্বাসে ফাটল ধরেনি আজও। বহু বিচিত্র দৃষ্টান্ত শোনাতে লাগল গাইড।

অর্চনার কানে তার এক বর্ণও ঢুকল না। কি একটা সুপ্ত ব্যথা খচখচিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখ। ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। ফকিরের সব কথা ননীমাধব শোনেন নি। কিন্তু অর্চনার দিকে চেয়ে থমকে গেলেন তিনি।

—কি হল?

জবাব না দিয়ে সুতো বাঁধা সেই জালির দেওয়ালের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন অর্চনা। লক্ষ লক্ষ সুতো বাঁধা। প্রত্যেকটি সুতো যেন এক একটা রক্ত-মাংসের শিশু হয়ে দেখা দিতে লাগল চোখের সামনে।

কি এক অজ্ঞাত উত্তেজনায় অর্চনা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলেন এক একবার। আবার কাছে এগিয়ে এলেন ননীমাধব। জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, খারাপ লাগছে কিছু?

হঠাৎ যেন সচেতন হলেন অর্চনা। তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন, না— গরম লাগছে, একটু জল পান কি না দেখুন তো........।

হন্তদন্ত হয়ে জলের বোতলের সন্ধানে গেলেন ননীমাধব। ঘাবড়ে গেছেন তিনি। জলের তৃষ্ণা দু'চোখে এমন করে ফুটে উঠতে জীবনে আর দেখেন নি কখনো।

ননীমাধব পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অর্চনা একটা কাণ্ড করে বসলেন। ফ্যাঁশ করে দামী শাড়ির আঁচলটা ছিঁড়ে ফেললেন। বৃদ্ধ গাইডের বিমূঢ় চোখের সামনেই সেই শাড়ির টুকরো জালির দেওয়ালে বেঁধে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে সরে এলেন। দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখে উঠে এসেছে তাঁর। গাইড কয়েক নিমেষ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি বুঝল সে-ই জানে। টেনে টেনে বলল, ফকিরের দোয়া কখনো মিথ্যে হয় না মাইজি, শুচি মতো থেকো, আর বিশ্বাস কর।

জল নিয়ে এসে ননীমাধব হতভম্ব। কারণ, অর্চনা অন্যমনস্কের মতো বললেন, জলের দরকার নেই। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়েই কিছু একটা ঘটেছে বোঝা গেল। দাদা বৌদি বরুণাও অবাক। সকলেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কি হয়েছে।

অর্চনা কথা বলতে পারছেন না, নিজেকে আড়াল করতে পারছেন না বলেই বিব্রত হয়ে পড়ছেন আরো বেশি। ছেঁড়া শাড়ির আঁচল ঢেকে ফেলেছেন, তবু অস্বস্তি যায় না। অস্ফুট স্বরে জানালেন, শরীর ভালো লাগছে না, এক্ষুনি ফেরা দরকার।

তাড়াহুড়ো করে হোটেলে ফিরলেন সকলে। কিন্তু কি ব্যাপার ঘটে গেল হঠাৎ ভেবে না পেয়ে সবাই যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ননীমাধবকে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন সকলে। কিন্তু তিনিও বিমূঢ়।

অর্চনা ঘোষণা করলেন, সেই রাতের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরবেন। আবার আকাশ থেকে পড়লেন সকলে। কিন্তু তাঁর দিকে চেয়ে মুখে আর কথা সরে না কারো। স্থানীয় ডাক্তার ডেকে ব্লাড-প্রেসার দেখিয়ে নেওয়ার কথাও মনে হয়েছে সকলেরই। কিন্তু শোনা মাত্র অর্চনা রেগে উঠলেন এমন, যে কেউ আর একটি কথাও বলতে পারলেন না।

সারা পথ এক অধীর প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে ছটফট করতে দেখা গেল তাঁকে। বেশি রাতে সকলে যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, ননীমাধব কাছে এলেন। সত্যিকারের আকুতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বলবে না ?

অর্চনা সচকিত হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে। কিছু একটা ভাবনায় যেন ছেদ পড়ল। দু চোখ ছল ছল করে এল কেমন। অস্ফুট জবাব দিলেন, কি বলব..........।

এ ভাবে চলে এলে কেন ?

অর্চনা তেমনি অস্ফুটস্বরে বলল, আর কত দেরি করব—অনেক দেরি হয়ে গেছে যে।

ননীমাধব ভড়কে গিয়ে চুপ করে গেলেন একেবারে।

হঠাৎ এভাবে ফিরতে দেখে মা পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দাদা বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন, জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার মেয়েকে, আমরা কিছু জানি না।

দুপুরের দিকে দাদা বেরিয়েছেন। বরুণা শ্বশুরবাড়িতে দেখা করে আসতে গেছে। বৌদি রাতের ক্লান্তি দূর করছেন ।

অর্চনা চুপচাপ বেরিয়ে পড়লেন।

ট্রাম থেকে নেমে একটুখানি হাঁটা পথ। তারপর বাড়ি। দরজা বন্ধ। বন্ধই থাকে ......। কড়া নাড়তে লাগলেন। সাড়া নেই। আরো জোরে কড়া নাড়লেন। মনে মনে হিসেব করছেন, যতদূর মনে পড়ে, এ দিনটা অফ-ডে। না কি রুটিন বদলেছে কলেজের। কিন্তু তাহলে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ কেন, বাইরে তালা ঝোলার কথা।

ওদিক থেকে দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। শরীরের সমস্ত রক্ত আবার মুখে এসে জমছে অর্চনার।

দরজা খুলল। অর্চনা স্তব্ধ।

দুপুরের ঘুম-ভাঙা চোখে দরজা খুলল একটি মেয়ে। বিবাহিতা। স্রস্ত বেশবাস। কোলে একটি ফুটফুটে শিশু।

দরজা খুলে মেয়েটিও অবাক।

অর্চনা সামলে নিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, এ বাড়িতে কে থাকেন?

জিজ্ঞাসা করারও দরকার ছিল না। শিশুটির মুখের আদলে তার জবাব লেখা আছে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখেই মেয়েটি জানাল কে থাকেন।

—ও, অর্চনা হাসলেন একটু, আমি ঠিকানা ভুল করেছি তাহলে। হাত বাড়িয়ে শিশুর গাল টিপে দিলেন।—বেশ ছেলে তো........ আপনার? আপনাকে বিরক্ত করলাম বোধহয়? আচ্ছা নমস্কার।

কিছু জিজ্ঞাসাবাদের ফুরসত না দিয়ে ছেলের গালে আর একবার আঙুল স্পর্শ করে অতি আধুনিকার মতোই টক টক করে বেরিয়ে এলেন অর্চনা বসু।

* * *

পাখি ডাকা আবছা অন্ধকারে ভোরের আভাস। খর-খরে দু'চোখের ওপর দিয়ে আর একটা রাতের অবসান হল। অর্চনা বসু উঠবেন। হাত-মুখ ধোবেন। তারপর চেয়ারে বসে ঝিমুবেন খানিক। বুড়ি ঝি চা নিয়ে আসবে। পর পর দু'তিন পেয়ালা চা খেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াবেন তিনি। স্নান করে আসবেন। স্কুলের খাতা দেখে বা বই পড়ে কাটাবেন কিছুক্ষণ। তারপর শুচিশুভ্র বেশবাসে নিজেকে ঢেলে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হবেন। গাইডের শুচি মতো থাকার নির্দেশ ভোলেন নি।

আর, তার কথামত বিশ্বাসটাও দূর করে উঠতে পারেন নি।

একটি অভিশাপ

মিথিলার সমীপস্থ বনে এক আশ্রম। ঘন সবুজের নির্জন সমারোহ-তটে আর একটুখানি ছন্দোবদ্ধ সবুজের মতো। সমস্ত তমসার অবসান লেখা সেই তপোবনের রূপে। পুষ্প-ফল-সমন্বিত পুণ্য আশ্রম।

আশ্রমে বাস করেন ত্রিকালদর্শী মুনি মহাযশা গৌতম। মানুষের আচার-কলা-নিষ্ঠার নিয়ামক। মানুষের নীতি, মানুষের রীতির সংহিতাকার। স্থির চিত্ত, স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়, জ্যোতির্ময় পুরুষ।

আর থাকেন এক নারী। ত্রিভুবনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া সেই নারী। বিধাতার যত্নে সৃজিত, নিদ্রা-জাগরণ-স্মরণপথের মায়াময়ী মনোহারিণী। অগ্নিশিখার মতো বর্ণমদির, ভাস্বরদেহিনী, অনন্তযৌবনা।

কিন্তু সেই অপরূপার মর্মস্তলে বর্ষণোমুখ মেঘের মতো একখানি সঙ্গোপন বেদনা পুঞ্জীভূত । পূর্ণচন্দ্র প্রভার মত তাঁর দীপ্ত রূপও যেন সেই বেদনাভারে তুষারাবৃত। অতিদীর্ঘ কৃষ্ণ-তারা সজল-চঞ্চল দু'চোখ মেলে সেই রমণী ঋষিকে দেখেন। তাঁর প্রিয় ঋষিকে দেখেন চেয়ে চেয়ে। মহাতেজা তপোমগ্ন ঋষি। কখনো শিষ্য পরিবৃত জ্যোতির্জ্ঞানদানে রত। কখনো বা মানুষের রীতি-নীতি আচার-কলা-নিষ্ঠার সংহিতা

রচনায় মগ্ন। কিন্তু এ পৃথিবীর সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি নেই, অন্তরীক্ষে কি দেখার আনন্দে যেন স্থিরচিত্ত তিনি।

রমণী ভাবেন, এ কি অমোঘ নিয়মে বন্দী তাঁর প্রিয় ঋষি ! রমণীর মন কি নিয়মের বাইরে ? নিয়মের বাইরে রমণী মনের রীতি-নীতি ? একটা দিনের জন্যেও মর্ত্যের তৃষ্ণা, মর্ত্যের আকুতি দেখলেন না তাঁর প্রিয় ঋষির অচপল সন্ধানী ওই চোখের তারায়। দিনে আসে, সূর্য ওঠে। রাত্রি হয়, চাঁদ হাসে। আষাঢ়ের তপোবনে নেমে আসে নীল মেঘের ছায়া। শীত অবসানে প্রকৃতির তনুতে দেখা দেয় সবুজের আভাস। বসন্তের সৃষ্টি-সজ্জার সমারোহে সেজে ওঠে মহাবীর্যবতী বসুন্ধরা। মর্ত্যের এই কাল-চক্রাবর্তে বাঁধা পড়েননি। শুধু এক মর্ত্যের মানুষ—যিনি রচনা করেন মর্ত্যের রীতিনীতি নিয়ম-নিষ্ঠার সংহিতা। মানুষ নন, ঋষি। প্রিয় ঋষি।

এক নিস্পৃহ সম্পূর্ণতার সমাধিবেষ্টনে অচঞ্চল, অচপল। মর্ত্যের এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন রমণী, পরিপূর্ণতার ডালি নিয়ে ফিরে যান। কুটির অভ্যন্তরে চলে যান বাতান্দোলিত লতার মতো সৌন্দর্যের তনুভার নিয়ে।

এমনি করেই দিন গেছে, বছর গেছে, সহস্র বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়।

না তারও অনেক, অনেক আগে থেকে দেখে এসেছেন এই জ্যোতিঃসিদ্ধ অচঞ্চল মূর্তি। রমণী তখন শুধু কুটিরবাসিনী। কুটির সীমন্তিনী নন। আর ওই মহাতপা জিতেন্দ্রিয় ঋষি তখনো হননি প্রিয় ঋষি।...কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, হয়েছিলেন কিনা।

সেদিনের কথা বিমনা হয়ে ভাবেন রমণী। কেন শুধু প্রজা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হলেন না পিতা ব্রহ্মা ? কেন অস্তিত্বের নিঃসীম সৌন্দর্য আহরণ করে এই দেহতটে এনে বন্দী করলেন তাঁকেও ? সেই অনির্বাণ রূপে কোনো 'হল' নেই, কোনো বিরূপতা নেই বলেই খেয়ালী স্রষ্টা অহল্যা নামে ডেকেছিলেন তাঁকে। প্রাণ-চেতনায় দু'চোখ মেলে দেবতাদেরও চাঞ্চল্য উপলব্ধি করেছিলেন অহল্যা। মুগ্ধ কামনায় অধীর প্রশ্ন জেগে উঠেছিল তাঁদের দেব-নেত্রে। কার জন্য এই মনোমোহিনী সৃষ্টি ? কোন দেবতার ভোগ্যা হবেন ?

কিন্তু পিতা ব্রহ্মার বিচিত্র রীতি।

এই আশ্রমে, এই কুটিরে, এই ঋষির কাছে গচ্ছিত রেখে গেলেন তাঁকে। বলে গেলেন, শুধু সযত্নে লালন কোরো আমার মানসী কন্যাকে।

সযত্নে শুধু লালনই করেছিলেন ঋষি। তার বেশি কিছু মাত্র নয়। গচ্ছিত ধনকে আগলে রেখেছিলেন শুধু, কিছুমাত্র নয় তার বেশি। ভুবনমোহিনী নারীর অতি-দীর্ঘ কৃষ্ণ-তারা কত সময়ে আবদ্ধ হয়েছে ওই জ্যোতির্ধ্যানী মুখের ওপর। কিন্তু না। কোনো ব্যতিক্রম দেখেন নি অহল্যা। ওই বক্ষ অশান্ত হতে দেখেন নি এক মুহূর্তের জন্য। তপশ্চর্যায় বিঘ্ন ঘটেনি এক দণ্ডের জন্য। মানুষের রীতিনীতি আচার-সংহিতা রচনায় ছেদ পড়েনি একটি দিনের জন্যও।

তারপর সহসা একদিন ডাক পড়েছে তাঁর। ঋষি ডেকেছেন। সে আহ্বান যেন একটা স্পর্শ হয়ে বিহ্বল করে ফেলেছে তাঁকে। ধড়মড়িয়ে উঠেছেন অহল্যা।-

ঋষি ডেকেছেন, এসো।

কিন্তু এ ডাক যেন হিমগিরি নিঃসৃত একটা শব্দ ধ্বনি মাত্র।

তবু অহল্যার বিস্মিত নেত্রে একটুখানি জিজ্ঞাসার আশা।

ঋষি বললেন, তুমি গচ্ছিত ছিলে, এতদিনে সময় হয়েছে যাঁর কাছ থেকে এসেছিলে তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার।

নিষ্প্রাণ বহুমূল্য একখানি গচ্ছিত রত্নকেই যেন নিরাসক্ত চিত্তে ঋষি প্রত্যর্পণ করলেন ব্রহ্মার কাছে। দেবতারা সাধু সাধু করে উঠলেন ঋষির জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধির মাহাত্ম্য দেখে। কিন্তু অহল্যাদর্শনে দেবতাদের বাসনা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আবার। এবারে কোন দেবতাকে অর্পণ করবেন ব্রহ্ম এই মূর্তিমতী মাধুর্যময়ীকে?

দেবগণের রুদ্ধ-শ্বাস, কম্প্রবক্ষ, স্থির নেত্র।

কেবল সুরপতি ইন্দ্র ছাড়া। তিনি জানেন সুরশ্রেষ্ঠ তিনি। যোগ্যতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ব্রহ্মা নিঃসন্দেহে স্বপ্নদৃষ্ট ত্রিভুবনমোহিনী অহল্যাকে অর্পণ করবেন তাঁরই কাছে। অনঙ্গ নিপীড়িত মৃদু হাস্যে রমণীর রূপ লেহন করেন সুরপতি ইন্দ্র।

কিন্তু মর্ত্যের এই ঋষির প্রতিই দৃষ্টিপাত করলেন ব্রহ্মা। পুরস্কৃত করলেন তাঁকেই। বললেন, এবারে এই রমণীকে তুমি গ্রহণ কর।

শুনে দেবগণ হতাশাস্পৃষ্ট, সুরপতির আনন ভ্রূকুটিকুটিল।

আবার সেই বন-বীথিকার আশ্রম, আর সেই ঋষি। কিন্তু এক নয় ঠিক। অহল্যার প্রিয় কুটির, আর প্রিয় ঋষি। আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা গভীর দুটি চোখ মেলে অহল্যা আবারও চেয়ে চেয়ে দেখেছেন তাঁর প্রিয় ঋষিকে। ঋষি আনন্দিত। কিন্তু অহল্যা নির্বাক, সে আনন্দ সিদ্ধিলাভের—প্রাপ্তির নয়। এতকাল না পাওয়ার বেদনা যাঁকে স্পর্শ করেনি, এই পাওয়ার মাঝেও তিনি ঠিক তেমনি নির্বিকার। এই প্রাপ্তিতে মর্ত্যের কামনা, মর্ত্যের তৃষ্ণার চিহ্ন মাত্র নেই।

তেমনি এক মনে, এক ধ্যানে মানুষের রীতি-নীতি, নিয়মনিষ্ঠার সংহিতা রচনা করে চলেন ঋষি। অহল্যা এই নিয়মের অঙ্গীভূত হয়েছেন শুধু। যোগীর রসভাবে সহবাস থেকে বঞ্চিত হননি তিনিও। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ যিনি, কোনো রসের তৃষ্ণা নেই যাঁর, তাঁর কাছে এই পরিপূর্ণতার ডালি তো শুধু শুষ্ক নিবেদন মাত্র।

দিন যায়, বছর যায়, সহস্র বৎসরের অবসান হয়ে আসে আবার।

ঋষির দিকে চেয়ে চেয়ে মর্ত্যের অসম্পূর্ণতা অনুসন্ধান করেন অহল্যা। মর্ত্যের তৃষ্ণার প্রতীক্ষা করেন।

ওদিকে কামনায় অধীর হয়ে উঠেছেন সুরপতি ইন্দ্র। ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতায় মর্ত্যে নেমে আসতে হয়েছে তাঁকে। দেবতারা জানেন, তাঁদের রাজ্য নিরঙ্কুশ করার জন্যেই মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন ইন্দ্র। ঋষি গৌতমের মহা-সাধনায় বিঘ্ন না ঘটালে সুরপতির আধিপত্য নিঃশেষ হবে, রূপান্তর ঘটবে স্বর্গের রীতির। তাই গৌতমের শিষ্য হয়েছেন সুরপতি ইন্দ্র। ছলনা গূঢ় কৌশলে প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠেছেন। ঋষির অভিশাপগ্রস্ত হলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে স্বর্গের—ঋষির পক্ষে সে তো স্খলনেরই নামান্তর। দেবতারা নিজের গরজে

ইন্দ্রকে রক্ষা করবেন অভিশাপ থেকে, উপায় নির্ধারণ করবেন কিছু। ইন্দ্র নিশ্চিন্ত তাই।

কুটির-সীমন্তিনী অহল্যা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা উপলব্ধি করেন শুধু। কার অজ্ঞাত কামনার আঁচ লাগে, রোমাঞ্চ জাগায়। এই আঁচ, এই রোমাঞ্চ কাম্য। প্রিয় ঋষির দিকে চেয়ে থাকেন নির্নিমেষে। কিন্তু না। তেমনি উর্ধ্বলোকে, অন্তরীক্ষ পথে অনুপস্থিত তাঁর দৃষ্টি।

একদিন।

মহাকালের চক্রধারা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন ওই একটি দিন। অহল্যা বিমনা হয়ে পড়ছেন বার বার। এক অজ্ঞাত শিহরনের অনুভূতি চোখের কোণে অশ্রু হয়ে জমে উঠছে থেকে থেকে। মনে হচ্ছে কিছু যেন ঘটবে আজ। কালান্তক কিছু। এ কি তাঁর প্রিয় ঋষির অমঙ্গলের সূচনা কোনো? অহল্যা আনমনা হয়ে পড়েন আবার।

ঋষি নদীতে গেছেন উপাসনা স্নানে। পুণ্যস্নানে অন্তরলোকশুদ্ধির মার্জনায় মর্ত্যের আকর্ষণ শিথিল হবে আরো একটু।

কুটিরের মধ্যে সহসা সচকিত হয়ে ওঠেন অহল্যা। নির্জন বনপথের শুষ্ক পত্র-মর্মরে কার পদধ্বনি কানে আসে? পদধ্বনি অচেনা নয়। কিন্তু যেন চেনাও নয় ঠিক। প্রায় সঙ্গীতের মত লাগছে সেই ত্বরিত পদধ্বনি। প্রিয়া-বিরহক্লিষ্ট তৃষাতপ্ত আকুতি নিয়ে আসছেন যেন কেউ। প্রিয় ঋষি আসছেন। কিন্তু এই আসার মধ্যে মর্ত্যের সুর বাজছে কেমন করে? তাছাড়া, এরই মধ্যে তো তাঁর ফেরার কথা নয়!

কিন্তু তবু আসছেন তিনি সন্দেহ নেই।

তাড়াতাড়ি কুটির-আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন অহল্যা। ঋষি এলেন। হাতে কমণ্ডলু। সদ্যস্নাত। কিন্তু সে-স্নান অসমাপ্ত বোঝা যায়। সর্বাঙ্গে তাঁর ব্যাকুল প্রত্যাশা, দুই চোখে মর্ত্যের কামনা, মর্ত্যের তৃষ্ণা।

অর্ধ বিস্ময়ে, অর্ধ বিশ্বাসে অহল্যা স্তব্ধ ক্ষণকাল। মৃগী চোখের ক্ষণ-বিহ্বলতায় চেয়ে থাকেন ঋষির দিকে।

ঋষি হাসছেন মৃদু-মন্দ। সেই হাসিতে মর্ত্যের আমন্ত্রণ, মর্ত্যের নিবিড়তা। বহু যুগের প্রবাস অবসানের নির্নিমেষ বিহ্বলতায় দেখছেন যেন আপন প্রিয়াকে। চন্দ্রকর আর পুষ্প সৌরভকে শরীরী করে গড়ে তোলা নারীকে দেখছেন প্রথম-দর্শনের নির্বাক ব্যাকুলতায়।

সেই অবকাশে ঋষিকে নিবিড় করে পর্যবেক্ষণ করে নিলেন অহল্যা।...ঋষি, তাঁরই প্রিয় ঋষি বটে। তাঁরই বহু প্রত্যাশিত মর্ত্যের তৃষ্ণা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু এমন লাগছে কেন? ওই কুন্দ-ধবল ঋষি অঙ্গে কোথায় দেখা এক পিঙ্গল জ্যোতির আভা জাগছে কেন? নিরাভরণ কর্ণদ্বয়ে যেন চেনা দুটি মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতির আভাস কেন? ঋষি আননের দিকে চেয়ে চেয়ে চেনা একটা কণ্টক পাশের ছায়া চোখে ভাসছে কেন? কমণ্ডলুধরা হাতে কেন দেখছেন বজ্রায়ুধের গোপন শক্তি? ঋষিবেশে প্রচ্ছন্ন দেখছেন কেন এক যুদ্ধনিপুণ ঝটিকাপ্লাবন প্রাকৃতিক অধিষ্ঠাতার ছদ্ম সাজ? আর ওই

প্রণয়াভিলাষী দুই চোখের গভীরে কেন অমরাবতীর সোমাসক্ত আবেশ?

কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে ঋষি। অহল্যার প্রিয় ঋষি। যাঁর চোখে মর্ত্যের চাতক-তৃষ্ণা। অহল্যার সহস্র বৎসরের প্রতীক্ষিত।

সহসা সচেতন হলেন অহল্যা। স্ফুরিত-বিম্বাধরে হাসির ঝলক দেখা দিল। নিবিড় কটাক্ষপাত করলেন ঋষির প্রতি। সেই বিদ্যুদ্দামস্ফুরণচকিত কটাক্ষ, অপাঙ্গ অর্ধদৃষ্টি, যোগী-মুনি-যুবা-বৃদ্ধ-বিভ্রমী ওষ্ঠ দর্শনের পুলকিত শিহরনে ঋষির মর্ত্য-কামনা উদ্বেলিত।

এমন অসময়ে ফিরলে?

ঋষি বললেন, স্নান সম্পন্ন হল না, তোমার সহস্র বৎসরের ব্যর্থ প্রতীক্ষা হঠাৎ যেন শুনতে পেলাম ভরা নদীর হাহাকারে। পয়ঃস্বিনীর ঢেউ বার বার আমাকে ঠেলে দিতে লাগল এই কুটিরের দিকে। আজ ধন্য আমি, নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম তোমাকে, আমাকে বিমুখ কোরো না।

অহল্যা হাত ধরলেন তাঁর। ডাকলেন, এস।

তারপর প্রকৃতির রুদ্ধ বাতাসে তপোবনের পল্লব-মর্মর নিথর হয় কিছুক্ষণের জন্য। শিরিষ শাখায় ফাগুন স্তব্ধ হয়ে থাকে। শাল-তাল-তমালের মূক ছায়া দীর্ঘতর হয়ে অসময়ে কুটির প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ঋষি বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন। অসমাপ্ত স্নান সমাপন করতে যাবেন এবার। কিন্তু অন্তস্তলের এক গোপন উল্লাস ঋষিঅঙ্গে সেই চেনা পিঙ্গলের আভা ছড়াচ্ছে। অহল্যার দীর্ঘায়ত নেত্র-পল্লব ঋষির মুখে স্থির সংবদ্ধ। শান্ত মুখে প্রশ্ন করলেন, তৃপ্ত হয়েছে বাসব?

বাসব! শোনামাত্র দারুণ বিস্ময়ে চমকে উঠলেন বাক্যাহত ঋষি। আবার নতুন করে দেখলেন যেন চম্পকদাম-বর্ণ ফুলেন্দীবরতলচক্ষু নারীকে। বিহ্বল প্রশ্ন করলেন ফিরে, আমাকে চিনেছিলে তুমি?

চিনেছিলাম বাসব।

ঋষিবেশী বাসবের সোমসক্ত নেত্রদ্বয় নারীতনুহরণের আনন্দস্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ঈষৎ বক্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, চিনেও আমাকে গ্রহণ করেছ?

অহল্যা বললেন, তুমি চতুর বাসব। আমার প্রিয় ঋষির মূর্তিতে সহস্র বৎসরের প্রতীক্ষার রূপ নিয়ে এসেছ তুমি। আমিও তৃপ্ত। কিন্তু তুমি চলে যাও বাসব, ঋষির প্রত্যাবর্তনের সময় হল, তাঁর কোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করো।

দ্রুত প্রস্থানোদ্যত হলেন ঋষিরূপী বাসব।

কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে। আশ্রমের আঙিনায় এসে পড়েছেন অমিত বীর্যবলের আশ্রয়নিবন্ধন দেবগণেরও দুর্ধর্ষ দীপ্ততেজা ঋষি গৌতম। পুণ্যতীর্থ সলিলে সিক্ত দেহ আজ্যসিক্ত অনলের মতো রুদ্র-নেত্র গৌতম। হাতে কুশ ও সমিধ। আশ্রমের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসছেন। যথার্থই আজ পুণ্য-স্নান সমাপন হয়নি তাঁরও। যথার্থই আজ পুণ্য পয়ঃস্বিনীর ঢেউ অসময়ে তাঁকে ঠেলে দিয়েছে কুটিরের দিকে।

গৌতমের অভিশাপ নিয়ে নতশিরে বিষণ্ণবদনে প্রস্থান করলেন সুরপতি ইন্দ্র।

তারপর রুদ্ধ রোষে ঋষি তাকালেন ভার্যা অহল্যার দিকে। শত সহস্র বৎসরের ধ্যানী স্থৈর্য ধূলিসাৎ হল এক মুহূর্তে। অভিশাপ দিলেন, তুমি অস্থিরচিত্ত অনন্তরূপযৌবনসম্পন্না—সকলের অদৃশ্য, শুধু বায়ুভুক পাষাণের স্থিরতায় বন্দী হ'য়ে থাকো।

মূক বেদনায় নিস্পন্দ আছন্ন বন-তপোবন।

স্থির অচঞ্চল পাষাণময়ী অহল্যা দু চোখ মেলে তাকালেন প্রিয় ঋষির দিকে। অনেকক্ষণ...। অস্ফুট প্রশ্ন করলেন, এ অভিশাপের কি অবসান হবে কখনো?

অভিশাপ-বাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্যের বিরহ যেন স্পর্শ করছে মানুষের নিয়ম-নিষ্ঠা রীতি-নীতি-সংহিতাকার ঋষি গৌতমের অন্তরে অন্তরে। অহল্যার কণ্ঠস্বর আজ এই প্রথম যেন একটা অনুভূতি হয়ে প্রবেশ করল তাঁর মর্ত্য-হৃদয়ের গভীরে। কণ্ঠস্বরে অশ্রুর ছোঁয়া লাগল নিজের অজ্ঞাতে। বললেন, আজ থেকে সহস্র বৎসর পরে শ্রীরামের পুণ্যপাদস্পর্শে তোমার মুক্তি।

সর্ববিরূপতামুক্ত অহল্যার শান্ত অচপল দৃষ্টি তেমনি নিবদ্ধ ঋষির মুখের ওপর। জিজ্ঞাসা করলেন, সে-মুক্তির পর আবার কি মিলন হবে?

গৌতমের অন্তস্থল উদ্বেলিত হয়ে উঠল আবারো। ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, হবে, আমি প্রতীক্ষা করব।

যুক্ত করে প্রণাম-আনত হয়ে অভিশাপ গ্রহণ করলেন অহল্যা। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, তোমার সে প্রতীক্ষা যেন এই মর্ত্যের প্রতীক্ষা হয় প্রিয় ঋষি।

মল্লিকা

পাঠক অবাস্তব বলবে।

ভবানী ঘোষাল বলেছিল, 'মডার্ন গল্পে বাস্তবের বাতাস ঠেসে দিতে না পারলে, চেনা-পরিবেশের ছবি তুলে ধরতে না পারলে, এমন কি নায়ক-নায়িকার পরিচিত গায়ের গন্ধ ফুটিয়ে তুলতে না পারলে মডার্ন গল্পে কল্কে পাবে না। বাট্ দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন্ হেভেন অ্যান্ড আর্থ.....'

ভবানী ঘোষালের কলেজের বন্ধু, কিন্তু তাকে ঠিক-ঠিক আবিস্কার করেছি এই প্রৌঢ় বয়সের মাঝখানে পা দিয়ে। কলেজের ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক সে এখন, পড়ানোয় নাম-ডাক আছে, আজকালকার ছাত্র-ছাত্রীরাও তাকে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি করে।

অনেককাল বাদে উত্তর ছেড়ে একেবারে দক্ষিণ কলকাতায় ওদেরই পাড়ায় বাড়ি বদলাবার ফলে আবার যোগাযোগ। বয়েসকালে অর্থাৎ কলেজ ছাড়ার পর দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর দেখা-সাক্ষাৎও হয়নি। আমাকে ভবঘুরে নেশায় পেয়েছিল, চাকরিও করেছি বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে। আর ভবানী মাত্র বছর খানেকের জন্য বিবাগী হয়েছিল

শুনেছি, তারপরেই ফিরে এসে যথারীতি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হয়েছে আর সেই থেকে পরম সুখে স্ত্রীর বহু দাপট সহ্য করে তেত্রিশ নম্বর গোল্ড রোডস্থ নিজ আবাসের এই চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে আছে।

কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের এই দ্বিতীয় যোগাযোগ আগের থেকে অনেক বেশি ঘনীভূত হয়েছে। হজমের তাগিদে দু'বেলা একসঙ্গে লেকে বেড়ানর ঘনিষ্ঠতার দরুন নয়। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে কালে দিনে ভবানী ঘোষাল যে এমন এক রসের খনি হয়ে উঠেছে ধারণা ছিল না। রসের খনি ছেড়ে গল্পের খনিও বলতে পারি। আর চুপি চুপি স্বীকার করতে বাধা নেই, ইদানীং কালের আমার কিছু কিছু গল্পের সম্মান দক্ষিণার একটা মোটা অংশ তারই প্রাপ্য। ইংরেজি আর বাংলা ছাড়া ফরাসি আর রুশ ভাষায়ও ভালো দখল আছে। তাই পাঁচটা কাগজ থেকে পাঁচমিশেলি চুটকি সংগ্রহ করে সত্য বলে নির্বিবাদে যে-সব কাল্পনিক গল্প চালিয়ে দেয় কথায় কথায়—তাতে আমার মাথায় অনেক রকম আইডিয়া খেলে। কিন্তু হৃদ্যতা সত্ত্বেও এই স্বার্থের দিকটা গোপন। আমার ধারণা, ভবানী ঘোষাল যদি কলেজের অধ্যাপক না হয়ে গল্প লেখার কলম ধরত, ওর প্রতিষ্ঠা অনেক গুণ বেশি হত।

আমি জানতাম স্ত্রী রগচটা বা মুখরা হলে স্বামী বেচারাদের ভেড়ার গোত্রের সঙ্গে কিছুটা মিল চোখে পড়ে আর ভিতরে ভিতরে যা কিছু সবুজ তার সবটাই জ্বলে যায় বা ঝলসে যায়। আর অমন স্ত্রী আগে চোখ বুজলে (যা খুব কমই হয়) গো-বেচারা স্বামী তখনো কাঁদে তার কারণ হঠাৎ-শেকল-ছেঁড়া অনভ্যস্ত স্বাধীনতা প্রায় অসহ্য লাগে।

কিন্তু ভবানীর বেলায় এর চাপা ব্যতিক্রমটুকু চোখে পড়েই। চাপা তার কারণ, বাইরের হাব-ভাব আর আচরণে ওই নিরীহ গো-বেচারী জীবের সঙ্গে গোত্র মেলে। কিন্তু স্ত্রীর অত দাপট উল্টে তার ভিতরে যেন কাঁচা সবুজের রঙ যুগিয়ে চলেছে। আড়ালে মনের আনন্দে হেসে ওঠার মতই টিকা-টিপ্পনী কাটে, আবার সামনা-সামনি হলে চোখের পলকে সেই মুখেরই ভোল বদলে স্ত্রীর শাসন বা অভিযোগে একবাক্যে সায় দেয়। শোনা মাত্র স্বর্গের স্বয়ং শচী দেবীর শাসন বলে মানে। কিন্তু স্ত্রীটিও বোধ হয় ওই গো-বেচারা স্বামীর মুখ একটু-আধটু চেনে। সায় পেয়েও অনেক সময় সন্দিগ্ধ চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখা গেছে মহিলাকে।

আমার অনেক সময় মনে হয় সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় মহিলাকে। অত শাসন বা অনুযোগ অভিযোগ বাতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। নইলে সুখের নির্ঝঞ্ঝাট সংসার, একটা মাত্র মেয়ে আর একটা ছেলে। মেয়ে বড়, বি.এ. পড়ছে। বেশ হাসি-খুশি মেয়ে, বাপের মতই ফুর্তি আর মুখে হাসি। ছেলের বয়েস তেরো, স্কুলে পড়ে। কলেজের অধ্যাপকের টান-ধরা অবস্থা নয়, রীতিমত সচ্ছল অবস্থা। তেত্রিশ নম্বর গোল্ড রোডের এই গোটা বাড়িটাই নিজেদের। নীচের তলার দোকানঘরগুলো আর দুটো ফ্ল্যাট থেকে মাসে যা ভাড়া আসে, তাতেই স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে। দোতলায় ফেলে ছড়িয়ে নিজেরা থাকে—নিজেদের শোবার ঘর, আলাদা দুটো বসার ঘর, খাবার ঘর, ছেলে-

মেয়ের আলাদা আলাদা শোবার ঘর আর পড়ার ঘর—দোতলায় উঠলেই খালি-খালি লাগে। অবশ্য গৃহিণীর মেজাজ যদি ঠাণ্ডা থাকে। নিজেদের সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও আছে একটা। কিন্তু এই সুখ আর সচ্ছলতা সত্ত্বেও মহিলাকে অলস বললে অবিচার করা হবে। দেড় মাইল দূরের এক মেয়েস্কুলের সহকারি হেডমিস্ট্রেস সে এখন। ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও চাকরি নিয়েছিল। মাসে আড়াই শ' তিন শ' টাকা এখন নিজেও উপার্জন করে।

গৃহিণীর এ-রকম দাপট আর শাসনের মেজাজ স্কুলে মেয়ে ঠেঙানোর ফল কিনা বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে গম্ভীর মুখেই জবাব দিয়েছে, না, এতে ওর আর আমাদের সকলেরই স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

লক্ষ্য করেছি, এই শাসন-পর্ব সব থেকে বেশি চলে বেচারী মেয়েটার ওপর। আর তার অবধারিত ঝাপটা এসে লাগে তার বাপের গায়ে। মেয়ের অপরাধের সঙ্গে বাপ সদা যুক্ত। চোখ-কান বুজে ভালো করে না জেনেই মেয়ের অপরাধ সম্পর্কে সুবোধ বালকের মতো সায় দেওয়ার পরেও ওই বাপের ওপর ঝলসে উঠতে দেখা গেছে মহিলাকে। মেয়ের মতি-গতির যা কিছু মন্দ, সব বাপের দোষে। বাপ আব মেয়ে ভিন্ন ছেলেকে খুব শাসন করতে দেখি না।

এদিকেও বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। সে বলেছে, মেয়েটা আমাব, ছেলেটা ওর।

নিঃসঙ্কোচ হাসিমুখেই মানে বুঝিয়েছে ভবানী ঘোষাল। মেয়ে হবার পর বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আর ছেলেপুলে চায় নি ভবানীগৃহিণী। বেচাল দেখলেই মুখঝামটা দিয়েছে, আবারও হয়ত একটা মেয়েই আসবে—দরকার নেই। ভবানী ঘোষাল বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ছেলেও তো আসতে পারে।

কিন্তু কয়েক বছরেব মধ্যে বোঝান সম্ভব হয়নি। শেষে নিজে থেকেই একদিন বলেছে, ছেলে হলে আপত্তি নেই......কিন্তু মেয়েই যদি হয় আবার?

ভেবে-চিন্তে ভবানী ঘোষাল মনের আশা প্রকাশ করেছে, বলেছে, হয়ই যদি কিছু আমার তার বিশ্বাস ছেলেই হবে।

পরে গলা আরো খাটো করে মন্তব্য করেছে, মিঠু হবার আগে দুশ্চিন্তায় ক'রাত ঘুমোই নি জান?.... ভগবানের দয়ায় ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে এতদিনে আমার সাক্ষাৎ তুমি হিমালয়ে ছাড়া আর কোথাও পেতে না।

শুনলে হাসি চাপা দায়।—গিন্নীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করব নাকি সত্যি বলছ না মিথ্যে বলছ?

বন্ধু নির্লিপ্ত জবাব দিয়েছে, আমাকে বাড়িছাড়া করতে চাও তো ডাক।

মহিলার রাগের ডিগ্রী বিশ্লেষণও মুখরোচক। গৃহিণীর কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে বসে সেই বিশ্লেষণও বন্ধুই শুনিয়েছে। সে চা বা কফির ভক্ত। আমিও তাই। বাড়িতে দুই-ই মজুত থাকে। আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে একাধিক বার আর একটু 'চা-টা পেলে হত' গোছের আবেদন পেশ করা হয়। কফি এলে বন্ধু আরো বেশি খুশি হয়, কিন্তু

আবেদনের বেলায় সর্বদা 'চা-টা' ভিন্ন আর কিছু বলে না। এখন চা আসবে কি কফি আসবে সেটা এলে বোঝা যাবে।

এই প্রসঙ্গ থেকেই বন্ধু তার গৃহিণীর মেজাজ আঁচ করার রাস্তা বাতলে দিয়েছিল। বলেছে, ভিতরের তাপ খুব বেশি থাকলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফায় 'চা-টা' চাইলে তুমি কফির মুখ দেখবে না, চা-ই পাবে, আর সেই চায়ের দুধ চিনি বা লিকারে অবধারিত গরমিল দেখবে। মেজাজ সাধারণভাবে বিগড়ে থাকলে মোটামুটি ভালো চা পাবে। বিগড়নো মেজাজ একটু ভালোর দিক ঘেঁষতে থাকলে কফিই পাবে হয়ত, কিন্তু তারও দুধ-চিনি-লিকার তোমার মনের মতো হবে না। আর মেজাজ যদি সত্যি সত্যি প্রসন্ন থাকে দৈবাৎ কখনো, কফি তো পাবেই, বেশ ভালো কফি পাবে— চিনি-দুধ-লিকারের সুসম বন্টনে তার স্বাদ তোমার জিভে লেগে থাকবে।

আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম, কেন, অনেকদিন মেয়ে বা তোমার ওপর গনগনে রাগের মুখেও তো বেশ ভালো কফিই পেয়েছি।

—সেটা তাহলে সত্যি সত্যি গনগনে রাগ নয়। গানের গলা ভালো রাখতে হলে নিয়মিত তালিমের দরকার হয়, মেজাজের ধাত আর ধার বজায় রাখতে হলেও তেমনি তালিম দিতে হয়।

বিশ্বাসঘাতকতা করে এই মেজাজের বিশ্লেষণ একদিন মহিলার কানে তুলেছিলাম। ফলে নিজেও অপ্রস্তুত। কম করে আধ ঘণ্টা নানা অভিযোগ বিস্তারে মহিলার তপ্ত রসনা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বন্ধু ততক্ষণ ধরে তার সামনে ড্রয়ার খুলে সমনযোগে কোনো অপ্রাপ্য জিনিস খুঁজছিল। আর তার ঘন্টাখানেক বাদে বেশ ভালো কফিই জুটতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে একসঙ্গেই হেসে উঠেছিলাম। বলা বাহুল্য সেটা মহিলার উপস্থিতিতে নয়।

বেড়িয়ে ফিরে সন্ধ্যার আগে দোতলায় উঠেই দেখি হাওয়া গরম। একসঙ্গেই ফিরেছি দুজনে। ইশারায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার ?

বন্ধু চাপা গলায় জবাব দিল, বিকেলে বেড়াতে বেরুবার আগেই শুরু হয়েছিল, ঘুরে ফিরে তাই চলছে বোধ হয় এখনো—চলে এস।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ভবানী ঘোষাল নিজের ঘরে ঢুকে গেল। আমার অত সহজে পা নড়ল না। সিঁড়ির বারান্দা থেকে আধ-ভেজান জানালা দিয়ে অলক্ষ্যে ওই ঘরের ভিতরে চোখ চালাতে চাইলে চলে। মহিলার গলার ঝাপটা আগেই কানে এসেছিল, একটু ঝুঁকতে ভিতরের দৃশ্যও চোখে পড়ল। খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে গম্ভীর মুখে মেয়ে বসে আছে, আর সামনে দাঁড়িয়ে তার মা চোখ দিয়ে তাকে ভস্ম করতে চেষ্টা করছে। সেটা সম্ভব নয় বলেই গলার আশ্রয় নিতে হল হয়তো।—এতক্ষণ ধরে বকে মরছি, এত সাহস যে তোর কানেই ওঠে না। এতখানি সাহস হয়েছে আজকাল, অ্যাঁ ? ঢং করে তোর ওই কলেজে যাওয়া-আসা আমি বন্ধ করে দেব, বুঝলি ? দেখব কার কত সাহস আমার অমতে তোকে কলেজে পাঠায় এরপর, ভালো চাস তো যা

বললাম, বল এখনো—।

মেয়ের প্রতিবাদ শোনা গেল, কতবার তো বললাম সেই থেকে —

—কতবার বললাম। আমার পেটে হয়েছিস তোকে আমি চিনি না? ফাঁক পেলে ইচ্ছে করেই তুই ও-ভাবে আসিস আমি জানি না? আমি জানতে চাই, ঠেকে না পড়লে আর ওভাবে আসবি না বলে তুই আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবি কিনা?

— আচ্ছা, ও-রকম প্রতিজ্ঞা করা উচিত কিনা আগে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে নিই।

— কি? কি বললি তুই?

দৃশ্য দেখার লোভেও এর পর আর প্রতীক্ষা করা নিরাপদ মনে হল না। সরেই এলাম।

মেয়ের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, হাব-ভাব, বেড়ান, কলেজে যাওয়া এবং ফেরা, সিনেমা দেখা—সবকিছু নিয়েই মায়ের সঙ্গে লাগে জানি। খর-প্রহরার একটা চোখ মেয়ের ওপর সর্বদাই ন্যস্ত। কিন্তু আজকের তপ্ত প্রবাহের কারণ ঠিক বোঝা গেল না। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়ার হেতুটা কি?

ঈষৎ বিরক্তির সুরে ভবানী ঘোষাল বলল, সেই থেকে মেয়েটাকে অস্থির করে ছাড়লে একেবারে। দোষের মধ্যে এক ঘণ্টা আগে ছুটি হতে গাড়ি পৌঁছনর আগেই মেয়ে বাসে চেপে বাড়ি চলে এসেছে—অনেকদিন বারণ করেছে শোনে নি, আজ একেবারে টুঁটি চেপে ধরেছে।

ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ছেলে ঘরের ভিতরে একবার গলা বাড়াল। ভবানী ঘোষাল ডাকল তাকে, মিঠু শোন তো, মা-কে গিয়ে বল কাকাবাবু ডাকছেন একটু—

ছেলে চলে যেতে আমি ঘাবড়ে গিয়ে তার দিকে তাকালাম।

—যা হোক কিছু অন্য কথা বলে তাল কেটে দাও দেখি, নইলে এ শিগগির থামবে না, মেয়েটা এর পর কাঁদতে শুরু করলে আবার উল্টো ফ্যাসাদ।

একটু বাদে মহিলা ঘরে এসে দাঁড়ালেন। চোখ দিয়ে ওই মুখের তাপ মাপলে ঘাবড়াবার কথা। কিন্তু এ-স্থলে মাপতে যাওয়া দ্বিগুণ কাপুরুষতা। অতএব চোখ-কান বুজে বলে ফেললাম, কলকাতার শহরে হাজার হাজার মেয়ে বাসে চেপে কলেজে যাতায়াত করছে, আপনার মেয়েও তাই করেছে বলে সেটা আপনি এতবড় অপরাধ ভাবছেন কেন?

যা-হোক কিছু বলে তাল কাটার নমুনা শুনেই বন্ধুর চোখে-মুখে অব্যক্ত ত্রাস। আর সেই সঙ্গে বন্ধু-পত্নীর রাগ-রক্ত মুখের বিচিত্র বিন্যাস। স্বামীর মূর্তিটি একপ্রস্থ বেশ করে ঝলসে নিল আগে। তারপর ধাপে ধাপে সুর চড়তে লাগল। সেই সুরের আসামীও আমি নয়, আমার সামনের মানুষ।—এই নিয়ে লাগান হয়েছে আবার, অ্যাঁ? আমিই তাহলে অন্যায় করছি আর মেয়ে যা করছে সেটাই ঠিক। আমি জানতে চাই সর্বব্যাপারে তাহলে আমাকে মাথা ঘামাতে হয় কেন? নিজে ভার নিলেই তো হয়—নিজে সবকিছু দেখাশুনা করলেই তো হয়। কোথায় মেয়েকে দু'কথা বলবে, তা নয়, উল্টে আমাকেই কৈফিয়ত দিতে হবে, কেমন?

জবাবে অনুযোগ-ভরা নীরব দৃষ্টিটা বন্ধু আমার মুখের ওপর তুলে ধরল একবার। অতএব আমিই হাল ধরতে চেষ্টা করলাম আবার।—শুনুন, ও কিছু বলে নি, আমিই বলছি। মাঝেসাঝে মেয়ে বাসে এলে আপনার এত আপত্তি কেন আমাকে বলুন, মিষ্টিকে ডেকে আমিই বুঝিয়ে বলছি আর যাতে ও-রকম অন্যায় না করে—ছেলে মেয়ে আর আপনার কর্তার হেপাজতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে স্কুলে আপনি নিজেও তো কষ্ট করে রোজ বাসে যাতায়াত করেন শুনেছি—তাহলে মেয়ের বেলায় এত আপত্তি কেন?

রাগটা আমার দিকেই ঘুরছে এবারে মনে হল। অনধিকার চর্চার দরুনও হতে পারে আবার সামনের বোবা আসামীর প্রতি টানের আভাস পেয়েছে বলেও হতে পারে।—আপত্তি কেন আপনি জানেন না?

—আপনার এত রাগ হবার মতো আপত্তি কেন জানি না।

ধৈর্যের বাঁধ গোটাগুটি ভাঙার উপক্রম।—আর জেনে কাজ নেই তাহলে, বসে বসে মনের আনন্দে একজন বক্তৃতা করুক আর আপনিও মনের আনন্দে বসে বসে তাই শুনুন আর লিখুন। একেবারে কিছুই জানেন না, কলকাতার বাসে কোনোদিন চাপেনও নি দেখেনও নি কিছু—যত-সব আদেখলে লোকের ভিড়, চোখ দেখলে গা রি-রি করে, যেন গিলতে পারলে বাঁচে—ফাঁকে পেলে এই বয়সেও চাপা-চাপি ঠেলা-ঠেলি—

রাগের মাথায় মহিলা রসনার লাগাম প্রায় ছেড়ে দিয়েই টেনে ধরল শেষ পর্যন্ত।

—মানে আপনার...এই বত্রিশ বছব বয়সেও?

মহিলার দু চোখ মুখের ওপর থমকালো একটু।—বত্রিশ বছর মানে? তেতাল্লিশ এখন—

আমতা আমতা করে বললাম, তাহলে আর লোকের দোষ কি, বয়েসটা লিখে গলায় ঝুলিয়ে বেরুনো উচিত আপনার...তা ছাড়া তেতাল্লিশই বা এমন বেশি কি...

ভয় ভুলে ভবানী ঘোষাল একটু জোরেই হেসে উঠতে প্রথমে একপ্রস্থ থতমত খেল মহিলা। রাগের মাথায় প্রসঙ্গ কোনদিকে ঘুরছে খেয়াল না করেই কথা বলছিল। আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ লাল, বন্ধুর দিকে সকোপ দৃষ্টিনিক্ষেপ, তারপর দ্রুত প্রস্থান।

বন্ধু ঝুঁকে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল।—বাঁচালে তুমি।

কিছুক্ষণ বাদে হাসতে হাসতে বলল, মেয়েকে একটু-আধটু শাসনে রেখে খুব অন্যায় করে না হে। আমি এক মেয়ের বেচাল আর শেষে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার একটা আশ্চর্য গল্প বলতে পারি, কিন্তু সে-গল্প তোমাদের আধুনিক বাস্তব গল্পের সঙ্গে মিলবে না।

—কোন দেশের গল্প?

—পৃথিবীর যে-কোনো দেশের বলতে পারো, সুযোগ সুবিধে পেলে সব দেশেরই ছেলে-মেয়ের ভিতরের মাল-মশলা প্রায় এক-রকম।

গল্পটা সাগ্রহেই শুনেছি। বয়েসকালের মেয়ের বিলিতি ধাঁচের বেপরোয়া চাল-চলনের গল্প। শেষের ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে। গল্পের বিস্তারে একটু গোঁজামিল দিয়ে এই দেশের কোনো মেয়ের চিত্রই ফোটানোর চেষ্টায় ছিল ভবানী ঘোষাল। বাস্তব হোক অবাস্তব হোক শুনতে ভালো লেগেছে। কিন্তু এই গল্পের উপকরণ নিয়েই যে ছোটখাটো একটু

উপকার সাধনের চেষ্টা করা যেতে পারে সেটা তখন মাথায় আসেনি। এসেছে রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে। উপকারের সম্ভাবনা মিষ্টির অর্থাৎ ভবানী ঘোষালের মেয়ের না হোক, মেয়ের সম্পর্কে তার মায়ের হতাশার রকম-ফের কিছু হলেও হতে পারে। অবশ্য গল্প যেমন শুনেছি তার সঙ্গে নিজের উপসংহার একটু জুড়তে হয় তাহলে।

তার আগে ভবানী ঘোষালের মুখে শোনা বেচাল মেয়ের কাহিনীর সারটুকু আগে ব্যক্ত করা দরকার।

...বড় একটা বাড়ির দোতলায় খণ্ড খণ্ড গোটা তিনেক ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট না বলে এক-ঘরে দু-ঘরের গোটা তিনেক সুইট বলা যেতে পারে। সব কটা সুইটেই পুরনো ভাড়াটে ছিল। নিচের তলা গোটাগুটি বাড়িওয়ালাদের দখলে। বাড়িওয়ালাদের মানে দুই ভাই। একসঙ্গে থাকে, কিন্তু বনিবনা খুব নেই। নীচের তলায় দুই ভাই থাকে আর তাদের এক বোন থাকে। ভাইয়েরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, চাকরি-বাকরি করে না, তেমন চালু ব্যবসা-ট্যাবসা আছে বলেও শোনা যায় না—কিন্তু বেশ শৌখিন আর পয়সাওয়ালা লোকের মতোই থাকে। সুইটগুলো থেকে যা ভাড়া পায় তাতে তাদের মাসের দশ দিনও চলার কথা নয়। কিন্তু দিব্বি বহাল তবিয়তে থাকে সব। কোথা থেকে বা কেমন করে টাকা আসে সেটা কেউ বলতে পারে না। মুখ ফুটে কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। কারণ, ওই দুই ভাইকে একটু-আধটু ভয় বা সমীহ করে না, পাড়ায় এমন লোক বেশি নেই। বয়েসকালে তাদের গুণ্ডামির খ্যাতি ছিল। এখন তারা গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তাদের বোন মল্লিকা ধরা যাক কলেজে পড়ে। পড়ে না ঠিক, সেজে-গুজে কলেজে গিয়ে ছেলেগুলোর মুণ্ডু ঘোরায়। পাড়ার অল্পবয়সী ছোকরাগুলোরও। মল্লিকার কলেজে যাওয়া আসার সময় মোড়ে মোড়ে ভক্তদের প্রতীক্ষারত জটলা দেখা যায়। তাদের মাঝখান দিয়ে রাজেন্দ্রাণীর মতো সে ঘরে ফেরে। সপ্তাহে দিন চারেক বিভিন্ন স্তাবকের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে খেতে দেখা যায়, আর দিন দুই অন্তত চটকদার সাজপোশাক আর টয়লেট করে স-ভক্ত দিশিবিলিতি সিনেমাঘরে ঢুকতে দেখা যায়।

ওই অতি আধুনিকা মল্লিকার দুনিয়ার একটিই মাত্র শত্রু। সে দোতলার এক সুইটের ভাড়াটে ছেলে। বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকত। ছেলেটা দেখতে শুনতে মন্দ নয়, স্কলারও ভালো—কিন্তু একেবারে রামগড়ুরের ছানা, হাসতে জানে না। দিন-রাত বই মুখে করে বসে থাকে। বছর পাঁচ-ছয় ধরে মল্লিকাকে দেখছে সে, অর্থাৎ তার পনের থেকে কুড়ি পর্যন্ত আর নিজের একুশের থেকে ছাব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত। গণ্ডগোলের সূত্রপাত মেয়েটার একুশ বছর আর ছেলেটার সাতাশ বছর বয়সে। অর্থাৎ ছেলেটার মা মারা যাবার পর থেকে। এতদিন মেয়েটা তার দিকে ভালো করে তাকায় নি, এবারে একটু-আধটু লক্ষ্য করতে লাগল। লক্ষ্য করার আরো কারণ, ছেলেটা তাকে দেখলেই যে বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার প্রমাণ বারকয়েক পেয়েছে। সেই কারণেই ছেলেটাকে একটু আল্‌টাবার ঝোঁক বেড়েছে তার।

পড়া বুঝে নেবার নাম করে বই হাতে দোতলায় উঠে এসেছে। ছেলেটা মুখের ওপর জবাব দিয়েছে, ব্যস্ত, সময় নেই।

জমিদারবাবুরা অর্থাৎ বাড়ির দুই মালিক তাদের প্রজাকে অর্থাৎ দাম্ভিক ছেলেটাকে একদিন ডেকে পাঠিয়েছে। তাদের সকলেরই চোখ গরম। অভিযোগ, ছেলেটা তাদের বোনকে রাস্তায় পেয়ে অপমান করেছে। ফের যদি এ-রকম কানে আসে তাহলে গণ্ডগোলের ব্যাপার হবে।

ছেলেটা বলেছে, গণ্ডগোলের ব্যাপার হয়ই যদি কি আর করা যাবে। কিন্তু অপমান সে করে নি, বোনকে যদি চিনেই থাকে তারা তাহলে বোন সম্পর্কে তাদেরই একটু সতর্ক হওয়া উচিত। আর কি অপমান করা হয়েছে সেটা সামনা-সামনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোক।

বলা বাহুল্য তা হয় নি, আর বোনের দাদারা খুশিও হয় নি। উল্টে তাদের আত্মসম্মানে লেগেছে। তারা বিরূপতা গোপন করে নি।

অপমানের ঘটনাটা সর্বৈব মিথ্যে নয় তা বলে। দিন চারেক আগের দুপুরে মল্লিকা ওপরে উঠে এসে দুটো সিনেমার টিকিট দেখিয়ে বলেছিল, তার আর এক বান্ধবীর যাওয়ার কথা, বান্ধবী যেতে পারবে না জানাল হঠাৎ, অতএব যদি সময় হয়—

সময় হয় নি। ছেলেটে জানিয়েছে, কোনোকালে সময় হবেও না।

পরদিন বিকেলে রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছিল। কোথা থেকে মেয়েটা এসে ঢুকল। তাকে দেখেই ঢুকেছে সন্দেহ নেই। ওই টেবিলেরই সামনের চেয়ারে বসল। হাসি চেপে বলল, চা খাওয়ান।

ছেলেটা আরো ভালো করে দেখে নিল তাকে। তারপর আর এক পেয়ালা চায়ের হুকুম করল। তারপর দু পেয়ালা চায়ের দাম টেবিলে রেখে আধ-খাওয়া পেয়ালা ফেলেই উঠে দাঁড়াল। মৃদু-কঠিন গলায় বলল, তুমি যাদের খেলিয়ে বেড়াও আমাকে তাদের কেউ না ভাবলে খুশি হব।

যত আস্তেই বলুক, আশপাশের দু-একজনের কানে গেছেই। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপে না করে ছেলেটা বেরিয়ে এসেছে।

বাড়ি ফিরে মেয়েটি সেই অপমানের নালিশই দাদাদের কাছে করেছে। নালিশের ফলাফলও আড়াল থেকে শুনেছে মনে হয়। কারণ, তারপর শিগগির আর বিরক্ত করে নি, দেখা হলে দু চোখে নিঃশব্দে তাকে ভস্ম করতে চেয়েছে শুধু।

তার দাদারা হঠাৎ একদিন দোতলার তিন সুইটের বাসিন্দাদের মৌখিক নোটিস দিল দু মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে, গোটা দোতলা নিয়ে তাদের কি প্ল্যান আছে।

জায়গা-বাসার অভাব পৃথিবীর সর্বত্র। বললেই ওঠা যায় কি করে। কিন্তু দু মাসে না হোক তিন মাস না যেতে তিন সুইটের মধ্যে দুই ভাড়াটে পরোক্ষ হুমকির চোটেই ঘর খালি করে দিয়ে পালাল। বাকি থাকল শুধু এই ছেলেটা, যার ওপর গোড়া থেকেই ভায়েরা রুষ্ট।

তাকে তাগিদ দিতে সে বলল, ওঠা সম্ভব নয় এখন। আর হুমকির জবাবে বলল, চেষ্টা করে দেখুন তাহলে তোলা যায় কিনা।

দুঃসাহস দেখে তারা স্তম্ভিত।

ছেলেটির খাওয়া-দাওয়া সব বাইরে। বেরুবার সময় এর পর দুটো ঘরে ডবল-ডবল তালা লাগিয়ে বেরুত সে।

একটা গণ্ডগোলের জন্য প্রস্তুত ছিল সে। কিন্তু একদিন রাস্তায় যা দেখল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না। দেশে থাকে এমন দূর সম্পর্কের দুই জ্ঞাতি ওই দুই ভাইয়ের সঙ্গে নিবিষ্ট মনে কি কথাবার্তা কইছে। তাকে দেখে জ্ঞাতিরা সচকিত, কাঠ-কাঠ হেসে বলল, চেনা-জানা ভদ্রলোক, দেখা হয়ে যেতে দাঁড়িয়ে দুটো কথা কইছে।

এই বাড়িওয়ালারা জ্ঞাতিদের চেনা-জানা কি করে বা কবে থেকে হল ছেলেটা ভেবে পেল না। মনের তলায় একটা অজ্ঞাত সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিল। এই দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিরাও দেশে তার জ্যাঠার পোষ্য। জ্যাঠার বিষয়সম্পত্তি আছে, নিজের ব্যবসা ছিল বেচে দিয়েছে। ফলে লাখ দুই আড়াই নগদ টাকাও আছে তার হাতে। নিঃসন্তান জ্যাঠার যাবতীয় সম্পত্তি আর সমস্ত টাকা এই ছেলের প্রাপ্য। ছেলেবেলা থেকেই ছেলেটা চোখের মণি জ্যাঠার, এখনো সাত দিনের ছুটি পেলেই সে জ্যাঠার কাছে ছোটে। জ্যাঠা লোক ভালো কিন্তু জেদী আর ভয়ানক গোঁড়া। একটু বে-চাল দেখলে সম্পর্ক পর্যন্ত ছেঁটে দিতে পারে। এইজন্যেই কলকাতায় তার বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে জ্ঞাতিদের কথাবার্তা কইতে দেখে মনে খটকা লেগেছিল ছেলেটার।

এর পর ওই জ্ঞাতিদের দু দিন এই বাড়িতেও আসতে দেখল সে। দেখেছে যে তারা টের পায় নি হয়ত। নীচের তলার দু ভাইয়ের সঙ্গে একঘণ্টা কাটিয়ে যেতে দেখেছে।

হতেও পারে চেনা-জানা। ছেলেটা নিশ্চিন্তই থাকতে চেষ্টা করেছে, কারণ, জ্যাঠা তাকে জানে, সে-ও জ্যাঠাকে চেনে। জ্যাঠার তার ওপর অন্ধ-বিশ্বাস।

দিন কয়েকের মধ্যে পাশের সুইটে নতুন ভাড়াটে দেখে অবাক। একজন প্রৌঢ়া আর তার মেয়ে। মেয়েটার বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ, মোটামুটি সুশ্রী, কোন হাসপাতালের নার্স নাকি। নার্সের মাইনেয় ঠিক এই গোছের সুইট ভাড়া করে থাকা চলে ছেলেটির ধারণা ছিল না। প্রাইভেট ডিউটির বাড়তি রোজগার আছে হয়ত। পাশের বাসিন্দার সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় নার্স মেয়েটি আলাপ করতে এল। ছেলেটি জানল বাড়ি বদলের কারণে দিন পাঁচেকের ছুটিতে আছে সে। সৌজন্যের খাতিরে আলাপ করল। চা দোকানে খায় শুনে নবাগত তাড়াতাড়ি উঠে নিজের ঘর থেকে দু পেয়ালা চা করে নিয়ে এল। ঠোঁটের ডগায় মিষ্টি হাসি।

পরদিনও এল ওই নার্স মেয়ে। সন্ধ্যার অনেক পরে। একেবারে দু পেয়ালা চা হাতে করে। তার দিকে চেয়ে ছেলেটি খুব অস্বস্তি বোধ করল। রঙ-করা ঠোঁট, খোঁপায় ফুল গোঁজা, গায়ে কাঁধ-কাটা টেপ ব্লাউস, পরনের শাড়িটা রঙিন হলেও বড় বেশি হাল্কা। তাকাতে গেলেই বুকের যে দুটি বস্তু বড় বেশি উঁচিয়ে আছে—চোখে ঠেকে। দ্বিতীয় দিনের আলাপে নার্স মেয়ের হাসি আর হাব-ভাব বেশ অন্তরঙ্গজনের মতো। ছেলেটি ভিতরে ভিতরে ঘামতে লাগল।

তৃতীয় দিনের বিকেলে নীচের তলার দু ভায়ের বোনকে দোতলায় উঠতে দেখা গেল

এবং নার্স মেয়ের ঘরেও ঢুকতে দেখা গেল। নীচের তলায় মেয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে নীচে নেমে গেল। ছেলেটির সঙ্গে চোখো-চোখি হতে ভয়ানক গম্ভীর মেয়েটা—যেন চেনেও না।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আবার বিস্ময়ে। এপাশের ঘরের সিঙ্গল্ সুইটেও নতুন এক ভাড়াটের আবির্ভাব। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, একটু রুক্ষ গোছের চেহারা। শোনা গেল কোনো খবরের কাগজের রিপোর্টার সে। তার সঙ্গে দুই এক কথা বলেই ঘরে ঢুকে গেল নতুন ভাড়াটে।

ছেলেটি ভাবল, সে ঘর ছাড়ল না দেখেই হয়ত নতুন ভাড়াটের আমদানি।

নিজের ঘরের সামনে ফালি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, দু ভাই সেজেগুজে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল। এটা প্রায় নৈমিত্তিক। কত রাতে ফেরে সঠিক খবর রাখে না। তবে বেশি রাতেই ফেরে। ঘরে এসে ছেলেটি ভাবতে লাগল এবারে সে-ও বেরিয়ে পড়বে কিনা। খানিকক্ষণের মধ্যেই নার্স মেয়ের চা নিয়ে হাজির হবার আশঙ্কা। বেরিয়েই পড়ল, একেবারে খেয়েদেয়ে রাত প্রায় পৌনে দশটায় ফিরল।

দোতলায় উঠে অবাক একটু, সামনের সুইটের দরজায় তালা, আর তার পাশের ঘর ভিতর থেকে বন্ধ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ছেলেটি ভাবল, নার্স মেয়ে হয়ত কোথাও নার্সিংয়ে গেছে, আর তার মা পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়েছে। এধারে রিপোর্টারের সুইট ভিতর থেকে বন্ধ।

ছেলেটি শোয় ঠিক রাত্রে সাড়ে এগারোটায়। মিনিট দশেক বাকি সাড়ে এগারোটা বাজতে। তার আগে পর্যন্ত পড়াশুনা করে।

হঠাৎ তার বন্ধ দরজায় টোকা পড়ল গোটাকয়েক। তারপরেও আস্তে, কিন্তু ঘন ঘন। ছেলেটা অবাক যত না, কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কা তার থেকে বেশি। দরজা খুলতে গিয়েও খুলল না, জিজ্ঞাসা করল, কে?

ওধারে চাপা ফিসফিস মেয়েলী-গলা, একটু উত্তেজিত যেন।—শিগগির খুলুন, খুব দরকার, শিগগির—!

নার্স মেয়ে কখন ফিরছে টের পায়নি। কোনো বিপদের আশঙ্কা করে দরজা খোলা মাত্র হতভম্ব। নার্স মেয়ে নয়, নীচের তলার মেয়ে। যে তাকে দেখলে এখন চোখ দিয়ে আগুন ছড়ায় শুধু। মেয়েটি প্রায় তাকে ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ল, আর নিজেই তাড়াতাড়ি দরজা দন্ধ করে দিল।

ছেলেটির দু চোখ কপালে কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই মেজাজ রুক্ষ।—কি ব্যাপার, এত রাতে?

মেয়েটি তার চোখে চোখ রাখল, বড় করে একটা দম নিয়ে বলল, বসুন, দরকারি কথা আছে।

নিজেই আগে বসল। নিজেকে গম্ভীর সংযমে বেঁধে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, দরকারি কথা আছে তো এত রাতে কেন?

মেয়েটি হাসল, বলল, রাতেই তো সুবিধে।

ছেলেটি চাপা গর্জন করে উঠল, এই মুহূর্তে তুমি ঘর থেকে বেরুবে কি না?

মেয়েটি থমকালো এক মুহূর্ত, গম্ভীর। অনুচ্চ কঠিন স্বরে পাল্টা ধমক দিয়ে উঠল, আপনি বসবেন ওখানে চুপ করে নাকি চিৎকার করে লোক ডাকব? আশপাশে লোক আছে আর নীচে তো আছেই—দরজা আমি বন্ধ করেছি বিশ্বাস করবে না, সকলে জানবে আপনি কোনো অছিলায় ডেকে এনে দরজা বন্ধ করেছেন।

—তা-তার মানে?

আঙুল দিয়ে সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিল, তার মানে ওখানে বসুন, চুপ করে, যা বলি শুনুন—

ছেলেটি ঘামছে। কাঁপছেও একটু একটু। যে মেয়ে, চিৎকার করে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। বসেই পড়ল।

মেয়েটি মন্তব্য করল, লক্ষ্মী ছেলে। চোখে চোখ, ঠোঁটের ডগায় সূক্ষ্ম হাসি।—আপনার জ্যাঠার বুঝি অনেক সম্পত্তি আর অনেক টাকা?

—কেন?

—আর ভবিষ্যতে সে-সবের বুঝি আপনি মালিক?

মাথার মধ্যে ছেলেটার যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব।—তা দিয়ে তোমার কি দরকার?

মেয়েটা হাসল মুখ টিপে, বলল, আমি একটা অতি খারাপ মেয়ে, টাকার কথা শুনলেই লোভ হয় যে। গম্ভীর। তা সে-সব বিষয়-সম্পত্তি আর টাকা যদি ফসকাতে হয় কেমন লাগবে আপনার?

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করছে ছেলেটা। ভিতরে ভিতরে ভালো-রকম কিছু একটা জট পাকাচ্ছে। ব্যাপারটা আগে বোঝা দরকার।—তুমি কি বলতে চাও পরিষ্কার করে বলো।

মেয়েটি সচকিত একটু। এদিক-ওদিক তাকাল। তারপর গম্ভীর মুখেই উঠে তার চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল। চুপি চুপি বলার মত করে চেয়ারের হাতল ধরে আরো কাছে ঝুঁকল, তারপর হঠাৎ একমুখ হেসে আরো অন্তরঙ্গ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলতে চাই, আমার ওপর এত রাগ কেন আপনার?

ছেলেটার মুখ লাল, কান গরম। আর এক মুহূর্তের অবকাশ পেলে কি করতে বলা যায় না। হয়ত ধাক্কা দিয়ে তিন হাত দূরে ফেলে দিত মেয়েটাকে। অবকাশ পেল না, পাশের অন্ধকার জানালা দিয়ে মুখের ওপর আকস্মিক আলোর আঘাতে চমকে লাফিয়ে উঠল সে। চমকাল একটু মেয়েটাও, কিন্তু অতটা নয়।

ছেলেটা বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। জানালার দিকে তাকাল। বারান্দা অন্ধকার। ঘরের ভিতরে, ঠিক মুখের ওপর একঝলক আলো কেন, মাথায় ঢুকছে না। ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে!—কি ব্যাপার?

মেয়েটির মুখের সমস্ত চটুলতা উবে গেছে। গম্ভীর। জবাব দিল, কাল জানতে পারবেন।...আর কালকের ডাকে একখানা চিঠিও পাবেন।

দরজা খুলে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটা বোবার মতো দাঁড়িয়ে। হঠাৎ বুঝি বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়। ওই আলোর ঝলক ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ভালব্ ছাড়া আর কিছু নয়, জানালা দিয়ে ফোটো তুলে নিয়েছে কেউ।

এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরুল সে। নার্স মেয়ের ঘরে তেমনি তালা ঝুলছে, পাশের ঘরের দরজাও বন্ধ।

এদিকের সুইটে রিপোর্টারের বন্ধ ঘরেও বড় তালা ঝুলছে একটা।

সমস্ত রাত মাথায় আগুন জ্বলল ছেলেটার। পরদিন বেলা গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে নীচের তলায় চাপা উত্তেজনার আভাস পেল একটু। চাকর এসে বার দুই খোঁজ করে গেল তাদের দিদিমণি ওপরে আছে কিনা। কিন্তু সেদিকে মন নেই ছেলেটার. নানা চিন্তা একের পর এক জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আজই জ্যাঠার কাছে চলে যাবে কিনা ভাবছে। ডাকের চিঠিরও প্রতীক্ষা করছে। মেয়েটা বলেছিল, চিঠি পাবে।

কিন্তু চারটে বেজে গেল চিঠির দেখা নেই। চাকরের মুখে খবর শুনল, তাদের দিদিমণি সকালে ঘুম থেকে উঠে কোথায় চলে গেছে এখনো দেখা নেই।

চারটের পর নীচের তলার দু ভাই উপরে উঠে এল। সরোষে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বোন কোথায়?

ছেলেটি পাল্টা মুখিয়ে উঠল, আমি তার কি জানি?

বড়ভাই ক্রূর দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।—কাল সে রাত এগারোটা পর্যন্ত এই ঘরে ছিল। ভালো চান তো বলুন কোথায় সে, নইলে বিপদ হবে।

—আমি জানি না। আপনার দয়া করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

—ও... ! পকেট থেকে ফোটো বার করল। হাতে রেখেই দেখাল। জানালা দিয়ে কাল রাতে তোলা ছবি। তার আর মেয়েটার।—আপনি কিছু জানেন না, কেমন? এ-সব কি ব্যাপার?

—কি ব্যাপার আমার থেকে আপনারা ভালো জানেন। হঠাৎ বুদ্ধি খেলল মাথায়, আরো গম্ভীর।—আপনাদের শুধু একটা কথা বলে রাখি, পুলিস ডিপার্টমেন্টের সব থেকে বড় কর্তা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—তাঁরই ভরসা পেয়ে আমি এতদিন এখানে টিকে আছি। আমার বিপদের কথা না ভেবে আপাতত নিজেদের বিপদের কথা চিন্তা করুন গে আপনারা।

ভাঁওতায় সাময়িক কাজ হল একটু। দু ভায়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। তারপর বল সংগ্রহ করে ছোট ভাই বলল, কোনো পুলিস-টুলিসের পরোয়া করে না তারা, আর পরোয়া করার মত কোনো অপরাধও করে নি। শাসিয়ে গেল, বোনকে না পেলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে।

ছেলেটি ছটফট করছে। ভাঁওতা দিয়ে কদিন আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে। সাংঘাতিক একটা ষড়্যন্ত্র হয়েছে, কি সেটা একেবারে স্পষ্ট নয় এখনো। মেয়েটা গেল কোথায়? চিঠি পাবে বলে গেল কেন?

পাঁচটার ডাকে চিঠি পেল। ছোট চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল।—ওই ফোটো আপনি যাকে নার্স মেয়ে বলে জানেন, তার সঙ্গে তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল—ওই রাত এগারোটাতেই, আপনি আর সে। আমার ব্যবস্থায় পাত্রী বদল হয়ে গেল শুধু। আশা করা যাচ্ছে দাদারা এই ফোটো আপনার জ্যাঠার কাছে পাঠাবে না। নিজেদের মান-মর্যাদার প্রশ্ন আছে, তা ছাড়া বাড়ির এক-তৃতীয়াংশের আমিও মালিক—সেই ঝামেলাও আছে। তার আগে চুপচাপ তারা হয়ত বোনকে খুন করে নিষ্কণ্টক হতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আপাতত আমার সে-সুযোগ দেবার ইচ্ছে নেই। নীচের তলার একটা বাজে মেয়েকে আর কোনোদিন আপনি দেখবেন না নমস্কার।

ভবানী ঘোষালের কাহিনী এটুকুই। আমি উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা। করলাম, তারপর ?

সে হেসেই জবাব দিয়েছিল, তারপর লেখকের কল্পনা-সাপেক্ষ।

গল্পটা সযত্নে লিখে শেষে কল্পনাই জুড়েছি। মাঝে বিশ বছরের ব্যবধান রচনা করে আত্মবিহ্বল নায়কের সঙ্গে নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটিয়েছি মহীশূরের চামুণ্ডা পাহাড়ের চূড়ায় চামুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে। নায়িকা সেখানে মহামায়ার সেবাদাসী। সকলের প্রিয়, শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি।

লেখাটা এক সাপ্তাহিক পত্রে পাঠিয়ে দিয়েছি। আশা করছি, অতি বড় বেচাল মেয়েরও ভিতরে কত বড় মহত্ত্ব লুকিয়ে থাকতে পারে, গল্পটা পড়লে ভবানী-গৃহিণী সেটুকু অন্তত অনুভব করবে।

কিছুদিন পরে। প্রকাশক মহলে হানা দিতে হয়েছিল বলে বেড়াতে বেরুনো হয় নি। সন্ধ্যায় যথারীতি বন্ধুর বাড়িতে এসেছি। দোতলায় উঠতেই বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে দেখা। থমথমে মুখ। দ্রুত অন্যদিকে সরে গেল।

আমি বুঝে নিলাম নতুন কিছু ঘটেছে। ঘরে ঢুকে দেখি, বন্ধুরও মুখ শুকনো। আমাকে ঢুকতে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল, চাপা গলায় বলল, কি সর্বনাশ করেছে, গল্পটা ছেপে দিয়ে বসে আছ ?

আমি অবাক। কেন, কি হয়েছে ? ভালো হয় নি ?

—আর ভালো। এদিকে আমি যে গেলাম। তোমার নায়িকা সেবাদাসীই হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা মহীশূরের মন্দিরের নয়। কাহিনীর পটভূমি আর সেই মল্লিকার বর্তমান ঠিকানা দুইই তেত্রিশ নম্বর গোন্ড রোডের এই বাড়ি, এই ঘর—যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ !

আমি হতচকিত। চেয়ারে বসে পড়েছি। ভবানীও বসে পড়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিল, গলার ব্রেক কষল। ফিরে দেখি ধূপদানি হাতে তেমনি থমথমে মুখে ঘরে সন্ধ্যা দেখাতে ঢুকল ভবানী-গৃহিণী।

সন্ধ্যা দেখিয়ে বেরিয়ে গেল। ভবানী বলল, ওটা পড়ার পর থেকে এই মুখ। ভবানী বলল, পনের বছরে নয়, এক বছরের মধ্যেই আমি ওকে খুঁজে বার করেছি। মল্লিকা গাঁয়ের এক প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করছিল। আর বিয়ের পর জ্যাঠার টাকা হাতে

আসতে বাড়িটা কিনে নিয়েছি। কিন্তু তুমি একেবারে ডোবালে আমাকে—

আশ্বস্থ হতে চেষ্টা করছি। মহিলা আবার ঘরে ঢুকল। কি একটা বই রাখতেই যেন এসেছিল, কিন্তু রেখে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও গেল না। নীরব দৃষ্টিটা আমার দিকেই। সত্যি কথা বলতে কি, ওই মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস আমারও হচ্ছিল না। তবু হাসতে চেষ্টা করেই বললাম, একটু চা-টা হবে না?

নির্বাক প্রস্থান।

আমি বললাম, তোমারই তো দোষ, কি করে জানব, আমি আরো ভালো ভেবে লিখতে গেলাম। ইয়ে, ভয়ানক রেগে গেছেন?

বন্ধুর অসহায় অভিব্যক্তি, মুখ দেখছ না!

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু উনিই যদি, উঠতে-বসতে মেয়ের ওপর তাহলে অত শাসন কেন?

গলা খাটো করে ভবানী ঘোষাল জবাব দিল, ওই জন্যেই। সব সময় ভয়, মেয়েটা বুঝি তার মতই হবে। সেই রকমই যদি হয়, আমার মতোই যে ছেলে জুটবে সেই ভরসা কি? আমি নেহাত পাগল বলেই আদা-জল খেয়ে তাকে খুঁজে বার করেছি, আর কার দায় পড়েছে?

বোবা মুখ করে বসে আছি দুজনে। একটু বাদে এক হাতে পট আর অন্য হাতে একজোড়া পেয়ালা প্লেট হাতে মহিলা ঘরে ঢুকল।

কিন্তু আমার আর কোনো দিকেই লক্ষ্য নেই। আড়চোখে ওই মুখের দিকে তাকাতেই দুরু-দুরু বক্ষ। দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য।

হঠাৎ দেখি পেয়ালায় চুমুক দিয়েই বন্ধু উদ্ভাসিত মুখ করে তাকাল আমার দিকে।

কিছু না বুঝে আমিও পেয়ালায় চুমুক দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বিস্ময়ে লাফিয়ে ওঠার দাখিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, চা নয়তো, বেশ ভালো কফি দেখি।

আর সেই মুহূর্তে রমণী-মুখের এক বিচিত্র কারুকার্য দেখলাম আমি। ভারি মেঘের ওপর যেন হঠাৎ লালচে আলোর ঝলক একপ্রস্থ। শরীরের সমস্ত রক্তকণাগুলো বুঝি সবেগে একসঙ্গে ওই গম্ভীর মুখখানা চড়াও করেছে। সমস্ত মুখ টকটকে লাল।

কয়েক নিমেষ মাত্র। সচকিত হয়ে কেটলি হাতে ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করল মহিলা।

নির্বাক বিস্ময়ে আর অব্যক্ত পুলকে আমরা দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

ভারতী

ছোট ছেলের ওপর বাবার টান কত বেশি সেটা আর একবার বেশ ভালো করেই টের পেল অন্য ছেলেরা। কিন্তু এভাবে টের পেতে কেউ চায় নি। ভাইকে তারাও কম ভালোবাসে না। তার ভালোর জন্যেই অনেক সময় কঠিন হতে হয়েছে, তার মতিগতি ফেরাতে চেষ্টা করেছে।

না পেরে শেষে হাল ছেড়েছিল।

বড় তিন ছেলেই দিল্লিতে থাকে। অবসর নেবার পর থেকে মেজর নন্দও ছেলেদের কাছেই আছেন। স্ত্রী অনেককাল বিগত। অবসর নেবার পর কৃতী ছেলেরা ছেলের বউয়ের শলা করে খুশি হবার মতোই একটা কাজ করেছিল। সব দল বেঁধে বোম্বাইয়ে হাজির হয়েছিল। সেখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এরপর কোথায় থাকবেন, কি করবেন কিছুই স্থির করে উঠতে পারেন নি তখনো। তার আর দরকারও হল না। ছেলেরা, ছেলের বউয়েরা সরাসরি দিল্লির সংসারে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল তাঁকে।

ছোট ছেলেকে না দেখে মেজর নন্দ শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইন্দ্র এল না বুঝি?

ছেলেরা জবাব দেয় নি। বউদের একজন বলেছিল, তার কি সব কাজ আছে বলছিল—

মেজর নন্দ বলেছিলেন, ওটা আর মানুষ হল না।

সেই থেকে ছেলেদের কাছে দিল্লিতে আছেন তিনি। সুখেই আছেন বলতে হবে। ছেলেরা বড় চাকুরে। দিল্লির উঁচু মহলের মানুষ। তাদের অভিজাত বন্ধুবান্ধবরা আসে—তাঁকেও যথেষ্ট সম্মান করে। বাগান-ঘেরা একটা বড় বাড়িতে থাকে ছেলেরা। অভাব অনটন নেই, তাই তুচ্ছ কারণে ঝগড়া-বিবাদও নেই। তবে কর্মক্ষেত্রে বড় হবার একটা প্রচ্ছন্ন রেষারেষি অবশ্য লক্ষ্য করেছেন মেজর নন্দ। সেটা নিন্দার কিছু নয়। পুরুষকারেরই লক্ষণ। যে যার কাজ আর সমস্যা আর সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত। এও স্বাভাবিক। পরিবারগত বড় কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে তারা মিলিত হয়ে আলাপ পরামর্শ করে, ছেলের বউয়েরাও যোগ দেয়, নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে।

তবে সে-রকম প্রয়োজন বা সমস্যা খুব কমই দেখা দেয়। শুধু ছোট ছেলে ইন্দ্র যা মাঝেসাঝে এক-একটা সমস্যা সৃষ্টি করে বসে। দিল্লির উঁচু মহলের দাদারা তাকে নিয়ে বিব্রত হয় অনেক সময়। তার আচরণ কোনদিনই ভালো লাগেনি তাদের। লেখাপড়া তেমন শিখল না। এতটা বয়েস শুধু খেলাধুলো করেই কাটাল। সেই বয়েসটা কাটতেই অবাঞ্ছিত বন্ধু ছেড়ে বান্ধবীও জোটাতে লাগল। ভাইয়েরা চেষ্টা-চরিত্র করে ছোট ছোট কয়েকটা চাকরিতেও ঢুকিয়েছিল তাকে। কিন্তু টিকে থাকতে পারে নি। অথচ খরচের হাত দাতাকর্ণের হাত। বাড়ির নামডাক আছে। যেখানে সেখানে ধার করে আসে, দোকানে ধারে দামি কোট-প্যান্ট বানায়, আর তার জের সামলাতে হয় ভাইদের। তাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

তাদের ধারণা বাবার জন্যেই ছোট ভাইটা এ-রকম হয়ে গেল। সে আসার কিছুদিনের মধ্যেই মা গেছে। অন্য ভাইরা বরাবর বাবার কাছছাড়া। তিনি চাকরি নিয়ে নানান জায়গায় ঘুরেছেন। ছেলেদের ভালো হস্টেল বোর্ডিংএ রেখে মানুষ করেছেন। কিন্তু ইন্দ্রর বেলায় মিলিটারি বাবার দুর্বলতা চাপা থাকল না। তাকে বেশির ভাগ সময় নিজের কাছেই রাখলেন। কিন্তু মানুষ করা দূরে থাক, তার ওপর একটু নজর রাখারও সময় নেই তাঁর। ফলে যা হবার তাই হল। তার মানুষ হবার ভিত পাকা হল না।

অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত জোয়ানদের সঙ্গে মিশত। তাদের সঙ্গে খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ করত, কুস্তি লড়ত।

বেগতিক দেখে বাবা শেষে অবশ্য তাকে ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু জোর করে মতিগতি ফেরানর বয়েস তখন পেরিয়ে গেছে। তবু তো ভাইয়েদের অনুশাসনে প্রথম পাসটা করে উঠে কলেজের মুখটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু কলেজে ঢুকেই তার যেন চার হাত আট পা গজাল। আর কিছু হল না।

যাক, সেই সময় থেকেই ছুটি পেলে বাবা ঘনঘন ছেলেদের দেখতে আসতেন। বড় তিন ভাই মুখ টিপে হাসত, বাবার আসল টানটা কোথায় তা তারা ভালোই বুঝত।

আসল গন্ডগোলটা বাধল সেজছেলের দূরসম্পর্কের শালী উর্মিলা এ বাড়িতে আসার পর থেকে। মেজর নন্দ তখনো বাইরে চাকরি করছেন। মেয়েটা বোর্ডিংএ থেকে য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে এসেছিল। কিন্তু বোর্ডিংএ সুবিধে হল না। বড়লোকের মেয়ে, বাপ নেই, শুধু মা আছে। নিজেই নিজের গার্জেন। তার ওপর হাতে অনেক টাকা। এ পর্যায়ের আত্মীয়া খাতির সর্বত্রই পেয়ে থাকে। শুধু সেজ নয়, অসুবিধে হচ্ছে শুনে অপর দু ভাইও তাকে এ বাড়িতে এসে থাকার আমন্ত্রণ জানাল। এটুকু শিষ্টাচারে পিছ-পা হবার মতো শিক্ষাদীক্ষা নয় কারো। ছোট ভাই নিজেই গলগ্রহ, তার মতামতের প্রয়োজন হয়নি।

মেয়ে রূপসী নয় আদৌ, তবে স্বাস্থ্যটি নিটোল। এর ওপর রুপোর জোর আছে বলে রূপের ঘাটতিটা অনেকেরই চোখে পড়ে না।

কিন্তু ইন্দ্রর চোখে পড়েছিল। শুধু সেজ ভাবীকে গোপন করে অন্য ভাবীদের কাছে ওই নবাগতার সম্পর্কে অনেক সময় চটুল মন্তব্য করত সে। কিন্তু এই ভাবীরাও আবার অকর্মণ্য এবং প্রায় বন্য এই মেজাজি দেওরটিকে মনে মনে তেমন পছন্দ করত না। তাই তাদের বিশ্বাসঘাতকতায় তার অনেক উক্তি সেজগিন্নির কানেও পৌঁছত। ফলে, তাদের অনবধানে ইন্দ্রশরণের দুই একটা লঘু বচন উর্মিলার কানেও যেত।

বার দুই তিন সে এ বাড়ি ছেড়ে আবার বোর্ডিংএ চলে যাওয়ার তোড়জোড় করেছে। আর লজ্জায় তখন তিন ভাই, তিন বউয়ের একসঙ্গে মাথা কাটা গেছে। ছোটর হয়ে বড় ভাইয়েরা তার কাছে মাপ চেয়েছে, আর বউয়েরা দেওরকে আশ্রিত পাগল আখ্যা দিয়ে উর্মিলাকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করেছে। বড় ভাইদের গম্ভীর অনুশাসন দেখেও উর্মিলা লজ্জা পেয়েছে। এমনি করেই তাদের ওই উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া ছোট ভাইয়ের প্রতি দৃষ্টি গেছে তার।

তার সঙ্গে সম্পর্কটা ক্রমশ সহজ হয়েছে। ওরা দুজনে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ ঝগড়া-ঝাঁটিও যে করে, বউয়েরা তাও টের পায়। কিন্তু তার পরেও উর্মিলার হাসিমুখ দেখেই স্বামীদের ডেকে ঘরোয়া মিটিংএ বসে না তারা। সেরকম মনোভাব দেখলে উর্মিলাই নিষেধ করে, বলে, তোমরাও যেমন, ওই লোকের কথা আবার ধরতে আছে।

কিন্তু শেষবারে ভাইদের বেশ বড় গোছের মাথা কাটা গেল যখন শুনল, ইন্দ্র উর্মিলার কাছ থেকে যখন-তখন টাকা আদায় করে, না পেলে শাসায়। এই নালিশও উর্মিলা

করেনি, করেছে তার দিদি। টাকা আদায় করা নিয়ে ওদের একটা ঝগড়ার প্রহসন সে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। ভাইদের তখনই মনে হয়েছে, ইন্দ্র আর টাকা-টাকা করে তাদের বিপর্যস্ত করে না বটে। তারপর জেরার মুখে পড়ে সবই ফাঁস হয়ে গেছে। বাবা অর্থাৎ মেজর নন্দ এর অনেক আগে থেকেই রিটায়ার করে ছেলেদের সঙ্গেই বসবাস করছেন। অতএব ব্যাপারটা তার কানে তুলল। বাবা ছেলেকে ডেকে গম্ভীর মুখে তিরস্কার করলেন বটে, আর উর্মিলাকেও নিষেধ করলেন এক পয়সাও যেন সে ওই অপদার্থ ছেলেকে না দেয়। কিন্তু তবু তার আসল বিচার দেখে বড় ছেলেরা ভিতরে ভিতরে ক্ষুণ্ণ হল। বেকার বাউন্ডুলে ভাইয়ের জন্য নিজের পেনসনের টাকা থেকে তিনি মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু সেই থেকে আবার উর্মিলার সঙ্গে কথায় কথায় ঝগড়া বাধতে লাগল ইন্দ্রর। বাবা যা দেন তাতে তার চলে না। উর্মিলার কাছে চাইলে সে শাসায়, তোমার বাবাকে বলে দেব। আর বেশি উত্ত্যক্ত করলে বলে, এখান থেকে চলে যাব।

এরপর সত্যিই চলে যাবার মতোই ব্যাপার ঘটে গেল একদিন। উর্মিলার কাছে ইন্দ্র সরাসরি প্রস্তাব করল, সে তাকে বিয়ে করবে। উর্মিলা কানে তোলে না দেখে রাগারাগি করতে লাগল। ফলে উর্মিলাও পাল্টা চোখ গরম করল, বলল, এক পয়সা উপার্জনের ক্ষমতা নেই যার তার আবার বিয়ে করার শখ। বলব নাকি তোমার বাবাকে ?

রাগের মাথায় ইন্দ্র সরাসরি বাবার কাছে এসে উপস্থিত। তার ঘোষণা শুনে বৃদ্ধ মেজর হতভম্ব খানিক। সে উর্মিলাকে বিয়ে করবে।

বউয়েরা তাজ্জব। ভয়ে সঙ্কোচে উর্মিলা নির্বাক। ছোট ভাইয়ের মাথায় গন্ডগোল হল কিনা ভাবছে বড় তিন ভাই।

মেজর নন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, উর্মিলা তোমাকে বিয়ে করবে কেন? সে রাজী হয়েছে ?

ক্রুদ্ধ মুখে ইন্দ্র মাথা নাড়ল, রাজী হয়নি।

অতঃপর রাগের মাথায় উর্মিলা যে কথা বলেছিল, আরো কঠিন করে সেই কথাগুলোই ছেলেকে বললেন মেজর নন্দ। আর বললেন, তার মতো অপদার্থ ছেলে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে—এভাবে সকলের মুখে চুন-কালি মাখানো আর তিনি বরদাস্ত করবেন না।

এর পর উর্মিলা এখান থেকে চলে যাবার কথাই ভাবছিল।........ অথচ সুশোভনভাবে যাবার ব্যবস্থা করা এখন আর খুব সহজ নয়। সকলকে ছেড়ে, ওই বৃদ্ধ মেজরও খুবই স্নেহ করেন তাকে। ছেলের ব্যবহারে লজ্জা পেয়েছেন, যেতে চাইলে আঘাতই পাবেন। সুযোগ মতো তাঁর ওই অবুঝ ছেলের সঙ্গেই কথাবার্তা বলার ইচ্ছে ছিল উর্মিলার।.........কিন্তু সে সুযোগও পেল না।

তিনটে দিন গুম হয়ে থেকে চার দিনের দিন ইন্দ্রশরণ নিরুদ্দেশ।

বাবার মুখ চেয়েই বড় ভাইয়েরা তলায় তলায় খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু সন্ধান মিলল না। প্রায় দু মাস কেটে গেল। বাড়ির বাতাস্ ভারি। উর্মিলার মুখ কালো।

সেই যেন অপরাধী।

মেজর নন্দ গম্ভীর। সকালে বিকেলে তিনি বাগানে গিয়ে বসেন। নিজের হাতে বাগানের কাজ করেন। চাকরিতে অবসর নেবার পর থেকে এই বাগান করাটাই তার নেশায় দাঁড়িয়েছে। বাগানে বসে চা খান, কাগজ পড়েন। কাঁচি নিয়ে গাছের পাতা ছাঁটেন। জল দেন, মাটি নিড়োন।

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে আছেন। খোলা জানলা দিয়ে চুপচাপ ঘোলাটে আকাশ দেখছেন। উর্মিলা ধুনচি নিয়ে ঘরে সন্ধ্যে দেখাতে ঢুকলো। ধূপের গন্ধে মেজর ঘাড় ফেরালেন।

এ বাড়িতে আসার পর থেকে এ কাজটা নিযমিত উর্মিলাই করে আসছে। বউদের অত সময় হয় না। মেজর ধূপ পছন্দ করেন বলে জ্বলন্ত ধূপদানী হাতে এই ঘরে একটু বেশিক্ষণ থাকে সে। আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে ধূপ দেয়। অবশ্য মেজর প্রায়ই তখন বাগানে থাকেন।

সেদিন মেজরের মনে হল, মেয়েটাকে যেন কেমন নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। মুখ শুকনো, আর বেশ যেন রোগাও হয়ে গেছে। ওই মেয়ের কাছে নিজেই তিনি লজ্জিত ছিলেন এতদিন। ছেলের ভাবনায় ডেকে ভালো করে কথাও বলা হয় নি অনেক দিন। ডাকলেন, শোনো—

উর্মিলা কাছে আসতে আরো ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন তাকে। বললেন, বোসো, মা বোসো, তুমি আজকাল আর আস না কেন, বাগানেও দেখিনে—ছেলে দোষ করেছে, তার শাস্তিও পাচ্ছে, কিন্তু এই বুড়ো কি দোষ করল?

উর্মিলা পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু মেজরের এক হাতে তার হাত ধরা। হঠাৎ বিস্ময়ের শেষ নেই মেজরের। মেয়েটা একটু হাসতে চেষ্টা করে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। অন্য হাতে জ্বলন্ত ধূপদানী—তার চিবুক বুকের কাছে ঠেকল প্রায়।

হতভম্ব মেজর চিবুক ধরে মুখখানা তুলে ধরলেন আবার। দেখলেন চেয়ে চেয়ে। মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল তার। অস্ফুটস্বরে বললেন, এইজন্যেই এমন রোগা হয়ে গেছ, অ্যাঁ? ....ওই অপদার্থ ছেলের এত ভাগ্য হবে কখনো ভাবি নি মা। ভাবনা কি .....পুরুষমানুষ যাবে কোথায়? ভালোই আছে।

আরো দিন পাঁচ-সাত বাদে ছেলের খবর এল। বিদেশ থেকে নিজেই বাবাকে চিঠি লিখেছে। মিলিটারিতে ঢুকেছে সে—এখন ট্রেনিং এ আছে। আর বেশ ভালোই আছে। বাবা যেন তার জন্য চিন্তা না করেন।

বাড়িতে সাড়া পড়ল একটু। বাপের মনের দিকে চেয়ে বড় ভাইয়েরা আনন্দ প্রকাশ করল। ভালই তো হয়েছে। আজকাল এও তো কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে —নিজেদের দেশ।

উর্মিলার ম্লান মুখ দেখে সকলের অগোচরে মেজর তাকে চুপি চুপি বলেছেন, এই কাজে ঢুকুক তা অবশ্য আমি চাইনি, তবু মন্দের ভালো হয়েছে—ওর যা স্বভাব, এই লাইনে ভালোই করবে দেখ.....। আমিও তো একদিন ওই ছিলাম গো।

আগের থেকে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত মনে তিনি বাগান পরিচর্যা করেন। জল দেন, পাতা ছাঁটেন, মাটি নিড়োন।

ভালো না লাগলে খুরপি দিয়ে নরম মাটির ওপর আঁকিবুকি করেন। ছেলেবেলায় আঁকার অভ্যেস ছিল। আঁকার খাতায় অনেক সতীর্থের মুখ কৌতুকবিকৃত করে তাদের হাসাতে বা রাগাতে পারতেন।

তাঁর অগোচরে এই আঁকার খেলাটা পিছনে দাঁড়িয়ে ঊর্মিলা দেখল সেদিন। নিড়োন মাটির ওপর খুরপি চালিয়ে বড় করে ভারতের বাউন্ডারি আঁকা হয়েছে একটা। এই চিত্রটা শিশুও চিনতে পারে। কিন্তু এই মানচিত্রের মধ্যে আর কি আঁকতে চেষ্টা করছেন ঊর্মিলা বুঝতে পারল না।

তার সাড়া পেয়ে অপ্রস্তুত মুখে মাটির শিল্পকলা মুছে ফেললেন মেজর। কিন্তু ক্ষণকাল আগে তাঁর নিবিষ্টতা দেখে ঊর্মিলা বিস্মিত হয়েছিল।

দেশের নিশ্চিন্ত আকাশে যুদ্ধের গুরু গুরু ধ্বনি শোনা যেতে লাগল হঠাৎ। বিস্ময়-বিমূঢ় একটা ক্ষোভ পুষ্ট হতে লাগল ক্রমশ। সহজ দিনযাপনের ধারাটা যেন এক ঘোরাল হিংস্র বাঁকের মুখে থমকে দাঁড়াল।

হিমালয় যোগভ্রষ্ট হল। তার তুষারসমাহিত অঙ্গে পররাজ্যলোলুপ শত্রুর পায়ের ছাপ পড়তে লাগল। রক্তের দাগ মিশতে লাগল।

দেশের অদূরদর্শী শাসনযন্ত্র সচকিত হয়ে উঠল। আর শত সহস্র লক্ষ জনসাধারণের দৈনন্দিন শিথিল ধারা বড় রকমের নাড়াচাড়া খেল একটা।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। দেশব্যাপী একটা সম্মিলিত সঙ্কল্প দেখতে দেখতে পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠল, দেশের মাটি বিপন্ন—এগিয়ে এস, রক্ত দাও, জীবন দাও, যার যা আছে সব দাও!

দিতে লাগল। লক্ষ কোটি জনসাধারণের বুকের তলায় শুচিশুদ্ধ তর্পণ চলতে লাগল।

দিল্লির ওই বাড়ির হাওয়াও বদলাল। ছোট ভাই ইন্দ্রর জীবনটা হঠাৎ যেন কি জাদুতে বৃহৎ হয়ে উঠল ভাইদের কাছে, বউদের কাছে। উদ্দীপনায় ভরা তার এক-একটা চিঠি আসে মাঝে মাঝে। এখন এই সীমান্তে আছে সে—এখন ওই সীমান্তে। শেষ চিঠিতে ইন্দ্র লিখেছিল, জীবন যে এত বড় কাজেও লাগতে পারে এ কি জানতুম!

ভাইয়েরা আলোচনা করে, ভাইয়ের বউয়েরা আলোচনা করে। তাদের বিচ্ছিন্ন মানসিকতা ওই একজনকে কেন্দ্র করে মিলিত হয়। মেজর নন্দ কথা কম বলেন বরাবরই। ছেলেদের আলোচনা শোনেন, মন্তব্য শোনেন।

তেমনি নিয়মিত বাগান পরিচর্যা করেন—জল দেন, পাতা ছাঁটেন, মাটি নিড়োন। আর খুরপি দিয়ে নিড়নো মাটির ওপর ভারতের সেই মানচিত্র আঁকেন—তারপর আরো নিবিষ্ট মনে তার মধ্যে কি যেন বসাতে চেষ্টা করেন।

বসাতে চেষ্টা করেন ছেলেবেলার দেখা একটি রমণীর প্রতিকৃতি। যার হাতে একটা প্রদীপের উৎস। মানচিত্রের মধ্যে নীচে থেকে প্রায় হিমালয় পর্যন্ত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে—তার প্রদীপভাণ্ড থেকে সর্বতমসানাশী আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

ভারতমাতার ওই ছবিটি খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলেন তিনি। কি ভালো যে লাগত তিনিই জানেন। নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে দেখতেন। ধৈর্য সহিষ্ণুতা শান্তি আর শক্তির এমন সমাহিত মূর্তি আর যেন দেখেন নি তিনি। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই আবেগ ক্রমে মুছে গেছে। চিত্রটার কথা ভুলেও গেছেন। এমন কি নিজের কর্মজীবনেও মনে পড়ে নি।

মনে পড়েছে ছেলের সৈনিকের কাজে যোগ দেবার পর। খুরপি নিয়ে কাঁচা মাটির ওপর আঁকিবুকি করতে করতে।

কিন্তু সেই রমণীর মূর্তি কিছুতে আর মনের মত করে বসাতে পারেন না মানচিত্রের মধ্যে—স্মৃতিপটে কেমন যেন ঘষা মোছা হয়ে গেছে মুখখানা। সেই অভিব্যক্তি মাটিতে ফোটানোর চেষ্টা হাস্যকর জানেন। তবু ঝোঁক চাপে।

বাড়ির হাওয়ায় একটা স্তব্ধতা জমাট বাঁধতে লাগল আস্তে আস্তে।

আর চিঠি আসছে না। আর খবর মিলছে না।

অনেক দুর্যোগের খবর কানে আসছে। অনেক রক্তপাতের খবর।

শেষ চিঠি যেখান থেকে লিখেছিল ইন্দ্র—সেই এলাকা তখনকার মতো শত্রুকবলিত হয়েছে।

ভাইয়েরা ভাইয়ের বউয়েরা কানাকানি করে, চুপি চুপি আলোচনা করে। খেতে বসে বৃদ্ধ বাবাকে জোর গলায় আশ্বাস দিতে চেষ্টা করে।

মেজর নন্দ কথা বলেন না। ছেলেদের চেয়ে চেয়ে দেখেন। তাদের কথা শোনেন। রোদ কমলে বাগানে চলে যান। জল দেন, পাতা ছাঁটেন, মাটি নিড়োন।

খুরপি নিয়ে নিবিষ্ট মনে আঁকিবুকি করেন।

ভাইয়েরা তলায় তলায় সর্বদা খোঁজখবর করছে। সন্ধান পেতে চেষ্টা করছে। কে একজন আশ্বাস দিল ইন্দ্র যুদ্ধবন্দী হয়েছে।

......তাহলে তো প্রাণ বেঁচে আছে নিশ্চয়। সেটাই মস্ত সান্ত্বনা যেন। ভাইয়েরা আবার আলোচনা করে। জটলা করে। বাবাকে জানায়, ইন্দ্র বেঁচে আছে।

মেজর নন্দ তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেদের দেখেন। একটি কথাও বলেন না।

যুদ্ধের বাতাস স্থির হল একসময়।

তারপর একসময় শোনা গেল যুদ্ধবন্দীদের এক-এক কিস্তিতে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

ভাইয়েরা আবার তৎপর হল। ছোটাছুটি করে খোঁজ নিতে লাগল। একে একে কয়েকটা দলের মুক্তির খবর পেল। যে খবরের আশায় উন্মুখ তারা— সেই খবর মিলছে না।

কিন্তু আরো আছে। এখনো অনেকে আটকে আছে। অঘটন কিছু ঘটে থাকলে সামরিক বিভাগ ঠিক জানাত। ঠিক খবর দিত।

তাদের রেকর্ডে অঘটনের সংবাদ নেই।

উদগ্র যাতনা নিয়ে অপেক্ষা করে তারা। বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

তাঁকে আশ্বাস দেবার মতো ভাষাও মুখে আসে না। আরো স্থির, আরো স্তব্ধ তিনি। ছেলেদের নিরীক্ষণ করেন শুধু। ছায়া নামলে বাগানে যান। জল দেন, পাতা ছাঁটেন, মাটি নিড়োন। খুরপি দিয়ে আঁকিবুকি করেন।

পররাজ্য লোভী শত্রুর বিরুদ্ধে একটা নির্মম ক্রোধ ওই এক ভাইকে কেন্দ্র করেই আরো যেন বেশি করে এঁটে বসতে থাকল অন্য ভাইয়ের মুখে।

শেষ বন্দীর দলও মুক্তি পেল শুনে আবার ছোটাছুটি করল তারা। আশায় উদ্দীপনায় আবারও উন্মুখ হয়ে রইল।

না, এ দলেও ইন্দ্রের খবর নেই।

তবু আশা একেবারে নির্মূল হয়ে যায়নি। সরকারি তরফের খবর—আরো বন্দী আছে ওদের হাতে। সকলের মুক্তি মেলেনি এখনো।

কিন্তু বাবার দিকে চেয়ে, বাবার মুখ দেখে, ভীত শঙ্কিত তিন ছেলে। বাবা যেন পাথর হয়ে যাচ্ছেন। ওই ছোট ছেলে যে বাবার কতখানি এ তারা জানে। .....নিজেদেরও যে কতখানি তাই শুধু জানত না। কিন্তু নিজেরা তবু সামলাতে পারত যদি বাবার মুখ অন্যরকম দেখত। যদি তাঁর ওই স্তব্ধতায় এতটুকু ফাটল ধরাতে পারত।

বাবার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু দিনকতকের জন্য বাড়িতে এলেন অতিথি হয়ে। তিন ছেলে হাঁপ ফেলে বাঁচল। বাবার আড়ালে তাঁকে অনুরোধ করল, এই স্তব্ধতা থেকে বাবাকে যদি একটু টেনে তুলতে পারেন, যদি একটু আশা দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে পারেন তাঁকে।

বন্ধু সেই চেষ্টা করলেন। ঘরে কেউ ছিল না। দুজনে যুদ্ধের প্রসঙ্গেই আলোচনা করছিলেন। কথা বেশি বন্ধুই বলছিলেন। মেজর নন্দ শ্রোতা। তাঁর ছোট ছেলে ইন্দ্র পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছে, সেই মামুলি কথা বললেন বন্ধু। তারপর কতদিন বাদে কত সময় কত হারানো সৈনিক অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসে সেই গল্প করলেন। আর বার বার আশ্বাস দিতে লাগলেন, তুমি অত ভাবছ কেন ? একেবারে হতাশ হবার মতো খবর তো কিছু পাওনি। এখনো তো কত আটকে আছে ওদের হাতে। দেখো না, ইন্দ্র ঠিক ফিরে আসবে একদিন।

নিষ্পলক চোখে মেজর নন্দ চেয়েছিলেন বন্ধুর মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ বাদে স্পষ্ট মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে মেজর নন্দ বললেন, সেটা আমি আর চাইনে।

বন্ধু হতভম্ব, বিমূঢ়। কি শুনলেন হঠাৎ যেন বুঝে উঠলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললে ?

বললাম, ইন্দ্র ফিরে আসুক সেটা আমি আর চাইনে। ওর ভাইদের বুকের জ্বালা যেন না জুড়োয়, ক্ষত যেন না শুকোয়—দেশকে যারা গ্রাস করতে চায় তাদের যেন ওরা কোনোদিন ক্ষমা না করতে পারে—ইন্দ্র ফিরে এলে ওরা আবার সব ভুলে যাবে। ভাই ফিরে না আসার যন্ত্রণাটা যেন দেশের মাটি খোয়ানোর যন্ত্রণার সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকে ওদের বুকের মধ্যে।

ভারি কথাগুলো একটি একটি করে ঘরের বাতাসসুদ্ধু কেটে কেটে দিয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ সচকিত দুজনেই।

তাঁদের পিছনে চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়িয়ে আছে উর্মিলা। কখন এসেছে কেউ টের পায়নি।

তার মুখ কাগজের মতো সাদা। কাঁপছে থর থর করে। সমস্ত চোখেমুখে আর্ত বেদনা।

সেই রাতেই ছোট রকমের একটা করোনারি অ্যাটাক হয়ে গেল মেজর নন্দর।

দু'দিন সঙ্কটের মধ্যে কাটল। বাড়ির বাতাস বদলাল। ডাক্তারে ডাক্তারে বাড়ি ছেয়ে গেল। ছেলেরা দিবারাত্র শয্যায় বসে।

তারপর আশার সূচনা দেখা গেল।

তবু আরো চার-পাঁচদিন কি রকম বেঁহুশের মতো কেটে গেল। এবারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত।

মেজর নন্দ ঘুমোন বেশির ভাগ। যেটুকু সময় জেগে থাকেন, তাও কেমন আচ্ছন্নের ঘোরে কাটে। এলোমেলো ভাবনা, এলোমেলো চিন্তা। পরক্ষণেই হয়ত ভুলে যান আবার।

...কি যেন হয়েছিল। কি যেন সেদিন বলছিলেন তিনি বন্ধুকে। ....আর, কে যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। চমকে উঠলেন মেজর নন্দ। মনে পড়ছে। সেই আর্ত মুখ, আর্ত দৃষ্টি মনে পড়ছে।

সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে ঘরের মধ্যে। শিয়রের কাছে কে বা কারা বসে আছে খেয়াল করতে পারলেন না।

হঠাৎ আবার সচকিত তিনি।

সন্ধ্যার জ্বলন্ত ধুনচি হাতে ঘরে ঢুকেছে ও কে ? দু চোখ টান করে দেখতে লাগলেন। উর্মিলা...। তার হাতে জ্বলন্ত ধুনচি। কিন্তু আত্মবিস্মৃত বিহ্বল চোখে এ কি দেখছেন মেজর নন্দ ? এ কাকে দেখছেন তিনি ?

মেজর নন্দ মানচিত্র দেখছেন একটা। ভারতের মানচিত্র। যার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সর্বতমসানাশী প্রদীপের উৎস হাতে ধৈর্য সহিষ্ণুতা শান্তি আর সমাহিত শক্তির প্রতীক এক রমণী। যে রমণীর মুখখানা এতদিন এত চেষ্টা করেও তিনি ধরে উঠতে পারছিলেন না।

...দু চোখ টান করে জ্বলন্ত ধুনচি হাতে উর্মিলার মুখে অবিকল সেই মুখখানাই দেখছেন মেজর নন্দ।

ভোজন-রসিক আর বচন-রসিক মেসো বলে, বড় বড় রুই-কাতলা গঙ্গার ইলিশ আর পাঁটা-খাসী জন্মায় কেন ? আমরা খাব বলে। গাছে গাছে এত ফুল আর ফলে কেন ? (পেনসন নিয়ে শহরের এক প্রান্তে ফুল-ফলের বাগান সমেত মেসো বাড়ি কিনেছে) আমরা তাদের গন্ধ আর স্বাদ পাব বলে। বিজ্ঞানের এত পসার কেন ? আমরা নিজের মাথা বাঁচাব আর অন্যের মাথা ফাটাব বলে। কেরানি জন্মায় কেন ? অফিসারদের ঠেলা-গুঁতো খাবে বলে। আর অফিসাররা ? ভিজে-বেড়াল হয়ে তাদের ওপর-অলাদের মনোরঞ্জন করবে বলে। অতএব সকলের জীবন আর সকলের জন্ম সার্থক অন্যের জন্যে। তারপর মুখের ওপর আরো গভীরতর দর্শনের ছায়া টেনে এনে আর সেই সঙ্গে নির্লিপ্ত মাসির দিকে একটা তেরছা কটাক্ষ ছুঁড়ে গলার স্বর আরো মেলায়েম করে বলবে, এমন অপার অসীম যে ভগবান—তারই বা অস্তিত্ব কেন ? ...ইয়ে আমরা একটু ভক্তি-টক্তি আর পুজো-টুজো করব বলে।

এই শেষের মন্তব্যে বা উপসংহারে মাসির নিস্পৃহ দৃষ্টিটা এদিকে ঘুরবেই একবার। মুখখানা আরো কাঁচুমাচু করে ঘরের অন্য শ্রোতা বা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে মেসো বক্তব্যের ওই সারটুকুই ছেঁকে তুলতে চেষ্টা করবে আবার, অর্থাৎ কারো অস্তিত্ব নিজের জন্যে নয়, সব এবং সব কিছু অপরের জন্যে। আর ভগবৎ প্রসঙ্গেও দৈবাৎ যদি মাসির দৃষ্টি বক্তার দিকে না ফেরে (এ-রকম কমই হয়), অস্তিত্ববাদের আরো মিছরি-মাখান কোমলতর দৃষ্টান্ত শোনা যাবে, সাহসে ভর করে মেসো আর একটা ধাপ মাত্র এগোবে।—তোদের মাসীরই বা এত জপ-তপ পুজো-পাঠ কেন, আমাদের মতো অবুঝ পাপী-তাপীরা তরে যাবে বলেই তো।

মেসোর মুখে এ ধরনের পরিহাস শুনে রেবা হেসে বাঁচে না। একই ধরনের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত শুনেছে ঠিক নেই। আবার জোরে হাসার উপায় নেই। কারণ, মাসী ধারেকাছে না থাকলে মেসো এভাবে অন্তত মুখ খোলে না। বেশি হাসলে মাসি তখন ওকে ধমকেই মেসোকে শায়েস্তা করবে। বলবে, আ-কথা কু-কথা কানে এলে অত হাসিস কেন, স্বভাব বদলা।

ছেলেবেলা থেকেই মাসির কাছে মানুষ রেবা। সপ্তাহে তিন দিন বাপের কাছে থাকলে চারদিন মাসীর কাছে থেকেছে। কিন্তু মাসির থেকেও হাসি-খুশি মেসোকে দ্বিগুণ পছন্দ তার। মাসীকেও ভালবাসে অবশ্যই। কিন্তু কেমন ভয়-ভয়ও করে একটু। কখনো কোনো অন্যায় করে বসলে মা নেই বলে মাসি ছেড়ে কথা কয়নি। ঠিক ডাক দিয়েছে। বকা-ঝকা করলে অনেক সময় ভয় ভাঙে, কিন্তু মাসি তাও করে না বিশেষ। যেভাবে

বলবে যেন সেটাই শেষ কথা—এ-রকম কখনো করবি না, বা এ-রকম করতে নেই—এই গোছের দুই একটা স্পষ্ট ঠাণ্ডা অনুশাসনের প্রতিবাদও মুখে যোগায় না।

রেবা বড় হবার পর মাসি দিনরাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা পুজোর ঘরে কাটায় বলে উল্টে বকা-ঝকা তাকে ও-ই করে এখন। কিন্তু বড় হোক আর যাই হোক, সমীহ যে আসলে শুধু এই মাসিটিকেই করে সেটা নিজেও জানে। আর এইজন্যেই বরাবর মাসির থেকে মেসোকে বেশি পছন্দ তার।

বরানগরের বাসে চলেছে। গিসগিস ভিড়। এই ভিড়ের জন্যেই বাসে চেপে মাসির বাড়ি যাবার নামে গায়ে জ্বর আসে। বসতে পেল তো বাঁচল, না পেলে ধকলের একশেষ। মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকলে ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না গোছের ছেলেগুলোর চাপা-চাপি আরো যেন বাড়ে। আজ বসতেই পেয়েছে। পেলেও জানালার দিকটা পায়নি। ভিড়ের গুমোটে মুখ ঘেমে উঠেছে। সামনে পাশে পিছনে ওপরের রড ধরে ভিড়ের চাপ সামলে দাঁড়িয়ে আছে জনাকতক। একটু হাত ফসকালে তার গায়ের ওপর সব হুমড়ি খেয়ে পড়বে। একজন আবার তার সীট-এর কাঁধ ধরে টাল সামলে দাঁড়িয়ে আছে। বাসের ঝাঁকুনিতে হোক বা যে জন্যেই হোক পিঠের ওপর থেকে থেকে তার আঙুলের স্পর্শ পাচ্ছে। রেবার কখনো রাগ হয়, কখনো বিরক্তি। আবার মেজাজপত্র ভালো থাকলে (যা আজকাল কমই থাকে) কখনো নিরুপায় কৌতুক অনুভব করে।

আজ ছুটির দিন। ইচ্ছে করলেই বাসের ভিড় না ঠেলে বাড়ির গাড়িতে আসতে পারত। তার বাবা খুব বড়লোক বা খুব উঁচুদরের পদস্থ অফিসার কিছু নয়। মোটামুটি ভালো চাকরি করে। পৈতৃক বাড়ির দুটো ফ্ল্যাট ভাড়া পায় সাতশ টাকার ওপর। দুটো মাত্র মেয়ে, ঝামেলা নেই। তাই গাড়ি হয়েছে একটা। তাও হয়েছে কার তাগিদে রেবা খুব ভালো করেই জানে। ছুটির দিন না হলেও অফিসে বাবাকে টেলিফোন করলেই গাড়ি পাঠিয়ে দিত। দিত এইজন্যে যে গাড়ি সে কমই চায়। কলেজে যেতে-আসতে বাবার কাজের দরুনও একটা দিন গাড়ি না পেলে একজনেরই শুধু মুখ ভার হয়, রেবার হয় না। য়ুনিভার্সিটি থেকে তো ইচ্ছে করেই সে বাসে ফেরে। ঠেকে না পড়লে গাড়ির দাবি করে না।

দক্ষিণেশ্বরের পথ, ছুটির দিনেও বাসে ভিড় হবেই জানত। তবু যে গাড়ি বাড়িতে বসেই আছে সেই গাড়ি নিয়ে বেরুল না। এই বাসটির ভিড় আর গুমোট বিচ্ছিরি রকমের অস্বস্তিকর—তবু না। তার কারণ, গাড়ি নিলেই জানাজানি হবে কোথায় যাচ্ছে। আর তক্ষুনি দোসর জুটবে। জুটবেই জানে।

তাই রেবা ঘামে জবজবে হয়েও বাসে চলেছে।

· কিন্তু অত ঘাম হচ্ছে ভিড়ের জন্যে, গুমোটের জন্যে, না আর কোনো কারণে? রেবা সেটা বিশ্লেষণ করছে না। ভয়ানক একটা অস্বস্তি লাগছে শুধু। এই অস্বস্তির মুখেই মেসোর মাসিকে ঠেসদেওয়া অস্তিত্ববাদের রসিকতা মনে পড়েছে। যা শুনে আগে অনেক হেসেছে, অনেক মজা পেয়েছে। অথচ আজ তার একটুও হাসি আসছে না, উল্টে ভিতরে কোথায় জ্বালা-জ্বালা করছে।

...মেসো যে ঠাট্টা মাসিকে করে সেটা হুবহু রেবার বেলাতে খাটে। খেটে যাচ্ছে। তার জন্ম আর অস্তিত্বই যেন আর একজন তার সব কিছু নেবে বলে, গ্রাস করবে বলে। ওই আর একজন আসবে বলেই অকালে তার মা মরেছে আর ছ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মা ঘরে এসেছে। ওকে বঞ্চিত করে ওই আর একজন তার বাপের বুকখানা গোটাগুটি দখল করবে বলেই দ্বিতীয় মা-ও দশ বছর না যেতে চোখ বুজেছে। যে মাসিকে পেয়ে আট মাস বয়সেও মা-কে হারিয়ে রেবা মায়ের অভাব কখনো টের পায়নি, ওই আর একজন দশ বছর বয়সে তার মা-কে খুইয়ে দিব্বি এই মাসিরও স্নেহ কাড়তে শুরু করেছিল। আর পরের এই দশ-এগার বছর ধরে তো রেবার নিজস্ব মাসিটির ওপর দাবি আর আব্দার কম চালাচ্ছে না।

রেবা অনেক দিন খুঁটিয়ে ভেবেছে, তলিয়ে বিচার করেছে। বাড়িতে ওই একজনই সব, তার জন্যেই সব। ওই শিপ্রা—তার বৈমাত্রেয় বোন শিপ্রার জন্যে। মাত্র দু বছরের ছোট তার থেকে। কিন্তু শিপ্রা আব্দার ধরলে বাবার চোখে এমন কি আজকাল মাসির চোখেও ও কত যে ছোট রেবার থেকে ঠিক নেই যেন। প্রায় জন্মায়নি এত ছোট। কিন্তু রেবার তা বলে হিসেবে ভুল নেই, তার তেইশ চলছে, শিপ্রার একুশ। কিন্তু স্বার্থের বেলায় ধাড়ি মেয়ের একুশ ছেড়ে এক হতেও লজ্জা করে না। আর, আশ্চর্য সকলে সেবেলায় দিব্বি প্রশ্রয় দেয়।

সেই থেকে চোখেমুখে একটা কঠিন রেখা পড়ে আছে রেবার মুখে। মেসোর ঠাট্টা শুধু ওর বেলাতেই যে অক্ষরে অক্ষরে, সত্য তাতে কোনো ভুল নেই। শিপ্রা তিলে তিলে ক্ষয় করবে বলেই ওর অস্তিত্ব, শিপ্রা ওকে শূন্য করে দিয়েছে, শূন্য করে চলেছে, আরো শূন্য করে দেবেই। শিপ্রা চাইলে ওকে বোধ হয় দুনিয়ার সব দখল ছাড়তে হবে। আর চাওয়ার ব্যাপারে ওই মেয়ের চক্ষুলজ্জার কানাকড়িও নেই। এমন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে রেবা জীবনে আর দেখেছে কিনা জানে না। মাসি শুনলে খুশি হয় না, তবু রাগের মুখে মাসিকে সে এ কথা অনেকবার বলেছে।

রাস্তার দিকে চোখ পড়তে রেবা সচকিত হল একটু। ওই সামনের স্টপে বাঁয়ের রাস্তা ধরে দু মিনিট হাঁটলে সঞ্জীবের বাড়ি। নেমে একবার দেখে যাবে কেমন পড়াশুনা চলছে? নাঃ, কলেজের নতুন মাস্টারি থেকে ছুটি নিয়ে আই. এ-এস পরীক্ষা দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। উন্নতির চুড়োয় ওঠার স্বপ্নের মধ্যে রেবা অসময়ে হাজির হয়ে ছন্দপতন ঘটাবে কেন? রেবার মতে কলেজের মাস্টারি বেশ লোভনীয় চাকরি। কিন্তু তার মত নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

ঘড়ি দেখল। আর খানিকবাদেই বাড়িতে শেখর চাটুজ্জে এসে হাজির হবে। আসার কথা আছে। টেলিফোনে রেবাই তাকে আসতে হুকুম করেছিল বলতে গেলে। আর তার গম্ভীর গলা শুনে শেখর যে রীতিমত ঘাবড়েছিল, তাও বেশ অনুভব করা গেছে। এসে দেখবে রেবা বাড়ি নেই। বাড়ির ঝিয়ের মুখে শুনবে হঠাৎ মাসির জরুরী টেলিফোন পেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। কিন্তু মাসি মোটেই জরুরী টেলিফোন করেনি তাকে। টেলিফোন সেই করেছিল মাসিকে। মাসি বলেছিল ছুটির দিন যখন শিপুকে নিয়ে চলে

আয় না। রেবা শিপ্রাকে বাদ দিয়েই চলেছে মাসির বাড়িতে।

বাড়িতে এসে সে নেই শুনলে শেখরের ফর্সা মুখখানা কি রকম হবে কল্পনা করতে চেষ্টা করল। অপমানে লাল হবে না নিশ্চয়। উল্টে স্বস্তিবোধ করবে। আর ভাববে, টেলিফোনে শেখর বার বার বিশেষ কাজের অজুহাতে আজকের দিনটা এড়াতে চেয়েছিল বলে রাগ করে রেবা মাসির বাড়ি চলে গেছে। তাকে জব্দ করার জন্য, আক্কেল দেবার জন্য। এবারে রেবার ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস দেখা গেল একটু। ভাবুক, যা-খুশি ভাবুক। রেবা ভাবাতেই চায়। আর মাত্র দুটো মাস অনেক কিছুই ভাবাতে চায় রেবা। সেদিনের কথা মনে পড়তে সত্যিই হাসি পেল। বাবা রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবে যায়। বাড়িতে তারা দু'বোন মাত্র, ঝি আর ঠাকুর নিজেদের কাজে ব্যস্ত। শিপ্রা নিজের ঘরে বই নিয়ে বসে আছে। তলব পেয়ে সেদিনও শেখর এসেছিল। রাত সাড়ে সাতটায় সময় দিয়েছিল—ঠিক সময় ধরেই এসেছিল। রেবা বাইরের ঘরে বসায়নি তাকে, নিঃশব্দে নিজের ঘরে এনে বসিয়েছিল। তারপর কাছে এসে, খুব কাছে এসে চোখে চোখ রেখে তাকিয়েছিল। শেখরের ফর্সা সুন্দর মুখে বিড়ম্বনার ছায়া পড়েছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করতে চায়নি। হেসে বলেছিল, ব্যাপারখানা কি, ঘরে ডেকে এনে মার-ধর করবে নাকি?

রেবা বলেছিল, না তোমাকে দেখছি।

—কি দেখছ?

—তোমার বাইরেটা এত সুন্দর কেন?

শেখর হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, আর ভেতরটা?

—ভেতর নিয়ে খটকা লাগছে, সে কি আমার ভুল?

এত কাছে দাঁড়িয়েছিল রেবা যে শেখরের দু চোখ লোভে চকচক করে উঠেছিল। সন্তর্পণে দরজার দিকে চেয়ে একটু নিশ্চিত হয়েছিল ও। দরজা ভেজান। তার কাঁধে একখানা হাত রেখে বলেছিল, মেয়েরা য়ুনিভার্সিটিতে পড়লে কি হবে, বড় সেন্টিমেন্টাল।

রেবা বলেছিল, যদি ভুল করে থাকি দোষ নিও না, মনটা কেন যেন সেই থেকে বিচ্ছিরি হয়ে আছে।

বাসে বসে সে-কথা মনে পড়তে রেবার হাসি পাচ্ছে বসে, কিন্তু কাঁধের যে জায়গায় শেখর হাত রেখেছিল আর তার লুব্ধ আঙুলগুলো একটু একটু চাপ দিচ্ছিল—সে জায়গায় একটা স্পর্শ এখনো যেন চিনচিন করছে। না, এতখানি সুযোগ শেখরকে এর আগে আর দেয়নি।...রেবা কি করবে, প্রাণের দায় বিষম দায়। ও নিঃসন্দেহে জানত এ ব্যাপারটা তৃতীয় কেউ দেখেছে, তাদের কথাবার্তা তৃতীয় কেউ শুনেছে। ছাদের ওই অন্ধকার দিকের জানালাটা সে বন্ধ করেনি। রেবা নিঃসংশয় ওখানে শিপ্রা এসে দাঁড়িয়েছিল। শেখর চলে যাবার পর শিপ্রার মুখে বহুক্ষণ পর্যন্ত চাপা হাসি আর চাপা বিদ্রূপের ছটা দেখছে।

ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল রেবার। মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল। একটা দারুণ অস্বস্তি যেন ভেতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে বার বার। সেই জন্যেই নিজের ওপরে

রাগ, নিজের উদ্দেশ্যে ভ্রূকুটি।

...হ্যাঁ,, যা ভাবছিল তার অস্তিত্ব শুধু শিপ্রার জন্য। তার যা কিছু আর সব কিছু ও-ই দখল করবে, গ্রাস করবে—এমন হবে কেন? রেবা রূপসী নয়, কিন্তু সুশ্রী বলে সবাই। স্বাস্থ্য ভালো, দীর্ঘাঙ্গী, ভাসা-ভাসা চোখ। দোষের মধ্যে গায়ের রং মাজা আর কোমর-ছড়ানো চুল নয় একমাথা। তার সব থেকে বেশি প্রশংসা পড়াশুনার ব্যাপারে। বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস থার্ড হয়েছিল ইতিহাসে, সকলেরই ধারণা এম. এ-তেও ফার্স্ট ক্লাস পাবেই। কিন্তু রেবা ঘোষাল জানে এবারে তার পরীক্ষা একটুও ভালো হবে না। হবে না ওই শিপ্রার জন্যে। এত অশান্তি মনে চেপে পড়াশুনা হয় না। অশান্তির থেকেও রেবার রাগ বেশি। যে দুশ্চিন্তা তার মাথায় এসেছে—সেই থেকে রাগ আর অশান্তি যেন গোটাগুটি দখল করে বসে আছে তাকে।

প্রথম অশান্তি, শিপ্রা সত্যিকারের রূপসী। তার তুলনায় ঢের বেশি রূপসী। ও সঙ্গে থাকলে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। রেবাকে জব্দ করার জন্যেই যেন ওর অত রূপ। গায়ের রং ধপধপে ফর্সা, একমাথা চুল, দোহারা গড়ন। ফ্রক-পরা বয়েস থেকেই নিজের রূপের দেমাক টনটন। এক-একটা চাউনি বিঁধে হাবা ছেলেগুলোর বুকের তলায় কবে কি কাণ্ড বাঁধাল—দিদিকে জড়িয়ে ধরে হেসে গড়িয়ে সে গল্প করত কলেজে ঢোকার আগেই। এখন বি. এ. পড়ছে না তো স্বর্গের রাণীটি হয়ে রাজত্ব করছে যেন। পরীক্ষা এলে তখনই শুধু দিদিকে ধরে কান্নাকাটি।

কিন্তু আজ নয়, রেবা মনে মনে ওকে দেখতে পারে না সেই ছ-সাত বছর বয়েস থেকেই। যখন থেকে মাসির কোলে ছেড়ে সে বাবার কাছে এসে স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, আট মাস থেকে ছ-সাত বছর পর্যন্ত একটানা মাসির কাছেই আনন্দে কাটিয়েছিল সে। কিন্তু বাবার কাছে আসার পর প্রতিদিন যেন সেই আনন্দ উল্টো ধাক্কা খেয়েছে।

তার নতুন মা অর্থাৎ শিপ্রার নিজের মা সামনাসামনি খুব দুর্ব্যবহার করেনি তার সঙ্গে, কিন্তু ওই নতুন মায়ের আসল টান যে নিজের মেয়ের ওপর এটা রেবা বেশ বুঝতে পারত। শিপ্রাকে নিয়ে লাফাত ঝাঁপাত আদর করত, ও কাছে গেলে বলত তুই তো বড় হয়েছিস, তোকে আদর করতে হবে? আদর সময়-সময় না যে করত তাও নয়, কিন্তু রেবার তাতে মন ভরত না। আর তাতেই হিংসুটে মেয়ে জ্বলে অস্থির হত। শিপ্রার একটু কিছু হলে নতুন মা যত অস্থির হত, রেবার জন্য তার সিকিও হত না বলে ধারণা।

কিন্তু রেবার সব থেকে বেশি রাগ হত বাবার পক্ষপাতিত্ব দেখে। সেই পক্ষপাতিত্ব বাবা যে এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাতে রেবার একটুও সন্দেহ নেই। ওইটুকু বয়েস থেকে রেবার যা কিছু তারই ওপর ওই হিংসুটে মেয়ের লোভ, আর সেই লোভে বাবার প্রশ্রয়। আদুরে মেয়ের বায়না এড়াতে না পেরে রেবার স্কুলের বই পর্যন্ত বাবা ওর হাতে দিয়েছে, আর সেই বই একসময় ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে মজা দেখেছে শিপ্রা। রেবার কান্নাকাটির ফলে বাবা অবশ্য আবার নতুন বই কিনে দিয়েছে, সেই সঙ্গে শিপ্রার জন্যেও বেশ দাম দিয়ে ঝকঝকে তকতকে নতুন ছবির বই কিনেছে।

দোকানে গেলে জামা-ফ্রক বা যে কোনো শখের জিনিস রেবার পছন্দ হবে সেটাই শিপ্রার চাই। রেবাকে অন্য জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। নতুন মা যখন নেই, তখন বাবার আদরে মেয়ের এই হিংসুটেপনা যেন আরো বেড়েছে। ভালো শাড়ি কিনতে হলে বাবা আগে শিপ্রাকেই পছন্দ করতে বলে। কিন্তু শিপ্রা দিদির পছন্দ কোনটা তাই আগে বুঝতে চেষ্টা করবে। বুঝতে পারলে সেটা ছাড়া কোনোটাই আর পছন্দ হবে না। অনেক সময় পরেও দুজনের শাড়ি বদলা-বদলি করতে হয়েছে—কারণ পরে পছন্দের ব্যাপারে শিপ্রার মত বদলেছে। বাবা ওমনি বলেছে, দিয়ে দে, তুই তো বড়।

সব ব্যাপারে এই। বাড়িতে যে মাস্টার রেবাকে পড়াতো, শিপ্রার ঝোঁক তার কাছেই সে-ও পড়বে। তার বিশ্বাস ওই মাস্টারের জন্যেই দিদির পরীক্ষার ফল এত ভালো হয়। সেই একই মাস্টারের কাছে দুজনারই পড়ার ব্যবস্থা হল। তারপরেই রেষারেষি। মাস্টারকে ও-ই সারাক্ষণ দখল করে থাকবে। আর বাবার কাছে উল্টে নালিশ, দিদি ওকে পড়তে দেয় না, আর মাস্টারও সারাক্ষণ খালি দিদিকেই পড়ায়।

শিপ্রার ওপর রেবা জীবনে হয়ত একদিন মাত্র খুশি হয়েছিল। শিপ্রাকে আছড়া-আছড়ি করে কাঁদতে দেখে। রেবার বয়েস তখন বারো আর শিপ্রার দশ। নতুন মা মরে গেল। কষ্টে রেবারও কম হয়নি। সে-ও কাঁদছিল হাপুস নয়নে। কিন্তু শিপ্রার কান্না দেখে অবাক। স্বার্থপর হিংসুটে মেয়ে যে এরকম কাঁদতে পারে, তার ধারণা ছিল না। নতুন মা মারা যাবার কদিন আগেও তো আদুরে মেয়ে কতভাবে অবাধ্য হয়েছে তার, আর কত রকমের কষ্ট দিয়েছে।

ওই নতুন মা মরে যাবার পর থেকেই বাবা আরো বেশি বদলে গেল। বাবা যেন দিনে দিনে মা হতে চেষ্টা করল শিপ্রার। আর তখন ওর সঙ্গে একটু ঝগড়া হলেই বাবা শুধু রেবার দোষ ধরত, আর তাকেই বকত।

'প্রভু এত কাছে থেকেও তুমি এত দূরে কেন? সমস্তক্ষণ সব কিছুর মধ্যে তোমাকে দেখি, তবু আমার চোখ এমন অন্ধ কেন? এত মায়াচ্ছন্ন কেন আমি? তোমার কাছে আমি কিছু চাইব না—এ অভিমানই বা আমার কেন? আমি যে অনেক চাই। সব কিছুর মধ্যে আমি তোমাকে চাই। তোমার বিশ্বসৃষ্টির মমতার গুণ আমাকে দাও, তোমার নিঃস্বার্থ দয়ার গুণ আমাকে দাও, তোমার অপরিসীম ক্ষমার গুণ আমাকে দাও—'

মাসীর পুজোর ঘরের দরজার সামনে রেবা থমকে দাঁড়িয়েছিল। শেষটুকু কানে যেতে চমকে উঠল কেমন।...'তোমার অপরিসীম ক্ষমার গুণ আমাকে দাও'। হঠাৎ এত অস্বস্তি বোধ করছে কেন রেবা? ঘরে না ঢুকেই চলে যেতে ইচ্ছে করছে কেন? কি একটা অদৃশ্য যন্ত্রণা এভাবে খচ-খচ করে উঠল কেন?

ঘরে ঢুকল। মাসির নাকে চশমা, সামনে খোলা খাতা। আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা প্রার্থনা একটা। মনে দাগ কাটার মতো কোথাও কিছু শুনলে বা পড়লে মাসি নিজের হাতে ওই খাতার মধ্যে তা সংগ্রহ করবেই। খাতাটা ভর্তি হয়ে গেছে প্রায়। এটা কোনো নতুন সংগ্রহ বোঝা গেল। ঘরে ঢুকে রেবা গম্ভীর। ভিতরের ওই হঠাৎ অস্বস্তি গোপন।—বেশ, এই বিকেল পর্যন্ত উপোস করে আছ তাহলে?

কথা শুনে মাসি অবাক।—তোর হল কি, আজ শিবচতুর্দশী, শিবপুজোর উপোস আমার তাও ভুলে গেলি নাকি!

রেবারই উল্টো বিড়ম্বনা। ভুলেই গেছে বটে। এ ক'ঘণ্টায় অনেক কিছু ভুল হয়ে গেছে।

মাসি জিজ্ঞাসা করল, কই শিপু কই? শিপুকে আনিসনি?

রেবা হঠাৎ ঝাঁজিয়ে উঠল, কেন, আমি এসেছি তাতে খুশি হওনি? আমি তাকে আনিনি, ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি—বুঝলে?

মাসি থতমত খেল একটু। তারপর হেসেই বলল, তোর বয়েস হচ্ছে না দিনে দিনে খুকি হচ্ছিস, শুনি? বাতাস থেকে অশান্তি ডাকিস কেন? নে, হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আয়, দুপুরের পুজোর অনেক প্রসাদ আছে—বসে খা।

মাসির বাড়িতে বেশিক্ষণ ভালো লাগল না রেবার। কি যেন ছটফটানি একটা। আসার সময় ভেবেছিল, বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়ে দেবে রাতটা মাসির কাছেই থাকবে। কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতে বাড়ি ফিরে এল।

বাড়ি ফিরেই ঝিকে জিজ্ঞেস করল, কেউ এসেছিল কিনা। কিন্তু ঝিয়ের জবাব শুনে রেবা অবাক। কেউ আসেনি। তবে সে বেরিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছোটদিদি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরেনি।

ঝিকে বিদায় করে রেবা গুম হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। অস্বস্তি বাড়ছেই। থেকে থেকে মাসির আকুতি-ভরা কণ্ঠস্বর কানে বাজছে, 'তোমার অপরিসীম ক্ষমার গুণ আমাকে দাও।' অকারণে রেবার রাগটা যেন মাসির ওপরেই সব থেকে বেশি।

রাত বাড়ছে। রেবার রাগ বাড়ছে। অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। কেন যে এত ছটফট করছে নিজেই বুঝতে পারছে না। রাত নটা বাজে, ধিঙ্গি মেয়ের এখনো দেখা নেই। একটু বাদে বাবা ক্লাব থেকে এসে পড়বে, খোঁজ করবে—কিন্তু ওর তো সাতখুন মাপ।

শিপ্রা ফিরল যখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। রেবা ঠিকই লক্ষ্য করেছে। প্রায় চোরের মুখ শিপ্রার। আড়ালে আড়ালে থাকছে।

রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেল। বাবা নিজের ঘরে চলে গেল। ঝিকে এটা-সেটা বুঝিয়ে দিয়ে রেবা ঘরে এসে দেখে শিপ্রা তার ঘরে বসে আছে। শুকনো মুখ।

এ-রকম বড় হয় না। রেবা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। ও ফেরার পর থেকেই মনে হয়েছে কিছু একটা ঘটেছে। সন্দেহটা আরো পাকা-পোক্ত হল এখন।

উঠে এসে শিপ্রা হঠাৎ জড়িয়ে ধরল তাকে, কোলে মুখ গুঁজতে চেষ্টা করে বলল, দিদিভাই, তুই আমাকে ক্ষমা কর, এই শেষবারটির মত ক্ষমা কর—কতবার তো করেছিস আর একটিবার কর।

শিপ্রা জানে না একবারও রেবা ওকে ক্ষমা করেনি। রেবা ঠেলে তুলেছে শিপ্রাকে, খরখর দু চোখ তার মুখের ওপর বিঁধিয়ে রেখেছে। বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন ভয়ানক কেঁপে উঠেছে রেবার। কিন্তু ও সেটা বুঝতে দিতে চায় না।

—কি হয়েছে?

শিপ্রা নিরুত্তর।

হঠাৎ তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কি জন্যে ক্ষমা করতে হবে? কি করেছিস তুই? কোথায় ছিলি সমস্ত দিন?

কি করেছে বা কোথায় ছিল সেটা রেবা ওর কাছ থেকে বার করে নিয়েছে। রেজিস্ট্রি অফিসে আগেই নোটিস দেওয়া হয়েছিল, আজ শিবচতুর্দশীর দিন কাগজের বিয়ের দলিল সই হয়ে গেল। শেখরের সঙ্গেই ছিল সমস্ত দিন, তাদের বাড়িতে ছিল।

রেবা স্তব্ধ, বিবর্ণ, পাংশু।

ব্যাপারটা শেষ করে ফেলার পর শিপ্রা ঘাবড়েছে একটু। দিদিকে জড়িয়ে ধরে আবার বলে উঠল, তুই বিশ্বাস কর দিদি, ও তোকে একটু ভালোবাসত না, তুই একটুও সুখী হতিস না—সই করার পর থেকে আমার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে আছে, আমি তো এরপর চলেই যাব এখান থেকে, এবারটি ক্ষমা কর দিদিভাই—আর বাবাকেও—

কিন্তু দিদির মুখের দিকে চেয়ে আর কথা যোগালো না তার। এই মূর্তি আর সে দেখেনি। কোনোদিন দেখেনি।

শিপ্রা আবার কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠাস করে গালে একটা চড় পড়তে মাথাটা ঘুরেই গেল বুঝি। চোখে হলদে সবুজ কি দেখে উঠল কয়েক নিমেষে।

রেবা উঠে দাঁড়াল। আর একটা চড় দেবার জন্য হাত তুলেছিল, সেই হাত দিয়ে ঠেলে সরাল ওকে। আর্ত চাপা স্বরে বলে উঠল, তুই এই করে এলি? এই করে এলি তুই? ঠেলতে ঠেলতে তাকে দরজার কাছে নিয়ে এলো, চলে যা তুই আমার সমুখ থেকে। চলে যা, চলে যা, চলে যা।

চড় খেয়ে শিপ্রার খেদের মুখোশ গেছে। এ-রকম একটা চড় জীবনে খায়নি, তাও কিনা এই দিদির হাতে। দু চোখ ধক-ধক করে জ্বলে উঠল তার। কাজটা করে ফেলার পর চক্ষুলজ্জা যে হয়নি তা নয়, ঘাবড়েও ছিল একটু। কিন্তু দিদিকে এভাবে তোয়াজ করার আসল উদ্দেশ্য বাবার দিকটা সামলান। বাবার সে-ই আদরের মেয়ে বটে, আর বিয়েটাও এমন কিছু বেজাতে করেনি—তবু বিয়ে বলে কথা, বাবা শুনলে আকাশ থেকে যে পড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু চড় খাবার পর আর এভাবে তাকে ঠেলে ঘর থেকে বার করার পর বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে শিপ্রার চোখ ঝলসেছে। ও নিজেই বলবে বাবাকে। আর এই অপমানের শোধ নেবে। এত সাহস। যা করেছে বেশ করেছে, বুক জুড়োবার মতোই জব্দ করেছে। কার কত কদর বুঝুক। আরো বুঝিয়ে ছাড়বে।

রাত বেড়েই চলেছে।

রেবা মূর্তির মত বসে আছে বিছানায়। বসেই আছে। নিস্পন্দ, চিত্রার্পিত। কিন্তু বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

নিঃশব্দে রাত গড়িয়ে চলেছে। বসেই আছে রেবা। থেকে থেকে মাসির কণ্ঠস্বর

যেন এক-একটা চাবুক হয়ে পিঠের ওপর পড়ছে, 'তোমর অপরিসীম ক্ষমার গুণ আমাকে দাও—।'

পুব-আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। একটু বাদে ভোরের আলোর আভাস দেখা যাবে।

রেবা উঠল। কাগজ কলম নিয়ে বসল। নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ঘুচেছে। এবারে একটা চিঠি লিখবে।

লিখল। থমথমে মুখ। হাত একটুও কাঁপল না। চিঠিটা সঞ্জীবের নামে। সে আই. এ. এস. পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত এখন। কিন্তু রেবার পরীক্ষাটা যে বড় মর্মান্তিক। সময় পার হয়ে গেলে লোভ তাকে আবার বিষোবে কিনা কে জানে।

'—এ চিঠি পাবার পর আর তুমি আমাকে ঘরে নেবে কিনা জানি না। তবু সমস্ত রাত ভেবে ভোরের দিকে বসে খুব ঠাণ্ডা মাথায় তোমাকে লিখছি।

আমার বোন শিপ্রার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এমন বিশ্বাসঘাতকতা কোনো শত্রুও করে কিনা জানি না। করেছি তোমাকে পাবার লোভে। সেই লোভের চরম ফল আজ পেলাম। শিপ্রার স্বভাবের গল্প তোমাকে করেছিলাম। করেছিলাম কারণ তোমাকে নিয়েও আমার সমস্যা ছিল। শিপ্রার অত রূপ বরাবর আমি ভয়ের চোখে দেখতাম। তুমি কাছে আসার পর সে ভয় দ্বিগুণ হয়েছিল।

আমাদের বাড়িতে কদিন তোমাকে দেখে ওর ভিতরটা উসখুস করে উঠেছিল আমি তা খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছিলাম। তুমি কি করতে জানি না, কিন্তু তোমার শিক্ষা-দীক্ষা, তোমাদের বংশের নামডাক, আর সেই সঙ্গে তোমাকে ভালো করে জানার সুযোগ পেলে তোমার আমার মাঝে ও এসে দাঁড়াতেই। সব থেকে বেশি দাঁড়াত আমার দুর্বলতা টের পেলে। ছেলেবেলা থেকে ওকে জানি বলেই এই দুশ্চিন্তা আমার অসহ্য হয়েছিল।

তাই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম। তোমার দিক থেকে ওর চোখ ফেরাবার জন্যে একজনকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। শেখর চাটুজ্জেকে তুমি জান, তোমাদের সঙ্গেই পড়ত—তাকে। কলেজে পড়তেই মেয়েদের নিয়ে তার দুর্নাম ছিল, আমার দিকেও তার চোখ ছিল। আমি তাকে ভালোই জানতাম। কলেজ ছাড়ার পরেও তার অনেক কুৎসিত ব্যাপার আমার কানে এসেছে। তবু তাকেই প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। কারণ ওই রকমই একখানা সুন্দর মুখ আমার দরকার ছিল।

তারপর আমি যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছিল, আমার আর শেখরের মাঝে শিপ্রা এসে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়াবার সুযোগ আমিই করে দিয়েছিলাম। সমস্ত কুৎসিত দিক ঢেকে শেখরের সুন্দর মুখের সব কিছু সুন্দর করে তুলেছিলাম শিপ্রার চোখে। এমন কি ওর কাছ থেকে শেখরকে আগলে রাখার অভিনয়ও একটু-আধটু করেছি।

ভেবেছিলাম, তোমার কাছে তোমার ঘরে যেতে পারলেই শিপ্রার ভুল ভেঙে দেব। ওর কাছে শেখরের মুখোশ খুলে দেব। আর, কেন এ ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম তাও ওকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেব।

কিন্তু সময় পেলাম না। যা কল্পনা করিনি তাই হয়েছে। আজ ওরা রেজিস্ট্রি বিয়ে

করে এসেছে। শুধু রূপসী দেখে বিয়ে করার লোক শেখর নয়, মনে হয়, এই এত বড় বাড়ির ভবিষ্যৎ মালিক আমরা দুই বোন—সেই লোভেই বিয়ে করেছে। কোনো অঘটন না ঘটে আমি শুধু সেদিকেই সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলাম—বাবাকেও ও গোপন করে শিপ্রা এভাবে বিয়ে করে বসতে পারে সেটা আমার মাথায় ছিল না। স্বার্থে অন্ধ না হলে হয়ত থাকত।

শিপ্রা জানে না ও কি করেছে। নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে এখন। কিন্তু একদিন তো জানবে। সমস্ত রাত বসে আমি ওর সেই জানার হাহাকার শুনেছি। এখনো শুনছি।

যাক, এরপর কোনো অভিযোগ না করে তোমার বিচার আমি মাথা পেতে নেব। বিচার কোরো। দয়া কোরো না। বুকের ভিতরটা এখন শুধু বিচারের আগুনে জ্বলে জ্বলে বাঁচতে চাইছে।—রেবা।

মাসির কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে রেবা। অনেকবার ডুকরে উঠেছে, মাসি-মা গো, শিপ্রার আমি কি করলাম—এখন আমি কি করব তুমি বলে দাও মাসিমা।

মাসি স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলো অনেকক্ষণ। কিন্তু মুখখানা শান্ত কমনীয় এখন। কান্নায় বাধা দিচ্ছে না। কিছু বলছেও না। আস্তে আস্তে তার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শুধু।

অনেকক্ষণ কেঁদে রেবা ঠাণ্ডা হল একটু। কি মনে হতে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখে জল, মুখে আশা। মাসিকে ধরে বলে উঠল, আমি, ক্ষমা জানিনে মাসিমা, তোমার ঠাকুর তো জানে, সমস্ত জীবন ধরে আমি যদি প্রার্থনা করি, শিপ্রার ভালো হবে না? শেখর ভালো হবে না? এমন তো হতে পারে মাসিমা—বলো না?

মাসির মুখখানা আরো স্নিগ্ধ আরো কমনীয় দেখাচ্ছে। এমন বুঝি আর দেখেনি। রেবা। অধীর যাতনায় উন্মুখ হয়ে সে জবাবের আশা করছিল। জবাব পেল না।

কিন্তু মাসির এই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তাব মনে হল ঠাকুরের ক্ষমা মিলতে পারে।

প্রগতিভস্ম

সীমান্ত তখনো হিমালয়ের মুক্ত প্রহরায় নিশ্চিন্ত। তার তুষার অঙ্গ কোনো অতর্কিত দস্যুর লোলুপতায় রক্তস্নান করে উঠতে পারে, এ সম্ভাবনা তখনো কল্পনার বাইরে। আমাদের ঘরের পাশ আমাদেরই সমবয়সী আর এক রাজ্যের স্বাধীনতা তখনো বৈমাত্রেয় হানাহানির প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়নি। উদার শিথিল নয়া শাসনের ফাঁক দিয়ে দেশের আড়তদার মজুতদারের নির্মম লোভ গোটা আকাশটাকে তখনো এভাবে কালো করে দেয়নি।

মোট কথা সেদিনের সেই অদূরদর্শী নিশ্চিন্ততার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া অনেক সহজ ছিল। অতএব তেমনি এক দিনে আমি—বাংলাদেশের এক দৈনিকের স্বল্প বেতনের

সামান্য এক সাংবাদিক, মস্তিষ্কের কোষে কোষে যে অশান্ত যাতনা আর ভাবনা বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি, তার সঙ্গে কোনো বৃহৎ সমস্যার যোগ ছিল না। সেই রাতে আমার বাংলা দৈনিকের স্বল্প-বেতন এক সামান্য সাংবাদিকের মাছের মতো দুটো খোলা চোখের উপর দিয়ে একের পর এক যে দৃশ্য পার হয়ে গেছে, তার সঙ্গেও হৃদয় নামে এক অবুঝ বস্তুর যোগ ছাড়া আর কোনো বাস্তবের সম্পর্ক ছিল কিনা আমার জানা নেই।

আমি শুধু ভেবেছি, মাত্র একটা বছরের মধ্যে কেন এমন হল। নিজের প্রতি নিজের অপরিসীম মমতা। সেই মমতা নিজের অক্ষমতাকে লালন করতে চায় হয়ত। কিন্তু সেই কটা বিনিদ্র রাতে এই স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতিও আমি সজাগ, সচেতন ছিলাম বোধ হয়। নন্দিতা বসুর সেই প্রগল্‌ভ উক্তি থেকে আমি প্রশ্রয়ের রসদ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করিনি। বা হুইস্কির গোলাসের রঙিন বস্তুর সঙ্গে প্রদীপ বসুর ঘন ঘন ক্ষোভের নিঃশ্বাস মিশতে দেখেও নিজের অনুকূলে কোনো রঙিন ইশারা খুঁজিনি। আমি শুধু ভেবেছি মাত্র একটা বছরের মধ্যে এমন হল কেন? মিলিটারি চাকরির চটকে তখনো তো কোনো দুর্যোগের ছায়া পড়েনি, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রয়োজনগত সামরিক ব্যবধান অনিবার্য হয়ে ওঠেনি। টাকার মান তখনো এত খেলো হয়ে যায়নি, তরুণ ক্যাপ্টেন প্রদীপ বসু যা রোজগার করে তাতে অনেক আরাম অনেক স্বাচ্ছন্দ্য কেনা যায়। আজ এই মুলুকে, কাল সে মুলুকে—চাকরির তখন থ্রিলএর দিকটাই বেশি, যা নন্দিতা বসুর স্বভাবের সঙ্গে মেলে। তবু এ-রকম হল কেন?

গত দু মাসের মধ্যে তিন দিন গিয়েছিল নন্দিতার বাড়িতে। বাড়ি বলতে এখানে তার বাপের বাড়ি। ওই বাড়ির নিচের তলায় দীর্ঘকাল বাস করেছি আমি। সম্পর্কটাও ঠিক বাড়িঅলা-ভাড়াটে গোছের ছিল না। নন্দিতাকে আমি ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতে দেখেছি, শাড়ি পরে কলেজ করতে দেখছি। বছর চারেক নিচে পড়তে আমার থেকে, পরীক্ষার সময় ওর চিরাচরিত দুশ্চিন্তার ফাঁক ধরে গুরু-গম্ভীর মুখে কিছু মাস্টারি করারও সুযোগ পেয়েছি ওর ওপর। সে এম. এ. পড়তে ঢুকে সেই মাস্টারির শোধ নিতে চেয়েছে। আমাকে বলেছিল, প্রাইভেটে তুমিও এম. এ. পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হও, এবার থেকে আমি তোমাকে পড়াব।

কিন্তু তখন আমি সংবাদিকতার পাকা রাস্তা ধরেছি, আমার হাবভাব কলেজের মাস্টারের মতো। নন্দিতা বলত, মাথার মধ্যে সর্বদা খবর ঠেসে নিয়ে বেড়াও আর বসে বসে সমস্যার জাল বোনো—এ আবার চাকরি নাকি।

না, নন্দিতার জন্য একদিনের জন্যও বন্ধু প্রদীপ বসুর সঙ্গে আমার মতান্তরের কারণ ঘটেনি। নন্দিতাকে বুঝতে একদিনের জন্যেও ভুল করিনি। বন্ধুর সঙ্গে মানসিক বিরোধ হয়ত দেখা দিতে পারত, যদি নন্দিতার চিন্তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকত। তা ছিল না। সে আমাকে বিশ্বাস করত, শ্রদ্ধা করত, পছন্দও করত। কিন্তু সেটা বাড়ির নিষ্ঠাবতী গৃহিণীর পরিচিত পুরোহিতের প্রতি বিশ্বাস শ্রদ্ধা আর প্রীতির মতই। জীবনের সমস্যার সঙ্গে যোগ, জোয়ারের সঙ্গে নয়।

বি. এ. যখন পড়ে, তখন চেহারার জোরে মেয়েকে কোনো আই. এ. এস. পাত্রের

হাতে দেবার কথাই ভেবেছিলেন তার বাবা-মা। কিন্তু মেয়ের আবার তাও পছন্দ নয়। চেহারা দেখে এক ছেলেকে তো সে নিজেই বাতিল করে দিল। পরে তাকে বলতে শোনা গেছে, এসব বড় চাকরে ছেলের মধ্যে লাইফ নেই—সর্বদা যেন তারা পোস্টটাকে মুখে এঁটে নিয়ে বেড়ায়।

এঞ্জিনিয়ার ?

দূর দূর, দেখতে দেখতে একেবারে মেহনতী মন হয়ে যায় ওদের ! আর ডাক্তারদের দেখলে তো ওর মায়াই হয়। অসুখ শুনলে যাদের আনন্দ তারা কৃপার পাত্র।

আর প্রোফেসার ?

যেভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসেছিল, সেই চাউনির সাদা অর্থ, তার থেকে সাংবাদিকও ভালো। অবশ্য প্রোফেসারের প্রসঙ্গ আমি তুলিনি। কথা হচ্ছিল ওর দিদির সঙ্গে আমার মায়ের। কোন্ প্রোফেসার ছেলে নাকি বোনকে বিয়ে করতে চায়। নন্দিতা তখন সেখানে ছিল, আর আমিও। একটা বই আড়াল করে নন্দিতা আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসছিল তখন।

নন্দিতার বিয়ের ব্যাপারে মায়ের আগ্রহের কারণ আর কেউ না হোক আমি বুঝতে পারতাম। তাই অনেক দিন তাঁকে সতর্ক করে দিতে হয়েছে, পাছে মনের অভিলাষ কখনো ব্যক্ত করে বসেন। প্রদীপ এ বাড়ির জামাই হতে পারে সেটা অবশ্য গোড়াতেই আমার মনে হয়নি। তবে তার হাসিখুশি বেপরোয়া ফুর্তি নন্দিতার যে ভালো লাগত সেটা লক্ষ্য করেছিলাম, প্রদীপ আমারই বন্ধু, আমার কাছেই আসত। আমার থেকে বাড়ির অবস্থা ভালো, চেহারা ভালো, নিজের অজ্ঞাতেও ভালো। মিলিটারি চাকরিতে ঢুকছে শুনে নন্দিতা বলেছিল ওকে ওসব কাজেই মানায়।

কিন্তু চাকরির শুরুতে লেফটানেন্টের মর্যাদা মেয়ের মা-বাবার চোখে অন্তত বড় ব্যাপার কিছু নয়। তাছাড়া কোথায় কোথায় গিয়ে থাকবে মেয়েটা ঠিক নেই। কিন্তু লেফটানেন্ট থেকে সে যখন ক্যাপ্টেন হল তখন মেয়ের উৎসাহ দেখেই তাঁরা মনোভাব বদলালেন বোধ হয়। বছরে এক মাসের ছুটিতে আসত। মিলিটারি চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই তার চালচলন হাবভাব, এমন কি চেহারার মধ্যেও পুরুষকার-ব্যঞ্জক পরিবর্তন এসেছে, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, সর্বদা আঁটসাঁট ফিটফাট, নিয়মিত পরিশ্রমে দেহের কাঠামোও যেন আর একভাবে পুষ্ট হয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন প্রদীপ বসু কলকাতায় বদলী হয়ে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আমার মনে হয়েছিল নন্দিতার বিয়েটা এবারে হয়ে যাবে।

অবসর পেলে চুপচাপ আমি শুধু একটা কাজ করেছি। বাড়ি খুঁজেছি। আর কপালজোরে পেয়েও গেছি। যেখানে থাকতুম সে তুলনায় যা পেয়েছি সেটা আদৌ লোভনীয় নয়। নন্দিতার বাড়ির সকলে, বিশেষ করে তার মা বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি শুনে অবাকই হয়েছিলেন। একটানা বিশ বছর এ বাড়িতে বাস। এর পর অন্য ভাড়াটে এলে ডবলেরও বেশি ভাড়া মিলতে পারে। ভাড়াটে অবশ্য আর এ বাড়িতে বসান হবে না জানি। কিন্তু এতকাল একসঙ্গে থাকার ফলে আমরা অন্যত্র উঠে গেলে ভালো

হয়, এ-রকম আভাস কেউ কখনো দেয়নি। এমন কি ভাড়া বাড়ানর কথা পর্যন্ত বলেনি কখনো। যেটুকু পেরেছি আমি নিজেই স্বেচ্ছায় বাড়িয়েছি।

এক্ষেত্রে আমার মতো অবস্থার লোকের অনেক বেশি ভাড়া গুনে অন্যত্র উঠে যাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয় খুব। মা-কে যে কারণ দেখিয়েছিলাম তিনি সেই কথাই বলেছেন ওদের। কাগজের অফিসের চাকরি, যখন তখন ডিউটি, অফিসের কাছে বাড়ি হলে সুবিধে হয়।

অবশ্য সাত-পাঁচ ভাবার মত কারণও তখন পর্যন্ত কিছু ঘটেনি। নন্দিতা মিত্র তখনো নিজেই স্থির করে উঠতে পারেনি সে নন্দিতা বসু হবে কিনা। বাড়ির অন্য কেউও না। তবু হঠাৎ চলে যাচ্ছি শুনে নন্দিতা চুপচাপ অনেক সময় আমাকে লক্ষ্য করেছে। বাড়ি একেবারে পাকাপাকি ঠিক করে নিয়ে তবে এ বাড়ি ছাড়ার খবরটা সবিনয়ে ওর মায়ের কাছে পেশ করেছিলাম। নন্দিতা তারপর শুনেছে। শুনে নেমে এসেছে। কিন্তু আমি তখন মায়ের সঙ্গে গোছগাছে ব্যস্ত বলে তেমন জেরা কিছু করতে পারেনি। মাকে শুধু বলেছে, মাসীমা এ কি রকম কথা, আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

মায়ের মনে ওই মেয়ের প্রতিই অভিমান একটু হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু বুদ্ধিমতী মা আমাকে একটুও বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেননি। আমার অসুবিধের কথাই বলেছেন। আর বলেছেন, কলকাতা থেকে কলকাতায়, হামেশাই দেখা হবে—বিশেষ করে তাদের যখন গাড়ি আছে, ইচ্ছে করলেই তো গরীব মাসিমাকে গিয়ে দেখে আসতে পারবে।

স্বভাব অনুযায়ী নন্দিতার বাধা দেবার কথা, কিন্তু বাধা দিতে সে চেষ্টা করেনি, বা দিতে পারেনি। দু চোখ শুধু মাঝে মাঝে আমার দিক ফিরতে দেখছি।

যাবার আগের দিন শুধু হাসিমুখে বলেছিল, এখানে তাহলে খুব অসুবিধের মধ্যে ছিলে?

আমি বলেছি, খুব না, অল্পস্বল্প। বয়েস হচ্ছে, নাইট ডিউটির শেষে অফিসের টেবিলে খবরের কাগজ পেতে ঘুমুতে আর ভালো লাগে না।

নন্দিতা বলেছে, কিন্তু নিজের সুবিধে দেখতে গিয়ে মাসিমার অসুবিধে ঘটালে। মাসের মধ্যে কতবার তো বাইরে যেতে হয়, তখন মাসিমাকে দেখবে কে?

আমি হেসে আঙুল দিয়ে মাথার ওপরের দিকটা দেখিয়ে দিয়েছি।

নন্দিতা টিপ্পনী কেটেছিল, ওপর-অলার ওপর বেশ ভক্তি বেড়েছে দেখছি।

ভক্তি নয়, দুর্বলের নির্ভরতা বলতে পারো।

আমি জানি মনে মনে নন্দিতার রাগ হয়েছে। এতকালের সম্পর্ক কাটিয়ে হঠাৎ এভাবে চলে যাব, এ সে চায়নি। কিন্তু আমার এই সামান্য সাংবাদিক জীবনকে যে কোনো অন্তরঙ্গ চিন্তার মধ্যেও ও স্থান দেয়নি কখনো—সেই জবাবটা যে এইভাবে দিয়ে যাব তাও কখনো ভাবেনি। একটু অসহিষ্ণুতাও এইজন্যেই। কিন্তু রাগ হোক আর যা-ই হোক, আমাকে সে নির্বোধ ভাবেনি শেষ পর্যন্ত, এটুকু সান্ত্বনা নিয়েই আমি মানে মানে বিদায় নিয়েছি।

নতুন বাড়িতে আসার কদিনের মধ্যেই ও এসেছিল একদিন। খুপরি দু'ঘরের বাস দেখে মায়ের আড়ালে ঠাট্টা করেছে, বেশি ভাড়া দিয়ে প্রাসাদ যোগাড় করেছ!

এর ঠিক তিন মাসের মধ্যে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়েতে গেছি আনন্দ করেছি। জাঁকজমক দেখে মনে মনে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। যা মানায় তাই হয়েছে। অন্যরকম কিছু হলে সেটা এক হাস্যকর করুণার ব্যাপার হত।

কিন্তু ওদের বিয়ের মাত্র এক বছরের মধ্যে এ কি ঘটে গেল! বিয়ের কদিন বাদেই প্রদীপ শ্রীনগরে বদলি হয়েছিল। বদলির খবর পেয়ে নন্দিতা মহাখুশি। এই রকম জীবনই তো চেয়েছিল সে।

প্রায় বছর ঘুরতে একদিন শুনলাম নন্দিতা কলকাতায় এসেছে। এবং কিছুদিন থাকবে এখানে। আর প্রদীপ মাসখানেক বাদে বছরের ছুটি পেলে আসবে। মা গেছলেন দক্ষিণেশ্বরে, সেখানে কার কাছ থেকে খবরটা শুনে আমাকে বলেছেন।

সময় করে একদিন এলাম দেখা করতে। দেখে ভালো লাগল। একটু মোটার দিক ঘেঁষেছে বটে, কিন্তু দেখতে আরো অনেক সুন্দর হয়েছে। আমি ঠাট্টা করেছি, কাশ্মীরের জল-বাতাসের গুণ আছে দেখছি।

নন্দিতা হাসিমুখে চোখ পাকিয়েছে, কেন, আগে দেখতে খুব কুৎসিত ছিলাম?

নন্দিতা অনেক হাসল, অনেক গল্প করল। কত নতুন জায়গা দেখেছে, কত বেড়িয়েছে সেই গল্প। আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, ও বেচারাকে একা নির্বাসনে ফেলে রেখে নিজে পালিয়ে এলে কেন? জোড়েই গেছলে, জোড়েই আসতে না হয়।

এ কথায়ও নন্দিতা হাসল খুব। বলল, ওটা নির্বাসনের জায়গা তোমাকে কে বললে? আমার মত রূপসী অনেক আছে সেখানে।

বললাম, সেটাও কি খুব নিশ্চিন্ত থাকার মত কথা?...তা মিলিটারি চাকরের বউদের কদর কেমন?

নন্দিতা যেন মজাদার প্রসঙ্গ পেল একটা। বলল, পীস্ টাইমে কদর খুব। ঝকঝকে তকতকে আসবাবপত্রের মতো ঝকঝকে বউও থাকে একটা করে। সকলে তাকে পরখ করে দেখে, প্রশংসা করে, আবার তেমন ইচ্ছে হলে ধরে একটু-আধটু নাড়াচাড়া দেবার সুযোগ সুবিধেও আছে।

সেদিন শুধু মনে হয়েছিল নন্দিতার কথাবার্তা আগের থেকেও অনেক বেশি বেপরোয়া হয়েছে।

এর পর দু'দিন নন্দিতাই আমাকে অফিসে টেলিফোন করে ডেকে পাটিয়েছে। জরুরী তলব। কিন্তু দেখা হলে হেসেছে, বলেছে, সাংবাদিকদের জরুরী দরকার না বললে তারা দশ কাজের ফিরিস্তি দেয়। তারা যে ইম্পর্ট্যান্ট লোক সেটা বোঝাতে চায়।

একদিন বলল, চল বেড়িয়ে আসি, আর একদিন প্রস্তাব করল, চল একটা সিনেমা দেখে আসি।

দ্বিতীয় দিনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রদীপ আসছে কবে?

ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছে, কে জানে আসতেও পারে নাও আসতে পারে।

না এলে তোমার ছুটির মেয়াদ তো ফুরিয়ে এল?

আমার। আমার কি? নন্দিতা হেসে উঠল।—আমার এখন অনেক ছুটি, এমন কি ছুটি আর নাও ফুরোতে পারে।

খট করে কথাটা লাগল কানে। আর নন্দিতার অত হাসিও কেন যেন স্বাভাবিক লাগল না খুব। কিন্তু সেদিনের প্রসঙ্গও শেষ পর্যন্ত হাল্কা ঠাণ্ডার মধ্যেই শেষ হল।

দিন চারেক বাদে প্রদীপ বসু কলকাতায় এসেছে, আর সেইদিনই বিকেলে আমার অফিসে হানা দিয়েছে। ক্যাপ্টেন হবার পর থেকে আমার সঙ্গে দেখা করার এতটা আগ্রহ আর লক্ষ্য করিনি। তার তাগিদে হাতের কাজ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বেরিয়ে আসতে হল। আমার নিজেরও কৌতূহল ছিল। ওই মুখের দিকে চেয়েই মনে হয়েছে, সমাচার কুশল নয়। মুখখানা গম্ভীর। গাম্ভীর্যের আড়ালে একটা শুকনো বিষণ্ণতা চাপা পড়ে আছে।

দেখা হতে জিজ্ঞাসা করেছি, কবে এলে? চারদিন আগেও তো নন্দিতার সঙ্গে দেখা হতে বলল আসছ কিনা ঠিক নেই।

ওর দু চোখ আমার মুখের ওপর সচকিত হল একটু। বলল, আজ সকালে এসেছি।...তোমাকে আমার সঙ্গে বেরুতে হবে, কথা আছে।

আমার ভিতরে ভিতরে কি একটা অস্বস্তি দানা পাকিয়ে উঠছে। অফিস থেকে ট্যাক্সি করে সোজা একটা নামকরা হোটেলের দোতলার ঘরে নিয়ে এল আমাকে। রাস্তায় মামুলী দু'চারটে কথা হল শুধু।

ঘরে ওর সুটকেস আর বিছানা দেখে আমি হতভম্ভ।—কি ব্যাপার, শ্বশুরবাড়িতে ওঠনি?

প্রদীপ মাথা নাড়ল।

নন্দিতার সঙ্গে দেখা হয়নি?

সকালে গেছলাম। দুপুরে সেখানেই খেয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, কি ব্যাপার, তোমাদের ভাবগতিক তো তেমন ভালো ঠেকছে না।

ও ফিরে তাকাল আমার দিকে। চাউনিটা খুব সরল ঠেকল না।—নন্দিতা তোমাকে কিছু বলেছে?

কি বলবে?

মিলিটারিতে চাকরি করলে চোখের দৃষ্টি এ-রকম হয় কিনা আমার জানা নেই। দৃষ্টিটা আরো একটু মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিল, 'তোমাদের' বললে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, তোমাকে ভাই একটু সাহায্য করতে হবে।...ও এত অবুঝ আমার জানা ছিল না। এসব চাকরি যে ইচ্ছে করলেই ছাড়া যায় না, ছাড়লেও কান ধরে হিড়হিড় করে আবার টেনে নিয়ে যাবে, সেটা ও কিছুতেই বুঝবে না। এখন আমি কি করি বলো তো!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

—চাকরি ছাড়বে!—কিন্তু তোমার এই চাকরিই তো ওর খুব পছন্দ ছিল!

—হুঁঃ, নইলে বাঙালি মেয়ে আর কাকে বলে—বান্ডল অভ্ সেন্টিমেন্টস, বান্ডল অভ্ নার্ভস্। এখন এই চাকরি না ছাড়লে সম্পর্ক যেতে বসেছে।

আমি নির্বাক।

প্রদীপ বলল, এই চাকরির আর একটা দিক আছেই। পার্টি-ডান্স ড্রিঙ্ক-ডান্স। সব অফিসারের স্ত্রীরাই এতে যোগ দিয়ে থাকে—এর থেকে সরে থাকলেই বরং কথা ওঠে, দুর্নাম হয়। বাঙালি মেয়েরা ড্রিঙ্ক বা ডান্সে বিশেষ পার্টিসিপেট করে না বলে এমনিতেই হাসে ওরা। কিন্তু তা বলে কেউ কাউকে ধরে বেঁধে নাচতে নামায় না বা মদ গেলায় না। এসব পার্টির জন্য একেবারে চাকরি ছাড়তে হবে এমন অবুঝ আব্দার কখনো শুনেছ? ইংরেজ আমলের শুরু থেকে মিলিটারি চাকরিতে যেটা একটা রীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে?

এ-রকম কিছু শোনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। আমার ভালো করে কিছুই বোধগম্য হয়নি তখনো।

তুমি একটা কাজ করবে, নন্দিতাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে একবার এই হোটেলে নিয়ে আসবে?

...তুমিও চল না।

আমি দুবার গেছি, চেষ্টাও করেছি। কিন্তু জোর করে যে অবুঝ হবে তাকে বোঝাব কি করে? আসা দূরে থাক, পাঁচটা কথাও বলেনি।

...আর শ্বশুরবাড়িতে এ-রকম পরিস্থিতি, বুঝতেই পারছ। তারাও জেনেছে, জামাইটা অমানুষ। তুমি যাও না একবার।

আমি দ্বিধান্বিত।—আমি গেলে আসবে?

প্রদীপ হাসল। এ হাসিটা আমার ভালো লাগল না খুব। বলল, আসবে আসবে—সী অ্যাডোর‌স্ ইউ। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও, আমি এখানে বসে আছি।

অগত্যা উঠতে হল। ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি। কেবলই মনে হতে লাগল যেটুকু শুনলাম সেটুকুই সব নয়। এই মান অভিমানের পালা দু'দিনে মিটে যাবে বটে, কিন্তু সূচনাটা ভালো লাগছে না।

বাড়িতেও নিরিবিলিতেই পেলাম নন্দিতাকে। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে এলাম। খবর পাঠাতে চাকর এসে দোতলায় ডেকে নিয়ে গেল আমাকে। ওর বাবা-মাকে এড়াবার জন্যেই আমি নীচের থেকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

ওপরে উঠে দেখলাম নন্দিতা একাই আছে। শুনলাম তাঁর বাবা-মা বেরিয়েছেন কোথায়। বললাম, তোমাকেও তো এক্ষুনি একটু বেরুতে হচ্ছে, রেডি হয়ে নাও।

ছদ্মবিস্ময়ে দু চোখ কপালে তুলে ফেলল নন্দিতা, কোথায়? কার সঙ্গে?

—আমার সঙ্গে। কোথায় সেটা অপ্রকাশ্য।

নন্দিতা ভ্রূকুটি করল তৎক্ষণাৎ, অপ্রকাশ্য স্থানে তোমার সঙ্গে আমি যেতে যাব

কেন ?

হাসিমুখে চেয়ে রইল একটু, তারপর বলল, বোস—।

সে উঠে গেল। আমি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

কিন্তু একটু বাদেই আবার ফিরে এল ও। সামনাসামনি বসে বলল, তোমার ট্যাক্সিটা বিদায় করে দিয়ে এলাম। এবার বলো কি খবর ?

দ্বিগুণ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লাম আমি। নন্দিতা হাসতে হাসতে বলল, দোতলার জানালা থেকে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখে তোমাকে ভিতরে আসতে দেখেই বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য ভালো নয়।

আমি জোর দিয়ে বললাম, কিন্তু আমি ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি—না গেলে হবে না।

নন্দিতা হাসছে তবু।—আ-হা, বিয়ের আগে যদি এ-রকম জোর দিয়ে কথা কইতে জানতে ! যাব কেন, তোমার বন্ধু হাঁ করে বসে আছে বলে ? আর আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তুমি একটু আত্মতৃপ্তি লাভ করবে বলে ?

অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি বাড়ছে আমার। বললাম, নন্দিতা ছেলেমানুষি কোর না—সত্যি বেচারা বড় মন-মরা হয়ে আছে।

নন্দিতা ব্যঙ্গ করে উঠল, মন-মরা কেন, ওই হোটেলে হুইস্কি নেই ?

রকম-সকম দেখে আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি। বললাম, তুমি না গেলে আমাকে উঠতে হচ্ছে এখন। কিন্তু আমার কথাটা রাখ, চল।

নন্দিতার মুখের হাসি গেল। চুপচাপ বসে রইল খানিক। আড়ে আড়ে দেখল দুই-একবার। তারপর জিজ্ঞেস করল, তুমি শুনেছ সব ?

যেটুকু শুনেছি তারই ওপর নির্ভর করে বললাম, শুনেছি, কিন্তু চাকরি বা বিয়ে কোনোটাই অত ঠুনকো জিনিস নয়, চল।

ও... ! হঠাৎ যেন মুখের ওপর একপশলা তপ্ত ব্যঙ্গ ছড়ালো নন্দিতা।—শুনেও এসেছ একটা উদার ফয়সালা করে দিতে ! কেন ? ডিভোর্স যদি সত্যি হয়ে যায়, তাহলে পাছে তোমার ঘাড়ে চাপি এবার, সেই ভয়ে ?

আমি বিমূঢ় !...ডিভোর্স ! এ বলে কি ! আস্তে আস্তে বললাম, না, তোমাদের ছেলেমানুষি এতটা গড়িয়েছে ভেবে আসিনি আমি। তাছাড়া, ঘাড়ে চাপার ইচ্ছে থাকলেই চাপা যায় না। এখন যাবে কিনা বল !

নন্দিতার মুখে অল্প অল্প হাসি দেখা দিল আবার। টিপ্পনী কাটল, তোমার কথাবার্তা পুরুষমানুষের মতো হয়েছে আজকাল। বিয়ের আগে যেদিন বাড়ি ছেড়ে গেলে সেদিন থেকেই তোমাকে কেমন ভালো লাগতে শুরু করেছে আমার।

আমি বললাম, আর তোমার কথাবার্তা বড় বেশি ঢিলেঢালা হয়ে পড়ছে।

তাই তো। সব সঙ্গদোষে, বুঝলে ? যাক্, অতটা দুর্ভাবনার কারণ নেই তোমার, বন্ধুকে গিয়ে বলো, আমার কথার নড়চড় হবে না— একেবারে সুবিনীতা দাসীটা হয়ে পায়ে পায়ে ফিরব, কিন্তু ওই চাকরির মায়া তাকে ছাড়তে হবে। এমন কিছু এমারজেন্সি

টাইম নয় এখন—চেষ্টা-চরিত্র করে কত লোকে চাকরি ছেড়েছে ঠিক নেই। তার ওপর পার্মানেন্ট কমিশন তো এখনো অ্যাকসেপ্ট করেনি, চেষ্টা করলে ছাড়া পাবে না কেন ?

কথা কাটাকাটি আমারও ভালো লাগছিল না, তাছাড়া কি ঘটেছে না ঘটেছে ভালো করে জানি না। তবু বললাম, তাহলে তোমার মতে যোগ্য লোকেরা দেশরক্ষার কাজে যাবে না ?

নন্দিতা চটে গেল তৎক্ষণাৎ। ঝাঁঝিয়ে উঠল, বড় বড় কথা বল না। যোগ্য লোকেরাই যাবে, অযোগ্য লোকেরা যাবে না। চাকরির নিন্দে কে করেছে ? ওই চাকরি শুনেই তো আমি লাফিয়ে পড়েছিলাম। তোমার বন্ধুই ও-কাজের উপযুক্ত নয়, এ-রকম অযোগ্য লোক আরো অনেক দেখেছি, কিন্তু তাদের নিয়ে ভেবে কি করব ?

অতএব একাই আমি হোটেলে ফিরে এলাম। প্রদীপ গুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর তিক্ত বিরসমুখে বলে উঠল, মেয়েছেলের এমন অবুঝ গোঁ হয় আমার জানা ছিল না।

রাত্রিতে সে হুইস্কি নিয়ে বসেছে।

সেই ফাঁকে আমি ছোট একটা ঘটনার আঁচ পেয়েছি। আর এই সঙ্গে প্রদীপের পানের মাত্রা দেখে আর ক্রমশ ভাবের পরিবর্তন দেখে ওদের এক বছরের জীবনযাত্রার চিত্রটা মোটামুটি অনুমান করতে পেরেছি।

...ওদের অনেক উৎসবেই অফিসারদের সস্ত্রীক যোগদানের রীতি। গোড়ায় গোড়ায় নন্দিতা খুশি হয়েই যেত। ক্যাপ্টেনের বউ হলেও বড় অফিসাররা তাকে খাতির-যত্ন করত। কেন করত তা সকলেই জানে, সেটাও অখুশির কারণ নয়।

কিন্তু প্রদীপের সঙ্গে খিটিরমিটির বাধতে লাগল ওই পান-পর্বের আর নাচগানের ব্যাপার নিয়ে। প্রদীপের ইচ্ছে নন্দিতা এই ফাঁকে নাচটা শিখে নেয়। আর নন্দিতার ইচ্ছে প্রদীপ একটু-আধটু খায় খাক, কিন্তু ওভাবে গেলার কি হয়েছে ! ওর সব থেকে বেশি অসহ্য, সে-সময়ে মেয়েদের সঙ্গে একটু-আধটু ফুর্তি করতে দেখলে।

—কতদিন যে আমাকে অসভ্য বর্বর মাতাল বলেছে, সে যদি জানতে ভাই, কিন্তু আমি এ পর্যন্ত তার কোন স্টেপ নিয়েছি ?

দু'দফা গেলাস খালি করবার পরই প্রদীপের মুখখানা কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠেছিল।

শেষের ঘটনাটা ঘটেছিল ওই কাশ্মীরের এক ক্যাম্পের উৎসবে। নতুন এক কর্নেল এসেছিল সিন্ধি। লোকটা ঝানু পাজি। আর তেমনি মেজাজ তার। মদের পিপে খালি করেও শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সেই লোকটা নন্দিতার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করল। সে কোনো অনুষ্ঠানে না এলেই প্রদীপকে চোখ রাঙাত পর্যন্ত, বউকে আনোনি কেন ? শরীর খারাপ শুনে একদিন তো গিয়ে দেখতেই হাজির। আর তার কিছু হয়নি বুঝতে পেরে পরে একগাদা অফিসারের সামনে ঠাট্টা-ইশারায় প্রদীপকে নাজেহাল করেছে।

তারপর সেই উৎসবের রাতে কি যে কাণ্ডটা হল ! প্রথম দফা নাচ আর আনন্দের পর রীতি অনুযায়ী 'লাইট অফ' হয়ে আবার আলো জ্বলে উঠতেই নন্দিতার দিকে

চেয়ে প্রদীপ হতভম্ব। সে কাছেই ছিল। কিন্তু তার সেই রক্তবর্ণ মুখ দেখে প্রদীপের নেশা কেটে যাওয়ার সামিল। তিনশ ব্লাড-প্রেসারেও মুখ অত লাল হয় কিনা প্রদীপ জানে না। একটা সোফায় বসেছিল সে, নন্দিতা কাছে এসে জানাল সে তক্ষুনি বাড়ি যাবে।

কিন্তু যাচ্ছি যাচ্ছি করেও প্রদীপ সোফা ছেড়ে উঠতেই পারছিল না। অদূরে কর্নেল দাঁড়িয়ে হাসছিল মিটিমিটি। কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ফিলিং ব্যাড?

স্ত্রী জবাব না দেওয়ায় অগত্যা প্রদীপই জানালো স্ত্রীটি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এক্ষুনি বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।

প্রদীপ উঠে ভালো করে দাঁড়াতে পারছে না দেখে কর্নেল আবার তাকে এক ধাক্কায় সোফার ওপর ঠেলে ফেলে দিল। তারপর ওই একদঙ্গল মেয়েপুরুষের মধ্যে নন্দিতার কাঁধ ধরে সবিনয়ে বলল, কাম অন ম্যাডাম্, আ'উইল গিভ ইউ এ লিফ্ট্।

এর ঠিক দু'দিনের মধ্যে টিকিট যোগাড় করে নন্দিতা একাই সোজা কলকাতা চলে এলো। এসেই চিঠি, হয় আমাকে ছাড়, নয়তো চাকরি ছাড়।

আর, তারপর পর পর ক'রাত আমার—বাংলা কাগজের এক অখ্যাত সাংবাদিকের চোখ থেকে ঘুম সরে গিয়েছিল। আমি শুধু ভেবেছি আর ভেবেছি। কিন্তু ঠিক কি যে ভেবেছি আমি জানি না।

এর দিন তিনেক বাদে নন্দিতা অফিসে টেলিফোন করে ডেকেছে আমাকে। বাড়ি আসতে বলেছে। আমি কাজের অজুহাত দেখিয়ে এড়াতে চেষ্টা করেছি। শেষে নরম করে কিন্তু স্পষ্ট করেই বলেছি, তোমাদের মধ্যে একটা আশাপ্রদ বোঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত আমার আর যাওয়া সম্ভব নয়।

টেলিফোনের ওধারে হঠাৎ একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল নন্দিতা। আর একটি কথাও বলেনি। রিসিভার ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল খানিক। তারপর লাইন কেটে দেওয়ার শব্দ কানে এসেছে।

আরো দিন দশেক বাদে প্রদীপের চিঠি পেলাম, ওদের বোঝাপড়া হয়েছে। প্রদীপ নন্দিতাকে নিয়ে মাদ্রাজ বেড়াতে এসেছে। ছুটি ফুরোলে কর্মস্থলে ফিরবে।

একে একে চৌদ্দটা বছর কেটেছে তারপর।

খর বাস্তবের মরুপথে বুকের তলায় গঙ্গা-যমুনার অনেক ধারা নিঃশ্বাষে হারিয়ে গেছে। মানুষের অনেক স্বপ্ন ভেঙেছে, অনেক আশা বাসি হয়েছে। যুগের চিন্তদাহ থেকে হৃদয় তবু আশা-মদিরার রসদ খুঁজছে।

নন্দিতা বা প্রদীপ বসু আমার বিচ্ছিন্ন চিন্তার রাজ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সেই আমি সাংবাদিক বটে, কিন্তু এক মানুষ নয় বলেই জানতুম।

দেখা ওদের সঙ্গে আরো তিন-চারবার হয়েছে। কখনো কলকাতায়, কখনো দিল্লিতে, কখনো বা আর কোথাও। সেই স্বল্প সাক্ষাতের আবেগ স্বভাবতই আনুষ্ঠানিক।

প্রদীপ বসু ক্যাপ্টেন থেকে মেজর হয়েছে অনেকদিন, সে খবর পেয়েছি। আর নন্দিতা বসু দিল্লির এক নামজাদা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রচার আর গণ-সংযোগের চটকদার চাকরিতে ঢুকে ধাপে ধাপে বেশ উন্নতির রাস্তায় এগিয়ে চলেছে—সেই খবরও কানে এসেছে। মেজর প্রদীপ বসুকে চাকরির দায়ে বহু জায়গায় ঘুরতে হয়, নন্দিতা বসু রাজধানীর অধিবাসিনী।

দুটি ছেলেমেয়ে ওদের। শুনেছি তারাও বাইরের আদব কায়দায় হস্টেল বোর্ডিং থেকে মানুষ হচ্ছে।

হঠাৎ নন্দিতারই পরোক্ষ আমন্ত্রণে দিল্লি আসা এবারে।

তাদের প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ বছরের জয়ন্তী উৎসব। বড় ব্যাপার। দিল্লিতে আমাদের কাগজের অফিসও আছে, প্রতিনিধি আছে। তবু নন্দিতা লিখেছে, তোমাকে আসতে বললেও তো আসবে না, যদিও তোমার বন্ধু বার বার আমাকে তাগিদ দিচ্ছে তোমাকে নেমন্তন্ন করতে—পারো তো তোমার এখানকার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্যে একটু সুপারিশ করো।

সেই সময়েই আবার দিল্লিতে ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশনের সমারোহ। অতএব ফাঁক পেয়ে নিজেই চলে এলাম আমি।

নন্দিতা মহাখুশি। আমার কল্যাণে প্রচারের সুনাম বাড়বে তার, সেই আনন্দটা প্রকাশ করেই ফেলল। কিন্তু আমাকে দেখে সত্যিকারের আনন্দ আর উৎসাহ দেখলাম প্রদীপ বসুর।

মাস কয়েক হল সে আবার দিল্লিতে বদলি হয়েছে। ঘুরেফিরে দিল্লিতেই থাকতে চেষ্টা করছে সে। কিন্তু আমি অবাক, কারণ ওরা একসঙ্গে থাকে না। নন্দিতা দু'ঘরের একটা বাসা নিয়ে আছে, মেজরের চাকরির দায়ে অতি দূরে বা ও-রকম জায়াগায় এসে থাকতে অসুবিধে। সে থাকে অফিসারস ক্লাবে। নন্দিতা বাসা ছাড়তে নারাজ, মেজর কখন হুট করে বদলি হবে ঠিক নেই কিছু। দিল্লিতে মনের মতো বাসা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

আমি একটা হোটেলে উঠেছি।

এসেই টের পেলাম আমার সাংবাদিক বন্ধুরা নন্দিতা বসুকে খুব সরল চোখে দেখে না। তাদের মন্তব্য, মহিলা এখানকার সোসাইটির একজন সুপরিচিতা আকর্ষণ। একজন টিপ্পনী কাটল, তোমার নন্দিতা এখন বহু-বন্দিতা। সমস্ত বড় বড় ফাংশনে তাকে দেখতে পাবে—আর পান-পর্বে সে এখানে বহু রমণীর ঈর্ষার পাত্রী।

আর শুনলাম, দিল্লীর উঁচুমহলে ভারী সমাদর মেজর প্রদীপ বসুরও। বহু সামাজিক পার্টিতেও পরামর্শের জন্য তার কাছে লোক ছোটে। ওদিকে সামরিক পার্টিও তো লেগেই আছে। অতএব মিস্টারের সুতো ধরে মিসেসের নেমন্তন্ন আর মিসেসের সুতো ধরে মিস্টারের নেমন্তন্ন লেগেই আছে। পার্টি-শূন্য কোনো সপ্তাহ গেলে মিস্টার তো বটেই—মিসেসেরও মেজাজ বিগড়োয়।

নন্দিতাদের ফাংশন হয়ে গেল। এরপর বাকি থাকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিজস্ব

সম্মিলিত পার্টির ব্যাপার। এমন এক শুভানুষ্ঠানের পর এই আনন্দের অধিকারটুকু অনস্বীকার্য।

পরের ছুটির দিনে, অর্থাৎ দিন পাঁচেক বাদে সেই সম্মেলন। কিন্তু সত্যি আসল অনুষ্ঠানের থেকেও এই পার্টির ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ দেখলাম প্রদীপ আর নন্দিতার। নন্দিতার অফিসের হোমরা-চোমরাদের সঙ্গেও ভারী হৃদ্যতা প্রদীপ বসুর। অতএব এই আসন্ন পার্টির ব্যাপারেও তার পরামর্শের কদর কম নয়।

কিন্তু এই মেজর প্রদীপ বসুর দিকে চেয়ে আমার কেমন যেন লাগত। মনে হত, কোথায় একটা শুকনো টান ধরেছে এর ভিতরে ভিতরে। অত চটক সত্ত্বেও মনে হত, ও যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে।

আমাকে কিছু কল্পনা করতে হয়নি। সেই সন্ধ্যায় এসে আমাকে একটা হোটেলে ধরে নিয়ে গেল সে। মদ খেল। অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে হঠাৎ একসময় ভেঙে পড়ল। বলল, কেমন দেখছ আমাদের? খুব ভালো আছি, না?

ওর চোখের সাদার ভাগ ক্রমে লাল হতে দেখছিলাম। জবাবের অপেক্ষা রাখল না, বলে গেল, তুমি না এলে আমি কলকাতায় যেতাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। এই জীবন আর পারছি না টানতে, নন্দিতাকে তুমি ফেরাও, সে আমাকে কতদূরে সরিয়ে দিয়েছে তুমি জান না। সম্পর্কের কাঠামোটা শুধু আছে, আর কিছু নেই। সে যে এভাবে বাইরের দিকে ঝুঁকবে আমার ধারণা ছিল না।

আমি নির্বাক। দেখছি। অপেক্ষা করছি।

পরিতাপের এই সুরটা সুরার ক্রিয়াজনিত কিনা জানি না। ও আমার একটা হাত চেপে ধরে বলল, ভেতরটা জ্বলে গেল ভাই। কোথায় কখন কার সঙ্গে চলে যায় ঠিক নেই, দু-পাঁচদিনের মধ্যে ফেরেই না হয়ত। মদ কত খায় তুমি ধারণা করতে পারবে না, কিন্তু মদের থেকেও ফুর্তিটাই বড় নেশা ওর। আমি জানি সব আমার দোষ, বাইরের এই হৈ-হুল্লোড় ফুর্তির দিকটা আমিই চিনিয়েছি ওকে, আমিই এদিকে টেনেছি, কিন্তু এরকম হবে, ভাবিনি। গোড়ায় গোড়ায় ও প্রতিশোধ নিয়েছে আমার ওপর, কিন্তু এখন সত্যিই ছেঁটে দিয়েছে আমাকে।...সুযোগ পেলে এখনো বোধহয় আমরা আবার নতুন করে আরম্ভ করতে পারি, তোমাকে এখনো শ্রদ্ধা করে ও, তোমার কথা হয়ত শুনতে পারে। তুমি ফেরাও ওকে, আর একটা সুযোগ আমাকে দিতে বল।

চৌদ্দ বছর আগের সেই ভাবপ্রবণ মানুষ আমি আর নই। তবু দুঃখ একটু হয়েছিল। আমার দ্বারা সত্যিই উপকার কিছু হতে পারে সেরকম ভরসা একটুও ছিল না। নন্দিতার আচরণ কত বদলেছে সে আমিও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এ কদিনের মধ্যে আমি তাকে একদিনও মদ খেতে দেখিনি।

যাই হোক, কি ভেবে সেই রাতেই নন্দিতার বাড়ি এলাম জানিনে। আমাকে দেখেই বলে উঠল, তোমার হোটেলে গিয়ে পেলাম না, গেছলে কোথায়? মেজর ধরে নিয়ে গেছল?

আমি ভালো করে দেখে নিলাম একটু, মদ খেয়েছে বলে মনে হল না। মাথা

নাড়লাম।

নন্দিতা হাসতে লাগল।—কি বলল, কান্নাকাটি করল খুব?

আমি চেয়েই আছি।

দেখছ কি, কিছু খেয়েছি-টেয়েছি কিনা? হেসে উঠল, তুমি দিল্লি থেকে পালাও শিগগীর, আমার ভারি অসুবিধে হচ্ছে। তা কি বললে বলো না ছাই, আমি কত অধঃপাতে গেছি সেই ফিরিস্তি দিলে তো?

কি বলেছে বললাম। আর বললাম, এই রাস্তায় সেই তোমাকে টেনেছে, তুমি আসতে চাওনি। কাশ্মীরের সেই ব্যাপারটা আমি আজও ভুলিনি। কিন্তু আজ ও কাঁদছে, নিজেও ফিরতে চাইছে, তোমাকেও ফেরাতে চাইছে—একবার চেষ্টা করে দেখতে দাও না?

মুখের দিকে চেয়ে নন্দিতা হাসতে লাগল শুধু।

এবারে আর একটু জোর দিয়ে বলালাম, আর একবার ওকে সুযোগ দিয়ে দেখ, আমার এই অনুরোধটা রাখ।

নন্দিতা হালকা করে বলল, তোমার অনুরোধ রাখতে যাব কেন?

বললাম, না যদি রাখ, নিজের দাম বুঝে নেব, চেষ্টা করব জীবনে যেন আর তোমাদের সঙ্গে দেখা না হয়।

নন্দিতা ছোট মেয়ের মতোই হেসে উঠল। বলল, আজও তুমি ছেলেমানুষই আছ দেখছি।

একটুবাদেই কিন্তু অন্যমনস্ক দেখাল তাকে। ভাবছে কিছু মনে হল। দু-তিনবার গা মোড়ামুড়ি দিল। অতএব আজ আর কিছু না বলে বিদায় নেব কিনা ভাবছি। নন্দিতা উঠে দেরাজ থেকে থার্মোমিটার নিয়ে এলো। বলল, শরীরটা কদিনই ভারি খারাপ লাগছে, আবার জ্বর-জ্বালা হল কিনা দেখি।

থার্মোমিটার মুখে পুরে আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগল। আমার ছেলেমানুষিই আবার মনে পড়ে গেছে যেন।

জ্বর দেখল। বলল, মুখে নিরানব্বই পয়েণ্ট দুই—একটু জ্বরই তো, না কি?

আমি মাথা নাড়লাম।—ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগে থাকবে, সাবধানে থেকো।

পরদিন বিকেলে প্রদীপকে সঙ্গে করেই আবার এলাম। প্রদীপ নন্দিতার অফিসে টেলিফোন করে জেনেছিল, সে অসুস্থ, অফিসে আসেনি।

অসুস্থই দেখলাম। শুয়ে ছিল। স্নান করেনি। রাতে জ্বর বেড়েছিল। শুনলাম সেই সঙ্গে পাঁজরের দিকে একটা ব্যথার মতো। মাথায়ও যন্ত্রণা।

প্রদীপ ব্যস্ত হয়ে উঠল। নন্দিতা বলল, অফিসের ডাক্তার এসে দেখে ওষুধ দিয়ে গেছে। নন্দিতা তাকে শাসিয়েছে, পরশু পার্টি, এর মধ্যে যদি বিছানায় শুয়ে থাকতে হয় তাহলে জন্মের মতো ডাক্তারের মুখ দেখা বন্ধ করে দেব।

প্রদীপও ভরসা দিল, পরশুর আগে নিশ্চয় ভালো হয়ে যাবে।

কিন্তু পরদিন আরো বেশি কাহিল দেখা গেল নন্দিতাকে। জ্বরও ছাড়েনি, বুকের ব্যথাও না, মাথাধরাও না। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, কালকের

পার্টি কি হবে, আমি যেতে পাব না?

প্রদীপ তক্ষুনি বড় ডাক্তার আনার পরামর্শ দিল। নন্দিতা সে প্রস্তাব বাতিল করে দিল, অফিসের ডাক্তারও তার মতে বড় ডাক্তার। বলল, তার ওষুধে এখন ভালোই লাগছে একটু, এ-রকম থাকলেই বাঁচা যায়।

পরদিন, অর্থাৎ পার্টির দিন। দুপুরে আমি একাই এলাম। নন্দিতা ভালো আছে আগের দিনের তুলনায়, কিন্তু অফিসের ডাক্তার একেবারে নট নড়ন-চড়ন ব্যবস্থা দিয়ে গেছে। অতএব গোটা দুনিয়ার ওপর রাগ হচ্ছে তার।

রাত তখন প্রায় দশটা। অত রাতে দরজার কড়ানাড়ার শব্দ শুনে আমি অবাক একটু। কিন্তু দরজা খুলে আমি বিমূঢ় হতভম্ব একেবারে।

নন্দিতা। হাসছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভালো করে দাঁড়াতেও পারছে না। চুল উস্কোখুস্কো, শুকনো মুখে ভারী প্রসাধন। এই বেশবাস অন্যরকম। কদিনের অসুস্থতার দরুন হোক বা বেশি মদ খেয়েছে বলেই হোক, দরজা ধরে দাঁড়াতে হয়েছে। আমি তাকে ধরে তাড়াতাড়ি ঘরে এনে বসিয়ে দিলাম। কিন্তু নন্দিতা এত হাসছে, যেন এত রাতে হোটেলে এসে আমাকে ভারি জব্দ করেছে।

গম্ভীর মুখে বললাম, এই শরীর নিয়েও পার্টিতে গেছলে তাহলে?

নন্দিতা চোখ পাকাল, কেন যাব না, তোমার ভয়ে? গেছলাম যে সেটা জানাবার জন্যেই তো বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে তোমাকে দেখা দিয়ে গেলাম।

পরক্ষণেই আবার হাসি। বলল, আমি বোকার মতো বিছানায় পড়ে থাকব কেন গো?...যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—গিয়ে দেখি তোমার বন্ধু সেখানে জমিয়ে ফূর্তি করছে—স্ত্রীর অসুখের জন্য মন খারাপ, কি করবে। আমাকে দেখে প্রথমে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল—পরে অবশ্য খুব খুশি।

বলতে বলতে হেসে আটখানা সে। বেদম হাসি।

আমি চিত্রার্পিত।

তাকে ধরে গাড়িতে তুলে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এসেছি।

আমার চোখে আঙুল দিয়ে নন্দিতা আমাকে কি দেখিয়ে গেল, বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি। প্রদীপের আবেদন সে মঞ্জুর করেছিল। আমার অনুরোধ সে রক্ষা করেছিল। মেজর প্রদীপ বসুকে আর একটা সুযোগ সে দিয়েছিল।

নন্দিতা হাসছিল...।

কিন্তু আমার মনে হয়েছে নন্দিতা কাঁদছিল। হাসির আড়ালে এমন কান্না আর বুঝি দেখিনি।

হৃদয় নামে সেই অবুঝ বস্তুটা কি এখনো আমি বয়ে বেড়াচ্ছি?

...চৌদ্দ বছর বাদে দিল্লির হোটেলে বাংলাদেশের এক অখ্যাত সাংবাদিকের আবার একটা রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে।

এরকমও হয়।

অরুন্ধতীর চোখের সামনে দিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাচ্ছে। আব্‌ছা অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। আধঘন্টা অন্তর দেওয়ালের ঘড়িটা টুং-টাং বাজে। রাত দশটার পর থেকে কতবার যে বেজেছে ঠিক নেই। রাত দশটায় ছেলেমেয়েরা শুতে গেছে। আসলে মাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যেই তারা উঠে গেছে। মেয়ে উল্টে মাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছে, থমথমে মুখেই বলেছে, আমার বরাত যে ভালো সেটা ভাবতে পারছ না কেন?

তপতী নিজের মুখে এই কথা বলে গেছে। কিন্তু নিজেও সে এখন পর্যন্ত ঘুমুতে পেরেছে কিনা কে জানে। ছেলের মেজাজ বয়সের মেজাজ। আজও শাসিয়েছে, যদি কখনো কোথাও তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, মা যেন থানা পুলিস করার জন্য তৈরি থাকে। কারণ লোকটাকে সে হাসপাতালে পাঠাতে চেষ্টা করবে।

ভাইয়ের কথা শুনে তপতী বিরক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু অরুন্ধতীর মতো সে-ও অমন চমকে ওঠেনি। এমন কি, ভাই যদি তার কথামত কাজ করেই, তাহলেও ভয়ানক কিছু অন্যায় করা হবে না—এমন ভাবাটাও বিচিত্র নয় মেয়ের পক্ষে। কিন্তু অরুন্ধতী চমকেই উঠেছিল। তার মুখ লাল হয়েছিল। ছেলেমেয়ে তা দেখেছিল। মায়ের ব্লাড-প্রেসারের প্রতিক্রিয়া ভেবেছিল। রক্তের চাপ তাদেরই বেড়ে আছে—মা তো রোগী। সমস্ত দিন ট্রেনের ধকল গেছে তার ওপর। কলকাতায় মা কেন গেছল, কি ফয়সালা হল, কিছুই জিজ্ঞাসা করেনি তারা। মুখের দিকে চেয়েই যা বোঝাবার বুঝে নিয়েছে। তপতীর অন্তত একটুও ইচ্ছে ছিল না, যা ঘটে গেছে তাই নিয়ে মা কলকাতায় বোঝাপড়া করতে ছুটুক। বাধাও দিয়েছিল। কিন্তু মায়ের ঝোঁক চাপলে আটকান মুশকিল। মাঝের থেকে রাগারাগি করে ব্লাড-প্রেসার চড়ে। কিছু করবে মনে করলে মাকে ঠেকান যায় না।

ছেলের কথায় মায়ের মুখ লাল হতে দেখে মেয়ে ভাইয়ের উদ্দেশে ইশারা করল। অর্থাৎ আর উত্তেজনার কথা নয়। ভেবেছে মা দেখেনি। কিন্তু অরুন্ধতী দেখেছে। বুঝেছে ওরা কি ভাবছে। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারেনি। ছেলেকে ধমকে উঠতে পারেনি। শুধু অসহায় বোধ করেছে।

নিজেকে এমন অসহায় কি আর কখনো মনে হয়েছে?

জ্ঞান অবধি মায়ের কর্তৃত্ব দেখে এসেছে ছেলেমেয়েরা। তাই মাকে অনেক বড় ভাবে তারা। বড় মেয়ের বয়েস চব্বিশ, বড় ছেলের বয়েস বাইশ। আরো এক মেয়ে

দুটি ছেলে তারপর। তারা চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে। তাদের সকলের চোখে রাশভারি মা সে। এমন কি তাদের বাবা তাদের থেকেও বেশি সমীহ করে চলে মাকে। কিন্তু অরুন্ধতীর বয়স বড় জোর ছেচল্লিশ। দেখায় তার থেকেও অনেক কম। কিন্তু আজ যেন সে পাঁচ ছেলেমেয়ের মা নয়। অসহায় অবুঝ ছোট মেয়ের মতই অবস্থা। যাকে দেখে তার ছেলেমেয়েরও সান্ত্বনা দেবার কথা মনে হয়।

বড় ঘরের ওদিকের কোণের চৌকি থেকে পরিপুষ্ট নাকের ডাক কানে আসছে। এত স্তব্ধ রাতে সেটা কানে ঠাস ঠাস করে লাগছে। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল অরুন্ধতী। অন্ধকারেই এদিকের চৌকিতে বসে শাণিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করল একটা। ঘরে খুব কম পাওয়ারের নীল আলো জ্বলছে। নীল নয়, প্রায় কালোই বলা চলে। আবছা কালচে অন্ধকারেও অগোছালো ঘুমন্ত মূর্তিটা দেখা যায়। মনের আনন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। গানের মাস্টারি সেরে রাত নটায় ফিরেছে। তারপর অপরাধ-বিনম্র মুখখানা করে কাছে কাছে ঘুরঘুর করেছে খানিক। সাহস করে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাও করতে পারেনি, কলকাতায় গেছলে, কি হল?

যেটুকু শুনেছে ছেলেমেয়ের মধ্যস্থতায় শুনেছে। মেয়ে বেশির ভাগ সময় গম্ভীর হয়েই ছিল। ছেলে যখন আধা ভয়ে আধা রাগে মাকে জেরা করছিল, তখনই শুধু কান খাড়া করে মানুষটা বুঝতে চেষ্ট করেছে—কি হল বা কিছু হল কিনা। তারপর খাওয়া-দাওয়া, তারপর ঘুম, তারপর পরম নিশ্চিন্তে নাক-ডাকান।

মানুষটার অন্য কোনো ঘরে শোবার ব্যবস্থা করতে পারলে করত অরুন্ধতী। অনেকদিন মনে হয়েছে। কিন্তু ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। কোন ধরনের আঁচড় পড়বে তাদের মনে কে জানে। তাছাড়া অত ঘরই বা কোথায়।

ওই চৌকি যে আলাদা করা হয়েছে সেটাই একটুও মনঃপুত নয়, অরুন্ধতী তা খুব ভালো করেই জানে। অথচ বয়েস লোকটার পঞ্চান্নয় গড়িয়েছে কম করে, বয়েস যারা জানে না মাথার ধপধপে সাদা চুল দেখে তাঁরা পঁয়ষট্টি ভাবে। কতজন যে এখানো পাশাপাশি দেখলে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ভাবে অরুন্ধতীকে, ঠিক নেই। এটা হাসাহাসির ব্যাপার হতে পারত, কিন্তু রাগ হয় অরুন্ধতীর লোকটার স্বভাবের জন্য। নইলে দিনরাত খাটে, ভাবলে মায়াই হয়। সকাল সন্ধ্যায় গানের টিউশনি আর দুপুরে গানের স্কুলের মাস্টারি। সব মিলিয়ে রোজগার মন্দ করে না। কিন্তু পাঁচ ছেলেমেয়ের সংসার এভাবে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হত, যদি না ওই আয়ের সঙ্গে অরুন্ধতীর আয় যুক্ত হত।

অরুন্ধতী এখানকার মেয়ে-স্কুলের হেডমিসস্ট্রেস এখন। তবে মর্যাদা যত, মেয়ে-স্কুলের মাইনে ততো নয়। অরুন্ধতী আশা করছে মাইনে শিগগিরই আরো বাড়বে। কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখে তাকে। পুরনো হেডমিস্ট্রেস রিটায়ার করার পর তারা কড়া বিধি—ব্যবস্থার ফলে এই এক বছরের মধ্যেই স্কুলের চেহারা বদলে গেছে।

যাই হোক, অত পরিশ্রমের দরুন মানুষটার প্রতি কখনো-কখনো মায়া হলেও অরুন্ধতী সেটা প্রকাশ করে না কখনো। ছাড়তে বললে এক্ষুনি তিনটে টিউশনি ছেড়ে যতক্ষণ পারা যায় বাড়িতে বসে থাকবে। কিন্তু অরুন্ধতীর তাতে ভয়ানক আপত্তি।

বরং বিকেলের দিকেও যদি দু'ঘণ্টা ঘরে বসে না থেকে টিউশনির সংখ্যা আর একটা বাড়িয়ে ফেলে, অরুন্ধতীর দুশ্চিন্তা হবে হয়ত একটু, কিন্তু মুখ ফুটে সে বাধা দেবে না।

এই মনোভাবের পিছনে সংসারের সচ্ছলতা বাড়ানোর তাগিদটাই একমাত্র কারণ নয়।

আরো একটা বড় কারণ আছে। সেই কারণ, লোকটার অসংযত স্বভাব। এই বয়সেও সেটা বদলেছে বলে আদৌ মনে হয় না অরুন্ধতীর। যত কাজের মধ্যে থাকে, তত নিশ্চিন্ত।

কুড়ি থেকে ছেচল্লিশ। ছাব্বিশ বছর ধরে দেখে আসছে।

বড়মেয়ে বা বড়ছেলের সঙ্গে অরুন্ধতী কোথাও বেরোয় যখন, অপরিচিত কেউ দেখলে ভাইবোনই ভেবে বসে এখনো। এ-রকম ভুল অনেকবার হয়েছে। তপতী তো কোথাও বেরুতেই চায় না মায়ের সঙ্গে। দেখতে সে বেশ সুশ্রীই বটে। কিন্তু একসঙ্গে দেখলে মায়ের অন্তরঙ্গ আলাপীরা নির্ঘাত একটা গবেষণায় বসে যাবে। বলবে, মেয়েও দেখতে বেশ, কিন্তু মায়ের মতো নয়। তার বয়সে মায়ের চেহারা কেমন ছিল সেটা অনুমানের চেষ্টা স্বভাবতই হয়ে থাকে তারপর। এখনো এই বয়সে তার পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে কে বলবে?

বাইরের লোকে প্রশংসা করুক, অরুন্ধতীর খারাপ লাগে না। আগে তো লাগতেই না। অমন কত শুনেছে ঠিক নেই। কিন্তু ঘরের লোকের অসংযত দৃষ্টি যদি এখনো চঞ্চল হতে দেখে, কেমন লাগে? সব চুল সাদা হয়েছে তবু যদি স্বভাব বদলাত। যেটুকু বদলেছে সে শুধু তার শাসনের ফলে, আর ভয়ে ।

এত বড় সংসার অরুন্ধতী চায়নি। প্রথম মেয়ের পর ছেলে হবার পরই সে সর্তক করেছিল। আর চাইনে। তবু যারা আসবার তারা এসেছে। আর প্রতিবারই অরুন্ধতীর আচরণ কঠিন হয়েছে। কত সময় নির্লজ্জ প্রবৃত্তির বশে মানুষটা তাকে ভাঁওতা পর্যন্ত দিয়েছে ঠিক নেই। আত্মরক্ষা করে করে কত আর চলা যায়।

পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগে থেকেই শয্যা পৃথক করে নিয়েছিল অরুন্ধতী। সন্তান আসার পর নির্মম হয়েছে।...লোকটা এখন তাকে ভয়ই করে।

কিন্তু এখনো স্ত্রীর মেজাজ-পত্র বেশি ভালো দেখলে তার দৃষ্টি যে বদলাতে থাকে সেটা অরুন্ধতী ভালো করেই লক্ষ্য করেছে। গল্পের ছলে তার শয্যা ছেড়ে নড়তে চায় না। সেই প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশার আঁচ লাগতে অরুন্ধতীর আচরণ রূঢ় হতে থাকে। তার গা ঘিনঘিন করে কেমন।

ভদ্রলোকের কপালে দুর্ভোগ তখন। বাবার প্রতি মায়ের রূঢ় ব্যবহারে ছেলেমেয়ে পর্যন্ত অবাক হয় এক-একসময়। তপতী তো বাবার হয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়াই করে।

চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, এতবড় এক ব্যাপার ঘটে গেল—সেই লোক নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকাচ্ছে।

ট্রেনে সমস্তক্ষণ ছটফট করেছে অরুন্ধতী। দারুণ অস্বস্তিতে এখনো ছটফট করছে।

অথচ এটা তার রাগ নয়, অনুতাপ নয়, কি যে সেটাই সে ভালো জানে না। বুকের ভিতর কিরকম একটা কাটা-ছেঁড়া চলেছে সেই থেকে। তার মেয়ের সঙ্গে এতবড় নিষ্ঠুর আচরণ করে গেল যে ছেলেটা, আশ্চর্য—তার ওপরে এত চেষ্টা করেও আর খড়গহস্ত হয়ে উঠতে পারছে না। একটা অব্যক্ত যাতনা শুধু বিঁধছে খচখচ করে।

বিঁধছেই।

আর সেই বোবা যাতনায় অরুন্ধতী শুধু ভাবছে, এ-রকমও হয়...।

এ-রকম হয়...।।

আর পাঁচজনে শুধু জানবে, ছেলেটা ঠকিয়ে গেল, তার মেয়ের মনটা দুমড়ে ভেঙে দিয়ে গেল। আড়ালে দু'চারজন হয়ত সমালোচনা করবে, মেয়েকে অত মিশতে দেওয়া ঠিক হয়নি। এ-রকম তো আকছার হচ্ছে, তবু বিয়ের আগেই অত মাখামাখি করতে দেওয়া কেন।

কিন্তু অরুন্ধতী সত্যিই স্বেচ্ছায় খুব একটা প্রশ্রয় দেয়নি। ছেলেটাকে তার সত্যিই ভালো লেগেছিল। ভালো লাগার মতোই চেহারা সুন্দর। এখানকার কলেজের প্রোফেসার হয়ে এসেছিল বছর তিনেক আগে। বছর একত্রিশ হবে বয়েস। ডক্টরেট। কিন্তু বেশ হাসিখুশি নরম স্বভাব। দেখলে মনেই হবে না অত বিদ্বান। চালচলনে এতটুকু গর্ব নেই, অথচ বেশ সভ্যভব্য।

আলাপ মেয়ের সঙ্গেই আগে হয়েছিল। তিন বছর আগে মেয়ে ওই করেজেই বি. এ. পড়ত। তখন আলাপ। আর অরুন্ধতী যতটা আঁচ পেয়েছে, আগ্রহ ছেলেটার দিক থেকেই বেশি ছিল। অথচ সেই আগ্রহের মধ্যে মার্জিত শালীনতার অভাব ছিল না। মেয়ের পরীক্ষার আগে প্রায়ই বাড়িতে এসেও পড়িয়ে গেছে। অরুন্ধতী চোখ রাখতে ভোলেনি। লক্ষ্য করেছে, পড়ার সময়ে পড়ানটা কখনো গৌণ হয়ে ওঠেনি।

খোঁজখবর সে-ই প্রথম করেছে। নিজের বাবা-মা নেই ছেলেটার। আত্মীয়ের মধ্যে তার কাকা। সেই কাকাটি কলকাতার কোন্ এক কলেজের নামজাদা প্রিন্সিপাল। নাম করা মাত্র মেয়ে অন্ততঃ চিনেছে। কারণ কাকার লেখা বই তাদের পড়তে হয়।

আলাপ পরিচয়ের হৃদ্যতা পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার মধ্যে টেনে এনেছে অবশ্য অরুন্ধতীই। প্রয়োজনে সে সুরসিকাও হয়ে উঠতে পারে। ভাবী শাশুড়ী জনোচিত গাম্ভীর্য সে কখনো দেখায়নি। হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে অনেক সন্ধ্যা গড়িয়েছে।

কিছুটা হৃদ্যতার সম্পর্ক হবার পরেই মেয়ের অসাক্ষাতে সে সরাসরি অজয়কে জিজ্ঞাসা করেছে। দেখো একটা কথা খোলাখুলি বুঝে নিই, মেয়ে বি. এ. পাস করল, এখন বিয়ে দিতে পারলে আর কলকাতায় পাঠিয়ে এম. এ. পড়ানর ইচ্ছে নেই। পড়তে ইচ্ছে হয়, বিয়ের পরে পড়বে। এখন তুমি কি ঠিক করেছ বল।

জবাবে অজয় সরকার শুধু হেসেছে। কথা এমনিতেই সে কম বলে, ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। ওই হাসিটুকু জবাব ধরে নিয়ে গোটাগুটি নিশ্চিন্ত হয়েছে অরুন্ধতী। তবু জিজ্ঞাসা করেছে, তোমার কাকাকে আমি লিখব? নাম ঠিকানা দাও তাহলে..।

ভাবী জামাই জবাব দিয়েছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, কাকার সঙ্গে যা ব্যবস্থা করার

আমিই করব।

যাক, অরুন্ধতীর যেন দায় বেঁচেছিল।মেয়ে আর এই ছেলের মাঝখানে কোনো কাকার অস্তিত্ব নিয়ে সে কোনোদিনই মাথা ঘামায়নি। দেরি হতে হতে তবু একটা বছরই প্রায় কেটে গেল। বিয়ে হয়নি তখনো কিন্তু হবে যে তাতে কারো সন্দেহ ছিল না। বাইরের পাঁচজনও খবর নিয়েছে অরুন্ধতীর কাছে, মেয়ের বিয়ে কবে। না, সন্দেহের লেশমাত্রও ছিল না তার। ভাবী জামাইকে যে কতভাবে বাজিয়ে নিয়েছে সে ঠিক নেই। এমন কি তপতীও অজয়কে ঠাট্টা করেছে, এমনিতে তো গম্ভীর, মায়ের সঙ্গে এত আড্ডা দাও কি করে—শাশুড়ীর সঙ্গে জামাইয়ের এত খাতির কেউ কখনো দেখেছে কিনা সন্দেহ।

মেয়ের এই ঠাট্টা অরুন্ধতী ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনে ফেলেছিল। শুনে তখনকার মতো আর ঘরে ঢোকেনি।

ছুটিতে কলকাতা গেছে অজয়। অরুন্ধতী নিশ্চিন্ত ছিল ভাবী-জামাই এবারে কলকাতায় গিয়ে সকল ব্যবস্থা পাকা করে আসবে। কিন্তু কলেজ খুলে গেল, সে এল না। অসুখ-বিসুখ হল কিনা ভেবে অরুন্ধতী চিন্তিত হল। তারপর কানাঘুষোয় খবর এল, অজয় নাকি এ কলেজে আর চাকরিই করতে আসবে না।

অরুন্ধতী অবাক। মোটামুটি চেনা কলেজের আর এক প্রোফেসারের কাছে নিজেই চলে গেল সে। মেয়ের বিয়ের জন্য খোঁজ করা হচ্ছে ভেবে সেই ভদ্রলোক অজয় সরকারের খুব প্রশংসা করল। আর জানাল, মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিন বছরের জন্য সে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। চলে গেছে কি যাবে সেটা ভদ্রলোক সঠিক বলতে পারল না, তবে ছুটির আগেই যে এই কলেজের সঙ্গে যোগাযোগ শেষ হয়েছে, সে-কথা জানাল।

অরুন্ধতী বাড়ি ফিরল। সমস্ত মুখ পাথরে মত কঠিন। মায়ের এই মুখ দেখেই মেয়ে বুঝল কিছু একটা ঘটেছে। তাছাড়া অরুন্ধতীরও কথা চাপতে পারার ধাত নয়। এত বড় বির্পযয় গোপন থাকবে কি করে।

মেয়ে শুনল। শোনার পর নির্বাক মূর্তির মতো বসে রইল।

ঠিক পরদিনই কলকাতা থেকেই অরুন্ধতীর নামে একটা চিঠি এলো। লিখেছে অজয় সরকার। সম্ভাষণ শূন্য ছোট চিঠি। চিঠির মর্ম, ওখানে বিয়ে যে হবে না সে গোড়া থেকেই জানত। কেন হবে না সেটা যদি জানার একান্তই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে অরুন্ধতী যেন কলকাতার ঠিকানায় তার কাকার সঙ্গে দেখা করে।

না, অরুন্ধতী কারো কথা শোনেনি। মেয়ে নিজে বাধা দিয়েছে, ছেলে বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, তা সত্ত্বেও অরুন্ধতী কলকাতায় রওনা হয়ে গেছে। চিঠি থেকে তার মনে হয়েছে, বিয়েতে অজয়ের কাকাই একমাত্র অন্তরায়। আমেরিকায় রওনা হবার আগেই অজয়কে ধরা দরকার আর তার কাকার সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার। তার এখনো আশা বিয়েটা হবে, সে-ও কেমন মহিলা দরকার হলে ওই কাকাকে সে ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পারবে।

কলকাতায় তার বিপুলমামার বাড়িতে এসে উঠল। বাবা-মা বেঁচে নেই, ভাইয়েরা আছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই অরুন্ধতীর । ছেলেবেলা থেকেই খুব খাতির বিপুলমামার সঙ্গে। কলেজের মাস্টার ছিল, বহুদিন রিটায়ার করেছে। দিল-খোলা মানুষ।

মামা বাড়ি ছিল না। এতকাল পরে ভাগ্নীকে দেখে মামি অবাক। কিন্তু অরুন্ধতী তাদের কাছে ভাঙল না কিছু। মামা কখন ফিরবে ঠিক নেই শুনে একাই বেরিয়ে পড়ল। মামিকে শুধু জানাল একজনের সঙ্গে দেখা করা দরকার, ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই ঘুরে আসছে।

ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি বার করল। কলকাতার পথঘাট সবই চেনা তার। ওমুক প্রিন্সিপালের বাড়ি কিনা জিজ্ঞাসা করতেই একটা চাকর বাইরের ঘর দেখিয়ে দিল, বলল, বাবু ওই পড়ার ঘরেই আছেন। অরুন্ধতী সোজা সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মোটা ফ্রেমের পুরু চশমা, মাথায় কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুল। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে একটা মোটা বই পড়ছে। কেউ এসেছে টের পেয়ে মুখ ফেরাল। তারপর সোজা হয়ে বসল।

দু'হাত জোড় করে অরুন্ধতী নমস্কার জানাল। মুখখানা দেখেই তার কেমন আশা হল। বেশ কমনীয় মুখ।

বসুন।

অরুন্ধতী বসল। জিজ্ঞাসা করল, অজয় বাড়ি আছে?

ভদ্রলোক ঈষৎ বিস্ময়ে তাকে নিরীক্ষণ করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মাথা নাড়ল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি অরুন্ধতী দেবী?

এবারে অরুন্ধতী মাথা নাড়ল আস্তে আস্তে। চেয়ে আছে। এখন তার মনে হচ্ছে, এ ধরনের কোনো মুখ যেন সে কোথাও দেখেছে। না দেখলেও মুখের আদল কেমন চেনা-চেনা লাগছে। কতকাল কলকাতার কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই, দেখে থাকলেও মনে পড়ছে না।

স্বল্প নীরবতার ফাঁকে প্রস্তুত হয়ে অরুন্ধতীই মুখ খুলল এবার। তার নাম জানে যখন, ব্যাপারটাও যে জানে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলল, আপনি এত বড় একজন প্রিন্সিপাল, ট্রেন থেকে নেমে খুব আশা নিয়েই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি। অজয় কখন ফিরবে, তার সামনেই আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই।

ভদ্রলোকের প্রশান্ত মুখখানা বিরস দেখালো কেমন। একটু চুপ করে থেকে বলল, পরশুর প্লেনে সে রওনা হয়ে গেছে।

মুহূর্তে সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল অরুন্ধতীর। স্তব্ধ মুখে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।.... অর্থাৎ পরশু চিঠি ডাকে দিয়ে সে রওনা হয়ে গেছে। অরুন্ধতী গতকাল পেয়েছে তার চিঠি।

প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে নিল অরুন্ধতী। এখনো ফয়সালা হতে বাকি। ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনি সবই জানেন বোধ হয়?

তেমনি ঠান্ডা গলায় ভদ্রলোক জবাব দিল, সব ঠিক জানতুম না, পরে শুনেছি।

অরুন্ধতী লক্ষ্য করছে ভদ্রলোকের মুখখানা গাম্ভীর্য সত্বেও বিড়ম্বিত দেখাচ্ছে কেমন। অরুন্ধতীর দৃষ্টিটা খরখরে হয়ে উঠতে লাগল। সে আরো কিছু শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

ভদ্রলোক ঝুঁকে ওধারের একটা বইয়ের তাক থেকে খাম তুলে নিল একটা। তারপর সেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটা পড়ুন—।

এবারে অরুন্ধতী বিস্মিত ঈষৎ। কি যেন অস্বস্তিকর অনুভূতি একটা। চিঠি হাতে নিল।

'আমার কাকামণি,

সাহস করে নিজের হাতে তোমাকে এ-চিঠি দিতে পারলুম না বলেই বিপুল-জেঠুর হাত দিয়ে পাঠালুম। এতক্ষণে বিপুল-জেঠুর মুখ থেকে তুমি সবই শুনেছ নিশ্চয়। আর শুনে আমাকে নিশ্চয় তুমি ক্ষমা করতে পারছ না। কিন্তু আমি তোমার মতো আদর্শবাদীও নই, উদারও নই। সেই ছেলেবেলা থেকে, আর বড় হয়ে সকলের মুখে গল্প শুনে শুনে, একটাই মাত্র বাসনা আমাকে সর্বদা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—যে মহিলা তোমার জীবনে এত বড় নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গতা এনে দিলেন, একটা বার যদি তাঁকে তোমার পায়ের কাছে এনে ফেলতে পারতুম ! তা পারি না পারি, আমি শোধ নিয়েছি কাকামণি। বিপুল-জেঠুর মুখে ওখানে সেই মহিলা থাকেন জেনেই সেখানে চাকরি করতে ছুটেছিলাম। এমন সুযোগ পাব আগে কল্পনাও করিনি। সেই মেয়েটির জন্যে আমার একটু দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তার মায়ের এটুকু প্রাপ্য ছিল। পার তো আমাকে ক্ষমা কোর। তোমার অজয়।'

চিঠি শেষ হবার আগেই থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে অরুন্ধতী। তারপর সমস্তমুখ রক্তবর্ণ হঠাৎ। দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু বুঝি মুখে এসে জমাট বেঁধেছে। ভদ্রলোকের দিকে তাকাল আবার। মনে পড়েছে। মনে পড়েছে। পঁচিশ বছর আগের ওই একদিনের দেখা মুখ মনে পড়ে গেছে। অরুন্ধতী কি করবে ? উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে এখান থেকে ?

কিন্তু শক্তি নেই। দাঁড়াবার শক্তিও নেই, নড়াচড়ার শক্তিও নেই। মাথার মধ্যে কিছু যেন হচ্ছে একটা।

অধ্যক্ষ কমলাপদ সরকার এই মূর্তি দেখে হঠাৎ ঘাবড়েই গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনি.... আপনি স্থির হয়ে বসুন.....। কি করবে বা কি বলবে ভেবে না পেয়ে ভদ্রলোক আবার বসে পড়ল।

সময় লাগল বটে, কিন্তু অরুন্ধতী সামলে নিল। আর একবার নিজের অগোচরেই তাকাল ভদ্রলোকের দিকে।

নিঃশব্দে চোখ বুজে কি যেন ভেবে নিল কমলাপদ সরকার। তারপর মৃদুগম্ভীর মুখে বলল, আমার এতে কোনো হাত ছিল না। অজয় কেন এরকম করেছে বিপুলদাকে বলে গেছে।... তবে আমার মতে সে অন্যায় করেছে।

আবার অখন্ড স্তব্ধতা কয়েক নিমেষের । ভদ্রলোক বলল, কি হবে জানি না, তবে আমি শুধু আপনাকে তিনটে বছর অপেক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারি।... অবশ্য, আপনার দিকে থেকে সেটা একটু বেশি রিস্ক্ নেওয়া হবে। কিন্তু এর বেশি আমি আপনাকে আর কিছু বলতে পারছি না।

অরুন্ধতী বিপুলমামার বাড়ি ফিরেছে। এই মুখ দেখেই মামাও বুঝেছে কি হতে পারে। রাত্রিতে বিপুলমামা কিছু বলেছিল তাকে। কতটা শুনেছে কতটা শোনে নি, অরুন্ধতী জানে না। কিন্তু সমস্ত রাত চোখে-পাতায় এক করতে পারেনি।

সকালে ট্রেন ধরেছে।

....তারপর থেকে সমস্তপথ ধরে বিপুলমামার কথাগুলো যেন কানের পর্দায় লেগে আছে মনে হয়েছে। আর জানা-অজানা কতগুলো দৃশ্য যেন চোখের সামনে ভেসে বেড়িয়েছে।

..পঁচিশ বছর আগে বিপুলমামা তাদের জীর্ণ বাড়িতে কলেজের এক তরুণ মাস্টারকে নিয়ে এসেছিল মেয়ে দেখাতে।..। সেই মেয়ে অরুন্ধতী। অরুন্ধতী তখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। ছেলেটার নাম কমল, মামার কলেজেরই মাস্টার—এইটুকুই শুধু শুনেছিল। আরো হয়ত শুনতে পারত, কিন্তু শোনার আগ্রহ তার আদৌ ছিল না। সম্ভব হলে বাবাকে সে নিষেধ করে দিত, কিন্তু ভয়ে পারেনি।

বাবা গরীব, কিন্তু প্রচন্ড রাগী মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই ওই বাবাকে তারা যমের মত ভয় করত। আর যেজন্য নিষেধ করবে, তা শুনলে তো বাড়ি থেকে হয়ত তাড়িয়েই দেবে। এমন একটা দাবীদাওয়াবিহীন সম্বন্ধ আসতে বাবা আশান্বিত, মা খুশি। পাড়ার বখাটে ছেলেগুলো যেভাবে বাড়ির আনাচেকানাচে সর্বদা আড়ি পেতে বসে থাকে, তাতে তারা চিন্তিতও। গরীবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে যত তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করা যায়, ততো মঙ্গল।

দেখতে এল। আর অরুন্ধতীও দেখা দিল। সুরসিক বিপুলমামার পাল্লায় পড়ে প্রায় ঘন্টা দুই চলেছিল সেই দেখা-দেখির পর্ব। আনুষ্ঠানিক মেয়ে দেখা নয়, যে এসেছে তাকে প্রায় ঘরের ছেলে করে তোলার চেষ্টা বাড়ির সকলের। অরুন্ধতী প্রথম দর্শনেই বুঝেছিল ছেলে ঘায়েল হয়েছে। হবে তাও ধরেই নিয়েছিল। নিজের চেহারা প্রসঙ্গে তার ধারণাটা অস্পষ্ট ছিল না আদৌ। অরুন্ধতী কথা বলতে পেরেছিল, সপ্রতিভ আলাপ করতে পেরেছিল, আর বিপুলমামার প্রচ্ছন্ন রসিকতার ফলে হাসতেও পেরেছিল।

দু'ঘণ্টা বাদে বিপুলমামাই লোকটাকে টেনে তুলল। নইলে আসর যেমন জমেছিল আরো দু'ঘণ্টা কাটিয়ে যেতেও আপত্তি ছিল না বোধ হয়। যাবার সময় বিপুলমামা বাবাকে চুপি চুপি বলে গেল, এবারে বিয়ের দিন-ক্ষণ ঠিক করে ফেলতে পারেন।

কিন্তু বিয়ে ওখানে হবে না, সে শুধু দুজনে জানত। একজন অরুন্ধতী নিজে, আর একজন, যার সঙ্গে ঘর করছে এখন, সে। এত শিগ্গির এমন বিপদ ঘনাবে অরুন্ধতী ভাবতে পারেনি। বলবে কাকে, যার জন্যে অন্যত্র তার বিয়েতে আপত্তি—পাড়ার একটা

লোকও তাকে সুচক্ষে দেখে না। গুণের মধ্যে ভালো গান করে, অনেক জায়গায় গানের আসর থেকে তার ডাক আসে। কিন্তু সংসারী লোকের চোখে সেটা এত বড় গুণ নয় যে তাকে প্রশয় দিতে চাইবে। দিনরাত রকে বসে আড্ডা দেয়, পান চিবোয়, সুর ভাঁজে, মেয়েদের দিকে তাকায়—এই সব দুর্নামই ওজনে ভারি। ওই একটা লোককে মেয়ে বিয়ে করতে চায় শুনলে বাবা হয়ত গলা টিপেই মারতে আসবে তাকে।

কিন্তু মনের বিচিত্র গতি। তারই সঙ্গে অরুন্ধতীর হৃদয়-বিনিময় ঘটে গিয়েছিল। তারই সঙ্গে কথা দেওয়া-নেওয়া সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর সেই কথা রাখতে না পারলে আত্মহত্যা ছাড়া গতি নেই—এমন কথাও ভেবেছিল অরুন্ধতী।

ওদিকে বাবা পাকা কথা সেরে ফেলল। কেনাকাটার তোড়জোড় চলতে লাগল।

এরপর একদিন অরুন্ধতীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পাড়ার গায়ককেও না। অরুন্ধতী তার মাকে শুধু চিঠি লিখে রেখে গেল একটা।

কিন্তু সেদিন আর এক বাড়ির খবর অরুন্ধতী জানত না। একবার মাথাও ঘামায়নি।

পঁচিশ বছর বাদে বিপুলমামার কথাগুলো যেন ছবি হয়ে চোখের সামনে ভাসছে।

..কর্মস্থল থেকে সেই মাস্টার ছেলের বাবা-মা এসেছে—ছোট ছেলের বিয়ে। তাদের বড়ছেলে কচি শিশু আর বউ রেখে মারা গেছে—অনেকদিন পরে তাদের এই সাধ-আহলাদ। বিপুলমামা তাদের বলেছে, চোখ জুড়োবার মতোই বউ আসছে, দেখে নেবেন। বড় বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, সেখানে উৎসব লেগে গেছে।

...পাঁচ বছরের ভাইপো অজয় কাকার চোখের মণি। বাবাকে তার মনেও পড়ে না, ওর কাকাই সব। কাকার সঙ্গে খায়, কাকার সঙ্গে ঘুমোয়, কাকার কাছে বই নিয়ে পড়তে বসে। সেই ছেলে শুনেছে, বাড়িতে কাকিমা আসছে। তারও আনন্দ ধরে না, রাতে শুয়ে শুয়ে কাকাকে অজস্র প্রশ্ন করে করে কাকিমার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছে সে। আর কাকা খুশিচিত্তে তার সব কথার জবাব দিয়েছে। সকালে মাকে তাদের আলাপের খবর জানিয়েছে সে। মা ঠাট্টা করেছে কাকাকে, এখন থেকেই যে ঘুম নেই চোখে, অ্যাঁ? তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, সত্যি খুব পছন্দ হয়েছে?

পাঁচ বছরের ছেলেটা উপস্থিত, কাকার খেয়াল নেই। হাসিমুখে মাথা নেড়েছে, বলেছে, তোমাদেরও হবে।

এই এক কথা কাকা মাকে কতবার বলেছে ঠিক নেই। মায়ের সঙ্গে অজয় কলকাতায় কাকার কাছেই থাকে। পাঁচ বছরের ছেলে তখন বোঝেনি, পরে বুঝেছে, বিধবা বলে অনেক বলা সত্ত্বেও মা মেয়ে দেখতে যেতে রাজি হয়নি।

কিন্তু দপ্ করে একসঙ্গে সব আলো নেভার মতোই বাড়ির সব আনন্দ নিভে গেল। ঠাকুমা আর দাদু চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল—কিন্তু অজয় ভালো করে কিছুই বুঝল না কি হয়েছে। এদিকে মায়ের মুখেরও হাসি গেল, কাকিমার কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মায়ের কাছে ধমক খেল।

অজয় শুধু এটুকু বুঝেছে, সব গন্ডগোল হয়ে গেছে। তবু কাকাকে না জিজ্ঞাসা করে পারেনি, কাকিমা আসছে না কেন?

কাকা মাথা নেড়ে বলেছে, আসবে না।

অজয় তবু আশা ছাড়তে পারেনি।—তাহলে কবে আসবে?

কাকা তেমনি হাসিমুখেই মাথা নেড়েছে, বোধ হয় আর আসবেই না।

আসেনি....।

এই না আসার জ্বালা যত বড় হয়েছে তত বেশি অনুভব করেছে অজয় সরকার।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে তপতীর। তখনো ফর্সা হয়নি ভালো করে। এই সময়েই ওঠে। মা ঘুমুচ্ছে কিনা দেখার জন্য শয্যা ছেড়ে উঠল সে।

বারান্দায় পা দিতেই চমকে উঠল। তারপরেই ছুটে এল। মা ঢাকা-বারান্দার বেঞ্চে বসে আছে। সমস্ত মুখ অস্বাভাবিক লাল। চোখ লাল।

তাড়াতাড়ি ধরে তুলতে চেষ্টা করল মাকে।—সারারাত তুমি বাইরে বসেই কাটালে নাকি মা? কি খারাপ লাগছে? ওদের ডাকব?

ঘোলাটে চোখে তাকাল অরুন্ধতী। উঠল না। মাথা নাড়ল শুধু। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, তুই বোস এখানে, আমি তোর ঘুম ভাঙার অপেক্ষাতেই বসে আছি।

মায়ের এই চেহারা দেখে তপতী ঘাবড়ে গেছে। কথা শুনে আরো হকচকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে মাকে জড়িয়ে ধরল।

—কি হয়েছে মা?

কিছু না...। আমার একটা কথা রাখবি?

কথায় নয়, চোখেমুখে মায়ের এমন মর্মচেঁড়া আকুতি তপতী বুঝি আর দেখেনি। তাড়াতাড়ি বলল, তোমার কোন কথা শুনি না? তুমি ঘরে চল আগে—

না, ঘরে না। আগে বল্, রাঁখবি?

তপতী তক্ষুনি মাথা নাড়ল, রাখবে। মায়ের মনের অবস্থা জানে, মনের অবস্থা নিজেরও ভালো নয়। কিন্তু মা এমন কি বলতে পারে, সে ভেবে পেল না।

উত্তেজনা চাপতে চেষ্টা করে মা আরো ফিস ফিস করে বলল, অপেক্ষা করবি? অজয়ের জন্য তিন বছর অপেক্ষা করবি?

তপতী নির্বাক, বিমূঢ় হঠাৎ।

কথা নয়, অধীর আগ্রহে মায়ের গলা দিয়ে যেন কান্না বেরুল এবার।—বল না? রাখবি আমার কথা? অপেক্ষা করবি?

এবারে কিছু না বুঝেই প্রায় নিজের অগোচরে তপতী বিমূঢ় মুখে মাথা নাড়াল শুধু।

কথা রাখবে। অপেক্ষা করবে।

একটা বছর ঘুরে গেল।

কি করে গেল তারানাথ তার হিসেব রাখে না। জীবনে সে কিছু হিসেব করেছিল। কিন্তু ওপরতলার ইচ্ছের সঙ্গে সে হিসেবটা মেলেনি। তারানাথ তা বরদাস্ত করতে চায়নি। স্রোতের মুখে নিজের ইচ্ছের একটা শক্তপোক্ত দেওয়াল তুলেছিল। সেটা টেঁকেনি। ফলে নিজের হৃৎপিন্ড ছিঁড়েখুঁড়ে কিছু মাশুল গুণে দিতে হয়েছে। ছেঁড়া হাপরের মতো বাতাসের সঞ্চয়টুকুও তাতে আর ধরে না।

একটা বোবা শূন্যতার মধ্যেই গা ভাসিয়েছে তারানাথ। যারা লক্ষ্য করে তারা তাকে উদাসীন ভাবে। এই উদাসীনতা ওপরতলার আশীর্বাদ মনে করে।

দিনের বেলার টুকিটাকি কাজের মধ্যেও এই দিনটাকে ঠিক মনে পড়েনি তারানাথের। ইচ্ছে করেই মনে পড়তে দেয়নি কিনা কে জানে! কারণ মনের তলায় কে যেন বার বার তার বাইরের দৃষ্টিটা নিভৃতের দিকে ফিরবে বলে অপেক্ষা করছিল। তারানাথ খেয়াল করেও করেনি।

তারপর রাত্রি। পৌষের হাড়-কাঁপানো রাত্রি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। লেপ ফেলে দিয়ে তারানাথ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। সকাল থেকে যে অপেক্ষা করছিল সে যেন তাকে ঠেলে তুলে দিল। এই শীতেও কপালে ঘামের মতো দেখা দিয়েছে। না, তারানাথ কোন দুঃস্বপ্ন দেখেনি। ঘুমের ফাঁকে বিবেক বস্তুটা আচমকা চাবুকও চালায়নি। শুধু তুলে দিয়েছে। ঘুম ভাঙিয়ে দিনটাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

তবু ঘুমভাঙা বিমূঢ় চোখে তারানাথ ঘরের চারদিকে তাকাল একবার। ঘরটা অন্ধকার নয় খুব। আলো নেভালে রাস্তার একটা আলো ঘরে এসে পড়ে। তারানাথ হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারল না এটা কোন রাত। এক বছর আগের না এক বছর পরের। ঘরে সে একা আছে না আর কেউ আছে। উল্টে এই একটা বছরই দুঃস্বপ্ন কিনা।

না, একা নেই। পাশে ছেলে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ঘোরে লেপটা তার গা থেকে সরে গেছে। তারানাথ টেনে ঠিক করে দিল। তারপর আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে নামল।... এইমাত্র ঘরে যেন আরো কেউ ছিল।...। ছিল আর কিছু বলছিল।

শীতের একটা ঝাপটা লাগল। কিন্তু অনুভূতিটা মগজ পর্যন্ত পৌঁছল না। তারানাথ অদূরের দেওয়ালের সুইচ টিপে আলো জ্বালাতে গেল। কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। আলো জ্বালল না। দেরাজ হাতড়ে পুরনো হাত-ঘড়িটা তুলে নিয়ে রাস্তার আলোয় ফেলে সময় দেখল। রাত্রি দুটো বেজে দশ-বারো মিনিট...

আশ্চর্য !

ঘড়ি রেখে তারানাথ আব্‌ছা অন্ধকারে পায়ে পায়ে ছেলের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল।..ঠিক এক বছর আগের এই রাত্রিতে অনেকটা এই সময় দ্বিতীয় দফা বিদায় নিয়েছিল তার কাছ থেকে সুমতি।... আরো আশ্চর্য, তারও দিনকতক আগে রাতের এই সময়েরই কাছাকাছি সময়ে সুমতি তাকে কিছু বলেছিল।

..ঘুমের ঘোরে তার সেই কথাগুলোই কি শুনেছিল তারানাথ ?

কান পাতলা। নিঃসীম প্রতীক্ষা। কান পাতলে শুনতে পায়। সুমতি নেই। কিন্তু সুমতির কথাগুলো কানে লেগে আছে। লেগে থাকে। শুধু এই কথা নয়, আরও অনেক দিনের অনেক কথা। আর হাসির ছোঁয়া-লাগা তার গলার স্বরটুকুও। এমন কি শেষের সেই কথাগুলোর মধ্যেও প্রাণান্তকর হাসির ছোঁয়া লেগে ছিল।

সমস্ত স্নায়ু একত্র করে কান পেতেছে তারানাথ।

'.....তুমি আমিও অভিনয়ই করছি। শুধু জানতুম না যে অভিনয় করছি। ফাঁকি তাতে কি, অভিনয় ভাল হলে পুরস্কার তো মেলে। তুমি কিছু ভেব না তোমার ছেলে ভালো হয়ে যাবে।'

নিস্পন্দ, কাঠ তারানাথ। দুটো কান শুধু উৎকর্ণ। কবেকার কোন দূরের কি সব কানাকানি যেন ভেসে আসছে কানে। তারানাথ ভাবতে চেষ্টা করে।... কি যেন হয়েছিল। কারা যেন কি বলাবলি করছিল। দেওয়াল ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেই সব কথা কানে বিঁধেছিল।.... সেবারে একটা মুখরোচক জটলার উপলক্ষ পেয়েছিল বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা। কিন্তু সেবারের মতো জমজমাট জটলার সুযোগ আগেও বুঝি পায়নি। উপলক্ষ আর কিছু নয়, সুমতির নিউমোনিয়া হয়েছিল। ডাক্তার এসে রায় দিয়ে গিয়েছিল, ডাবল নিউমোনিয়া, কি করে ভালো রকম ঠাণ্ডা লেগেছে—বুকের দু'দিক ধরে গেছে।

কর্তব্যের খাতিরে অন্যান্য ভাড়াটেদের বউয়েরা এসে এসে দেখে গেছে। কি করে ভালো রকম ঠাণ্ডাটি লেগে থাকতে পারে তা তারা ভালোই জানে। শীতকাতুরে সুমতির ঠাণ্ডা লাগার ধাতের কথাএ বাড়ির কে আর না জানে। এ নিয়ে কত সময় ঠাট্টা-তামাশাও করেছে অন্য ভাড়াটেদের বউয়েরা। শীত পড়তে না পড়তে সুমতির গলায় কমফর্টার উঠল। ঠাট্টা তারানাথও করত। দেখলেও ওর কাঁপুনি ধরে বলে কত সময় ভরা শীতেও শুধু একটা গেঞ্জি ভিন্ন আর কিছু হয়ত গায়ে তোলেনি তারানাথ। সুমতিকে আঁতকে উঠতে দেখলে বলেছে, আমার শীত তো সব তুমি নিয়েছ—ঠাণ্ডা কোথায় ?

রাত্রিতে গায়ের জামা খুলে সুমতি হুড়মুড় করে লেপের তলায় ঢুকে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে আষ্টেপৃষ্টে জাপটে ধরেছে তাকে। দাঁড়াও, গা গরম করে নিই, যে শীত।

তারানাথের বেচাল দেখে চোখ পাকিয়েছে।—এই ! ভালো হবে না বলছি—তুমি না আশ্রমে ঘোরাফেরা করছ আজকাল !

সেইজন্যেই তো তোমাকে একটু সাহায্যে করার বাসনা—যে শীত !

তারানাথের অবাধ্য হাত ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে গোটা লেপটা। টেনে নিয়ে সরে যেতে চেয়েছে সুমতি।—সাহায্য করতে হবে না, ছাড় বলছি!

তারানাথ অনেক সময় অবাক হয়েছে। সুমতির স্বাস্থ্য রীতিমত ভালো, গরমের দিনে চারবার করে স্নান করে। অথচ শীত পড়ল কি কাবু।

কিন্তু অন্য ভাড়াটে গিন্নীদের জটলায় দরদের ছিটেফোঁটাও ছিল না। তাদের আলোচনা শোনার জন্য কান পাতেনি তারানাথ। এমনই বাড়ি এটা যে এর ভিতরের চার দেওয়ালের কথা আপনি কানে আসে। তারানাথেরও কানে এসেছে কেমন করে। না, সুমতির ডবল নিউমোনিয়া শুনে জটলাকারিণীদের একজনও এতটুকু বিস্মিত হয়নি।—হবে না! ঠাণ্ডা লাগবে না! এই কনকনে ঠাণ্ডায় রাত্রি একটা নেই, দুটো নেই, তিনটে নেই কতদিন এই বাড়িরই কতজন তো ওই অভিসারিকাকে একা রাস্তায় দেখেছে। ভোর রাতও দেখেছে। হয় কোথাও যাচ্ছেন, নয় তো কোথাও থেকে ফিরছেন। যে রাস্তা, সেই নিশুতি রাতে একা পুরুষমানুষেরই বেরুতে ভয় করে, কিন্তু ওই মেয়ের ভয়ডর বলে কিছু আছে! দেখা হলেও বা চিনলেও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, কারণ, সুমতি তখন এ বাড়িতে থাকে না—আর, কেন থাকে না তাও সকলেই জানে।..। ওদিকে তো ননীর শরীর, শীত লাগল তো জমে গেল। হবে না ডবল নিউমোনিয়া, অমন নির্জলা অভিসারের পুরস্কার মিলবে না!

সুমতির পুরস্কার-প্রীতি সকলেই জানে এরা। তার পাওয়া কাপ, সোনার মেডেল, রুপোর মেডেলগুলো সে ঘটা করেই দেখাত সকলকে। যে অনুষ্ঠানে এইসব বাড়তি পুরস্কার মিলত না, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিই মনে মনে বিরূপ হত সুমতি।

প্রায়, ছেলেবেলা থেকেই পুরস্কারের প্রতি লোভ সুমতির। গরীব ঘরের মেয়ে, বাপ নেই, পাঁচ-পাঁচটা ভাই-বোন নিয়ে মা তার মামার গলগ্রহ। মামার অবস্থা মন্দ নয়, তারও ছেলেপুলে আছে। সেই মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে নিজেদের তফাত প্রায়ই অনুভব করতে হত। অনেক দিনের বঞ্চনার ফলে বাড়তি সম্মান লাভের প্রতি ঝোঁক তার। ভাগ্যোর হাতে মার খেয়েছে, নইলে সে যে কোন অংশে কারও থেকে কম যায় না, এটা প্রতিপন্ন করার জন্য মন উন্মুখ হয়ে থাকত। লেখাপড়ায় তেমন টান বা মাথা নেই, দেখিয়ে শুনিয়ে দেবারও নেই কেউ। তাই পড়াশুনার ব্যাপারে সম্মানলাভ কখনো বরাতে জোটেনি। কিন্তু স্কুলে থেকে বরাবর প্রাইজ নিয়ে আসত অভিনয়ে বা আবৃত্তিতে সকলকে ছাড়িয়ে। সেই পুরস্কার একমাত্র সুমতি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ কখনো বড় করে দেখেনি।

দ্বিতীয় বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাস করার পর মামা আর পড়ায় নি। প্রথম দু'তিন বছর দুই-একটা পাত্রের সন্ধান করেছে, তারপর হাল ছেড়েছে। ওদিকে তার থেকে ছোট মামাতো বোনদেরও ভালই বিয়ে হয়ে গেছে। এই ব্যাপারেও সুমতি মনে মনে তাদের থেকে বড়গোছের সম্মান আশা করেছে... আশা করেছে জীবনে হঠাৎ একদিন আসবে কেউ, সকলে অবাক হবে।

দারিদ্র্যের প্রতি ছেলেবেলা থেকে বিতৃষ্ণা সুমতির। এর ওপর একদিনের একটা

দৃশ্য বিভীষিকার মতো বুকে চেপেছিল তার। ছুটির দিনে পাড়ার অবস্থাপন্ন বয়স্ক মেয়েরা দুপুরে বাড়ি এসে জোর করে ধরে নিয়ে যেতই তাকে। পাড়ায় মেয়েদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে একটা। স্টেজ ভাড়া করে বছরে কম করে দুটো নাটক করে তারা। সেখানে এই গরীব ঘরের মেয়েটিই সব থেকে বড় আকর্ষণ। সেই সময় সে-ই সকলের গরবিনী, মুকুটমণি। অতএব ছুটির দিন হলেই রিহার্সাল বা আলোচনা থাকেই। সেখানকার আসন থেকে বিকেলের আগেই বাড়ি ফিরছিল একদিন। প্যাচপেচে গরমের সময় সেটা। বাতাসে তপ্ত হল্কা। বাড়ির দাওয়ায় পা দিয়েই সুমতি একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর বুকের ভিতরে কি যেন ঘটে যেতে থাকল।

...এই গরমেও বাইরের দাওয়ার ছায়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে একটা মাঝবয়সী ভিখিরি মেয়েছেলে। বিবর্ণ ছেঁড়া-খোড়া একটা শাড়ির মত কিছু দেহে জড়ান—বুকের দিকটা প্রায় নগ্ন। অস্থিচর্মসার কঙ্কাল একটা। তারই বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তেমনি একটা রুগ্ন বছরখানেকের বুভুক্ষ শিশু দড়ি-বটা শুকনো স্তন-পিণ্ডটা যতটা সম্ভব মুখে পুরে খাদ্য আহরণের প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিছু পাচ্ছে না বলেই শীর্ণ দুই হাতে কঙ্কালসার দেহটা আরো বেশি করে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছে সে।

ভিখিরি মেয়েটা ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে কি মরে পড়ে আছে হঠাৎ ঠাওর হয় না।

এই দৃশ্যটাই সুমতি আর ভুলতে পারে নি বোধ হয়। মনে পড়লেই সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যায় তার।

একটু দেরিতে হলেও সুমতির বিয়ে হয়েছে। দেখতে সুশ্রী, স্বাস্থ্য ভালো, সঙ্গতি থাকলে বিয়ে অনেক আগেই হয়ে যাবার কথা।

ছেলের তরফ থেকে সাগ্রহ বিয়ের প্রস্তাব এসেছে শুনে সুমতি প্রথম অবাকই হয়েছিল। তারপর যখন শুনল ছেলে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, ঘোর অবজ্ঞায় মনে মনে প্রস্তাবটা বাতিলই করেছিল সে। মামা অবশ্য বলেছে, পাত্রের সকালে চাকরি, দুপুরে আর বিকেলে টুকটাক এটা-সেটা করে আরো কিছু রোজগার হয় তার। সুমতি তবু সায় দিতে পারেনি।

কিন্তু এইখানেই, এই তারানাথের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছে। তারানাথ মামার পরিচিত, দাদাদের পরিচিত এবং সকলের মতে চমৎকার ছেলে। সুমতি জানেও না, সে নাকি তাকে অনেক দিন দেখার পরেই এভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

চমৎকার না হোক, বিয়ের পরে সুমতিরও মন্দ লাগেনি অবশ্য। ঠাণ্ডা মেজাজের ভালোমানুষ তারানাথ। ধর্মভীরু, মাঝেসাঝে কোন্ এক আশ্রমের স্বামীজির কাছে যায়। তাকেও বারকয়েক নিয়ে গেছে। স্বল্পভাড়ার খুপরি দুখানি ঘর তারানাথের : আগে একখানা ছিল, বিয়ের পর চেষ্টা-চরিত্র করে পাশের চিলতে ঘরটাও সংগ্রহ করেছে। আরো পাঁচ-ছ ঘর ভাড়াটে থাকে বাড়িটায়। কারও বড় অবস্থা নয়। শহুরে এলাকা ছেড়ে হঠাৎ যেন গ্রামের আকার নিয়েছে জায়গাটা। জানালায় দাঁড়ালে গাছ-গাছড়া, এবড়ো-খেবড়ো খানিকটা মাঠ আর কাঁচা রাস্তা চোখে পড়ে। অথচ গলি ধরে পাঁচ মিনিট হাঁটলে ট্রাম-বাস, গাড়িঘোড়ায় জমজমাট ব্যস্ত সমস্ত শহর।

ভালো তারানাথের লেগেছিল। এই ভালো লাগার সবটুকুই সুমতিকে ঘিরে। সুমতির সবেতে হাসি, সবেতে কৌতূহল, সবেতে উৎসাহ, সবেতে সহজ প্রাণের আবেগ। অদূরে চক্রবর্তীবাড়ির বাঁধানো পুকুর আছে একটা। পাড়ার মেয়ে-বউদের চান করতে দেখে তারও পুকুরে চান করার শখ। আশ্রমে যায় বলে তারানাথকে ঠাট্টা করে, কিন্তু অশ্বত্থতলার রাস্তায় যাতায়াতের সময় সেখানকার জীর্ণ কালভৈরবীর মন্দিরের উদ্দেশে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করতে ভোলে না। পাড়ার এক পাগল ছোকরা দু'বেলা তারস্বরে গান করে যেত। সুমতি সভয়ে দেখত তাকে। হঠাৎ একদিন কানে এল কালভৈরবীর কৃপায় সে ভালো হয়ে গেছে। সত্যিই আর গান করে না। তারানাথ একদিন দেখল ছোকরা চলে যাচ্ছে, আর জানালায় দাঁড়িয়ে সুমতি তার উদ্দেশেও দু-হাত কপালে ঠেকাচ্ছে।

তারনাথ অবাক।—ও কি?

সুমতি অপ্রস্তুত।—মায়ের দয়া পেয়েছে, ওর মধ্যেও আছে নিশ্চয় কিছু।

শুধু এই নয়, অদূরে কাদের আমগাছ থেকে ছেলেরা আম পাড়ছে, সুমতি দাঁড়িয়ে গেল দেখতে। হরেক রকমের ফেরিওয়ালা যাচ্ছেই—সুমতির যেন উঁকি দিয়ে দেখাই চাই কি যায়। বরুণের সামনেই তারানাথ এইসব নিয়ে কতদিন কত রকমের ঠাট্টা করেছে সুমতিকে ঠিক নেই। বরুণ তারানাথের দূর সম্পর্কের ভাই আবার অন্তরঙ্গ গুরুভাই। আশ্রমের স্বামীজির কাছে সে-ই তারানাথকে টেনেছিল। বরুণ কিন্তু সর্বদা সুমতির দিকে টেনে কথা বলে। বলে, যত ঠাট্টাই কর দাদা, এ জীবনটা বউদির জন্যেই তরে গেলে।

সুমতির মন-মেজাজ বদলাতে লাগল ছেলের বছরখানেক বয়েস হওয়ার পর। রোগা ছেলে, একটা না একটা ভোগ লেগেই আছে। ওদিকে আশ্রমের প্রতি টান বাড়ছে তারানাথের। সকালের প্রাইমারি স্কুল করা ছাড়া বাড়তি রোজগারের দিকে তেমন মন নেই আর। কিছু বললে হেসে জবাব দেয়, দুদিন বাদে হেডমাস্টার হয়ে যাব, একরকম করে চলে যাবে তখন। কিন্তু হেডমাস্টারের মাইনে তো একশ তিরিশ টাকা। তাদেরও অনেক জায়গায় ছেলে পড়িয়ে তবে চলে। সুমতি ভ্রূকুটি করে, আসলে তুমি রাম-কুঁড়ে।

সংসারের খরচে টান ধরছে। মাসের কুড়ি দিন না যেতে সুমতি অন্ধকার দেখে চোখে। সুমতির চোখের সামনে বাড়ির দাওয়ায় সেই ভিখিরি মেয়ে আর বুভুক্ষ শিশুর দৃশ্যটা ভেসে ওঠে। তারপর থেকে বুকের তলায় একটা অজ্ঞাত ত্রাস জমে জমে উঠেছে তার। তার হাসিমুখ দেখে সেটা বোঝা যায় না সব সময়। কিন্তু একটা দুর্ভর চিন্তা সুমতিকে পেয়ে বসতে থাকে।

মামার বাড়ির পাড়ার সেই মেয়ে প্রতিষ্ঠানের এক দঙ্গল মেয়ে বাড়িতে এসে হাজির একদিন। আর্জি, ঘটা করে এক নাটক অনুষ্ঠানে নামছে তারা—এবারে আর নেমন্তন্ন করে দর্শক আনবে না। রীতিমত দু-পাঁচ-দশ টাকার টিকিট করা হবে। অতএব নায়িকার ভূমিকায় তাদের সুমতিকে চাই-ই-চাই।

সুমতি সানন্দে রাজি। গাড়ি করে তাকে রিহার্সালে নিয়ে যাওয়া আর দিয়ে যাওয়ার

ভার প্রতিষ্ঠানের। আর ছেলে? ছেলের বাপের তো সকালে চাকরি। ছেলে রাখার ভাবনা কি!

নাটক মঞ্চস্থ হল। দেড় বছরের ছেলে নিয়ে তারানাথ আর বরুণও দর্শক। তারানাথ সুমতির অভিনয় বিয়ের আগেও দেখেছে। কিন্তু এমনটি আর বুঝি দেখেনি। সে মুগ্ধ। বরুণও। আর মুগ্ধ অগণিত দর্শক।

একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তো সুমতিকে সোনার মেডেল দেবেন ঘোষণা করে বসলেন।

বাড়ি ফিরে বরুণের ঢালা প্রশংসার জবাবে তারানাথ টিপ্পনী কাটল, অভিনয় জিনিসটা আসলে তো ফাঁকি। আমি ফাঁকির গুণপনার তারিফ করি না।

সুমতি মুখ টিপে হাসছে। বলল, পুরস্কার তো আর ফাঁকি নয়, সোনার মেডেলটা খাঁটিই হবে।

সেই শুরু। শহর কলকাতায় অ্যামেচার নাট্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম নয়। পছন্দমত নায়িকার অভাব লেগেই আছে। মেয়ে ক্লাবের সেই অভিনয় দেখে তেমনি এক প্রতিষ্ঠানের লোক এল বাড়িতে। প্রস্তাব, সুমতি যদি তাদের নাটকে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে খরচ-খরচা বাদে বাড়তি কিছু টাকাও দেওয়া হবে তাকে। বলা বাহুল্য, সুমতির পরিচিতা এক বান্ধবীকে ধরে নিয়ে এসেছিল তারা। অনুরোধ-উপরোধে সুমতি দ্বিধায় পড়ল। দু'দিন বাদে আসতে বলল তাদের।

শোনামাত্র তারানাথ আপত্তি করল। বরুণও। কিন্তু এই আপত্তির ফলেই সুমতির গোঁ চাপল যেন। চোখ পাকিয়ে তর্ক করল, কেন, করব না কেন? মাসের পনের দিন না যেতে খরচের টানে চোখে অন্ধকার দেখি, সে খবর রাখ?

বরুণ বলে, তুমি এই করে খরচ চালাবে নাকি?

চালাবই তো। দোষ কি?

সুমতি অভিনয় করেছে। সেখানেও পুরস্কার পেয়েছে। তারপর তিন-চার মাস অন্তর ডাক এসেছে তার, আর তারপর তো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে মাসে মাসে ডাক আসছে। সুমতির নাম হয়েছে। নিজের ফী নিজে ডিকটেট করে এখন। আগের পাঁচ গুণ টাকা দিয়েও তাকে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তাছাড়া দুই-একটা চিত্র প্রতিষ্ঠানের লোকও ঘোরাঘুরি করে যাচ্ছে। মনের মত ভূমিকা পেলে সুমতির সিনেমায় নামারও বাসনা আছে।

বাড়ির হাওয়া বদলেছে। অন্য ভাড়াটেদের কানাকানি এখন আর গোপন নেই। রাত-বিরেতে যখন তখন বাড়ি ফেরে সুমতি, কার মুখ বন্ধ করবে তারানাথ। তাছাড়া বাড়িতেও হরেক রকমের লোক আসে সুমতির কাছে, আড্ডা দেয়, গল্প করে, তাদের ভাল চোখে দেখে না কেউ। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল হয়েছে, কিন্তু তারানাথের ভাবগতিক বদলাচ্ছে। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিকে মন দিয়েছে সে। অবসর সময় রোগা ছেলেটাকে নিয়ে থাকে, সংসারের অবস্থা ফিরলেও তার স্বাস্থ্য ফিরছে না। মাকে তেমন পায় না, বাপকে পায়—কাজেই বাপের গা ঘেঁষেই আছে সর্বদা।

...ভাবে তারানাথ। সুমতির সর্বদাই হাসিমুখ। কিন্তু এ হাসি বোধ হয় সত্যি নয়। কারণ, গোড়ায় গোড়ায় সুমতির অনেক রোজগারের অভিনয় দেখেছে সে। কিন্তু সেই অভিনয়ের বেশির ভাগই মর্মছেঁড়া দুঃখের। সীতা, খনা, জনা, ষোড়শী, প্রফুল্ল, জাহানারা—এদের সব দুঃখের স্ফুলিঙ্গ ওর মধ্যে এমন করে মূর্ত হয়ে ওঠে কি করে!

তারানাথ বলত, সব ফাঁকি!

সুমতি জবাব দিত, পুরস্কার আর টাকাগুলো ফাঁকি নয়।

কিন্তু এখন আর তারানাথ কিছু বলে না। অথচ সন্ধ্যা-আহ্নিকেও মন দিতে পারে না। চেষ্টা করে চতুর্গুণ। ক্ষিপ্তও হয় চতুর্গুণ। খিটির-মিটির বাধে। বচসা হয়। বরুণ বলে, বউদি ছেড়ে দাও, দাদা চায় না যখন—

সুমতি জ্বলে ওঠে, তোমার দাদার মুরদ জানা আছে। চোখে সেই ভিখিরির ছবি ভাসে। জোর দিয়ে বলে, সব অকৃতজ্ঞ, কারো পরমর্শ দরকার নেই আমার। এবার সিনেমায় নামব ভাবছি।

তুমুল হয়-একদিন। ভয়ে ছেলেটা ঘরের কোণে সেঁধিয়ে থাকে। রাগলে সুমতির কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। জিনিসপত্র আছড়ে ভাঙতে চায়। এই রাগের মাত্রা দিন দিন বাড়ছে।

তারানাথ বলে, এভাবে চলতে পারে না।

সুমতি ফুঁসে ওঠে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি!

চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে গেল একদিন। সাত বছরের ছেলের শরীর খারাপ ছিল। তবু সুমতিকে বেরুতে হয়েছে। টাকা নিয়ে বসে আছে, পরদিন বড় নাটক আছে। স্টেজ রিহার্সাল হবে। ফিরল রাত্রি একটার পর।

দরজা ভিতরে থেকে বন্ধ। দরজা ঠেলল, কেউ দরজা খুলল না। ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। শ্রান্ত-ক্লান্ত সুমতির মাথায় আগুন জ্বলতে থাকল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। শেষে পাশের চিলতে ঘরে চলে গেল।

পরদিন সকালে এ-ঘরে এল। বাপ-ছেলে শয্যায় বসে আছে। ছেলেকে মোটামুটি সুস্থ মনে হল।

কাল রাতে দরজা বন্ধ করে ছিলে কেন?

তারানাথ জবাব দিল না।

ডাকালাম সাড়া দিলে না কেন?

তারানাথ জবাব দিল না।

সুমতি দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে।

সুমতি চলে গেল। খানিকবাদে তারানাথকে একলা পেয়ে আবার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল। তারপর সুমতির মুখ দিয়েই আজ তারানাথের কথা বেরুল।

এভাবে আর তাহলে চলতেই পারে না।

তারানাথ জবাব দিল। বলল, না।

তাহলে আমাকে যেতে হয় এখান থেকে, কি বল?

গেলে আপত্তি করব না। ছেলের সামনে তার মায়ের এই আদর্শ আমার পছন্দ নয়।

সেইদিনই সুমতি ঘর ছেড়েছে।

ছেলেকে ভোলাতে দিনকতক মাত্র লেগেছিল তারানাথের। মা এখন কিছুকাল আসবে না এটুকুই জেনেছে ছেলে। অন্য ভাড়াটেদের কানাকানি দ্বিগুণ হয়েছে, তারানাথ কান দেয়নি। প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছে অনেক আগেই। সকালে স্কুল করে। তারপর সমস্ত দিনরাত ছেলে আগলায়। আগে যেমন করত। আর ফাঁক পেলেই নাম জপ করে।

কিন্তু দু মাস না যেতে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল তারানাথের। দিনকতক জ্বরে ভোগার পর ছেলে আর চলতে ফিরতে চায় না। ডাক্তার দেখান হল। ডাক্তার আরো বড় ডাক্তার ডাকার পরামর্শ দিলেন। বড় ডাক্তার অনেক কিছু পরীক্ষা করলে, সার্জন এনে দেখানো হল, শেষে রায় দিলেন, দুরারোগ্য হাড়ের ব্যাধি, হাড় শুকিয়ে যাচ্ছে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

আশ্রমের স্বামীজির দু'পায়ে মাথা গুঁজে পড়ে রইল তারানাথ।

স্বামীজি আশ্বাস দিলেন, ছেলে ভালো হয়ে যাবে। প্রাণভরে মাকে ডাক, আর প্রার্থনা কর, আর বিশ্বাস কর, ছেলে ভালো হয়ে যাবে। তাঁর চরণে গোটাগুটি নির্ভর করো—এইটেই আসল ওষুধ

মাস দুই কেটেছে তারপর। প্রাণপণে বিশ্বাসে বুক বেঁধেছে তারানাথ। বাঁধতে চেষ্টা করেছে।

সেদিন বরুণ বলল, বউদি আশ্রমে এসেছিল হঠাৎ।

তারানাথ চমকে উঠল প্রথমে। তারপর কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করল, ছেলের অসুখের কথা বলেছিস?

বরুণ চুপ।

কেন বললি? বলার দরকার কি ছিল? সবেতে বাড়াবাড়ি তোর।

বরুণ বলল, স্বামীজিই বলেছেন।

তারানাথ গুম হয়ে বসে রইল। তার পর তিনটে মাস কেটে গেল আরো। গোড়ায় গোড়ায় প্রায়ই তারানাথ ভেবেছে, সুমতি আসবে। এলে আবার একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে তাকে। ওই মায়ের চোখ থেকে ছেলেকে আড়ালে রাখতে হবে, অন্যথায় তার বিশ্বাসে ভাঙন ধরবে। এলে স্থির শান্তমুখেই সুমতিকে ফেরাতে হবে।

কিন্তু সুমতি আসেনি।

অথচ সে যে এদিকেই কোথাও থাকে তাতে ভুল নেই। কারণ বাড়ির ভাড়াটেদের বা পড়শীর কানাকানি এখনো তার কানে আসে। মাঝরাতে বা ভোররাতে অনেকে তাকে কোথায় কোথায় একা রাস্তায় দেখেছে। কেউ টিপ্পনী কাটে, অভিসার থেকে ফিরতে দেখেছে, কেউ বলে, যেতে।

এদিকে বিধাতার পায়ে দ্বিগুণ সমর্পণের চেষ্টা তারানাথের। তবু কোথায় যেন সংশয়

কোথায় ভয়। ছেলের দিকে চেয়ে চেয়ে বুকের হাড়পাঁজর যেন দুমড়ে দুমড়ে ভাঙতে চায় এক-একসময়। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় সেই দৈবকেই আঁকড়ে ধরে আবার।

সেদিন রাতে কি হল কে জানে। কার প্ররোচনা কে জানে! রাত্রি তখন একটা বেজে গেছে। ঘুমন্ত ছেলের শিয়রে বসে জপ করতে করতে কেমন মনে হল, এতদিনেও তেমন কিছু উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। বুকের ভিতরটা ডুকরে উঠল তারানাথের। তারপরেই আচমকা কি মনে পড়তে নিস্পন্দ কয়েক মুহূর্ত। আশা আছে। আশা নিশ্চয় আছে। এতদিন মনে পড়েনি কেন?

উঠল। গরম জামাটা গায়ে চাপিয়ে নিল। ছেলে সমস্ত রাতে একবারও জাগবে না। সন্তর্পণে রাস্তায় এসে দাঁড়াল, শীতের হাওয়া গায়ে বিঁধল। কিন্তু তারানাথ টের পেল না।

প্রায় আধ মাইল পথ ভেঙে নিজেকে সমর্পণ করবে বলে সেই জায়গায় এসে দাঁড়াল। চক্রবর্তীদের পুকুরের পাশ কাটিয়ে অশথতলার সেই আপদনাশিনী জীর্ণ কালভৈরবীর মন্দিরের সামনে।

পরক্ষণে বিষম চমকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল তারানাথ।—কে! কে?

বন্ধ মন্দিরের সিঁড়িতে মাথা রেখে পড়ে আছে একজন রমণী। এই জমাটবাঁধা শীতেও গরম জামা নেই গায়ে। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সে-ও ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তারপর আর্তস্বরে বলে উঠল,—তুমি! তুমি এখানে কেন? ছেলে কোথায়? ছেলে কেমন আছে?

তারানাথ নিস্পন্দ, কাঠ। অস্ফুট স্বর নির্গত হল একটা।...তুমি এখানে!

আঃ। আমি এখানে নতুন নই, তিন মাস ধরে রোজ আসছি। ছেলে কোথায়? সে কেমন আছে?

ভা-ভালো। ঘুমুচ্ছে।

বড় করে দম নিল একটা সুমতি। উত্তেজনা সংযত করতে চেষ্টা করল। তারানাথের মনে হল এ যেন সুমতি নয়, সুমতির প্রেত।

সুমতিও দেখছে তাকেই। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। বলল, মায়ের ডাক মা না শুনে পারে? আমি আসব না তো কে আসবে।

তারানাথ চেয়ে আছে ফ্যাল-ফ্যাল করে।

সুমতি হঠাৎ হাসল একটু। বিবর্ণ হাসি। কিন্তু অনেকটা আগের মতই। টেনে টেনে বলল, দেখছ কি।...তুমি আমিও অভিনয়ই করছি। ফাঁকি, তাতে কি, অভিনয় ভালো হলে পুরস্কার তো মেলে। তুমি কিছু ভেব না, তোমার ছেলে ভালো হয়ে যাবে।

হঠাৎ কাঁপুনির চোটে সুমতি পড়েই যাচ্ছিল। তারানাথ ধরে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল।

সুমতির গা পুড়ে যাচ্ছে। একটু বাদে প্রায় বেহুঁশ।

...ডাক্তার বললেন, নিউমোনিয়া। আশা নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে। বুকের দু'দিক ধরে গেছে।

সুমতি তারপর শেষ বিদায় নিয়েছে।

ভোরের আলো ঘুমন্ত ছেলের মুখে এসে পড়েছে। শিয়রের কাছে তারানাথ তেমনি দাঁড়িয়ে। একটা বছর ঘুরে গেছে। ছেলের স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরছে মনে হয়।

...পুরস্কার মিলেছে হয়ত। কিন্তু পুরস্কারের এত বড় ভার তারানাথ একা বইবে কি করে?

আদর্শ

'আদর্শ বলে একটা কথা আছে। কিন্তু শুনলে রাগ হয় এখন। তার জন্য দায়ী আমাদের মানী-গুণী নেতারা। উনিশ বছরের অবিরাম চেষ্টায় কথাটাকে তাঁরাই একেবারে ঘষা নয়া পয়সার মতো জ্যোতিশূন্য করে তুলেছেন।'

অতএব সামনের দেওয়ালজোড়া মস্ত মস্ত অয়েলপেন্টিং দুটোর দিকে চোখ রেখে আদর্শ প্রসঙ্গে কিছু নরম-গরম বুলি কর্ণস্থ করার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের তলায় একটা তির্যক অনুভূতি উঁকিঝুঁকি দিল আমার। ওই পূর্ণাঙ্গ অয়েলপেন্টিং দুটো সমীরণ দত্তর শ্বশুর এবং শাশুড়ির। ও দুটো আঁকতে আর অমন ঝকমকে সোনালী ফ্রেমে বাঁধাতে খরচ কত পড়েছে শুনলে হয়ত আঁতকেই উঠব। ছবি দুটোয় বড় বড় ফুলের মালাও দুলতে দেখেছি মাঝেসাঝে। জামাই শ্বশুর এবং শাশুড়ি ভক্ত হোক তাতে আমার আপত্তি নেই,—কিন্তু আদর্শের কথা বলছে বলেই মনে হল, ঘরের মধ্যে তার নিজের বাপ-মায়ের ছবিও থাকতে পারত একটা। বাড়িতেও আছে কিনা সন্দেহ।

যাক, ইচ্ছা থাকলেও বা বক্তাটি তর্ক ভালোবাসলেও খোঁচাটা দেওয়া গেল না। বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে এ বাড়ির গৃহিণীটি আমার প্রতি উদার এবং সদয়। এসেই শুনলাম, কোন্ বিয়েবাড়িতে দিতে হবে বলে মহিলা শাড়ি কিনতে বেরিয়েছে। শাড়ি কিনে বিয়েবাড়িতে দিয়ে তবে ফিরবে। অতএব ছুটির দিনে খোশগল্পের ফাঁকে যে পেয়ালা দুই চা এসে হাজির হয়, তাও হবে কিনা কোনো নিশ্চয়তা নেই। রমণীর হাসিমুখ দেখা বা টিকা-টিপ্পনী সহ দু'চারটে বাক্যবাণ শোনার আশাও জলাঞ্জলি।

সমীরণ দত্ত সোৎসাহে বলতে লাগল, তার থেকে কর্তারা যদি হবু রাজা গবু মন্ত্রীর রাজত্ব যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চালিয়ে গিয়েও চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় উদরস্থ করার প্রয়োজনে ছাড়া বাদবাকি কাজে জিব নাড়া বন্ধ করতেন, তাহলেও লোকে দুটো আদর্শের কথা বলত আর দু-পাঁচজন তা শুনতও। কিন্তু এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, আদর্শের কথা বলতেই তো ভয় করে।

আমি আশান্বিত হয়ে মুখ খুললাম।—সত্যি ভয় করে বলছ?

যে সমীরণ দত্তর সঙ্গে দীর্ঘকাল বাদে আমার মাস কয়েকের মাত্র যোগাযোগ, সে বে-রসিক নয়। একটু অপ্রস্তুত হয়ে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল।

যাক, এই সঙ্গে প্রথম দফা চা অন্তত এল, আর তা নিয়ে এল গম্ভীর মনোযোগে

ট্রের পেয়ালায় চা যতটা সম্ভব রক্ষা করতে করতে সমীরণের দশ বছরের ফুটফুটে ফ্রক-পরা মেয়েটা। আমি খুশি এবং ব্যস্ত হয়ে ট্রে-টা তার হাত থেকে নিয়ে বললাম, তুমি কেন মা, তোমাদের বেচা কোথায় ?

লজ্জা-লজ্জা মুখ করে মেয়েটা বলল, মা তো নিজের হাতে আনে.........

শুনতে ভালো লাগল। আর, শূন্য ট্রে নিয়ে মেয়ে চলে যাবার পরেও বাপের মুখে যে প্রসন্ন হাসিটুকু লেগে থাকল, তাও ভালো লাগল। পরিতুষ্ট মুখে সে এই ফাঁকে মেয়ের মায়েরও প্রশংসা করে নিল একটু, বলল, তুচ্ছ আদর্শের নজিরও কেমন মজার জিনিস দেখো।

আমি দেখলাম, আর মনে মনে ভাবলাম সমীরণ বদলেছে বটে। যে পেশা নিয়ে আছে, জীবনের বহু জটিলতা দেখেছে আর দেখছে বলেই হয়ত এই পরিবর্তন।

সমীরণ দত্ত ব্যারিস্টার। বাপের কিছু সম্পত্তি পেয়েছে, নিজেরও ভালো পসার। উড়ন্ত বাবুরা বিলেত গেলে একেবারে বাড়তি দুটো ডানা লাগিয়ে ফেরে—এই রকম ধারণা ছিল আমার। কিন্তু প্রায় দেড় যুগ বাদে এই সমীরণকে দেখে ধারণা কিছুটা বদলাতে হয়েছে। কারণ, য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে ওকে একদিনও আমি ভালো চোখে দেখিনি। উদ্ধত, দাম্ভিক, অভদ্র গোছের ব্যবহার ছিল। টাকার গর্বে মাটিতে পা পড়ত না। পিছনে মোসায়েব ছিল জনাকতক। তাদের নিয়েই থাকত সর্বদা। অনেক অপচয়ের খবরও আমাদের কানে আসত।

কিন্তু একটা গুণ ছিল, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। য়ুনিভার্সিটির নামজাদা ডিবেটার ছিল সে। ঠোঁটের ডগায় জিভের ডগায় কথার কল বসানো যেন। মনে মনে যতই অপছন্দ করি না কেন, কান পেতে শোনার মতোই ডিবেট করত, বক্তৃতা করত।

তার বর্তমানের পেশায় ওই গুণটাই যে কাজে লেগেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাস ছয় আগে একবার আমি কোর্টে গিয়েছিলাম লেখার কিছু রসদের আশায় এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। দোতলার বারান্দায় সমীরণের সঙ্গে দেখা। ধরাচূড়া পরা মুখোমুখি মূর্তিটিকে আমি চিনতে পারিনি বা খেয়াল করে দেখিনি। কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে-ই আমার কাঁধে আচমকা এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। তারপর একেবারে বগলদাবা করে নিজের গাড়িতে এনে তুলল। আর সেই থেকে এই নতুন পর্যায়ের ঘনিষ্ঠতা। লিখি বলে ওর মিষ্টি গিন্নীটি ওর থেকেও একটু বেশি খাতির করেছে আমাকে। কতদিন নাকি আমার প্রকাশকের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করার জন্যও তাগিদ দিয়েছে কর্তাটিকে, তারপর হাল ছেড়েছে।

যাই হোক, নতুন পর্যায়ের এই ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর ব্যাপারে আমারও সক্রিয় সহযোগিতা ছিল একটু । সেটা নিছক স্বার্থগত কারণে। গত ছ'মাসে কম করে গোটাপাঁচেক চমক লাগার মতো গল্প লিখতে পেরেছি। মনে মনে খুব ভালই জানি তার একটারও কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য নয়। পেশাগত এক-একটা বিচিত্র কেস-হিস্ট্রি সমীরণ যেভাবে বলে, হুবহু তাই বসিয়ে দিলেও ভালো গল্প হতে পারে। তবে তাতে একটা বড় রকমের ফাঁকও অবশ্য থেকে যাবে। সেটা সমীরণের নিজের আবিষ্কার

বা চেষ্টা বা প্রসারতার দিক। ওর অনুপস্থিতিতে সেটুকু পূরণ করে দেয় ওর স্ত্রী। এই প্রসঙ্গে মহিলার মুখখানা গভীর পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠতে দেখেছি অনেক দিন।

মোট কথা, আজ নিরাশ হবারই দিন মনে হল। একে ইন্ধন যোগানোর জন্য সাহায্যকারিণী অনুপস্থিত, তার ওপর সমীরণ আদর্শ নিয়ে মেতেছে। আদর্শের প্রসঙ্গটা উঠেছিল কংগ্রেসের সদ্যগত অধিবেশনের আলোচনার রাস্তা ধরে। সেই থেকে ওটা সমাজের সর্ব-স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। অথচ সমীরণের বিশ্বাস সত্যিকারের আদর্শ স্পর্শমণির মতোই প্রায় অপার্থিব বস্তু।

ঠিক এইখানেই কণ্টকোত্তীর্ণ কুসুমলাভের একটা চেষ্টার লোভ মনে জাগল। বললাম, সত্যি সত্যি মনে দাগ কাটে, তোমার ওই লাল সুতো-বাঁধা বাণ্ডিল ঘেঁটে এমন একটা নজির বার কর না দেখি—অবশ্যই তাকলাগান হওয়া চাই, নইলে আদর্শের কথা শুনলে লোকে মারতে আসে জানই তো।

সমীরণ হেসে ফেলে চোখ পাকাল, বাণিজ্য করার মতলব বুঝি?

মাথা নাড়লাম, আদর্শের মতো আদর্শ লোকের চোখের সামনে তুলে ধরা ঠিক তেমনি বড় কাজ নয়?

সমীরণ মিটি মিটি হাসতে লাগল, আবার অন্যমনস্কের মতো ভাবতেও লাগল বোধহয়, যুতসই কিছু মনে পড়ে কিনা। মুডের মাথায় আছে, আমার একটু আশা হল।

হঠাৎ একসময় উঠল সে, সারি সারি কাচের আলমারির একেবারে কোণেরটার কাছে গিয়ে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে এক হাত প্রমাণ একটা মোটা খাম বার করে নিয়ে এলো। আমি নড়েচড়ে বসলাম, সমীরণ যখন এক-একটা জটিল প্রহসন বিস্তার করতে বসে, কেসএর কাগজপত্র সব হাতে নিয়ে তবে বসে।

নিজের আসনে ফিরে এসে সমীরণ বলল, একটা ঘটনা বলতে পারি, কিন্তু পড়ে তোমার পাঠকেরা একেবারে অবাস্তব বলবে—

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে অপেক্ষা করছি। খামের ভিতর থেকে মোটা এক গোছা কাগজ বার করে সমীরণ নিবিষ্ট মনে পড়তে লাগল। আর পড়তে পড়তে আমি যে বসেই আছি হাঁ করে, তাও ভুলে গেল বোধ হয়। একাগ্রে নিবিষ্টতায় আদ্যোপান্ত পড়ে গেল সে। আমি কেবল এধার থেকে আঁকা-বাঁকা হস্তাক্ষর দেখলাম গুচ্ছের। পড়া শেষ করে লম্বা একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সমীরণ কাগজগুলো খামে পুরে মন্তব্য করল, এতে একটা আদর্শের গল্প আছে। এই থেকে একটা পরিবার কত বড় এক দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচেছিল জান? সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু এটা ছেপে দিলেই দুর্লভ এক জীবনসাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।

এত বড় কথা শুনে আমি খামটার লোভে হাত বাড়ালাম। কিন্তু এই বেলায় সমীরণ দস্তুর পাকা পেশাদার লোক, কোনো নথি-পত্র নিজের চোখে দেখতে দেবে না। মুচকি হেসে ওটা আরো একটু নিজের কাছে সরিয়ে রেখে বলল, পড়ে লাভ নেই, শুধু এটা পড়লে আরো বেশি আজগুবী আর অবাস্তব মনে হবে।

এই যে বললে জীবন-সাহিত্য হতে পারে?

বিশ্বাস করলে হতে পারে, কিন্তু শুধু এটা পড়ে বিশ্বাস করা শক্ত।

অতএব এবারে শোনার প্রত্যাশা। শোনার পর তেমন অভিনবই যদি কিছু মনে হয়, ওই খাম হস্তগত করার ব্যাপারে সাহায্য করার মানুষ তার ঘরেই আছে। এই গোছের বিশ্বাসঘাতকতা আরো করা হয়েছে বলে এযাবৎ বার দুই চোখ পাকিয়ে স্ত্রীকে শাসন করতেও চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু তার ব্যারিস্টার অনুশাসন হাসির ফোয়ারায় মাঠে মারা গেছে।

সুতরাং অনুগত প্রতীক্ষাই শ্রেয় আপাতত।

কিন্তু যে কেস সমীরণ ফেঁদে বসল সেটা চমকপ্রদ লাগা দূরে থাক, বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরস লাগল আমারও। আর তারপর চমকের সূচনা দেখা গেল যখন, তখনো অবাস্তবের দিকটাই ভারি ঠেকতে লাগল। যাই হোক, ব্যারিস্টার সমীরণ দত্ত এক বৃদ্ধের জীবনের চিত্র যে-ভাবে এঁকে যাচ্ছে, তা সংক্ষিপ্তবদ্ধ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

—স্ত্রী মারা যেতে ষাট বছরের এক ভদ্রলোক যেন জীবনের সর্বস্ব হারিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের নাম ধরা যাক রামজীবন সোম (পেশার খাতিরে বন্ধু আসল নাম যে বলবে না জানা কথাই)। ভদ্রলোক কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন, সেই দাঁড়ানর পিছনেও তাঁর স্বর্গতা স্ত্রীব উদ্দীপনাই নাকি আসল মূলধন ছিল। ভদ্রলোকের চার ছেলে এক মেয়ে। তারাও লেখা-পড়া শিখে মানুষ হয়েছে। ছেলেরা তার পরেও গোলামীর দিকে ঝোঁকে নি, বাবাব ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছে, কারবার চারগুণ ফাঁপিয়ে তুলেছে।

স্ত্রী যখন মারা যায়, রামজীবনবাবুর মেয়ে তখন স্কুলের ওপরের ক্লাসে পড়ে। ওই মেয়েই ভদ্রলোকের একমাত্র চোখের মণি তখন। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বলেই নয়, মেয়েটা তার মায়ের মতো দেখতে বলেও। স্ত্রী বিয়োগের পর ছেলে ছেলের বউয়েরা সর্বদা ভদ্রলোকের পাশে পাশে থাকত, তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখত। মেয়েও বাপের সঙ্গে ছায়ার মতোই থাকত। কিন্তু এক মায়ের অভাব তারা সকলে মিলেও পূরণ করতে পারত না বোধ হয়।

একটানা দশটা বছর তারপর ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিতে বিভোর হয়ে কাটিয়েছেন। ধীর স্থির শান্ত সৌম্য। স্ত্রীর একটি মর্মর মূর্তি গড়িয়ে নিয়েছিলেন। সেটা তাঁর ঘরেই থাকত। ভালো না লাগলেই সেই মূর্তির সামনে চুপচাপ বসে থাকতেন। বাপের শ্রদ্ধার প্রভাবে মা-কে বরাবরই খুব বড় করে দেখত মেয়ে এবং ছেলেরা, মারা যাবার পর সেই মা দেবীর আসন নিল প্রায়।

সেই বুড়ো বাবা জীবনের সব থেকে বড় আঘাত পেলেন সত্তর বছর বয়সে—আর সেটা পেলেন তাঁর মেয়ের কারণেই। এম. এ. পাস করার আগেই ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়েটা যে সুখের হয়নি তা মাস কতকের মধ্যেই বোঝা গেল। বাপের কাছে থেকেই মেয়ে এম. এ. পাস করল, আর তারপর এক কলেজে অধ্যাপনার কাজে ঢুকল।

তারপর থেকে মেয়ের সঙ্গে তার স্বামীর বিচ্ছেদ ক্রমে পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আর একদিন সেটা আইনের দরজায় গিয়েও উপস্থিত হল। বিচ্ছেদ মেয়েই চেয়েছে। বৃদ্ধ বাবা বাধা দেবেন কি করে, মেয়ের দোষ সত্যিই নেই। ভাইয়েরাও বোনেরই স্বপক্ষে। তারা অনেক চেষ্টা করেছে, অনেকরকম ভাবে শান্তি ফেরাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু চূড়ান্ত অমানুষ ভগ্নীপতিকে বশে আনতে পারেনি। শেষে তারাও রায় দিয়েছে, এর থেকে বিচ্ছেদ ভালো।

কিন্তু বাপের যেন মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। কি যেন তিনি বলতে চান কিন্তু বলতে পারেন না। তাঁর অবস্থা দেখে মেয়ে পর্যন্ত বাপের উপর অভিমান করে।

বৃদ্ধ রামজীবনবাবু হঠাৎ অসুখে পড়ে গেলেন। ওদিকে কোর্টেও প্রথম দফার ফয়সালা হয়ে গেছে। মেয়ের স্বপক্ষে সাময়িক বিচ্ছেদের পরোয়ানা বেরিয়েছে— যাকে বলে জুডিসিয়াল সেপারেশন। নির্ধারিত মেয়াদ ফুরোলে, অর্থাৎ একটা বছর ঘুরলে ডিভোর্সের প্রশ্ন উঠবে।

রোগশয্যায় বৃদ্ধ খবরটা শুনলেন, কিন্তু ভালো-মন্দ একটা কথাও বললেন না। বাবার এই ব্যবহারটাই মেয়ের সব থেকে বেশি দুঃসহ। যা ঘটে গেছে তার জন্য দায়ী কেউ নয়—শুধু সেই একজন ছাড়া যে মেয়ের জীবনটা এভাবে তছনছ করে দিয়েছে। কিন্তু তা বলে বাবা কেন এত বড় অশান্তির আগুন বুকে চেপে বসে থাকবেন—বাবা কেন ডেকে দুটো কথাও বলেন না তার সঙ্গে?

দিন গড়িয়ে চলতে লাগল। সকলেই লক্ষ্য করল একটু ভালো থাকলেই বৃদ্ধ বসে বসে কি লেখেন। কিন্তু ভালো বিশেষ থাকতে পারলেন না। শরীর ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ অবাক সকলে একদিন। ছেলে-মেয়েদের ডেকে বৃদ্ধ আদেশ দিলেন, তারা যেন ঘটা করে তাদের মায়ের আবির্ভাব তিথি পালন করে এবারে। সেই তিথির এখনো মাস তিনেক বাকি।

এর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই রামজীবনবাবু মারা গেলেন। সকলের মনে হল একটা মস্ত পাহাড় সরে গেল। বাবার দেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার দিনই হাতে মুখ-বন্ধ বড় খাম পড়ল একটা। বাবার দরকারি জিনিসপত্র যেখানে থাকত, সেইখানে ছিল। সেই খামের ওপর বাবার নিজের হাতে মেয়ের নাম লেখা। আর খামের ওপর লেখা, মেয়ে যেন তার মায়ের আবির্ভাব তিথির দিনে এটা খুলে পড়ে—তার আগে নয়। খাম হাতে পেয়ে সেই শোকের মধ্যেও মেয়ের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।

সেইদিন এল। মায়ের আবির্ভাব তিথির দিন। ছেলেরা বাপের শেষ নির্দেশ পালনে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। সকাল থেকেই যেন মায়ের স্মৃতিতে বাড়ি ভরপুর। কিন্তু সকাল থেকে বিমনা শুধু মেয়ে। কি আছে ওই খামে? কি দেখবে সে?

কতবার খুলতে গিয়েও খুলতে পারল না সেই খাম, কেন কে জানে। শেষে দুপুরে দরজা বন্ধ করে বসল সে।

প্রথমটা চিঠির মতো করে বাবা তাকেই লিখেছেন। লিখেছেন, 'আমার খুকু, তোর জীবনে যা ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্যে তোকে আমি একটুও দোষ দিই না। তবু খালি একটা চিন্তা আমাকে পাগল করে তুলেছে, ঠিক এই রকম অবস্থায় পড়লে তোর মা কি করত। তুই কি করবি আমি জানি না, কিন্তু তোদের মায়ের কথা শোনার আজ দিন এসেছে......।'

এর পর একটানা নিজের জীবনের কথা লিখে গেছেন বৃদ্ধ।....সেই জীবন এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর চিত্রই বটে।

....বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান রামজীবন সোম। একমাত্র আদরের সন্তান যতদূর উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী হয়ে উঠতে পারে তিনি তা হয়েছিলের। বিধবা মায়ের হাতে কিছু টাকা ছিল। কিন্তু ছেলে সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গে তা উবে গেছে। যে সংসর্গে তিনি মিশতেন, পিচ্ছিল পথে চলার মাশুল তাঁরাই যোগাতেন। কতবার বিপদে পড়তে পড়তে বেঁচেছেন ঠিক নেই। এই বাঁচার মূলে তাঁর চেহারাটা কাজ করত। মানুষকে বশীভূত করার মতোই চেহারাটা সুন্দর ছিল তাঁর।

সেই পরিণত বয়সে একটি ভদ্রঘরের মেয়েকে তিনি ভুলোতে পেরেছিলেন প্রণয়ের অভিনয় করে। মেয়েটি অল্পবয়সের বিধবা। অনেক দিনের পরিচয় ছিল। সেই মেয়েকে তিনি বিয়ে করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আর শেষে-- বিপাকে পড়ে তাঁকে বিয়ে করে বাড়িতে এনে তুলতেও হয়েছিল। বিয়ে না করলে মেয়ের আত্মীয়পরিজন দুজনের একজনকেও বাঁচতে দিত না।

বলা বাহুল্য, সেই বৌ মায়ের চক্ষুশূল হল। নির্যাতন গঞ্জনার অন্ত ছিল না তার ওপর। কিন্তু সেটাই সব থেকে বড় শেল নয় সেই মেয়ের কাছে। রিক্ত জীবনের সর্বস্ব দিয়ে আবার স্বামী বলে যাঁকে গ্রহণ করলেন, তিনি মানুষ হলে দুঃখ থাকত না। অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর স্বরূপ দেখে তিনি হাহাকার করে উঠলেন।

কিন্তু ভালো সত্যিই বেসেছিলেন। এই ভালোবাসার মাশুলই দিনে দিনে দিতে লাগলেন। প্রতি ব্যাপারে স্বামীকে ফেরাবার চেষ্টায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে রামজীবন সোমই তাঁর ওপর অত্যাচারী হয়ে উঠলেন সব থেকে বেশি। কিন্তু তবু মেয়েমানুষের এমন গোঁ আর বুঝি তিনি দেখেননি। করা উচিত নয় বলে মনে হলে, অজস্র নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁকে দিয়ে সেই কাজ রামজীবন সোম কখনো করাতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, স্ত্রীর দাবি নিয়ে বাধা যেখানে দেবার তিনি দেবেনই।—তাঁকে মেরেই ফেলা হোক আর কেটেই ফেলা হোক।

কিন্তু রামজীবন সোম তাঁর রাস্তা বদলাননি। বরং বিপথের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন আরো বেশি। এই সময়ে আবার এক মেয়ের সংস্রবজনিত ব্যাপারে আপন সংসর্গের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন রামজীবন সোম। এমন কি ফাঁদ পেতে দীর্ঘকালের জন্য জেলে পাঠাবার ব্যবস্থাও পাকা করে এনেছিল সেই বিশ্বাসঘাতক।

সুযোগ সন্ধানে ছিলেন। সুযোগ পেলেন। রামজীবন সোম এক রাতে তাকে খুন

করলেন।

অবশ্য একেবারে খুন করবেন ভাবেননি। কিন্তু অন্ধ আঘাতে লোকটা খুন হয়েই গেল।

তারপর প্রায় তিরিশ ঘণ্টা বাড়িতে ছিলেন তিনি। ঘরে স্ত্রী যতবার শিউরে উঠেছেন, ততবার তাঁকেও প্রায় খুন করতে গেছেন তিনি। আর শিখিয়েছেন, ভালো যদি বাসো, কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে তিনদিনের মধ্যে কোথাও বেরুইনি আমি। অসুস্থ হয়ে ঘরেই পড়ে আছি।

কিন্তু প্রাণের দায়ে রামজীবন সোমকে ধরিয়ে দিল তাঁরই আর এক বিশ্বাসভাজন বন্ধু। ঘটনা-পরম্পরায় সন্দেহটা তারই ওপরে গিয়ে পড়েছিল।

তবু বিচারে হয়ত গোলেমালে ভণ্ডুল কিছু হতে পারত, রামজীবন সোমের স্ত্রী যদি বুদ্ধিমতীর মত স্বপক্ষের উকিলের পরামর্শ অনুযায়ী জেরার সম্মুখীন হতে পারতেন। শাশুড়ির অন্তত ধারণা ওই পাপের বউয়ের জন্যই তাঁর ছেলে রক্ষা পেল না।

সাক্ষ্য দিতে এসে রামজীবনের স্ত্রী শুধু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি মিথ্যে কথা বললেন না। সত্যি প্রশ্ন হলে শুধু মাথা নাড়লেন। তাছাড়া অনেক গুরুতর প্রশ্নের জবাবে নির্বাক মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু।

বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল রামজীবন সোমের। কিন্তু তিনি তখন তার স্ত্রীকে দেখছিলেন, আর যদি কখনো ফিরে আসেন, আবার একটা চরম প্রতিশোধ নেবার কথাই ভাবছিলেন!

সুদূর আন্দামানে চালান হয়ে গেলেন রামজীবন সোম।

এদিকে তাঁর মা আর একটা বছর মাত্র বেঁচে ছিলেন। সেই একটা বছর দু'বেলা বউকে বঁটি দিয়ে কেটেছেন আর শাপান্ত করেছেন। কিন্তু নির্বাক, প্রায়-বোবা বউ নিঃশব্দে তাঁর সেবা করে গেছেন। তাঁকে নিতে আসা সত্ত্বেও বাপের বাড়ি পর্যন্ত যাননি।

শাশুড়ির দেহান্ত হলে বউ একাই থেকেছেন সেখানে। এদিকে হাসপাতালে ধাত্রীর কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন।

আন্দামানে একটানা চার বছর ধরে একান্ত অনুগতভাবেই বিধিনিষেধ পালন করে গেছেন রামজীবন সোম। ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলের প্রতি তাই কিছুটা প্রসন্ন ছিলেন সেদিনের পরদেশী জেলশাসকরা।

দ্বীপে জনবসতি বাড়ানোর পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কয়েদী যদি কর্তাদের মন-মত শান্ত, বাধ্য এবং অনুগত ভাবে শাস্তি যাপন করে, তাহলে দ্বীপে পরিবার নিয়ে এসে বসবাস করার অনুমতি মেলে। লবণ-সমুদ্রের এধারে বসে কি করে যেন এই নিয়মের কথা রামজীবনের স্ত্রী শুনেছিলেন। কেউ জানে না, প্রথম এক বছরের মধ্যে মাত্র দুটো চিঠি তিনি স্বামীকে লিখেছিলেন, তাঁর একমাত্র অনুরোধ ভগবানের দিকে চেয়ে যেন তিনি সেখানকার সমস্ত নিয়ম মেনে চলেন।

সেই চিঠি পড়ে কুটি কুটি করে রামজীবন সোম সমুদ্রে ফেলেছেন। চিঠি যখন পেয়েছেন তখনই শুধু আক্রোশে নতুন করে আবার খুন চেপেছে তাঁর মাথায়।

চতুর্থ বছরে জেলেরই এক ভদ্রলোক তাঁকে জানালেন, খুব সম্ভব আগামী জাহাজে তাঁর স্ত্রী আসছেন এখানে স্বামীর সঙ্গে থাকতে। দেশ থেকেই নাকি অনুমতি যোগাড় করা হয়েছে, অবশ্য কর্তৃপক্ষের ভালো রিপোর্টের ওপরেই অনুমতি মিলেছে।

এ-রকম অনেকে আসে রামজীবনবাবু জানেন। কিন্তু তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কত কয়েদী আছে, কারটা কার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে ঠিক নেই। তাছাড়া যা ঘটে গেছে, তারপর তাঁর স্ত্রী আসবে—পাগল না হলে এসব কথা ভাবা যায় না।

জাহাজ যেদিন এসে লাগল, অনেকের সঙ্গে রামজীবন সোমও রস্ জেটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। জাহাজ এলে দ্বীপসুদ্ধু লোক ভেঙে পড়ে।

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অলস চোখে দেখছিলেন রামজীবন সোম।

কিন্তু একসময় হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল তাঁর সমস্ত দেহে। বুকের ভিতরটা আচমকা ধক-ধক করে উঠল।

এ কি দেখছেন ? এ কাকে দেখছেন তিনি ? ও কে ? তিনি কি জেগে আছেন ? স্বপ্ন দেখছেন ?

অসহায় দুই চোখ মেলে চারদিক খুঁজতে খুঁজতে ওই কে এগিয়ে আসছে ?

স্থাণুর মতো নিস্পন্দ কাঠ রামজীবন সোম।

দেখা হল।

স্ত্রী দু-চোখ মেলে অনেকক্ষণ শুধু চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। শুধু নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করলেন।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, এখন কোথায় নিয়ে যাবে, চল। শাস্তি যদি দিতে চাও সময় বুঝে দিও ।......শুনেছি এখানকার সমুদ্রের জলে হাঙর কুমীর কিল-বিল করে, রাত্রিতে যেদিন খুশি ডেকে এনে ফেলে দিও।....... আমি আপত্তি করব না...... কেউ জানবে না।

থর থর করে কাঁপছিলেন রামজীবন সোম। সিঁথির ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুর, এই মুখ, এই চোখ—সব যেন তাঁর সমস্ত পাপের মূল ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে বসেই পড়লেন রামজীবন সোম, তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

আপন স্নিগ্ধ মহিমায় তাঁর স্ত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন শুধু। জীবনের সব সংশয় তাঁর শেষ হয়েছে। মুক্তির আলো যখন স্পর্শ করে তখন এমনি করেই করে বোধ হয়। সেই মুক্তির পট বিধাতা নিজের হাতেই তৈরি করে রাখেন। পরের ছ'মাসে আরো কিছু ঘটল। নিজের হাতে একটা জীবন নিয়েছিলেন রামজীবন সোম। আবার এখানে নিজের জীবন বিপন্ন করে আর একটি জীবন রক্ষার উপলক্ষ হলেন তিনি। সেই মূল্যবান জীবন এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর। নিজের সেই কৃতিত্বের কথা রামজীবন সোম লেখেননি। শুধু লিখেছেন, কে যে তাঁকে দুর্ঘটনার ইঙ্গিত দিয়েছিল আর কোন চেতনা তাঁকে সামনে ঠেলে দিয়েছিল, তিনি জানেন না।

পরের ছ' মাসে সাগরপারের কোনো রাজ-উৎসব উপলক্ষে এই দ্বীপের গুটিকতক কয়েদী রাজানুগ্রহে মুক্তি পেয়েছিল। রামজীবন সোম তাদের একজন। এত অল্প সময়ের

মধ্যে দ্বীপান্তর থেকে ফিরে আসার নজির বিরল।

শেষটা রামজীবন সোম আবারও মেয়েকে সম্বোধন করে সেই একই কথা লিখেছেন, 'খুকু, এখন আমি তোকে কি পরামর্শ দেব বল, আমার যে কেবলই সেই এক কথাই মনে হচ্ছে, তোর মা হলে কি করত?

সবটা পড়ার পর মেয়ে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। সেই স্তব্ধতা দেখে বাড়ির সকলে বিচলিত হয়েছিল। রাত যখন বেশি, সকলে যখন ঘুমিয়ে—নিঃশব্দে মেয়ে উঠেছিল তখন। বাবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল। মায়ের মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বলছিল। তাঁর গলায় মালা দুলছিল।

মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, আর দেখছিল।

রাত ভোর হয়েছে। মেয়ে দাঁড়িয়েছিল আর দেখছিল।

কাহিনীর এখানেই যেন ছেদ টেনে দিল সমীরণ। আমি উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু হঠাৎ অবাক আমি। মনে হল সমীরণের হাসি-হাসি মুখ বটে, কিন্তু চোখের কোণে যেন জল চিক চিক করছে।

তবু থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে কি হল? মেয়েটি কি করল—ডিভোর্স হল, না মিটে গেল?

আমার আগ্রহ দেখে সমীরণ মিটিমিটি হাসতে লাগল। কিন্তু কিছু বলবার আগেই পিছনে গাড়ির শব্দে ছেদ পড়ল। তার স্ত্রী ফিরল। হাসি-মুখে কাছে এসে মহিলা বলল, কেমন, দেরি হল কিনা দেখো, তখনি বলেছিলাম এখন গিয়ে কাজ নেই। আমার দিকে ফিরে বলল, কতক্ষণ এসেছেন, খুব গল্প জমিয়ে বসেছেন বুঝি?

সমীরণ জবাব দিল, হ্যাঁ, একটা অবাস্তব আদর্শের কেস বললাম ওকে—সেই গল্পটা। এখন ও জিজ্ঞাসা করছে, মায়ের সেই আবির্ভাব তিথিতে মেয়েটি সমস্ত রাত মায়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার পর কি হল—ডিভোর্স হল, না মিটে গেল?

কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে এ আমি কি দেখলাম? কোনো রমণীমুখের এমন চকিত বিড়ম্বিত মাধুর্য আর কি কখনো দেখেছি? চোখের পলকে কোনো রমণীর মুখে রক্ত-কণিকার এমন ছোটাছুটি আর কি কখনো দেখেছি? ভিতর থেকে কে যেন ওই মুখে সিঁদুর গুলে দিয়েছে। অব্যক্ত রাগ-রক্ত মুহূর্ত দু-চারটে। মুখ তুলে চকিতে একবার সামনের অয়েলপেন্টিং দুটোর দিকে তাকিয়ে দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল মহিলা।

আমার হতবুদ্ধি দৃষ্টিটা সমীরণের মুখের ওপর ধাওয়া করল। সে তেমনি হাসছে মিটিমিটি।

বিমূঢ় দু চোখ তুলে এবারে আমি তাকালাম সামনের দেওয়াল জোড়া অয়েলপেন্টিং দুটোর দিকে।

সকলে আমাকে বিদেশিনী বলে ধরেই নেয়।

কিন্তু আমি এই দেশের মেয়ে। আমি নিজে অন্তত তাই মনে করি। নিজেকে আমি ভারতীয় ভাবি। আমার পিতামহ জন হীল্ এ-কথা শুনলে হয়ত ভূত হয়ে তার নাতনির কাঁধে চেপে বসবে! সে বেচারার দোষ নেই। তার রক্তে কোনো মিশেল ছিল না। সংস্থানের ধান্দায় আর কিছুটা বা অ্যাডভেঞ্চারের টানে অল্প বয়সে সে নীল সমুদ্রের ও-পার থেকেই ভেসে এসেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার নীল চোখে সেই নীলের আমেজ লেগে ছিল। আর শেষ দিন পর্যন্তই বোধ হয় হোম-এর স্বপ্ন দেখে গেছল।

আমি তার ছেলে হলে, আর আমার তখন যথেষ্ট পয়সা থাকলে, তার নশ্বর দেহটা হয়ত তার হোম-এ নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করতাম। পিতামহ বলত, আমার ঠাকুরমার জন্যেই তার আর হোম-এ ফেরা হল না। ঠাকুমা শুনে কিন্তু ফুঁসে উঠত না, বা একটুও রাগ করত না। বরং হাসত। হেসে স্বীকার করে নিত। আবেগ বেশি হলে পিতামহ বলত, আর ভালো লাগে না, এবারে সত্যিই চল, দিন কয়েক ঘুরে আসা যাক।

ঠাকুমা যদি মজা দেখার জন্যেও কোনোদিন সায় দিত, যদি বলত এত ইচ্ছে যখন, চল ঘুরেই আসি একবার—হয়ত বিপর্যয়ই ঘটে যেত একটা। পুরুষের আত্মাভিমান তখন এই ছলনার আশ্রয়টুকুও পেত না। রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তার সেই আবেগ ক্ষত-বিক্ষত হত। আসলে কখনো তাদের দূরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি পয়সার অভাবে। দুজনেই সেটা খুব ভালো করে জানত। পিতামহর ভাগ্যান্বেষণের চরিত্রে সব থেকে বড় খুঁত তার আবেগ আর আত্মাভিমান। এ-দুটোকে বাতিল করতে পারলে হয়ত পয়সার মুখ দেখতে পেত। মানুষটা অসৎ ছিল না বা অলস ছিল না। খানিকটা শিল্পীগোছের মন ছিল হয়ত। গোড়ার জীবনে সেই সময়ের আধুনিক ডেকোরেশনের কাজ করত। লোকের ঘরবাড়ি সাজাত, নতুন স্টাইলে দোকানঘর সাজাত। রুচি আর প্রয়োজনের সমন্বয় ঘটানো পেশা।

চটকের উঠতি হাওয়ায় এই পেশা মন্দ অর্থকরী ছিল না শুনেছি। তা ছাড়া এই ঘর সাজাতে গিয়েই ঠাকুমাকে ঘরে এনেছিল আমার পিতামহ। ঠাকুমা সিন্ধী বাপের মেয়ে। সিন্ধীরা সাধারণত পয়সাঅলা লোক। আর তাদের মেয়ে-পুরুষ দুই-ই বেশ শিক্ষিত। ঠাকুমার প্রবাসী বাপেরও পয়সা ছিল। আর তার এই মেয়েরও শিক্ষা-দীক্ষা আর রুচিবোধ ছিল।

ঘর সাজাতে গিয়ে পিতামহ ওই মেয়েকে নিজের ঘরে এনে তুলল কি করে—সেই

প্রেমের পর্ব আজও আমার অজ্ঞাত। ঠাকুমা শেষ পর্যন্ত সে-রহস্য কৃপণের ধনের মতো আগলে রেখেই চোখ বুজেছে। মনে হয় এ ব্যাপারে পিতামহ তার শাশুড়ীর কাছ থেকে কিছু সাহায্য এবং প্রশ্রয় পেয়েছিল। সেই মহিলাও খাঁটি ইংরেজ-দুহিতা। তারও হোম ছিল। ঠাকুমার বাপ তাকে সেই হোম থেকে এই সুদূরে ভাসিয়ে এনেছে। অতএব ওই মহিলার দিক থেকে খানিকটা প্রশ্রয় এবং সাহায্য মেলা স্বাভাবিক।

যাই হোক, ঠাকুমাকে ঘরে আনার পর নিজের পেশা নিয়ে আমার পিতামহটি বিলক্ষণ সমস্যায় পড়ে গেছল। কেবলই মনে হত তার নতুন সংসারে এ-পেশা খাপ খায় না। তার তুলনায় ঠাকুমা বেশি শিক্ষিতা, সমস্যাটা সেই কারণজাত কিনা জানি না। ঠাকুমার মতো মেয়েকে ঘরে আনার ফলে রোজগারের তাগিদা বেড়েছিল বলেও হতে পারে।

ঘর সাজানোর পেশা ছেড়ে ভদ্রলোক একটা নামী লোহা-লক্কড়ের কারখানার তদারকি কাজে ঢুকেছিল। দেশে সাদা চামড়ার কদর ছিল তখনো, কাজ পেতে অসুবিধে হয়নি। মাইনেও তখন কালো চামড়ার থেকে উঁচুতে। কিন্তু তার বিবেচনায় সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা খাটুনির সেই গদ্যাকারের পেশা তার সংসার-চিত্রের পাশে আরো বেশি ছন্দপতনের মতো ঠেকেছে। নতুন নতুন চাকরি ধরে সংসারের আয়নার সামনে রেখে বিচার-বিশ্লেষণ করে করে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। বেচারা চোখ বোজার আগে পর্যন্ত বোধ হয় বুঝে যেতে পারেনি ঠিক কোন পেশাটি তার সংসারে খাপ খেত।

বেগতিক দেখে ঠাকুমা বিয়ের দু'বছরের মধ্যে একটা মিশনারি স্কুলে চাকরি নিয়ে টানা তিরিশটা বছর মেয়ে ঠেঙিয়ে কাটিয়ে গেছে। সে-পেশা তার সংসারে খাপ খেল কিনা এ-চিন্তা করার অবকাশ মেলেনি।

তবু, ঠাকুমা হোম-এ যাবার নামে কোনোদিনও তার স্বামীটিকে জব্দ করতে চেষ্টা করেনি। বরং অভিযোগটা স্বীকার করে নিয়েই মিনমিন করে বলত, কি করে যাই বল, ছেলেপুলেগুলোর অসুবিধে হবে, এসময়ে অতদিনের জন্য স্কুল থেকেই বা ছাড়া পাই কি করে.....তার থেকে আমি থাকি, তুমি বরং একবারটি ঘুরে এসো।

ছেলেদের বিয়ে হয়ে গেলে বাপ-মাকে ছেড়ে বউ নিয়ে অন্যত্র বসবাস করাটা হোম-এর রীতি। ছেলে আর ছেলের বউ নিয়ে একই সংসারে লেপটে থাকাটা পিতামহের একটুও মনঃপূত ছিল না। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাই থাকতে হয়েছিল। তখনো কেউ তাকে কখনো অনটনের খোঁটা দিয়েছিল বলে শুনিনি। তবু আমার বাবা রবার্ট হীল্ যখন বেশ পদস্থ মানুষ তখন ওই আগের যুগের পুরুষ আর মহিলাটিকে আপনা থেকেই এই সংসার-মঞ্চের একেবারে পিছনের সারিতে চলে যেতে দেখেছি। এমন কি এক-একসময় এমনও মনে হয়েছে ওদের অস্তিত্ব নিয়েই যেন বিব্রত ওরা।

বাবা রবার্ট হীলও এই দেশটা নিজের দেশ বলে ভাবতে পারেনি, অন্তত পুরোপুরি ভারতীয় ভাবতে পারেনি নিজেকে। সে-রকম প্রয়োজন হলে অবশ্য নিজেকে ভারতীয়

বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করত না। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তার আচরণ এবং চালচলন যথাসম্ভব হোম-ঘেঁষাই ছিল।

আমার বাবা বিয়ে করেছিল এ-দেশের মানুষ যাদের ফিরিঙ্গী বলে, সেই গোত্রের এক মেয়েকে। মা-টি আমার বেশ রাশভারি মেয়ে। ঠাকুমার একেবারে বিপরীত স্বভাবের বলা যেতে পারে। মস্ত হাসপাতালের নার্স। কাজেকর্মে চটপটে ছটফটে। হাসপাতালে তার কাজের সুনাম ছিল খুব। বড় বড় অনেক নামী ডাক্তারকে অ্যাসিস্ট করত। সময়কালে মেট্রনও হয়েছিল। বিয়ের পরেও চাকরি করতে হবে ভাবেনি। এ-দিক দিয়ে তার ভাবনাটা ঠিক হোম-ঘেঁষা বলা চলে না। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন বাদে নিজে থেকেই আবার চাকরিতে যোগ দিয়েছে শুনেছি। এ-ব্যাপারে বাবার কোনোরকম সক্রিয় মতামত ছিল কিনা জানি না। তবে এটুকু কানে এসেছিল যে তারপর থেকেই নাকি মায়ের চাকরি-প্রীতি আর চাকরির প্রতি নিষ্ঠা অনেক বেড়ে গেছল।

বাবা রবার্ট হীল্ এক খাস-বিলিতি জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করত। আমার যখন চোদ্দ-পনের বছর বয়েস তখন বাবা আর মা দুজনকেই যার-যার ক্ষেত্রে বেশ পদস্থ মনে হত আমার। সেটা মিথ্যেও নয়। বাবা তখন কোম্পানির হোমরাচোমরা কয়েকজনের একজন, আর মা তারও বছর কয়েক আগে থেকেই মেট্রন।

সংসারের সঙ্গে চাকরির অথবা চাকরির সঙ্গে সংসারের খাপ-খাওয়ানোর ব্যাপারে পিতামহ জন হীল্ কতটা বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিল সে-সম্বন্ধে আমার কোন রকম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয়। তার সবটুকুই ঠাকুমার মুখে শোনা গল্প। আর সে-গল্পও ঠাকুমা কখনো কড়া মেজাজে অথবা কোনোরকম খেদ নিয়ে শোনাত না। বরং বেশ রসিয়েই বলত।

কিন্তু সংসার আর ব্যক্তিজীবনের দিক থেকে বাবার চাকরির সঙ্গে মায়ের চাকরি খাপ খাচ্ছে না—এরকম একটা অনুভূতি আমার মনে আপনা থেকেই জেগেছে। আর বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সেটা পাকাপোক্ত হয়েছে।

একটা চিন্তা প্রায়ই আমার মনে আসত, হাসপাতালের নার্স বা মেট্রনরা সকলেই কি তাদের সাংসারিক জীবনে অসুখী? তাদের পেশা কি সুস্থ পারিবারিক জীবনের বিঘ্ন? চিন্তা করতাম বটে কিন্তু মন থেকে সায় মিলত না।

না, মায়ের সঙ্গে বাবার কোনোদিন কোনো বড় রকমের ঝগড়া বিবাদ বা কলহ হতে দেখিনি। ধাক্কা খাবার মত কোনো অঘটনও চোখে পড়েনি আমার। বরং দুজনের প্রতি দুজনার এক-ধরনের সৌজন্যবোধ সজাগ দেখেছি সর্বদা। তবু আমার মনে হত মা আর বাবা যেন আলাদা দুখানা জাহাজ। বাইরের পর্যটন শেষ করে একই বন্দরে ফিরে আসে, নোঙর ফেলে, তারপর আবার বিপরীত স্রোতে ভেসে চলে।

...বছর তিনেক আগের এক রাতের কথা মনে পড়ে। তখন আমার বয়েস বারো। সকালেই শুনেছি বাবা-মায়ের বিয়ের বার্ষিকী দিন সেটা। অতএব সেই সন্ধ্যায় খুব ঘরোয়াভাবে একটু বাড়তি খাওয়া-দাওয়া আর একটু বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা। সকালে কারখানায় বেরুবার আগে বাবা বলে গেছে বিকেলের মধ্যেই ফিরবে। হাসপাতালের

কাজ সেরে মা আগেই ফিরে এসেছে।

সন্ধ্যার আগে থেকেই বাবার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা। বাবা ফিরল যখন রাত প্রায় দশটা। তার আগে মা-কে আমি অনেকবার বলেছি একটা ফোন করে খবর নিতে। মা শেষে আমাকেই বকেছে, নিশ্চয় কোনো দরকারে আটকে গেছে, ফোন করে তাকে বিরক্ত করব কেন? আমার কেন যেন খুব খারাপ লাগছিল। মা এমনিতেই গম্ভীর, রাত যত বাড়ছিল তার মুখ যেন ততো ঠাণ্ডা। বাবার ওপরেই রাগ হচ্ছিল আমার, সে নিজেও তো টেলিফোন করে একটা খবর দিতে পারত!

রাত দশটা নাগাদ ব্যস্ত-সমস্ত মুখে বাবা ঘরে ঢুকল, পরিতাপের সুরে বলে উঠল, এর নাম চাকরি, ঠিক আজই কারখানায় গণ্ডগোল, এতক্ষণ পর্যন্ত এই নিয়ে ডিরেক্টর আর ম্যানেজারের সঙ্গে জরুরী মিটিং—কি-যে খারাপ লাগছে এখন।

মায়ের ঠাণ্ডা মুখে এতক্ষণ বাদে হাসি দেখলাম আমি। জবাব দিল, চাকরি চাকরিই, তার ওপর তো হাত নেই, কি আর করবে....কোনো জরুরী ব্যাপারে আটকে গেছ আমি বুঝেছিলাম, তোমার মেয়েই অস্থির হয়ে উঠেছিল।

বাবা হাসিমুখে আমাকে আদর করতে এল। গালে আর কপালে চুমু খেল। তখুনি একটা পরিচিত গন্ধ আমার নাকে এল। আমি বলে ফেললাম, তোমাদের মিটিং-এ বুঝি ড্রিঙ্ক দেয় ড্যাডি?

সঙ্গে সঙ্গে বাবার মুখ ফ্যাকাশে আর মায়ের মুখ থমথমে। বাবা হাসতে চেষ্টা করে জবাব দিল, না, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তো, সেই জন্যে....

বাবা তাড়াতাড়ি ভেতরের ঘরে চলে গেল, বিড়বিড় করে বলতে বলতে গেল, বড্ড গরম পড়েছে, জামা-কাপড় বদলে একেবারে চানটা সেরে আসি।

পরক্ষণে মায়ের সে-মূর্তি দেখে একেবারে হতভম্ব আমি। সমস্ত মুখে যেন আগুন লেগেছে আর চোখ দিয়েও যেন নীল আগুন ঠিকরোচ্ছে। উঠে এসে আমার ডানা ধরে এক ঝটকায় সোফা থেকে তুলে ফেলল আমাকে। গোটা দুই তিন ঝাঁকুনি দিয়ে হিসহিস শব্দে বলে উঠল, কেন ড্যাডিকে ও কথা বললে—কেন—কেন?

নিজের অপরাধ সম্পর্কে একটুও সচেতন নই, জবাব দেব কি। আবার দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে তেমনি ফিসফিস হিসহিস গলায় মা বলে উঠল, আর কক্ষনো বলবে? কক্ষনো বলবে?

কি বলেছি আর কি বলব না ততক্ষণে তাই আমার গুলিয়ে গেছে। মায়ের সেই মূর্তি দেখেই তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লাম, আর বলব না।

আমাকে ছেড়ে দিয়ে মা হন হন করে ভিতরের ঘরে চলে গেল।

এ-ঘটনার দিনে পনের পরের কথা। পরের দিনটা ছুটির দিন। আগের সন্ধ্যায় কারখানা থেকে ফিরে মাকে বাবা বলল, কাল চারজন বন্ধু এখানে লাঞ্চ খাবে, তোমার ডিউটির খবর কি.....থাকতে পারবে?

বাবার মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে মা উঠে গেল। তার পর দেরাজ খুলে হাতব্যাগের ভেতর থেকে কালো ডায়েরিটা বার করে পাতা ওলটাতে লাগল। তারপর

মাথা নাড়ল।—উহুঁ....এমারজেন্সি ডিউটি, মেজর ঘোষের মেজর অপারেশন আছে।

ডায়েরি হাতব্যাগে পুরে সেটা আবার দেরাজে চালান করে মা চিন্তিত মুখে ফিরে এল।—কালই বলে বসলে....ব্যবস্থাপত্র সব ঠিক করে রাখা যাবে অবশ্য, ন'টার আগে তো বেরুচ্ছি না, তারপর অপারেশন যদি তাড়াতাড়ি হয়ে যায় একটা ট্যাক্সি ধরেই না-হয় চট করে চলে আসব।

বাবা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নাথা নাড়ল।—সেই ভালো।

পরদিন। বাবার সামনে খানসামাকে ডেকে মা কি হবে না-হবে মেনু ঠিক করল। তারপর খানসামাকে হুকুম করল, ঘড়ির কাঁটা ধরে সব যেন হোটেল থেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের ফ্ল্যাটের কাছেই নামজাদা হোটেল আছে একটা। একটু ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার থাকলে সেদিন আর বাড়িতে রান্না হয় না—সব ওই হোটেল থেকে আসে।

খাবার ব্যবস্থা করার পর মা নিজের হাতে ঘর-সাজানোর কাজে মন দিল। জানলা-দরজার পরদা বদলানো হল, ডাইনিং-টেবিলে লন্ড্রির পাটভাঙা চাদর পড়ল। ইত্যবসরে বেয়ারা মার্কেট থেকে ফুল নিয়ে আসতে শৌখিন ভাসে সেগুলো যথাস্থানে সাজানো হল।

সব দেখে-শুনে বাবা খুশিমুখে বলল, চমৎকার হয়েছে।

শুনে মা-ও নিশ্চিন্ত যেন। হাসিমুখে চান করতে চলে গেল।

মা হাসপাতালে বেরুবার আগে চান করে, আবার ডিউটি থেকে এসেও একবার চান করে। আর দু'বারই মায়ের চান করতে সময় লাগে বেশ।

একটু বাদে এমনি একবার ঘরে ঢুকে দেখি বাবা মায়ের দেরাজের ড্রয়ারটা টানাটানি করে খুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। বোধ হয় চাবি লাগানো আছে। পেছনে আমার সাড়া পেয়ে বাবা এত চমকে উঠল যে আমি অবাক। জিজ্ঞেস করলাম, কি খুঁজছ ড্যাডি ?

ভয়ানক ব্যস্তমুখে গলা খাটো করে বাবা বলল, ইয়ে—থার্মোমিটারটা। কোথায় যে রাখে, দেখ তো একটু....

মা মেট্রন, থার্মোমিটার ছেড়ে অনেক দরকারি ওষুধও ঘরে মজুত থাকে দেয়ালের ছোট গা-আলমারিতে। নিজে খোঁজার ধকল এড়াবার জন্যেই ঘরের ভেতর দিয়ে আমি সোজা বাথরুমের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে মায়ের উদ্দেশে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, থার্মোমিটার কোথায় ?

মনে হল, মা যেন ভেতর থেকে একেবারে শুনতে পেল না। কিন্তু আবার হাঁক দেবার উপক্রম করার আগেই ও-ধার থেকে মায়ের গলা শোনা গেল, কার দরকার ?

—বাবার। দেরাজের...

বলতে যাচ্ছিলাম, দেরাজের ড্রয়ার টানাটানি করে বাবা সেটা খুলতে পারছে না। কিন্তু তার আগেই শক্ত হাতে পেছন থেকে বাবা আমার মুখ চেপে ধরল। হতভম্বের মতো আমি পেছন দিকে ঘাড় উঁচিয়ে বাবার এক অদ্ভুত মূর্তি দেখলাম। তার চোখ-

মুখ দিয়ে রাগ আর ত্রাস যেন একসঙ্গে ঠিকরে বেরুচ্ছে। আমার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকাল। অর্থাৎ আমাকে মুখ বুজে থাকতে ইশারা করল।

একটু বাদে ওদিক থেকে মা বলল, থার্মোমিটার ওষুধের আলমারিতে।

বাবা আমার একটা বাহু ধরে হিড়হিড় করে একেবারে এ-ধারে টেনে নিয়ে এল। কেন জানি না, আমার তক্ষুনি মনে হল, সেই এক রাতে মা যেমন আমাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়েছিল, বাবাও বুঝি তাই করবে।

কিন্তু বাবা তা করল না। হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, কেন তুই মা-কে বিরক্ত করতে গেলি?....বোকা মেয়ে, আমার জ্বর আসছে শুনলে তোর মা এক্ষুনি টেলিফোন করে অতিথিদের সব আসতে বারণ করে দেবে না!...মা কিছু জিজ্ঞাসা করলে কি-চ্ছু বলবি না, বুঝলি?

মা যখন চান করে বেরুল বাবা তখন ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। মা দূরে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখল একটু। আমাকেও। তারপর বাবার কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, থার্মোমিটার কেন, জ্বর-টর আসছে নাকি?

খবরের কাগজে চোখ রেখেই বাবা জবাব দিল, না...গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে, আর গলাটাও খুসখুস করছিল....

—থার্মোমিটার লাগিয়েছ?

—না....থাকগে, জ্বর নেই বোধ হয়।

কিন্তু একবার জ্বরের কথা উচ্চারণ করে অত বড় হাসপাতালের মেট্রন মায়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। আরো এগিয়ে এসে মা বাবার ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর বসল। ভিজে হাত বলেই হয়ত ঝুঁকে নিজের একটা গাল বাবার কপালে ঠেকালে। উঠে পড়ল।—না জ্বর নয়, গলায় ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়। ফ্রিজের জল-টল খেও না যেন।

বেলা একটা পর্যন্ত আমি আশা করছিলাম এই বুঝি মা এল। আর, আমার ধারণা অতিথিদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাবাও তাই আশা করছিল। অনেকবার তাকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখেছি। ঠিক একটা বেজে দশ মিনিটে টেলিফোন বেজে উঠল। বাবা তার একটু আগে খানসামাকে টেবিলে খাবার সাজাতে বলেছে। টেলিফোন বাবাই ধরল। আর তার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আমি বুঝে নিলাম ও-দিক থেকে মা কথা বলছে।

বাবা ঈষৎ ব্যস্ত হয়ে মিষ্টি করে বলছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে,....আমি আগেই বুঝেছি, কি করবে, তোমার তো আর হাত নেই....তাছাড়া একটা লোকের মরা-বাঁচা সমস্যা, তুমি কি-চ্ছু ব্যস্ত হয়ো না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব....অ্যাঁ? হ্যাঁ, বন্ধুদের বলব বইকি, তারা কি-চ্ছু মনে করবে না।

এবারে, আমি হিলডা হীল্, বয়েস একত্রিশ—এবারে আমার কথা।

আমার বাবা-মা দুজনেই চতুর মানুষ। কিন্তু আমার সম্পর্কে একটা বড় ভুল তারা

করে গেছে। দুজনের একজনও তারা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে তেমন সজাগ ছিল না। আমি বাড়ির একটা মাত্র মেয়ে তাদের চোখের সামনে বড় হয়ে উঠছি, আমার মাথায় যে অনেক বিস্ময়, অনেক কৌতূহল, অনেক কল্পনা আর অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠতে পারে এ-সম্ভাবনার কথা তাদের মনে আসেনি।

আজ আমি হিলডা হীল্ এই একত্রিশ বছর বয়সে যে মানসিকতার মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে কম করে দু'জোড়া পুরুষ আর রমণীর প্রভাব যে আছে, তাতে কোনো ভুল নেই। তবে এ-কথাও ঠিক, এ-প্রভাব সম্পর্কে আমি নিজেও খুব সচেতন ছিলাম না।

সেই দু'জোড়া পুরুষ এবং রমণীর একজোড়া আমার পিতামহ জন হীল্ আর তার স্ত্রী, দ্বিতীয় জোড়া রবার্ট হীল্ আর তার স্ত্রী—আমার বাবা আর মা। বাবারা তিন ভাই ছিল। বাবাই বড়। তার মেজ ভাই আমার জ্ঞান-বয়সের আগেই মারা গেছে, আর ছোট ভাই বড় হবার আশায় ষোল-সতের বছর বয়সে বম্বে চলে গেছল শুনেছিলাম। এখন সে কোথায় আছে বা কত বড় হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সে-খবর কেউ রাখে না। তাই আমার মানসিকতায় তাদের প্রভাবের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

পিতামহর কোনো পেশাই তার পারিবারিক জীবনে খাপ খায়নি, সেটা আমি ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। আর খাপ না খাওয়ার প্রত্যক্ষ রূপটা আমি দেখেছি বাবা আর মায়ের জীবনে। মা-বাবার পেশা নিয়ে আমার মনে তেমন কিছু জটিল চিন্তা আসেনি। শুধু মনে হয়েছে মায়ের পেশাটাই পারিবারিক জীবনে খাপ খেল না। কেন খেল না, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করেছি, অনেক মাথা ঘামিয়েছি। নার্স অথবা মেট্রনের কাজ কোনোদিন আমি অসম্মান বা অগৌরবের ভাবি না। অন্য নার্স অথবা অন্য মেট্রনদের পারিবারিক জীবন কেমন তাও জানি না। মোট কথা, পেশার সঙ্গে পারিবারিক জীবনে সামঞ্জস্য ঘটানোর সমস্যাটা গোচরে হোক অগোচরে হোক, আমার মনের তলায় গেঁথেই গেছল। দু'জোড়া পুরুষ আর রমণীর এই প্রভাবটুকুই সম্ভবত আমার গোচর বা অগোচর মনে সব থেকে বেশি কাজ করেছিল।

গোড়াতেই যে-কথা বলছিলাম, চামড়া দেখে অন্য লোক বিদেশিনী মনে করলেও নিজেকে আমার এ-দেশের মেয়ে অর্থাৎ ভারতীয় ভাবতে একটুও অসুবিধে হত না। তার সব সঠিক কারণ হয়ত আমি বিস্তার করতে পারব না। হয়ত অনেক-রকমের অনেক কারণের সমষ্টিগত ফল এটা।

আমাদের দোতলার ফ্ল্যাটে একটি বাঙালি পরিবার থাকত। ভদ্রলোক বিলেত-ফেরত, বড় চাকরি করে, নিজের গাড়ি আছে। তার স্ত্রী-টি সকালে আয়া-বেয়ারাগুলোকে ধমকায়, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে লম্বা ঘুম দেয়, বিকেলে সেজেগুজে স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে থাকে (স্বামীর গাড়ির প্রতীক্ষায়ও হতে পারে), স্বামী এলে দুজনে বেড়াতে বেরোয়, নয়তো সিনেমায় যায়, নয়তো শপিং-এ। ওদের পারিবারিক জীবনে কোথাও কোনো গলদ আছে আমার মনে হত না।

ঠিক আমার বয়সী মেয়ে আছে ওদের একটা। একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়ি।

ওরই সঙ্গে আমার সব থেকে বেশি খাতির। সকালে ওদের গাড়িতে স্কুলে যাই, ফেরার সময়ে গাড়ি আসে না বলে একসঙ্গে স্কুল-বাসে ফিরি। বিকেলে আর ছুটির দিনে রুমার সঙ্গে খেলা করি। দিনের অনেকটা সময় আমার ওদের ফ্ল্যাটে কাটে।

রুমার একজন বাঙালি প্রাইভেট টিউটর ছিল। ভারী ভালো লোক। রুমাকে অনেক মজার মজার গল্প বলত। আমি বুঝতাম না, মাস্টারমশাই অনেক সময় ইংরেজি করে আমাকে বুঝিয়ে দিত। কি ভালো যে লাগত তখন। তার আসার সময় হলেই আমার ভেতরটা নীচে যাবার জন্যে উসখুস করত। কিন্তু রুমার মা ঘরে থাকলে যেতে পারতাম না। অন্য কোনো সময় নয়, শুধু রুমার পড়ার সময় গেলে ওর মা অসন্তুষ্ট হত। সপ্তাহে চারদিন মাস্টারমশাই আসে, ওই চারদিনই আমি তক্কে তক্কে থাকতুম রুমার মা বেড়ানো শেষ করে ফিরে এসেছে কিনা। ফিরতে কোনদিন দেরি হবে জানা থাকলে রুমাই আমাকে-সে-খবরটা চুপিচুপি দিয়ে রাখত। সেদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে।

তখন আমার বয়েস সবে নয়। গল্প করতে করতে সেই মাস্টারমশাই হঠাৎ একদিন আমাকে বলল, তোমরা তো এদেশেরই মেয়ে, বাংলা শেখ না কেন....পরে তাতে অনেক সুবিধে হতে পারে—তাছাড়া এই দেশেও কত বড় কবি আর কত বড় বড় গল্প-লেখক আছে জানতে পারবে।

তার ওই কথা একটা ন'বছরের মেয়ের বুকের তলায় কী-ভাবে নাড়াচাড়া দিয়েছিল সে বোধ হয় কেউ ভাবতেও পারবে না। সেই রাতেই আমি মা-বাবার কাছে বায়না পেশ করেছিলাম, বাংলা শিখব এবং রুমার মাস্টারের কাছেই শিখব। প্রথমে কেউ কানে তোলেনি। তারপর ক্রমে মায়ের একটু কৌতূহল হল। শেষে একদিন বলল, আচ্ছা ভদ্রলোককে একবার ডেকে আন, কথা বলে দেখি।

আমার বালিকা বয়সের সেটাই বোধ হয় স্মরণীয় দিন। রুমাকে পড়ানো শেষ করে রাত্রিতে মাস্টারমশাই মায়ের সঙ্গে কথা বলতে এলো। আমি উদ্‌গ্রীব, উন্মুখ। সাদাসিধে কথা, মাস্টারমশায়ের আদৌ সময় নেই। কত মাইনে দিতে পারবে জেনে নিয়ে মা-কে বলল, সে একজন ভালো লোকের খোঁজ করবে।

আমার ভেতরে হঠাৎ কি যে হয়ে গেল কে জানে। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝি একসঙ্গে ধসে গেল। আচমকা মা আর মাস্টারমশায়ের মাঝে এসে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, পড়ব না, পড়ব না, পড়ব না! আমার কি-চ্ছু দরকার নেই, আমার কাউকে দরকার নেই।

সেই রাগের মুখেই চোখে জল এসে গেল। আমি ছুটে পালাতে চেষ্টা করলাম। তার আগেই মাস্টারমশাই দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে কাছে টেনে নিল। ফলে আমি আরো বেশি করে কেঁদে ফেললাম।

আমার আচরণে মা হতভম্ব। মাস্টারমশাই বেশ মন দিয়ে আমার মুখখানা দেখতে লাগল। আমি ভালো করে তাকাতে পারিনি, তবু মনে হল হাসছে অল্প-অল্প। বলল, রুমাকে সপ্তাহে চারদিন পড়াই, তাহলে রবিবার নিয়ে আর হাতে থাকল তিন দিন....রবিবারেও পড়তে পারবে?

হাতের উল্টো দিক দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আমি মাথা ঝাঁকালাম। পারব।

—বেশ, বাকি তিন দিন তাহলে তোমার। এবারে তোমার মা-কে একটু হাসি-মুখ দেখাও তাহলে?

আমি সত্যিই হেসে ফেলেছিলাম। অবাক মুখে মা-ও।

....এর অনেক বছর পরে জেনেছিলাম, আমাকে ওই তিন দিন বাংলা পড়াবার জন্যে মাস্টারমশাইকে অনেক বেশি টাকার একটা টিউশন তার এক বন্ধুকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাংলা শেখার ব্যাপারে আমার আরো একটু সুবিধে ছিল। যে স্কুলে পড়তাম সেটা মিশনারি স্কুল হলেও আসলে ওটা বাঙালি মেয়েদেরই স্কুল। শতকরা কম করে নব্বুইটা মেয়ে বাঙালি। বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দির কোর্স তো ছিলই। অবশ্য অবাঙালি মেয়েদের মধ্যে একমাত্র আমার ভিন্ন আর কারো ও-সবে আগ্রহ ছিল না। বাংলা পড়া শুরু করার পর থেকেই আমি বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চেষ্টা করলাম। একাগ্র মনোযোগে তাদের কথার উচ্চারণ আর ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করতাম। গোড়ায় গোড়ায় সে-সবের অনুকরণ করতে গিয়ে অনেক হাসির খোরাক জুগিয়েছি ওদের।

কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে সবই সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কেউ আর তখন হাসার সুযোগ পায়নি। হ্যাঁ, আমার ওই বাড়ির মাস্টারমশাইটি বিচিত্র মানুষ। জীবনে তাকে কেন ভুলব না সেটা পরের ব্যাপার। আমার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা পর্যন্ত সে শুধু বাংলা পড়ায়নি, বাংলা ভাষার আধ্যাত্মিক, পৌরাণিক আর কাব্যিক আধারের একেবারে ভিতরে নিয়ে ঢোকাতে চেষ্টা করেছে আমাকে। শেষের দিকে পড়ার বই ছেড়ে রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ গুলে খাওয়াতে চেষ্টা করেছে আমাকে।

হায়ার সেকেন্ডারিতে আমি সংস্কৃততে ডিস্টিংশন পেয়েছিলাম আর বোর্ডের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাংলায় প্রথম হয়েছিলাম যেটা খবরের কাগজের খবর হিসেবে ছাপা হয়েছিল। বি. এ-তে আমি যে বাংলা অনার্স পড়লাম না সেটা ওই মাস্টারমশাইটির সত্যিকারের মনোবেদনার কারণ হয়েছিল।

হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার স্পেশাল সাবজেক্ট ছিল সাইকোলজি। কেন ছিল আমি তার সচেতন বিশ্লেষণ কিছু দিতে পারব না। ওই বিষয়টির প্রতি একটু বিশেষ ঝোঁক ছিল—এই পর্যন্ত। বি. এ-তেও ওই বিষয় নিয়ে এগোলাম। তখনো সঠিক জানি না কেন। যতটা আশা করেছিলাম তার থেকেও ঢের ভালো পাশ করলাম। ওই বিষয় নিয়ে এম. এ. পড়ার সময় মাঝে মাঝে নিজের ভেতরটা আমি তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছি।....কেন এ-দিকে এগোচ্ছি, কি হবে শেষ পর্যন্ত এই দিয়ে?

তখনই অবচেতন মনের ওপরকার একটা পর্দা যেন একসময় নড়েছে একটু। পেশার সঙ্গে পারিবারিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার ব্যাপারে আমার মনের তলায় যা এক

সুপ্ত সমস্যার আকারে অঙ্কুরিত হয়েছিল সেটাই হয়ত আমাকে মানুষের মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের দিকে ঠেলেছে।

মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় এম. এ. পাস করার আগে মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম, আমি কি করব, যা শিখছি তা দিয়ে কি হবে, ব্যবসা না মাস্টারি....যে-মানুষ আসবে আমার জীবনে তার সঙ্গে আমার স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কাজ খাপ খাবে কিনা?

আমার জীবনে পুরুষের অল্প-স্বল্প হামলা শুরু হয়েছিল বি. এ. পড়ার সময় থেকেই। তাদের মধ্যে স্ব-জাতীয়ও ছিল, আবার বাঙালী অবাঙালীও ছিল। স্বজাতীয়রা ছকেবাঁধা নিয়মে একটু-আধটু রোমান্সের ফাঁক খুঁজত। মুশকিলে পড়তাম বাঙালী আর অবাঙালী প্রেমিকদের নিয়ে। আমি মেয়েটা তাদের কাছে বিজাতীয় বলেই যেন ওদের প্রাপ্তির আশা অনেক সময় অশোভন তো বটেই, সেই সঙ্গে নির্মমও। এম. এ. পড়ার সময় এক ছেলে বিলিতি কায়দায় আমার সঙ্গে 'ডেট্' করার আবেদন করে করে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিল, প্রথমে সে আমাকে খুন করবে তারপর নিজে আত্মহত্যা করবে।

অগত্যা আমাকেই নরম হতে হয়েছিল। বলেছিলাম, করলাম না হয় ডেট্....তারপর? যাবে কোথাও?

উৎফুল্ল মুখে সে প্রস্তাব করেছিল, দিন দুয়েকের জন্যে দীঘায় যাওয়া যেতে পারে, সমুদ্রের উপর চমৎকার জায়গা।

আমি বললাম, বেশ, তাই না হয় গেলাম....তারপর কি হবে?

—তোমাকে কাছে পাব।

—কত কাছে?

লোভে দু'চোখ বিচ্ছিরি চকচক করে উঠল তার, সম্ভব হলে তক্ষুনি আমাকে জাপটে ধরে দেখাত কত কাছে। হেসে বলল, দুষ্টু মেয়ে, তুমি কি কচি খুকি—কিচ্ছু বোঝ না?

—বুঝি বলেই তো সমস্যা। ঠিক আছে, যাব।....কিন্তু তার আগে রেজিস্ট্রি আপিসে বিয়ের নোটিস পাঠাবার ব্যবস্থা করো। তাছাড়া তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গেও একবার দেখা করব, এ-বিয়ে তারা কীভাবে নেবে না নেবে জানা দরকার।

আমার সেই প্রেমিক তারপর একেবারে আকাশ থেকেই পড়েছিল যেন।—বিয়ে! এক্ষুনি বিয়ের প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?

সেই প্রথম আমিও তপ্ত জবাব দিয়েছিলাম।—কোত্থেকে আসছে বোঝ না? তুমিও কি কচি খোকা নাকি?

আর একবার এক দুর্বলচিত্তে প্রেমিককে নিয়ে বেশ মুশকিলে পড়েছিলাম। আমার তখন এম. এ. পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। সেই ছেলেও তখন সি. এ. না কি পড়ছে। রোজ সন্ধ্যায় তার আমাদের বাড়ি আসা চাই-ই। ছুটির দিনে সকালেও। একবার এলে আর উঠতেই চায় না। বললেও শোনে না। আমার মা-কে তো মা বলেই ডাকতে শুরু করল। আমি রাগ করলে মুখখানা বেজার করে বলে, তোমাকে একদিন না দেখলে

আমি চোখে অন্ধকার দেখি—শেষে ট্রাম-বাস চাপা পড়ব !

ওর জ্বালায় চোখে অন্ধকার আমিও দেখতে লাগলাম। শেষে একদিন যা করে বসলাম, মনে পড়লে আজও হাসি পায়। সেজেগুজে সটান একদিন সেই ছেলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। চেঁচিয়ে প্রেমিকের নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। শুকনো বিবর্ণ মুখে সেই ছেলে বেরিয়ে এল, আর নানা বয়সের অনেকগুলো মেয়ে-পুরুষের মুখ উঁকিঝুঁকি দিল। তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমি শুধু আমার প্রেমিকটিকে নিয়ে বিগলিত হয়ে উঠলাম। তার হাত ধরে ঝাঁকালাম, আর প্রচুর হেসে বললাম, কেমন সারপ্রাইজ ! কি কাণ্ড, তুমি দেখি একেবারে হাঁ হয়ে গেলে ! ঘরে ডেকে বসতে দেবে না নাকি ?

ওদের ঘরে ওকেই আমি কাচপোকার মতো টেনে নিয়ে গেলাম। তারপর ওর গা-ঘেঁষে বসে আবোল-তাবোল কত কি যে বকতে লাগলাম আর কত রকমের আব্দার করতে লাগলাম ঠিক নেই। ঘরের বাইরে যে অনেকগুলি প্রাণী উৎকর্ণ এবং রুদ্ধশ্বাস, সেটা আমি সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলাম।

তারপর আর একদিন মাত্র সেই প্রেমিক আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিল। পরদিন। শুকনো পাংশু মূর্তি। মিনমিন করে বলল, ইয়ে, আমাদের বাড়ির লোক....মানে আমার বাবা-মা একটু বেশি রকমের কনজারভেটিভ, তাই কাল তোমাকে সে-ভাবে রিসিভ-টিসিভ....

আমি বাধা দিয়ে বললাম, সে জন্যে তুমি কি-চ্ছু ভেবো না, তোমার বাবাকে ড্যাডি আর মা-কে মা-মি বলে দুই একবার জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরলেই তাঁরা গলে জল হয়ে যাবেন।

প্রেমিক সত্রাসে লাফিয়ে উঠল।

—তুমি কি আবারও যাবে নাকি !

—এরপর থেকে তুমি যতবার আসবে গুনে গুনে ঠিক আমিও ততবার যাব।

আর আসেনি।

আমার গড়গড় করে বাংলা বলতে পারা আর লিখতে পারাটা কলেজ আর য়ুনিভার্সিটির অনুরাগী মহলে একটা বাড়তি চটকের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উচ্চারণেও এতটুকু খুঁত বা টান ছিল না। আড়াল থেকে শুনলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কোনো বাঙালী মেয়ে কথা বলছে না। তাছাড়া বি. এ-তেও পাস কোর্সএ আমি বাংলা রেখেছিলাম। আর, মনে হয় অনেকটা এই গুণেই ভবিষ্যৎ জীবনে আমি জনাকতক বাঙালী গুণীর একটু বাড়তি স্নেহ লাভ করেছিলাম।

বাংলা যতই ভালো বলি না কেন, বাঙালী মেয়ের পোশাকে আমি নিজেকে রপ্ত করিনি। একখানাই শাড়ি আছে আমার, অনেক কসরৎ করে ক্বচিৎ কখনো ওটা পরি। অনুরাগীরা অনেকে বলেছে শাড়িতে আমাকে ঢের ভালো মানায়। কিন্তু আমি ও কথায় ভুলিনি। বরাবর গাউন-স্কার্ট-ফ্রকই পরে আসছি। তার একনম্বর কারণ ওই অতবড় জিনিসটা ঠিক ম্যানেজ করে উঠতে পারি না, দু'নম্বর কারণ, শাড়ি পরে টগবগিয়ে বাংলা বলার চটক তাহলে অর্ধেক নিষ্প্রভ হয়ে যেত। এ ছাড়া অনেক মজাও মাটি হয়ে যেত।

কলেজে পড়তে আমি মাঝে মাঝে এক বাঙালী সহপাঠিনীর বাড়ি যেতাম। সে-এলাকার রকে-বসা ছেলেগুলো প্রায়ই আমার উদ্দেশে টীকা-টিপ্পনী ছুঁড়ত, পেছন থেকে শিস দিত। একদিন একটু বাড়াবাড়িই করছিল। আমি চট করে ঘুরে সোজা ওদের সামনে চলে এলাম। তারপর হাসি মুখেই বললাম, কি বলছিলে ভাইয়েরা, সামনা-সামনি বল, আমার সঙ্গে যদি তোমাদের ভাব করতে ইচ্ছে করে তাহলে আমাকে ডাকো নি কেন? মাঝখান থেকে এ-রকম ব্যবহার করে নিজেরাই কষ্ট পাও।

আমার মুখে ও-রকম বাংলা শুনে ওদের জোড়া-জোড়া চোখ কপালে ওঠার দাখিল। এরপর আমাকে দেখলেই ওরা উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানাত।

বছর চারেক আগের কথা। আমার বয়েস তখন সাতাশ বছর হবে। এখন আমার নিজের ছোট গাড়ি হয়েছে, নিজেই ড্রাইভ করি। চার বছর আগে ওটা ছিল না। ট্রামে যাতায়াত করতাম। এক দুপুরে ট্রামে যাচ্ছিলাম কোথায়। যাত্রী কমই ছিল। এক জায়গা থেকে জনা ছয় ছেলে উঠল। আর তার একটু পরেই আমাকে লক্ষ্য করে ওরা বেশ অশোভন মন্তব্য ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখলাম ওদের, ওদের কারো বয়েসই কুড়ি-একুশের বেশি নয়।

আমি তাকালাম বলে ওদের উৎসাহ বাড়ল আরো। বাংলায় আরো অশ্লীল গালাগাল আর মন্তব্য করতে লাগল। আমি ট্রামের অন্য যাত্রীদের দিকে তাকালাম। ওদের বাদ দিলে আর দশ-বারোজন মাত্র হবে। তার মধ্যে বুড়ো আর আধ-বয়সীই বেশি। এই ইতরামো কেউ পছন্দ করছে না বটে, কিন্তু হামলার ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতেও সাহস পাচ্ছে না। পাবার কথাও নয়, যুগের এই দুর্বিনীত হাওয়া সকলেই চেনে। তাছাড়া আমি কিছু বুঝছি না ভেবেও হয়ত স্বস্তি পাচ্ছে।

এবারে আমি ছেলেগুলোর দিকে ঘুরে বসলাম। ওদের একজন সকৌতুকে বলে উঠল, এই খেল যা।

—তোমাদের যে-রকম ডানা গজিয়েছে তোমাদের খাবে কে?

ট্রামের মধ্যে যেন বোমা ফাটল একটা। আমাকে এই ঝাঁজে এ-রকম বাংলা বলতে দেখে বা শুনে ওরা হতচকিত। অন্য যাত্রীরাও।

সংযত কঠিন স্বরে আবার বললাম, আমি তোমাদের অনেক বড়, দিদির বয়সী বাছারা। আমি তোমাদের ভাষা জানি বুঝলে নিশ্চয় অকারণে নিজেদের এত নীচে টেনে নামাতে না তোমরা, কি বল? তোমাদের আর তোমাদের ভাষার ওপর আমার কতখানি টান দেখতেই পাচ্ছ, আর তোমরা কিনা তোমাদের জাতের মুখে এভাবে কলঙ্ক মাখাচ্ছ?

ওরা কথা বলবে কি, দিশেহারা চোখ-মুখ সব ক'টার। একজন উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে বাকি ক'জনও। টপাটপ চলতি ট্রাম থেকে নেমে গেল।

অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি নিয়ে ভালোভাবেই এম. এ. পাস করেছি। তারপর থিসিস্ সাবমিট করে চটপট ডক্টরেট পেয়েছি। আর বরাতজোরে মাস আষ্টেকের জন্যে

বিলেতের এক মানসিক চিকিৎসা সংস্থা থেকে হাতেকলমে কিছু ট্রেনিং নিয়ে আসতে পেরেছি।

এই সবই সম্ভব হয়েছে আমার এখানকার বৃদ্ধ শিক্ষাগুরুর স্নেহ আর করুণায়। ডক্টর বিজিতনাথ বোস—বি. এন. বি—এই একটা নাম মনে এলেই আমার হাত দুটো আপনা থেকে যুক্ত হয়ে কপালের দিকে উঠতে চায়। মনের রোগের চিকিৎসক হিসেবে ভারতের বাইরেও তাঁর নামডাক। আমাকে নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসেন। আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সবটুকুই তাঁর দান।

বিলেত থেকে ঘুরে এসেও তাঁর ক্লিনিকের সঙ্গেই যুক্ত আছি। ওঁরই তিনতলার ফ্ল্যাটে আমি থাকি। তিনটে ঘর, বড় দুটো আমার আবাসঘর, আর এ দুটোর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরখানা আমার চেম্বার। নীচের একতলা দোতলা ডক্টর বোসের নার্সিং হোম। তাঁর চেম্বার এবং বসত-বাড়ি অন্যত্র। এই গোটা বাড়িটাও তাঁরই। রোজ বিকেল চারটে নাগাদ ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েকের জন্যে এখানে রোগী দেখতে আসেন তিনি। তার বেশি সময় দিতে পারেন না। সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাঁর ফুরসৎ নেই। এই বয়সে অমন বিরাট কর্মী-পুরুষ আমি আর দেখিনি।

সব ক'টাই মেয়েদের, অর্থাৎ ফিমেল পেসেন্টএর বেড এখানে। অল্প-স্বল্প মানসিক বিভ্রান্তিতে ভুগছে যারা তাদের এখানে স্টাডি-ট্রায়ালে রাখা হয়। একতলার দুটো বড় ঘরে সকাল-বিকেল দু'বেলাই বাইরের মেয়ে-পুরুষ-সকলেই চিকিৎসা হয়ে থাকে। এই সবেরই জন্যে এখানে ডক্টর বোসের অধীনে বাঁধা ডাক্তার আছে দু'জন—একজন মেয়ে ডাক্তার, একজন পুরুষ। সিকিয়াট্রিস্ট বা মনোবিশ্লেষকারিণী আমি একাই।

আগে এই ফ্ল্যাটে একজন মহিলা ডাক্তার থাকত। সে চলে যেতে মাস ছয় হল ডক্টর বোসের অনুরোধে এখানে উঠে এসেছি। তারপর থেকে আমার নিজস্ব রোগী বা রোগিণীর সংখ্যা আরো বাড়ছে। মানসিক রোগের বহু ক্ষেত্রে সাইকো-অ্যানালিসিস বা মনোবিশ্লেষণ চিকিৎসার এক অপরিহার্য অঙ্গ। রোগীর অগোচরে তার অবচেতন মনে হয়ত এমন কিছু জট পাকিয়ে থাকে যার দরুন অনেক রকমের মানসিক বিপর্যয় ঘটে যায়। অবচেতন মনের এই জট রোগীর চেতনার মধ্যে স্পষ্ট করে তোলাই সিকিয়াট্রিস্টের কাজ। জট তখন আপনিই ছেড়ে যায়। মনস্তত্ত্বগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগীর সঙ্গে আলাপে আলোচনায় তার অবচেতন মনের সেই অন্তঃপুরের দরজাটি খুলে দিতে পারলে তবে তার মুক্তি, আর তবে এই বিশ্লেষণ সার্থক। এ-পদ্ধতিতে রোগ সারিয়ে তুলতে কত দিন লাগবে সেটা নির্ভর করে রোগ-কাল আর ব্যক্তি-সত্তার বৈশিষ্ট্যের ওপর, আর নির্ভর করে সিকিয়াট্রিস্টের বিচক্ষণতার ওপর।

এ-বিদ্যায়ও ডক্টর বোসের সর্বোচ্চ বিদেশী ডিগ্রী আছে। কিন্তু তাঁর যা পসার এখন তাতে এ-পর্যায়ের রোগীকে দিনের পর দিন সিটিং দেবার আদৌ সময় নেই তাঁর। অতএব এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন হলেই রোগী বা রোগিণীকে তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। আমি কিছুদিন পর-পর তাঁর কাছে বিশ্লেষণের রিপোর্ট পাঠাই। অবশ্য সব রোগীই যে তাঁর কাছ থেকে আসে তা নয়। অন্য ডাক্তারদের কাছ থেকেও আসে, রোগী

বা রোগিণীর মারফৎও আসে।

প্রত্তিটি পেসেণ্টের সীটিং-প্রতি আট টাকা ফী ছিল আমার। সম্প্রতি দশ টাকা করেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো পেসেন্টকে সপ্তাহে দু'দিন কি বড় জোর তিন দিনের বেশি সীটিং দিতে পারি না। প্রত্যেকটা সীটিং-এর মেয়াদ আধ-ঘণ্টা, বেশি হলে চল্লিশ মিনিট। তাতেও পেসেন্ট-এর সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছে এখন যে সকাল থেকে রাত অবধি এক-একদিন বিশ্রামেরও অবকাশ মেলে না। ডক্টর বোসের পেসেন্ট না হলে ফিরিয়েও দিতে হচ্ছে অনেককে।

প্রতিটি কেস্এ আমি বিশেষ যত্ন নিই। ভাবি। কেস্ বেশি জটিল হলে ডক্টর বোসের সঙ্গে আলোচনা করি, পরামর্শ করি। তাঁর নির্দেশমতো চলি। তাঁর প্রতি আমার অন্ধ বিশ্বাস, অন্ধ ভক্তি। শুধু বিশ্রাম আর অবসর-বিনোদনের জন্যেই নয়, তাঁর সাহচর্যের লোভে আর তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানলাভের আশায়ও এক সকাল ভিন্ন রবিবারে অন্য পেসেন্ট নিই না।

....সম্প্রতি একটা অদ্ভুত জটিল কেস্ নিয়ে দিশেহারা অবস্থা আমার। এই একত্রিশ বছরের জীবনে এমন কাণ্ড আর হয়নি। ক্রমশ যেন দুরূহ আর দুরারোগ্য মনে হয়েছে ওটা। শেষে এমন হয়ে দাঁড়াল ওটা যে আমি ভালো করে অন্য কেস্-এর দিকেও মন দিতে পারি না।

একদিন নয়, কয়েকদিনই অন্য সীটিং ক্যানসেল করে ছুটে ছুটে গেলাম আমার গুরু ডক্টর বোসের কাছে। তিনি খুব মন দিয়ে শুনলেন কেস্টা।....রোগী, রোগী নয়, রোগিণী মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে খুব মোটা একটা প্রকাণ্ড সাপ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাকে-পাকে জড়িয়ে মাথার ওপর ফণা তুলে জ্বলন্ত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। নির্মম, ক্রূর। কার একটা অদৃশ্য হাত যেন প্রবল শক্তিতে ওই ভয়ঙ্কর সাপের গলাটা চেপে ধরে ফণাটা রোগিণীর মাথার ওপর নেমে আসতে দিচ্ছে না। আর তারই আর একখানা অদৃশ্য পুরুষের হাত একটা ধারাল অস্ত্র দিয়ে তলা থেকে এই সাপটাকে কেটে কেটে ওপরের দিকে উঠে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই সাপের গলাটা কাটতে পারবে, নাকি তার আগেই অন্য হাতের বাধা ঠেলে ওটা রোগিণীর মাথায় ছোবল বসাবে কেউ জানে না।

....তারপর রোগিণী আঁতকে উঠল একদিন। হঠাৎই তার খেয়াল হল সে স্বপ্ন দেখছে না, সম্পূর্ণ জেগে থেকেই সেদিন ওই বিভীষিকার দৃশ্যটা দেখছে। তারপর থেকে জাগ্রত অবস্থাতেই ওই বীভৎস দৃশ্য দেখা শুরু হল। এখন দিনে-রাতে তিন-চারবারও রোগিণী ওই দৃশ্য দেখছে।

শুনে আমার বিশেষজ্ঞ-গুরু ডক্টর বিজিতনাথ বোসও বিশেষ চিন্তিত হয়েছেন।

চিন্তিত হয়েছেন কারণ, মোটামুটি প্রতিষ্ঠিতা সিকিয়াট্রিস্ট আমি হিলডা হীল, বয়েস একত্রিশ—সেই রোগিণী আমি নিজেই।

গুরুর নির্দেশে কাগজে কলমে নিজের জীবনের এই চিত্র-রচনায় বসেছি আমি। তাঁর নির্দেশ সর্বদাই অভ্রান্ত মনে করি। তিনি বলেছেন, একেবারে ছেলেবেলা থেকে যা-কিছু মনে পড়ে কোনোরকম সঙ্কোচ না করে অকপটে লিখে যেতে। কেন বলেছেন, এই চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে আমি চেষ্টা করলে তাও অনুমান করতে পারি। কিন্তু সে-চেষ্টা আমি করিনি। তাঁর কথা-মতো এক মাসের জন্যে আমি আমার সমস্ত পেসেন্ট ছেঁটে দিয়েছি। তারা জেনেছে অত্যধিক পরিশ্রমে আমি অসুস্থ, ডাক্তারের এক মাসের পূর্ণ বিশ্রাম নির্দেশ।

না, একেবারে সমস্ত রোগী বাতিল করিনি আমি। কেবল একজনকে রেখেছি। একটি পুরুষ পেসেন্টকে। এও ডক্টর বোসের ব্যবস্থা। এই পেসেন্ট সপ্তাহে তিন দিন আসে বিকেলের দিকে। শুধু সেই তিন দিন সেই সময়টুকুর জন্যে আমি আগের মতই মনোবিশ্লেষণকারিণীর ভূমিকা নিয়ে থাকি। কিন্তু সেটা অনেক পরের, অর্থাৎ আমার এই একত্রিশ বছর বয়সের প্রসঙ্গ।

....ওই তিন দিনের ওই সময়টুকু ছাড়া বাকি সমস্তক্ষণ আমি আত্ম-চিত্র রচনায় অথবা রচনার চিন্তায় মগ্ন।

প্রোফেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইফ, পেশা আর পারিবারিক জীবন—এই দুইয়ের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে কিনা, একটা আর একটার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কিনা, তার প্রতি আমার দৃষ্টি সম্ভবত একটু বেশিমাত্রায় সজাগ ছিল। আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুমার পারিবারিক জীবন আর তার থেকেও বেশি আমার বাবা আর মায়ের পারিবারিক জীবন এ-ব্যাপারে আমার মনের তলায় একটা স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমার নিজের জীবনেও এই সমন্বয়ের প্রশ্নটা কখনো দুশ্চিন্তার আকারে এসেছে, কখনো বা সমস্যার আকারে।

এই একটিমাত্র বিষয়ে আমার কোনো রকম আপস ছিল না। সামান্য ব্যতিক্রম দেখলেই, অর্থাৎ পেশার সঙ্গে পারিবারিক জীবন খাপ খাচ্ছে কি না সে-সংশয় মনে এলেই আমি সহজে সেটা বরদাস্ত করতে পারতাম না।

এ-ব্যাপারে আমাকে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে সচেতন করেছিল আমার বাবা। মায়ের বরাবর ইচ্ছে ছিল মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাস করে আমি ডাক্তার হই। আজীবন নার্স আর মেট্রনগিরি করে ডাক্তারদের ওপর হয়ত তার প্রচ্ছন্ন একটু হিংসে ছিল। মা-কে আমি খুশি করতে পারিনি। বাবার খুশি-অখুশির বালাই কিছু ছিল না। নিজের বিবেচনায় যা করছি তাই ভালো। ও-ব্যাপারে তার কোনো মতামতই ছিল না।

থিসিস লিখে ডক্টরেট পাওয়ার পর বাবা প্রথম শুনল ভবিষ্যৎ জীবনে আমি কি করতে চাই অথবা কি হতে চাই। শোনার পরেও কোনো রকম অনুকূল বা প্রতিকূল মন্তব্য করল না। শুধু বলল, এ-সবের আমি কিছুই বুঝি না। তারপর এদিক-ওদিক চেয়ে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, এ-ধরনের প্রোফেশন তোমার ফ্যামিলি লাইফে খাপ খাবে তো?

একটি ছেলের সঙ্গে তখন আমার একটু-আধটু অনুরাগ-পর্ব চলছে সে খবর বাবা-মা দুজনেই জানত। তার নাম নরম্যান। এ-দেশেই জন্ম-কর্ম। অল্প বয়সে এক বড় এন্‌জিনিয়ারিং ফার্মের পদস্থ অফিসার। স্নিগ্ধ, ঠাণ্ডা মানুষ। দিন-কতক হাসপাতালে ছিল অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের উদ্দেশ্যে। অপারেশন দরকার হয়নি শেষ পর্যন্ত। দিনকতক পর্যবেক্ষণে রেখে ডাক্তার রায় দিয়েছে, সামান্য ব্যাপার, ওষুধেই সারবে। অত খরচের স্পেশাল কেবিনের পেসেন্ট বলেই হয়ত মায়ের সঙ্গে আলাপ এবং ভাব। তার মেয়ে হিল্‌ডা হীল কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাস করে এখন গবেষণা-রত শুনে বাড়ি এসে মেয়ের সঙ্গেও আলাপের বাসনা। মনে হয়, মা-ও এদিকে লক্ষ্য রেখেই তার সঙ্গে হৃদ্যতা বাড়িয়ে ছিল।

আমি এমন কিছু রূপসী নই, সকলে সুশ্রী বলে, আর লম্বার ওপর স্বাস্থ্য ভালো—এই পর্যন্ত। কিন্তু আমাকে দেখে আর এক ঘণ্টা আলাপ করেই লোকটা যে প্রেমের কাঠগড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ল সেটা যে করেই হোক আমি বুঝেছিলাম। কৃতিত্বের সঙ্গে আমার এম. এ. পাসের বিদ্যেটাও হয়ত ওর চোখে আমার রূপের চটক বাড়িয়েছে। আমাদের সমাজের মেয়েরা বেশির ভাগই জুনিয়র বা সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করে চাকরির বাজারে নেমে পড়ে। স্টেনো-টাইপিস্ট হয়, স্টেনোগ্রাফার হয়, সেক্রেটারি হয়। এর থেকে অল্পবিদ্যের মেয়েরা বড় দোকানের সেল্‌স্ গার্ল হয়। অতএব এম. এ. পাস এবং রিসার্চের একটু বাড়তি চটক আছে বইকি।

আমার থেকে বড় জোর বছর তিনেক বড় হবে বয়সে। মিষ্টি স্বভাব এবং ভদ্র। ক্রমে যাতায়াত বেড়েছে, দেখা-সাক্ষাৎ হৃদ্যতার দিকে এগিয়েছে। নরম্যানকে আমারও ভালোই লেগেছে। অতএব মা-বাবা দুজনেই ধরে নিয়েছে অদূর ভবিষ্যতে এই হৃদ্যতা এবং ভালো লাগা একটা সুপরিণতির দিকে গড়াবে।

....আমার পারিবারিক জীবনে এই পেশা খাপ খাবে কিনা বাবার ওই প্রশ্নে ভেতরে ভেতরে হঠাৎ আমি বেশ একটা নাড়াচাড়া খেয়েছিলাম। কেন, সেই চিন্তা তখন করিনি। তার পরেই হেসে জবাব দিয়েছিলাম, ফ্যামিলি লাইফ্ এই প্রোফেশনে তো আরো ভালো হবার কথা। এ প্রোফেশনে মন নিয়েই কারবার....

বলেছিলাম বটে, কিন্তু প্রশ্নটা আমার মনের তলায় লেগেই ছিল।

বান্ধবীদের পারিবারিক জীবনের প্রতি আমার বিশেষ একটা কৌতূহল ছিল। উপার্জন করে এবং বিবাহিত এমন বান্ধবীদের কথাই বলছি। অবশ্য সে-রকম বান্ধবীর সংখ্যা আমার খুব বেশি নয়। অনেক দিন ধরে যারা পাড়ায় আছে শুধু তাদের সঙ্গেই যা একটু হৃদ্যতা।

দুটো মেয়ের কথা বলতে পারি যারা আমার মনে রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করত। দুজনেই তারা মস্ত নামজাদা কোম্পানির দুই হোমরাচোমরা ওপর-অলার নিজস্ব স্টেনোগ্রাফার। দুজনেই বেশ ভালো মাইনে পায়। ফিটফাট সেজে-গুজে সকাল ন'টার মধ্যে আপিসে বেরোয় তারা। কিন্তু ফেরার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কোনো দিন বিকেলে ফেরে, কোনো দিন সন্ধ্যায়, কোনো দিন বা রাতে। ওদের স্বামীরাও সেই

রকমই। একজন তার বউয়ের আগে বেরোয়, আর একজন অনেক পরে। তাঁদেরও ঘরে ফেরার নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। এক-একদিন এক-একসময় ফেরে।

এই দুই বান্ধবীকে দেখতাম আর বার বার আমার মনে প্রশ্ন জাগত, ওদের পারিবারিকে জীবন কি সুস্থ, নির্বিঘ্ন ? ওদের পেশা কি খাপ খেয়েছে ?....মেয়ে দুটোকে অনেক দিন ঝকঝকে গাড়িতে অন্য মানুষের পাশে বসে মনের আনন্দে হাওয়া খেতে দেখেছি। তারা ওদের আপিসের ওপরঅলা কিনা জানি না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে দুই-একজনকে ওদের বাড়িতে আসতেও দেখেছি। পরে স্বামী এসে হাজির হলেও কোনো রকম বিভ্রাট বাধতে দেখিনি। আবার ওদের ওই স্বামী দুটিরও একটু-আধটু বেচাল আমার চোখে পড়েছে। একজনকে তো একদিন মদ খেয়ে এক অচেনা মেয়ের কণ্ঠ-লগ্ন হয়ে রাস্তায় চলতে দেখেছিলাম।

....এদের পারিবারিক জীবনযাত্রা কেমন ? দুটি দম্পতিই এমন ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে কি করে ? কি করেই বা নিজেকে ওরা খাপ খাওয়াল ?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে দুই বান্ধবীকেই এ-প্রসঙ্গে আলাদা জিজ্ঞেস করেছিলাম। দুজনেই প্রায় একই ধরনের জবাব দিয়েছে। প্রশ্ন শুনে প্রথমে তো নিজেরাই অবাক তারা—এ আবার একটা সমস্যা নাকি ! কেউ কারো ব্যাপারে নাক বা মাথা না গলালেই তো ফুরিয়ে গেল। অশান্তি হতে যাবে কেন ? আপিসের কাজে আনন্দ বা ফুর্তি আপিসের—বাড়ির আনন্দ-ফুর্তি বাড়ির—সেন্টিমেন্টাল হয়ে একটার সঙ্গে আর একটা না মেশালেই তো হল ! আমার মাথায় যত-সব উদ্ভট চিন্তা আসে বলেই ওদের হাসাহাসি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার খটকা দূর হয়নি। উল্টে মনে হয়েছে, এ-ই একমাত্র সত্যি নয়, সত্যি হতে পারে না। আসলে ওই মেয়ে দুটো আর তাদের স্বামী দুটো সত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে, চোখ বুজে আছে। ওদের পেশার সঙ্গে ওদের জীবনযাত্রা মেলেনি, মিলতে পারে না।

....আবার আর এক মেয়ের পেশার খবর আমি জানি, আর তার পারিবারিক জীবনযাত্রার খবরও। ওই পেশা রমণী জীবনের সব-থেকে ঘৃণ্য বৃত্তি, সব-থেকে বড় অভিশাপ। অথচ তার স্বল্প-মেয়াদী পারিবারিক জীবনের যে মাধুর্য দেখেছি, মনে পড়লেও চোখে জল আসে।

সেই মেয়ে আজ কোথায় বা কোথাও আছে কিনা, জানি না। তার নাম জুলি—জুলি হেওয়ার্ড। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ওপারে দুখানা বাড়ি ছাড়িয়ে ওদের ছোট ফ্ল্যাট। জুলি আমার থেকে বছর চারেকের বড়, তেইশ-চব্বিশ হবে তখন ওর বয়েস। ভারী সপ্রতিভ আর মিষ্টি মেয়ে। লেখা-পড়া কিছুই শেখেনি, গরীবের অবাঞ্ছিত মেয়ে। ওর বাপ হাল-ফ্যাশানের এক বিলিতি রেস্তরাঁয় ভায়লিন বাজাতো। তার চার-চারটে মেয়ে, জুলি সবার ছোট। মেয়েগুলোর একমাত্র ভালো দিক হল সব ক'টাই বেশ সুশ্রী। জুলির মুখেই আমি শুনেছি তার বড় তিনটে বোনকে রীতিমত সুন্দরীই বলা চলে। গরীবের ঘরে ওই রূপটুকুই পুঁজি। সেই পুঁজি ভালোই বিকিয়েছে—বড় তিনজনের

মোটামুটি ভালোই বিয়ে হয়েছে। তারা কে কোথায় আছে জুলি তাও জানত না।

কিন্তু সব-থেকে সুখের ঘর সম্ভবত জুলিই পেয়েছিল। খুব সচ্ছল ঘর নয় অবশ্য, কিন্তু আনন্দের ঘর যে সে আমি নিজের চোখে দেখেছি।

টম হেওয়ার্ড ফ্যাক্টরিতে সাব-ফোরম্যানের কাজ করত। কাজের সুনাম ছিল তার। শক্ত-সমর্থ ছেলে, ও নিজেও আশা করত চাকরির উন্নতি হতে বেশি সময় লাগবে না। জুলির সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে গীর্জায় আলাপ। টম হেওয়ার্ড সপ্তাহের ওই একটা দিন নিয়মিত গীর্জায় যেত। জুলিও যেত। তাই থেকেই হৃদ্যতা। টম হেওয়ার্ড সসম্মানে ঘরে এনেছে তাকে, গরীবের মেয়ে বলে একদিনের জন্যেও অমর্যাদা করেনি বা অবহেলা করেনি। বরং জুলি এসে যেন তার ঘর আলো করেছে, সর্বদা সেই আনন্দ।

....এত সুখ যে সইবে না কে জানত!

যে-সময়ের কথা বলছি জুলির ঘরে তখন দুটো ফুটফুটে ছেলে-মেয়ে। ও দুটোকে চটকাবার লোভেও প্রায় দু'বেলাই আমি ওদের ফ্ল্যাটে যেতাম। দু'টো ছেলে-মেয়ে আর বয়েস চব্বিশ হলেও জুলিকে তখন যেন আরো ছেলেমানুষ দেখাত। একটা তৃপ্তি আর আনন্দের ছোঁয়া সর্বদা ওর চোখে-মুখে লেগে থাকত বলেই আরো কচি দেখাত ওকে।

....হঠাৎই একদিন ওই সুখের ঘর বুঝি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রাস্তায় এক লরি অ্যাকসিডেন্টে টম হেওয়ার্ডের একটা হাত ভাঙল, উরুর নীচে থেকে একটা পা খোয়া গেল। নিতান্ত পরমায়ু ছিল বলেই টম হেওয়ার্ড প্রাণে বাঁচল সে-যাত্রা। কিন্তু না বাঁচাই বোধ হয় ভালো ছিল। কোম্পানি থেকে যেটুকু সাহায্য আর টমের নিজের প্রাপ্য যা পাওয়া গেল তার সবটা ঢেলে এক-পা কাটা আর এক-হাত বিকল টম হেওয়ার্ডকে একদিন হাতপাতাল থেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল জুলি। আনতে যে পেরেছে সেই আনন্দ ধরে না। শোকে আর দুশ্চিন্তায় মাঝে পাগলের মতো হয়ে গেছল ও।

তারপর?

তারপর আরো কঠিন বাস্তব গোটা পরিবারটাকেই হাঁ করে গিলতে এল।

জুলি হেওয়ার্ড রোজগারের চেষ্টায় পথে নামল। কচি ছেলে-মেয়ে দুটো তাদের পঙ্গু বাপের হেপাজতে।

চেহারা তখনো ভালো বলেই একটা মাঝারি অবস্থার ফার্মে রিসেপসনিস্টের চাকরি পেয়ে গেল। কিছুদিনের মতো নিশ্চিন্ত। তারপর আবার বেকার। শুনলাম সেখানকার পুরুষদের অশালীন ব্যবহারে মান-সম্ভ্রম নিয়ে ওখানে টেঁকা গেল না। কিছুদিন বাদে ওই চেহারার দৌলতেই একটা বড় দোকানে সেল্স গার্ল-এর চাকরি পেল। দু'মাস না যেতে সেই চাকরিরও একই পরিণতি। এরপর বেশ কিছুদিনের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরেও গ্রাসাচ্ছাদন চলার মতো একটা চাকরি জোটাতে পারল না জুলি হেওয়ার্ড। অবস্থা যখন চরমে, আবার একটু আশার আলো দেখল ওরা। জুলি কাজ পেল। এক নার্সিং হোমে নাইট অ্যাটেনডেন্ট-এর কাজ। রাতে দু'শিফ্‌ট্‌এ দুজন কাজ করে সেখানে। একজন রাত আটটা থেকে রাত্রি দুটো, আর একজন রাত দুটো থেকে সকাল আটটা। রাত আটটা থেকে দুটোর অ্যাটেনডেন্ট চলে যেতে জুলির চাকরি। ডিউটির

পর গাড়ি-টাড়ির সঙ্গতি পেলে বাড়ি চলে আসে, না পেলে বাকি রাতটুকু নার্সিং হোমে ঘুমিয়ে কাটিয়ে সকালে ফেরে।

প্রায় দু'বছর এমনি করে কেটেছিল। তখনো ওদের দেখে আমার মনে হত ওপরঅলার ওদের বিপন্ন করার সব চক্রান্ত বুঝি ব্যর্থ। ওদের সত্তার যোগ বিচ্ছিন্ন হবার নয়। এরই মধ্যে পারিবারিক জীবনে যেটুকু আনন্দ আহরণ সম্ভব তা যেন জোর করেই আদায় করে নিত ওরা।

কিন্তু এরপর এটুকুরও অবসান।

ক'দিন ধুম জ্বর চলছিল টমের। ডাক্তার দেখে বলে গেছে লক্ষণ ভালো নয়। জুলির মুখে আবার সেই পুরনো ত্রাস দেখলাম আমি। তিন দিন কাজে বেরোয়নি, সেদিন না বেরুলে চাকরি থাকে কিনা সন্দেহ। যাবার আগে জুলি আমাকে বলে গেল, একটু খোঁজখবর কোরো ভাই—

রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময় আমাদের আয়া হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাকে খবর দিল, টম সাহেব বাথরুমে ক্রাচ স্লিপ করে পড়ে গেছে, মাথা ফেটেছে, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

আমি ছুটে গিয়ে দেখি সব শেষ।

এখন খবর দিয়ে জুলিকে নিয়ে আসার সমস্যা। বাড়ি এসে টেলিফোন গাইড হাতড়ে জুলি যেখানে কাজ করে সেই নামের কোনো নার্সিং হোমের নাম চোখে পড়ল না।....একদিন জিজ্ঞাসা করতে জুলি মাইল দুই দূরের একটা রাস্তার নাম করেছিল। তক্ষুনি বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি ধরলাম। কিন্তু সেই রাস্তা যদি বা পেলাম, সেখানে নার্সিং হোমের কোনো হদিস মিলল না।

সেই রাতে সাড়ে বারোটার মধ্যেই জুলি ঘরে ফিরল। দুশ্চিন্তা নিয়ে গেছল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরেছে।

তারপর জুলি পাথর দিনকতক। তার যেন জীবনের সব প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সেদিন আমার কাছে চুপচাপ বসেছিল জুলি। হঠাৎ মনে পড়তে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তোমার সেই নার্সিং হোমটা ঠিক কোথায় বলো তো, সেদিন খুঁজেই পেলাম না—

একটু চুপ করে থেকে জুলি ঠাণ্ডা জবাব দিল, নেই....পাবে কোথা থেকে !

আমি বিমূঢ় প্রথম। তারপরেই বিষম ধাক্কা।

ঠাণ্ডা দু'চোখ আমার মুখের ওপর রাখল জুলি, নিরুত্তাপ গলায় বলল, আমাকে এখন যত খুশি ঘৃণা করতে পার তোমরা, আমি ঘৃণার যোগ্য।....টমকে সুখে রাখব, তার সঙ্গে সুখে থাকব, এর থেকে দুনিয়ায় আর কোনো কিছুই বড় করে দেখিনি আমি....ওই একদিকে লক্ষ্য রেখে শেষে এই ঘৃণ্য পেশার মধ্যেও তলিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

জুলি হেওয়ার্ড তোমাকে আমি কোনো দিন ঘৃণা করিনি, তোমাকে আমি কোনো দিন ভুলব না।

নরম্যানের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল ডক্টরেটের থিসিস সাবমিট করার পরে। আমি মিস হীল্ মিসেস নরম্যান হয়েছিলাম। এ বিয়ে টিকবে কি টিকবে না এ-চিন্তা আমার একবারও মনে আসেনি। কিছুকাল আনন্দেই ছিলাম বেশ। কেবল ওর মিনমিনে স্বভাব আব সবেতে ওর খুঁতখুঁতে ভাব দেখে মাঝে মাঝে বকতাম ওকে। কিন্তু লোকটা যে ভালো তাতে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না। আজও নেই।

থিসিসের ফল বেরুবার আগে পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যের আগে আমি আমার গুরু, অর্থাৎ ডক্টর বোসের চেম্বারে যেতাম। যে কেস্গুলোর অ্যানালিসিস দরকার গভীর মনোযোগে সেগুলো স্টাডি করতাম, ডক্টর বোসের সঙ্গে আলোচনা করতাম, তাঁর পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের ধারা বুঝতে চেষ্টা করতাম।

থিসিসের ফল বেরুতে ডক্টর বোস আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে এবার বাড়িতে চেম্বার করতে বললেন আর বাড়তি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে রোজ একবার করে তাঁর নার্সিং হোম অ্যাটেন্ড করতে বললেন।

সোৎসাহে আমার পছন্দমতো বাড়িতে চেম্বার সাজিয়ে দিল নরম্যান। কিন্তু রোজ বিকেল সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত নার্সিং হোম অ্যাটেন্ড করা নিয়ে তার খুঁতখুঁতুনি।—আবার নার্সিং হোমে যাওয়ার কি দরকার।

কি দরকার তাকে বোঝালাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও নার্সিং হোমের প্রোগ্রাম একটুও মনঃপূত নয় দেখলাম। তখনি আমার মনের তলায় পেশার সঙ্গে পারিবারিক জীবনের খাপ খাওয়ার সুপ্ত সমস্যাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমি তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করলাম একটু। সে তাতেই হকচকিয়ে গেল যেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এতে আপত্তির কারণ কি?

মুখখানা কাঁচুমাচু করে ও যা বলল তাতে আমি নিশ্চিন্তও হলাম, হেসেও ফেললাম। বলল, তুমি এভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তোমাকে আমি কতটুকু পাব?

আমি হেসেই ভ্রূকুটি করলাম, তোমার তো আপিস থেকে বাড়ি ফিরতে পাঁচটা, আধ ঘণ্টার সবুর সইবে না?

—তারপর তো চেম্বার তোমার।

—সে-ও ছ'টা থেকে আটটা, তারপর?

নরম্যানের মানসিক কিছু একটা বাধা স্পষ্ট হয়ে উঠল ডক্টর বোসের দাক্ষিণ্যে আমার বিলেত যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক হতে। ওর দস্তুরমতো আপত্তি। কোনো যুক্তি শুনতে চায় না, কেবল বলে কি দরকার। সেই সঙ্গে মুখখানা এমন করতে লাগল যেন ছ'টা মাস ছ'টা বছর ওর কাছে।

শেষে আমি ধমকেই উঠলাম ওকে। বললাম, আমার ব্যাপারে তুমি এভাবে বাধা দিতে চেষ্টা করলে তো বিপদ হবে। একবারটি ঘুরে এলে কত বড় হবার সুযোগ পাব বুঝছ না কেন!

....ও ঠিকই বুঝেছিল, আসলে আমিই বুঝিনি। বুঝিনি যে ঠিক এই জন্যেই ওর আপত্তি। আমি বড় হব, ওর থেকেও মাথা উঁচিয়ে উঠব এটাই ওর ভয়, এ-ই ওর

কমপ্লেক্স।

বিলেত থেকে ফিরতে ছ' মাসের জায়গায় আট মাস হয়েছিল।

তারপর থেকে দিনে দিনে অশান্তি বেড়েছে। আমার পেসেন্ট বাড়ছে, পেশা-সংশ্লিষ্ট আলোচনার আসরে আমার ডাক পড়ছে, মেডিক্যাল জার্নালে লেখার জন্যে আমার আমন্ত্রণ আসছে—এ সব যেন ওর কিছুই পছন্দ নয়। ওর এই আচরণে আমি অনেক সময় অবাক হতাম, অনেক সময় বিরক্তও।

একদিন চরম ফয়সলা হয়ে গেল। উপলক্ষ তুচ্ছ, কিন্তু আমার পেশায় এই লোকের সঙ্গে পারিবারিক জীবন মিশবে না, ওই তুচ্ছ উপলক্ষে সেটা সন্দেহাতীত ভাবে স্পষ্ট হয়ে গেল।

রাশিয়ার একজন মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ দিল্লিতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করা আর কথা বলার লোভে আমার দিল্লিতে ছোটার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ডক্টর বোস জানালেন দুই একদিনের জন্যে উনি কলকাতায় আসবেন—তখন তাঁর বাড়িতেই একটা সিমপোসিয়াম্ গোছের অনুষ্ঠান করা যাবে।

সেদিন সকালে কি একটা কাজে বেরিয়েছিলাম আমি। ফিরে এসে দেখলাম নরম্যান আপিসে যায়নি, কাগজ পড়ছে। জিজ্ঞাসা করতে বলল, শরীরটা ভালো লাগছে না, আপিসে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে আজ যাবে না।

দুপুরে নরম্যানের হঠাৎ ঝোঁক চাপল আমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। ওর হাব-ভাব কেমন বদলাচ্ছে অনুভব করেই যতটা সম্ভব ওকে আমি খুশি রাখতে চেষ্টা করি। আপত্তি না করে গেলাম। একদিন নার্সিং হোমের হাজিরা বাদ পড়বে। দুপুরের শো, ছ'টায় চেম্বার আওয়ার্স-এর মধ্যেই ফিরতে পারব।

পরদিন বিকেলে নার্সিং হোমে ডক্টর বোসের সঙ্গে দেখা হতে অনুযোগের সুরে উনি যা বললেন শুনে আমি স্তব্ধ।....গতকাল সকালে উনি বাড়িতে টেলিফোন করেছিলেন। আমি নেই শুনে নরম্যানকে দরকারি খবরটা আমি ফেরা-মাত্র আমাকে জানাবার কথা বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন। রাশিয়ার মনস্তত্ত্ববিদ কলকাতায় এসেছেন, গতকাল দুপুর তিনটের সময় ডক্টর বোসের বাড়িতে সিম্পোসিয়াম—খবর এই। শুনলাম এক আমি ছাড়া এ-লাইনের আর সকলেই এসেছিল কাল। আমাকে অনুপস্থিত দেখে ডক্টর বোস বেলা সাড়ে তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে বার তিনেক বাড়িতে টেলিফোন করেছিলেন। সাড়া না পেয়ে শেষে ক্ষান্ত হয়েছেন।

বাড়ি ফিরলাম। মনের তলায় একটা শেষের সুর বাজছে বলেই স্থির, ঠাণ্ডা আমি। নরম্যানের সামনে এসে দাঁড়ালাম।—কাল সকালে আমি যখন একটু বেরিয়েছিলাম তখন ডক্টর বোস টেলিফোনে একটা জরুরী খবর আমাকে জানাতে বলেছিলেন?

মনে করার ভান করল।—ও, হ্যাঁ....তোমাকে বলতে ভুলে গেছলাম।

আমি স্থির চেয়ে আছি। ও আমার দিকে ভালো করে তাকাতে পারছে না।—আমাকে বলতে ভুলে গিয়ে আপিস বন্ধ করে সিনেমায় যাওয়া ঠিক করলে?....পাছে তোমার ভুলে যাওয়াটা আবার টেলিফোনে কেউ মাটি করে দেয়, এই জন্যে?

অনেক দিনের রুদ্ধ তাপ হঠাৎ বেরিয়ে এলো যেন। বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যে! ঘরের থেকে তোমার বাইরেটা বড় হয়ে উঠবে এ আমি চাইনে চাইনে চাইনে!

না, তারপর আর কিছু গণ্ডগোল হয়নি। খুব ঠাণ্ডাভাবেই বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

আমার জীবন-বাস্তব আর যৌবন-বাস্তবের দ্বিতীয় পুরুষ জোসেফ—জোসেফ উড্। নামজাদা এক বিলিতি ওষুধের কোম্পানির পূর্বাঞ্চলের চীফ রিপ্রেজেনটেটিভ। মোটা মাইনের চাকরি। চৌকস চালাক-চতুর মানুষ। চোখে মুখে কথা বলে। আমার প্র্যাকটিস শুরু থেকেই তার সঙ্গে আলাপ। মাঝে মাঝে ডক্টর বোসের কাছে আসে, নার্সিং হোমে আসে, আমাদের বাড়িতেও দু'তিনদিন এসেছিল। আমাদের বলতে বিচ্ছেদের আগে আমার আর নরম্যানের বাড়িতে। ওর গাড়ি আছে একটা, রাস্তায় দেখা হতে দিন দুই আমাকে লিফ্ট্ও দিয়েছে।

নরম্যানের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাবার পর এই লোক কেমন করে অল্প সময়ের মধ্যে আমার ওপর দখল বিস্তার করে বসল সেই মামুলী প্রসঙ্গ থাক। পেশার সঙ্গে পারিবারিক জীবন খাপ খাবে কিনা এই সমস্যা যখন প্রথম বিয়ের আগেই মাথায় ঢুকেছিল, তখন সংসার যে আমারও হবে সে তো ধরেই নিয়েছিলাম। আর, নরম্যানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবার পরেও সে-আশা বা লোভ একেবারে বাতিল করে দিতে পারিনি। মোট কথা এর পরের অধ্যায়ে আমি মিসেস্ হীল্ডা উড্ হয়েছি।

এই মানুষটা বেপরোয়া প্রকৃতির। সত্যি বলতে কি, গোড়ায় গোড়ায় এই জন্যেই ওকে আরো বেশি ভালো লাগত। আর, ওর প্রতি আমার আরো একটু দুর্বলতা ছিল এই জন্যে যে ওর ঘরে যাবার পর থেকেই আমার প্র্যাকটিস অনেক বেড়ে গেছল।

কিন্তু এই বিয়েও দেড় বছরের মধ্যেই ভেঙেছে।

এটা আমি আশা করিনি। ওর যা পেশা, তাতে মানুষটা যাকে বলে প্র্যাকটিক্যাল হবে ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন না যেতে এরও যে ভেতর বিগড়োতে শুরু করেছে আগে বুঝতে পারিনি।

আমার পসার দেখে গোড়ায় গোড়ায় ঠাট্টা করত, সমস্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে এ এক ভাঁওতাবাজীর ব্যবসা বটে—কথা বলে আর গল্প করে রোগ সারাব। এর পর কবে শুনব কেউ গান গেয়ে রোগ সারাচ্ছে, কেউ নাচ দেখিয়ে।

ঠাট্টাকে ঠাট্টা বলে মেনে নেবার মত উদারতার অভাব ছিল না আমার। আমি হাসতাম, ফিরে টীকাটিপ্পনী কাটতাম। কিন্তু ক্রমশ এই ঠাট্টা-বিদ্রূপ যেন বাঁকা রাস্তায় চলতে লাগল। একদিন বলল মেয়ের থেকে তোমার পুরুষ পেসেন্টই দিনকে দিন বাড়ছে দেখছি। তারপর হাসি, একলা ঘরে দরজা বন্ধ করে এক ঘণ্টার নির্জন আলাপে রোগ সারবে না তো কি! আমারই রোগী হতে সাধ যাচ্ছে!

রোগ যে ওর মধ্যে বাসা বেঁধেইছে তখনো বুঝিনি। ফিরে ঠাট্টা করেছি, আমার রোগী না আর কারো?

ও বলেছে, তোমার কাছে যা ভিড়, ঠাঁই মেলা শক্ত হবে।

না, আমি তখনো রাগ করিনি, তখনো আমার মনে কোনো সংশয়ের ছায়াপাত ঘটেনি।

তাছাড়া ঠাট্টা হোক বা যা-ই হোক কথাটা খুব মিথ্যে বলেনি। দিন দিন রোগীর সংখ্যা আমার বাড়ছেই আর তার মধ্যে পুরুষ রোগী দ্বিগুণেরও বেশিই বটে। এর মধ্যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আকর্ষণের ব্যাপারও যে একটু-আধটু নেই এ-কথা হলপ করে বলতে পারব না। এর মধ্যে অনেক পেসেন্ট আছে যার সীটিং-এর মেয়াদ ফুরোলে মুখ বেজার করে উঠে যায়, আর তারপর আবার যেদিন ডেট্ সেই দিনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। রোগীর রোগ সারানোর ব্যাপারে এতে আমার সুবিধেই হয়। এ-সব রোগে রোগীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্যতা স্থাপন, যাকে আমরা মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের ভাষায় বলি 'র‍্যাপোর্ট'—তার অবশ্য প্রয়োজন। অতএব কোনো পেসেন্টের এই গোছের একটু-আধটু স্বাভাবিক দুর্বলতা আমার চিকিৎসার ব্যাপারে কোনো সমস্যাই নয়।

কিন্তু স্মার্ট সুশ্রী মেয়ে মনোবিজ্ঞানী বলেই যে আমার কাছে এত রোগীর ভিড় তা আমি মনে করি না। এ অনেক কারণের একটা হতে পারে। এই বিদ্যায় আমার শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার পিছনে বিলিতি ডিপ্লোমার ছাপ আছে। তার থেকেও বড় কথা, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন আমার গুরু ডক্টর বোস—এই রোগের চিকিৎসায় যিনি সমস্ত ভারতের মধ্যে নামী মানুষ। তাছাড়া তিনতিনটে ভাষা রপ্ত আমার—বাঙালি পেসেন্টের সঙ্গে বাংলা বলি, অবাঙালি পেসেন্টের সঙ্গে হিন্দি, আর যারা হিন্দি বোঝে না তাদের সঙ্গে ইংরেজি। কাজও করি যতখানি সম্ভব নিষ্ঠা সহকারে—আমার পসার হবে না-ই বা কেন?

ঘরের লোকের একটা ব্যতিক্রম ইদানীং আমি লক্ষ্য করছিলাম। মাসের মধ্যে সাত-আটদিন অন্তত বাইরে ট্যুর থাকে তার। বেশিও থাকে।

এই ট্যুর-প্রোগ্রাম পড়লেই দু'তিনদিন আগে থাকতে মেজাজ বিগড়োতে শুরু করে তার। কথাবার্তা, আচরণ সব রুক্ষ হয়ে ওঠে। চাকর-বাকরগুলো অকারণে ধমক-ধামক খায়—আর আমারও সঙ্গে যেন একটু বেশি ঠেস দিয়ে কথা বলে।

....আমার পেশা যে এই পারিবারিক জীবনেও খাপ খেল না সেটা আচমকা স্পষ্ট হয়ে গেল দেড় বছরের মাথায়। জোসেফের একটা পেয়ারের চাকর ছিল, নাম লছমন। কিছুদিন ধরে ওকে বেশ উতলা আর বিমর্ষ দেখতাম। আগের রাতে ওর মনিব ট্যুরে বেরুবার পরদিন লছমন এসে আমাকে জানাল, সেইদিনই ও দেশে চলে যাবে, আর এখানে কাজ করবে না, ওর এ-মাসের ক'দিনের তলব মেলে ভালো, না মেলে তো তলব ছেড়েই চলে যাবে।

আমি অবাক।—কেন, কি হয়েছে?

প্রথমে বলতে চায় না। পরে আমার পীড়াপীড়িতে যা বলল শুনে আমি স্তব্ধ একেবারে।....ও চলে যেতে চাচ্ছে ভয়ে, সাহেবের মাথা বিগড়েছে বলে। মেমসাহেবকে অর্থাৎ আমাকে ভয়ানক সন্দেহ করে ওর সাহেব। অনেকদিন ধরেই ওর ওপর হুকুম সাহেব না থাকলে বাড়িতে মেমসাহেবের কাছে কে আসে না আসে কড়া নজর রাখতে

হবে—আর সাহেব ট্যুরে বেরুলে মেমসাহেব কখন কোথায় যায় না-যায় মাথা খাটিয়ে সেটা জেনে নিতে হবে, পরে সত্যিই সেখানে গেছে কিনা কোনো দরকারের অছিলায় টেলিফোন করে জেনে নিতে হবে। জোয়ান বয়সের পুরুষ রোগীরা ওই দরজা-বন্ধ ঘরে কে কতক্ষণ থাকে ঘড়ি ধরে তার হিসেব দাখিল করতে হবে। আর শাসিয়েছে, ঠিক ঠিক হুকুম তামিল না করতে পারলে বা মেমসাহেব ঘুণাক্ষরে কিছু টের পেলে ওর গায়ের ছাল-চামড়া বলে কিছু থাকবে না। অনেক দিন ধরে লছমন এই কাজই করে আসছে। কিন্তু সাহেবের মাথা দিনে দিনে আরো বেশি বিগড়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে রাগ বাড়ছে, শাসানি বাড়ছে। এই পরশু রাতেও মেমসাহেবের সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করতে ও ঠিক-মতো জবাব দিতে পারেনি বলে তার গালে ঠাস করে এক চড়। তখনই লছমন ঠিক করেছে এখানে আর কাজ করবে না, সাহেব ট্যুরে বেরুলেই ও চলে যাবে।

আমি ওকে আটকাতে চেষ্টা করিনি। পুরো মাসের মাইনে দিয়েই ওকে বিদায় করেছি। তারপর ডক্টর বোসের কাছে এসে তাঁকে সব বলেছি। এ বিয়েও এত তাড়াতাড়ি ভেঙে দেব সেটা তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। তাঁর সংস্কার আমি বুঝি, কিন্তু আমার পেশার সঙ্গে পারিবারিক জীবন খাপ খাবে না—এ চিন্তা একবার মাথায় ঢুকলে আর আমি কিছুতে আপস করতে পারি না। অগত্যা ডক্টর বোস তাঁর চেম্বারের ওপরতলার দুখানা ঘর আমাকে ছেড়ে দিলেন। সেই দিনই আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে ও-বাড়ি তালাবন্ধ করে চলে এলাম। পরদিন কাগজে আমার ঠিকানা বদলের বিজ্ঞাপন দিলাম, আর প্রত্যেক পেসেন্টের কাছে টাইপ-করা চিঠি ছাড়লাম।

কাগজে আমার ঠিকানা বদলের বিজ্ঞাপন দেখে হোক বা যে-কারণে হোক, নির্দিষ্ট সময়ের দিনকতক আগেই ট্যুর থেকে ফিরে এসেছিল জোসেফ উড্। আমি শুধু তার বাড়ির চাবি ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিতর্কের মধ্যে ঢুকতে চাইনি। কিন্তু ও নরম্যান নয়, অত সহজে ছাড়ার পাত্রও নয়। প্রথমে রাগে ফেটে পড়তে চাইল। তারপর অনুতাপ প্রকাশ করল। তখনো আমার মনে হল, ক্রূর দুটো চোখে খাঁচায়-পোরা জন্তুর তাপ। মনে হল, ছলে-কৌশলে একবার আমাকে ওর দখলের আওতার মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চায়। অনুতাপেও কাজ হল না দেখে আবার স্ব-মূর্তি ধরল। সুশ্রী পুরুষের এমন কুৎসিত মুখ আমি বোধ হয় আর দেখিনি। গজরাল, শাসাল, আমাকে দেখে নেবে বলে গেল। ডক্টর বোসের আশ্রয়ে না থাকলে হামলা যে করত সন্দেহ নেই। এখানে থাকা সত্ত্বেও সে-চেষ্টা করেছিল। আর ডক্টর বোসের স্ত্রীর কাছে নোংরা উড়ো চিঠি পাঠিয়েছিল, তাঁর স্বামীর সঙ্গে অসৎ সম্পর্কের দরুনই নাকি আমি দু'দুটো বিয়ে বাতিল করে এখন সম্পূর্ণ তাঁর স্বামীর হেপাজতে আছি।

ডক্টর বোসের বয়স কম করে সত্তর। চার বছর আগে তাঁর স্ত্রী বিগত হয়েছেন। চিঠিটা তিনি আমার হাতে দিয়েছেন আর হা-হা করে হেসেছেন। আমি লজ্জা পেয়েছি আর রাগে ফুঁসেছি।

আদালতে এ বিয়ে নাকচ করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে আর সময়ও লেগেছে। নিজের অনুকূলে রায় পাবার চেষ্টার ত্রুটি করেনি জোসেফ উড্। আর, সেই রায় আমার

অনুকূলে বেরুবার পরেও দেখে নেবে বলে শাসিয়েছে।

না, কিছুই করতে পারেনি। তবু অনেক দিন পর্যন্ত ওকে নিয়ে আমার ভেতরে-ভেতরে এক ধরনের আতঙ্ক ছিল। ডক্টর বোসের পাঠানো রোগী ভিন্ন জোয়ান বয়সের পুরুষ পেসেন্ট নেবার ব্যাপারে আমি রীতিমতো সতর্ক থাকতাম। লোকটার অসাধ্য কর্ম নেই, মতলব এঁটে কাউকে রোগী সাজিয়ে পাঠানোও বিচিত্র নয়। এ-কারণে মনে একটু খটকা লাগলেই সেই পুরুষ পেসেন্ট বাতিল করে দিতাম।

বছর তিনেক নিরুপদ্রবে কেটে যেতে ও-ভয় আপনা থেকেই মুছে গেল।

দু'দুটো বিঘ্ন কাটিয়ে আবার পিতৃ-পিতামহর পদবী বহন করেছি আমি। হিল্‌ডা হীল্। আর কখনো এ পদবী বদল হবে ভাবি না। মনের তলায় কখনো সে-সম্ভাবনার চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিলে তখুনি সেটা সমূলে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করি।

সদ্য বর্তমানে বয়েস আমার একত্রিশ। আজকাল দেখি অনেক সমাজেই ওই বয়সে অনেক মেয়ের নতুন বিয়ে হয়। আমাদের সমাজে তো হয়ই। তাই আবার সংসারী হবার পক্ষে ও-বয়েসটা কোনো বাধাই নয়। আমার পক্ষে তো নয়ই। আমার দেহের বাঁধুনি এতটুকু শিথিল হয়নি। এই কিছুদিন আগেও ডক্টর বোসের সিনিয়র অ্যাসিসট্যান্ট প্রশংসার ছলে ঠাট্টা করেছিল, বয়েসটা এখনো নাকি সেই বাইশ-তেইশেই আটকে আছে।

আমি নিজেই অনুভব করি এর সবটুকু চাটুবাক্য নয়। তা ছাড়া এই চিকিৎসায় আমার নামডাক হয়েছে একটু, নিজের গাড়ি আছে. মাস গেলে উপার্জনের একটা মোটা অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে। আমি আবার ঘর করব ঠিক করলে তিন দিনের মধ্যেই তার ব্যবস্থা হতে পারে।

কিন্তু দু'দুবার ঘা খাবার ফলে ঘর-পোড়া গোরুর দশা আমার। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। এই তিন বছরের মধ্যে অনেকে কাছে আসতে চেষ্টা করেছে, এখনো করছে কেউ কেউ। আমি মুখ ফিরিয়ে থেকেছি। থাকছি।

....কিন্তু ভেতর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পেরেছি কি? পারছি কি?

আমি জানি না।আমার সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয়, যে-চিন্তার মূলসুদ্ধু আমি উপড়ে ফেলেছি ভাবি, তার একটু-আধটু টুকরো ভেতরে থেকেই গেছে। পেশার সঙ্গে সার্থকভাবে পারিবারিক জীবন মেশাতে পারার তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা আমার মনের তলায় আজও বুঝি কোথাও বাসা বেঁধে আছে। আমি সেটা খুঁজি, ভাঙার তাড়না অনুভব করি।

ছ' মাস হল ডক্টর বোসের ব্যবস্থামতো তাঁর নার্সিং হোমের তিনতলার সবটুকু দখল করে আছি। এই ছ' মাসে বহু রোগীর মধ্যে দুটি মাত্র মুখ আমার মনের ওপর বিশেষ করে ছাপ ফেলেছে। দুজনকেই ডক্টর বোস পাঠিয়েছিলেন। তাদের একজনকে দেখলে আমার যেমন আনন্দ, আর একজনকে দেখলে তেমনি অস্বস্তি।

....ডক্টর বোস একদিন নিজে আমাকে টেলিফোনে বললেন, আমার এক ছেলেবেলার বন্ধুকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি, খুব পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু বড় গরীব, আমার কেমন

ধারণা হল তুমি তাকে চিনবে....বহুকাল আগে তার স্ত্রী তাকে একবার অপমান করেছিল, এখনো সেটা মাথায় ঢুকে বসে আছে। দেখো কিছু করতে পারো কিনা। আরো জানালেন, বহু বছর বাদে রাস্তায় দেখা তার সঙ্গে, গাড়িতে তুলে নিয়ে ডক্টর বোস তাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছলেন—সেখানে তার স্ত্রী যখন শুনলেন স্বামীর বন্ধু এই লাইনের বড় ডাক্তার তখন তিনি তাঁর কাছে এসে কেঁদে পড়লেন একেবারে। ডক্টর বোস তখনই জানতে পারলেন বন্ধুর মাথায় কিছু একটা গণ্ডগোল চেপে বসে আছে। মাঝে মাঝে বেশ কিছুকাল সুস্থ থাকে আবার হঠাৎ এক-সময় বিগড়ে যায়। এই করে বহু বছর কেটে গেছে।

ডক্টর বোসের বন্ধু আসা-মাত্র আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম একেবারে। আমার ভেতরে-ভেতরে খুশির উত্তেজনা একটা। এই মানুষকে দেখব আমি কল্পনাও করিনি।

....আমার সেই বাংলার মাস্টারমশাই। সমস্ত চুল রেশমের মতো সাদা, মুখে বার্ধক্যের হিজিবিজি ভাঁজ—তবু দেখা-মাত্র আমি চিনেছি। এই মানুষ আমার স্মৃতিতে কত উঁচু আসনে বসে আছেন, এতকাল বাদে আবার তাঁকে দেখার পর অনুভব করলাম। মনে হল, আমি আজ যা তার অনেকটাই শুধু এই মানুষটির জন্য।

কিন্তু মাস্টারমশাই আমাকে একটুও চিনতে পারলেন না। না পারারই কথা। খুব সুস্থ মাথা নন যখন, এতবছর বাদে দেখে কি করেই বা চিনবেন।

সাদরে তাঁকে আমার চেম্বারে এনে বসালাম। আর সেই ফাঁকে আমার মাথায় কি মতলব এল, এই প্রথম আমি একজন বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজীতে কথাবার্তা শুরু করলাম। যিনি আমাকে বাংলা শিখিয়েছেন, আর যিনি ভারতীয় ভাবতে শিখিয়েছেন আমাকে—তাঁরই সঙ্গে।

ভুরু কুঁচকে ঘরের চারদিক দেখলেন একবার। তারপর ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানকার সাইকো-অ্যানালিস্ট ?

আমি হাসিমুখে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলাম।

এবার তিনিও হেসে উঠলেন, বললেন, বোসটা একটা পাগল, তোমার কাছে আমাকে পাঠাতে গেল কেন ? আমার সঙ্গে দিনকতক গল্প করে তুমি তাকে কি রিপোর্ট দেবে ?

আমি সপ্রতিভ জবাব দিলাম, সেটা গল্প করার পরে ঠিক হবে।

উনি হাসতে লাগলেন, না....বলছিলাম তুমি তো দেখছি একটা বাচ্চা মেয়ে। হঠাৎ আবার কি মনে পড়ল।—তোমাকে তো ফী দিতে হবে ?

আমি মাথা নাড়লাম, দিতে হবে না।

তিনি বিস্মিত।—কেন ? বোসের সঙ্গে তোমার মাস-মাইনের ব্যবস্থা নাকি ?

নিরুপায় হয়েই মিথ্যের আশ্রয় নিলাম।—তাঁর কেস্ হলে তাই।

তবু চিন্তিত তিনি।—দেখ তো, আমাকে নিয়ে আবার টানাহেঁচড়া কেন ! যাক, বল কি করতে হবে আমাকে—

—প্রথমে এক পেয়ালা চা আর একটু জলখাবার খেতে হবে।

বেয়ারার উদ্দেশে বেল টিপলাম। ঘরে এসে বসার আগেই তাকে চা-জলখাবারের কথা বলে রেখেছিলাম। সে ট্রে হাতে করেই ঘরে ঢুকল। মাস্টারমশাই খুশিও, অবাকও।—বাঃ! বেশ মেয়ে তো তুমি, গাঁটের পয়সা খরচ করে পেসেন্টকে চা-জলখাবার খাওয়াও! না বাপু, বোসকে বলে দিও আমি আর আসব না—সর্বদিকে লোকসান তোমাদের।

বেগতিক দেখে এবারে আমি এক কাণ্ড করলাম। উঠে কাছে গিয়ে ঠিক বাঙালী মেয়ের মতই পায়ের ধুলো নিলাম তাঁর। তারপর ওঁর বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললাম, আপনার কথা মনে হলে নিজের দু'হাত জোড় করে আমি কপালে ঠেকাই, আর আপনি আমাকে চিনতেও পারলেন না মাস্টারমশাই?

বিস্ময় আর আনন্দের এমন মাধুর্য আর বোধ হয় দেখিনি।—কি কাণ্ড! অ্যাঁ! তুমি—তুমি হিলডা? তুমি আমার সেই হিলডা হীল্! আনন্দে চোখে জল এসে গেল তাঁর।—তাই তো গো, তুমি তো সেই মেয়েই বটে, আর আমি এতক্ষণের মধ্যে চিনতে পারলাম না। আমার মাথাটা সত্যিই গেছে দেখছি, অথচ এখনো আমি তোমার কথা কত লোককে বলি....কেন, সেদিন তো বোসের কাছেও বলেছিলাম তোমার কথা, দুষ্টুটা এই মজা করার জন্যেই আমাকে কিচ্ছুটি বলেনি।

এরপর ডেট্ অনুযায়ী সাগ্রহেই এসেছেন উনি। স্ত্রীর যে অপমান ভুলতে না পারার দরুন তাঁর এই অবস্থা, তার মহৎ আর বৃহৎ দিকটা আমি কোনোদিনও ভুলব না।....আমার মা তাঁকে মাইনে দিতেন পঁয়ত্রিশ টাকা। একটা বিজাতীয় ছোট মেয়ের বাংলা শেখার আগ্রহ দেখে আর কান্না দেখে পঁচাত্তর টাকার টিউশন এক বন্ধুকে গছিয়ে নিজে এই পঁয়ত্রিশ টাকার টিউশন নিয়েছেন, মাসকাবারে এ-খবর জেনেছিলেন শুধু তাঁর স্ত্রী। অভাবের সংসার, তাঁর স্ত্রীর দোষ নেই, এই ঘাটতি দেখে তাঁর মাথায় আগুন জ্বলেছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল ওই ফিরিঙ্গী মেয়ের মায়ের মোহে পড়েছে নিশ্চয় তাঁর স্বামী, নইলে টানাটানির সংসারে নিজের এত বড় ক্ষতিও কেউ করে। এই রাগে স্বামীর ওপর অনেক দিন অনেক ঘৃণ্য কটূক্তি বর্ষণ করেছেন তিনি। আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে বেরুবার পর ওঁর ছুটি হয়ে যেতেও তাঁর স্ত্রী সে-রাগ ভোলেননি, জিজ্ঞেস করেছেন, এখন আর কোন্ ছুতোয় রূপ দেখতে যাবে সেখানে, মাথা খাটিয়ে ফন্দিফিকির বার করো কিছু।

দিন চারেক্ সীটিং-এর পর একদিন মাস্টারমশাইকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে ড্রাইভ করে সোজা তাঁর বাড়ি এসে হাজির হলাম আমি। ডক্টর বোসের মুখে শুনেছিলাম নিজের ব্যবহারের দরুন মাস্টার মশাইয়ের স্ত্রী এমনিতেই সর্বদা অনুতপ্ত। বাড়ি গিয়ে আমি তাঁকে মা বলে ডাকলাম, প্রণাম করলাম, আর বললাম, মাগো, আমি তোমাদের সেই ফিরিঙ্গী মেয়ে, যাকে অসীম করুণায় মাস্টার মশাই জীবনের পথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন।

ভদ্রমহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছেন। আর অদূরে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাই শুধু হেসেছেন। সেই হাসি দেখা-মাত্র আমার স্থির ধারণা হয়েছে,

মাস্টারমশাইয়ের চিকিৎসার দরকার হবে না।

গত ছ' মাসের মধ্যে যে দুটি মুখ আমার মনের ওপর বিশেষ ছাপ ফেলেছে বলেছি, তার আর একজন মাইকেল।

রবিন মাইকেল।

কিন্তু এ ছাপ সুখ ছেড়ে স্বস্তিরও নয় আদৌ।

প্রথম দেখেই লোকটাকে ভালো লাগেনি আমার। ডক্টর বোস না পাঠালে এ কেস্ আমি নিতাম কিনা সন্দেহ। অবশ্য এ কেস্-এর পেছনে কোনো স্পেশাল রেকমেনডেশান ছিল না, আর পাঁচটা কেস্ যেমন পাঠান তেমনি পাঠিয়েছেন।

দেশ গোয়া। বয়েস লেখাল চল্লিশ। আর একটু বেশি মনে হয়। চওড়া কাঁধ, চওড়া বুকের ছাতি। কপালটাও চওড়া। লম্বা প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি। দেখলেই বোঝা যায় গায়ে শক্তি রাখে। শরীরের তুলনায় চোখ দুটো ছোট। ওই চোখ দুটো দেখেই হয়ত রোগী হিসেবে লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। অত চকচকে চোখ আমি বেশি দেখিনি। আর সেই চোখে হিংসা যন্ত্রণা সংশয় সব যেন একসঙ্গে ফুটে বেরুচ্ছে। গায়ের রং একটু কালোর দিকে ঘেঁষা তামাটে। পরিপুষ্ট হাতের যতটুকু দেখা যায়, লম্বা ঘন কালো লোম গিজগিজ করছে।

নিজের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট বিজনেস। গোয়াতে থাকে না, বছরের মধ্যে এরোপ্লেনে বহুবার বম্বে আর কলকাতায় ছোটাছুটি করে। এই দু' জায়গাতেই আপিস আছে তার। বিশ্বস্ত কর্মচারী আছে। টাকা কত আছে ঠিক বলতে পারবে না, তবে অনেক আছে। আগে হিসেব থাকত, এখন থাকে না। ভুলে যায়। কলকাতা আর বম্বে দু' জায়গাতেই নামী হোটেলে বারো মাসের জন্যে স্যুইট্ ভাড়া করা আছে তার নামে। আর কোম্পানির ছাড়াও নিজের দু' জায়গায় দুটো গাড়ি আছে, যখন যেখানে থাকে গাড়ি ছাড়া চলে না। গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে, কারণ দুনিয়ার সব ড্রাইভার শয়তান বিশ্বাসঘাতক বদমাশ।

বাঁধানো রেজিস্ট্রারে তার প্রাথমিক পরিচয় লিখছিলাম আর আড়চোখে দেখে নিচ্ছিলাম। চকচকে ধারাল দু' চোখ আমার মুখের ওপর আটকে নিয়ে সে কথা বলছিল। আমার খুব ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল আমাকেও যেন লোকটা রূঢ় যাচাইয়ের চোখে দেখে নিচ্ছে।

লেখা শেষ করে ডেট্ দিলাম। সপ্তাহে দু'দিন। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে পৌনে সাতটা।

ঠিক মনঃপূত হল না যেন। চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা আর বাড়ানো যায় না?

—কোন্‌টা, সময়?

—সময়, দিন, সব।

পেসেন্টের কথার আমরা চট্ করে প্রতিবাদ করি না। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, সপ্তাহে ক'দিন হলে আপনার সুবিধে হয়?

আমার মুখের ওপর বেশ মনোযোগ সহকারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে জবাব দিল, সাত দিনই।

ভেতরে ভেতরে আমি একটু ধাক্কা খেলাম কিনা জানি না। তার চোখে চোখ রেখে হাসিমুখেই মাথা নেড়ে জানালাম, সপ্তাহে তিন দিনের বেশি আমরা কাউকে সীটিং দিই না, পরে দরকার বুঝলে আর একদিন বাড়ানো যাবে।

ঈষৎ অসহিষ্ণু মুখে সে বলে উঠল, আমার ক'দিন দরকার আপনারা বুঝবেন কি করে?....আমি যদি ওই সাত দিনই ডবল ফী দিই?

আমার মনে হতে লাগল এই পেসেন্ট জ্বালাবে আমাকে। একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার চিকিৎসা আপনি করবেন, না আমরা করব?

....ডক্টর বোস বলেছেন, এখন কিছুকাল আপনি করবেন, পরে রেজাল্ট আর রিপোর্ট বুঝে উনি করবেন।

—তাহলে যা বললাম সেই ভাবে শুরু করুন, পরে দরকার বুঝলে দিন বাড়ানোর কথা আমিই ভাবব।

—ও, কে। বিরক্ত মুখে হাল ছেড়ে রাজী হল।—আপনার ফী কত?

বললাম।

মনে মনে একটু চিন্তা করে পকেট থেকে মোটা চেক-বই বার করল। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে কলম পেল না।—পেন প্লীজ।

কলম এগিয়ে দিলাম।

—থ্যাঙ্কস্। খস-খস করে চেক লিখল। নাম সই করল। চেকটা বই থেকে ছিঁড়ে আমার হাতে দিয়ে কলমটা নিজের পকেটে গুঁজল।

চেকের দিকে না তাকিয়ে আমি বললাম, পেনটা আমার।

হঠাৎ বিমূঢ় একটু। পকেট থেকে কলমটা তুলে নিয়ে দেখল একবার। আমার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিল।—আই অ্যাম সরি।

এবারে চেকটার দিকে চোখ পড়তে আমি হতভম্ব। আমার ফী-এর বহুগুণ বেশি টাকার অঙ্ক লেখা চেক-এ।

—এ কী?

জবাব দিল, বেশি চেক সই করতে আমার বিরক্তি ধরে, অফিসিয়াল চেকও সেই জন্যে আজকাল আমি সই করি না, এখানকার চেক স্যান্ডাল সই করে আর বম্বের চেক ফিলিপ সই করে, ওদের আমি সেই পাওয়ার দিয়েছি আর চুরি করলে খুন করব বলেছি—দে নো আ-অ্যাম এ কীলার। আপনাকে আমি তিন মাসের ফী একবারে লিখে দিলাম, ইউ গিভ মি এ রিসিট দ্যাট ওয়ে ফর মাই রেকর্ড।

লোকটার প্রতি আমার কৌতূহল বাড়ছে, আবার কি রকম যেন একটু অস্বস্তিও বোধ করছি। বললাম, এভাবে অ্যাডভান্স ফী নিতে আমরা অভ্যস্ত নই, তাছাড়া তিন মাস সময় আপনার না-ও লাগতে পারে বা তার আগে আপনি নিজেও ডিস্‌কন্‌টিনিউ করতে পারেন....

সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট চোখ দুটো থেকে রাগ যেন ছিটকে বেরুতে লাগল। বলে উঠল, আই নেভার ডিস্‌কন্‌টিনিউ—আমি কাউকে বাতিল করি না—রাদার লেডীজ ডু দ্যাট, তারা খুব চতুরভাবে আমাকে বাতিল করে থাকে—আন্ডারস্ট্যান্ড?

আর না ঘাঁটিয়ে চুপচাপ তিন মাসের অ্যাডভ্যান্স ফী-এর রিসিট লিখে দিলাম। উঠে গটমট করে চলে গেল। যাবার আগে কোনোরকম সম্ভাষণ জানাল না।

রিসিট লিখে দেবার পর আমার অস্বস্তি আরো বাড়ল যেন। এর আগে আর কোনো পেসেন্ট নিয়ে কখনো এ-রকম মনে হয়নি। বিকেলে ডক্টর বোস আসতে বললাম, আপনি তো আজ এক আচ্ছা পেসেন্ট পাঠিয়েছেন দেখি।

ডক্টর বোস হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, রবিন মাইকেল? কি করেছে?

আদ্যোপান্ত বললাম। শুনেও তিনি হাসিমুখেই পরামর্শ দিলেন, একটু ট্যাক্টফুলি ডিল করো, আই থিঙ্ক ইউ উইল ফাইন্ড এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস ইন হিম।....আর ও যখন আসবে আর যতক্ষণ থাকবে তোমার দুটো বেয়ারাকেই চেম্বারের কাছাকাছি বসিয়ে রেখো, ভয়ের কিছু নেই, তবু সাবধান হওয়া ভালো।

আমি লজ্জা পেলাম একটু, কিন্তু আশ্চর্য, সাবধান হওয়া ভালো মনে করা সত্ত্বেও এই কেস তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছেন। এই নার্সিং হোমে না হোক কলকাতা শহরে পুরুষ অ্যানালিস্ট বা সিকিয়াট্রিস্ট-এর অভাব নেই।

পাছে নিজস্ব বিশ্লেষণে কোনো রকম প্রভাব এসে পড়ে তাই গোড়ায় কখনো কোনো কেস নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন না ডক্টর বোস। যা জানার বা যা বোঝার পেসেন্টকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে, বুঝি নিতে হবে। রোগী ভালো হয়ে গেলে আলোচনা করার দরকারই হয় না। ভালো না হলে তখন আলোচনা, কেস রিপোর্ট দেখা, চিকিৎসা বদলের কথা ভাবা। এ-ক্ষেত্রে সোজাসুজি পেসেন্টের কথা কিছু বললেন না তিনি, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে যে-ঘটনাটা বললেন, শুনে যেমন ভালো লাগল, রবিন মাইকেল সম্পর্কে কৌতূহলও তেমনি বেড়ে গেল আমার।

চিকিৎসার জন্যে রবিন মাইকেল ডক্টর বোসের কাছে এসেছে তিন সপ্তাহ আগে। তার মধ্যে ছ'দিন জোর করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে এবং ফী গুণে দিয়ে গেছে। অঢেল টাকা, ডক্টর বোস রাজী হলে পনের দিনই আসত। ওই ছ'দিনে রবিন মাইকেলের মুখে তার বিশ্বস্তজন হিসেবে দুটিমাত্র লোকের নাম শুনেছিলেন ডক্টর বোস। একজন তার কলকাতা অফিসের ম্যানেজার স্যাণ্ডাল আর একজন তার বম্বে অফিসের ম্যানেজার ফিলিপ।

যে-কারণেই হোক, পেসেন্ট সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহল হতে কলকাতার স্যাণ্ডালকে তার মালিকের অগোচরে একবার আসতে অনুরোধ করেছিলেন ডক্টর বোস। মালিক কার চিকিৎসায় আছে স্যাণ্ডাল জানত। টেলিফোন পেয়ে সাগ্রহে এসেছিল। বাঙালী, সান্যাল থেকে স্যাণ্ডাল হয়েছে। বছর ছত্তিরিশ সাঁইতিরিশ হবে বয়স। বেশ সপ্রতিভ ছেলে। মালিক-প্রসঙ্গে ডক্টর বোস কি তথ্য জানার জন্যে তাকে আসতে অনুরোধ করেছিলেন সেটা ভাঙলেন না। মালিকের প্রতি স্যাণ্ডালের শ্রদ্ধার ব্যাপারটুকু শুধু

বললেন।

বললেন, আজকের দিনে মালিককে এত শ্রদ্ধা কোনো কর্মচারী করে না বোধ হয়। স্যাণ্ডালের উক্তির মর্ম, মালিককে অনেকে খুব ভালো বলে, অনেকে খুব মন্দ বলে। ভালোর থেকে মন্দই হয়ত বেশি বলে। কারণ তার মেজাজের মুখে পড়লে অনেক রথী-মহারথী ভয়ে কাঁপে থর থর করে। কিন্তু স্যাণ্ডাল যদি মন্দ বলে তাহলে তার জিভ খসে পড়বে। কেন, সেটাই শোনার মত ঘটনা।

....আট বছর আগের কথা, স্যাণ্ডাল তখন এই অফিসের অ্যাকাউনটেন্ট। মাইনে সাড়ে তিনশ'। হঠাৎ বিষম বিপাকে পড়ে বিনা নোটিসে, বিনা খবরে, পর পর চার দিন অফিস কামাই হয়ে গেছল। একটি গরিবের মেয়েকে সে গোপনে বিয়ে করেছিল। সেই অসবর্ণ বিয়েতে ছেলের বাপ এবং মেয়ের বাপের ঘোরতর আপত্তি ছিল। স্যাণ্ডালের বাপ তাকে স্পষ্ট শাসিয়ে রেখেছিল, ওই মেয়েকে বিয়ে করলে বউ দূরে থাক, ছেলেরও আর পৈতৃক ভিটেতে জায়গা হবে না। ছেলেবেলা থেকে দুজনকে দুজনে ভালোবাসত ওরা, এই শাসানি উপেক্ষা করেই দুজনে খুব গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসেছিল।

কিন্তু গোপন থাকল না। বাপ শোনামাত্র ছেলেকে বাড়ি থেকে বার করে দিল। ওদিকে মেয়ের বাপও তাই করল। দুজনে ওরা তখন এক দিন এ-বন্ধুর বাড়ি এক দিন ও-বন্ধুর বাড়ি করে বেড়াল, আর মরীয়া হয়ে ঘর খুঁজতে লাগল। এ-ধরনের ঘটনায় বন্ধুদের আশ্রয় মেলাও শক্ত। শেষে বেহালার একটা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ষাট টাকা ভাড়ায় এক বাড়ির একটা খুপরি ঘর পেল তারা।

চার দিন বাদে হন্তদন্ত হয়ে আপিসে আসতেই মাথায় বজ্রাঘাত। তিন দিন আগে বম্বে থেকে রবিন মাইকেল এসে হাজির হঠাৎ। স্যাণ্ডালের খোঁজ করতে জানল সে নেই, কেন নেই কেউ বলতে পারল না। পরদিনও একই কথা শুনল। সঙ্গে সঙ্গে রেগে গিয়ে চাপরাসী দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠাতে বলল। সেখান থেকেও একই খবর—নেই। তারপর পরদিনও নেই শুনে সোজা বরখাস্তের হুকুম লিখে পাঠিয়ে দিল, আর ওর পরের লোককে অ্যাকাউনটেন্টের চেয়ারে বসিয়ে দিল।

চার দিন বাদে আপিসে আসতেই তখনকার ম্যানেজার বরখাস্তের নোটিস তার হাতে ধরিয়ে দিল।

তারপর একটানা ছ'ঘন্টা পায়ের নীচের মাটি দুলেছিল স্যাণ্ডালের। মালিকের সঙ্গে একবার দেখা করার চেষ্টা করতেই সে গর্জন করে দরজা থেকে বিদায় করে দিল তাকে। কিন্তু বিদায় করলেই সে বিদায় নেয় কি করে। মনে মনে আশা করে এসেছিল ম্যানেজারকে ধরে-পড়ে মাইনের থেকে কিছু অ্যাডভান্স পেতেই হবে। পেলে তবে মাসের বাকি ক'টা দিন নতুন সংসার চলবে। তার মধ্যে এই বিপত্তি।

চারদিক অন্ধকার দেখতে দেখতে মালিকের উদ্দেশে এদিকের বেয়ারার মারফৎ একটা চিরকুট লিখে পাঠাল স্যাণ্ডাল। করুণ মিনতি, মালিক যদি দয়া করে একবারটি তাকে ডেকে তার বিপদের কথা শোনার পরেও তাকে বরখাস্ত করেন তাহলে আর তার কিছু বলার থাকবে না।

ভাগ্য সদয় বলেই মালিক এবার তাকে ডেকে পাঠাল। ঘরে পা দেওয়া-মাত্র হুমকি দিয়ে উঠল, নাও হোয়াট্‌স্ ইওর স্টোরি ?

স্যাণ্ডাল তাকে আদ্যোপান্ত বলল সব। মালিক নিঃশব্দে শুনল। বিশ্বাস করল কি করল না কিছুই বোঝা গেল না। প্রথম থেকেই ওর মুখের দিকে চেয়েছিল চুপচাপ। আরো খানিক তেমনি চেয়ে থেকে হুকম দিল, কাম আফটার ফাইভ।

পাঁচটার পর আবার কাঁপতে কাঁপতে তার ঘরে গেল স্যাণ্ডাল। মালিক তখন উঠে দাঁড়িয়ে গায়ে কোট চড়াল।—কাম অন্।

তারপর আপিসসুদ্ধু লোক হাঁ হয়ে দেখল, যে-ছেলেটার চাকরি গেছে তাকে পাশে বসিয়ে সাঁ করে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল তাদের মালিক রবিন মাইকেল। স্যাণ্ডাল তখন জেগে স্বপ্ন দেখছে কিনা তাই যেন জানে না।

মার্কেটের সামনে গাড়ি থামাল। ওকে বসতে বলে নিজে নেমে গেল। দশ মিনিট বাদে ফিরল যখন পেছনের লোকের হাতে একগাদা ফুল, মিষ্টির বাক্স, তাছাড়াও লাল ফিতে জড়ানো একটা বড়সড় প্যাকেট। সেগুলো সব পেছনে তুলে দিয়ে মালিক আবার চালকের আসনে বসল।—নাও টেল মি, হয়্যার ডু ইউ লিভ।

মোহগ্রস্তের মতো স্যাণ্ডাল তাকে বেহালার রাস্তায় নিয়ে চলল।

গলিতে গাড়ি ঢোকে না। গলির মুখে গাড়ি থামিয়ে দুজনে মিলে জিনিসগুলো নিয়ে সেই খুপরি ঘরে ঢুকল। স্যাণ্ডালের বউ শিক্ষিতা আর সুশ্রীও। মাইকেল তাকে দেখে ভারি খুশি। ফুল, খাবারের বাক্স, আর উপহারের প্যাকেট সামনে রেখে চোখ পাকিয়ে বউকে বলল, তুমি এই ছোকরার চাকরিটা খেয়ে বসলে ?

কে এসেছে পরিচয় পেয়ে স্যাণ্ডালের বউয়েরও দুই চক্ষু কপালে। চা-জলখাবার খেতে খেতে মাইকেল বারকয়েক স্যাণ্ডালকে বলল, তুমি একটা স্কাউন্‌ড্রেল। আমার সুইট সিসটারকে একটা নরকে এনে তুলেছ।

হাসি-খুশির মধ্যে জলখাবারের পর্ব শেষ হতেই সে বউকে হুকুম করল, নাও গেট রেডি, এক্ষুনি তোমাদের আমার সঙ্গে বেরুতে হবে, কুইক—আমি গাড়িতে বসছি।

ওরা গাড়িতে ওঠার পর বোঝা গেল ওদের জন্যে ভদ্রগোছের একটা আস্তানা খুঁজে বার করা উদ্দেশ্য মালিকের। অনেকগুলো দেখার পর একটা ফ্ল্যাট মোটামুটি পছন্দ হল। দুখানা বড় বড় ঘর, অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ, ডাইনিং স্পেস, শাওয়ার, বেসিন সবই আছে। কিন্তু ভাড়া শুনে স্যাণ্ডালের চক্ষুস্থির। সাড়ে তিনশ' মাইনে তার, ফ্ল্যাটের ভাড়া তিনশ' পঁচিশ। সে বাধা দিতে চেষ্টা করল, অত ভাড়া....

—শাট্ আপ। ইউ উইল গেট এইচ-এ।

অর্থাৎ সে হাউস এলাওয়েন্স পাবে। মাইকেল ওর বউয়ের দিকে ঘুরল, আপাতত এখানেই চলে এস সিস্টার, পরে আর একটা ভালো ফ্ল্যাটের খোঁজ করা যাবে—কি বল ?

বলবে আর কি ? আধা-বোবা দুজনেই। সব ব্যবস্থা পাকা করে, চারতলার বাসিন্দা ফ্ল্যাটের মালিকের হাতে তিনশ' পঁচিশ টাকা ভাড়া আর ছ'শ পঞ্চাশ টাকা সেলামী—মোট

ন'শ পঁচাত্তর টাকার চেক গুঁজে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত রবিন মাইকেল।

....সাড়ে তিনশ' টাকা মাইনের চাকুরেকে যে তিনশ' পঁচিশ টাকা হাউস এলাওয়েন্স দেওয়া যায় না সে কাণ্ডজ্ঞান রবিন মাইকেলের আছে। অতএব স্যাণ্ডালের যে-চাকরি গেছে—সেটা গেছেই। কলমের এক খোঁচায় সে সুপারভাইজার হয়ে বসেছে, বছর দেড়েকের মধ্যে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার—আর এখন তো ম্যানেজারই।

....কিন্তু আসল মানুষটাকে ওরা স্বামী-স্ত্রী চিনেছে, আর চিনছে গত চার বছর ধরে। তার আগে মাসে একদিন দু'দিন আসত ওদের বাড়ি, খাওয়া-দাওয়া করত, হৈ-চৈ করে চলে যেত। চার বছর আগে স্যাণ্ডালের বউ সন্তান-সম্ভবা হতে সে আর এক পর্ব।

হাসপাতালে প্রথম ডেলিভারির আগে একটু সংকটই দেখা দিয়েছিল। মাইকেল সেটা জানত না। আপিসে বসেই স্যাণ্ডাল টেলিফোন পেল, বউয়ের অপারেশন দরকার হবে হয়ত, তার এক্ষুনি একবার হাসপাতালে আসা দরকার।

শুকনো মুখে স্যাণ্ডাল মালিকের ঘরে ঢুকল। উদ্দেশ্য তাকে একবার বলে চলে যাবে। কিন্তু শোনামাত্র হঠাৎ ক্ষিপ্ত আক্রোশে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল রবিন মাইকেল।—স্কাউনড্রেল ! তোমার বউ হাসপাতালে আর তুমি এখানে ইয়ারকি করতে বসে আছ—কাজ দেখাচ্ছ, কেমন ? রান ইমিডিয়েট্লি ! আপিসের একটা গাড়ি নিয়ে যাও—

গাড়ি খোঁজ করার আগেই মাইকেল হন্তদন্ত হয়ে নীচে নেমে এসেছে। ওকে ইশারায় ডেকে নিজের গাড়িতে উঠে বসেছে।

হাসপাতালে এসে শোনে অপারেশনের আগে তখনো এমনি ডেলিভারির চেষ্টা চলেছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক দুজনে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেছে তারপর। মাইকেল বসতেও পারেনি, কেবল পায়চারি করেছে। হঠাৎ একবার তার সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেছে, এ-সব ব্যাপারে এটাই কি সব থেকে ভালো জায়গা ?

আলাদা কেবিনের ব্যবস্থাই করেছিল স্যাণ্ডাল, কিন্তু কলকাতার মধ্যে সব থেকে ভালো জায়গা সে-কথা বলে কি করে ? ওকে নিরুত্তর দেখে মাইকেল যা বোঝার বুঝে নিল। দাঁত কড়মড় করে বলল, স্কাউনড্রেল, আমার সিসটারের কোনো ক্ষতি হলে তোমাকে আমি দেখে নেব !

এক ঘণ্টা বাদে খবর এল, অপারেশনের দরকার হয়নি, অনেক ধকলের পর সেফ ডেলিভারি হয়ে গেছে—ছেলে আর প্রসূতি দুজনেই ভালো আছে।।

স্থান-কাল বিস্মৃত মাইকেলের সেদিনের সেই আনন্দ দেখে চোখে জলই এসে গেছল স্যাণ্ডালের।

আর এখন ?

এখন ওদের ছেলের বয়েস চার।

কলকাতায় থাকলে প্রত্যেক রবিবার সকালে একগাদা খাবার-দাবার আর খেলনা-

পাতি নিয়ে ভাগ্নেকে দেখতে আসবে মাইকেল। বাবা-মায়ের নামে ছেলে নালিশ করলে ওদের বকা-ঝকা করবে। তারপরেই ছেলে তাকে ঘোড়া হবার জন্যে বায়না ধরবে। ছেলেকে পিঠে নিয়ে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে চিঁহি-চিঁহি শব্দ করে জ্যান্ত ঘোড়া হয়ে ঘরময় ঘুরবে এক্সপোর্ট-ইম্‌পোর্ট মার্চেন্ট ধনপতি রবিন মাইকেল।

স্যাণ্ডালকে একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিলেন ডক্টর বোস।—তোমাকে টাকা-পয়সার ব্যাপারেও এত বিশ্বাস করে কেন তোমার মালিক?

স্যাণ্ডাল জবাব দিয়েছে, মালিকের ধারণা, প্রেমে বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সব কিছু দিয়ে তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

বলা বাহুল্য ওই কাহিনী শোনার পর আমি অভিভূত হয়েছিলাম। লোকটার সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেছল।

কিন্তু কাজ শুরু করার প্রথম দিন থেকেই ধাক্কা।

বেয়ারা তাকে চেম্বারে পৌঁছে দিয়ে নিয়ম-মাফিক দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল। সামনের ইজিচেয়ার দেখিয়ে রিল্যাক্স করতে বললাম। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে তাকে খুশি মনে হল একটু। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে সে ইজিচেয়ারে আরাম করে বসল। সুইচ টিপে ঘরের সাদা আলো নিভিয়ে সবুজ আলো জ্বেলে খাতা-কলম হাতে তার দিকে ঝুঁকতেই প্রথম ধাক্কা।

নাকে গন্ধ এল একটা। আর ঘোলাটে পিচ্ছিল চোখে লোকটা আমার দিকে চেয়ে আছে। এ চাউনি সব মেয়েই চেনে।

খট্ করে সুইচ টিপে সাদা আলো জ্বাললাম আবার। উঠে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিলাম। বললাম, দুঃখিত, আজ সীটিং হবে না।

রবিন মাইকেল আকাশ থেকে পড়ল।—কেন? কি ব্যাপার?

—আপনি ড্রিঙ্ক করে এসেছেন।

—তাতে কি! ড্রিঙ্ক তো আমি রোজই করি, আর তাইতেই নরম্যাল থাকি!

বললাম, এখানে যেদিন আসবেন সেদিন ড্রিঙ্ক করবেন না। করলে চিকিৎসা হবে না।

ক্রুদ্ধ দু'চোখ আমার মুখের ওপর আটকে রাখল খানিক। তারপর উঠে হন-হন করে বেরিয়ে গেল। আর আসবেই না যেন। কিন্তু আমি জানি আসবে। প্রথম দিন যে-অস্বস্তি বোধ করেছিলাম সেটাই ফিরে আসছে আবার।

দ্বিতীয় সীটিং-এর দিনে চেম্বারে ঢোকার জন্য ঘর থেকে সামনের ঢাকা-বারান্দায় পা ফেলেই দেখি কোণের দিকের একটা সোফায় মুখ গোঁজ করে সময়ের বেশ খানিকটা আগেই এসে বসে আছে। ছোট ছেলের মতোই রাগ-চাপা মুখ। আমাকে দেখেও কোনো রকম সৌজন্য প্রকাশ করল না।

তাকে দেখে আমার হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল কেমন। তাড়াতাড়ি চেম্বারের দিকে এগিয়ে ডাকলাম, আসুন—

এল। এসে ইজিচেয়ারে বসল। তার পরেও অখুশি মুখ। আমি প্রস্তুত হয়ে কাগজ-কলম নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে বসলাম। হাসি মুখে মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন ?

—ভালো না। আপনার জন্যে সপ্তাহে দু'দিন অন্তত ভালো থাকার উপায় নেই।....ডক্টর বোস আপনার খুব প্রশংসা করেছিলেন, নইলে আর আসব কিনা ভাবছিলাম।

সবিনয়ে বললাম, আমি সত্যিই দুঃখিত, কিন্তু কি করব বলুন যেখানকার যা নিয়ম।

রবিন মাইকেল ঝপ করে বলে বসল, ওসব নিয়ম-টিয়ম কিছু না, আসলে আমি ড্রিঙ্ক্ করে আসাতে সেদিন আপনি ভয় পেয়েছিলেন, আপনি মেয়েছেলে না হলে কেয়ারও করতেন না।....অবশ্য আপনি মেয়েছেলে না হলে আমিও থোড়াই আসতাম এখানে।

শেষেরটুকু শুনে আমার রাগ হওয়ার কথা, অথচ রাগ সত্যিই হল না। লোকটা আবার বলল, কিন্তু আপনি জানেন না, ড্রিঙ্ক করলে আমি অনেক ভালো থাকি, সোবার থাকি—অন্য সময়েই বরং আমার মাথার ঠিক থাকে না।

তার কথা থেকেই আলাপ শুরু করলাম।—আপনি তাহলে অফিস টাইমেও ড্রিঙ্ক করেন ?

—না। সেইজন্যেই আমি তখন খুব খারাপ লোক হয়ে পড়ি।

আমি হেসে বললাম, কিন্তু এখনো তো আমি আপনাকে বেশ ভালো লোকই দেখছি !

বিরক্ত হয়ে সে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনার কখন কি রকম কষ্ট হয় বলুন তো ?

রবিন মাইকেল অবাক যেন একটু। আবার আমার দিকে ফিরল।—আমার কষ্ট হয় আপনাকে কে বলল ? আমি কি দুনিয়ার কাউকে কেয়ার করি যে আমার কষ্ট হবে !

মাথা নেড়ে সায় দিলাম। সেটাই রীতি।—আমার বলতে ভুল হয়েছে, আমি জানতে চাইছি আপনি ঠিক কি রিলিফের জন্যে ডক্টর বোসের কাছে এসেছিলেন ?

—ও ! চুপচাপ একটু। তারপর ঝপ-ঝপ বলে ফেলার মতো করে বলল, দেখুন, টু বি ফ্র্যাঙ্ক, মেয়েদের আমি ঘৃণা করি, আই হেট্ দেম, তাদের আমার খুন করতে ইচ্ছে করে। এটাই আমার একটা রোগে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।....সেদিন একটা ফাঁকা রাস্তায় জোরে ড্রাইভ করে যাচ্ছি, দেখি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা মেয়ে ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে হেলে-দুলে চলেছে। হঠাৎ আমার মনে হল মেয়েটাকে গাড়ির চাকার নীচে পিষে দিয়ে চলে গেলে কি হয় ? মুহূর্তের মধ্যে মাথায় রক্ত উঠল। গাড়ির স্পীড আরো বাড়িয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে প্রাণপণ চেষ্টায় ওকে বাঁচিয়ে ওর গা-ঘেঁষে বেরিয়ে গেলাম আমি।....তারপর সেই সন্ধ্যাতেই ডক্টর বোসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম।

মেয়েদের ঘৃণা করে, মেয়েদের দেখলেই মাথায় খুন চাপে—আর একজন মেয়ের

বসে সেটা শুনতে ভালো লাগার কথা নয়। জিজ্ঞেস করলাম, সব মেয়েকে দেখলেই অমন হয়, না কোনো-কোনো মেয়েকে?

সে জবাব দিল, বেশির ভাগ মেয়েকে দেখলেই ও-রকম হয়।

জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল, তার ম্যানেজারের বউ মিসেস স্যাণ্ডালকে দেখলে কি-রকম মনে হয়। তা না করে ডক্টর বোসের মুখে শোনা তার কথাতেই তাকে ধরতে চেষ্টা করলাম।—ভালোবাসায় বিশ্বাস করে এমন মেয়ে যদি দেখেন?

সক্ষোভে মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, ভেরি রেয়ার, ভেরি ভেরি রেয়ার!

ভাবলাম একটু।—আমাকে দেখে খুন করতে ইচ্ছে করছে?

চাউনিটা এবারে একটু একটু করে পিচ্ছিল হয়ে উঠলে লাগল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস।—পেসেন্ট হিসেবে ঠিক সত্যি কথা বলব?

চকিতের অস্বস্তি চেপে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—আপনাকে দেখে আমার প্রচণ্ড রাগ হয়, কিন্তু কাছে আসতে ইচ্ছে করে। একটু থেমে আবার বলল, আপনাকে দেখার আগে আপনাকে খুন করতে ইচ্ছে করেছিল—বম্বেতে দ্যাট সোয়াইন, আই মিন আপনার দ্বিতীয় স্বামী জোসেফ উডের মুখে আপনার কথা শোনার পর। হাসতে লাগল।—কলকাতায় এলে সে আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছিল, বলেছিল, আপনার এই চেম্বারের এত গুণ যে জোয়ান বয়সের পুরুষ পেসেন্ট কিছুদিন যাওয়া-আসা করলেই ভালো হয়ে যায়....অ্যান্ড ইউ আর্ন এ লট্ দ্যাট্ ওয়ে।

রোগীর কথা শুনব কি, আমার নিজের মাথায়ই রক্ত উঠল যেন। ওই একটা লোকের নাম শুনলেই আমার সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায়। তার ওপর এই কথা আর লোকটার মুখে এই হাসি। আজও চট্ করে উঠে ঘরের দরজা খুলে দিলাম আমি।—আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত থাক।

লোকটা আমার উদ্দেশ্য বুঝল বোধ হয়। হাতের ঘড়ি দেখল। চাউনিটা ধার-ধার এবার, কুটিল। বলল, সময় হয়েছে অবশ্য, আবার তাহলে শুক্রবার দেখা হচ্ছে....?

—দেখা হচ্ছে কিনা আপনাকে টেলিফোনে জানাব।

আমার চোখে চোখ রেখে রবিন মাইকেল হাসছে অল্প-অল্প, বলল, আই অ্যাম এ টাফ্ ম্যান ম্যাডাম, মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রায়ই গণ্ডগোল বাঁধে বলেই আপনাকে তিন মাসের ফী অ্যাডভ্যান্স করে রিসিট নিয়েছি, আমাকে ছাঁটতে চেষ্টা করলে আপনাকে কোর্টে আসতে হতে পারে।

দুঃসাহস দেখে আমি স্তব্ধ। লোকটা হাসছে তখনো। মোলায়েম করে আবার বলল, আমি তো আগেই বলেছি, উড্ একটা সোয়াইন্....আই জাস্ট স্টারটেড্ লাভিং এ থার্ড গার্ল ইন মাই লাইফ, ও তাকে নিয়ে পালিয়েছে। আমি অবশ্য রক্ষাই পেয়েছি, ও-রকম মেয়ে নিয়ে আবার কি হত কে জানে, হাউএভার, ওই উডকে আমি বিশ্বাস করি না....তাছাড়া ডক্টর বোস ইজ এ ডিসেন্ট ম্যান, তিনি আপনার অজস্র প্রশংসা করেছেন, বলেছেন আপনি তাঁর মেয়ে।

এই পেসেন্ট নিয়ে কি যে করব আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। না, তার কোর্টের হুমকিতে আমি একটুও ঘাবড়াইনি। আচরণ খারাপ এই কথা লিখে রেজিস্ট্রি ডাকে তার চেকের টাকা পাল্টা চেকএ ফেরত পাঠালেই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু কেন যেন ছেঁটেও দেওয়া গেল না। লোকটা যে জ্বালাবে আমাকে তাও বুঝেছি, তবু না। থেকে থেকে স্যাণ্ডালের ঘটনাটা মনে পড়ে বলেও হতে পারে।

গত তিন মাসে তার জীবনের যে ঘটনা শোনা গেছে তা এমন কিছু অভাবিত রকমের জটিল নয়।....ওর বাপ ছিল পাদ্রী। কিন্তু রবিন তাকে খুব ধার্মিক বলে মনে করত না। এই ছেলের বেলায় অন্তত বাপ হিংস্র-রকমের নিষ্ঠুর ছিল নাকি। ষোল বছর বয়সে একটা মেয়েকে বুকে জাপটে ধরেছিল শুনে বাপ ওকে আধ-মরা করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ওর নিজের মা আগেই গত হয়েছিল, বাড়িতে সৎ-মা ছিল, সে-ও তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

অজস্র দুঃখ আর দৈন্য সহ্য করে নিজেব পায়ে দাঁড়িয়েছে। আর আজ তো সকলে বড়লোক বলেই জানে তাকে। একে একে দুটো মেয়ে এসেছিল তার জীবনে। দুজনকেই বিয়ে করেছিল। ছেলেবেলা থেকে স্নেহে বঞ্চিত বলেই হয়ত স্নেহ আর ভালোবাসার কাঙাল সে। ওই মেয়ে দুটোর প্রতি সমুদ্র-প্রমাণ ভালোবাসা ছিল ওর বুকের তলায়। কিন্তু ওই মেয়েরা ওকে ভালোবেসে ওর জীবনে আসেনি, এসেছিল টাকার লোভে। ওর দুর্বলতার অজস্র সুযোগ নিয়েছে তারা। সেটা টের পেলেই রবিন মাইকেল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত, আর তখন ভয়ে কাঁপত তারা।

অনেক টাকা হাতিয়ে তার প্রথম স্ত্রী পালিয়েছিল বাড়িব ড্রাইভারের সঙ্গে। আশ্চর্য, এমন মতিও কারো হতে পারে। ঘৃণায় আর তার নামও উচ্চারণ করেনি রবিন মাইকেল। আর ড্রাইভারও রাখেনি কোনোদিন। দু বছর বাদে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল। এই স্ত্রীটির প্রতি আরো বেশি দুর্বলতা ছিল বলেই যেন এই স্ত্রী আরো চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে গেল। বিয়ের আগেই ওই স্ত্রীর ভালোবাসার পাত্র ছিল একটি। তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সেই স্ত্রী তাকে বিষ খাইয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল।....ওব সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবার পর ফাঁক বুঝে এক সময় আগের প্রণয়ীকে বিয়ে করবে।

সেই থেকে রবিন মাইকেল সমস্ত মেয়ে জাতটাকেই যেন ধ্বংস করতে চায় এক-একসময়।

কিন্তু আমি কি করি এখন ?

আমি জানি ওই মেয়ে দুটোর ছাপ ওর মন থেকে উপড়ে ফেলে দিতে পারলে তবে ওর মুক্তি। কিন্তু খুব সহজ কাজ নয় সেটা। তিন মাস ধরে সেই চেষ্টাই করছি। কথা বলে, গল্প করে, সেই পুরনো ভাবাবেগের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ওকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছি।

কিন্তু এই করতে গিয়ে নিজেরই আমার বিষম ধকল পোহাতে হচ্ছে। আমার প্রতি লোকটার ক্রমে যেন আচরণ বদলাচ্ছে। কাকুতি-মিনতি করে সপ্তাহে দু'দিনের থেকে

সপ্তাহে তিন দিনের সীটিং করে নিয়েছে। এক-একদিন আবার সীটিং না থাকলেও এসে হাজির হয়—চুপচাপ ওই ঢাকা-বারান্দার সোফায় বসে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে রেগে যায়। বলে, এসেছি তাতে কি, আমি তোমাকে ডেকেছি, না কোনোরকম ডিসর্টাব করেছি?

মেজাজ ভালো থাকলে এক-একসময় বলে, তোমার মতো কাজে এত নিষ্ঠা আমি কোনো মেয়ের দেখিনি। তোমার জীবনের ওই দুটো লোকই নিশ্চয় হারামজাদা ছিল এক নম্বরের।

....এ-কথা শুনলে আমার ভেতরে ভেতরে একটা নাড়াচাড়া পড়ে কেন?

কিন্তু মেজাজ লোকটার কমই ভালো থাকে। এক-একদিন এমন চেয়ে থাকে যে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করি আমি। মনে হয় লোকটা যেন আমাকেই গ্রাস করার জন্য ওৎ পেতে আছে, আর সেই তাড়না নিয়েই কোনো অদৃশ্য পথের কাছে এগিয়ে আসছে।

এমন দিনে ওই দুঃস্বপ্ন। একটা বিশাল সাপ আমাকে জড়িয়ে জড়িয়ে মাথার ওপর ফণা মেলে আছে। কিন্তু ছোবল বসাতে পারছে না। কার একটা শক্ত হাত যেন ওকে ঠেলে ধরে আছে, আর অন্য হাতের তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে ওটাকে তলার থেকে টুকরো টুকরো করে কাটছে।

আর শেষে এমন দাঁড়িয়েছে যে ওই ভয়াবহ দৃশ্য আমি জেগে থেকেও দেখছি।

ডক্টর বোসের নির্দেশ পালন করেছি। এক মাসের কিছু আগেই নিজের জীবন-চিত্র লেখা শেষ হয়েছে। তাঁর কথা-মতো এই এক মাসের মধ্যে শুধু একটি পেসেন্ট ছাড়া আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখিনি। শুধু রবিন মাইকেল সপ্তাহে তিন দিন করে যেমন আসত তেমনি এসেছে। তার বেশিও এসেছে। কিন্তু আমাকে বিরক্ত করেনি। সামনের ঢাকা-বারান্দার কুশনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চলে গেছে।

লেখাটা শেষ হবার আগে থেকেই কি যেন একটা অদ্ভুত মুক্তির স্বাদ পেতে শুরু করেছিলাম আমি। থেকে থেকে প্রায়ই মনে হচ্ছিল আমার পেশা বা কাজের নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধার চোখে আর প্রীতির চোখে দেখে নি কেউ। রবিন মাইকেল নিজে প্রবল কর্মী বলেই ও-রকম করে দেখতে পারে। আর মনে হয়েছে যে-রমণীরা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে—সে-কলঙ্ক বুঝি সমস্ত রমণী-কুলেরই।

কিন্তু আরো অবাক কাণ্ড, ওই বীভৎস সাপের দৃশ্যটা মন থেকে মুছে গেছে আমি টেরও পাইনি। সেই জন্যেই কি এমন হালকা লাগছে, এত ভালো লাগছে?

ডক্টর বোস চারটের সময় নার্সিং হোমে আসবেন। এখন তিনটে। কিন্তু আমার আর সবুর সইল না। গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটলাম তাঁর বাড়ি।

তিনি বললেন, কি ব্যাপার?

—লেখাটা শেষ হয়েছে।

—ভেরি গুড।....দেন?

জবাব না দিয়ে আমি তাঁর চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগলাম।

মিটি মিটি হাসছেন তিনিও। আলতো করে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই ভয়ঙ্কর সাপটা আর তোমাকে জড়িয়ে মাথার ওপর ফণা তুলে নেই নিশ্চয় ?

আমি হাসিমুখে মাথা নাড়লাম, নেই।

নিরীহ অজ্ঞতার ভান করে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু অমন ভয়ানক সাপটা কে ?

—রবিন মাইকেল।

—আর শক্ত হাতে ফণাটা সরিয়ে রেখে অন্য হাতে তলা থেকে ওটাকে টুকরো-টুকরো করে কাটছিল কে ?

—সে-ও রবিন মাইকেল নিজেই।

চোখে-মুখে বিস্ময় ছড়িয়ে তিনি বললেন, হাউ স্ট্রেঞ্জ্ !....তা তুমি এমন ছুটে এলে কেন, আমাকে বলবে কিছু ?

আমি হাসতে লাগলাম। হেসে মাথা ঝাঁকালাম, বলব। বললাম, প্রায় মাসখানেক ধরে আপনি আমাকে দিয়ে যা লেখালেন তার মধ্যে কোনো নায়ক নেই, কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই সব কিছুর মধ্যে একজন নায়ক পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।....সে আপনি। আমার ধারণা কি ভুল ?

তিনিও হেসেই উঠলেন এবার। জবাব দিলেন, একটু। সেই বিচারে নায়ক বরং রবিন মাইকেলের ম্যানেজার ওই স্যাণ্ডালকে বলতে পার। সে বলেছিল, তার মালিকের ধারণা, প্রেমে বিশ্বাস করে যে, দুনিয়ার সব কিছু দিয়ে তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।....ও রকম একটা কথা শোনার পর আমার মাথায় কিছু প্ল্যান গজিয়েছিল।

আদুরে মেয়ের মতো হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসলাম আমি। এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলাম। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে ছুট সেখান থেকে।

বিকেলের দিকে নার্সিং হোমের দোতলায় নেমেছিলাম। খানিক বাদে লোকটা এসেছে টের পেয়েও ইচ্ছে করেই অনেকক্ষণ বাদে ওপরে উঠলাম।

....ঢাকা-বারান্দার সোফায় চুপচাপ বসে আছে।

পায়ে-পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালাম। সে মুখ ফেরাল না। নির্দিষ্ট দিন ভিন্ন আমি তার দিকে তাকাই না বা কথা বলি না, সেই ক্ষোভ যেন।

হাসি চেপে ডাকলাম, আসুন—

সে সচকিত। মুখ ফেরাল।—ইয়ে....আজ তো আমার ডেট নয়।

—নয় বুঝি ?....আচ্ছা, তা হলেও আসুন, আপনার সঙ্গে কথা আছে কিছু।

চেম্বারে ঢুকলাম। পেছনে রবিন মাইকেল। সুইচ টিপে সাদা আলো জ্বাললাম। রবিন মাইকেল এগিয়ে গিয়ে ইজিচেয়ারে বসল। সেই ফাঁকে নিঃশব্দে আমি দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিলাম। তারপর সবুজ আলো জ্বেলে সাদা আলোটা নেভালাম। তারপর নিজের চেয়ারে না বসে ধীরে-সুস্থে তার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

সে আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি তার মুখের দিকে। বললাম, আপনার রোগ তো সেরে গেছে।

সে এই দ্বিতীয় প্রশ্নে সচকিত।

—তার মানে ?

—তার মানে, যে-মেয়ে দুটোর জন্যে আপনি এত কষ্ট পেয়েছেন তারা আপনার মন থেকে একেবারে মুছে গেছে।....যায়নি ?

স্বীকার না করে উপায় নেই যেন। মাথা নাড়ল। গেছে।

—আর, মেয়েদের দেখলেই আর আপনার তাদের আগের মতো খুন করতে ইচ্ছে করে না।....করে ?

আবারও তেমনি করেই মাথা নাড়ল। করে না।

—যাক, আর তাহলে আপনার সীটিংয়ের দরকার নেই।

এ-ই বলব সে যেন আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছিল। অসহিষ্ণু মুখে বলে উঠল, ওই রোগ সারলেও আমাকে আর এক রোগে পেয়ে বসেছে। ওই মেয়ে দুটো মুছে গেলেও আর এক মেয়ে সারাক্ষণ আমার মনের ওপর চেপে বসে আছে, আমি ঘুমের মধ্যে তাকে দেখি, জেগে উঠেও তাকে দেখার জন্য সারাক্ষণ ছটফট করি—সেই মেয়ে তুমি, তুমি—এই রোগের কি হবে ?

উষ্ণ ক্ষুব্ধ মূর্তিখানা চেয়ে চেয়ে দেখলাম একটু। তারপর খেয়াল না করেই যেন এগিয়ে গিয়ে তার ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর বসলাম।

তারপর যথাসম্ভব নির্লিপ্ত মুখ করে বললাম, ও কিছু না।....এই রোগটা এ-জীবনে আর না সারলেও চলবে।

সনচরি

একটা বছর ঘুরে গেল।

ভাদ্রের সেই শুক্লা নবমী আবার এসেছে। পুণ্য গোগো নবমী। দিনের বেলা গ্রামে গ্রামে গোগো দেবতার পুজো সারা হয়েছে, হাতে তাগা বাঁধা হয়েছে। মুসলমানরাও দিনমানে গোগোপীরের দোয়ামানত সেরে নিয়েছে। এই দেবতাটি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পুজো পেয়ে থাকেন। এই পুজোর একটাই লক্ষ্য, একটাই সিদ্ধি। বিষাক্ত সর্পদংশনের দুর্ভাগ্য দূরে রাখা। গোগোর আশীর্বাদী তাগা হাতে বাঁধলে অতি বড় বিষধরও মাটিতে ফণা গুঁজে পালাবে।

মরু-ঘেরা এই রুক্ষ পার্বত্য দেশের অনেক তাজা দেহ প্রতি বছর সাপের বিষে নীল হয়। হয়তো দেখা যায়, তাদের হাতে-বাহুতেও গোগো দেবতা বা গোগোপীরের তাগা বাঁধা। কিন্তু তাগা বাঁধলেই যে ভিতরে ভিতরে ভক্তি-বিশ্বাস থাকবে তার কি মানে ?

লোকের বিশ্বাস গোগো রুষ্ট হলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কিন্তু নগরে এইবার শুক্লা-নবমীর আচার-অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপে একটা সামগ্রিক ব্যতিক্রম ঘটেছে। এই পুজোর প্রকৃষ্টতম সময় শুক্লা-নবমীর শ্বেত-সন্ধ্যা। গভীর রাত্রিযামেও কেউ কেউ পুজো সম্পন্ন করে থাকে। কিন্তু এবারে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র সকলেরই দিনমানে পুজো সারা। স্বয়ং রাজপুরোহিতের বিধান, ভক্তিভরে পুজো একসময় করলেই হল—দেবতার নিকট দিবারাত্রি সমান।

অস্বস্তির কাঁটা যাদের বিঁধছিল, এক সামগ্রিক উদ্দীপনার বন্যায় তা ধুয়েমুছে গেছে। দেশসুদ্ধ লোকের ওপরে দেবতার কোপ লাগতে পারে না। স্বয়ং রাজপুরোহিত যেখানে অভয় দিয়েছেন, স্বয়ং মহারাজ আর অমাত্যবর্গ যেখানে দিনের পূজারী—দেবতার অভিশাপ তাদের স্পর্শ করবে কেন? দেবতার কি আক্কেল-বিবেচনা নেই।

শুক্লা নবমীর এই সন্ধ্যাটা, এই রাত্রিটা সকলেই আজ নিজের দখলে রাখতে চায়—স্বয়ং মহারাজা থেকে শুরু করে দরিদ্র প্রজা পর্যন্ত। আজ কদিন ধরেই নগরবাসীদের বুকের তলায় একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রলোভন শিখার মতো জ্বলছে। নিভৃতের মন-পতঙ্গ অহর্নিশি সেই শিখার দিকে ধাওয়া করে চলেছে। ধাওয়া করে করে আজ কাছাকাছি এসেছে। এই সন্ধ্যায় সেই বিদেশিনীকে—শিখারূপিণীকে দেখবে সকলে। আগেও দেখেছে অনেকে। কিন্তু সেই দেখায় মন ভরে নি, চোখের তৃষ্ণা মেটে নি। বুকের জ্বালা নেভে নি।

আজ মন ভরবে, তৃষ্ণা মিটবে, জ্বালা জুড়বে ভাবছে। কদিন ধরেই ঘরে ঘরে পথে হাটে মাঠে জল্পনা-কল্পনা চলছে একটা। ছেলে যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ—সকলেই এই শুক্লা নবমীর প্রতীক্ষারত। চক্ষু সার্থক সেই দিন হবে, কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই দেখার অভিসারে মেতেছিল সবাই।

শুক্লা নবমীর শূন্য জ্যোৎস্নায় অবগাহন করতে করতে নগরের স্বপ্ন-নাগরী আজ রাজ-মনোরঞ্জনে আবির্ভূত হবে। রাজার মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য হলেও নগরের কাউকে নিরাশ করবে না সে, তার নির্দেশেই এই রাজ-ক্রীড়াঙ্গনে নগরের আপামর সকলের নিমন্ত্রণ।

জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা দেখাবে আজ পুরুষের যৌবন-স্বপ্ন-সহচরী বিদেশিনী যাদুকরী সনচরী।

তাই এত আলোর বন্যা। তাই এত মশাল-সজ্জা। আর তাই বোধ হয় আকাশে এত জ্যোৎস্না।

হ্যাঁ, মহারাজা বিরমও দিনমানেই আজ বাহুতে গোগোর আশীর্বাদ ধারণ করেছেন। কারণ, রাতে তাঁর অবকাশ নেই। কারণ, এই রাতের অভিসারে যে আসবে তার আতপ্ত প্রতীক্ষায় অনেক রাত্রি বিনিদ্র যাপন করেছেন রাজা বিরম। রমণীর মন বোঝা ভার। রাতের পর রাত যে মোহিনীময়ী বিচিত্ররূপিণী সমস্ত আচার সংস্কার নিয়ম নিষ্ঠার কূল ভেঙে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো এই জীবন-তরী তার অশান্ত, উদ্দাম যৌবনসমুদ্রে

ডুবিয়ে ভাসিয়ে এক অননুভূত বিস্মৃতির কোন দুর্গম গভীরে টেনে নিয়ে গেছে—আজ একটানা চার মাস তার দর্শনটুকুও মেলে নি। রাজা বিরম প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, পরে ক্রুদ্ধ হয়েছেন, সমস্ত নগর, নগরপ্রান্ত তচনচ করেছেন, বন-জঙ্গল লণ্ডভণ্ড করেছেন। তবু দেখা মেলে নি। শেষে ঘোর সন্দেহে ভ্রূকুটি কুটিল হয়েছে, কেউ তার ক্ষতি করল কি না। কিন্তু না। তার বারতা এসেছে। শূন্য থেকেই এসেছে যেন। নিজে হাতে পত্র দিয়েছে যাদুকরী সনচরী। লিখেছে, আমার মিথ্যে অনুসন্ধান ক'রো না। সামনের তিন মাস শুচিসুদ্ধ ব্রতযাপনের পর আমি প্রিয়মিলনে আসব। সেই মিলনে আর ছেদ পড়বে না। একদিন যখন তুমি থাকবে না, আমি থাকব না—তখনো লোকে এই মিলনের কথা বলবে। এই তিন মাস তুমিও মন শুচিসুদ্ধ করো, রাজকাজে মন দাও, কর্তব্যে অটল হও। তিন মাস বাদে ভাদ্র শুক্লা নবমীতে তোমার সনচরী আসবে। তোমার উৎসবের আলোয় আকাশের জ্যোৎস্না যেন ঢাকা পড়ে সেদিন। উৎসবে একা আনন্দ করতে নেই—তোমার প্রজাদেরও ডেকো সেদিন। সক্কলকে। তাদেরও গোপন কামনা তোমার মতো করেই আমাকে স্পর্শ করেছে। চোখের দেখা থেকেও তুমি তাদের বঞ্চিত করবে কেন? তাদেরও আশা মেটাব আমি। তাদেরও বুকের তাপ জুড়িয়ে দেব। বলো, যাদুকরী সনচরী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা দেখাবে তাদের। কোনো পথে আমি আসব সময়ে জানবে।

রাজা বিরম দিনের বেলায় গোগোর আশীর্বাদ গ্রহণ করেছেন। ভক্তিভরেই পুষ্পপত্র করে ধারণ করেছেন। রাজমহিষী রত্নাবাঈ দেখেছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দিনের আলোয় এই অনুষ্ঠান সমাপনে তিনি আপত্তি করেন নি। রাজমহিষীর দিনের হিসেব আলাদা। তাঁর বুকের তলায় এক অনড় স্থির রাত্রি বাসা বেঁধে আছে অনেক দিন। সেই রাত্রি আজও পোহায় নি। তবে রাত্রি অবসানের লগ্ন আসন্ন বটে।

নিষ্পলক আয়ত গভীর চোখে রত্নাবাঈ স্বামীকে ভক্তিভরে আশীর্বাদী গ্রহণ করতে দেখেছেন। রানী জানেন এই ভক্তি দুর্বলতারই নামান্তর। একদিকে প্রলোভনের হাতছানি, অন্যদিকে ভবিতব্যের ভ্রূকুটি-সম্ভাবনা—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে দিব্যকান্তি বিশালবক্ষ রাজার ভিতরে ভিতরে দুর্বলতার বিষ ঢুকেছে। গর্বিত রাজা তা বুঝতে দিতে না চাইলেও রাজমহিষীর তা চোখে গোপন থাকে না। রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে মহিষী তাঁর অন্তরের চিত্রটি স্পষ্ট দেখতে পান। পাচ্ছেন। আশীর্বাদী নেবার সময় ভক্তির আবরণে দুর্বলতাই দেখেছেন তিনি। গত বছর এই দিনের সেই কালান্তক রাত্রির স্মৃতি বিভীষিকার মতো ওই বিশাল বুকের কোথাও পুঞ্জীভূত হয়ে আছে বোধ হয়। গত বছর ঠিক এই দিনটির জ্যোৎস্না রাতে সমস্ত রাজ্যের ওপর শোকের আঁধার নেমে এসেছিল। বিষে বিষে রাজার সোনার বীর অঙ্গ নীল হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত সেই তরল আগুনের অধিক বিষের জ্বালা স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি একেবারে।

তাই রানী যখন প্রস্তাব করলেন, রাতে সময় না পাও, দিনেই আশীর্বাদ নাও, তাতে বাধা নেই—একসময় নিলেই হল, দিনরাত সবই তো সেই একজনেরই সৃষ্টি—রাজা বিরম একবারও আপত্তি করেন নি। প্রিয়তমা মহিষীর অনুরোধেই যেন রাজী হয়েছেন।

রাজা এত সহজে তাঁর কথা রাখতে স্বীকৃত হলেন দেখে মহিষীও খুশির হাসি হাসলেন। কিন্তু ওটা নকল হাসি। ওই হাসির সঙ্গে অন্তরের খুশির যোগ নেই। এই দুর্বলতা দেখে মনে মনে তিনি উল্টে নিজের কপালে করাঘাত করেছেন। শৌর্যের পূর্ণচন্দ্র রাহু-কবলিত। তবে সান্ত্বনা এই যে, রাজাকে রাহুমুক্ত করতে পারবেন এই অটল বিশ্বাস রানীর আছে।

রাজাকে সঙ্গে করে নিজে তিনি নিয়ে এসেছেন নগরে-প্রান্তের গোগো মন্দিরে। সঙ্গে ছিলেন রাজবন্ধু প্রায়-বৃদ্ধ অধিকারী দেবরাজ। তিনি শুধু মন্ত্রী নন, এক দৃপ্ত শুভেচ্ছা দিয়ে পাহাড় জঙ্গল মরুভূমি ঘেরা সমগ্র জালোর ভূমির মঙ্গলটুকু আঁকড়ে ধরে আছেন। এই মঙ্গলের ওপর কেউ ছায়াপাত করলে অমোঘ-লক্ষ্য শ্যেনপক্ষীর মতো অতর্কিতে তাকে জীবনের ক্ষেত্র থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে শান্ত নির্মম চিত্তে মৃত্যুর তিমির গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারেন। অনেক অভিজ্ঞতায় অসময়ে দেবরাজের চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে। ফলে তাঁর মহত্তর রূপটি যেন আরো সুন্দরভাবে বিকশিত। উন্নত খড়্গ নাসা, প্রশস্ত ললাট, উজ্জ্বল চক্ষু। সদা স্থির গম্ভীর, কিন্তু নিভৃতের স্থিরবুদ্ধি অসংমূঢ় প্রাণদেবতার হাসিটুকু সর্বদা যেন ঠোঁটের ফাঁকে, চোখের কোণে লেগে আছে। এই হাসির প্রলেপ দেওয়া গম্ভীর মূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালে ছলের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে, সুজনের ভরসা মেলে।

আজ থেকে ঠিক চৌদ্দ মাস আগে রত্নাবাঈ সকলের অগোচরে অধিকারী দেবরাজকে এক রাতে অন্তঃপুরের নিভৃতে ডেকে এনেছিলেন। মহিষীও এই একজনকে রাজকোষপুষ্ট অমাত্য ভাবেন না, রাজার শুভানুধ্যায়ী ঈষ্টমিত্র জ্ঞানে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন। তিনি আসতে উঠে সসম্ভ্রমে আহ্বান জানালেন তাঁকে, বসতে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, রাজ্যের সমস্ত সমাচার কুশল তো?

অধিকারী নিরুত্তর।

রত্নাবাঈ আবার বিনীত উক্তি করলেন, দেশ আমাদের মা, প্রজারা আমাদের সন্তান—মা আর সন্তানকে সর্বদা স্মরণ করা শুধু রাজার নয়, শুধু মন্ত্রীর নয়—রাজমহিষীরও কর্তব্য। তাই জিজ্ঞাসা করি, মায়ের পূজায়, সন্তানের সেবায় কোথাও কোনো বিঘ্ন দেখা দেয় নি তো?

সুচতুরা মহিষীর মিষ্টি-গম্ভীর বচনকুশলতায় মনে মনে প্রীত হলেন দেবরাজ। এই শুভময়ী যে-রাজ্য বেষ্টন করে আছে, তার কোনো অমঙ্গল হতে পারে না বলেই ধারণা হল। কিন্তু অধিকারী এবারও জবাব দিয়ে উঠতে পারলেন না। নীরব তিনি।

রত্নাবাঈ ক্ষণকাল প্রতীক্ষারত। তাঁর স্থির দৃষ্টি অধিকারীর মুখের ওপর সংবদ্ধ। এই নীরবতা থেকেই যেন যথার্থ জবাবটি পেলেন তিনি। ধীর কণ্ঠে বললেন, আপনার মুখ দেখে মনে হয় সমাচার সব কুশল নয়, আমারও সেই রকমই খবর। রাজ্যে এক সুরূপা বিদেশিনীর আর্বিভাব হয়েছে, জালোরের বাতাসে সে মোহ ছড়াচ্ছে।

দেবরাজ শান্ত জবাব দিলেন, আমি জানি।

সেই মোহ রাজদুর্গের ব্যবধান লঙ্ঘন করেছে। তার পাপ নিঃশ্বাস রাজাকে স্পর্শ

করেছে। তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে।

আমি জানি।

বিভ্রান্ত হলে প্রজারাও বিভ্রান্ত হয়। রাজশাসনের ভিত নড়ে। দেশের আত্মিক আদর্শ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। অনাচারের স্রোত বইলে পাহাড়ের শক্তিও ধসে পড়ে। এমনি অনাচারের স্রোতে রাজা মোহগ্রস্ত, প্রজারা মোহগ্রস্ত।

আমি এও জানি।

মহিষীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল ঈষৎ, দৃপ্ত হল, কণ্ঠস্বরও ঈষৎ অসহিষ্ণু শোনাল।—সব জেনেও আপনি এমন অসহায় দ্রষ্টার মতো নিষ্ক্রিয় বসে আছেন কেন? রূপসী ডাকিনী মোহবিস্তারে যত বড় পটু হোক, অধিকারী দেবরাজকেও সে বিচলিত করতে পেরেছে এ-কথা আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করব না?

প্রাণপণ চেষ্টায় অব্যক্ত অপমানের অনুভূতিটাকে নিষ্পেষণ করলেন দেবরাজ। তাঁর শুভ্র মুখবর্ণ লোহিত হল। আস্তে আস্তে টান হয়ে বসলেন তিনি। মহিষীর চোখে চোখ রেখে নিজেকে সংবরণ করলেন। তার পর অল্প মাথা নেড়ে স্পষ্ট করে বললেন, না।

রত্নাবাঈ হাসলেন সামান্য একটু। বীর, প্রাজ্ঞ অধিকারীকে ব্যঙ্গাঘাতে এমনি সচেতন করে তুলতেই চেয়েছিলেন তিনি। এবারে তাঁর অনুকরণেই বললেন, আমি জানি, এ কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু মহামান্য অধিকারী এর কোনো বিহিত করছেন না কেন?

আগের বিদ্রূপের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ মেলায় নি। দেবরাজ আজ দীর্ঘকাল বিপত্নীক। একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র জয়রাজ ভিন্ন সংসারের আর কোনো বন্ধন নেই। রাজকার্য, রাজ্যের মঙ্গলসাধন এমন নেশার মতো পেয়ে না বসলে বহু আগেই কোনো দুর্গমে গিয়ে সাধন-ভজনে মন দিতেন হয়তো। স্ত্রী-বিয়োগের পর এতকালের মধ্যেও একটি দিনের জন্য অদর্শচ্যুত হন নি, ইন্দ্রিয়ের চতুষ্পার্শ্বে কর্তব্যের হোমানল জ্বেলে রেখে মনটিকে কঠিন বিবাগী করে তুলছেন। এতদিনের মধ্যে পরিহাসছলেও কেউ তাঁর এই কর্তব্যের ওপর কটাক্ষপাত করে নি। কিন্তু আজ একটু আগে যিনি ওই বিদ্রূপবাণ হেনেছেন, তিনি স্বয়ং রাজমহিষী। শিষ্টাচার ভুললেন না দেবরাজ, কিন্তু বিনম্র জলদগম্ভীর স্বরে স্পষ্ট জবাবই দিলেন, বললেন, অধিকারীর কর্ম-বিধান প্রজা থেকে রাজার পদমূল পর্যন্ত পৌঁছয়, তার ওপরে আর ওঠে না। যে দুর্বিপাকের সঙ্গে স্বয়ং রাজা যুক্ত, তার বিহিত একমাত্র ইষ্টদেবী শাকম্ভরী করতে পারেন।

মহিষী রত্নাবাঈ স্থির নেত্রে চেয়ে রইলেন অধিকারীর দিকে। স্বামীর প্রতি এই ইঙ্গিতে একটা তপ্ত অনুভূতি সতীর অন্তস্তলে উদ্বেলিত হতে থাকল। কিন্তু ইঙ্গিত মিথ্যে নয়। নয় বলেই বুকের মধ্যে এত আগুন জ্বলছে। যোগ্য প্রত্যুত্তর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই গ্রহণ করলেন রানী। বললেন, দেবী শাকম্ভরীর প্রতিকারের ইচ্ছে হয়েছে, রাজ্যের এত বড় অমঙ্গল তিনি চান না। প্রতিকার তাঁর অভিপ্রায় না হলে আমি আপনার শরণাপন্ন হব কেন? আমার সমস্ত অন্তরাত্মার ভিতর দিয়ে তাঁরই প্রতিকারের নির্দেশ আসছে—তাঁর সেই নির্দেশ আমি অহর্নিশি শুনতে পাচ্ছি—এ আপনি বিশ্বাস করেন?

ক্ষণকাল আগের বিদ্রূপ ভুললেন অধিকারী দেবরাজ। দৃপ্ত মঙ্গলময়ীর মধ্যে যেন

ইষ্টদেবী শাকম্ভরীকেই দেখলেন তিনি, তাঁর কথা শুনলেন।আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। বললেন, করি। তা হলে প্রতিকার হবে। কিন্তু আপনাকে ধৈর্য ধরে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বোধ হয়।

একটানা চৌদ্দ মাস ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করেছেন রত্নাবাঈ। এর মধ্যে এক গণিকা যাযাবরী নারীকে ঘিরে অনেক বাসনার মত্ততা দেখেছেন, অনেক ব্যভিচারের স্রোতে দেখেছেন। এক অশুভ ছায়া রাজ্যের আকাশে আরো ঘন হয়ে ছেয়ে আছে। কিন্তু মহিষীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি। এমন কি বুকের আগুন যখন মুখের রক্ত-কণায় এসে মিশেছে, তখনো নির্মম শান্ত তিনি। রাজার সান্নিধ্যে তখনো রাজপ্রেয়সীর দীপ্তিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, হেসেছেন, সহজ কৌতুকে মগ্ন হয়েছেন।

চৌদ্দ মাস ধরে এই অটুট অটল ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে আসছেন তিনি।

গোগো নবমীর এই দিনের আশীর্বাদ গ্রহণ সম্পন্ন হতে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রানী হাসলেন। বললেন, শাপিনী ডাকিনী মোহিনীর সব ভয় একটা বছরের মতো তোমার কেটে গেল, নিশ্চিন্ত তো?

রাজা বিরম অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন একটু। চেষ্টা করেও সহজ চোখে রানীর মুখের দিকে সব সময় তাকাতে পারেন না আজকাল। দেবরাজ আড়চোখে দুজনকেই দেখলেন একবার। তাঁর মনে হল, রানী রাজাকে নয়, মা যেন তার অনাচারমগ্ন সন্তানকে আশ্বাস দিচ্ছে।

রত্নাবাঈ এবারে খুব নীচু স্বরে বললেন, কাল অকাল নীরাজনার অনুষ্ঠান, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সেই অনুষ্ঠানপালনে তুমি দেবীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেই প্রতিশ্রুতি তুমি পালন করবে জানি—কিন্তু দেবীকে তুমি ফাঁকি দেবে না তো? তোমার মন দেবীর চরণে ঠিক ঠিক পৌঁছবে তো?

রাজা বিরমের সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল হঠাৎ। ঘাড় বাঁকিয়ে অধিকারীর দিকে তাকালেন একবার। অধিকারী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন,শোনেন নি কিছু। কিন্তু রানীর সামনেও বিড়ম্বনা কম নয় রাজা বিরমের। এই প্রশ্নের ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। আজ রাতের ঢালা উৎসবের আয়োজনের সংবাদ রাখে না রাজ্যে এমন মানুষ নেই। কিন্তু আসলে এই আসন্নরজনী শুধু রাজা আর মোহিনীময়ী সনচরীর উৎসব-রজনীই বটে। এও সকলেই অনুমান করতে পারে। সনচরীর যাদুর খেলার পর দীর্ঘদিনের প্রণয়-তাপদগ্ধ রাজা যে বিদায় দেবেন না সনচরীকে, এও জানা কথাই। রাজার নিভৃত প্রমোদাগারে এই রাতে আজ অনেক দীপ জ্বলবে। এই রাতের অনেক আগে থেকেই রাজার বক্ষ-দেউলে লক্ষ বাসনার দীপ জ্বলছে।

জানে। সকলেই জানে।

রাজা বোঝেন, তাই রানীর সংশয়। সমস্ত রাতের অভিসার বিনোদনের পরে কোন্ মন নিয়ে তিনি নীরাজনার আচার পালন করবেন—সেই ভাবনায় রানী উতলা। ক্ষণকালের জন্য রাজ-ধমনীর রক্তস্রোত উষ্ণ হয়ে উঠল। রাজার একাগ্রতার ওপর রানীর নির্ভর টলেছে। রাজা স্থির জানেন, রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মমুহূর্তে রাতের

স্মৃতি একটা দিনের জন্যও তিনি ধুয়ে মুছে ফেলতে পারবেন। সঙ্কল্প-চ্যুত তিনি কখনো হন নি। কালও হবেন না। নিজেকে তিনি মহাভোগী বলে জানেন, কিন্তু ইচ্ছে করলে তিনি মহাযোগীও হতে পারেন। একটা দিনের জন্যে অন্তত পারেন। কিন্তু তবু তিনি রানীর প্রতি রুষ্ট হতে পারলেন না। সব জানা সত্ত্বেও রানীর এই ধীর ক্ষমাসুন্দর মূর্তিই তাঁকে সব থেকে বেশি বিচলিত করে। রানী যদি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন, প্রতিশোধ কামনায় উগ্র হয়ে উঠতেন, তা হলে তিনিও কঠিন হতে পারতেন, রূঢ় হতে পারতেন।

কিন্তু এদিকে থেকে রানীর ত্যাগটুকুই বড়—রাজা বিরম তাঁর প্রতি অকরুণ হবেন কি করে? নিজের বুকের একটা দিক খালি হয়ে গেছে বলেই রানী মনে মনে তাঁকে ব্যভিচারী ভাবেন। এ-রকম ভাবার অধিকার তাঁর আছে। যাদুকরী রাজাকে যাদু করেছে সত্যি কথাই। কিন্তু একে শুদ্ধ প্রণয়-যাদু ভাবেন রাজা। সনচারীর হৃদয়টি যদি রানী দেখতে পেতেন, তা হলে বোধ হয় তিনিও ওই যাদুকরীকে দু-হাত বাড়িয়ে অন্তঃপুরে অভ্যর্থনা করে নিতেন। রানীর কত বড় উদার অন্তঃকরণ জানেন বলেই এ-রকম একটা অসম্ভব আশা মনে মনে রাজা আজও পোষণ করেন। তিনি তো দুর্বল ছিলেন না, সোনগড়া অগ্নিবংশের রাজপুত তিনি। অনেক যুদ্ধ অনেক সংগ্রামের জয়তিলক তাঁর ললাটে ভাস্বর। কিন্তু তবু তিনি কি করবেন? ওই এক বিচিত্র যাযাবরী রমণীর হৃদয় জয় করার আকর্ষণ সে যে কি দুর্নিবার ব্যাপার—এ তিনি বলবেন কাকে?

রাজা বিরম মাথা নাড়ালেন শুধু, দেবীকে ফাঁকি দেবেন না, নীরাজনা অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না, দেবীর চরণে মন ঠিক ঠিক পৌঁছুবে।

রানীর চোখেমুখে চাপা কৌতুক উছলে উঠতে চাইছে। কিন্তু সেটা প্রকাশ পেল না, নীরাজনা অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না এই আশ্বাসটুকু পেয়েই তিনি যেন খুশি হলেন।

অকাল নীরাজনা।

ঠিক সময়ে, ঠিক কালটিতে এই উৎসব পালিত হচ্ছে না এবারে, তাই অকাল বলছে সকালে। এই কারণেও এক ধরনের চাপা উদ্দীপনা পুঞ্জীভূত প্রজাদের মনে। গোগো নবমীর পরের দিন নীরাজনা উৎসব পালন করবেন রাজা। বলতে গেলে গত এক বছর ধরেই চিত্তাকর্ষক জটলার খোরাক জুটছে তাদের। গত বছর এই দিনে সর্প-দংশনে রাজার জীবন সংশয়। বাঁচার আশা কেউ করে নি, স্বয়ং রাজমহিষীও না। কিন্তু রাজা বাঁচলেন, আর রাজ্যময় যাদুকরী সনচরীর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। তারপর রাজার সঙ্গে সেই অগ্নিযৌবনার গোপন প্রণয় গোপন থাকল না। রাজার কাছে রাজ্য রাজকার্য সব তুচ্ছ হয়ে গেল। মাঝে আবার বেশ একটা কানাঘুষা শুরু হল, অধিকারী দেবরাজের একমাত্র সন্তান নগরশাসক জয়রাজ পিতার রোষ, রাজরোষ তুচ্ছ করেও ওই মোহময়ী যৌবন-শিখায় আত্মাহুতি দেবার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। এ রটনার কতটা সত্যি সঠিক কেউ জানে না। গুজব রাজার কানে না উঠলেও পিতা দেবরাজের কানে উঠেছিল নিশ্চয়। অন্যথায় ওই বেপরোয়া বে-হিসেবী তরুণ হঠাৎ অমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেমন করে? আর তার পর বাণিজ্যের অছিলায় একেবারে দেশ ছাড়াই বা হল কেন? অন্যদিকে একমাত্র সন্তান অনির্দিষ্টকালের জন্য চোখের

আড়াল হওয়া সত্ত্বেও অধিকারী দেবরাজ এমন নির্মম শাস্তি কেন?

তার পরের খবরটাও চাপা থাকল না বেশিদিন। রাজা এবং রাজ্যসুদ্ধ লোকের চিত্তহরণ করে যাযাবরী সনচরী হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। রাজার বিলাসশালার সব দীপ যেন এক ফুঁয়ে নিভে গেল। উৎসবে, যে-কোনো উপলক্ষে রাজা এবং সহস্রজনের চোখের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যেও আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তার যাদুর খেলা পরিবেশনে ছেদ পড়ল।

এরপর গত চার মাস আগে রাজমহিষী স্বপ্ন দেখলেন হঠাৎ। দেবী শাকম্ভরী তাঁকে স্বপ্নে যেন কি কারণে চোখ রাঙাচ্ছেন। তার পর দেখেন গোগো নবমীর পরদিনই ঘটা করে অকাল নীরাজনা উৎসব পালন করছেন স্বয়ং রাজা—রাজ্যের সকলে।

স্বপ্নের বিস্তৃত সমাচার অবশ্য প্রজারা জানে না। ঘুম ভাঙতে সকালেই রত্নাবাঈ রাজাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজা বিরস এসে দেখেন রানী পালঙ্কে বসে আছেন, মুখ থমথমে গম্ভীর। রাজাকে বসিয়ে স্বপ্নের কথা বললেন তিনি। রাজা শুনলেন শুধু। শুনেও স্বপ্নবৃত্তান্তে মাথা দিতে পারলেন না। নিজেই তিনি হতাশায় ম্রিয়মাণ সর্বদা। যাদুকরী তার মন কেড়েছে, কোনো কিছুতে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না তাঁর পক্ষে।

বললেন, রাজ-পুরোহিতকে ডেকে আলোচনা করো, তিনি বুঝিয়ে দেবেন, বিধান দেবেন।

রাজার সামনেই তাঁর ডাক পড়ল। পুরোহিত স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে খুশি মুখে বললেন, এ অতি শুভ স্বপ্ন। দেশের আত্মিক আদর্শ কিছুটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে বলেই দেবীর রুষ্ট চক্ষু। কিন্তু তার বিধানও দেবী নিজেই দিয়েছেন। গোগো নবমীর পরদিনই এবারে নীরাজনা উৎসব পালন করে নতুন উদ্যমে নতুন দিনের যাত্রা শুরু করতে হবে।

রাজা বললেন, তাই হবে।

রানীর স্বপ্নের কথা আর রাজ-সিদ্ধান্তের কথা এক কান থেকে পাঁচ কানে ছড়াল, পাঁচ কান থেকে শত সহস্রের কানে।

নীরাজনা উৎসব পালিত হয়ে থাকে বিজয়া দশমীর দিন, বিসর্জনের পর। কিন্তু এখানে এই দিনে প্রতিমা বিসর্জন আসল উৎসব নয়। আসল উৎসব অস্ত্রযুদ্ধ-অন্তে সসৈন্য রাজার এবং রাজ-পরিজনদের কুলদেবী শাকম্ভরীর আশীর্বাদ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধ কৃত্রিম যুদ্ধ। কিন্তু আড়ম্বর যুদ্ধের মতোই। যুদ্ধের সাজ-সজ্জা করে সসৈন্য রাজা নকল যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন। ওদিকে নকল শত্রুসৈন্যও প্রস্তুত। যুদ্ধে রাজা জয়লাভ করবেন, শেষ শত্রুসৈন্যটি পর্যন্ত পরাস্ত করে সেই দৃপ্ত যোদ্ধবেশে রাজা যাবেন ইষ্টকুলদেবী শাকম্ভরীর মন্দিরে। রাজ-পুরোহিত তখন তাঁর হাতে দেবীপূজার মন্ত্রপূত শমীপাতা আশীর্বাদী দেবেন। রাজা সেই আশীর্বাদী মাথায় করে নিয়ে আসবেন।

তাৎপর্য, রাজার শৌর্যে সকল বাধা সকল বিঘ্নের অবসান হল। এবারে দেবীর আশীস মাথায় নিয়ে দুর্যোগাতীত নতুন জীবন শুরু। নব উদ্যমে নতুন উজ্জ্বল শুভ জীবন।

দেবীর স্বপ্নে অসময়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বলেই অকাল নীরাজনা।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের একমাস পার না হতেই আবার এক বিপুল বিস্ময়ের ধাক্কা। প্রথমে বিভ্রান্ত সচকিত সকলে। তার পর অকাল নীরাজনা উৎসব সম্ভাবনার রোমাঞ্চও ম্লান এই বারতার কাছে।

মোহিনীময়ী যাযাবরীর লিপি পেয়েছেন রাজা। যাদুকরী সনচরী হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি, কেউ তার কোনো ক্ষতিও করতে পারে নি। সে আছে কোথাও। সে আসবে। আসবে গোগো নবমীর সন্ধ্যায়। অকাল নীরাজনার আগের রাত্রিতে। জীবনের শ্রেষ্ঠতম খেলা দেখাবে সে। আলোকসজ্জায় সমস্ত জালোর আলো হয়ে উঠবে। ঘরে ঘরে তার অভ্যর্থনার দীপ-মালা জ্বলে উঠবে। অভ্যর্থনার আড়ম্বরে রাজকোষ হয়ত অর্ধেক খালি হয়ে যাবে। ফুর্তির বন্যা আসবে। সেই বন্যায় সকলে ভাসবে, সকলে ডুববে। এই উৎসবে আপামর সকলের নিমন্ত্রণ।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের আবেগ কিছুটা স্থির হয়ে আসতে অনেকের মনেই একটা কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। মনে হল, রানীর স্বপ্ন, রানীর অকাল নীরাজনা উৎসব-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই সনচরী ঠিক আগের রাতটিতে রাজ-অঙ্গনে তার আবির্ভাব ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণায় রাজার নিরঙ্কুশ নতুন জীবন-যাপনের প্রতিশ্রুতি লাভের ওপর সে বুঝি একদফা অট্টহাসি ছড়িয়ে রাখার সঙ্কল্প করেছে। রানীর প্রতি এ-ই বুঝি তার সব থেকে মর্মান্তিক পরিহাস।

গোগো নবমীর সন্ধ্যায় রাজ-ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হবার লোভ সংবরণ করতে না পারলেও মনে মনে বিচলিত হল অনেকেই। রূপের মদির হাতখানি বুকের তলায় যতই উদ্দাম হোক, ওই অনমিতা মহীয়সী রাজমহিষীকে অন্তর থেকেই শ্রদ্ধা করে সকলে। তাই মনের তলায় একটা অস্বস্তিও থিতিয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। সেই সঙ্গে দেবী শাকম্ভরীর কোপের শঙ্কাও।

যত রূপসী উর্বশী সদৃশ্যই হোক সনচরী, আসলে সে তো গণিকা বই আর কিছু নয়। গণিকা যে তার প্রমাণ হয়ে গেছে। অন্যথায়, অতি-সাধারণ যাযাবরী হলেও রাজমহিষীর সম্মান সে পেত, রাজার অন্তঃপুরে স্থান হত তার। রাজা কোনো বাধায় কান দিতেন না। মন্ত্রী দেবরাজ তার সমস্ত অতীত খুঁড়ে বার করেছেন। শুনেছেন, কোথাকার এক উঁচু বংশের মেয়ে ছিল সে। সনচরী বিশ্বাস করে না সে বিদেশিনী। তার দৃঢ় বিশ্বাস সে এখানকার রাজপুত বংশের মেয়ে। পাঁচ বছর বয়সে ওর দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যেত না। মনে হত, স্বর্গের কোনো শাপভ্রষ্ট দেবী মর্ত্যের ঘর আলো করতে এসেছে। কিন্তু বাপ-মা উচ্চবংশীয় হলেও গরীব। ওইটুকু মেয়ে খেয়াল-খুশিমত যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াত। বেদেনীরা চুরি করে নিয়ে গেল তাকে। মেয়ের শোকে বাপ-মাও বেশি দিন বাঁচল না।

বেদেনীদের পুরুষেরা ফাঁক পেলে ডাকাতিও করত। তাদেরই এক দল সময়কালে দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়ে উঠেছিল। উঠতি বয়সে সনচরীকে নিয়ে বেদেনী আর ডাকাতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। বেদেনীরা তাকে নাচ-গান-যাদুর খেলার মধ্যেই ধরে রাখতে চায়। কিন্তু ধনীর চোখ-মন ধাঁধিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করার মতো এত বড়

টোপ ডাকাতেরা হেলায় নষ্ট করতে রাজী নয়। ওই দলের পিথল সর্দারের নামে তখন ছেলে-বুড়োর বুক কাঁপে। তার ইচ্ছে সনচরী ভগতন হোক। নাচ-গান পেশা যে গণিকাদের, তারা ভগতন হবার আগে তাদের মাটির গণেশ অথবা কোনো সাধুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু পিথলও অনেকদিন সুবিধে করে উঠতে পারে নি, তার কারণ বুড়ী মা মেয়েটাকে সর্বদা চোখে চোখে আগলে থাকত। সনচরী ওই বুড়ীর সম্পত্তি। সে-ই চুরি করেছিল তাকে। সে-ই সনচরীকে বলেছে ও রাজপুত বংশের মেয়ে। পিথলের লোহার মতো দুই হাত নিশপিশ করত, ইচ্ছে হত বুড়ীকে গলা টিপে দেয় শেষ করে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, ওই বুড়ীর জন্যেই আজ এত আয়-পয় তাদের। ডাকাত হলেও তারা সংস্কারাচ্ছন্ন। বেদেনীর দল আর ছোটখাটো ডাকাতের দলের উৎপত্তি ওই বুড়ী মায়ের দুই হাত থেকে। একদা দুই দলেরই কর্ত্রী ছিল সে। ছেলেদের বিশ্বাস করে না, নিজেরও শক্তি কম, তাই সনচরীকে আগলে রাখার জন্য কনড়কে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল বুড়ী মা। বুনো গোঁয়ার কনড় ছায়ার মতো মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। বুড়ীটা মরলেই কনড়কে কেটে কুচি-কুচি করবে পিথল, ঠিক করেই রেখেছিল।

তবু এক রাতে ফাঁক পেয়েছিল পিথল। বুড়ী মা বেশিরকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তার জন্যে গাছ-গাছড়ার শেকড় সংগ্রহে বেরিয়েছিল কনড়—কোনো কারণে আটকে গিয়ে রাতেও ফেরে নি। সেই রাতেই পিথল চুরি করেছিল সনচরীকে—সনচরী সাদা মনেই বিশ্বাস করেছিল তাকে। পিথল সোজা তাকে পাহাড়ের এক সাধুর কাছে নিয়ে এসেছিল, তার সঙ্গে বিয়ে হলেই সনচরীর ভগতন হতে আর বাধা থাকবে না।

সনচরী বিপদ বুঝেছিল। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে পিথল তাকে খুন করে পাহাড়ে পুঁতে ফেলতেও দ্বিধা করবে না। সে জানাল, ভগতন হতে তার আপত্তি নেই, আর ঘরে ফিরে বুড়ী মাকে ও বলবে নিজের ইচ্ছেতেই সে ভগতন হয়েছে, কারণ এই বেদেনীর খেলা আর নাচ-গান সত্যিই তার একটুও ভালো লাগছে না—জীবন সে ভোগ করতেই চায়। কিন্তু আপাতত সাধুকে সে বিয়ে করবে না, মাটির গণেশ বিয়ে করে ভগতন হবে—একই তো কথা। পিথল যদি এই শর্তে রাজী না হয় তবে সে যা খুশি করতে পারে।

নিরুপায় সনচরী সেই রাতে আরো কিছু তরল আশ্বাসে পিথলকে ভুলিয়েছিল, সে-খবর মন্ত্রী দেবরাজ জানেন না। মাটির গণেশ বিয়ে করে সে ভগতন হয়েছিল, রাজ-বধূর মর্যাদা লাভের লোভেও এই সত্যটা সনচরী গোপন করে নি মন্ত্রীর কাছে। অকপটে সত্য বলেছে। কিন্তু এই সত্যটুকুই রাজার অভিলাষে ছাই ঢালার পক্ষে যথেষ্ট। এক রাজা ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোনো পুরুষ গণিকা মেয়ের যৌবনে অভিসারী হয় নি—এ কথা বিশ্বাস করবে কে? হয়ই যদি বড় বংশের মেয়ে, ভগতনের কলঙ্কতিলক সে কপাল থেকে মুছবে কি করে?

এই এক রাস্তা ধরেই সনচরীকে রাজার রাজমর্যাদা দানের সঙ্কল্প ঘুচিয়ে দিয়েছেন অধিকারী দেবরাজ।

তাই প্রজাদের লোভের তলায় তলায় একটা অজ্ঞাত শঙ্কা কিসের। গণিকা সনচরী দেবী-স্বপ্নাদিষ্টা রাজমহিষীর দৈব-ইচ্ছাটাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভাসিয়ে দিতে আসছে। কাল ভোরে যেখানে শুচিসুদ্ধ নীরাজনা উৎসব, আজ সেখানে আত্মগ্রাসী বিবেকগ্রাসী মোহময়ী নটীর নৃত্য।

॥ দুই ॥

গোগো নবমীর সকাল থেকে জালোরের বাতাস এক উদগ্র উত্তেজনায় ভরপুর। এক বৃহৎ একক বাসনার বেগে সমস্ত ভয়-শঙ্কা মিলিয়ে গেছে। উত্তেজনা ক'দিন থেকেই চলেছে। যেদিন থেকে ক্রীড়াঙ্গনে সাজ-সজ্জার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। থমথমে জালোর পাহাড়ের অনড় তপস্যাও ঘুচে গেছে যেন, জঙ্গল মহীরুহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানি ঘটেছে ব্যাপকভাবে—গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে তারা রাজঅঙ্গনের দিকে চলেছে। দূরে, বহু দূরে মরুভূমির ঢেউ খেলানো সোনালি বালি দেখা যায় এখন নগর-প্রান্ত থেকে।

সাজসজ্জা প্রস্তুত। আলোকমালা প্রস্তুত।

একটা শক্ত সুদৃঢ় দড়ি বাঁধা হয়েছে জালোর পাহাড়ের চূড়া থেকে বারো শ' ফুট উঁচু রাজদুর্গের চূড়া পর্যন্ত। অত মোটা দড়িও এত নীচু থেকে ভালো করে চোখে ঠাওর হয় না। রাতে তো হবেই না। এই দড়ি বাঁধা দেখেই বোঝা গেল সনচরী কোন পথে আসবে, জালোর পাহাড়ের এক চূড়া থেকে দুর্গচূড়ার দিকে আসবে সে। রাজা বিরম স্বয়ং কবার করে সমস্ত ব্যবস্থা তদারক করেছেন।

সূর্য অস্ত গেল।

আলোর বান ডাকল। রাজার ক্রীড়াঙ্গনে মানুষের মাথার সমুদ্র। সকলের উদ্‌গ্রীব স্তব্ধ দৃষ্টি সুদূর শূন্যের দিকে, জালোর পাহাড়ের চূড়ার দিকে, দুর্গ-চূড়ার দিকে। সেই একাগ্র দৃষ্টির আঘাতে আঘাতে বাতাসও বিহ্বল বুঝি। বাঁশের সঙ্গে বাঁশ বেঁধে বেঁধে আলোকসজ্জা উঁচু থেকে উঁচুতে তোলা হয়েছে, আলোর রোশনাই ছুটেছে আকাশের দিকে।

আসছে। আসছে। যাদুকরী সনচরী আসছে। ওই দেখা যায়—ওই ওই ওই।

জালোর পাহাড় দেখা যায় না, দড়ি দেখা যায় না—সেদিক থেকে মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে নাচতে নাচতে একটা আলোর বিন্দু ক্রমশ বড় হয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে।

ওই ওই ওই।

লক্ষ জনতার উল্লাস রাজঅন্তঃপুরে রাজমহিষী রত্নাবাঈয়ের কানে এসে পৌঁছুল। তাঁর ধমনীর সব রক্তকণা মুখে এসে জমাট বেঁধেছে যেন। দুই চক্ষু ধকধক করে জ্বলছে। নিজেকে নির্মম শাণিত কঠিন করে তুলতে চেষ্টা করছেন তিনি। বহুক্ষণ ধরেই নিজের সঙ্গে এক মর্মান্তিক প্রস্তুতির যোঝাযুঝি চলছে। তবু জনতার উল্লাস কানে ভেসে আসতেই এত চমকে উঠলেন কেন রাজমহিষী? এমন বিষম চমক লাগল কেন।

রাজমহিষী রত্নাবাঈ উৎসবে আসেন নি। শান্ত মুখে রাজাকে জানিয়েছেন, তিনি আসবেন না। দেবী শাকম্ভরীর মন্দিরে যাবেন। সমস্ত রাজ্যের মনটিকে নিজের মধ্যে

ধরে রেখে দেবীর স্তব করবেন তিনি, আসন্ন নীরাজনার শুচিতা রক্ষা করবেন।

রাজা বিরম মনে মনে খুশি হয়েছেন, ভারী স্বস্তি বোধ করেছেন। এইটুকুই আশা করছিলেন, এই উৎসবে রত্নাবাঈয়ের অনুপস্থিতিই কামনা করেছিলেন তিনি। উৎসবে আর একজনকেও চান নি তিনি। অধিকারী দেবরাজকে। তাঁর সামনে থাকাটাই যেন বিস্মৃতির প্রতিবন্ধক। তা রাজার সেই আশাও পূরণ হয়েছে। পূর্বভাগেই অধিকারী জানিয়েছেন, তিনি অসুস্থ, উৎসবে হয়তো যোগদান করা সম্ভব হবে না। সম্ভব হয় নি। নিশ্চিন্ত হয়ে রাজা বিরম মনে মনে হেসেছেন।

ইচ্ছে করলেই মহিষী রত্নাবাঈ সামনের গবাক্ষ খুলে প্রজাদের এই সম্মিলিত উচ্ছ্বাসের উৎসরূপিণীকে দেখতে পারেন। কিন্তু গবাক্ষ বন্ধ, রত্নাবাঈ দেখবেন না, দেখার প্রয়োজন নেই। তবু ভিতরে ভিতরে যেন একটা দেখার কারিগরী চলেছে। প্রজাদের সম্মিলিত উল্লাস যত বাড়ছে, ততো যেন এক গণিকা নটীর পদধ্বনি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

কিন্তু ক্রোধের বদলে রানী এই মুহূর্তে এক অব্যক্ত অস্বস্তি বোধ করছেন। নটীর গরিমা-দৃপ্ত জ্বলজ্বলে মুখখানা স্মরণ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন দেবী শাকম্ভরীকে দেখলেন তিনি। যতবার চেষ্টা করলেন ততবার। এ কি কাণ্ড ! দেবীমন্দিরে যাবার কথা আছে বলেই কি এই বিভ্রম ?

অথচ রানীর শত্রু, সমগ্র জালোরের শত্রু ওই নটীর সঙ্গে আজ অপরাহ্ণেই মুখোমুখি দেখা হয়েছে তাঁর, কথা হয়েছে। দুর্বিনীতা, পরিহাসমুখরা অসমসাহসিকা যাদুকরী আজকের মতো বিদ্রূপ আর বোধ হয় কোনো দিন করে নি ! অন্য দিন হলে মহিষী সম্ভবত তার জিহ্বা কেটে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতেন। কিন্তু আজকের সমগ্র পরিহাস দেবীর মতোই শান্ত সংযত চিত্তে রত্নাবাঈ সহ্য করেছেন। সহ্য করার কারণ ছিল।

কেউ জানে না, এই দীর্ঘদিন যাদুকরী সনচরী গোপনে কোথায় কাটাল। রাজা বিরম জানেন না, প্রজারা জানে না, রাজপরিজনেরাও জানে না।

শুধু রাজমহিষী রত্নাবাঈ জানতেন, আর অধিকারী দেবরাজ জানতেন, আর জনাকয়েক অতি বিশ্বস্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পরিচারক এবং পরিচারিকা জানত।

যাদুকরী সনচরী রাজদুর্গেরই এক নিভৃত গোপন কক্ষে রাজমহিষী রত্নাবাঈয়ের স্বেচ্ছা-বন্দিনী ছিল বিগত চার মাস।

চার মাস আগে নির্বাক রাজমহিষীকে এই প্রস্তাব সনচরীই দিয়েছিল। অধিকারী দেবরাজ তখন রাজ্যের অমঙ্গলের কাঁটা নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু রাজার চোখ মন যাকে ঘিরে রয়েছে তাকে সহজে নির্মূল করার মতো সুযোগ তিনি পাবেন কি করে ? এই এক রমণী রাজ্যে অবস্থান করলেও পাপের আগুন লাগবে, আবার দিনের আলোর মতো বিশ্বাস্য কৌশল ভিন্ন তাকে সরাতে গেলেও রাজরোষের আগুন জ্বলবে। নিজের জন্য ভাবেন না দেবরাজ, রাজমহিষীর জন্যেই তাঁর যত ভাবনা। ক্রুদ্ধ রাজা ওই মহীয়সী রানীর কোনো ক্ষতি করলে রাজ্যের কল্যাণ রাহুকবলিত হবে তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সমস্যার সমাধান নটীই করে দিল। দেবী শাকম্ভরীর ইচ্ছা ভিন্ন এমন মতি হবে কেন যাযাবরীর! মহিষী রত্নাবাঈয়ের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের অভিলাষিণী হল সে। কেউ থাকবে না সেখানে, কেউ জানবে না। চার মাস আগের এক সন্ধ্যায় সনচরী ওড়নায় মুখ ঢেকে রাজার প্রমোদশালা থেকে বেরুল। রক্ষীরা বহিরাগত বিপদ থেকেই তাকে রক্ষা করার জন্য মোতায়েন। কিন্তু যাদুকরী নটী স্বেচ্ছায় বেরুলে কে তাকে রুখবে? গোপনে রাজ-অভিসারেই চলল কিনা তাই বা কে জানে! কিছু জিজ্ঞাসা করার মতো বুকের পাটাও নেই কারো।

দুর্গের মধ্যেই মহিষীর সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। মহিষী এলেন। এভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অভিলাষ কেন, জানার কৌতূহল ছিল। কিন্তু ঘৃণায় অন্তরাত্মা আচ্ছন্ন তাঁর। আগেও বারকয়েক দেখেছেন এই নারকী যাদুকরীকে। ঘৃণায় বিদ্বেষে মুখের দিকে তাকাতে পারেন নি। আজও পারলেন না।

সনচরী বলল, রত্নাবাঈ, আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।

এক রাজা ভিন্ন রাজমহিষীকে আর নাম ধরে কেউ ডাকে নি কখনো। কানে যেন গলিত সীসা প্রবেশ করল। এই মুহূর্তে দুর্গের মধ্যে এই পাতকীকে যদি কেটে কুচি কুচি করে মাটির নীচে পুঁতে রাখার নির্দেশ দেন, কেউ টেরও পাবে না। সেই নির্দেশ দেবার অদম্য ইচ্ছেও হল।

ইচ্ছাটা সনচরী যেন আঁচ করে নিল। হাসি মুখে বলল, আমি তোমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছি কাকপক্ষীও জানে না। বিপদের ভয়ে প্রমোদশালার কাউকে জানিয়েও আসি নি কোথায় এসেছি। ইচ্ছে করলে তুমি যেমন সাধ যায় তেমন প্রতিশোধই নিতে পার। তোমার মহীয়সী নামের কলঙ্ক কেউ টের পাবে না।

আস্তে আস্তে মহিষী মুখ তুললেন এবার। তার পরেই বিস্মিত, স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। যাদুকরী হাসছে। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে চেষ্টা করেও কোনো ছলনা, কোনো কলুষতা আবিষ্কার করতে পারলেন না তিনি। মনে হল একে যেন তিনি আর দেখেন নি। যাদুবলেই যেন সমস্ত পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বের এক জ্যোৎস্না-ধোয়া সুষমায় নিজেকে আবৃত করে বসে আছে, তার দিকে চেয়ে হাসছে মুখ টিপে।

স্ত্রীলোক হয়েও রত্নাবাঈয়ের চোখে পলক পড়ে না ক্ষণকাল। জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও তুমি?

আমি কিছু চাই না। আমি তোমাদের একটু সাহায্য করতে এসেছি। তোমাকে আর অধিকারীকে। রাজার জন্য তোমরা চিন্তান্বিত, রাজ্যের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তোমরা কাতর। তোমরা বিশ্বাস করো না, আমি রাজপুত মেয়ে, রাজপুতের রক্ত আমার শিরায় বইছে। অধিকারীর ধারণা আমার জন্যে রাজা-প্রজা সব জাহান্নমে গেল। যত বড় দুরাচারিণীই হই, রাজ্যের অকল্যাণ শুনলে মন খারাপ হয়। তাই এলাম, যদি কিছুদিনের জন্য একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।

ঘৃণায় আর রাগে রাজমহিষীর সমস্ত মুখ আবার কঠিন হয়ে উঠল। তীব্র শ্লেষে বললেন, রাজপুতের নাম মুখে আনতে লজ্জা করে না তোমার? যদি বিদেশিনী

ব্যভিচারণী না হও তাহলে কিছুদিনের জন্য কেন, বরাবরের জন্য গা-ঢাকা দিতে পার ? মরতে পার ?

সনচরী খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই হাসি রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুৎ-কশার আঘাত হানল। সনচরী হাসি থামিয়ে বলল, রত্নাবাঈ, তোমাতে ঈর্ষা মানায় না, তুমি তুচ্ছ ঈর্ষার ঊর্ধ্বে উঠতে পার বলেই আমার বিশ্বাস। আমার আদর্শ তুমি। একদিন স্বপ্ন ছিল রাজমহিষী হব, তা যখন হওয়া হল না, তখন তোমাকে দেখেই শান্তি। আমি মরলেই কি রাজার আর প্রজার কামনার জগৎ থেকে সনচরী মরবে তুমি আশা কর ? সনচরী যে কামনার আগুন হয়ে তাদের রক্তে জ্বলছে গো !

রাজমহিষী কি গলা টিপে ধরবেন ওই ডাকিনীর, বিষ-জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে আনবেন ? নাকি এক্ষুনি লোক ডেকে চিরতরে এই পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেবেন ? প্রাণপণ চেষ্টায় রানী সংবরণ করলেন নিজেকে। যাযাবরী কি উদ্দেশ্যে এসেছে এখনো জানেন না। থমথমে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, সময় নষ্ট না করে কি জন্যে এসেছ বল।

কিছুদিন এই দুর্গে তোমার অতিথি হয়ে থাকব বলে এসেছি। সনচরীর উক্তিতে লেশমাত্র দ্বিধা নেই। বলল, যত বড় পাপিনীই হই, আমরাও একটু আধটু ধর্ম-কর্ম করি। সামনের মাস থেকে আমার একটা গোপনীয় ব্রত শুরু হবে, কি ব্রত জিজ্ঞাসা করো না। তিন মাস চলবে সেই ব্রত। সব মিলিয়ে মোট এই চার মাস আমি তোমার আশ্রয়ে থাকতে চাই—আজ থেকেই।

এখানে থাকতে চাও কেন ?

সনচরী হাসল।—তোমার রাজার জ্বালায়। আর কোথায় থাকব বল, পাতালে ঢুকলেও তোমার রাজা তো মাটি খুঁড়ে বার করবেন আমাকে। কিন্তু তোমার জিম্মায় এ দুর্গে আমি থাকতে পারি এ তিনি স্বপ্নেও ভাববেন না।

রাজার সম্বন্ধে এই অশোভন উক্তির বৃশ্চিক জ্বালা সহ্য করতেও সময় লাগল রত্নাবাঈয়ের। তারপর নির্মম কঠিন স্বরে বলল, তুমি ভীরু মিথ্যাচারিণী, অধিকারীর ভয়ে আর আমার ভয়ে ছলনা করে তুমি আমারই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছ !

তেমনি সহজ ব্যঙ্গের স্বরে সনচরী জবাব দিল, মহারানীর জ্ঞানবুদ্ধি আরো একটু প্রখর হবে আশা করেছিলাম। ভয়ের কারণ থাকতে পারে, কিন্তু তার জন্য তোমার কাছে আসব কেন ? তোমার অধিকারীকে ক্ষমতাচ্যুত করে সব ভয় ঘুচিয়ে দিতে আমার কতক্ষণ লাগবে ? ভয়ের কথা রাজাকে বললে তার প্রাণ নিতেই বা কতক্ষণ লাগবে ? আর তুমি ? তোমার ক্ষমতা কতটুকু সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট অবকাশ কি তুমি পাও নি ?

যত ক্রুদ্ধই হোন, রত্নাবাঈ এই উক্তির নির্মম সত্যের দিকটাও উপলব্ধি করলেন। ফলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে তিনি প্রতীক্ষাই করলেন শুধু।

সনচরী বলল, তার থেকে আমার কথা তোমার বিশ্বাস করাই মঙ্গল। চারটে মাস তুমি অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারবে। সাধ্য থাকে তো, এই দীর্ঘ সময়ে রাজা আর প্রজাদের মন ফেরাতে চেষ্টা করো। এক মাস বাদে রাজা আমার খবর পাবেন। তিনি জানবেন,

ঠিক তিন মাস বাদে আমি আবার তাঁকে দেখা দেব। তাঁকে, আর সকলকে, গোগো নবমীর রাতে—গত বছর যে রাতে আমি রাজার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম। সকলে জানবে, সেই স্মৃতি উৎসবের ঝোঁকেই আমি আবার এসেছি। ইতিমধ্যে রাজা আর প্রজার মনের যদি পরিবর্তন ঘটাতে পার, তাহলে আর ভাবনা কি—সেটাই তো সনচরীর মৃত্যুর সামিল।

রত্নাবাঈ স্থির নেত্রে চেয়ে আছেন তার দিকে। দুর্বোধ্য লাগছে। জিজ্ঞাসা করলেন, আর মনের পরিবর্তন যদি না ঘটে, তা হলে?

সনচরী তরল জবাব দিল, তা হলে কি আর করবে বল। তা হলে তোমার হার হল ধরে নিও—পরিবর্তন যদি না-ই হয়, মিথ্যে আর সকলকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি—বিশেষ করে রাজাকে। আবার তখন তোমার আশ্রয় ছেড়ে তাঁর প্রমোদশালার আতিথ্য নেব।

রাগ নয়, রাজমহিষী দ্রুত চিন্তা করছিলেন। চারটে মাস দীর্ঘ সময়ই বটে। দেবী শাকম্ভরীই এমন অভাবিত সুযোগ এনে দিয়েছেন কিনা কে জানে! নইলে যাদুকরী এ-রকম বিচিত্র প্রস্তাব দেবে কেন?

সনচরীর মুখ থেকে লঘু চপলতা মিলিয়েছে। আবার সেই অগোচরে নিষ্পলক চেয়ে থাকার মতোই সুষমামণ্ডিত মুখ। বলল, কিন্তু একটা কথা, এই চার মাস কেউ জানবে না, কেউ কোনোরকম সন্দেহ করবে না, কেউ আমার কোনো ক্ষতি করবে না—এই চার মাস আমাকে রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব তোমার—যতক্ষণ আমি এই দুর্গে আছি ততক্ষণ। আমি দুর্গ থেকে বেরুবার পর, তুমি আর দেবরাজ সমস্ত রাজশক্তি নিয়ে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও আমি আপত্তি করব না—তোমাদের সেই শত্রুতার সঙ্গে আমি অনায়াসে যুঝতে পারব, তোমাদের কেরামতি আমার জানা আছে। তা হলেও একমাত্র তোমাকেই আমি শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি, আমি দুর্গে থাকাকালীন সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে। মনে রেখো, আমি বিদেশিনী নই, আমি রাজপুত মেয়ে।

রানী আর কিছু বলেন নি। অধিকারীর সাহায্যে সনচরীর দুর্গে থাকার সমস্ত গোপন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর অধিকারীকে বলেছেন, প্রতিকারের ব্যবস্থা আমরা ভাবব, রাজ্যের কল্যাণে প্রতিকার করবও—দেখা যাক, চার মাসে শাকম্ভরী কি করেন। কিন্তু সনচরীর দুর্গে থাকাকালীন বিশ্বাসভঙ্গের কোনো কারণ যেন না ঘটে—প্রতিকারের লোভ যেন তিনি সংবরণ করেন।

ধীর স্থির চিত্তেই তার পর রাজ্য বনজঙ্গল পাহাড় মালভূমি তোলপাড় করে সনচরীর অন্বেষণ-পর্ব দেখছেন তাঁরা। রাজা বিভ্রান্ত হয়েছেন, সনচরীকে না পেয়ে দিশেহারা হয়েছেন। প্রজারাও হতভম্ব।

ইতিমধ্যেই রানীর অকাল নীরাজনা পালনের স্বপ্নের কথা সকলে শুনেছে। সনচরীর গোগো নবমীতে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা শোনার অনেক আগে। রাজা বিরম এবং প্রজাদের মনে একটা ভুল ধারণার অস্বস্তি বড় হয়ে উঠেছে। সকলেরই বিশ্বাস, রানীর অকাল নীরাজনা পালনের স্বপ্নটাকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই সনচরীর আগের দিন গোগো নবমীর রাত্রিতে সাড়ম্বর আবির্ভাবের বাসনা। কিন্তু রানীর স্বপ্ন দেখার অনেক আগেই

যে সনচরীর ওই রাতে আত্মপ্রকাশের সঙ্কল্প ছিল, সে শুধু স্বয়ং রানী রত্নাবাঈ জানেন আর অধিকারী দেবরাজ জানেন। এই সত্যটা আর সকলেরই অগোচর।

একে একে দিন কেটেছে। কি অপরিসীম অসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে কেটেছে তা শুধু রানীই জানেন। এই কটা মাসের অবকাশে রাজার চিত্ত আর জনতার চিত্ত অন্তরমুখী করে তোলার কম চেষ্টা করেন নি তিনি। প্রজাদের উল্লাসে একটা সাময়িক ছেদ পড়েছিল বটে, কিন্তু রাজার মন তিনি ফেরাতে পারেন নি। এ যেন সেই রাজাই নয়, সদা বিষণ্ণ, রাজকার্যে নিরুৎসাহ, আচ্ছন্ন। সনচরীর আবির্ভাব ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা আর উদ্দীপনার বন্যা এল যেন। প্রজারা আগের থেকেও দ্বিগুণ উল্লসিত হয়ে উঠল, রাজার অবসাদ কেটে গেল। দিনে দিনে উদগ্র হয়ে উঠলে লাগল একটা ব্যাপক আশা, ব্যাপক আকাঙ্ক্ষা। রানী আর অধিকারী দেবরাজের সকল আশা সকল চেষ্টা ধূলিসাৎ।

দিনে দিনে মহিষী রত্নাবাঈয়ের মুখ কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। দেবরাজও যেন পাষাণ-মূর্তি।

তার পর এই দিন। গোগো নবমীর দিন। কিন্তু আজও এই রূপসর্বস্বা ব্যভিচারিণীর বিচিত্র ব্যবহারে মনে মনে রানী ঈষৎ বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। সনচরী অহরাহ্নে রানীকে সংবাদ পাঠিয়েছিল। রত্নাবাঈ যান নি। নিজের ঘরে তাকেই ডেকে পাঠিয়েছেন। একেবারে গোপনেই বটে। যদিও আজ আর এত গোপনতার প্রয়োজন ছিল না—অন্তঃপুরেরও আজ সকলের চোখ আর সকলের মন বাইরের দিকে, আসন্ন উৎসবের দিকে। শুধু একটা ওড়নায় মুখ ঢেকে এলেই হয়। কিন্তু তবু রানী সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি কথার খেলাপ করবেন না। নটী দুর্গে থাকাকালীন কারো কোনো কৌতূহলও স্পর্শ করতে দেবেন না।

একখানা পাথরের মূর্তির মতো রানী পালঙ্কে বসেছিলেন। শেষের এই কটা দিন কি এক অজ্ঞাত ভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কথা বলতে পারেন নি। স্বয়ং রাজা বিরম পর্যন্ত পারতপক্ষে তাঁর দিকে তাকান নি, এড়াতে চেষ্টা করেছেন।

আজ ব্যতিক্রম ঘটল। সনচরী সকৌতুকে চেয়ে আছে তাঁর দিকে, হাসছে মুখ টিপে। তার হাতে সুন্দর কাজ করা ছোট কাঠের বাক্স একটা।

কি বলবে? রানীর ধীর প্রশ্ন।

তোমারই হার হল মনে হচ্ছে....কিন্তু কি আর করবে বল। আমি নিরপরাধ....যথেষ্ট সময়ই দিয়েছিলাম।

রানীর দুই চক্ষু দপ করে জ্বলে উঠল একবার। পরক্ষণেই স্থির শান্ত আবার। সনচরী তেমনি খুশির চপলতায় বলে গেল, আর দু-ঘণ্টা মাত্র দুর্গে আছি, তারপরেই তোমার ছুটি—এর পর আমার দায়িত্ব আমারই। তুমি কথা রেখেছ, তোমাকে ধন্যবাদ।

কেন এসেছ?

এসেছি তোমাকে একটা উপহার দিয়ে যাব বলে। এর পর তুমি আর আমাকে সহ্য করবে না নিশ্চয়, তাই আর হয়তো আমাদের দেখাও হবে না। রাজার মন পেলাম,

রাজ্যসুদ্ধু লোকের মন পেলাম—এত বড় প্রাপ্তির পর তোমার জন্যে কিছু রেখে যাবার লোভ কিছুতে ঠেকাতে পারলুম না—বিশ্বাস কর, রাজপুত মেয়ে মিথ্যা বলে না, এটা ঠাট্টা নয়, এর মধ্যে তুমি কিছু পেতেও পার।

ধীর নির্মম নিষ্পলক নেত্রে রাণী দেখেছেন তাকে।—কি আছে ওতে?

এক ধরনের বিষ। যাদুকরীর বিষ। খেলে মৃত্যু হয় না, ভিতরটা জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সোনা করে দেয়। কিন্তু দোহাই তোমার, দেখার আগে আগুনে নিক্ষেপ করো না, আর তোমার দেবী শাকম্ভরীর দিব্বি, আমি উৎসবে এসে পৌঁছুনোর আগে এ বাক্স খুলো না, খুললে রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়েছে। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের ছায়া স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। রানী নিশ্চল স্থাণুর মতো বসে তেমনি।

তাঁর মুখের ওই দৃপ্ত শিখার সঙ্গে কোনো দুর্বলতার আপস নেই।

রাজক্রীড়াঙ্গনে উল্লাসমত্ত শত-সহস্র দর্শকের মিলিত কণ্ঠস্বর আকাশ ছুঁয়েছে। বন্ধ গবাক্ষের ভিতর দিয়েও সেই উল্লাসধ্বনি রানীর কানে বাজছে।

দড়ির সেতু ধরে পাপ-নটী এসে পৌঁচেছে বোঝা গেল।

হঠাৎ রানীর চোখ পড়ল সেই ছোট কাজ-করা কাঠের বাক্সটার দিকে। ঘৃণায় এতক্ষণ একবারও চোখ চেয়ে দেখেন নি ওটা। সনচরী যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি পড়ে আছে। এবারে ঈষৎ কৌতূহল বোধ করলেন রানী। নটী উৎসবে এসে গেছে যখন, খুলে দেখা যেতে পারে কি আছে ওতে—যাদুকরী কোন্ বিষ উপহার দিয়ে গেল।

রানীর মুখে কঠিন হাসির রেখা ফুটল একটু। হাত বাড়িয়ে বাক্সটা টেনে নিলেন। আলাদা সুতোয় চাবিও বাঁধা। বাক্সটা খুললেন। ভিতরে কাপড়ে জড়ানো তুলটের মতো মোড়া কি জিনিস একটা। সেটাও খুললেন।

তার পরেই অবাক একটু। তাঁর উদ্দেশেই লেখা ছোট একটা লিপি।

কিন্তু পড়তে পড়তে সর্বাঙ্গে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-কশার আঘাত পড়তে লাগল। থর থর করে কাঁপতে লাগলেন রানী রত্নাবাঈ। চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, লিপির অক্ষরগুলো শুধু আগুনের মতো জ্বলছে।

পড়া শেষ হতে রানী নির্বাক স্তব্ধ কয়েক নিমেষ, দেহে যেন প্রাণ নেই। তার পরেই দিশেহারার মতো ছুটে এসে এক ঝটকায় গবাক্ষ খুলে দিলেন তিনি।

উৎসবের আলোকবন্যায় আকাশ লালে লাল। ওই দূরে অগ্নিমূর্তির মতোই মহাশূন্যে দুলছে কেউ, ভাসছে কেউ, নাচছে কেউ। অব্যক্ত ত্রাসে শিউরে উঠলেন রানী, আকাশ ছাওয়া ওই আলোর আগুন আর মূর্তির আগুন যেন তাঁর মাথায় ভেঙে পড়বার জন্যেই এগিয়ে আসছে।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে রানী ছুটলেন দুর্গপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য।

রথ প্রস্তুত ছিল। কারণ রানীর দেবী শাকম্ভরীর মন্দিরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু দ্রুত যে পথে রথ চালাতে নির্দেশ দিলেন তিনি, সেটা মন্দিরের পথ নয়, অধিকারী

দেবরাজের গৃহের পথ।

বায়ুবেগে রথ ছুটেছে। ভিতরে প্রাণপণ বলে নিজেকে সম্বরণ করে বসে আছেন রাণী রত্নাবাঈ। সমস্ত মুখ ঘর্মাক্ত। তাঁর দুই অধর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বিড় বিড় করে বলছেন কিছু তিনি। বলছেন, এ কোন্ আগুন তুমি জ্বালিয়ে গেলে সনচরী, এ কোন্ বিষ তুমি রেখে গেলে যাদুকরী....দেবী শাকম্ভরী, রক্ষা কর রক্ষা কর রক্ষা কর.... ।

॥ তিন ॥

সনচরীর এই দড়ির খেলা দেখেই রাজা প্রথম মুগ্ধ হয়েছিলেন।

অবশ্য তাঁকে মুগ্ধ করার ষড়যন্ত্রটি বিধাতা অনেক আগেই সম্পন্ন করে রেখেছিলেন। গহন অরণ্যে সেই কল্পান্তক প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুমূর্ষু নিশ্চেতন রাজার ওষ্ঠাগত প্রাণটি অসামান্য রমণীর যৌবন-তাপে যেদিন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, ন্যায়নিষ্ঠ অগ্নিবংশের সন্তান রাজা বিরমের বুকের তলায় সেদিন থেকেই এক বিচিত্র আলোড়নের সূত্রপাত। কিন্তু রাজা নিজেই সেদিন একে মোহ ছাড়া আর কিছুই ভাবেন নি। তাই নিভৃতে যে বাসনা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, কর্তব্য আর বিবেকের কশায় সেই নিভৃতেই তিনি সেটা নিষ্পেষিত করেছিলেন।

কিন্তু অঙ্কুরের বিনাশ হয় নি।

রমণীর রূপ রাজা অনেক দেখেছেন। তাঁর তেজস্বিনী রানী রত্নাবাঈও এমন কিছু কম রূপসী নন সনচরীর থেকে। শুধু রূপে তাঁকে ভোলানো সহজ ছিল না। যাদুকরীর এই রূপ গোড়ায় তিনি প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন। বিচিত্ররূপিণী যাদুকরী অনেক যাদুর খেলা জানে, অনেক ছলা-কলা জানে, ভবিষ্যৎ গণনা করে—এ সবও এমন কিছু আকর্ষণ নয় রাজার কাছে। মোহময়ী যাযাবরীর এক অপরূপ সত্তা উন্মুক্ত হয়েছিল রাজার চোখের সামনে—যে সত্তা সময়ে এই জালোর পাহাড়ের মতো কঠিন, জালোরের ওই মরুভূমির মতোই রুক্ষ, জালোরের এই নিবিড় অরণ্যের মতোই জটিল, আবার জালোরের এই নীল আকাশের মতোই প্রসন্ন উদার। সব মিলিয়ে যাযাবরীর মধ্যে সম্পূর্ণ একটি জালোর কন্যাকে আবিষ্কার করেছিলেন রাজা বিরম।

কিন্তু তার আগে মুগ্ধ হয়েছিলেন ওই দড়ির খেলা দেখে। অবশ্য আজকের মতো এত উঁচুতে দড়ি বাঁধা হয় নি কোনোদিন। দুর্গ বা এই ক্রীড়াঙ্গনও পাহাড়ের ওপরেই অবস্থিত না হলে নীচের লোক যাযাবরীকে একটা বিন্দুর মতোও দেখতে পেত কিনা সন্দেহ।

দেখে দেখে রাজার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, নইলে গোড়ায় গোড়ায় অনেক দিন রাজার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। মনে হয়েছে, এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল। অত উঁচু একটা দড়ির ওপর অমন নির্ভীক সাবলীল ছন্দে কেউ হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়াতে পারে, এ যেন চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। স্বর্গের কোনো অপ্সরা যেন শূন্যপথে এসে এসে কঠিন জালোরের সুপ্ত যৌবনটি জাগিয়ে দিয়ে গেছে। নেচে গেয়ে কখনো ভ্রূকুটি করেছে, কখনো আবেদন পেশ করেছে, কখনো আঘাত হেনেছে, কখনো হাস্য-

পরিহাসের প্রণয়লীলায় নিজেই শতধা হয়েছে, মুখর হয়েছে।

যারা এই কাণ্ড দেখে তাদের বিশ্বাস এটা যাদুর খেলা, যাদু ভিন্ন অমন বিষম উঁচু একটা দড়ির ওপর ঘুরে ফিরে এমন কাণ্ড কে করতে পারে ? তারা জানে যাদুকরী বিদেশিনী যাযাবরী।

কিন্তু পরিহাসের মতো করে সনচরী রাজাকে বলেছে, এটা যাদুর খেলা নয়, রাজার খেলা। এমন মারাত্মক খেলা না দেখলে রাজার চোখ খোলে না বলেই ও প্রাণভয় তুচ্ছ করে দিনে দিনে এমন অসমসাহসিকা হয়ে উঠতে পেরেছে। অতএব কৃতিত্ব রাজার, তাই এটা রাজার খেলা।

পরিহাস হলেও একেবারে মিথ্যে বলে নি বোধ হয়।

অনেক বছর আগে থেকেই সনচরীর বুকের তলায় এই রাজার খেলা বাসা বেঁধে আছে। কিশোরীর সেই যৌবনোন্মুখ কাল থেকে। যাযাবরী বুড়ীমা তার ভবিতব্যের কথা শুনিয়েছিল যেদিন। সে নাকি রাজ-সোহাগিনী হবে, রাজাকে আর গোটা রাজ্যটাকে একদিন হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে। বুড়ীমার সেই উক্তি এক নিশ্চিত বিশ্বাসের মত মর্মমূলে বসে গিয়েছিল। নিজের রূপ সম্বন্ধে সনচরী তেমন সচেতন নয় তখনো। কে রাজা, কেমনধারা দেখতে হয় রাজাকে, সে-সম্বন্ধেও কিছুমাত্র ধারণা নেই তার। কিন্তু তখন থেকেই মনে মনে সে রাজবধূ, রাজ-সোহাগিনী, আর রাজ্যের ইন্দ্রাণী হয়ে বসেছিল।

বুড়ীমারও এই বিশ্বাসই ছিল হয়তো, নয় তো ছেলেদের গ্রাস থেকে সে তাকে এভাবে আগলাবে কেন ? যে যে-ভাবে খুশি চল আপত্তি নেই, কিন্তু সনচরীর দিকে তাকিয়েছ কি ক্ষমা নেই। সময় সময় সনচরী বুড়ীমাকে ঘৃণা করত, সে জানত কোনো জায়গার কোনো এক ঘর থেকে তাকে চুরি করে আনা হয়েছে। সেই অতীতের কোনো কিছুই অবশ্য স্মরণ নেই, আর সত্যিকারের খেদও নেই তার জন্যে কিছু। আসলে এই সত্যটা না জানলেই কোনো গণ্ডগোল থাকত না। কিন্তু এই বুড়ীমার প্রতি তার আকর্ষণও বড় কম ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীমা তার সমস্ত গুণাবলী নিঃশেষে শুধু ওকেই যেন অর্পণ করে গেছে।

যাই হোক, কয়েক বছরের মধ্যেই দলের সর্দার পিথল, আর তার ভাই কুশের মনোবাসনার আঁচ সে অনুভব করেছিল। দুজনেই বুড়ীমার ছেলে। মাঝে অটল-বন্য কনড় না থাকলে ওই ছেলেদের হাত থেকে বুড়ীমাও তাকে রক্ষা করতে পারত কি না সন্দেহ। কনড়কে পোষা জন্তুর মতু ভাবত সকলে। সাধারণ ব্যাপারে নির্বোধ ভাবত। কিন্তু ওই জন্তুসদৃশ নির্বোধ লোকটা তার কাজ বুঝত। তিনটে মরদের শক্তি রাখত। সেই শক্তি নিয়ে ছায়ার মতোই সনচরীর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। সর্দার পিথল বা তার ভাই কুশও জানত, আগের থেকে ব্যবস্থা অবলম্বন না করে, সতর্ক না হয়ে সনচরীর দিকে হাত বাড়াতে গেলে ওই নির্বোধটা খাতির করবে না, হাত দুমড়ে ভেঙে দেবে, তার পর আছড়ে মাথার খুলিসুদ্ধ হয়তো চৌচির করে দেবে। পিথল সনচরীকে ঠাট্টাও করত, বলত, ওই জানোয়ারটাই তোকে খাবে একদিন দেখিস। সনচরী হাসত, হেসে

সস্নেহে অদূরের ওই নিরাসক্ত লোকটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিত, তার পর বলত, খেলেও ও সিংহের জাত, সাপ-খোপ নয়।

ওকে নিয়ে পিথল আর কুশের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন রেষারেষি চলছিল অনেক দিন। বুড়ীমার শরীর খারাপ হতে সেটা আরো বাড়ছিল। তার কিছু হয়ে গেলে তখন কনড় আর ওকে রক্ষা করতে পারবে না। ওদের হাতেই মরতে হবে ওকে। ওর প্রতি দুজনারই লোভ, আবার ওর রূপের ছটার জাল ফেলে অন্য শিকারের চোখ ধাঁধিয়ে সর্বস্ব অপহরণেরও বাসনা।

বুড়ীমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না পিথল। তার আগেই বিপদ বাধাল। সনচরীর ললাটে ভগতনের ছাপ মেরে দেওয়ার জন্য তাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল। প্রাণের দায়ে ত্বরিত দ্রুত চিন্তা করতে হয়েছিল সেদিন সনচরীকে। রাজসোহাগিনী হবে সেই বদ্ধমূল বিশ্বাসটা এই বিপদেও অটুট ছিল। তাই ভেবেচিন্তে বলেছিল, সাধুকে বিয়ে করবে না, মাটির গণেশ বিয়ে করে ভগতন হবে। ওসব সাধু-টাধুকে বিশ্বাস করে না সে, অনেক দেখা আছে, তার থেকে মাটির গণেশ নিরাপদ।

পিথলকে সে ঠেকিয়ে রেখেছিল অসুস্থ বুড়ীমাকে দেখিয়ে। তার প্রতি তার গোপন অনুরাগের কথা স্বীকার করে ছলা-কলায় ভুলিয়েছিল তাকে। অপেক্ষা তো কদিন করতেই হবে, মরার মুখে বুড়ীমা যদি অভিশাপ দেয় তা হলে সর্বনাশ না?

পিথল মোহগ্রস্ত, তাই বিশ্বাসও করেছিল। বুড়ীমার জ্ঞান ছিল না, কিন্তু তবু বিকারের ঘোরে কাকে যেন সে বিড়বিড় করে অভিশাপ দিচ্ছিল, সর্বনাশ হবে, সব সর্বনাশ হবে!

কাঁটা দিয়ে কাঁটা দূর করা ভিন্ন গতি ছিল না সনচরীর। তার যে এমন বিষম ফল হবে তা অবশ্য ভাবে নি। গোপনে সে কুশের শরণাপন্ন হয়েছিল। বলেছে, ভালো তো সে তাকেই বাসে, কিন্তু পিথল যে মাঝখান থেকে এই কাণ্ড করে বসল তার কি হবে? ওকে ভগতন করে বসল! বুড়ীটা মরলে সেই তো জোর করে সনচরীকে দখল করবে, কুশের সঙ্গে তার এতদিনের মিলনের আশা সফল হবে কেমন করে? যৌবনের প্রথম পুরুষ যদি কুশ না হয়ে আর কেউ হয়, সনচরী তাহলে আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োবে।

মোহিনীর মায়ায় কুশও ভুলেছে। সত্যি না হলে সনচরী এত বড় একটা ব্যাপার তার কাছে ফাঁস করবে কেন?

পরের দিন ডাকাতি করতে যাবার কথা ছিল নগরের কোথায়। মায়ের অসুখে ডাকাতি বন্ধ থাকে না। দলের অর্ধেক লোক নিয়ে পিথল উদ্দেশ্যসাধনে চলে গেল। কুশের শরীর ভালো নয়, সে ঘরে থাকল।

কিন্তু ঘরে সে থাকে নি। আগের দিনই পিথলের মৃত্যুবাণ ঠিক করে রেখেছিল। গোপন বারতা পাঠিয়ে আগে থাকতেই রাজসৈন্যকে সতর্ক করে রেখেছিল। দলবলসহ পিথল হতভম্ব, অতর্কিতে কোথা থেকে যমদূতেরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর টেরও পেল না। কুশ বেরিয়ে সংবাদ নিয়ে এল, তার কার্য সমাধা হয়েছে—পিথলের

নিশ্চিত ফাঁসি হবে।

সনচরীকে আড়ালে ডেকে খুশিতে আটখানা হয়ে নিজের কৃতিত্বের কথা ব্যক্ত করল। সনচরীর কাছ থেকে পুরস্কার আশা করল।

ঘৃণায় বিদ্বেষে সনচরীর সমস্ত অঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল। তবু হাসতে হল। তবু পুরস্কার দিতে হল। হাসি মুখে দু হাত বাড়িয়ে সে কুশের ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে আদর করে ঝাঁকিয়ে দিল। এর বেশি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি পরের জন্য মুলতুবী রেখে তাড়াতাড়ি মুমূর্ষু বুড়ীমাকে দেখার অছিলায় সরে গেল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পিথলের ধরা পড়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনেই হয়তো খানিকক্ষণের জন্য চেতনা ফিরেছিল বুড়ীমার। ঘোলাটে চোখে সনচরীর দিকে তাকিয়ে বলল, ধরা পড়ার আগে ও আত্মহত্যা করল না কেন? একটু বাদেই বিকারের ঘোরে ভুল বকতে লাগল আবার।—সর্বনাশ হবে, সক্কলের সর্বনাশ হবে—

সেই রাতেই বুড়ীমা চোখ বুজল।

সনচরী শোক করে নি। সত্যি কথা বলতে কি শোক তার হয় নি। এই মৃত্যুতে জীবনের সব থেকে বড় সঙ্কট ওর নিজেরও। কর্তব্য স্থির করতে হবে। এর পর সে অবকাশ আর হয়তো পাবে না।

লোকজনের সাহায্যে কুশ মা-কে নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে গেল। সনচরী এক ফাঁকে কনড়কে বলে গেল সে যেন কোথাও না যায়, দরকার আছে।

হাতে ঘণ্টা কয়েক মাত্র সময়। যা করার এরই মধ্যে করতে হবে। অন্যথায় এই জীবনের মত আর চিন্তা করার কিছু থাকবে না।

কনড় !

আচ্ছন্নের মতো বসে ছিল বিশালদেহ লোকটা। আস্তে আস্তে ফিরে তাকাল।

সনচরী বলল, এক্ষুনি আমাদের পালাতে হবে, আমার বিপদ, তোমারও বিপদ। ওঠো—

বিপদটা কি সংক্ষেপে তাকে বোঝাল। পিথল কি করে ধরা পড়ল তাও বলল, এই ভাঙা দলের নায়ক এখন কুশ, সে যে কনড়কেও আর ছেড়ে কথা কইবে না তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছে তারা। সকলের অগোচরে জটিল পথ ধরে কোথায় চলেছে সনচরী জানে না। বলতে গেলে সমস্ত রাত ধরেই হেঁটেছে। সনচরী শ্রান্ত-ক্লান্ত, পা ভেঙে পড়ছে, তবু তার দূরে যাবার তাড়া। ভোরের দিকে গহন বনের কাছাকাছি আত্মগোপন করেছে।

ভালো করে দিনের আলো ফোটার আগেই জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। কনড় কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে জানে না। ওর মুখ দেখেও কিছু বোঝার উপায় নেই—ভাবলেশশূন্য। সনচরীর আর পা চলে না, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, বার বার হোঁচট খাচ্ছে। দুই-একবার বিশ্রামের কথা বলেছে কনড়কে, কিন্তু সে কর্ণপাতও করে

নি। তার মুখের দিকে চেয়েও সনচরীর কেমন ভয়-ভয় করেছে।

শেষে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় ভেঙে পড়ে বসে পড়তে গেল। কিন্তু কনড় শক্ত হাতে ধরে ফেলল তাকে। চোখে চোখ রেখে তাকাল। সনচরী অসহায়, নিরুপায়।

হঠাৎ কনড় পাঁজাকোলা করে তুলে নিল তাকে। আচমকা এভাবে তুলে নিতে পড়ে যাবার ভয়ে সনচরী দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরল তার, চোখ টান করে দেখছে। ধীর কঠিন মৃত্যুর মতো লাগছে ওকে। কিন্তু এই মৃত্যুর মধ্যে কি এক নিশ্চিত আশ্বাসও যেন আছে। সনচরী আর পারে না, হাল ছেড়ে নির্ভয়ে এই মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেই যেন চোখ বুজল সে। কনড় জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলেছে।

চোখ মেলে তাকাল যখন, তখন দিন কি রাত সনচরী জানে না। রাতই হবে, কারণ ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। একটা মাটির ঘরে শুয়ে আছে সে। তার মুখের উপর ঝুঁকে কনড় একটা মাটির ভাঁড়ে করে ফলের রস খাওয়াতে চেষ্টা করছে তাকে। কনড় কথা কম বলে, সনচরী চোখ মেলে তাকাতে মৃদু কাঁধ চাপড়ে অভয় দিল তাকে।

বাঁশ আর গাছের ডালের বেড়া দেওয়া ঘর একটা। ভোর হতে চারদিকে চেয়ে সনচরী অবাক হয়েছে। এইখানে এ-ঘর বাঁধল কে, আর এ-ঘরের খবর কনড় জানলই বা কেমন করে? তার বিস্ময় দেখে কনড় হাসে, জিজ্ঞাসা করলেও বলে না কিছু। পরে জেনেছে সনচরী। ওরই ঘর। কনড়ের বাপও নামকরা ডাকাত ছিল। বন্যবরাহের হাতে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে ছেলেকে সে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল ও নগরে ফিরে ভদ্রজীবন যাপন করবে, ডাকাতি করবে না কখনো।

খুড়ীমা আর সনচরীর তত্ত্বাবধানের ভার নিয়ে কনড় ডাকাতের আশ্রয়ে ছিল বটে, কিন্তু কখনো ডাকাতি করে নি।

প্রথম দিনকতক সনচরীর ভয়ে ভয়ে কেটেছে। ভয় কনড়কেই। মৃত্যুর মতো এক প্রবল পুরুষের বক্ষলগ্ন হয়ে এখানে আসার স্মৃতি মনে পড়েছে। ওই মৃত্যু আবার হাত বাড়ালে নিজেকে সমর্পণ করা ভিন্ন আর গতি নেই। আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ চোখে মৃত্যুর জৈবিক দাবির প্রতিক্রিয়ার কোনো আভাস পায় কিনা লক্ষ্য করেছে।

তারপর ক্রমশ নিশ্চিন্ত হয়েছে সনচরী। লোকটা যেন আগের মতোই তার পোষ-মানা সেই মানুষ আবার। আগে থেকে একটু বেশি খুশি সর্বদা, এই যা। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে—মুখের কথা খসার আগেই পরম আগ্রহে হুকুম তামিল করতে ছোটে। সনচরীর আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, আগের মতোই ওই বিশাল জানোয়ারের মতো লোকটার মালিক হয়ে বসল সে।

ভোর না হতে উঠে কনড়কে জঙ্গলের বাইরে নগরপ্রান্তে আসতে হয়, কিছু রোজগার করে জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করে জঙ্গলের কুটীরে ফিরতে হয়। নইলে শুধু ফলমূল খেয়ে দিন চলবে কি করে? কিছুদিন বাদে একদিন বাইরে থেকে এসে সে জানাল, কুশও ধরা পড়েছে, দলবলও ভেঙে গেছে, এখন ইচ্ছে করলে আবার নিশ্চিন্তমনে তারা নগরে ফিরতে পারে।

কিন্তু সনচরী নড়তে চাইল না। আপাতত এখানেই তার ভালো লাগছে। এই বিচিত্র

পরিবেশ অদ্ভুত লাগছে। যেতে তো হবেই একদিন, তবু যাক আরো কিছু দিন।

কিন্তু এই কিছুদিনের মধ্যেই জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত বুঝি।

সেদিনটা ছিল দুর্যোগের দিন। অকালের ঝড়ে গাছপালা ভেঙে পড়ছে, বনস্পতি আলুথালু। ঝড়ের পর অঝোরে বর্ষা নেমেছে। অকালবর্ষা কনকনে শীত নামিয়ে দিয়েছে। কনড় ভোরে বেরিয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে তবু তার দেখা নেই। সনচরী চিন্তিত হয়ে ঘরবার করছে।

সেই দিনই জনাকয়েক সঙ্গী নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন রাজা বিরম। আকাশের দিকে চোখ ছিল না—জঙ্গলের মধ্যে থাকবেই বা কেমন করে। প্রচণ্ড ঝড় এসে যেতে দিক্‌ভ্রান্ত দিশেহারা সঙ্গীরা কে কোথায় ছিটকে পড়ল ঠিক নেই। প্রাণ বাঁচানো দায় তখন। ঝড়ের দাপট থেকে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় রাজার প্রাণান্ত অবস্থা। গাছ-গাছড়া ডালপালার আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। প্রাণপণ যোঝা সত্ত্বেও রাজার শেষের ক্ষণ ঘনিয়ে এল বুঝি। ঝড় যদি বা কমল, মুষলধারে বৃষ্টি। রাজার পরিচ্ছদ জব্‌জবে ভেজা, কন্‌কনে শীত হাড়ের মধ্যে সেঁধোচ্ছে। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচলেও বৃষ্টি আর শীতের হাত থেকে আর বোধ হয় অব্যাহতি নেই।

অজ্ঞান হয়ে রাজা বিরম ঘোড়ার ওপরেই লুটিয়ে পড়লেন। ঘোড়ারও প্রাণসঙ্কট। প্রভুর সাড়া না পেয়ে এখন নিজের ইচ্ছেমতো চলা ছাড়া আর গতি নেই।

বাইরে শব্দ হতে সনচরী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। সভয়ে দেখলে সামনে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে, তার পিঠে একজন মুমূর্ষু লোক। ঘোড়াটা শব্দ করে যেন আশ্রয় ভিক্ষা করছে।

সনচরী পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ভয়ে ভয়ে অজ্ঞান আরোহীকে তার পিঠ থেকে নামাল। বেঁচে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। টেনে হিঁচড়ে তাকে ঘরে এনে শুইয়ে দিল। তার পর প্রদীপের আলোয় তাকে ভালো করে দেখার অবকাশ পেল।

কিন্তু দেখামাত্র বিষম চমকে উঠল সে। না, আগে কখনো দেখে নি তাকে, তবু মনে হল, এই একজনের জন্যই যেন এতকাল অপেক্ষা করছে সে। পরিচ্ছদ দেখে একটা বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হল। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে নিশ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করল।....বেঁচেই আছে। দুই-এক মুহূর্ত ভাবল সনচরী। সঙ্কোচ করতে গেলে মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। ভিজে পোশাক-পরিচ্ছদ টেনে খুলে ফেলল, বেশ করে সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিয়ে ঘরে যা কিছু ছিল সব দিয়ে চাপা দিল। মালসায় করে আগুন জ্বালল। গা হাত পা সেঁকে দিয়ে কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করল। পারা গেল না। ক্ষতস্থানগুলো পরিষ্কার করে কিছু লতাপাতা ছেঁচে প্রলেপ দিল। কিন্তু জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণ নেই, সর্বাঙ্গ হিম।

সনচরী চেয়ে চেয়ে দেখল খানিক। কি সে করতে পারে? তারই ভিতর থেকে কে যেন বলছে, কিছু করতে হবে, বাঁচাতে হবে, এই দুর্যোগের অতিথিকে না বাঁচালেই নয়। এই অতিথি স্বপ্নের চেনা, এরই জন্য সব প্রতীক্ষা।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেখল একবার। এই দুর্যোগের রাতে কনড় ফিরবে সেই আশাও আর নেই। ফেরা নিরাপদও নয়।

স্থির একটা সঙ্কল্প নিয়েই সনচরী মুমূর্ষু অতিথির কাছে এসে বসল। খুব কাছে। শেষবারের মতোই যেন তাকে দেখে নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, অনুমানে ভুল হয়েছে কিনা। না, ভুল হয় নি, হতে পারে না। ওই সিক্ত বসনগুলো যেন তাকে ইশারায় বলছে, ভুল হয় নি।

অচপল হাতে একটি একটি করে নিজের বেশবাস খুলে ফেলল সনচরী। তারপর অতিথির আচ্ছাদনের নীচে নিজেও আশ্রয় নিয়ে দু হাতে নিবিড় ভাবে বেষ্টন করে রাখল তাকে। এই দেহের সবটুকু তাপ নিঃশেষ করেও এই অতিথিকে যে তার বাঁচাতেই হবে।

ভোরের দিকে রাজা বিরম চোখ মেলে তাকালেন।

কিন্তু হঠাৎ মনে হল তিনি স্বপ্নে তাকাচ্ছেন। ভারী মিষ্টি স্বপ্ন। স্বর্গের কোনো অপ্সরী যেন দুই বাহু-বেষ্টনে নিজের দেহের তাপ ছড়িয়ে তাঁকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে। আবেশে চোখ বুজতে গিয়েও বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকালেন আবার। স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের থেকেও অসম্ভব কিছু।

সনচরী ঘুমোয় নি। চোখ বুজে ছিল। রাজা উঠে বসতে আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাল। নির্বাক নিঃশব্দ দৃষ্টিবিনিময়।

রাজা উঠে বসতে সনচরীর দেহ থেকেও আচ্ছাদন অনেকটাই সরে গেছে। রমণীর এই উন্মুক্ত অনির্বচনীয় যৌবনের সামনে সমাসীন রাজার বিপুল বিস্ময়। চোখের পলক পড়ে না। সনচরীর আয়ত গম্ভীর দুই চোখ রাজার মুখের ওপর স্থির সংবদ্ধ।

রাজার মুখে কথা সরতে সময় লাগল।—তুমি কে?

সনচরী তেমনি চেয়ে থেকে ফিরে প্রশ্ন করল, তুমি কে?

রাজার অনভ্যস্ত কানে একটু লাগল বটে, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিরূপ হওয়ার কথা মনেও এল না। বললেন, আমার নাম বিরম, লোকে এই জালোরের রাজা বলে জানে।

ভেবেছিলেন, শোনামাত্র রমণী সচকিত হবে, তটস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু বিস্ময় বা সঙ্কোচের সামান্য আভাসও দেখলেন না। যেন জানাই ছিল কে তিনি, একবার জিজ্ঞাসা করে নিল শুধু। হাত বাড়িয়ে সনচরী বসন টেনে নিল। মোটামুটি নিজেকে আবৃত করে আস্তে আস্তে উঠে বসল। গায়ের জামার ফিতে বাঁধতে বাঁধতে নিরুত্তাপ সহজ গলায় বলল, আমি সনচরী।

সনচরী কে?

উঠে সনচরী রাজার গত রাতের সিক্ত বসন পরীক্ষা করতে করতে জবাব দিল, যাযাবরী। যাদুর খেলা দেখাই বলে অনেকে যাদুকরীও বলে।

বিস্ফারিত দুই চক্ষু মেলে রাজা যেন এখনো যাদুর খেলাই দেখছেন। বসন পরীক্ষা করে সনচরী সেগুলি রাজার দিকে এগিয়ে দিল। তিনি আত্মস্থ হলেন এতক্ষণে। বেশবাস

ঠিক করতে করতে প্রশ্ন করলেন, তুমি এই গহন জঙ্গলে থাক কেন?

মুখ তুলে দেখলেন, নিঃসঙ্কোচে তাঁর সামনে কোমরে দু হাত তুলে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে—দেখছে তাঁকে। বড় বিচিত্ররূপিণী মনে হল রাজার। জবাব শুনে আরো বিস্মিত।

সনচরী বলল, মহারাজের লোকালয় থেকে এই স্থান নিরাপদ বলে।

ও....একা থাকো এখানে?

না, আমার একজন নিষ্পাপ রক্ষকের সঙ্গে থাকি। কালকের দুর্যোগে সে নগর থেকে ফিরতে পারে নি।

দুর্যোগের কথা মনে হতে রাজা বিরমের মাথাটা যেন আরো পরিষ্কার হল।—আমি এখানে এলাম কি করে?

ভবিতব্য টেনেছে। অচেতন অবস্থায় মহারাজের ঘোড়া এখানে নিয়ে এসেছে। গরীবের কুটিরে মহারাজের প্রাণ রক্ষা করার আর কোনো উপায় ছিল না বলে এইভাবেই সেবা করতে হয়েছে। আশা করি এজন্য মহারাজ অপরাধ নেন নি।

এ-ধরনের বচন শুনেও বিরমের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে। মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, আমি যে মহারাজা এ তুমি আগেই বুঝেছিলে তা হলে?

সনচরীর অধর-কোণেও যেন সামান্য একটু হাসির ছোঁয়া লাগল। আয়ত চোখের কালো তারায়ও ঈষৎ কৌতুক ঝিকমিকিয়ে উঠল। জবাব না দিয়ে সামান্য মাথা নাড়ল শুধু। বুঝেছিল।

রাজা নিজের পরিচ্ছদ দেখে নিলেন একবার। রমণী কতটা সত্যি কথা বলছে বোঝার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, এই শিকারীর পোশাক দেখে তুমি আমাকে চিনলে কি করে?

স্পষ্ট নিঃসঙ্কোচ উত্তর এল, পোশাক দেখে চিনি নি, অন্তর থেকে জেনেছি। এই দাসীর জীবনে মহারাজের আসার কথা আছে।

যতই অবাক হোন আর অভিভূত হোন, রাজা অস্বস্তি বোধ করলেন একটু। রমণী অতি সুচতুরা আগেই উপলব্ধি করেছেন। রাজার নৈতিক চরিত্র আজও নিষ্কলুষ, যত অভাবিত যোগাযোগই ঘটুক, অভ্যস্ত নীতির দিকটাই জোর করে বড় করে তুললেন। এ-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করে মোহরের থলেটা বার করতে করতে বললেন, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মোহরের থলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই পুরস্কার তোমার প্রাপ্য।

সনচরীর অপলক চোখে চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। হাত বাড়াল না, থলেটার দিকে তাকালও না। বলল, পুরস্কারের প্রত্যাশায় সনচরী কারো উপকার করে না। তবে মহারাজের কৃতজ্ঞতা যদি সত্যি হয়, তবে দাসীর প্রতি একটু বিবেচনার আর্জি আছে। কোনো পুরুষের জীবন রক্ষার জন্য যদি কোনো কুমারী কন্যার এই উপকার করতে হয়, তা হলে দেশীয় আচারে সেই কন্যার স্থান কোথায় মহারাজ একটু ভেবে দেখবেন।

রাজা বিরম স্তম্ভিত কয়েক মুহূর্ত। পরপুরুষ কুমারী-অঙ্গ স্পর্শ করলে সে তার স্বামী বলে পরিগণিত হয়। রাজসভা হলে যাযাবরীর এই স্পর্ধার কথা শুনে হয়ত

পুরস্কারের বদলে সমুচিত শাস্তিই দিতেন কিছু। কিন্তু গহন অরণ্যের এই কুটিরের পরিবেশে ওই অপরূপার মুখের দিকে চেয়ে রাগের বদলে হঠাৎ দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেন তিনি। দৈব-বিড়ম্বনায় কোনো কুহকিনীর পাল্লায় পড়েছেন কিনা সেই সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিল।

সনচরী ধীর পায়ে বাইরে চলে এল। কিন্তু পরক্ষণে হতভম্ব সে। দাওয়ার কোণে বাঁশের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কনড় বসে আছে। উসকো-খুসকো চুল, মুখ থমথমে, দুই চোখ রক্তবর্ণ। সনচরী বাইরে আসতেই সে ফিরে তাকিয়েছে।

কনড়। তুমি কখন এলে?

কাল রাতে।

কাল রাতে। সমস্ত মুখ হঠাৎ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার। কনড়ের অঙ্গারের মতো চোখ দুটো তার মুখখানা পুড়িয়ে দিতে লাগল। ইতিমধ্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজা বিরমও বাইরে এলেন। কনড়কে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

সনচরীর সমস্ত মুখ কঠিন হয়ে উঠল আস্তে আস্তে। তার আজ্ঞাবহ দাসকেই যেন অবিচল কণ্ঠে হুকুম করল সে। বলল, কনড়, মহারাজ কাল দুর্যোগে পথ হারিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁকে জঙ্গলের পথ দেখিয়ে বাইরে পৌঁছে দিয়ে এস।

কনড় যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়াল। রাজা ঘোড়ায় উঠলেন। কনড় সঙ্গে চলল। সনচরী দেখছে দাঁড়িয়ে। রাজাকে নয়, কনড়কে। তারও দু চোখ জ্বলছে। যে লোকটা দুর্যোগের বিপদ মাথায় করে কুটীরে ফিরে সমস্ত রাত বাইরে বসে কাটিয়েছে, তারই ওপর অকস্মাৎ সে এমন অকরুণ হয়ে উঠল কেন, নিজেও জানে না।

নীরব প্রতীক্ষায় কয়েকটা দিন কেটে গেল। সনচরীর মুখের উপর একটা কঠিন ছায়া এঁটে বসছে ক্রমশ। ওদিকে কনড়ও নির্বাক একেবারে। দিনান্তে একটা কথাও হয় না। দুজনের সহজতার মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ক্রমশ উঁচিয়ে উঠছে যেন।

সেদিন সনচরী কর্ত্রীর মতোই তাকে ডেকে অভিপ্রায় প্রকাশ করল, সে নগরে যাবে, কনড় যেন তাকে নিয়ে যায়।

জঙ্গলের বাইরে এসে সনচরী পালকি করে রাজপ্রাসাদের দিকে চলল। নির্বাক কনড় পায়ে পায়ে অনুসরণ করল।

কেমন করে, কাকে কি বলে রাজদর্শনের অনুমতি লাভ করল কনড় জানে না। সে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। অধিকারী দেবরাজের একমাত্র সন্তান তরুণ নগরশাসক জয়রাজ ওড়নায় মুখ-ঢাকা রমণীর কথা শুনে রাজাকে সংবাদ দিয়েছিল। আর, সাক্ষাৎপ্রার্থিনীর বারতা শোনামাত্র রাজাকে ঈষৎ বিচলিত হতে দেখে মনে মনে কৌতূহলান্বিত হয়েছিল।

রাজার নির্দেশের প্রতীক্ষায় জয়রাজ অদূরে আড়ালে অবস্থান করতে লাগল।

সনচরী রাজা বিরমের সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা মনে মনে নিজেকে একটু কঠিন করে তুলেছিলেন। রূপসী রমণী আকাশছোঁয়া বাসনা নিয়ে এসেছে জানেন। মনে মনে এ কদিন এক ধরনের অশান্ত যাতনা ভোগ করছিলেন তিনি। এক দুর্লভ স্মৃতি থেকে

থেকে তাঁকে বিমনা করে তুলেছিল। বড় বিচিত্ররূপা এক রমণীর যৌবনের উত্তাপ এখনো যেন তাঁর সর্বাঙ্গে লেগে আছে—নীতির ভ্রূকুটির আঘাতে সেই স্পর্শ তিনি দূর করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু সেই রমণী আজ পরোক্ষ দাবি নিয়ে আসতে তাঁর কঠিন হওয়া সহজ হল। আরো সহজ হল ভালো করে নয়ন-মনোহারিণীর মুখ দেখতে পেলেন না বলে। পেলে হয়তো দুর্বল হয়ে পড়তেন। সনচরী রাজ-সন্নিধানে এসেও তার মুখের আবরণ সরাল না।

মৃদু স্পষ্ট স্বরে সনচরী বলল, মহারাজের বিবেচনার প্রত্যাশায় ছিলাম। কোনো সংবাদ না পেয়ে সেটা জেনে নিতে এসেছি।

রাজা বিরূপ জবাব দিলেন না। এই মুহূর্তে অন্তত অভ্যস্ত নীতিবোধটাই বড় হয়ে উঠল। তাঁর গম্ভীর সংকেতে নগরশাসক জয়রাজ ছুটে এল। মহারাজ তাঁকে আদেশ দিলেন, একে কোষাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাও, জঙ্গলের সেই দুর্যোগের রাতে এই রমণী আমার প্রাণরক্ষা করেছিল। একে যত খুশি ধনরত্ন নিয়ে যেতে দাও।

সনচরী স্থির দাঁড়িয়ে রাজার নির্দেশ শুনল। রাজা ফিরে চলেছেন—ওড়নার ভিতর দিয়ে নিষ্পলক নির্দেশ শুনল। রাজা ফিরে চলেছেন—ওড়নার ভিতর দিয়ে নিষ্পলক চেয়ে চেয়ে দেখল তাঁকে। তারপর নগরশাসককে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

সে পালকির দিকে এগোতে জয়রাজ বাধা দিল, এদিকে—

সনচরী দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল তার দিকে। তার পর হঠাৎ বাহু সঞ্চালন করে ওড়নাটা সরিয়ে ফেলল মুখের ওপর থেকে। সনচরী হাসছে। সেই হাসির ছটায় সমস্ত চোখ মুখ দাঁত যেন ঝকমকিয়ে উঠল। আগন্তুকা যে রূপসী সেটা জয়রাজ মুখ না দেখেও অনুমান করেছিল—কিন্তু এমন যে, তা স্বপ্নেরও অগোচর।

জয়রাজের দৃষ্টিটা যেন ধাঁধিয়ে গেল হঠাৎ।

মিষ্টি মধুর স্বরে সনচরী জানাল, মহারাজের বিধান শুনতেই সে এসেছিল, আর তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে হৃষ্টচিত্তেই এখন ফিরে যাচ্ছে। যাযাবরী যাদুকরী সে, খেলা দেখিয়ে খুশি না করে কারো কাছ থেকে কিছু নিতে নেই তাদের। অনুগ্রহ করে নগরশাসক যদি নগরে অবস্থানের সুযোগ করে দেন তার, তখন সকলকে সে যাদুর খেলা দেখিয়ে খুশি করতে পারে, আর দয়ালু নগরশাসকের কাছ থেকেও সেই খুশির মূল্য হাত পেতে নিয়ে কৃতার্থ হতে পারে।

বলা বাহুল্য, সেই কয়েকটা মুহূর্তের অব্যর্থ কটাক্ষ তরুণ জয়রাজের বুকের ভিতরে বড় নির্মমভাবেই বিঁধেছিল। ওড়নাটা আবার টেনে নামিয়ে পালকিতে উঠে বসেছিল সনচরী। কিন্তু বেশিদূর যেতে হয় নি। রূপ-কশাবিদ্ধ জয়রাজের হুঁশ ফিরতে পালকি-বাহকেরা আবার পালকি থামিয়েছে।

সনচরী জঙ্গলে ফেরে নি। কনড়কেও ফিরতে দেয় নি। নগরপ্রান্তের এক সুন্দর অট্টালিকায় ডেরা নিয়েছে। তার নির্দেশে কনড় সেই বুড়ীমার দলের বেদেনীদের সংগ্রহ করে এনেছে। এই দলের নেত্রী অগ্নিরূপিণী সনচরী। সে-ই সর্বে-সর্বা, সে-ই একমাত্র

আকর্ষণ। অন্য সকলের অস্তিত্ব শুধু প্রহেলিকাময়ীর শোভাবর্ধনের জন্য।

অতুলনীয়া রূপসী যাদুকরীর সংবাদ দেখতে দেখতে নগরময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। শুকনো খড়ের গাদায় আগুনও এত তাড়াতাড়ি প্রসারলাভ করে কিনা সন্দেহ। সনচরীর দড়ির খেলা আর দড়ির ওপর যাদুর খেলা যারা দেখল, তারা শিখা-লোভী পতঙ্গের মতোই আবার ছুটে ছুটে আসতে লাগল। যারা দেখে নি, তারা শুনে আসতে লাগল।

খেলার আসর থেকে সনচরীর গৃহের দিকে পা বাড়াল অধিকারী দেবরাজের ছেলে নগরশাসক তরুণ জয়রাজ। এ পর্যন্ত সে-ই শিখাহত সব থেকে বেশি। সনচরী পরম সমাদরে আপ্যায়ন জানাল তাকে, তার খুশির দান গ্রহণ করতে লাগল। তার সঙ্গে অন্যান্য রাজপরিজনেরাও আসে, তারাও হাত উপুড় করে দান করে। কিন্তু তারা বিদায় হলেই সনচরী সে-সব ধনরত্নের দিকে ফিরেও তাকায় না। কৌশলে, চাতুরিতে ভুলিয়ে নিজেকেও রক্ষা করে।

একদিন জয়রাজকে জানাল, জীবনের সাধ, রাজাকে খেলা দেখাবে। নগরশাসক যদি ব্যবস্থা করতে পারেন, সনচরীর কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

জয়রাজ ব্যবস্থা করার আগেই রূপসী যাযাবরী যাদুকরীর খেলার প্রশংসা রাজা শুনেছেন। শোনার পরেও নিজেকে সংযত রেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কৌতূহল বাড়ছিল ক্রমশ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেও ঠুনকো মেয়ের মতো সে-যে মুখ থেকে ওড়না সরিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে নি—সেটা পরে মনে হয়েছে রাজার। আর সনচরী যে রাজকোষের ধন-রত্ন উপেক্ষা করেই চলে গিয়েছিল সে-খবরও তিনি রাখেন। ভিতরে ভিতরে অশান্তই হয়ে উঠেছিলেন রাজা বিরম্।

জয়রাজের প্ররোচনায় বয়স্যদের একজনের মুখে যাযাবরীর দড়ির খেলার প্রশংসা এবং রাজাকে তা দেখার বাসনা শুনে রাজা বিরম যথাসম্ভব নিস্পৃহ মুখেই যাযাবরীকে রাজ-আমন্ত্রণ জানানোর নির্দেশ দিলেন।

এই যাযাবরীকেই কি রাজা জঙ্গলের কুটীরে দেখেছিলেন, নিজের প্রাসাদে দেখেছিলেন ?

বোধ হয় না।

সেই প্রথম দিন সনচরী শুধু খেলা দেখায় নি, রাজার হৃৎপিণ্ডটা নিয়ে যেন নাড়াচাড়া করছিল, খেলা করছিল। এই যৌবন-স্বরূপিণীর বেশবাস অন্যরকম, হাসি অন্যরকম, কটাক্ষ অন্যরকম, পদক্ষেপের ঠমক অন্যরকম। দড়ির ওপর নাচের তালে ঘুরে ঘুরে সে যাবতীয় যাদুর খেলা দেখিয়েছে, হাতের কসরতে দিনকে যেন রাত করেছে, দর্শকের চোখে অবিশ্বাস্য বিভ্রম ঘটিযেছে। বিস্মিত, মুগ্ধ রাজপরিজনেরা আনন্দে মাতোয়ারা।

আর রাজার কাছে ক্রমশ যেন রাজ্য তুচ্ছ হয়ে গেছে, রাজকর্তব্য, রাজার নীতি সব তুচ্ছ হয়ে গেছে।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে, দড়ির নাচের মাঝে মাঝে যাদুকরী পরিহাসের ছলে কৌতুকে বিঁধেছে রাজাকে। সনচরীর শেখানো এক অনুচরী গানের মধ্য দিয়ে যেন লোভ দেখাচ্ছে যাযাবরীকে :

'সুরতা ভীলনী হে ভীলনী
রাওজী বুলায়ে, মহলা আওয়ো
চুড়ো নৈ পহরাওয়ুঁ হাতি দাঁত রো।'

ভীলনী, ওগো রূপসী ভীলনী, রাজমশাই যে তোমাকে ডাকছেন—তুমি রাজমহলে এস, মহারাজ তোমাকে মহলে রাখবেন, আদর করে হাতীর দাঁতের চুড়ি দেবেন—।

দড়ির ওপর নাচের ছন্দ বজায় রেখে ভ্রূকুটি হেনে সনচরী সখীর প্রস্তাব শুনল, তার পর দৃপ্ত কটাক্ষে যেন রাজার আবেদন ছেঁটে দিয়ে পাল্টা গান ধরল :

'মোটা রাওজী হো রাওজী
নহী নৈ মলোঁ রো মহা নো কোড
ঝুঁপড়ী ভলী হো মহাঁ রো ভীলরী
বিলায়া নৈ ভলা হো মহাঁ রে ভীলরা!'

—দরকার নেই, দরকার নেই, দরকার নেই আমার মোটা রাওজীর আদরের চুড়িতে। কেমন মোটা রাজা দেখছ না? তার থেকে আমার কাচের চুড়িই ভালো, আর ওই মোটা রাজার থেকে অনেক অনেক ভালো আমার ওই ভীল মরদ।

বলে দড়ির নীচে গম্ভীরানন কনড়কে দেখিয়ে দিল সে।

হাসির রোল উঠল অনুষ্ঠান-অঙ্গনে। বিহ্বল মুগ্ধ রাজা উঠে দাঁড়িয়ে কণ্ঠের রত্নহার খুলে ছুঁড়ে দিলেন সনচরীর দিকে। অবলীলাক্রমে সনচরী সেটা লুফে নিয়ে খুশির আতিশয্যে গলায় পরে ফেলল। পরক্ষণে বিপরীত ছদ্মগাম্ভীর্যে সেটা খুলে ঠিক রাজার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে গান ধরল। এই গানও যেন তার সখির উদ্দেশ্যেই। মর্ম, সখি, রাজার মালা আমি ফেরত দিলাম। মোটা রাজা রমণীর হৃদয় বোঝে না, রূপা দিয়ে রূপ কেনে। মোটা রাজা ভালোবাসতে জানে না, মুক্তোর হারে ভালোবাসার গলায় ফাঁস পরায়।

সেই রাতে, নগর যখন স্তব্ধ, তখন চুপিসাড়ে রাজা বিরম বেরিয়েছেন রাজপ্রাসাদ থেকে। রাজবেশে নয়, সাধারণ নাগরিকের বেশে। রাত্রির আলোছায়ায় দুই-একজন যারা তাঁকে দেখেছে তারাও চেনে নি।

যাযাবরীর গৃহে আলো জ্বলছে তখনো। কম্পিত হস্তে দরজায় মৃদু করাঘাত করলেন রাজা।

দরজা খুলে গেল। সামনে সনচরী দাঁড়িয়ে। হাসছে মৃদু মৃদু। হাত বাড়িয়ে নিঃসঙ্কোচে বিরমের হাত ধরল, ভিতরে নিজের একেবারে শয়নঘরে এনে বসাল তাঁকে। তার পর হাসিমুখে একটা তীর বিঁধিয়ে দিল যেন রাজার বুকে। বলল, আমি জানতুম মহারাজ আসবেন। জঙ্গলের কুটীরবাসিনী সনচরীর কাছে যিনি আসতে পারেন নি, মহল থেকে যে সমর্পিতাকে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন—নগরের নটীযাদুকরীর কাছে তিনি আসবেন। মোটা বলার অপরাধ মহারাজ নিজগুণে মার্জনা করেছেন আশা করি।

এই অপমানের পরেও রাজা মুগ্ধ, বিহ্বল। রাজা মার্জনা ভিক্ষা করবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু চোখের তৃষ্ণায় মুখের কথা মুখেই থেকে গেল।

বুড়ীমার ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয় নি। সনচরী রাজসোহাগিনী হয়েছে। তার প্রতীক্ষারত যৌবনে বাঞ্ছিত পুরুষের প্রথম আবির্ভাব। দু হাত বাড়িয়ে সনচরী রাজাকে গ্রহণ করেছে, অভ্যর্থনা জানিয়েছে। নিজেকে সমর্পণ করেছে। রাজার মুক্তাহার এবারে স্বেচ্ছায় নিজের গলায় পরেছে।

রাজারও এক বিচিত্র জীবন শুরু। নতুন যৌবনে অভিষিক্ত তিনি। এই মোহ দুর্নিবার। এই মোহ তিনি ভাঙতেও চান না।

রাজার এই দুরতিক্রমণীয় আকর্ষণের ফলেই ব্যাপারটা জানাজানি হতে সময় লাগল না। রানীর মুখ ধারালো হয়ে উঠল, অধিকারী দেবরাজের মুখ ঘোরালো হল, আর নগরশাসক তরুণ জয়রাজের মুখ ঈর্ষায় কালো হয়ে গেল। প্রতি রাতে রাজা অভিসারে বেরিয়ে পড়েন। কি এক দুঃসহ তাড়নায় সব লজ্জা, সব সঙ্কোচ, নীতির সব অনুশাসন তুচ্ছ করে তিনি বেরিয়ে আসেন।

গুজব শোনা যেতে লাগল, ধনসম্পদ ছার, অর্ধেক রাজ্য তিনি যাদুকরীর পদমূলে উপহার দিতে চেয়েছেন।

রানী রত্নাবাঈয়ের সঙ্গে কথা হবার পর অধিকারী দেবরাজ একদিন সঙ্গোপনে এলেন যাদুকরীর সঙ্গে দেখা করতে। বললেন, তুমি নিজেকে রাজপুতানী বল, সত্যিকারের রাজপুতানীর রাজ্যের মঙ্গলের থেকে বড় আর কিছু নেই। সেই মঙ্গল তুমি ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছ টের পাও ?

এই মহামাননীয় অধিকারীর সমাচার সনচরীর জানা ছিল। সেদিনও পরম সমাদরে এবং সম্মানের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এ-কথা শোনার পর অন্তরের শ্রদ্ধা অন্তরেই গোপন থাকল। তরল কৌতুকে জবাব দিল, তা হলে শুধু রাজা কেন, রাজার প্রধান অমাত্যবৃন্দকেও অযোগ্য বলতে হবে, এই অমঙ্গল তাঁরা দূর করতে পারছেন না কেন ?

ধীর গম্ভীর মুখে অধিকারী বললেন, পারবেন। সেই জন্যই আমার আসা। তুমি রমণী, আমাকে কঠিন হতে বাধ্য করো না।

দু-হাত জুড়ে অধিকারীর উদ্দেশে একবার আনত হল সনচরী। তার পর সবিনয়ে বলল, রাজা আমাকে অর্ধেক রাজ্য উপহার দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজ্য পরিচালনার কোনো গুণ নেই বলে আমার অর্ধেক রাজ্যও আমি রাজাকেই চালাতে বলেছি। যোগ্য লোকের সন্ধান পেলে ওই অর্ধেক রাজ্য আমি তাঁর হাতেই অর্পণ করি। মহামান্য অধিকারী কি অনুগ্রহ করে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন ?

নটীর দুঃসাহস দেখে অধিকারী স্তম্ভিত। এ-রকম বিদ্রূপ স্বয়ং রাজাও তাঁকে করতে পারেন বলে মনে হয় না। এই নটীকে কেন্দ্র করে অধিকারীর বুকের তলায় আরো একটা হিংসার আগুন চাপা আছে। তাঁর একমাত্র সন্তান জয়রাজও এই কুহকিনীর রূপের মোহে আচ্ছন্ন, কর্তব্যভ্রষ্ট।

মৃদুকঠিন স্বরে বললেন, তোমার স্পর্ধার সীমা নেই দেখছি। কিন্তু আমি তোমার ক্ষতি করতে চাইনে, তোমাকে সাবধান করছি, অর্থ সম্পদ যা চাও সব নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। অন্যথায় এর ভয়াবহ পরিণাম তোমাকে ভোগ করতে হবে।

সনচরী রাজার দেওয়া মুক্তাহারটা নাড়াচাড়া করল একটু। অর্থাৎ কার জোরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে প্রকারান্তরে অধিকারীকে তাই দেখিয়ে দিল। তার পর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের ওপর ছদ্ম-ভয়ের আবরণ টেনে এনে বলল, আমি নিতান্ত অবলা, আপনার কথা শুনে ভয় করছে, রাজার শরণাপন্ন হতে বলছেন আমাকে?

অধিকারী থমকালেন মুহূর্তের জন্য। নটী ফিরে তাঁকেই সাবধান করল! রাজার কাছে বলে তাঁর জীবন-সংশয় ঘটাতে পারে বটে। ক্রোধে সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল অধিকারীর। তেমনি স্বরেই বললেন, দেশকে ব্যভিচারে কলুষিত করার আগে অধিকারীর দেহ থেকে মুণ্ডচ্ছেদই করে নিতে হবে তোমাকে, তা যদি না পার তোমার শেষ ঘনিয়ে এসেছে জেনো।

অধিকারী চলে এসেছেন। অটুট কাঠিন্যে রাজরোষ গ্রহণের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েছেন। যাদুকরী রাজাকে সব বলবে সে সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দেশের মঙ্গলের জন্য রাজার মুখের ওপর অনাচার ঘোষণা করে অধিকারী এই পঙ্কিলতা থেকে চিরমুক্ত হতেও প্রস্তুত।

কিন্তু মনে মনে বিস্মিত তিনি, দিনের পর দিন যায়, রাজরোষের একটু স্ফুলিঙ্গের আভাসও দেখা গেল না। অর্থাৎ যাদুকরী রাজাকে কিছু বলে নি।

এর পর শোনা গেল রাজা ওই যাযাবরীকে বিবাহ করতে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয়া মহিষীর মর্যাদা দেবেন তাকে। দ্বিতীয়া হলেও ওই ছলনাময়ী অদ্বিতীয়া হবে।

গোপনে সংবাদ নিলেন অধিকারী—কনড়কে ধরে আনলেন। যাযাবরীর বিগত জীবনের প্রসঙ্গ উদ্‌ঘাটন করলেন—তার ভগতন হওয়ার সংবাদও। শেষে রাজাকে সুকঠিন বিনয়ে জ্ঞাপন করলেন এই সংবাদ। সনচরী রাজপুতানী সেটা অবিশ্বাস্য। আর হলেও সে গণিকা, রাজা গণিকাকে রাজবধূর সম্মান দিতে পারেন না।

রাজা বজ্রাহত।

বিবাহ সম্ভব নয় সে সংবাদ সনচরীও শুনল। তার সমস্ত জ্বালা আর যাতনা দুই চোখে এসে জমাট বাঁধতে লাগল। তার পরেও বাসনা-নিপীড়িত রাজা এলেন। সনচরী এদিনও তাঁকে ফেরাল না। যৌবনের আরতি জ্বালল। রাজাকে সে বিস্মৃত হতে দেবে না। এই রাতের স্মৃতি রাজার বুকেও কামনা হয়ে জ্বলবে।

বিদায়ের আগে শান্ত মুখে রাজাকে বলল, যে রাজা আর তাঁর শাসকমন্ত্রী গৃহস্থের নাবালিকা কন্যাকে রক্ষা করতে পারেন না, ডাকাতে ধরে নিয়ে যায়, তাঁরা আবার ন্যায়নীতির বিচার করেন এর থেকে হাস্যকর আর কিছু হয় না। ধিক্ রাজাকে, ধিক তাঁর মন্ত্রীকে—এমন রাজ্যে সনচরী আর বাস করতে চায় না।

অধোমুখে রাজা বিদায় নিলেন তখনকার মতো।

তার পর সেই সন্ধ্যা। এক বছর আগের সেই গোগো নবমীর সন্ধ্যা। রাজার অন্তর্দাহ মস্তিষ্কে ওঠা-নামা করছে। কটা দিন কোনোপ্রকারে আত্মসংযমে বেঁধে ছিলেন নিজেকে। কিন্তু সেদিন আর পারলেন না। বিগত সেই রজনীর ভোগের স্মৃতি আবারও পতঙ্গের

মতোই টেনে নিয়ে গেল তাঁকে। মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, প্রয়োজন হলে—যাযাবরীকে নিয়ে এই রাজ্য ছেড়ে চলেই যাবেন তিনি।

কিন্তু এসে দেখেন সনচরী নেই। আর কনড় নেই। তাদের অন্যান্য পরিজনেরা আছে। শুনলেন, সনচরী সেই জঙ্গলের কুটিরেই ফিরে গেছে আবার।

হিতাহিতজ্ঞানশূন্য রাজা জঙ্গলের পথে ঘোড়া ছোটালেন।

জঙ্গলে প্রবেশের মুখে ঘোড়া থামিয়ে পথের নিশানা খুঁজছিলেন। সহসা পায়ের দিকে যেন জ্বলন্ত মৃত্যু-দংশন একটা। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিলেন কি ঘটে গেল। গোগো নবমীর রাতে কাল-সর্প দংশন করেছে তাঁকে। বিষের জ্বালায় সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু তখনো জ্ঞান আছে। নেমে মাথার পাগড়ি দিয়ে প্রাণপণে ক্ষতস্থান বাঁধতে চেষ্টা করলেন তিনি—কিন্তু বন্ধন সম্পূর্ণ হবার আগেই ঢলে পড়লেন।

রাজা জানতেন না সম্প্রতি অধিকারীর অনুচরেরা সর্বদা গোপনে ছায়ার মতো অনুসরণ করে তাঁকে। একটু বাদে দুটি লোক সেই জঙ্গলের ধারে এল। চকিতে দুর্ঘটনাটা বুঝে নিল। ক্ষতস্থানের ওপরে আরো কয়েকটা বাঁধন দিয়ে রাজাকে তুলে নিয়ে তীরবেগে তারা প্রাসাদের দিকে ছুটল।

রাজপ্রাসাদ। রাজা বেহুঁশ। রাণী রত্নাবাঈ দেখছেন। অধিকারী নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। রাজবৈদ্য তাঁর ব্যবস্থার কোনো আশাপ্রদ প্রতিক্রিয়া না দেখে অসহায়।

সহসা রানীর বজ্রকঠিন আদেশ শুনল সকলে।—ওই যাদুকরীকে ধরে নিয়ে আসতে হবে, সে যেখানে থাকুক, অচিরে আমি তাকে এখানে চাই।

অধিকারীর ইঙ্গিতে রাজপরিজনেরা বায়ুবেগে জঙ্গলের পথে ছুটল আবার।

ঘরের মধ্যে সনচরী মূর্তির মতো বসে ছিল। বাইরে কনড়। সহসা একসঙ্গে চমকে উঠল দুজনে। অরণ্যের নৈশ-নীরবতা লণ্ডভণ্ড করে কারা কুটীরের সামনে এসে দাঁড়াল।

বন্দী হওয়ার দরুন নয়, রাজার দুর্ঘটনার কথা শুনেই ত্রাসে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সনচরী। দিশেহারার মতো ছুটে কুটীরের ভিতরে এল আবার। এ-হেন দুর্ঘটনার ওষুধ ঘরে মজুতই থাকে। দু'হাতে যা পারল তুলে নিল, যারা ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল তাকে, তারই তাগিদে আরো বায়ুবেগে প্রাসাদের দিকে ছুটতে হল তাদের।

সঙ্গে কনড়ও আসছে। তাকেও ছেড়ে আসে নি রাজপুরুষেরা।

সনচরী প্রাসাদের সেই কক্ষে প্রবেশ করল যেখানে মুমূর্ষু রাজা শয়ান। তাঁর দেহ নীলাভ হয়ে আসছে। সেখানে রানী দাঁড়িয়ে আর অধিকারী দেবরাজ দাঁড়িয়ে।

রানী আস্তে আস্তে সনচরীর কাছে এলেন। নিষ্পলক কঠিন নেত্রে দেখলন দুই-এক মুহূর্ত। বললেন,"এইবার তোমার শেষ যাদুর খেলা দেখাও, না যদি পার, তোমার ওই সুন্দর দেহ একটু একটু করে কুকুরে খাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।"

রানীকে উপেক্ষা করে রানীর পাশ ঘেঁষে ত্বরিত পদক্ষেপে সনচরী রাজার সামনে এসে ঝুঁকল। শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করল, ক্ষতস্থান আর বাঁধনগুলো দেখল একবার। তার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, কনড় !

দ্বারপ্রান্ত থেকে কনড় ভিতরে এসে দাঁড়াল। সনচরী এবার রানীর চোখে চোখ

রাখল। ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে বলল, না পারার পরিণাম জানা থাকল, চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু পারলে মহারানীর প্রধান মহিষীর আসন টলবে কিনা সেটুকুও শোনালে কৃতার্থ বোধ করতাম।....যাক, আপাতত কিছুক্ষণের জন্য মহারানী আর মহামাতাকে এই কক্ষ ছেড়ে যেতে হবে।

রত্নাবাঈ একঝলক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘর থেকে প্রস্থান করলেন। যাযাবরীর কথা শুনে একটু আশাও হল, রাজা হয়তো প্রাণ ফিরে পাবেন।

ভাবলেশহীন অধিকারী দেবরাজও রানীকে অনুসরণ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হল সনচরী। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল প্রথম, তার পর ছুটে রাজার কাছে এল। রাজাকে বাঁচাতে না পারলে রানীকে আর কষ্ট করতে হবে না, তাকেও এসে মৃত দেখবে।

সঙ্গে ওষুধ যা এনেছিল ক্ষিপ্র হাতে তা প্রয়োগ করল, যত রকম প্রক্রিয়া জানত স্তব্ধ মুখে তা সবই সম্পন্ন করল। কনড় চিত্রার্পিত মূর্তির মতো দেখছে। সর্প-দংশনের বিধি-ব্যবস্থা কনড় সনচরীর থেকেও ভালো জানে। সনচরী আশা করেছিল, সে এগিয়ে আসবে, নিজে হাত লাগাবে, শেষ চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু তার নিশ্চেষ্ট পাথর মূর্তি দেখে ক্ষোভে রোষে নিজেই প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

ফল হল না। দেহের বিষ উর্ধ্বে উঠছে। বিষের প্রতিক্রিয়ায় রাজার সর্বাঙ্গ নীল হয়ে যাচ্ছে।

হাল ছেড়ে সনচরী বসে পড়ল। হতাশায় ক্ষিপ্ত চোখে তাকাল কনড়ের দিকে। তার পর শান্ত সংযত কণ্ঠে বলল, কনড়, রাজা না বাঁচলে রানী তোমাকে আমাকে দুজনকেই হত্যা করবে। কিন্তু প্রাণের মায়া আমি করি না, এই দেখ কিরীচ, রাজা প্রাণত্যাগ করলে হত্যা আমি নিজেই নিজেকে করব। কিন্তু মরেও আমি শান্তি পাব না, রাজাকে বাঁচাতে না পারার খেদ আমার যাবে না। কনড়, আমি জানি, তুমি আমাকে ভালোবাস, আমি তোমার কাছে রাজার প্রাণভিক্ষা চাইছি—যেমন করে হোক রাজাকে বাঁচাও। আর তাতে যদি আপত্তি থাকে তোমার, দরজা খুলে চলে যাও, অধিকারী আর প্রহরীদের বলো রাজার জন্য অন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছ—তারা বাধা দেবে না, তুমি অনায়াসে পালাতে পারবে।

পাথর মূর্তিতে যেন প্রাণসঞ্চার হল। স্ফীত-বক্ষ বিশাল-দেহ মানুষটা আস্তে আস্তে টান হয়ে দাঁড়াল। নিজের অজ্ঞাতে সনচরীর কাছে এগিয়ে গেল। খুব কাছে। সনচরী রাজার গা ঘেঁষে বসেছিল। কাছে এসে কনড় ঝুঁকে অপলক নেত্রে তাকে দেখল একটু। তার পর আরো ঝুঁকে দুই হাতের থাবায় তাকে পুতুলের মতো তুলে নিয়ে সযত্নে অনতিদূরের একটা উঁচু আসনে বসিয়ে দিল। তার কোমর থেকে কিরীচটা নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

রাজার কাছে এসে প্রলেপ আর ওষুধের গুঁড়ো হাতে করে সরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষত-স্থান পরীক্ষা করল। আগেই দেখেছিল, এখন যেন শেষবারের মতোই দেখল। তার পর আস্তে আস্তে সনচরীর দিকে ফিরে তাকাল।

সনচরী উদ্‌গ্রীব। এই মুখ দেখে আশা বা আশঙ্কা কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু তবু তার মনে হল, ওই নিষ্পলক চোখে একটু যেন আশ্বাসের বারতা আছে, ওই অভিব্যক্তিশূন্য ঠোঁটের কোণে একটু যেন অদৃশ্য হাসি লেগে আছে।

কনড় উঠল। খুব ধীরে সনচরীর সামনে এগিয়ে এলো। তার পায়ের কাছটিতে নতজানু হয়ে বসল। তার চোখ দুটো যেন আরো একটু বেশি চকচক করছে। সনচরী নির্বাক স্তব্ধ। তার দুটো পায়ে ও দুটি চুম্বন-রেখা এঁকে দিয়ে আবার উঠে রাজার কাছে ফিরে গেল।

পিছন থেকে সনচরী দেখতে পাচ্ছে না, ক্ষতস্থানের ওপর উবুড় হয়ে কি করছে সে। সমস্ত শক্তি দিয়ে এক হাতে রাজার উরুদেশের সমস্ত রক্তচলাচল বন্ধ করেছে। দাঁতে করে নরপশুর মতো ক্ষতস্থানে আরো বড় করে ছিঁড়ে দিয়েছে সে। তার পর নিঃশেষে রাজার অঙ্গের রুদ্ধ বিষরক্ত টেনে শুষে নিচ্ছে। সেই বিষরক্তের অনেকটাই মেঝেতে গড়াচ্ছে আর অনেকটাই তার জঠরে গেছে। দেহ অবশ হয়ে আসছে তার, তবু ওই রক্ত টানতে টানতেই একসময় মুখ থুবড়ে ঢলে পড়ল সে।

সনচরী নিস্পন্দ, চেতনাশূন্য, চিত্রার্পিত।

কতক্ষণ কেটেছে হুঁশ নেই। সনচরী জেগেছিল কি ঘুমোচ্ছিল জানে না। হঠাৎ এক বিদ্যুৎ-কশাঘাতেই যেন চমকে উঠে দাঁড়াল। এ কি হল ? এ কি করেছে সে ? কনড় এভাবে পড়ে আছে কেন ? রাজা....না রাজার দেহের নীলভাব তো অনেক, অনেক কম। কিন্তু কনড়ের কি হল ? সে নড়ে না কেন—ওই বিশাল দেহ এমন অসাড় কেন ? এমন কে করল....সনচরীই তো করেছে, কিন্তু কি করেছে সনচরী ?

হঠাৎ যেন দিশা ফিরল তার। স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে বসে এতক্ষণ কি দেখেছে সে, স্মরণ হল। তীব্র, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠতে গিয়েও নিজের মুখ চাপা দিল। তারপর নিস্পন্দ কনড়ের গা ঘেঁষে বসে পড়ে তার বুকের ওপর মুখ ঘষতে লাগল।—এ কি করলাম আমি, এ কি করলাম কনড়, তোমার ভালোবাসার এ কি প্রতিদান দিলাম আমি ! কনড় তুমি ওঠ, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব, কনড় চোখ মেলে চাও, ওঠ কনড় ওঠ— !

কিন্তু কনড় যে আর উঠবে না তার থেকে ভালো আর কে জানে !

প্রায় এক মাস বাদে রাজা সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন।

প্রাণদাত্রীর প্রতি রাজার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। তার থেকেও বেশি, সনচরীর প্রতি প্রেমে রাজার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ। এই প্রেমের বন্যা প্রতিরোধের ক্ষমতা আর যেন কারো নেই—রানীর না, অধিকারীর না, রাজার নিজেরও না। সনচরী রাজী হলে রাজপ্রাসাদেই তার স্থান কত। রাজা কারো নিষেধে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। সনচরী রাজী হয় নি। আপাতত সে আগের সেই নগর-গৃহেই আছে। তবে সম্প্রতি রাজার অনুরোধে তাঁর বিলাসশালায় উঠে যেতে রাজী হয়েছে।

রাজা তার জন্য রাজ্য ছাড়তে প্রস্তুত, দেশ ছাড়তে প্রস্তুত। কিন্তু সনচরী তাঁকে

কিছুই ছাড়তে দিতে প্রস্তুত নয়।

বাইরে থেকে সনচরীর পরিবর্তনের আভাস কেউ পায় না। রাজার কাছে সে তেমনি হাস্যোচ্ছল, মোহিনীময়ী, চিরযৌবনের অভিসারিণী। প্রজাদের কাছে সে তেমনি রহস্যময়ী কৌতুকশিখাময়ী যাযাবরী যাদুকরী। কিন্তু নিভৃত অবকাশে অন্তস্তলের পরিবর্তনের আভাস সনচরী নিজেই পায়। কে যেন ভিতর থেকে এক মহান ভয়াল পরিণামের জন্য তাকে প্রস্তুত হতে বলছে, প্রস্তুত করে তুলছে। কেউ তাকে না বললেও রানীর ক্রোধ আর অধিকারী দেবরাজের ক্রোধ সে উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সেজন্যে সে কিছুমাত্র উতলা নয়। সনচরী নিজেকেই ভয় করে, নিজের জন্যেই উতলা হয়, নিজের নিভৃতের কিছু প্ররোচনায় নিজেই কখনো উদ্দীপিত হয়, কখনো শঙ্কা বোধ করে। কখনো বা কনড়ের কাছে একটা প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে। মনে হয়, কনড় যেন কোন্ নিঃশব্দ অলক্ষ্য থেকে তাকে দেখছে, গম্ভীর বিদ্রূপে তার দিকে চেয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ হয়ে ওঠে সনচরী, অস্ফুট উক্তি করে, আমি মিথ্যে বলি না কনড়, সময় আসুক, তখন দেখবে।

ইতিমধ্যে ছোটখাটো আর এক ব্যাপার ঘটে গেল। কিন্তু দুই-একজনের ব্যক্তিজীবনে ঘটনাটা ছোট নয়। বাসনার আগুনে অনেক দিন ধরেই জ্বলছে অধিকারীর ছেলে তরুণ নগরশাসক জয়রাজ। কামনার তাপ যখন মস্তিষ্কে ওঠে, মানুষ তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়। অন্যথায়, রাজপ্রেয়সীকে বাসনার অন্তঃপুরে পাবার চিন্তায়ও ভয়ে বুক কেঁপে ওঠার কথা। চিত্তদাহে জয়রাজ দিনে দিনে মরীয়া হয়ে উঠেছে। রাজরোষে যদি প্রাণ যায় তাও পরোয়া করে না।

সনচরী বহুবার বহু ছলাকলায় ফিরিয়েছে তাকে। পরোক্ষে রাজার কথা বলে সচেতন করতে চেষ্টা করেছে তাকে। কিন্তু জয়রাজ কেমন করে যেন বুঝে নিয়েছে, ওই যাদুকরী আর যাই করুক নালিশ করবে না। করলে অনেক আগেই করত।

সেদিন দিবা-দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরে চুপচাপ বসেছিল সনচরী। সংবাদ পেল নগরশাসক জয়রাজ সাক্ষাৎপ্রার্থী। সনচরী ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু। তাকে বিদায় দেবার নির্দেশ দিতে গিয়েও কি ভেবে দিল না। বলল, অপেক্ষা করতে বল, যাচ্ছি।

সনচরী ঘরোয়া বেশবাসই আর একটু সংযত বিন্যস্ত করে নিল। তার পর পায়ে পায়ে অনাহূত তরুণ প্রেমিকের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই ক্ষোভে অভিমানে জয়রাজ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সনচরীর মুখে হাসির লেশমাত্র নেই, কিন্তু খুব কোমল করে বলল, বসতে আজ্ঞা হোক।

কণ্ঠস্বর শুনে ঈষৎ আশান্বিত হয়ে মুখ ফেরাল জয়রাজ।

সনচরী বলল, আপনার রাগ বুঝি, আমি নিরুপায় বলেই এতদিন এভাবে আপনাকে এড়াতে চেষ্টা করছি। কিন্তু আর গোপন করে লাভ নেই, আপনার এভাবে আমার কাছে আসতে নেই, কারণ আমি আপনার মাতৃতুল্যা।

সহসা মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল জয়রাজের। বিভ্রান্ত, বিমূঢ়।—তার মানে?

মানে যদি এখনো না বুঝে থাকেন, আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি বুঝিয়ে দেবেন—তিনি সত্যবাদী, সত্য গোপন করবেন না।

এই মুহূর্তে যাযাবরীর মাথাটা যদি অসির আঘাতে ধূলায় বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারত, জয়রাজ দিত। পিতার সঙ্গে তার এই রমণীকে নিয়েই মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তবু, পিতাকে সে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু নারকী যাদুকরী এ কি কথা বলল তাকে !

জয়রাজ মাতালের মতো টলতে টলতে বেরিয়ে এল। যে বিষ কানে ঢুকেছে, ক্রমশ তার প্রতিক্রিয়াই বড় হয়ে উঠতে লাগল। পিতা অনেক দিনই গোপনে যাদুকরীর সঙ্গে দেখা করেছেন জানে। সেটা তাকে প্রতিহত করার জন্যেই ধরে নিয়েছিল।....কিন্তু এমন ন্যায়নিষ্ঠ রাজা—ঘরে যার রূপসী শক্তিময়ী পত্নী—তিনি যদি এভাবে মোহগ্রস্ত হতে পারেন, আর কেউই বা হবে না কেন ? মিথ্যে হলে যাযাবরীর এভাবে বলার সাহস হয় কি করে ? ওই সর্বগ্রাসী রূপের দ্বারা সবই সম্ভব মনে হল জয়রাজের।....এই জন্যেই তা হলে পিতার এত কঠিন গঞ্জনা, এই জন্যই তাঁর এমন চক্ষুশূল সে !

জয়রাজ জানে না, কুশাগ্রবুদ্ধি পিতার চর তার পেছনে লেগে আছে। ভিতরের কথা দেবরাজ জানেন না, কিন্তু যাযাবরীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের শোক নিয়ে ফিরে অসার খবর তিনি পেয়েছেন। আরো সংবাদ পেলেন, এই দিনেই ছেলে দেশত্যাগের সঙ্কল্প করেছে।

দেবরাজ অনেকদিন বাদে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ শুনলাম, কবে ?

ঘৃণায় তাঁর দিকে তাকাতে পারল না জয়রাজ, জবাব দিল, এই মুহূর্তে।

দেবরাজের মুখে ঠাণ্ডা বিদ্রূপের আভাস। বললেন, বেশ। কিন্তু এক নটীর কাছ থেকে ঘা খেয়ে দেশত্যাগের দরকার কি ছিল, জালোরের পাহাড় তো কম উঁচু নয়, সেখান থেকে লাফিয়ে পরে এই কীটদেহের ভারমুক্ত হতে পারলে না ?

কাণ্ডজ্ঞানহীন জয়রাজ জ্বলে উঠল দপ করে। বলল, ঘৃণ্য নটীর প্রত্যাখ্যানের আঘাত নিয়ে আমি যাচ্ছি না, তার থেকে অনেক বড় আঘাত সে দিয়েছে আমার ইষ্টতুল্য পিতার সমাচার শুনিয়ে। আমি যাচ্ছি পিতা হারানোর শোক জুড়োতে।

দেবরাজ বিস্মিত, কৌতূহলান্বিতও। ছেলে চলে যাচ্ছে দেখে কঠোর আহ্বানে থামালেন তাকে।—কি বলেছে তোমাকে যাযাবরী ?

বলেছে সে আমার মাতৃতুল্যা। বলেছে, এর অর্থ যদি আমি না বুঝতে পারি তা হলে যেন আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করি—তিনি সত্যবাদী, সত্য গোপন করবেন না।

দেবরাজ স্তম্ভিত। তাঁর এই ভয়াল স্তব্ধতার ফাঁকে ছেলে কখন চলে গেছে খেয়াল নেই। আত্মস্থ হলেন যখন, ছেলে তখন অনেক দূরে। তবু ইচ্ছে করলে রক্ষী পাঠিয়ে ফেরাতে পারতেন তাকে। ফেরালেন না। দেবী শাকম্ভরী হয়ত তার মঙ্গলের জন্যই দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন তাকে। দেবরাজ উঠলেন আস্তে আস্তে। অকল্যাণের অবসান এবারে তিনিই করে দেবেন। তার পর রাজার নৃশংস শাস্তি স্থিরচিত্তে গ্রহণ করবেন।

যাযাবরীর গৃহে এলেন। সংবাদ পাঠাতে হল না, হাসিমুখে সনচরী নিজেই তাঁর

অভ্যর্থনায় দ্রুত এগিয়ে এল। বলল, মহামান্য অধিকারীর এই পদার্পণের আশাতেই দাসী অপেক্ষা করছিল।

ন্যায়নিষ্ঠ দেবরাজ কৈফিয়ত না নিয়ে বিচার করেন না। ধীরস্বরে বললেন, তুমি এতবড় পাতকী জানতুম না, আমার ছেলে দেশত্যাগী হয়েছে তার জন্য দুঃখ নেই, তুমি তার পিতৃগৌরবে কলঙ্ক লেপে দিয়েছ, এই মিথ্যার ফল গ্রহণের জন্য কি তুমি প্রস্তুত ছিলে?

সহজ বিস্ময়ে দু-চোখ টান করল সনচরী, বলল, আমি তাকে যা বলেছি সে কি সত্যি নয় বলে মনে করেন মহামান্য অধিকারী? মিথ্যা?

আরো স্পষ্ট কঠোর স্বরে দেবরাজ বললেন, পরিহাসের সুযোগ এর পর তুমি আর না-ও পেতে পার। তোমার উক্তির কৈফিয়ত শোনা পর্যন্ত আমার ধৈর্য থাকবে।

অসহায়ার মতো মুখখানা করে তুলল সনচরী। ঈষৎ বিস্ময়ের আমেজ লাগিয়ে জবাব দিল, কিন্তু পাপিষ্ঠা হলেও সত্যের অপলাপ তো পারতপক্ষে আমিও করি না মহামান্য অধিকারী। দেশের রীতি অনুযায়ী অপরাধিনী পরস্ত্রীর বিচার এবং শাস্তি একমাত্র রাজার দরবারে রাজার সম্মুখেই হয়ে থাকে। কেবলমাত্র নিজের পত্নী বা স্ত্রীসদৃশা উপপত্নীর অপরাধের শাস্তিবিধানেই পুরুষের অধিকার। আপনি তো অনেকদিন ধরেই স্বয়ং আমাকে শাস্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প জানি। মনে মনে আমাকে যদি সেই আসনই না দিয়ে থাকেন, তা হলে ন্যায়প্রতীক মহামান্য অধিকারী আমাকে রাজার গোচরে প্রকাশ্য রাজদরবারে বিচারের জন্য টেনে না নিয়ে গিয়ে গোপনে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হন কি করে?

অসহায় দুর্বলের মতোই ফিরে এসেছেন প্রবলপ্রতাপ অধিকারী দেবরাজ। সেই বিস্ময়ের ধাক্কায় সাময়িকভাবে অন্তত ক্রোধ ভুলেছেন। বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই তাঁর....কে এই যাযাবরী? পিশাচী? শয়তানী? নাকি কোনো ছলনাময়ী দেবী?

অধিকারী দেবরাজ বিভ্রান্ত।

তার পর আরো কিছুদিন রাজা যাদুকরীর মদির সান্নিধ্যের জোয়ারে ভেসেছেন, প্রজারা তার যাদুর খেলা দেখে আনন্দমত্ত। সনচরী তখন রাজার বিলাসশালায় উঠে এসেছে। সেই বিলাসশালায় দিনকতক তখন বাসনার লক্ষ দীপ জ্বলেছে।

শেষে হঠাৎ আবার একদিন সেই বিপরীত স্রোত। সব অন্ধকার। রানীর সঙ্গে সনচরীর সেই গোপন সাক্ষাৎ। যাযাবরী নিরুদ্দেশ। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে।

দীর্ঘ চার মাস বাদে, আবার এই গোগো নবমীর রাতে তার বহু প্রত্যাশিত বহুতৃষিত এক আর্বিভাব।

॥ চার ॥

রাজার আনন্দ আর শত-সহস্র প্রজার আনন্দোল্লাস কি এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ধাক্কায় ক্রমশ যেন স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। এত বড় জনতার মাঝে কি এক অস্বস্তি পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যেন।

এই আলোর বন্যায় ওই বহু উঁচু দড়ির ওপর সেই চিররহস্যময়ী সনচরীই নাচছে বটে। শুধু নাচ, যাদুর খেলা কিছু দেখাচ্ছে না। কিন্তু সকলের হৃদয়মনোহারিণী সেই সনচরীই কি?

সনচরীর নাচ দেখতে কারো আপত্তি নেই। বিশেষ করে মহাশূন্যে দড়ির ওপর নাচ। কিন্তু এ আবার কি নাচ যাদুকরীর। এই নাচ দেখে কাল যে অকাল নীরাজনা উৎসব এই মুহূর্তে এই যৌবনতৃষ্ণায় পরিবেশে এ-কথা সকলের মনে পড়ে যাচ্ছে কেন? তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস থেমে গিয়ে ভিতর থেকে বহুদিনের বিস্মৃত এক নম্র আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চাইছে কেন?

আরতির নাচ নাচছে সনচরী। তার পরনে দেবদাসীর বেশ। তার হাতে মঙ্গল উপাচার—শমীপল্লব। এই নাচের কথা যেন সকলেরই শোনা ছিল, স্মৃতিপথে সকলেরই দেখা ছিল। নীরাজনা উৎসবের আগের রাতে জীবনযৌবন মনপ্রাণ-সমর্পিতা দেবদাসীরা দেবী শাকম্ভরীর সম্মুখে এই নাচের আরতি করত। এখনো নাচ হয়, কিন্তু তপশ্চারিণীদের সেই নিষ্ঠার অভাবে ওই আরতি-নৃত্যের আবেগ গেছে—আনুষ্ঠানিক দিকটাই আছে শুধু।

রাজা সম্মোহিত। প্রজারা সম্মোহিত। যাদুকরী যেন সাক্ষাৎ দেবী শাকম্ভরীর সামনে সেই হারানো দিনের আরতির মধ্য দিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়ে নেচে চলেছে, নিজেকে দেবীর পায়ে উৎসর্গ করে দিচ্ছে, তার ভরা যৌবনের পাত্রটি যেন দেবীর পদমূলে উবুড় করে ঢেলে চলেছে।

রাজা নির্বাক। এত বড় জনতা নির্বাক। নিষ্পলক চোখে শুধু দেখছে সকলে। আর কতকালের এক নির্বাসিত কান্না যেন বুক ঠেলে গুমরে উঠতে চাইছে।

তীরবেগে ছুটেছে রানী রত্নাবাঈয়ের রথ। সামনের আসনে বসে অধিকারী দেবরাজ। তাঁর মুখ কাগজের মতো সাদা। নিশ্চল, নিষ্প্রাণ মূর্তির মত বসে আছেন অধিকারী দেবরাজ।

রানী রত্নাবাঈয়ের সমস্ত মুখ আরক্ত এখনো। দেবী-নাম জপ করতে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু পারছেন না। চমকে চমকে বার বার বাইরের দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। উৎসব-অঙ্গন থেকে উল্লাসের সাড়া কানে আসছে না বলে ব্যাকুল চোখে এক-একবার নিস্পন্দ-মূর্তি অধিকারীর দিকে তাকাচ্ছেন।

আবার নামজপে মন দিলেন রত্নাবাঈ। কিন্তু সহসা চমকে উঠলেন। জপমন্ত্র ছাপিয়ে কার অস্ফুট কৌতুক-কণ্ঠ কানে আসছে! যাযাবরীর যে-লিপি তাঁর বক্ষবাসের আড়ালে রয়েছে, সনচরীর কণ্ঠে সেই লিপির বাণীগুলোই থেকে থেকে কানের ভিতর দিয়ে মর্মমূলে প্রবেশ করছে তাঁর।

—রত্নাবাঈ, তোমার অকাল নীরাজনার মিথ্যা স্বপ্ন সফল হবে। নতুন শুচিসুদ্ধ জীবনের প্রতিশ্রুতিলাভ উপলক্ষে হলেও তোমাদের উদ্দেশ্য একটি বিসর্জন। তোমার আর অধিকারী দেবরাজের। এই উদ্দেশ্য তোমাদের সিদ্ধ হবে। বিসর্জন হবে। এই সুযোগ দেবার জন্যেই আমি তোমার আশ্রয়ে এসেছিলাম। তোমরা ষড়যন্ত্র যে করবে

তারা। অধিকারী দেবরাজকেও চেনে না তারা, তবে নামটা শোনা ছিল, চেহারার বর্ণনাও কিছু কিছু জানা ছিল। ওই বৃদ্ধ সেই অধিকারী দেবরাজ কিনা তাই নিয়েও জটলা করে তারা।

বলতে গেলে একটা বছর ধরেই এই দেখে আসছিল তারা। এক বছর পরের আবার গোগো নবমীর দিন পর্যন্ত। সভয়ে চিন্তা করেছে তারা, হাতে গোগোর আশীর্বাদী তাগা না বেঁধে এই রাতেও লোকটা ওই জংলাপাহাড়েই কাটাবে নাকি।

সেই রাতের পর থেকে আর কেউ তাঁকে দেখে নি।

গ্রন্থ পরিচিতি

এই খণ্ডে আছে পাঁচটি গল্পগ্রন্থ।

'নব নায়িকা' (প্রকাশ ২৫ অক্টোবর ১৯৫৭)। এখানে গল্পগুলির পূর্ব নামে নামকরণ হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশকালে যে নামে মুদ্রিত হয়, বন্ধনীর মধ্যে গ্রন্থধৃত নাম সমেত তালিকা এই রকম:—চোখের বালি (প্রথমা), কলঙ্কবতী (দ্বিতীয়া), কালোদা (তৃতীয়া), হাত (চতুর্থা), কমলিনী (পঞ্চমা), জবাব (ষষ্ঠা), অশমিতা (সপ্তমা), লীলাবতী (অষ্টমা), সুদর্শনা সোম (নবমা)। প্রথম গল্পটি আত্মজীবনীমূলক। তাঁর লেখক হওয়ার পথে বাধাবিপত্তি ও তা থেকে উদ্ধার লাভের কাহিনী এই গল্পে ধৃত।

'অলকাতিলকা' (৩১ ডিসেম্বর ১৯৬০) গ্রন্থে আছে একটি গল্প, চারপর্বে বিন্যস্ত—'সদানন্দ ঘোষালের গল্প—প্রথম সর্গ', দ্বিতীয় সর্গ, তৃতীয় সর্গ, চতুর্থ সর্গ।

'মহুয়া কথা' (জানুয়ারি ১৯৬০) গ্রন্থে আছে আটটি গল্প; কুমারসম্ভব, মাশুল, তিলে তিলে তিলোত্তমা, ভুল ভুলাইয়া, শিকার, মদনভস্ম, মহুয়া কথা, সেলিম চিশ্তির কবর।

'সাঁঝের মল্লিকা' গল্প সংকলনে আছে সাতটি গল্প—মল্লিকা, ভারতী, টান, প্রণতিভস্ম, আর এক বস্তু, পুরস্কার, আদর্শ।

'বিদেশিনী' গল্পগ্রন্থ দুটি বৃহদায়তন ছোট গল্পের সংকলন—বিদেশিনী এবং সঞ্চারী।

এই পাঁচটি গল্পগ্রন্থ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে সার্থক কুশলী গল্প লেখক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত